ভগবদ্গীতা
ও
বিশ্বজনীন বার্তা

(আধুনিক চিন্তাধারা ও চাহিদার আলোকে গীতাভাষ্য)

প্রথম খণ্ড

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

অনুবাদক ঃ
ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

প্রকাশক :
স্বামী সত্যব্রতানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলকাতা ৭০০ ০০৩

প্রথম প্রকাশ :
শ্রীমায়ের উদ্বোধন বাড়িতে ৯৬তম শুভ পদার্পণ তিথি
২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১২
১১ জুন, ২০০৫
1M1C

ISBN 81-8040-494-3

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস :
উদ্বোধন প্রকাশন বিভাগ

মুদ্রক :
রমা আর্ট প্রেস
৬/৩০ দমদম রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩০

প্রকাশকের নিবেদন

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সদ্যপ্রয়াত ত্রয়োদশ মহাধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'Universal Message of the Bhagavad Gita'-র প্রথম খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হলো। আমাদের একটা বিশেষ আক্ষেপ থেকে গেল এই জন্য যে, আমাদের সর্ববিধ প্রয়াস ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমরা মহারাজজীর ইহজীবনের মধ্যেই এই প্রকাশনা সম্ভব করে উঠতে পারলাম না। পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজ এই প্রকাশনার ব্যাপারে তাঁর জীবনের শেষদিনটি পর্যন্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে গেছেন এবং কাজের অগ্রগতির বিষয়ে প্রায়শই খোঁজখবর নিতেন। কিন্তু আমাদের অপরিসীম দুর্ভাগ্য, আমরা শেষপর্যন্ত তাঁর মর্তলোকে অধিষ্ঠানকালের মধ্যেই তাঁর শ্রীহস্তে এই খণ্ডটি তুলে দিতে পারলাম না। এজন্য আমরা শ্রীরামকৃষ্ণলোকনিবাসী মহারাজজীর নিকট অশেষ ক্ষমাপ্রার্থী।

গীতা ধ্যান-শ্লোকের পর গীতা-মাহাত্ম্য শীর্ষক শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মবিনিঃসৃতা ॥
সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা, সর্বদেবময়ো হরিঃ।
সর্বতীর্থময়ী গঙ্গা, সর্বদেবময়ো মনুঃ ॥
গীতা গঙ্গা চ গায়ত্রী গোবিন্দেতি হৃদি স্থিতে ॥
চতুর্গকার সংযুক্তে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

অর্থাৎ—স্বয়ং পদ্মনাভ (নাভিতে যাঁর কমল সুশোভিত) শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত শ্রীমদ্ভগবদগীতা সুললিত মাধুর্যে গান করাই কর্তব্য, অন্য কোন শাস্ত্রের আর প্রয়োজন কি! কেননা, শ্রীহরি যেমন সকল দেবদেবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পুণ্যতোয়া গঙ্গা যেমন সর্বতীর্থের সার, সকল দেবতাদের মধ্যে আদি মানব মনু যেমন বিশিষ্ট, তেমনি গীতাও সর্বশাস্ত্রের নির্যাস। গীতা, গঙ্গা, গায়ত্রী ও গোবিন্দ—আদিতে গ-কারাত্মক এই চারটিকে হৃদয়ে ধারণ করে রাখলেই আর মানুষের পুনর্জন্ম লাভ করতে হয় না।

এতো গেল গীতা মাহাত্ম্যের কথা, কিন্তু আধুনিক বিশ্বে এই গীতার সমাদর সর্বজনীন। মানবজীবনের বিভিন্ন স্তরে গীতার অবদান যে কতটা সুদূরপ্রসারী তা অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর গবেষণা-সমৃদ্ধ এই সুবিশাল গ্রন্থে। মহারাজজী তাঁর সুদীর্ঘ সাধনজীবনে তাঁর অনন্যসাধারণ দিব্য প্রতিভা ও মহতী প্রজ্ঞার আলোকে আধুনিক মানব জীবনের সুবিস্তৃত পটভূমিকায় উপনিষদ্ গীতাদি সনাতন ধর্মগ্রন্থসমূহের নবতর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে তা বিশ্ববাসীর সমক্ষে অতি প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপিত করে গেছেন। আমরা ইতঃপূর্বেই ভারতীয় বিদ্যাভবন কর্তৃক প্রকাশিত মহারাজজীর সুলিখিত গবেষণাধর্মী 'Universal Message of the Upanishad'-গ্রন্থখানির বঙ্গানুবাদ 'উপনিষদের সন্দেশ' নামে প্রকাশ করেছি। উপনিষদের পর তিনি দীর্ঘ দুবৎসরকাল ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে হায়দ্রাবাদ রামকৃষ্ণ মঠের বারশো আসনবিশিষ্ট 'বিবেকানন্দ হল' নামক প্রেক্ষাগৃহে রবিবাসরীয় আলোচনাসভায় শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ওপর ইংরাজিতে স্বতোৎসারিতভাবে (Extempore) ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেইসব বক্তৃতা অডিও ও ভিডিও ক্যাসেটে ধরে রাখাও হয়েছিল এবং পরবর্তী কালে তার সংকলন তিনখণ্ডে 'Universal Message of the Gita' নামে রামকৃষ্ণ মঠের অদ্বৈত আশ্রম কর্তৃক প্রকাশিত হয়, যার প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ২০০০ খ্রিস্টাব্দের গুরুপূর্ণিমার শুভলগ্নে। পরবর্তী কালে আরও দুটি খণ্ড একে একে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির সম্যকভাবে সম্পাদনা করেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী স্বয়ং এবং একাজে তাঁকে সহায়তা করেন স্বামী সত্যপ্রিয়ানন্দ, স্বামী নিশ্চলানন্দ এবং ব্রহ্মচারী শাশ্বতচৈতন্য। ইংরাজি গ্রন্থটি প্রকাশনার পরই স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী এর একখানি সাবলীল বাংলা অনুবাদ যাতে সত্বর প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য উদ্বোধন কার্যালয়কে অনুরোধ করেন এবং সেইমতো আমরা এই অনুপম গ্রন্থটির তিনখণ্ড অনুবাদের কাজে উদ্যোগী হই এবং প্রথম খণ্ডটির অনুবাদের দায়িত্বভার শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তপরিমণ্ডলে সুপরিচিত সর্বজনশ্রদ্ধেয় বর্ষীয়ান শাস্ত্রবেত্তা ও সুলেখক ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য হস্তে সমর্পিত হয়। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স বর্তমানে প্রায় নব্বই বৎসর এবং সম্প্রতি বার্ধক্যজনিত নানাবিধ শারীরিক অসুবিধায়ও তিনি কিছুটা বিপর্যস্ত, তথাপি তাঁর স্বভাবসুলভ বিনয়বশত আমাদের এই অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি। অক্লান্ত শ্রমস্বীকার করে তিনি যথাসময়ে খণ্ডটির অনুবাদ কার্য সুসম্পন্ন করেছেন। বাকি দুই খণ্ডের অনুবাদকার্যও প্রায় সমাপ্তির পথে।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বিরল কর্মনিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার জন্য তাঁর প্রতি আমরা আমাদের অন্তরের সশ্রদ্ধ ও সুগভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

প্রথম খণ্ডের অনুবাদকার্য যথাসময়ে সুসম্পন্ন হলেও প্রকাশনা পর্বে আমাদের কাজের গতি গ্রন্থটির বিশালতা ও বিপুল তথ্যসমৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট দ্রুত না হতে পারায় গ্রন্থটির প্রকাশনায় বেশ কিছুটা বিলম্ব হয়ে গেল। তজ্জন্য আমরা সবিশেষ দুঃখিত। এই খণ্ডটির প্রকাশনা-কার্যে নানাভাবে সাহায্য করেছেন আমাদের স্বেচ্ছাব্রতী কর্মিবৃন্দ, বিশেষ করে সর্বশ্রী পলিন মুখোপাধ্যায়, সুহাস রায়, উৎপল মুখোপাধ্যায় ও অজিতকুমার দাস। অনূদিত গ্রন্থের পরিমার্জনা ও নির্দেশিকা প্রণয়নের কাজ করেছেন আমাদের আর এক স্বেচ্ছাব্রতী কর্মী শ্রীতারকনাথ দে। এঁদের অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা ভিন্ন এই খণ্ডটির প্রকাশনা যথেষ্ট দুঃসাধ্য হতো। তাঁরা সকলেই আমাদের ধন্যবাদার্হ।

আমাদের আশা, এই গ্রন্থের বাকি দুটি খণ্ডের অনুবাদও আমরা যথাসময়ে প্রকাশ করে উঠতে পারব। নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুণে সমৃদ্ধ অনুপম এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি পাঠক-পাঠিকা মহলে যথাযোগ্য সমাদর লাভ করলে আমরা আমাদের শ্রম সার্থক জ্ঞান করব। অলমিতি—

স্বামী সত্যব্রতানন্দ

বাগবাজার মায়ের বাড়িতে
শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ৯৬তম
শুভ পদার্পণ তিথি, ১৪১২ বঙ্গাব্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা—৭০০ ০০৩

সূচীপত্র

ভূমিকা

গীতার শক্তি ও মনোহারিত্ব

কঠ উপনিষদের একটি শান্তিপাঠ দিয়ে আমরা প্রসঙ্গের সূচনা করব ঃ

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বিনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—'ওঁ (পরমাত্মা) আমাদের উভয়কে (গুরু-শিষ্যকে) সমভাবে রক্ষা করুন; তিনি যেন আমাদের সমভাবে বিদ্যাফল ভোগ করান। আমরা যেন সমভাবে সামর্থ্য অর্জন করতে পারি। অধিগত বিদ্যা যেন আমাদের উভয়কে তাৎপর্য প্রকাশে তেজস্বী করে তোলে। আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।'

প্রারম্ভিক মন্তব্য ঃ
ভারত এককালে গীতাকে ভুল বুঝেছিল

গীতার প্রথম তিনটি অধ্যায়ে যোগের দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার মূল ভাবটি তুলে ধরা হয়েছে; যেটির উল্লেখ শ্রীকৃষ্ণ চতুর্থ অধ্যায়ের সূচনাতে করেছেন। বাকি চোদ্দটি অধ্যায়ে সেই দর্শনের পুষ্টিসাধন করা হয়েছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আদি বাণীর সারটি ব্যাখ্যাত হয়েছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে। গীতার উদ্দেশ্য হলো নর-নারীর অন্তরস্থ শাশ্বত আধ্যাত্মিক সত্যটিকে উপলব্ধি করতে মানুষকে সাহায্য করা; সেইসঙ্গে বুঝতে সাহায্য করা যে সব মানবীয় লক্ষ্যগুলির কথা আমাদের সংবিধানে বলা হয়েছে এবং এ যুগের মানব যেগুলির সন্ধান করছে। এই কারণেই আজ গীতার বাণী সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। আর আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রে আধুনিক যুগে গীতাকে বুঝতে হবে এমন এক দৃষ্টিকোণ থেকে। যা আমাদের চিরাচরিত প্রথা থেকে আলাদা। অতীতে বেশির ভাগ মানুষই গীতা পড়তেন পুণ্যের আকাঙ্ক্ষায় এবং একটু মানসিক শান্তির আশায়। আমরা কখনো বুঝিনি যে, গীতা হলো তীব্র বাস্তবমুখিনতার এক মহাগ্রন্থ; বুঝিনি যে, এটি ফলিত বেদান্তের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ—যা পূর্ণ-বিকশিত

মানুষের এক সমাজ গড়ে তুলতে আমাদের সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে। আমরা কখনো গীতার শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগের দিকটি বুঝতে পারিনি। যদি তা পারতাম, তাহলে আর আমাদের এক হাজার বছর ধরে বৈদেশিক আগ্রাসন, আভ্যন্তরীণ জাতিদ্বন্দ্ব, সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও গণ-দারিদ্র্য সহ্য করতে হতো না। আমরা কখনো গীতাকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করিনি; কিন্তু এখন তা করতে হবে।

আমাদের দরকার এমন এক দর্শন যা মানুষের আত্মমর্যাদা, স্বাধীনতা ও সাম্যের ভিত্তিতে এক নতুন জনকল্যাণকামী সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে। আধুনিক ভারতবর্ষে আমরা আমাদের সামনে এই লক্ষ্য স্থাপন করেছি এবং এই ভাব সারা পৃথিবীর মানুষকেও অনুপ্রাণিত করছে। গীতায় রয়েছে এমনই এক দর্শন, যা মানুষের হৃদয়-মনকে সেই লক্ষ্যের উদ্দেশে পরিচালিত করবে, নিয়ন্ত্রিত করবে। আধুনিক যুগে গীতাকে প্রথম এইরকম একদিশা—বাস্তবমুখী দিশা—প্রদান করলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বহু হাজার বছর আগে শ্রীকৃষ্ণ এটিকে এক বাস্তবমুখী দর্শনরূপে উপস্থাপন করলেও আমরা কিন্তু তাকে একটি পুণ্যফলদায়ী গ্রন্থমাত্রে পরিণত করে ফেলেছিলাম। *গীতা-ধ্যান-শ্লোক* নামে পরিচিত তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোকগুলিতে এই ভাব রয়েছে। সেখানে গীতাকে তুলনা করা হয়েছে দুধের সঙ্গে; সেই দুধ গাভী অর্থাৎ বেদসমূহ থেকে দোহন করেছেন যে-গোয়ালা বা দোগ্ধা, তিনি শ্রীকৃষ্ণ। সেই দুধ কী কাজে লাগবে? সে-দুধ পূজায় ব্যবহারের জন্য নয়; সে-দুধ পান করে পুষ্ট হওয়ার জন্য। কেবল তবেই শক্তিলাভ করা যাবে। কিন্তু শত শত বছর ধরে আমরা সেই দুধভর্তি পাত্র ফুলচন্দন দিয়ে পূজা করেছি, প্রণাম করেছি, কিন্তু কখনো সে-দুধ পান করিনি। তাই আমরা দুর্বল—শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিকভাবে। এই অবস্থার পরিবর্তন হবে যদি আমরা এখন সে-দুধ পান করতে ও হজম করতে—আত্মীকরণ করতে—আরম্ভ করি। তাতে আমাদের সুবিধা হবে চারিত্রশক্তি গড়ে তুলতে, কর্মে দক্ষতা আনতে, সেবাভাব জাগিয়ে তুলতে এবং জাতির ভাগ্য নতুন করে রচনা করতে।

ভারতের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেছি, আমাদের দেশের লোকের মধ্যে ব্যাপকভাবে গীতা সম্বন্ধে এই ভুল ধারণা রয়েছে। তবে, ব্যাপারটা আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল হায়দ্রাবাদের একটি ঘটনা। আমি তখন দিল্লির রামকৃষ্ণ মিশনের দায়িত্ব নিতে চলেছি। অন্ধ্রপ্রদেশ হয়ে যাচ্ছিলাম। ১৯৪৯-

এর পুলিশি তৎপরতার ঠিক পরেই। ঐ রাজ্যে বিস্তারিত বক্তৃতা সফরসূচীর মধ্যে হায়দ্রাবাদের জন্য ছিল পাঁচটি দিন। এক বন্ধু পরামর্শ দিল, রাজ্যের সামরিক শাসক, জেনারেল জে. এন. চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে যেতে। আমি বন্ধুটির বাড়িতে উঠেছিলাম। ওঁর সঙ্গেই গিয়ে জেনারেল চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম।

আমরা যেতে জেনারেল চৌধুরী আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। প্রথম আধঘণ্টা উনিই কথা বললেন; আমি শুনলাম। রাজ্যের কিছু কিছু অঞ্চলে তখন কম্যুনিস্ট গণ-অভ্যুত্থান হচ্ছিল; ওঁকে ঘন ঘন ফোন ধরতে হচ্ছিল, তবে আমাদের কথাবার্তা চলছিল। দেখলাম, ওঁর টেবিলের ওপর একখানি গীতা। আমার সুযোগ এসে গেল কথা বলার। জিজ্ঞেস করলাম ঃ "জেনারেল চৌধুরী, আপনি গীতা পড়েন নাকি? আপনার টেবিলে গীতা দেখছি।" উলটোদিক থেকে রীতিমতো অবসন্ন গলায় জবাব এল ঃ "হ্যাঁ, অবশ্যই; যখন খুব ক্লান্ত লাগে আর একটু মানসিক শান্তি পেতে চাই, তখন গীতা থেকে কয়েক লাইন পড়ি।" আমি দৃঢ়ভাবে বললাম ঃ "উদ্দেশ্য কিন্তু সেটা নয়।" একথায় অবাক হয়ে উনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আপনি কি বলতে চান যে, আমাদের কেবল একটু মানসিক শান্তি দেওয়া ছাড়া গীতার অন্য কোন মূল্য আছে?" আমি বললাম ঃ "হ্যাঁ, গীতা কেবল মানসিক শান্তি দেওয়ার জন্য নয়, গীতার উদ্দেশ্য আপনাকে জনগণের সেবা করতে পারার শক্তি দেওয়া, আপনাকে একজন দায়িত্বশীল নাগরিক করে তোলা। গীতায় রয়েছে জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে এক সার্বিক স্বয়ংসম্পূর্ণ দর্শন।"

জেনারেল চৌধুরী একেবারে অবাক হয়ে গিয়ে আমাকে বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন ঃ "আপনি বলতে চাইছেন, এই রাজ্যের মিলিটারি গভর্নর হিসেবে আমার কাছে গীতার কোন প্রাসঙ্গিকতা আছে?" আমি বললাম ঃ "ঠিক তা-ই। আমাদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, যেসব নারীপুরুষকে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হয় এবং দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নিতে হয়, তাঁদের জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে একটা 'দর্শন' থাকা দরকার। গীতায় সেই দর্শন পাওয়া যায় যাকে 'যোগ'—এই সহজ-সরল নামে অভিহিত করা হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত আমরা এটিকে ঠিক বুঝতে পারিনি। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটির কথা ধরুন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের বলছেন, 'দায়িত্বশীল মানুষকে আমি এই যোগদর্শন প্রদান করেছি, যাতে তারা এর মাধ্যমে মানুষকে সেবা

করার, সুরক্ষা দেওয়ার ও পুষ্ট করার শক্তি অর্জন করতে পারে।' এই মহান গ্রন্থের এটিই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য।" আমি এই কথাগুলির ওপর বারবার জোর দিলাম, আর উনি বারবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আমি—এই রাজ্যের গভর্নর—সেই আমি কি এই গ্রন্থ থেকে কোন শিক্ষা নিয়ে আরো দক্ষ ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারি?" উত্তরে বললাম ঃ "হ্যাঁ, সেটিই এর উদ্দেশ্য—সমস্ত দায়িত্বশীল নরনারীকে আপামর জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে অনুপ্রাণিত করা। সেটিই এর স্বরূপ। এ-গ্রন্থ আপনাকে ঘুম পাড়ানোর জন্য নয়—আপনাকে জাগানোর জন্য। এটি কেবল আপনাকে মানসিক শান্তি দেওয়ার জন্য নয়—এটি আপনাকে সেই প্রচণ্ড মানবিক প্রেরণা ও দৃঢ়সঙ্কল্প দেওয়ার জন্য, যার সহায়ে আপনি সমাজের সকলের কল্যাণের জন্য কাজ করায় ব্রতী হবেন।"

জেনারেল চৌধুরী খুব খুশি হলেন। কথায় কথায় একঘণ্টা কেটে গেল। জিজ্ঞেস করলাম ঃ "আপনি কি স্বামী বিবেকানন্দের কোন বই পড়েছেন?" উনি বললেন ঃ "হ্যাঁ, আমি তাঁর উক্তি-সঞ্চয়নের ছোট ছোট কিছু বই পড়েছি।" আমি বললাম ঃ "তাতে হবে না কিন্তু! আমি চাই, আপনি বিশেষ করে একটি বই পড়ুন—'Lectures from Colombo to Almora' ('ভারতে বিবেকানন্দ')—যাতে তাঁর ভারতে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি রয়েছে। এইসব বক্তৃতা আমাদের জাতিকে জাগিয়ে দিয়েছিল; এইসব বক্তৃতার প্রভাবে জ্বলে উঠেছিলেন সব মহান দেশপ্রেমিক বীর, যাঁরা আমাদের জাতির স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। এই গ্রন্থের ভাব হলো মানুষ তৈরি ও জাতি-গঠন। আমি দিল্লি থেকে আপনাকে একটি পাঠিয়ে দেব, আমার স্বাক্ষর-সহ—অবশ্য যদি আপনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, সেটি পড়বেন। আমি এমন একটি গ্রন্থকে অকারণ নষ্ট করতে চাই না।" উনি বললেন ঃ "হ্যাঁ, পড়ব।" ওঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দিল্লি পৌঁছে সেখান থেকে 'Lectures from Colombo to Almora' বইটি ওঁকে পাঠালাম। তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে সুন্দর একটি চিঠি লিখেছিলেন। পরবর্তী কালে যখন উনি কানাডায় আমাদের হাই কমিশনার হয়েছিলেন, তখন সেদেশে বসবাসকারী ফরাসী নাগরিকদের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানের বিস্তারের উদ্দেশ্যে উনি আমার লেখা 'Eternal Values for a Changing Society' গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডের প্রথম বক্তৃতা—'Essence of Indian Culture'—ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার জন্য আমার অনুমতি গ্রহণ করেছিলেন।

এই অভিজ্ঞতা থেকে আমি বুঝেছিলাম, যেভাবে আমরা নিছক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মতো করে রোজ সকালে বিভিন্ন স্তোত্র আবৃত্তি করি, সেভাবেই ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষ গীতাকে দেখে ও বুঝে থাকে। ভারতবর্ষে আজ আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ সঠিক লক্ষ্যে পরিচালিত করার জন্য প্রয়োজন যথার্থ একটি দর্শনের, যাতে আমরা এদেশের বিপুল পুরুষ-শক্তি ও স্ত্রী-শক্তি জাগরণ ও উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারি। গীতায় আমরা সেই দর্শন ও সেই আধ্যাত্মিকতারই সন্ধান পাই। গীতার বাণী কয়েক হাজার বছর আগে কুরুক্ষেত্রের ভয়ঙ্কর যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রদত্ত হয়েছিল। কেবল গীতাতেই আছে এইরকম এক দর্শন। অন্য সব শিক্ষাই প্রদত্ত হয়েছিল মন্দিরে, গুহায় বা অরণ্যে। এখানে ছাত্র ও শিক্ষক—অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ—দুজনেই ছিলেন চোখে-পড়ার মতো ব্যক্তিত্ব, দুজনেই যোদ্ধা। আর যিনি শিক্ষক—শ্রীকৃষ্ণ, তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ, যাঁর অন্তর সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ; যাঁর সম্পদ তাঁর বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি। গীতা তাই বীর ছাত্রের প্রতি এক বীর আচার্যের মুখনিঃসৃত বীরবাণী। গীতার বাণী সর্বজনীন; তাই সেটি পৃথিবীর যে কোন জায়গায় যে কোন মানুষের সম্বন্ধে প্রযোজ্য, যাতে সেই মানুষ তার অন্তর্নিহিত পূর্ণাঙ্গ মানবীয় সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে পারে। হাজার হাজার বছর আগে উপনিষদ্ বা বেদান্তসমূহ প্রতিপাদন করেছে মানবীয় সম্ভাবনার বিজ্ঞান, আর গীতা প্রতিপাদন করেছে সেই বিজ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ-পদ্ধতি। তাই স্বামী বিবেকানন্দ গীতাকে ফলিত বা প্রায়োগিক বেদান্তের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে মনে করতেন।

গীতার প্রথম ইংরেজি অনুবাদ

গীতার প্রথম ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন স্যার চার্লস উইলকিন্স। এটির প্রকাশক ছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। এর শুরুতে ওয়ারেন হেস্টিংস (ভারতে প্রথম ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল)-এর লেখা একটি ভূমিকা আছে, যাতে পাওয়া যায় এই অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণীটি ঃ "ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসানের তথা সেই সাম্রাজ্যের শক্তি ও সম্পদের উৎসগুলি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়ার দীর্ঘকাল পরেও ভারতীয় দর্শনের রচয়িতারা বেঁচে থাকবেন।"

এর একশ বছর পরে 'The Song Celestial' নামে গীতার আরেকটি সুন্দর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। লেখক স্যার এডউইন আর্নল্ড (১৮৩২-১৯০৪ খ্রিঃ)। তিনি ভারতবর্ষের পুনে ও অন্যত্র কর্মরত থাকাকালীন সংস্কৃত শিখেছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মেছিল। ইংল্যান্ডে

গিয়ে তিনি এই অনন্য গ্রন্থখানি ছাড়াও বুদ্ধের ওপর 'The Light of Asia' নামে একই রকম উল্লেখযোগ্য অপর একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। দুটি গ্রন্থেরই পঞ্চাশ-ষাটটির বেশি সংস্করণ হয়েছে। দুটিই সোজাসুজি পাঠকের হৃদয়ে গিয়ে উপস্থিত হয়।

ভগবদ্‌গীতা মানুষের সমস্যাকে মানুষের মতো করে দেখে, বিশ্লেষণ করে। এই কারণেই এর দারুণ একটি আবেদন আছে। ভারতবর্ষের মানুষের মনকে এই গ্রন্থ শত শত বছর ধরে অনুপ্রাণিত করেছে এবং আজ এটি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত করছে। লক্ষ্য করার ব্যাপার হলো, এই সমস্ত দেশের মানুষ দেখছেন, গীতা অধ্যয়নের পর তাঁদের পুরো দৃষ্টিভঙ্গিটাই বদলে যাচ্ছে। আমেরিকার এমার্সন, ওয়াল্ট হুইটম্যান, থোরো এবং ইংল্যান্ডের কার্লাইলের মতো চিন্তাবিদ্-লেখকরা গীতা অধ্যয়নের পর তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই প্রসারতা ও গভীরতা এসে যাওয়াটা অনুভব করেছেন। আর তখন থেকেই তাঁদের রচনার মধ্যেও ফুটে উঠতে আরম্ভ করেছে নতুন ভাব, নতুন বাণী।

আদি শঙ্করাচার্য কর্তৃক উন্মোচিত গীতার মহত্ত্ব

বর্তমান যুগে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে গীতার সাম্রাজ্য বিস্তৃত। প্রথমে গীতা কেবল ভারতেই প্রচলিত ছিল; তাও সমগ্র ভারতে নয়—ভারতের মাত্র কয়েকজন সংস্কৃত পণ্ডিতের মধ্যে। গীতার ওপর সংস্কৃত ভাষায় মহান ভাষ্য রচনা করে তাকে বিশাল 'মহাভারত' মহাকাব্য থেকে বের করে এনে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে জনসাধারণের কাছে সর্বপ্রথম উপস্থাপন করলেন আদি শঙ্করাচার্য। তার আগে পর্যন্ত এটি সেই বিশাল মহাকাব্যের ভীষ্মপর্বের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। শঙ্করাচার্যের এই মহান কীর্তির বিশেষ সমাদর করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর নিজের কথায় ঃ "শঙ্করাচার্য গীতার প্রচার করেই মহা গৌরবের ভাগী হয়েছিলেন। এই মহাপুরুষ তাঁর মহৎ জীবনে যে সকল বড় বড় কাজ করেছিলেন, সেগুলির মধ্যে গীতাপ্রচার ও গীতার একটি অতি সুন্দর ভাষ্যপ্রণয়ন অন্যতম। ভারতের সনাতন-পন্থাবলম্বী প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতাই পরবর্তী কালে তাঁকে অনুসরণ করে গীতার এক একটি ভাষ্য লিখেছেন।"[১]

---

১ বাণী ও রচনা, ৪র্থ সং, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৩

এসব সত্ত্বেও গীতা সীমাবদ্ধ ছিল মাত্র কয়েকজন পণ্ডিত ও সাধুসন্তের মধ্যেই। পরে অন্যান্যরা এর ওপর ভাষ্য রচনা করেন এবং গ্রন্থটি ধীরে ধীরে আমাদের জাতীয় ভাষাগুলিতে প্রবেশ করে। শঙ্করাচার্যের কয়েক শতক পরে মারাঠী ভাষায় সাধু জ্ঞানেশ্বর রচনা করেন *জ্ঞানেশ্বরী*। আধুনিক কালে লোকমান্য তিলক (দুই খণ্ডে) রচনা করেছেন 'গীতারহস্য' নামে এক মহান গ্রন্থ। ইংরেজ সরকার তাঁকে যে সময়ে কয়েক বছরের জন্য বর্মার (বর্তমান মায়ানমার) মান্দালয় কারাগারে বন্দি করে রেখেছিল, সে সময়ে গ্রন্থটি রচিত হয়। সাহায্য নেওয়ার মতো কোন বই তখন তাঁর হাতে ছিল না; তিনি স্মৃতি থেকে লিখেছিলেন। গ্রন্থটি অসাধারণ। তার পর থেকে আজ পর্যন্ত গীতার ওপর বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গীতা আজ সমগ্র ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর বহু অংশে অত্যন্ত জনপ্রিয়। পৃথিবীর নানা ভাষায় গীতা-গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিক্রিও হয়ে যাচ্ছে। অতএব, আমরা এমন এক যুগে বাস করছি, নিশ্চিতভাবে যার রূপচরিত্র ধীরে ধীরে নির্মাণ করে দিচ্ছে এই একটি মহান গ্রন্থ। গীতার বাণী বিশ্বজনীন, বাস্তবমুখী, শক্তিদায়ী এবং পবিত্রকারী। মহান উপনিষদ্সমূহে মানবসম্পদের এবং মানবিক সম্ভাবনার যে অসামান্য বিজ্ঞান গড়ে তোলা হয়েছে, তা গীতার মধ্যে লাভ করেছে বাস্তব প্রয়োগমুখী তাৎপর্য ও লক্ষ্যনির্দেশ। গীতাকে আমাদের সেই দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যয়ন করতে হবে; একে উপলব্ধি করতে হবে মানবীয় বিকাশ ও পরিপূর্ণতা লাভের একটি বিজ্ঞানরূপে। এর সাতশো শ্লোকের ছন্দও খুব সরল—এক পঙ্‌ক্তিতে আটটি বর্ণের প্রচলিত 'অনুষ্টুপ্' ছন্দ; যদিও মাঝেমধ্যে কিছু দীর্ঘতর ছন্দও আছে।

গীতা-ধ্যান-শ্লোক

গীতা খুব সহজ এবং এর অনেক ভাব মহাভারতের বাকি অংশেও দেখতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শান্তিপর্বের সঙ্গে গীতার অনেক ভাবগত মিল আছে। ২-৩ বছর আগে হায়দ্রাবাদে শান্তি পর্বের ওপর ভাষণ দেবার সময় তা লক্ষ্য করা গেছে। বৈদিক যুগের পর থেকে ঔপনিষদিক দর্শনের বাস্তববাদী তাৎপর্য নিরূপণ করে তাকে মানব-সমস্যা সমাধানে নিয়োগ করার প্রয়াস এতে রয়েছে দেখা যায়। এই উদ্দেশ্যেই এলেন মহান আচার্য শ্রীকৃষ্ণ, যিনি নিজে অত্যন্ত বাস্তববাদী ছিলেন। তিনি যাপন করলেন প্রবল কর্মময় একটি জীবন; সেইসঙ্গে তাঁর ছিল এমন এক হৃদয়-মন, যা সর্বার্থে বিশ্বজনীন। ভগবদ্গীতার মধ্য দিয়ে বেদান্তদর্শনের প্রয়োগোপযোগী রূপটি উপস্থাপন করলেন তিনি। এই গ্রন্থের

আঠারোটি অধ্যায় জুড়ে সাতশো শ্লোকের মধ্যে ধরা আছে সুন্দর সুন্দর সব ভাব—যা আমাদের কাছে বর্তমান কালে রীতিমতো প্রাসঙ্গিক। গীতা আপনার ওপর এমন কিছু মতবাদ চাপিয়ে দেয় না, যা নিয়ে আপনার কোন প্রশ্ন করবার অধিকার নেই। গীতা সকলকে আহ্বান জানায়—তার শিক্ষাকে প্রশ্ন করার এবং কেবল তার পরেই সে-শিক্ষাকে অনুসরণ করার। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মৌলিক জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠা ও ব্যাখ্যা করছেন সেইসব মানুষের জন্য, যারা কর্মব্যস্ত। সাধারণত আমরা গীতাপাঠ শুরু করার আগে *গীতা-ধ্যান-শ্লোক* নামে পরিচিত ৯টি শ্লোক পাঠ করে থাকি। এটি সারা ভারতে প্রচলিত এবং এখন প্রচলিত বিদেশেও। আমরা জানি না, কে এগুলি রচনা করেছিলেন। কারো কারো বিশ্বাস, গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার শ্রীধর স্বামী তিন-চারশ বছর আগে এগুলি রচনা করেছিলেন। শ্লোকগুলিতে গীতা, মহাভারতের রচয়িতা ব্যাসদেব এবং শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ রয়েছে।

তাই, আজ এই অদ্ভুত শ্লোকগুলির মূলানুগ অর্থ আপনাদের বলব।

প্রথমেই রয়েছে গীতা সম্বন্ধে একটি উক্তি ঃ

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ম্
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যেমহাভারতম্।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীম্
অম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্‌গীতে ভবদ্বেষিণীম্॥ ১॥

—'ওঁ ! হে জননি ভগবদ্গীতে, আপনার মাধ্যমে স্বয়ং ভগবান নারায়ণ কর্তৃক পার্থ (অর্জুন) উপদিষ্ট হয়েছিলেন; আপনি প্রাচীন মহর্ষি ব্যাসদেব কর্তৃক মহাভারতে গ্রথিতা, অষ্টাদশ অধ্যায়রূপিণী, অদ্বৈততত্ত্বরূপ অমৃতবর্ষিণী ও পুনর্জন্মনাশিনী—ভগবতি, আমি সদা আপনার ধ্যান করি।'

এইটিই প্রথম শ্লোক যেখানে গীতাকে 'জননী' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন ঃ "গীতা আমার মায়ের স্থান গ্রহণ করেছে। অল্পবয়সে আমি মাকে হারিয়েছিলাম, কিন্তু জীবনে কখনো মায়ের অভাব বুঝিনি, কারণ গীতা আমার সঙ্গে থাকত।" ধ্যানের দ্বিতীয় শ্লোকটি হলো ঃ

নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে
ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র।

যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ
প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ॥ ২॥

—'হে মহামতি ব্যাসদেব, আপনার চোখদুটি প্রস্ফুটিত পদ্মপত্রের মতো বিশাল, আপনি মহাভারতরূপ তৈলপূর্ণ জ্ঞানময় প্রদীপ প্রজ্বালিত করেছেন—আপনাকে প্রণাম করি।'

প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ॥ ৩॥

—'শরণাগতের কল্পবৃক্ষতুল্য, একহাতে অশ্ব-তাড়নের বেত্রদণ্ডধারী, গীতারূপ অমৃতদোহনকারী ও (দক্ষিণ হস্তে) জ্ঞানমুদ্রাযুক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি।'

জ্ঞানমুদ্রার তাৎপর্য

উল্লিখিত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনায় তাঁর (ডান) হাত জ্ঞানমুদ্রায় স্থিত—এইরকম উল্লেখ রয়েছে। ভারতীয় বৈদান্তিক দর্শন ও আধ্যাত্মিকতায় এটি একটি লক্ষণীয় ধারণা—তথা বিশেষত্ব। জ্ঞানাবস্থানরূপ এই বিশেষ মুদ্রার সুগভীর তাৎপর্য আছে বলে মনে করা হয়। এই মুদ্রায় ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি তর্জনীর মুখোমুখি চেপে অন্য আঙুলগুলিকে বাইরের দিকে টান করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। আমাদের দেহভঙ্গিমা ও মানসগঠনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে; মন যেমন, দেহ তেমনটি হয়। আপনি যে-ভঙ্গিতে শুয়ে আছেন, তা দেখলে আপনার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়। আপনি বিশেষ একটি ভঙ্গিতে বসুন; দেখবেন সেই অবস্থায় আপনার মানসিকতাও বিশেষ এক রূপে প্রকাশ পাচ্ছে। ধরুন, কেউ বসে বসে একনাগাড়ে পা নাচাচ্ছেন—তার মানে তাঁর মন একটা অস্থির, এলোমেলো, অবস্থায় রয়েছে। এইসব ব্যাপারে আমাদের দেহ আমাদের মনের প্রভাবকেই প্রকাশ করে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞানমুদ্রা হলো কোন গভীর মানসিক অভিব্যক্তির লক্ষণীয় সঙ্কেত। নামেই বোঝাচ্ছে—মুদ্রাটি জ্ঞানের প্রতীক। 'জ্ঞান' বলতে সর্বপ্রকার জ্ঞানকেই বোঝাচ্ছে; সাধারণ বা লৌকিক জ্ঞান থেকে আরম্ভ করে উচ্চতম আধ্যাত্মিক জ্ঞান পর্যন্ত। ভারতবর্ষে আমরা কখনো লৌকিক জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মধ্যে বড়রকমের কোন তফাত আছে বলে মনে করিনি। আমাদের কাছে সব জ্ঞানই পবিত্র। মনে রাখবেন, জ্ঞানের কেবল একজনই দেবী আছেন—সরস্বতী—যিনি সকল জ্ঞান ও কলাকৌশলের অধিষ্ঠাত্রী। ভারতীয় ঐতিহ্যের

এক অতিসমৃদ্ধ ভাব হলো সকল জ্ঞানের ঐক্য। চর্চার সুবিধার জন্য জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বা কেন্দ্র সৃষ্টি করা যেতে পারে, কিন্তু জ্ঞানের এই ঐক্যকে ভেঙে ফেলা চলবে না। ভারতের এটাই হলো শিক্ষা। তাই আমাদের ভাব এই যে, জীবনের সব অভিষ্ট বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো জ্ঞান—বিদ্যাধনং সর্বধনপ্রধানম্— 'সকল ধনের সেরা বিদ্যাধন'। পৃথিবীতে জ্ঞানের তুল্য পবিত্রকারী আর কিছুই নেই, বলছে গীতা : ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে। (৪।৩৮) এটি আবার আমাদের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের (মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়) প্রাতিষ্ঠানিক আদর্শ বা motto-ও বটে।

একজন মানুষ কেবল এই কারণেই মানুষ যে, তার জ্ঞানানুসন্ধানের জৈব ক্ষমতা আছে। জন্তু-জানোয়ার কিন্তু জ্ঞানের সন্ধান করতে পারে না। তাদের ভিতরে থাকে কেবল সহজ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার একটা যন্ত্র এবং তাদের সৃষ্টি ব্যবস্থাই তাদের সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষকে কিন্তু স্থাপন করা হয়েছে জ্ঞান-জগৎ অনুসন্ধানের রাজপথে। জ্ঞানের সে-জগৎ হতে পারে লৌকিক কিংবা আধ্যাত্মিক। অবশ্য ভারতবর্ষে আমাদের কাছে সব জ্ঞানই পবিত্র। লৌকিক চর্চা দিয়ে আমরা আরম্ভ করি এবং সে-চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যাই লোকোত্তর আধ্যাত্মিক সন্ধান ও সাধনায়।

এখন কথা হলো, কিভাবে এই জ্ঞানানুসন্ধানকে বিশিষ্ট একটি ভঙ্গিমায় প্রকাশ করা যাবে? আমাদের প্রাচীন ঋষিরা আবিষ্কার করেছিলেন এই অসাধারণ *মুদ্রাটিকে*, যার মধ্য দিয়ে জ্ঞানানুসন্ধানের স্বরূপটি তার সার্বিক ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত হতে পারে। ব্যাপারটি অনবদ্য। আগে আমি বিষয়টি নিয়ে ভেবেছি, অবাক হয়েছি। পরবর্তী কালে, কয়েক বছর আগে জীববিজ্ঞান, স্নায়ুবিদ্যা ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় পড়তে গিয়ে দারুণ একটা সত্যের সন্ধান পেলাম। সেটি এই যে, জীবজগতে মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণী তার তর্জনীকে (অর্থাৎ বুড়ো আঙুলের পাশের আঙুলটিকে) বুড়ো আঙুলের মুখোমুখি চেপে ধরতে পারে না; এমনকি শিম্পাঞ্জিও নয়। পারে একমাত্র মানবশিশু। হল্যান্ডে থাকাকালে শিম্পাঞ্জির আচারব্যবহার নিয়ে একটা ছবি দেখেছিলাম। তাতে দেখাচ্ছে, একটা শিম্পাঞ্জি হাতের তালু ও আঙুলগুলোর সাহায্যে গাছের একটা ডালকে ধরে মাটিতে ঠুকে ঠুকে শত্রু তাড়াচ্ছে। কিন্তু ডালটাকে ঐভাবে ধরলে সে মুষ্টিতে কোন জোর থাকে না। ডালটির ব্যবহারে যতক্ষণ না বুড়ো আঙুলটিকে যথাযথভাবে ব্যবহারে আনা যায় ততক্ষণ কোন শক্তিসঞ্চার করা

যায় না। মানুষ ছাড়া অন্য সমস্ত প্রাণীতে দেখা যায়, বুড়ো আঙুল জানে না কিভাবে অন্য সব আঙুলের, বিশেষ করে তর্জনীর সঙ্গে সহযোগিতা করে চলতে হয়।

বিবর্তনের ধারায় মানুষই হলো সেই প্রাণী, যে সর্বপ্রথম শিখল কি করে বুড়ো আঙুলকে তর্জনীর বিপরীতে স্থাপন করতে হয়। সেটিই হলো সূত্রপাত— সূত্রপাত মানুষের প্রযুক্তিগত-দক্ষতা; যন্ত্রপাতির ব্যবহার-কুশলতার, পারিপার্শ্বিক দুনিয়াকে স্বকার্যসাধনে ব্যবহার করতে পারার এবং জ্ঞান অর্জন করতে পারার সক্ষমতার। মানুষ তার এই প্রারম্ভিক দৈহিক ক্ষমতা সহায়ে প্রবেশ করল জ্ঞান-এর জগতে। এই কারণেই তর্জনীর বিপরীতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে স্থাপন করাটা হলো মানুষের জ্ঞানানুসন্ধানের এক মস্ত বড় প্রতীক; তা সে জ্ঞান একেবারে সাধারণ থেকে অতি অসাধারণ—যে কোন স্তরেরই হোক না কেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটিকে আমার সম্পূর্ণরূপে যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। এটাও লক্ষ্য করলাম যে, এই দুটি আঙুলকে ঠিকভাবে চালানোর জন্য মস্তিষ্কে যতগুলি কোষের প্রয়োজন হয় তা-ও সর্বোচ্চ সংখ্যক, অর্থাৎ অন্য সব আঙুলের তুলনায় বেশি। বুড়ো আঙুল কেটে ফেলা হলে স্বাভাবিকভাবেই হাতের কর্মদক্ষতা কমে যাবে। মহাভারতে আমরা ধনুর্বিদ্যার আচার্য দ্রোণের কথা পড়ি, যিনি একলব্যকে আদেশ করেছিলেন নিজের বুড়ো আঙুলটি কেটে তাঁকে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করতে, যাতে সে কোনদিন তাঁর প্রিয় শিষ্য অর্জুনের সঙ্গে সফলভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না পারে। একলব্য, যিনি দ্রোণকে নিজের আচার্যের মতো সম্মান করতেন, সে আদেশ পালনও করেছিলেন। শোনা যায়, ভারতের ইংরেজ শাসকেরা ঢাকার তাঁতশিল্পীদের বুড়ো আঙুল কেটে দিয়েছিল, যাতে তারা তাদের নিজস্ব অতি সূক্ষ্ম ঢাকাই মসলিন তৈরি করে ল্যাঙ্কাশায়ারের তাঁতিদের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারে।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের গুরুত্ব এবং তাকে তর্জনীর বিপরীতে স্থাপন করতে পারার সক্ষমতা অর্জন হলো লৌকিক এবং আধ্যাত্মিক এই উভয়বিধ জ্ঞানের উদ্দেশে মানুষের অভিযাত্রার সূচনাকাল। জ্ঞানের ক্ষেত্রে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক পর্যায়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই—সব জ্ঞানই পবিত্র। সরস্বতীপূজার দিন জ্ঞানের সর্বপ্রকার *যন্ত্র* দেবীর সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়। ছোটবেলায় আমি প্রত্যেক বছর বাড়ির সরস্বতীপূজায় অংশগ্রহণ করতাম। দেখতাম, সূত্রধরের যন্ত্রপাতি, চিকিৎসকের ডাক্তারি সাজসরঞ্জাম এবং সর্বপ্রকার পবিত্র গ্রন্থ সরস্বতীর সামনে

স্থাপন করা হতো। সরস্বতীর অপর নাম *বাণী*। সকল জ্ঞানের অন্তর্নিহিত যে ঐক্য, তার প্রতীক তিনি। অসামান্য, অনাড়ম্বর এই দেবী মানবমনে বিপুল প্রেরণার সঞ্চার করেন। যতদিন পর্যন্ত আমরা নিষ্ঠাভরে সরস্বতীর পূজা করেছি, ততদিন আমাদের দেশ জ্ঞানের সাধনায় ব্যাপৃত ছিল। কিন্তু যেদিন আমরা সরস্বতীকে ছেড়ে ধনের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর পিছনে ছুটেছি, সেদিন থেকে লক্ষ্মী-সরস্বতী দুজনেই অন্তর্ধান করেছেন; ঐশ্বর্য ও জ্ঞান দুই-ই চলে গেছে ভারত থেকে। আজ আমাদের এই দুই দেবীকেই ভারতভূমিতে ফিরিয়ে আনতে হবে; প্রথমে সরস্বতীকে ও তারপর লক্ষ্মীকে। লক্ষ্মী হলেন সরস্বতীর আরাধনারই ফল।

জ্ঞান যত বৃদ্ধি পাবে, ততই বেশি সম্পদ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। জ্ঞানের দ্বারা উজ্জীবিত সুদক্ষ কর্ম-সম্পাদন ছাড়া সম্পদলাভের আর কোন পথ নেই। যাদু দিয়ে বা কোনরকম রহস্য করে সম্পদ সৃষ্টি করা যায় না। সেই শিক্ষা আজ আমাদের পেতে হবে। সরস্বতী হলেন প্রথম; লক্ষ্মী সরস্বতী-আরাধনারই বাড়তি ফল। ভারত থেকে দারিদ্র্য দূর করার জন্য এই জ্ঞান আমাদের আনতেই হবে। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান হলো সরস্বতী এবং ফলিত বা প্রায়োগিক বিজ্ঞান হলো লক্ষ্মী। জ্ঞানকে যখন কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তখন তাতে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পায়; শিল্পেরও অগ্রগতি হয়। সর্বত্রই এই দুই অনাড়ম্বর দেবীর অধিষ্ঠান; তবে ভারতবর্ষে আমাদের নতুন করে শিখতে হবে, কিভাবে তাঁদের যথার্থ উপাসনা করা যায়। কেবল আলো ঘুরিয়ে আরতি করলেই তাঁদের পূজা করা হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হয়, নানান বইপত্র পড়তে হয়, নিজের মনে চিন্তাভাবনা করতে হয়—তবে সরস্বতীর ছাত্র হওয়া যায়। আর কঠোর পরিশ্রম, দলবদ্ধ কর্ম, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা—এর মাধ্যমে আমাদের লক্ষ্মীর উপাসনা করতে হবে। বছরে একবার আমরা আরতি করতে পারি, কিন্তু প্রত্যেক দিন কেবল এইরকম কঠোর শ্রমের মধ্য দিয়ে আমাদের লক্ষ্মীপূজা করতে হবে। কেবল তবেই আমরা লক্ষ্মীর *কটাক্ষ* বা কৃপাদৃষ্টি লাভ করতে পারব।

অতএব বর্তমান যুগের আদর্শটি হলো *জ্ঞান* এবং প্রত্যেককে সেই জ্ঞানমার্গের পথিক হতে হবে। প্রকৃতি মানুষকে তার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি আপন তর্জনীর বিপরীতে স্থাপনের ক্ষমতাদান করেছে, যাতে সে তার চারপাশের জগৎকে কাজে লাগিয়ে জ্ঞান ও শক্তি অর্জন করতে পারে। মানবীয় ক্রমবিকাশের এটাই হলো সূচনা। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনায় তাই এই অসাধারণ উক্তিটি রয়েছেঃ *জ্ঞানমুদ্রায়*

কৃষ্ণায়। ভারতে সব মহান সাধুসন্ত, অবতার ও দেবীমাতৃকার মূর্তিতে—বস্তুত, আমাদের সমগ্র পটশিল্পে—জ্ঞানমুদ্রার এই বিশেষ ভঙ্গিটি লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত শিবকে দক্ষিণামূর্তিরূপে প্রকাশের মধ্যে এটি দেখা যায়। এই *জ্ঞানমুদ্রার* দ্বারা তিনি তাঁর চতুষ্পার্শ্বে সমাগত শিষ্যদের মনের সংশয় দূর করতে সমর্থ হন। এই ঐতিহ্য আমাদের মধ্যে চলে এসেছে অতি প্রাচীন কাল থেকে এবং আমাদের উচিত এই ঐতিহ্যের সারসত্যটিকে নিজেদের বর্তমান কালের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। সমগ্র দেশকে তার মনপ্রাণ নিবেদন করতেই হবে জ্ঞান অর্জন ও অন্বেষণের উদ্দেশে।

তপস্যার অর্থ ও তাৎপর্য

পাশ্চাত্যের মানুষ জ্ঞানের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ দেখিয়েছেন এবং তার সহায়ে গড়ে তুলেছেন এই আধুনিক সভ্যতা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গবেষণা; ক্লাবে যাওয়ার সময় নেই, এমনকি রোজকার খাওয়াদাওয়ার সময়টুকু পর্যন্ত নেই—এইভাবে মানুষ কাজ করেছে দু-শতক ধরে। আর তাতেই এসেছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, প্রযুক্তি ও সম্পদ-ভাণ্ডার। বহুযুগ আগে ভারতেও একই প্রবণতা ছিল। ছিল জ্ঞানের প্রতি অপ্রতিহত প্রেম। দক্ষিণ ভারতের কেউ হয়তো শুনলেন সুদূর বারাণসীতে একজন আচার্য আছেন; 'আমাকে সেই আচার্যের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করতেই হবে'—এই চিন্তা নিয়ে তিনি হাঁটতে আরম্ভ করলেন বারাণসীর উদ্দেশে। পশ্চিম পাঞ্জাবের তক্ষশীলায় (বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত) চরক, সুশ্রুতের মতো খ্যাতনামা আচার্যের কাছে চিকিৎসাশাস্ত্র ও শল্যবিদ্যা শিখতে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ছাত্ররা হেঁটে হেঁটে আসতেন। যেখানেই জ্ঞানের প্রতি সত্যিকার অনুরাগ থাকে, সেখানেই দেখা যায়, ছোটখাট অসুবিধা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। জ্ঞান-অনুসন্ধান হলো *তপস্যা*—কৃচ্ছ্রসাধন। তপস্যা ছাড়া কোন জ্ঞানলাভ হতে পারে না। তপস্যা ও জ্ঞান-এর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। পরে দেখা যাবে, শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলছেন ঃ *বহবো জ্ঞানতপসা পূতাঃ...* (৪/১০)—অনেকে জ্ঞান-তপস্যায় পরিশুদ্ধ হয়ে (ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়েছেন)। যদি আমাদের গোটা জাতি এই *জ্ঞান-তপস্যার* ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে, তবে আমাদের জাতীয় জীবনে নানা ক্ষেত্রে আসবে অসাধারণ অগ্রগতি। *তপস্যা* ছাড়া, আরামকেদারায় বসে বসে কোন জ্ঞানার্জন হয় না। উদ্যমী হয়ে, সংগ্রাম করে তার মূল্য দিতে হয়—আর তারই নাম তপস্যা। আমাদের সংস্কৃতিতে এই এক মহান শব্দ—*তপস্যা*। উপনিষদ্ ও গীতাতে

শব্দটিকে প্রায়ই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে: *তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব* (৩/২)—'ব্রহ্মকে তপস্যার মাধ্যমে অবগত হও'। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি থেকে একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে *তপস্যা* শব্দটির সংজ্ঞা দিয়েছেন: *মনসশ্চ ইন্দ্রিয়াণাং চ ঐকাগ্র্যং তপ উচ্যতে*, 'মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহের শক্তি একত্র সংহত করাকে *তপস্* বলা হয়'। জগতে জ্ঞানের যে কোন অনুসন্ধানের প্রতিই এই সংজ্ঞা প্রযুক্ত হতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা এটিই করেন—তাঁরা তাঁদের মনকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সহায়ে শিক্ষিত করে তুলে সেই মনের সাহায্যে প্রকৃতির আবরণ ভেদ করে তার অন্তস্থলে পৌঁছান এবং সত্যের আবরণ উন্মোচন করে দেন—যে সত্যকে যুগ যুগ ধরে প্রকৃতি সযত্নে রক্ষা করে এসেছে। একইভাবে, আত্মা লুক্কায়িত আছেন এই *মায়ার* জগতে। আমাদের বৈদিক ঋষিগণ এই *মায়াকে* ভেদ করে আবিষ্কার করেছিলেন নিয়ত পরিবর্তনশীল মায়ার জগতের অন্তরালে স্থিত সেই অনন্ত শাশ্বত সত্যকে; সেই আত্মাকে।

স্কুল-কলেজে প্রবেশের আগে সব ছাত্রছাত্রীর উচিত *তপস্* বা তপস্যার এই সংজ্ঞাটিকে তাদের সামনে রাখা। স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে যথেষ্ট পরিশ্রম না করলে জ্ঞান অর্জন করা যায় না। তপস্যাকে সরিয়ে নিলে জ্ঞানানুসন্ধান লঘু বা সস্তা হয়ে দাঁড়ায়; আর আমাদের শিক্ষায় বর্তমানে সেটাই হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কোন জ্ঞানার্জন-কেন্দ্রে গেলে সেখানে তপস্যার কোন মনোভাব বা পরিবেশ দেখতে পাওয়া যায় না; দেখা যাবে, সবকিছুই দিব্যি বিনা ক্লেশে চলে যাচ্ছে, কেবল ব্যতিক্রমী কয়েকজনই এখনো তপস্যার অগ্নিকে নিরন্তর প্রজ্বলিত করে রেখেছে। আমাদের সংস্কৃতিতে তপস্যা ও স্বাধ্যায় পরস্পর সদা যুক্ত থাকে। *স্বাধ্যায়* মানে অধ্যয়ন। বাল্মীকি-রামায়ণ শুরু হচ্ছে এই কথাগুলি দিয়ে: *তপঃ স্বাধ্যায়নিরতং নারদম্*—'নারদ, যিনি কিনা নিয়ত তপস্যা ও স্বাধ্যায়ে নিযুক্ত ছিলেন'। অতএব এটিই হলো জ্ঞানমুদ্রার ধারণা, যার পিছনে আছে *তপস্যা* ও *স্বাধ্যায়*। তাই গীতাধ্যানে বলা হয়েছে—*জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায়*—'(আমরা প্রণাম করি) কৃষ্ণকে যিনি এই জ্ঞানমুদ্রা ধারণ করে রয়েছেন'। শ্লোকটিতে আরো বলা হচ্ছে: *গীতামৃতদুহে* (৩)—'যিনি (উপনিষদ্‌রূপী গাভী থেকে) গীতারূপ অমৃতদুগ্ধ দোহন করেছেন'। দ্বিতীয়াংশের বর্ণনাটি পূর্ণরূপে আসবে পরবর্তী শ্লোকে। সংস্কৃতে *দুহ্* শব্দের অর্থ—যিনি গাভীকে দোহন করেন; *দুগ্ধম্* অর্থ 'দুধ'; *দুহিতা* মানে 'কন্যা'—যিনি প্রাচীন আর্যগৃহের গোরুগুলিকে দোহন করতেন। ঐ সংস্কৃত শব্দটি থেকেই

এসেছে রাশিয়ান বা স্লাভ শব্দ 'doch', জার্মান শব্দ 'tochter' এবং ইংলিশ শব্দ 'daughter'—যাদের সবগুলির অর্থ 'কন্যা'।

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥ ৪॥

—'উপনিষদ্‌গুলি হলো গাভী, দোগ্ধা হলেন গোপালক-পুত্র (শ্রীকৃষ্ণ); পার্থ বা অর্জুন বৎস; শুদ্ধবুদ্ধি নারীপুরুষ পানকর্তা এবং অমৃতময়ী গীতা হলো দুগ্ধ।'

এই বিখ্যাত শ্লোকটি সমগ্র ভারতে জনপ্রিয়। গীতা বর্ণিত হয়েছে উপনিষদের সাররূপে। পরবর্তী শ্লোকে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একটি শ্রদ্ধা-উক্তি ঃ

বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্॥ ৫॥

—'কংস ও চাণূর (অসুর প্রবৃত্তির দুই পাষণ্ড)-বিনাশক, (জননী) দেবকীর পরমানন্দদায়ক, বসুদেবপুত্র জগদ্‌গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি।'

শ্রীকৃষ্ণ জগতে কোন বিশেষ সম্প্রদায়কে বা কোন দেশকে বা কোন জাতিকে শিক্ষাপ্রদান করতে আসেননি, তিনি এসেছিলেন সমগ্র মানব জাতির জন্য। সেটিই বলা হয়েছে এই শ্লোকে ঃ *কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্*। পরবর্তী শ্লোকটি বেশ বড়; রূপক অলঙ্কারে পূর্ণ ঃ

ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোৎপলা
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।
অশ্বত্থামবিকর্ণঘোরমকরা দুর্যোধনাবর্তিনী
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্তকে কেশবে॥ ৬॥

—'যুদ্ধরূপ যে নদীর ভীষ্ম ও দ্রোণরূপ দুই তীর, জয়দ্রথরূপ জল, গান্ধাররাজরূপ নীলপদ্ম, শল্যরূপ হাঙর, কৃপরূপ খরস্রোত, কর্ণরূপ তীরপ্লাবী তরঙ্গ, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণরূপ ভয়ঙ্কর দুই কুমীর এবং দুর্যোধনরূপ ঘূর্ণাবর্ত; কেশব (শ্রীকৃষ্ণ) কর্ণধার থাকায় পাণ্ডবরা সেই রণনদী নিশ্চিতরূপে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।'

পরবর্তী শ্লোকটি হলো ঃ

পারাশর্যবচঃসরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং
নানাখ্যানককেশরং হরিকথাসম্বোধনাবোধিতম্।
লোকে সজ্জনষট্‌পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা
ভূয়াদ্ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে॥ ৭॥

—'যে পদ্ম পরাশরপুত্রের (অর্থাৎ ব্যাসদেবের) বাক্যরূপ সরোবরজাত, হরি (অর্থাৎ পরম দেবসত্তা) বিষয়ক কথাপ্রসঙ্গ দ্বারা পূর্ণ প্রস্ফুটিত, নানা আখ্যানরূপ কেশরযুক্ত; যার মধু এই জগতের সজ্জনরূপ ভ্রমরগণ নিত্য পান করেন; গীতারূপ তীব্রসুগন্ধযুক্ত অমল মহাভারতরূপ সেই পদ্ম কলিযুগের কলুষ নাশে ব্যগ্র ব্যক্তিদের সর্বোত্তম কল্যাণ করুক।'

পরবর্তী শ্লোকটি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা বিষয়ক। এটিও একটি বিখ্যাত শ্লোক ঃ

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥ ৮॥

—'যাঁর কৃপা মূককে বাগ্মী করে এবং পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘন করায়, সেই পরমানন্দস্বরূপ মাধবকে (শ্রীকৃষ্ণকে) বন্দনা করি।'

দৈবকৃপার শক্তির কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে ভারতবর্ষের বহু মুনিঋষি বারেবারে এই শ্লোকটি ব্যবহার করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, দৈব কৃপা হলো সেই বাতাসের মতো যা সবসময়ই বইছে; তোমার নৌকা সামনে এগোচ্ছে না, তার কারণ তুমি পাল তুলে দাওনি। পাল তুলে দাও; তাহলে বাতাস লাগবে এবং তুমি সামনে এগোবে। কৃপা অনুভব করতে হলে আমাদের শুধু ঐটুকু কাজ করতে হবে।

তারপরে আছে শেষ শ্লোকটি, যা আমাদের দেশের লোক প্রায়ই পাঠ করে থাকেন ঃ

যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ॥
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥ ৯॥

—'ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুৎগণ দিব্য স্তব দ্বারা যাঁর বন্দনা করেন,

সামগায়কগণ অঙ্গ, পদক্রম ও উপনিষদ্-সহ বেদ পাঠ করে যাঁর মহিমা কীর্তন করেন, যোগীরা ধ্যানে তদ্গতচিত্ত হয়ে ধ্যানে যাঁকে দর্শন করেন এবং দেবাসুরগণও যাঁর চরম তত্ত্ব অবগত নন, সেই পরম দেবতাকে প্রণাম করি।'

আদি শঙ্করাচার্যের গীতাভাষ্যের ভূমিকা

আগেই বলা হয়েছে, শঙ্করাচার্যই প্রথম গীতার গুরুত্ব আবিষ্কার করেন এবং তার ওপর একটি ভাষ্য রচনা করে সাধারণ্যে গ্রন্থটি প্রচার করেন। ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর আবির্ভাব এবং ৮২০ খ্রিস্টাব্দে ঘটে তাঁর মহাপ্রয়াণ। তিনি ছিলেন অসামান্য এক সৃজন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, যিনি তাঁর আপন সত্তায় ভারতীয় সংস্কৃতি, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার বৈশিষ্ট্যকে সামগ্রিকভাবে মূর্ত করে তুলেছিলেন। ভারতবর্ষের দক্ষিণ থেকে উত্তর এবং পশ্চিম থেকে পূর্বপ্রান্ত তিনি পায়ে হেঁটে পরিভ্রমণ করেছিলেন। রচনা করেছিলেন বেদান্তের ওপর অনেকগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও জনপ্রিয় গ্রন্থ। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের ওপর শঙ্করাচার্য তাঁর স্বীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। আর এসবই তিনি করেছেন তাঁর বত্রিশ বছরের স্বল্প জীবনকালে।

গীতাভাষ্যের ওপর শঙ্করাচার্যের যে দু-পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা আছে, তার প্রধান অংশ আমরা আলোচনা করব। এখানে রয়েছে মানব-প্রগতি সম্বন্ধে এক সার্বিক ভাবনার বিস্তার। আমি চাই, গীতাপ্রেমিক প্রত্যেকেই এই দু-পৃষ্ঠা ভূমিকা অধ্যয়ন করুন; এর সর্বজনীন ভাবটি উপলব্ধি করুন; তার দ্বারা আন্তরিকভাবে প্রভাবিত হোন। গীতা মানুষের জীবনকে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক—এ দুভাগে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে না, বরং মানবজীবন ও তার ভবিতব্য সম্পর্কে এক সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। তাই আমরা উক্ত ভূমিকার অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি আলোচনা করব।

শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যের ভূমিকায় প্রথমে একটি *পৌরাণিক* শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন, যার আংশিক প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় আধুনিক পাশ্চাত্য সৃষ্টিতত্ত্বে (cosmology)। শ্লোকটিতে দৈবসত্তার স্বরূপ প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে ঃ

ওঁ নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবম্।
অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী ॥

—'নারায়ণ (পরম দৈবসত্তা) হলেন *অব্যক্তের* (অর্থাৎ অবিভাজিত বা মূলা

প্রকৃতির) পারে, ব্রহ্মাণ্ড এসেছে *অব্যক্ত* থেকে; ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত রয়েছে সপ্তদ্বীপ-মহাদেশযুক্ত পৃথিবী-সহ এই লোকসমূহ।'

ভারতীয় সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য সৃষ্টিতত্ত্বের যে কেবল কতকগুলো দিক দিয়ে দারুণ মিল আছে, তা-ই নয়; এটি পাশ্চাত্য তত্ত্বের তুলনায় সমৃদ্ধও বটে। আলোচ্য শ্লোকে এই ভারতীয় সৃষ্টিতত্ত্বের প্রকাশ দেখা যায়। এ বিষয়ে উভয় দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য হলো, ভারতবর্ষের বিচারে পবিত্র জগৎ-কারণ আধ্যাত্মিক; আর আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ঐ-উৎসটি হলো জড়বস্তু। অবশ্য ইংলন্ডের ফ্রেড হয়েলের মতো কিছু পাশ্চাত্য সৃষ্টিতত্ত্ববিদ্ চেষ্টা করছেন ঐ উৎসে আধ্যাত্মিক রূপ আরোপ করতে। চল্লিশ বছরেরও আগে ফ্রেড হয়েল সৃষ্টিতত্ত্বের ওপর একটি বই লিখেছিলেন, যেটি ছিল সম্পূর্ণরূপে বস্তুবাদী। এখন তিনি নতুন একটি বই লিখেছেন, যার শিরোনামটিতেই রয়েছে এক আধ্যাত্মিক মাত্রা The Intelligent Universe (চৈতন্যময় মহাবিশ্ব)। মহাবিশ্ব চৈতন্যময়; এবং বেদান্তও এ-বিশ্বকে এমনটিই বলে থাকে ঃ অনন্ত, অদ্বৈত চৈতন্যসত্তা।

এই প্রথম শ্লোকটিতে আমরা পাচ্ছি 'নারায়ণ'-এর উল্লেখ, যার সঙ্গে তুলনীয় কোন ধারণা বা ভাব পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানে নেই। কিন্তু পরবর্তী পর্বে *অব্যক্ত* বা অবিভাজিত অবস্থার কথা আসছে; যা আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের 'state of singularity'-র ('এককত্বের অবস্থা'র) সঙ্গে তুলনীয়। পরম দৈবসত্তা নারায়ণকে আবাহন করা হয়েছে এই বলে যে, তিনি অবিভাজিত প্রকৃতির পশ্চাতে অবস্থিত। বেদান্ত মতে, প্রকৃতির দুটি মাত্রা—বিভাজিত ও অবিভাজিত। 'বিভাজিত' হলো তা-ই, যাকে এই ব্যক্ত বিশ্বরূপে প্রকাশিত দেখতে পাওয়া যায়। তার পিছনে আছে *অব্যক্ত*, অর্থাৎ অবিভাজিত প্রকৃতি; যা হলো পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞান-কথিত 'মহা-নাদ' ('Big Bang')-এর ঠিক আগের অবস্থা। *অব্যক্ত* থেকে আসে *ব্যক্ত* বা প্রকাশিত রূপ—যাকে বর্তমান শ্লোকে বলা হয়েছে *ব্রহ্মাণ্ড* এবং যার মধ্যে রয়েছে সপ্তমহাদেশযুক্ত এই পৃথিবী সহ লক্ষ কোটি জগৎ। বেদান্তে ঈশ্বর বা পরম সত্যকে *অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড নায়ক* বলা হয়েছে। ভারতবর্ষের চিন্তায় ছিল অসীম দেশকালের ধারণা, যার সঙ্গে সেমিটিক চিন্তার অতি সীমাবদ্ধ দেশকাল-ভাবনার সাদৃশ্য নেই, কিন্তু সাদৃশ্য আছে আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞান ভাবনার। বেদান্ত বলে, গোটা *ব্রহ্মাণ্ড* এসেছে ব্রহ্ম থেকে, ব্রহ্মেই তা অবস্থান করছে এবং একটি সৃষ্টিচক্রের অন্তে আবার তা ব্রহ্মেই লীন হয়ে যায়। বেদান্ত আরো বলে, ব্রহ্ম

থেকে জগৎ সৃষ্ট হয়েছে এক সবিশেষ সুশৃঙ্খল পরম্পরাক্রমে; এসেছে অবিভাজিত অবস্থা থেকে বিভাজিত অবস্থায়, এবং এই বিভাজন সংঘটিত হয় একটি নির্দিষ্ট বিবর্তন-ক্রম অনুসারে, যথা—মহাজাগতিক বিবর্তন, জৈব বিবর্তন, মানবীয় (নৈতিক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক) বিবর্তন। বৈদান্তিক সৃষ্টিতত্ত্বে এই ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে। *বিষ্ণুসহস্রনামে (মহাভারত, অনুশাসনপর্ব)* গীত হয়েছে ঃ

যতঃ সর্বাণি ভূতানি ভবন্তি আদি যুগাগমে।
যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে ॥ ১১॥

—'যাঁর হতে একটি যুগ বা সৃষ্টিচক্রের প্রারম্ভে সত্তাবান জীব বা বস্তুসকল উৎপন্ন হয় এবং যুগান্তে যাঁর মধ্যে সবকিছু লয়প্রাপ্ত হয়'—তিনিই নারায়ণ।

দৈবী নারায়ণ হলেন সগুণ-নির্গুণ ব্রহ্মের ব্যক্তিসত্তা। এই ব্রহ্ম অনন্ত বিশুদ্ধ চৈতন্য, এক এবং অদ্বিতীয় স্বরূপসম্পন্ন।

মানবজীবনের দুটি মার্গ ঃ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

এরপর শঙ্কর বিবর্তনের ক্রমে মানবীয় স্তরে প্রদান করছেন এমন এক সর্বাঙ্গীণ জীবনদর্শন, যার সহায়ে মানবসমাজ সুন্দরভাবে সমতা রক্ষা করে তার আপন পথে এগিয়ে চলতে পারে ঃ

স ভগবান্ সৃষ্ট্বেদং জগৎ তস্য চ স্থিতিং চিকীর্ষুঃ মরীচ্যাদীন্ অগ্রে সৃষ্ট্বা প্রজাপতীন্ প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্মং গ্রাহয়ামাস বেদোক্তম্॥

—'সেই ভগবান এই জগৎকে (নিজের ভিতর থেকে) সৃষ্টি করে তাকে সুস্থিতিতে রক্ষা করার মানসে প্রথমে মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করে তাদের বেদোক্ত প্রবৃত্তি (বা কর্ম) লক্ষণ ধর্ম গ্রহণ করিয়েছিলেন।'

ততোঽন্যাংশ্চ সনকসনন্দনাদীনুৎপাদ্য নিবৃত্তিলক্ষণং ধর্মং জ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণং গ্রাহয়ামাস॥

—'তারপর সনক, সনন্দন (এবং সনাতন ও সনৎকুমার)-কে সৃষ্টি করে তাদের জ্ঞান-বৈরাগ্যরূপ নিবৃত্তি (বা অন্তর্মুখী ধ্যান) লক্ষণ ধর্ম গ্রহণ করিয়েছিলেন।'

সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমারকে চার *কুমার*—বিশ্বাত্মার শাশ্বত সন্তান—বলা হয়; ভারতীয় সাহিত্যে তাঁদের পরম দৈবসত্তার সাংসারিক মালিন্যমুক্ত সন্তানরূপে সম্মান প্রদান করা হয়।

দ্বিবিধো হি বেদোক্তো ধর্মঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ॥ জগতঃ স্থিতিকারণং প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সহেতুঃ।

—'অর্থাৎ বেদোক্ত ধর্মের বা দর্শনের দুটি লক্ষণ—প্রবৃত্তি (বা বহিরঙ্গের কাজকর্ম) এবং নিবৃত্তি (বা অন্তর্মুখী ধ্যান)। এরা জগতের সুষম সাম্য রক্ষা করে। সকল জীবনের জন্য দুটি বস্তু নিশ্চিত করে—প্রকৃত অভ্যুদয় বা সামাজিক-অর্থনৈতিক কল্যাণ এবং নিঃশ্রেয়স বা আধ্যাত্মিক মুক্তি।'

মানুষের কল্যাণের জন্য কর্ম ও ধ্যান—দুইয়েরই প্রয়োজন। যদি এদের দুটির যে কোন একটিমাত্র থাকে, তবে ব্যক্তি মঙ্গল বা সমাজের মঙ্গল—কোনটিই হতে পারে না। দেখুন প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের কী অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি ও সার্বিক প্রজ্ঞা ছিল! *প্রবৃত্তির* মাধ্যমে আর্থিক অবস্থা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করে গড়ে তোলা যায় একটি জনকল্যাণমুখী সমাজ। কিন্তু যাকে আজ আমরা মূল্যবোধমুখী জীবন বলি, তা অর্জন করা যায় *নিবৃত্তির* মাধ্যমে। এ রকম জীবন তৈরি হয় মানবের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতা থেকে। *প্রবৃত্তির* মধ্য দিয়ে প্রচুর অর্থ, ক্ষমতা এবং অন্যান্য নানা কিছু আসতে পারে; কিন্তু কেবলমাত্র ঐ *প্রবৃত্তিটি* থাকলে আর *নিবৃত্তি* কিছুমাত্র না থাকলে সমাজ অল্প কয়দিনের জন্য ঠিকঠাক চললেও শেষপর্যন্ত সমস্যায় পড়ে যাবে। সমগ্র আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ সমস্যাদীর্ণ, কারণ সেখানে *নিবৃত্তির* ওপর কোন গুরুত্ব না দিয়ে কেবল জোর দেওয়া হয়েছে *প্রবৃত্তির* ওপর—কাজ, কাজ আরো কাজ কর; আরো আরো অর্থ উপার্জন কর; কিন্তু ভিতরে ভিতরে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর থেকে যাও—যতক্ষণ না মানসিকভাবে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছ! আধুনিক পৃথিবীতে বহু মানুষ এইভাবে ভুগছেন। আমি প্রায়ই জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের 'The World as Will and Idea' গ্রন্থটি থেকে উদ্ধৃতি দিই; তিনি একথাগুলি বলেছেন প্রায় ১৪০ বছর আগে এবং তখন তিনি যা বলেছেন তা আজ সম্পূর্ণরূপে সত্য। তিনি বলেছেন ঃ "নিরাপত্তা ও জনকল্যাণ অর্জন করলে মানুষ প্রকৃতপক্ষে অন্য সব সমস্যারই সমাধান করে ফেলে এবং তখন নিজেরাই নিজেদের কাছে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।"

এই আধুনিক যুগের নারীপুরুষের কাছে কথাগুলি কতই না অক্ষরে অক্ষরে সত্য! এমনকি আমাদের নিজেদের দেশেও রয়েছে অর্থ, ক্ষমতা ও ভোগসুখ লাভের অশেষ চেষ্টা; ফলে এসেছে মূল্যবোধের ব্যাপক অবক্ষয় এবং ক্রমবর্ধমান হিংসা। সুস্থ মানবসমাজকে রক্ষা করার উপায় এটা নয়। আসলে,

দ্বিতীয় লক্ষণটির—নিবৃত্তির অভাব ঘটছে। তাই শঙ্কর বলছেন: *প্রাণিনাং সাক্ষাৎ অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সহেতুঃ* —'এমন এক জীবনদর্শন, যা (কর্ম ও ধ্যানের মাধ্যমে), সামাজিক কল্যাণ ও আধ্যাত্মিক মুক্তিকে সমন্বিত করে'। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। *অভি*-র পরে *উদয়* মানে হলো কল্যাণ; অভির অর্থ হলো সম্মিলিতভাবে এককভাবে নয়; উদয় এই বিশেষ শব্দটির পূর্বে ব্যবহৃত *অভি* একটি গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ যার তাৎপর্য হলো—সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া কোন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটতে পারে না; সুস্থ-সবল সমাজ গড়তে হলে সমন্বিত কার্যপ্রণালী ও সঙ্ঘবদ্ধতা বা সমবায়ী মনোবৃত্তির প্রয়োজন আছে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে লড়াই করলে কোন সমৃদ্ধি আসবে না। সামাজিক শান্তির একান্ত প্রয়োজন; প্রয়োজন সমন্বয়ের, প্রয়োজন সঙ্ঘবদ্ধ কার্যধারার এবং এসবেরই ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে *অভি*-শব্দটির মাধ্যমে। এটি এমন একটি মূল্যবোধ, যাকে ভারতীয় সমাজে সাম্প্রতিক কয়েক শতকে আমরা যথেষ্টরূপে আত্মস্থ করে উঠতে পারিনি। আমাদের আজ সেই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে—গড়ে তুলতে হবে সঙ্ঘবদ্ধ মানসিকতা। আমাদের দেশের মানুষ একসঙ্গে কাজ করতে জানলে আমাদের গ্রামগুলি আগামী কালই স্বর্গে পরিণত হয়ে যেত। আমরা এটা এখনো শিখিনি, আর তাই আমাদের 'কো-অপারেটিভ সোসাইটি' বা সমবায় সমিতিগুলি প্রায়ই বন্ধ হয়ে যায়। সমবায়ী কোন মানসিকতাই না থাকলে কী করে সমবায় আন্দোলনকে সফল করে তোলা যাবে?

এই দুই মার্গের ফল : অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স

অতএব, *উদয়*-এর সঙ্গে যুক্ত *অভি* শব্দটি অতি গুরুত্বপূর্ণ; এতে সমষ্টিবদ্ধতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। আমাদের শিখতে হবে, গ্রামে আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত। তাদের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করে সবাই মিলে গ্রামগুলিকে উন্নত করে তোলা যায়। পয়ঃপ্রণালীর উন্নয়ন, ভাল ভাল রাস্তাঘাট, উৎকৃষ্টতর আবাসন, সকলের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য ও উপযুক্ত শিক্ষা—এসবই আমরা অর্জন করতে পারি কেবল সকলে একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করলে। এভাবেই আমাদের পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলিকে সুস্থ-সবল করে তোলা যায়। এইভাবেই গড়ে তোলা যায় নতুন এক সুস্থ-সবল, প্রাণবন্ত ভারতবর্ষ। তাই এই *অভ্যুদয়*-এর দর্শন একান্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পাশ্চাত্য এটিকে অনেকটাই আয়ত্ত করে ফেলেছে। আমরা তাদের কাছ থেকে

শিখতে পারি, কিভাবে এই দর্শনকে আমাদের দেশে প্রয়োগ করা যায়। আমাদের জীবন ও কর্মে তিনটি মূল্যবোধ নিয়ে আসতে হবে ঃ প্রচুর কাজ, দক্ষ কাজ এবং সম্মিলিত কাজ। শঙ্করাচার্য বলছেন, *প্রবৃত্তি* ও *নিবৃত্তি* নামক যৌথ আদর্শ-সমন্বিত এই বৈদিক দর্শন একদিকে নারী-পুরুষের *অভ্যুদয়* এবং অপরদিকে তাদের *নিঃশ্রেয়স* ঘটায়। সম্পূর্ণরূপে জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র বলতে আজ আমরা এইরকমই বুঝি। এটা মোটেও আকাশকুসুম কল্পনা নয়। বহু সমাজ আজ *অভ্যুদয়* অর্জন করেছে এবং ভারতে আমরাও তা অর্জন করতে পারি, যদি আমরা যাকে চারিত্রিক দক্ষতা বলি, সেটি গড়ে তুলতে পারি। যিশুখ্রিস্ট যেমন বলেছেন ঃ "যে আমাকে তোমরা দেখছ—তাকেই যদি ভাল না বাসতে পার, তবে যে ঈশ্বরকে তোমরা দেখনি—তাকে কী করে ভালবাসবে?" এই একটি মহান শিক্ষা আমাদের দেশের মানুষকে লাভ করতেই হবে। বহুদূরে অবস্থিত কোন ঈশ্বরের সঙ্গে বা মন্দিরে অবস্থিত ঈশ্বরের কোন মূর্তির সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাতে আমাদের যে দারুণ আগ্রহ দেখা গেছে, তার তুলনায় নিকট প্রতিবেশী কোন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে আমাদের আগ্রহ কিছুই নয়; কাছের সেই মানুষটির সঙ্গে প্রায়ই আমরা ঝগড়াঝাঁটি বাঁধিয়ে বসি। এটা বদলাতে হবে এবং এই পরিবর্তনই আনে *অভ্যুদয়*। তারপর আসে *নিঃশ্রেয়স*। তুমি অর্জন করতে পার জীবনের সবরকম স্বাচ্ছন্দ্য—বাসস্থান, শিক্ষা, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, আর্থিক ক্ষমতা এবং নানারকম সুখভোগ। তবু মনে শান্তি থাকবে না; জীবন হবে উদ্বেগ-অশান্তিতে ভরা। কেন? কারণ, তুমি একটি জিনিস পাওনি—তোমার প্রকৃত সত্তাকে তুমি জানতে পারোনি, চেনোনি তোমার অন্তরস্থিত দৈব স্ফুলিঙ্গটিকে। তোমার ভরকেন্দ্রটি সবসময়ই তোমার বাইরে রয়ে গেছে। তুমি তোমার সত্যকার আত্মমর্যাদা উপলব্ধি করতে না পেরে, থেকে গেছ জড়বস্তুর দাস হয়ে। এর থেকেই আসে অন্তরের উদ্বেগ; বাড়ে সামাজিক অপরাধ ও ভ্রষ্টাচার এবং ধীরে ধীরে ঘটতে শুরু করে সামাজিক অবক্ষয়।

এটাকে এড়ানো যায় তখন, যখন আমরা জীবনে নিয়ে আসি দ্বিতীয় সেই মূল্যবোধ—*নিবৃত্তি*—ধ্যান, যার মাধ্যমে মানুষ তার অন্তরস্থ সদাজাগ্রত দৈবসত্তার সংস্পর্শে আসে। এটা কোন চাপিয়ে দেওয়া উক্তি বা বিশ্বাসমাত্র নয়; এ হলো অধ্যাত্মবিজ্ঞানের পথে ঔপনিষদিক ঋষিদের অনুভূত সত্য; যে-সত্যকে আমাদের প্রত্যেকের কেবল বিশ্বাস করলেই চলবে না, অন্তরে উপলব্ধিও করতে হবে। আর যতই অন্তর্মুখী হওয়া যাবে, ততই তোমার মধ্যে অন্যের মনোরাজ্যে প্রবেশ করে তাদের সঙ্গে সুখ-সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষমতা

জাগবে। নিজের অন্তঃপ্রকৃতির গভীরে প্রবেশ করলে তুমি তোমার জেনেটিক বা প্রজনন ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ক্ষুদ্র অহং-এর পারে চলে গিয়ে পৌঁছে যাবে বৃহত্তর সেই আত্মসত্তার সংস্পর্শে, যিনি সকল জীবেরই আন্তর সত্তা।

এইভাবে দেখা যায় প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির, অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স-এর, এই মিলনই হলো গীতার মহৎ শিক্ষা। এতে আছে এমন এক দর্শন, যার মাধ্যমে আসে সর্বাঙ্গীণ মানবীয় প্রগতি। এই মহান গ্রন্থের এটিই বিশেষত্ব। তাই শঙ্করাচার্য বলেছেন : *প্রাণিনাং সাক্ষাৎ অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সহেতুঃ।* তিনি বলেননি যে, এটি কেবল হিন্দুদের জন্য বা ভারতের মানুষের জন্য। বলেছেন—*প্রাণিনাম্*—অর্থাৎ 'সকল মানুষের জন্য'। এটিই এর সর্বজনীনতা। *অভ্যুদয়*-এর সঙ্গে *নিঃশ্রেয়সকে* যুক্ত করে গীতা মানুষকে যন্ত্রমাত্রে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করেছে। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতায় ঐ প্রবণতা রয়েছে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর 'Impact of Science on Society' গ্রন্থে বলেছেন, নারী-পুরুষকে যন্ত্রে পরিণত করার এই ব্যাপারটা যদি খুব বেশি দূর গড়ায়, তাহলে এমন একটা সময় আসবে যখন একজন শ্রমিক একটা ফুল হাতে কারখানায় ঢুকে অতিকায় একটা যন্ত্রের সামনে ফুলটা রেখে প্রার্থনা করবে : "হে যন্ত্র, আমাকে তোমার কলকব্জার মধ্যে ভাল একটা নাট-বলটু করে নাও!" এরই নাম মানুষের যন্ত্রায়ণ। দ্বিতীয় যে-মূল্যবোধটির ওপর শঙ্করাচার্য জোর দিয়েছেন, অর্থাৎ *নিঃশ্রেয়স*—তার প্রতি যদি যথাযথ মনোযোগ দেওয়া হয়, তবে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধগুলির বিকাশ হবে এবং তখন এইরকম একটি সমস্যা কোনদিনই দেখা দেবে না। *অভ্যুদয়* ও *নিঃশ্রেয়স*—এ-দুটির মিলনই বিশ্বের সাম্য ও সুস্থিতি বজায় রাখার উপায় করে দেয়। একটির ওপর জোর দিয়ে অন্যটিকে অবহেলা করলেই সমগ্র ব্যবস্থাটা কোন একদিকে কাত হয়ে পড়বে—নৌকার মতো। সাম্প্রতিক কয়েক শতক ধরে ভারতবর্ষ নিঃশ্রেয়স-এর দিকে হেলে পড়েছিল; তাও যথাযথভাবে নয় এবং *অভ্যুদয়*-এর দিকটা অবহেলা করেছিল। ফলে এসেছিল বদ্ধ বা নিশ্চেষ্ট অবস্থা, যা থেকে দেশকে আধুনিক কালে উদ্ধার করছেন স্বামী বিবেকানন্দের মতো আচার্যগণ। অপরপক্ষে আধুনিক পাশ্চাত্য ঝুঁকেছিল *অভ্যুদয়*-এর দিকে, যা থেকে উদ্ধার লাভের জন্য এখন সে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। পাশ্চাত্যের *নিবৃত্তির* অভিজ্ঞতা হয়ে ছিল ধ্যান সম্পর্কে খ্রিস্টীয় ধারণার মাধ্যমে এবং তার থেকেই উদ্ভূত হয়েছিলেন মহান ভাববাদী সাধক ও সাধুসন্তগণ; কিন্তু আধুনিক যুগে সেসবই অপ্রচলিত হয়ে গেছে; আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে *প্রবৃত্তি*-র ভিত্তিতেই গঠিত। কিন্তু আজকের পাশ্চাত্যে জীবন সম্বন্ধে

এই একপেশে মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, এই প্রতিক্রিয়া আসছে কিছু চিন্তাবিদ, মনোবিজ্ঞানী এবং পারমাণবিক বিজ্ঞানীর কাছ থেকে, যখন তাঁরা দেখছেন—এই একপেশে মনোভাব জন্ম দিচ্ছে একপেশে মানুষদের এবং একটি একপেশে সভ্যতার। আরো কিছু একটা দরকার; এই অনুভূতিটা দেখা দিতে আরম্ভ করেছে আমেরিকায় বিগত ২০০ বছর ধরে নানা সাংস্কৃতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর। কিছু কিছু চিন্তাবিদ এখন এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, *নিবৃত্তির* ওপরেও জোর দেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। এই ভাব আমেরিকার চিন্তায় কিভাবে, কি ভাষায়, আত্মপ্রকাশ করছে?

অববোধের (cognition) যে বিভিন্ন স্তর আছে, তাদের মধ্যে চেতন, প্রাক্-চেতন, অবচেতন এবং অ-চেতন ছাড়াও বেদান্ত আরো একটি স্তরকে স্বীকার করে—সেটি অতিচেতন। মানুষের সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে *নিবৃত্তি* সেই অতিচেতন স্তরেরই ইঙ্গিত করে। মানুষের সৃজনশীলতায় 'অববোধ'-এর ভূমিকা প্রসঙ্গে অনেক পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানীর সাম্প্রতিক গবেষণাতেও এই ইঙ্গিত রয়েছে।

১৯৭১-৭২-এ আমেরিকায় আটমাসের বক্তৃতা-সফরকালে আমি যখন ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে ছিলাম তখন আমার হাতে একটা অতি স্থূলকায় গ্রন্থ এসেছিল—'American Handbook of Psychiatry' (Vol. III)। গ্রন্থটি ছিল বহু লেখকের প্রবন্ধ-সঙ্কলন। সৃজনশীলতা বাড়াতে আমেরিকার যুবসম্প্রদায় একসময় নানা ধরনের ড্রাগ (মাদকদ্রব্য) ব্যবহার ও তার অপপ্রয়োগ করতে আরম্ভ করে; গ্রন্থটিতে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদসহ একটি সুস্থ কর্মপদ্ধতির কথা বলা হয়েছে।

'সৃজনশীলতা ও তার অনুশীলন' (Creativity and Its Cultivation) শীর্ষক আলোচনায় সিলভানো আরিয়েতি (পৃঃ ৭৩৭-৪০) বলছেন ঃ

"নেশাভাঙের পথ অবলম্বন করার বদলে আমাদের যে উপায়গুলি সম্বন্ধে অবশ্যই ভাবা এবং সম্ভবত সুপারিশ করা উচিত, সেগুলি হলো—বিশেষ কিছু মনোভাব, অভ্যাস এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা। প্রথম যে অবস্থাটির কথা ভাবতে হবে, সেটি হলো একাকীত্ব। একাকীত্বকে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির আংশিক পরিহার বলে ভাবা যেতে পারে।... তার পক্ষে আরো বেশি সম্ভব তার আন্তর সত্তার প্রতি কান পাতা, আন্তর সম্পদের সংস্পর্শে আসা এবং প্রাথমিক প্রক্রিয়াগুলির কিছু কিছু বহিঃপ্রকাশ সম্পর্কে অবহিত হওয়া। (আধুনিক পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান প্রাক্-চেতন স্তর থেকে আহৃত জ্ঞান বা যুক্তি-বিরহিত [non-

logical] জ্ঞানকে 'প্রাথমিক জ্ঞান' এবং চেতন অবস্থা থেকে আহৃত জ্ঞান বা যুক্তিসম্মত জ্ঞানকে 'গৌণ জ্ঞান' বলে।) দুর্ভাগ্যের বিষয়, বয়ঃসন্ধিতে আগত ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রে আমাদের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাগুলিতে একাকীত্বের সমর্থনে কিছু বলা হয়নি। বিপরীতপক্ষে, দলবদ্ধভাবে চলার প্রবণতা এবং জনপ্রিয়তাকে উচ্চ মূল্য দেওয়া হয়েছে।

"একাকীত্বকে পীড়নমূলক নিঃসঙ্গতা অথবা প্রত্যাহরণ কিংবা নিরন্তর নির্জনবাসের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে হবে না।..." দ্বিতীয় একটি বিশেষত্ব, যা সম্ভবত সৃজনশীলতাকে পুষ্ট করে, তা হলো এমন কিছু যা আমেরিকার বর্তমান সাংস্কৃতিক মেজাজের পরিপন্থী—সেটি হলো *নৈষ্কর্ম্য*।

"তৃতীয় বিশেষত্বটি হলো *দিবাস্বপ্ন*।... দিবাস্বপ্নময় জীবনেই মানুষ নিজেকে স্বাধীনতা দেয় চিরাচরিত রাস্তা ছেড়ে অন্য পথ ধরার এবং যুক্তিবিরোধী জগতে একটু আধটু বেরিয়ে বেড়ানোর।

"সৃজনশীল মানুষের আর একটি বিশেষত্ব থাকার প্রয়োজন, যেটিকে মেনে নেওয়া বোধহয় আরো অসুবিধাজনক। সেটি হলো—সহজ বিশ্বাস প্রবণতা। এখানে কথাটির তাৎপর্য হলো—আমাদের বাইরের এবং আমাদের ভিতরের সব ব্যাপারে যে কিছু অন্তর্নিহিত সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলাবদ্ধ বিন্যাস আছে, তা মেনে নিতে প্রস্তুত বা সম্মত থাকা—অন্তত সাময়িকভাবে বা যতক্ষণ না সেগুলি মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত। সৃজনশীলতা বলতে যত না নতুন নতুন বস্তু আবিষ্কার করাকে বোঝায়, প্রায়ই তার থেকেও বেশি বোঝায় এই অন্তর্নিহিত বা মূলগত বিন্যাস বা সজ্জা আবিষ্কার করাকে।...

"অন্যান্য গুণের মধ্যে চাই *সজাগ থাকা এবং শৃঙ্খলাবদ্ধতা*। যে-কোন রকম উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে এগুলি প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত হলেও সৃজনশীলতার প্রসঙ্গে এরা বিশেষ মাত্রা লাভ করে।"

এই হলো সিলভানো আরিয়েতির দেওয়া কিছু ব্যবস্থাপত্র। এদের মধ্যে একটি চূড়ান্ত বৈপ্লবিক ঃ তোমাকে সহজ বিশ্বাসপ্রবণ মন গড়ে তুলতেই হবে—লোকে যা বলছে তা বিশ্বাস কর; অবিশ্বাস করো না। লেখকরা জানাচ্ছেন, আজকাল সবকিছুকে অবিশ্বাস করার একটা প্রবণতা দেখা যায় এবং এটা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। যতক্ষণ না কোন কিছু মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে, ততক্ষণ তাকে বিশ্বাস করার জন্যও কিছু ক্ষমতা থাকা দরকার। ছোট শিশুরা সৃজনশীল, কারণ তারা বিশ্বাস করে; কিন্তু বয়স্করা বিশ্বাস করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে।

সাধারণত দেখা যায়, একপেশেভাবে গড়ে ওঠার ফলে বিশ্বাসের এই ক্ষমতা চলে যায়। আর যখন সেটা চলে যায়, তখন আস্তে আস্তে একটা সন্দেহবাতিক মনোভাব এসে যায়। বর্তমানে সারা বিশ্ব জুড়ে বহু মানুষের মানসিক অসুস্থতাই হলো সবকিছুকে অবিশ্বাস করা। একদিকের চূড়ান্ত হলো সন্দেহবাতিক মনোভাব, তার মোকাবিলা করতে হবে আরেকটি চূড়ান্ত প্রবণতা দিয়ে; সেটি— সহজ বিশ্বাস প্রবণতা। তখন একটা সুসমঞ্জস মানসিকতা গড়ে উঠবে— জানাচ্ছে উল্লিখিত বইটি।

সন্দেহবাতিক মনোভাব সমস্ত সৃজনশীলতাকে ধ্বংস করে। মনে হয় ব্রিটিশ কবি বায়রন বলেছিলেন, সমগ্র ইংল্যান্ডে মাত্র দুজন ছাড়া আর কোন সতী নারী নেই। তাঁদের একজন রানী ভিক্টোরিয়া এবং অন্যজন তাঁর নিজের মা। তারপর তিনি আরো বলছেন, রানী ভিক্টোরিয়াকে তিনি সতী নারী বলেছেন, কারণ তা না বললে তাঁর শাস্তি হবে; আর নিজের মায়ের কথা বলেছেন, কারণ তা না হলে প্রমাণিত হবে যে তিনি নিজে একজন জারজ সন্তান!

মনের মধ্যে গ্রথিত গভীর নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই ধরনের বিচার আসে। বর্তমান ভারতের বহু বুদ্ধিজীবীর মধ্যে আমরা এইরকম সন্দেহবাতিক মনোভাব দেখি। আমাদের সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের লোকজনের কারো কারোর মধ্যেও এটি বেশ ভালরকম আছে। সত্যের প্রতি, মানুষের প্রতি, তার ভবিতব্যের প্রতি সেই মৌলিক বিশ্বাসটাই ক্ষয়িত হয়ে গেছে। অধ্যাত্মবিজ্ঞান যখন মানুষকে ধীরস্থিরভাবে বসে ধ্যান করতে বলে, তখন সে আসলে বলে স্বতন্ত্রভাবে একা থাকতে এবং সব সময়ে অন্যদের সংসর্গে না থাকতে। অন্যদের সঙ্গে মেশামিশি করতে গেলে স্নায়ুগুলোও পিষ্ট ও অবসন্ন হয়। মাঝে মাঝে একা থাকাটা উপভোগ করতে শিখুন। এই সমস্ত ধারণাই *নিবৃত্তি* নামক প্রাচীন বৈদান্তিক উপদেশটির মধ্যে আছে। *প্রবৃত্তিকে* আলাদাভাবে শেখাতে হয় না, কারণ আমরা স্বাভাবিকভাবেই *প্রবৃত্তিপরায়ণ*। শিশু লাফায়-ঝাঁপায়, ছুটে বেড়ায়, এটা ঠেলে, ওটা টানে। অতএব *প্রবৃত্তিটা* স্বাভাবিক। কিন্তু নিবৃত্তি শিক্ষার অপেক্ষা রাখে। মানবজাতি আজ সেটাই চাইছে। এর মধ্যে রয়েছে কী গভীর মানসিক প্রজ্ঞার এক অভিব্যক্তি!

এই বাণী, *নিবৃত্তি* নামক এই আশীর্বাদ, ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য মানসিকতায় পরিব্যাপ্ত হচ্ছে। সেটা যে শুধু ভারত থেকে যাওয়া প্রভাবের বশে হচ্ছে, তা নয়; হচ্ছে চীন ও জাপানের প্রভাবেও এবং হচ্ছে তাদের নিজেদের সেইসব

লেখক, চিন্তাবিদ ও মনোবিজ্ঞানীর দ্বারা—যাঁরা তাঁদের একপেশে সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির প্রতি নিজেদের প্রতিক্রিয়ায় গভীর প্রজ্ঞার পরিচয় রাখছেন। *প্রবৃত্তির* সহায়ে অর্জন করা যায় সামাজিক কল্যাণ—সুন্দর সুন্দর বাড়িঘর, পর্যাপ্ত খাদ্য-পানীয়, উত্তম সাজপোশাক, শিক্ষা, আলোকিত রাস্তাঘাট, ভাল ভাল জনপথ; কিন্তু এসবেরই বাড়াবাড়িকে আজকাল ভোগবাদিতা বা 'কনজ্যুমারিজম' বলা হয়। শান্ত, সমন্বয়ী, পরিতৃপ্ত হতে হলে, মানুষের প্রতি ভালবাসার শক্তি গড়ে তুলতে হলে এবং তাদের সবার সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করতে চাইলে আমাদের প্রয়োজন *নিবৃত্তির* আশীর্বাদ, যা সকলের অন্তর্নিহিত দৈব স্ফুলিঙ্গরূপ আধ্যাত্মিক শক্তি বিকাশের সহায়ক। এবং সেই *নিবৃত্তি* আবার আমাদের সকল *প্রবৃত্তিকে* উদ্দীপ্ত করতেও পারে। এই উপদেশই গীতায় দেওয়া হয়েছে ঃ *নিবৃত্তি প্রবৃত্তির* প্রেরণা জোগায়। ভারতে আমাদের *প্রবৃত্তির প্রাচুর্য* রয়েছে। আমাদের সম্প্রতি নির্বাচন হয়ে গেল, নির্বাচনের সময় কী পরিমাণ *প্রবৃত্তি* আমরা প্রত্যক্ষ করি—সর্বত্র হিংসাত্মক চিন্তাভাবনা, হিংসাত্মক কাজকর্ম; কেউ ব্যালট বাক্স ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—এইরকম কত কিছু! কেন আমরা এমন করি? কারণ, আমাদের চিন্তাভাবনাকে সুস্থিত ও পরিশুদ্ধ করার জন্য যে *নিবৃত্তি* প্রয়োজন, তা আজ নিতান্ত কম। আমাদের এটা নিয়ে ভাবতে হবে; নিজেদের জিজ্ঞাসা করতে হবে ঃ 'কেন আমরা এটা করব? এটা কি আমাদের গণতন্ত্রের পক্ষে ভাল?' দেশের মানুষকে *তাদের* ইচ্ছানুযায়ী ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা দিতে হবে। কেন রাজনৈতিক দলগুলি সেই স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করবে বা সে ব্যাপারে নাক গলাবে? আমাদের রাজনীতিতে এইসব বিচ্যুতি রয়েছে এবং সেইসঙ্গে আছে প্রচুর দুর্নীতিও। কিন্তু সামান্য *নিবৃত্তির* সংস্পর্শে এ সমস্তই বদলে যেতে পারে।

গীতা আমাদের সেই ধরনের জীবনের কথা বলতে চলেছে—যেখানে থাকবে প্রচণ্ড কর্মকুশলতা, বিশাল উৎপাদনশীলতা এবং উৎকৃষ্টতর আন্তর-মানবিক সম্পর্কসমূহ। মানুষের জীবন ও অদৃষ্টের প্রতি গীতার দৃষ্টিভঙ্গির এই সর্বগ্রাহিতা লক্ষণীয়! গীতার এই সর্বাঙ্গীণ আধ্যাত্মিকতার সংক্ষিপ্তসার শঙ্করাচার্য আমাদের দিয়েছেন। এতে বলা হয়েছে—প্রত্যেক মানুষই আধ্যাত্মিক, এমনকি যখন সে জীবনের *প্রবৃত্তিক্ষেত্রে* অবস্থিত, তখনো। মানুষ কখনো আধ্যাত্মিকতার বাইরে নয়। চমৎকার চিন্তা এটি! আধ্যাত্মিকতা গোটা জীবনকে পরিবেষ্টন করে থাকে; মানুষ কখনো আধ্যাত্মিকতার বাইরে অবস্থান করে না। এটিই হলো গীতা ও বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গি। এই কারণেই আমি ভাষ্যের দ্বিতীয় বাক্যটি পছন্দ করি, শঙ্কর যার শুরুতে বলছেন ঃ *দ্বিবিধো হি বেদোক্তো ধর্মঃ*। বিগত বহু শতক ধরে আমরা

কখনো এর সত্যতা উপলব্ধি করতে পারিনি; আমরা আমাদের ধর্ম ও দর্শনকে হালকা করতে করতে এমন একটা অবস্থায় এনে ফেলেছিলাম যে, গত শতকে আমাদের ধর্মের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল—বাজারের দুধের মতো—৯০% জল আর ১০% দুধ!

আমাদের সমগ্র জাতিকে এই মহান ও সুগভীর সমন্বয়ী দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে। এই কারণেই স্বামী বিবেকানন্দ স্মরণীয় হয়ে আছেন এমন একজন মানুষ হিসেবে, যিনি আধুনিক কালে বেদান্তের এই সর্বাঙ্গীণ দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার নিশানকে অতি উচ্চে তুলে ধরেছিলেন। এটি যুক্তিগ্রাহ্য, প্রয়োগ-কুশল, সর্বজনীন এবং মানবতামুখী। সেই নিশানকে আবার তুলে ধরতে হবে। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ লাহোরে বেদান্তের ওপর বক্তৃতায় জাতির প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন ঃ

"অতএব হে লাহোরবাসী যুবকবৃন্দ, আবার সেই বিশাল অদ্বৈতভাবের পতাকা উড্ডীন কর—কারণ আর কোন ভিত্তির ওপর সেই অপূর্ব প্রেম প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না; যতদিন না তোমরা সেই এক ভগবানকে একভাবে সর্বত্র অবস্থিত দেখছ, ততদিন তোমাদের ভিতর সেই প্রেম জন্মিতে পারে না; সেই প্রেমের পতাকা উড়াইয়া দাও। ওঠ, জাগো, যতদিন না লক্ষ্যে পৌঁছাচ্ছ, ততদিন নিশ্চিন্ত থাকিও না; ওঠো, আর একবার ওঠো, ত্যাগ ব্যতীত কিছুই হতে পারে না। অন্যকে যদি সাহায্য করতে চাও, তবে তোমার নিজের অহংকে বিসর্জন দিতে হবে।...এই জাতি ডুবে যাচ্ছে! লক্ষ লক্ষ লোকের অভিশাপ আমাদের মস্তকে রয়েছে—যাদিগকে আমরা নিত্য-প্রবাহিত অমৃতনদী পার্শ্বে বহে গেলেও তৃষ্ণার সময় পয়ঃপ্রণালীর জল পান করতে দিয়েছি, সম্মুখে অপর্যাপ্ত আহার্য থাকা সত্ত্বেও যাদিগকে আমরা অনশনে মরতে দিয়েছি, লক্ষ লক্ষ লোক—যাদিগকে আমরা অদ্বৈতবাদের কথা বলেছি, কিন্তু প্রাণপণে ঘৃণা করেছি,...তোমাদের চরিত্রের এই কলঙ্ক মুছে ফেলো।...অতএব ওঠো, জাগো এবং সম্পূর্ণ অকপট হও। ভারতে ঘোর কপটতা প্রবেশ করেছে। চাই চরিত্র, চাই এইরূপ দৃঢ়তা ও চরিত্রবল, যাতে মানুষ একটা ভাবকে মরণকামড়ে ধরে রাখতে পারে।"[১]

বেদান্তের সেই সিংহনাদকে আজ আমরা তার অসামান্য আধুনিক প্রাসঙ্গিকতার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রদত্ত প্রায়োগিক বেদান্তের শিক্ষায় পাচ্ছি।

---

১ বাণী ও রচনা, ৪র্থ সং, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৬১-৬২

প্রাণিনাং সাক্ষাৎ অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স-হেতুঃ—এই কথা বলে শঙ্কর জোর দিয়ে বোঝালেন যে, বেদান্ত বা সনাতন ধর্ম পশুকুল-সহ সকল জীবের সুখ ও মঙ্গলের জন্য কাজ করে; কোন কোন ধর্ম ও রাজনীতিক ব্যবস্থা যেমন কেবল নিজেদের অনুগামীদেরই ভালমন্দ দেখে—তেমনভাবে নয়।

তারপর শঙ্কর বলছেন : *যঃ স ধর্মো ব্রাহ্মণাদ্যৈঃ বর্ণিভিঃ আশ্রমিভিঃ চ শ্রেয়োঽর্থিভিঃ অনুষ্ঠীয়মানঃ দীর্ঘেণ কালেন।*—এই দ্বিমুখী ধর্ম আধ্যাত্মিক শ্রেয়োভিলাষী বর্ণাশ্রমসেবী ব্রাহ্মণাদি সকল শ্রেণীর মানুষের দ্বারা দীর্ঘকাল ধরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ইন্দ্রিয়পরায়ণতার আধিপত্য এবং তদোদ্ভূত অশুভ প্রভাব

দীর্ঘদিন ধরে সবকিছু ঠিকমতই চলছিল; কিন্তু তারপর কী ঘটল? শঙ্কর বলে চললেন :

অনুষ্ঠাতৃণাং কামোদ্ভবাৎ হীয়মান-বিবেক-বিজ্ঞান-হেতুকেন অধর্মেণ অভিভূয়মানে ধর্মে, প্রবর্দ্ধমানে চ অধর্মে...—'যাঁরা এই সব ধর্মপালন করতেন তাদের মধ্যে ইন্দ্রিয়াসক্তির বৃদ্ধি হওয়ায় বিবেক-বিজ্ঞান হ্রাস পায়; তখন ধর্মবোধ বা মূল্যবোধ বিদূরিত হয় এবং অধর্ম বা অশুভ প্রভাব বৃদ্ধি পায়।'

এইরকম অবস্থায় এতদিন ধরে যেসব গুণ ও চারিত্রিক মাধুর্যের সহায়ে মানুষে মানুষে একটা সুস্থ বন্ধন রচিত হয়েছিল সেগুলির অন্তর্ধান ঘটে, আর বাড়ে লোভ-লালসা, হিংসা এবং আত্মকেন্দ্রিকতা, ফলে সংশ্লিষ্ট সমাজ এক অবক্ষয়ের অবস্থায় পৌঁছায়। মানুষ *কাম* ও *ক্রোধের* দ্বারা পরাভূত হলে প্রথমেই বিবেক অর্থাৎ বিচারক্ষমতা এবং বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান তাকে ছেড়ে চলে যায়। ভাল-মন্দের বোধটা ক্রমে অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হয়ে যায়। ইন্দ্রিয়সুখ থেকে কখন যে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিতে হবে, তার বিচারটা যায় হারিয়ে। তখন কী ঘটে? *ধর্মের* ওপর আধিপত্য করে বসে *অধর্ম*, এবং নৈতিক সংযমকে একেবারে বিদায় দিয়ে দেওয়া হয়। যার যা খুশি, সে তা-ই করে—যেমন আজ ঘটছে ভারতীয় জীবনধারার বহু ক্ষেত্রে। ধর্ম যখন পরাভূত হয়, তখন সেই নেতিবাচক অবস্থা জন্ম দেয় আর এক ইতিবাচক অবস্থার—*অধর্মের* বৃদ্ধির। অশুভ কর্ম ক্রমাগত বাড়ে; সৎকর্ম ক্রমাগত কমে। ইতিহাসে আমরা বিভিন্ন সভ্যতার জন্ম ও প্রসার, তাদের ক্ষয় ও মৃত্যুর কথা পড়ি ও বিশ্লেষণ করি। শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হলো একদা শক্তিশালী রোম সভ্যতা, যার ইতিহাস সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে এডওয়ার্ড গিবনের 'ডিক্লাইন্ অ্যান্ড ফল অফ দ্য রোমান্

এম্পায়ার' গ্রন্থটিতে। শঙ্করাচার্য এখানে যা বলছেন, তার উত্তম দৃষ্টান্ত আছে গ্রন্থটিতে। গিবন বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন কীভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ক্রমান্বয়ে রোম সাম্রাজ্যে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধগুলির অবক্ষয় ঘটেছিল এবং শেষপর্যন্ত এক বহিরাগত অসভ্য বর্বর জাতির আক্রমণে কীভাবে সে সাম্রাজ্য চিরতরে ধ্বংস হয়ে গেল।

ভারতবর্ষও তার পাঁচহাজার বছরের ইতিহাসে এমন অবক্ষয় প্রত্যক্ষ করেছে; কিন্তু ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতায় আসেনি সেই শেষ পর্যায়টি অর্থাৎ মৃত্যু। প্রত্যেক অবক্ষয়ের পরেই এসেছে এক প্রাণচঞ্চল পুনর্গঠন পর্ব। শঙ্করাচার্য তাঁর ভূমিকার পরবর্তী অংশে সেই কথাই বলেছেন ঃ

জগতঃ স্থিতিং পরিপিপালয়িষুঃ স আদিকর্তা নারায়ণাখ্যো বিষ্ণুর্ভৌমস্য ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণত্বস্য রক্ষণার্থং দেবক্যাং বসুদেবাৎ অংশেন কৃষ্ণঃ কিল সংবভূব। ব্রাহ্মণত্বস্য হি রক্ষণেন রক্ষিতঃ স্যাৎ বৈদিকোধর্মঃ, তদধীনত্বাৎ বর্ণাশ্রমভেদানাম্।

—'তাই, জগতের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্যে সেই আদিকর্তা, জগৎ-স্রষ্টা, নারায়ণ নামে খ্যাত, বিষ্ণু, জগতের আধ্যাত্মিকতা ও ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করতে বসুদেব ও দেবকীর সন্তান-রূপে আবির্ভূত হলেন। ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা হলে বৈদিক ন্যায়ধর্মও রক্ষা পাবে। কারণ, চতুর্বিধ কর্মভেদে এবং চতুর্বিধ আশ্রমভেদে সমাজের যে সংগঠন, তা বৈদিক ধর্মের ওপর নির্ভর করে।'

যেভাবে কুম্ভকার কাদার তাল থেকে কুম্ভ 'সৃষ্টি' করে সেইভাবে এই জগতের 'সৃষ্টি' এমন কথা বেদান্ত বলে না। বেদান্ত বলে জগতের 'ব্যক্ত' বা 'প্রকাশিত' হওয়ার কথা—যেমন জ্বলন্ত অগ্নি থেকে ছিটকে আসে স্ফুলিঙ্গ কিংবা মাকড়সার দেহ থেকে তৈরি হয়ে যায় তার জালিকা। একের মধ্যে থেকেই ব্যক্ত হয় বহু; পরে তারাই আবার মিশে যায় সেই একের মধ্যে।

ব্রাহ্মণত্ব ঃ মানবীয় ক্রমবিকাশের লক্ষ্য

সামাজিক পুনর্গঠনের কাজটি কোন রাজনীতিবিদ বা বুদ্ধিজীবী বা যাজকের দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়; কেবল যিনি ঈশ্বর-উপলব্ধি করেছেন, তেমন কোন মানুষই সেটি করতে পারেন। ভারতবর্ষের দীর্ঘ ইতিহাসে এমন দিব্য মহাত্মার আবির্ভাব হয়েছে বারংবার এবং এখানে আমরা বলছি এরূপ একটি কাহিনী যা তিনহাজার বছরেরও আগে ঘটে গেছে, তা হলো শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-কথা।

ভারতবর্ষে আমাদের একটি মৌলিক ভাবনা হলো মানবীয় ক্রমবিকাশ বলে একটি বিষয় আছে; তা হলো মানবের *তমঃ* থেকে *রজঃ*-তে এবং *রজঃ* থেকে *সত্ত্বে* উত্তরণ। সম্পূর্ণ সত্ত্বভাবাপন্ন পুরুষ বা নারী একজন অসামান্য মানুষ, যিনি প্রকৃষ্টরূপে বিকশিত হয়ে অন্তরের দেবত্বকে প্রকাশ করেছেন। ভারতবর্ষে আমরা বুঝেছি যে, এটিই মানবীয় ক্রমবিকাশের লক্ষ্য বা চরম অবস্থা। সমাজে কিভাবে আরো আরো বেশি সংখ্যায় এই ধরনের মানুষ সৃষ্ট করা যায়? সমাজের প্রত্যেক লোকের কাছে এই লক্ষ্য স্থাপন করা হচ্ছে। তাকে এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে বা অন্তত জীবনটাকে সেই উদ্দেশে চালিত করতে হবে। তোমার নিজের গতিতে এগোও, কিন্তু এগোও সেই লক্ষ্যের উদ্দেশে—বলছে বেদান্ত। আধুনিক চিন্তায় যাকে 'সমাজতত্ত্ব' বলা হয়, তা আসলে সামাজিক পরিসংখ্যান-মাত্র; ওতে হবে না। বেদান্ত দেখিয়ে দেয় যে, সমাজবিদ্যার মধ্যে মানুষের সামনে একটা সামাজিক লক্ষ্য স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা আছে এবং মানবজাতিকে অতি অবশ্যই সেই মানবীয় ক্রমবিকাশের উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে হবে। সেই লক্ষ্য বা আদর্শস্থলটি হতে হবে একজন *সাত্ত্বিক* মানুষ—যাঁর মধ্যে কোন ঘৃণা বা হিংসা নেই, যিনি চিরপ্রেমময়, দয়াশীল। কোন সমাজে এমন সব মানুষ থাকলে সেখানে পুলিসেরও আর দরকার হবে না, এমনকি রাজনীতিক রাষ্ট্রেরও প্রয়োজন থাকবে না। আর আইনকানুন, বিধি-নিষেধের তো কথাই নেই। কারণ, সেই সমাজে থাকবেন এমন সব মানুষ, যাঁরা স্ব-নিয়ন্ত্রিত ও সংযত; যাঁরা সকলের সঙ্গে নিজেদের আধ্যাত্মিক একত্ব উপলব্ধি করেছেন। ভারতবর্ষ বিশ্বাস করে যে, সেই সমাজই সবচেয়ে উন্নত, যে সমাজে সাত্ত্বিক মানুষের সংখ্যা সর্বোচ্চ, যাঁরা আধ্যাত্মিক ও বিকশিত-সত্তা এবং যাঁরা তাঁদের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশসাধন করেছেন। এইরকম মানুষকেই *ব্রাহ্মণ* বলা হয়েছে—শব্দটির আদি বৈদান্তিক তাৎপর্য অনুযায়ী, অশুভ জাতপাতের নিয়মে নয়।

চারহাজার বছরের প্রাচীন বৃহদারণ্যক উপনিষদে প্রথম *ব্রাহ্মণ* শব্দটির সংজ্ঞা প্রদান করে বলা হয়েছে ঃ

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোঽথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ। (৩/৮/১০)

—'গার্গি, যে এই অক্ষরকে (সত্যস্বরূপকে) না জেনে ইহলোক ত্যাগ করে, সে *কৃপণ*। কিন্তু গার্গি, যিনি এই অক্ষরকে (সত্যস্বরূপকে) জেনে ইহলোক ত্যাগ করেন, তিনি *ব্রাহ্মণ*।'

এই অংশের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য 'কৃপণ'-এর সংজ্ঞা প্রদান করে বলেছেন—পণের দ্বারা ক্রীত দাসের মতো দুঃখী।

ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধ

সপ্তম খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভগবান বুদ্ধ ভারতবর্ষে আবির্ভূত হয়ে প্রেম ও করুণার মহান বাণী প্রচার করলেন এবং স্থাপন করলেন এমন এক সন্ন্যাসিসঙ্ঘ যা জাতি ও সম্প্রদায়গত সর্বপ্রকার বিভাজন উপেক্ষা করে সব শ্রেণীর, সব সম্প্রদায়ের মানুষকে গ্রহণ করল। কিন্তু তিনি *ব্রাহ্মণত্বের* আদর্শ সম্বন্ধে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও সম্মান ব্যক্ত করলেন। বৌদ্ধগ্রন্থ *'সুত্ত পিটক'*-এর *খুদ্দক নিকায়ের* অন্তর্গত *ধম্মপদের 'ব্রাহ্মণ বগ্‌গো'* নামক ছাব্বিশতম তথা শেষ অধ্যায়ের পুরোটা জুড়ে *ব্রাহ্মণ্য* আদর্শের গুণ-বিচার ও প্রশংসা করা হয়েছে। সেই অধ্যায় থেকে নির্বাচিত কতকগুলি শ্লোক নিচে উদ্ধৃত হলো :

যস্‌স পারং অপারং বা পারাপারং ন বিজ্জতি,
বীতদ্দরং বিসংযুত্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণম্‌। (৩)

—'তাঁকে বলি ব্রাহ্মণ, যাঁর এ-কূল ও-কূল দুটি কূলই নেই, যিনি ভয় থেকে মুক্ত, যিনি বন্ধন থেকে মুক্ত।'

ঝায়িং বিরজমাসীনং কতকিচ্চম্‌ অনাসবং;
উত্তমত্থং অনুপ্পত্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণম্‌। (৪)

—'তাঁকে বলি ব্রাহ্মণ, যিনি ধ্যানপরায়ণ, আবেগমুক্ত, স্থিতধী, যাঁর কর্ম সমাপ্ত, যিনি কলুষমুক্ত এবং যিনি (সাধুত্বের) সর্বোচ্চ লক্ষ্যে উপনীত হয়েছেন।'

বাহিতপাপোতি ব্রাহ্মণো সমচরিয়া সমণোতি বুচ্চতি
পব্বাজয়মাত্তনো মলং তস্মা পব্বজিতোতি বুচ্চতি। (৬)

—'যেহেতু তিনি সব অশুভ ত্যাগ করেছেন, সেহেতু তিনি *ব্রাহ্মণ*; প্রশান্তিতে বাস করেন বলে তিনি *সমণ* (শ্রমণ); আপন অশুদ্ধি পরিহার করেন বলে তিনি "পব্বজিত" (প্রব্রজিত)।'

যস্‌স কায়েন বাচায় মনসা নত্থি দুক্কতং,
সংযুতং তিহি ঠানেহি তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণম্‌। (৯)

—তাঁকে বলি ব্রাহ্মণ, যিনি দেহ, বাক্য বা মনের দ্বারা আঘাত করেন না; এই তিন বিষয়ে যিনি সংযত।

ন জটাহি ন গোত্তেন ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো
যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ সো সুচী সো চ ব্রাহ্মণো। (১১)

—ব্রাহ্মণ হওয়া যায় জটা ও গোত্রের সহায়ে নয়, বংশপরিচয়ে নয়, জাতির দ্বারা নয়; তিনিই ব্রাহ্মণ যাঁর মধ্যে আছে সত্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা।

গম্ভীরপঞ্ঞং মেধাবিং মগ্গামগ্গস্স কোবিদং
উত্তমত্থং অনুপ্পত্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণম্। (২১)

—তাঁকে বলি ব্রাহ্মণ, যাঁর প্রজ্ঞা গভীর, যিনি বহুজ্ঞাত, যিনি ন্যায় ও অন্যায় পথ সনাক্ত করেন এবং যিনি উচ্চতম আদর্শে উপনীত হয়েছেন।'*

এবং এই আধুনিক যুগে স্বামী বিবেকানন্দ সবরকম জাতপাতের বিচার ও অস্পৃশ্যতার ভয়ানক সমালোচনা করে মানবীয় ক্রমবিকাশের পথে এই *ব্রাহ্মণত্বের* আদর্শকে সবার ওপরে তুলে ধরেছেন। 'ভারতের ভবিষ্যৎ' সম্বন্ধে তাঁর বক্তৃতায় তিনি বলেছেন : "ভারতে ব্রাহ্মণই মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ—শঙ্করাচার্য তাঁর গীতাভাষ্যের ভূমিকায় এটি অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের কারণ বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন; এইটিই ছিল তাঁর অবতরণের মহান উদ্দেশ্য। এই ব্রাহ্মণ, এই দিব্যমানব, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, এই আদর্শ ও পূর্ণমানবকে থাকতে হবে; তাঁর লোপ হলে চলবে না।"[১]

সেইসঙ্গে জাতপাতের অশুভ প্রভাব, বিশেষত উচ্চবর্ণের বিশেষাধিকারের দাবির প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন : "একচেটিয়া অধিকারের দিন চলে গিয়েছে। প্রত্যেক অভিজাত জাতির কর্তব্য—নিজের সমাধি নিজে খনন করা; আর যত শীঘ্র তারা এ-কার্য করে, ততই তাদের পক্ষে মঙ্গল। যত বিলম্ব হবে, ততই তারা পচবে আর ধ্বংসও তত ভয়ানক হবে।"[২]

(দ্রঃ The Dhammapada, English translation by Dr. S. Radhakrishnan, Oxford University Press, 10th Impression, Ch. XXVI)

১ বাণী ও রচনা, ৪র্থ সং, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৬-৪৭

২ বাণী ও রচনা, ৪র্থ সং, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৯

আধুনিক শতকগুলিতে *ব্রাহ্মণ* নামক সেই মহান শব্দটিকে আমরা বিকৃত করে ফেলেছি। এখন এর মানে এসে দাঁড়িয়েছে জাতপাতে আবদ্ধ উন্নাসিক একজন মানুষ—যে *রজঃ* ও *তমঃ*-তে পূর্ণ, যার মধ্যে *সত্ত্বের* লেশমাত্র নেই, এবং যে অন্য সব জাতের মানুষকে নিচু চোখে দেখে। বিগত একহাজার বছর ধরে এমন একটি মহান শব্দের অবনমন ঘটিয়ে চলেছে ব্রাহ্মণেরা। স্বল্প-সুবিধাপ্রাপ্ত বা সর্বসুবিধাবঞ্চিত বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে থেকে তারা নিজেদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দাবি করে এসেছে। আধুনিক ভারতীয় বিবেক এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং ভারতীয় সমাজকে এই অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত করতে শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

উপনিষদ্ থেকে এবং পরবর্তী কালে বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্য প্রমুখ আচার্যদের মাধ্যমে আমরা এই শিক্ষা পেয়েছি যে, *ব্রাহ্মণ* শব্দটির অর্থ হলো এমন একজন মানুষ, যিনি ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে সম্বন্ধে পরিণত হয়েছেন প্রেম ও করুণায় পূর্ণ একক ব্যক্তিত্বে। শঙ্করাচার্যের ভূমিকার এই অংশে ব্যবহৃত শব্দটির তাৎপর্য হলো ব্রাহ্মণের বিমূর্ত রূপ—*ব্রাহ্মণত্ব*—যা বলতে বোঝায় বিশেষ এক মানবীয় অবস্থাকে, বিশেষ কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীকে নয়; ব্রাহ্মণত্ব মানে হলো মানবীয় বিকাশের উচ্চ এক পর্যায়, যা কোন বিশেষ জাতি, শ্রেণী বা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। *ব্রাহ্মণ* পদবাচ্য মানুষ রয়েছেন রাশিয়ায়, আমেরিকায়, চীনে এবং অন্য সব স্থানে। চমৎকার একটি ভাব আমাদের আছে; সেটি এই যে, ঈশ্বরের অবতার পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, তিনি কোন সামাজিক সংস্কার শুরু করেন না, কারণ সেটা সমাজ-সমস্যার খুব ওপর-ওপর একটা প্রতিকার-প্রচেষ্টামাত্র—রোগকে না সারিয়ে রোগের বহির্লক্ষণ সারানোর চেষ্টার মতো। অবতার একটি নতুন মূল্যবোধ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন, যা ধীরে ধীরে মানুষের হৃদয়-মনকে অনুপ্রাণিত করে। তা থেকেই আসে নৈতিক ও মানবিক জাগরণ; এবং এই জাগরণই প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার সমাজ-সংস্কারের জন্ম দেয়। তিনি আসেন দুটি উদ্দেশ্যে : একটি হলো *সনাতন ধর্মের* মহিমা ও সর্বজনীনতা প্রতিষ্ঠা করা; অপরটি হলো সেই 'আদর্শ মানুষ'কে রক্ষা করা, যিনি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের প্রতিমূর্তিস্বরূপ এবং যিনি মানবীয় ক্রমবিকাশের লক্ষ্যস্বরূপ—ব্রাহ্মণত্ব-নামক অবস্থায় উপনীত হয়েছেন।

সকল মানুষকেই সেই লক্ষ্যের অভিমুখে বিকশিত হয়ে উঠতে হবে। শ্রীকৃষ্ণের 'অবতরণ'কে যার সঙ্গে সম্বন্ধিত করা হয়েছে, সেটি হলো—*ভৌমস্য*

ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণত্বস্য রক্ষণার্থম্। ভৌমস্য ব্রহ্মণো—জগতের ব্রহ্ম, অর্থাৎ বেদ, বেদের অসামান্য দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা—যেখানে এইসব সর্বজনীন ভাবের সন্ধান মেলে। এই দর্শন সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করতে কারো ভীত হওয়ার প্রয়োজন নেই। এই দর্শন প্রশ্নকে স্বাগত জানায়, কারণ এটি অত্যন্ত যুক্তিবাদী এবং সাধনসম্মত। দ্বিতীয়ত, এটি অত্যন্ত সর্বজনীন; এটি মানবজাতিকে দেখে সামগ্রিকভাবে একটি এককরূপে তাকে বর্ণ, দেশ এবং জাতিতে বিভক্ত রূপে নয়। বৈদিক ঐতিহ্যের এটিই গুরুত্ব। তাই এটিকে তিনি বলছেন *'ভৌমস্য ব্রহ্মণো'* এবং *ব্রাহ্মণত্বস্য রক্ষণার্থম্*। বেদ বা *শ্রুতি* বা উপনিষদে ঈশ্বর ও মানবজাতি সম্বন্ধে কেবল সর্বজনীন নীতিসমূহের কথাই আছে। শ্রীকৃষ্ণ এসেছিলেন এটিকে রক্ষা করতে, এবং রক্ষা করতে সেই মানুষটিকে যাঁর জীবনে সেই *শ্রুতি*, সেই ব্রাহ্মণ-রূপটি মূর্ত হয়ে উঠেছে। আমাদের ঐতিহ্য ও সাহিত্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই দুটির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এটিকে কাজে পরিণত করতে নারায়ণ স্বয়ং কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। নারায়ণ—যিনি এই দ্বি-ধারাবিশিষ্ট *ধর্মের* প্রবর্তক এবং যিনি এই জগতের সুস্থিতি কল্পে *প্রবৃত্তি* ও *নিবৃত্তি* ধর্মের দৃষ্টান্তস্বরূপ *প্রজাপতি* ও কুমারগণের স্রষ্টা—তিনি যখন দেখলেন যে, জগৎ ভুল পথে চলেছে তখন শ্রুতির এই মহান বাণীকে আরো শক্তিশালী করতে, জীবনের আধ্যাত্মিক মাত্রাকে উন্নততর করতে এবং যে মানুষ শ্রুতি বা ব্রাহ্মণত্বকে নিজ জীবনে মূর্ত করে তুলেছেন, তাকে সুরক্ষা দিতে তিনি জন্ম নিলেন দেবকী ও বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণরূপে। ঈশ্বরাবতারের মূল ভাব এটিই।

আমরা প্রায়ই শুনি যে, বৌদ্ধধর্ম হলো ব্রাহ্মণত্ব-বিরোধী। পাশ্চাত্য লেখকেরা এইরকম অনেক ব্যাপারেরই অপব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা জানতেন না যে, *পূজারি-ব্রাহ্মণ* আর ঐসব মহান গ্রন্থে বর্ণিত ব্রাহ্মণ, দুটির অস্তিত্ব পৃথক। অতীতে এমন বহু মহান *ব্রাহ্মণ* জন্মগ্রহণ করেছেন, যাঁরা ছিলেন প্রকৃতই ধর্মপ্রাণ ও পবিত্র। আজ আমরা যাঁদের দেখি, তাঁরা সবাই *পূজারি-ব্রাহ্মণ*। তাঁরা যে সমাজে মহাবিঘ্নের কারণ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু *ব্রাহ্মণ* বলতে ঠিক কী বোঝায়, তা কখনো ভুললে চলবে না। আর তাই বুদ্ধ অবতারে দেখা যায়, ভগবান বুদ্ধ ঠিক এই ধারণাটিকেই ব্যক্ত করেছেন। *ব্রাহ্মণদের* সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। বুদ্ধ জানতেন যে, *ব্রাহ্মণেরা* উচ্চতম আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক সাধনে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ এবং তাঁদের জীবন খুবই সাদাসিধে ও সরল। যদিও এটা সত্য যে, বহু লোকে সেই আদর্শে উপনীত হতে পারেন না; কিন্তু তা

বলে আদর্শটিকে ভুলে গেলে চলবে না। বুদ্ধের আলোচনাদিতে *ব্রাহ্মণ* এবং *শ্রমণ* কথা দুটি ঘুরে ফিরে এসেছে। *ব্রাহ্মণ* এবং *শ্রমণ*—উভয়কেই শ্রদ্ধা-সম্মান কর—বলছেন বুদ্ধ। *ব্রাহ্মণরা* সাধারণত গৃহস্থ এবং *শ্রমণরা* সন্ন্যাসী। এরূপ গৃহস্থদেরও উচ্চ সম্মান প্রদান করা হয়, কারণ তাঁরা *সাত্ত্বিক* জীবন যাপন করেন।

অতি প্রাচীন কাল থেকে আমরা উপলব্ধি করেছি যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই এইরকম একজন ব্রাহ্মণ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা অন্তর্নিহিত আছে, যাঁর মধ্যে কোন শত্রুতা বা ঘৃণার ভাব নেই, যাঁর হৃদয় প্রেম ও করুণায় পূর্ণ। আধুনিক কালে আমরা পেয়েছি মহাত্মা গান্ধীকে। এক অর্থে বর্ণের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন *বৈশ্য*; কিন্তু চরিত্রের দিক দিয়ে ছিলেন একজন *ব্রাহ্মণ*। কারো প্রতি তিনি কোন ঘৃণার মনোভাব দেখাননি, এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকায় যে পুলিশ তাঁকে মেরে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল—তাদের প্রতিও না। বিচারালয়ে গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। আজও এমন মানুষ আছেন, এবং গান্ধীজীর মতো মানুষ আবার আমাদের নতুন করে আশ্বস্ত করছেন যে, এমন অবস্থা লাভ করা অসম্ভব নয়। প্রশ্ন হলো, আমরা কাজে কী করি?

আধুনিক জীববিদ্যা বলছে, ক্রমবিকাশের রঙ্গমঞ্চে মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জৈব ক্রমবিকাশের সকল প্রাসঙ্গিকতা শেষ হয়ে গেছে। মানুষের সমৃদ্ধ মস্তিষ্ক অসাধ্য সাধন করতে পারে; উচ্চতর স্তরে যে ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল রয়েছে, তারই অনুসন্ধান করতে হবে আমাদের। স্যার জুলিয়ান হাক্সলি একে বলেছেন *মনোসামাজিক* বা psycho-social ক্রমবিকাশ; আর বেদান্ত একে বলে *আধ্যাত্মিক* ক্রমবিকাশ। মানবীয় ক্রমবিকাশের লক্ষ্য যে কী, জীববিদ্যা নিজেই এখনো পর্যন্ত তা খুঁজে পায়নি। তবে সে সিদ্ধান্ত করেছে যে, সে-লক্ষ্যটি নিয়ন্ত্রিত হবে গুণের দ্বারা; পরিমাণের দ্বারা নয়। ভারত এই 'গুণ'-এরই পূর্ণ-বিকাশ লক্ষ্য করেছে *ব্রাহ্মণ*-আদর্শের মধ্যে। এই হলো আদর্শটি এবং এই রইল কয়েকটি দৃষ্টান্ত—তুমি তোমার গতিবিধি সেই অভিমুখে পরিচালিত কর। হতে পার তুমি একজন সাধারণ মানুষ—তমঃ পূর্ণ মানুষ। তাতে কিছু এসে যায় না; জীবনে একটা অগ্রগতি আছে এবং সে অগ্রগমন আছে এই লক্ষ্যটির অভিমুখে। ভারতের জনসাধারণের সামনে এই আদর্শটিকে স্থাপন করা হলে গোটা দেশটাই সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। তোমার সামর্থ্য অনুসারে সেই লক্ষ্যের দিকে এগোও। একটি, দুটি, তিনটি পদক্ষেপ পরপর

চলতে থাকবে, আর তোমার জীবনে কী পরিবর্তনটাই না এসে যাবে! মানবীয় উৎকর্ষের ক্ষেত্রে এই *ব্রাহ্মণ* ভাবটি প্রযোজ্য হতে পারে আমেরিকায়, রাশিয়ায়, জার্মানিতে, চীনে—সর্বত্র। *আজ আমাদের বুঝতে হবে যে, ঐটিই হলো সামাজিক ক্রমবিকাশের লক্ষ্য।* আধুনিক সমাজবিদ্যার অনেকটাই সামাজিক পরিসংখ্যানমাত্র, কিন্তু সত্যকারের সমাজবিদ্যা হলো সেটিই, যেটি মানুষের আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক ক্রমবিকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। সেই দিকে বিকাশশীল কোন সমাজের প্রকৃতি বা লক্ষণ কী? আমরা একে বলি আধ্যাত্মিক লক্ষ্য বা দিশা। মানুষের স্তরে ক্রমবিকাশের লক্ষ্য হলো এই আধ্যাত্মিক দিশা। বিংশ শতাব্দীর জীববিদ্যা ধীরে ধীরে এই কথা বলতে আরম্ভ করেছেঃ অতিক্রম করে যাও এই দেহগত সীমাবদ্ধতাকে, এই ইন্দ্রিয়জ সীমাবদ্ধতাকে; সমৃদ্ধ মস্তিষ্ক রয়েছে সেই কারণেই। তারা মনোসামাজিক ক্রমবিকাশের কথাও বলছে। বলছে সেই মনের কথা যা সমস্ত মানুষ ও সমস্ত সমাজের সঙ্গে নিজের একাত্মতা অনুভব করতে পারে। তখন আর কোন শোষণ থাকবে না। এবং এটিই হলো *ব্রাহ্মণ* মানসিকতা।

অতএব, বিংশ শতাব্দীর জীববিদ্যা সকল সমাজে ক্রমবিকাশের সামগ্রিক লক্ষ্যটি স্থির করে দিচ্ছে *ব্রাহ্মণ* আদর্শের অভিমুখে। শাঙ্করভাষ্যের বর্তমান উক্তির এটা-ই হলো গুরুত্ব।

বেদান্ত অনুসারে, মানবীয় ক্রমবিকাশের এটিই হলো পথ ও লক্ষ্য। অবতারের আবির্ভাব হয় মানুষকে এই ক্রমবিকাশের পথে স্থাপন করতে, তাদের একটু ধাক্কা দিতে, একটু উদ্দীপনা জোগাতে। সেই উদ্দীপনা দেওয়া হলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অশুভ বৃত্তিগুলির অন্তর্ধান ঘটে, কারণ তখন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব পালটে যায়, তার মূল্যবোধগুলি বদলে যায়; সে তার জীবনকে কোন এক উচ্চ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করেছে। তার ছোটখাট ভুলভ্রান্তি কারো অনিষ্টসাধন করে না। মানবের বৃদ্ধি ও প্রগতির এ-ই হলো ধারণা এবং এটি সাধন করতে পারেন কেবল একজন ঈশ্বর-অবতার, যিনি একাধারে একজন যুগপ্রবর্তক এবং একজন ঈশ্বরীয় সত্তা। এই মহাবলশালী আধ্যাত্মিক স্রোতকে বেগবতী করতে যে শক্তির প্রয়োজন, তা আসতে পারে কেবল সেইরকম এক ব্যক্তিরই কাছ থেকে, যাঁকে আমরা বলি 'অবতার'। আপনারা অন্য যে কোন শব্দই ব্যবহার করতে পারেন। এটি এক অনন্য-সাধারণ ক্ষমতা, যা কোন সাধারণ সাধু-সন্তের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। এই ক্ষমতা এমনই অ-সাধারণ; যা নতুন ঐতিহাসিক যুগের

প্রবর্তন করতে পারে। এঁরা সংখ্যায় অত্যল্প; এঁরা জগৎ-আলোড়ক ব্যক্তিত্ব। আমরা রাম, কৃষ্ণ এবং বুদ্ধকে জগৎ-আলোড়নকারী ব্যক্তিত্ব বলে বিবেচনা করি, যিশুকেও তাই; এবং এই আধুনিক কালে আমরা পাচ্ছি শ্রীরামকৃষ্ণকে। আমাদের সমগ্র ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে এ এক অতি সুন্দর চর্চার বিষয়। পরিস্থিতি যখন খারাপের দিকে যায়, তখন সেই শক্তিকে পুনরায় অবতরণ করতে হয়, এবং তিনি আসেন। পরে গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে কৃষ্ণ বলবেন যে, অনেকে তাঁকে চিনতে পারবেন না, কারণ তিনি আসবেন সাধারণ একজন মানুষ হয়ে। কালে কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁকে চিনবে। কোন মহান মানুষের খুব কাছাকাছি অবস্থান করলে আমরা তাঁকে চিনতে পারি না। *অবতারের* এই ধারণাটি—যেটিকে শ্রীকৃষ্ণ গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণনা করবেন—তা *সনাতন ধর্ম* ও খ্রিস্টধর্মের মূল ভাব তথা বিশেষত্ব। অন্য কোন ধর্মে অবতারের এই ধারণাটি নেই। এই আধুনিক কালে সমগ্র ব্যবস্থাটিতে যুগোপযোগী পরিবর্তনের অনুরূপ একটি প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল, এবং জন্ম নিয়েছিলেন এক মহান পুরুষ—শ্রীরামকৃষ্ণ। শিক্ষাটি আমাদের বইপত্রে আছে, কিন্তু আমরা তা বোঝার বা অনুসরণ করার উপায় খুঁজে পাই না। এমন কাউকে আসতেই হবে, যিনি আমাদের দেবেন নতুন অন্তর্দৃষ্টি। কে তা করবেন? কোন পণ্ডিত নয়, কোন ধর্মযাজক নয়, নয় কোন অধ্যাপক। তাঁরা কী জানেন? আসতে হবে প্রচণ্ড শক্তিধর কোন আধ্যাত্মিক সত্তাকে। এবং তিনি আসেন নিঃশব্দে, অচঞ্চলভাবে—এবং এক নতুন আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবাহ সৃষ্টি করে যান। সেই আধ্যাত্মিকতা মানুষকে ধীরে ধীরে পরিবেষ্টন করতে থাকে আর বদলে দিতে থাকে গোটা জগৎটাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেবত্ব প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ

সমাজে ক্রিয়াশীল শক্তিগুলির পারস্পরিক অনুপাতকে অবতার কিভাবে পরিবর্তন করেন? আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে এই প্রশ্নের উত্তর দেবেন। তবে আলোচনার এই পর্যায়ে এসে আমি আপনাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অর্থাৎ *অবতারের* গুরুত্ব প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ কি বলেছেন, তা আপনাদের সঙ্গে পুনরাবৃত্তি করতে চাই। সমাজে যখন সবকিছু ভ্রান্তপথগামী হয়, তখন সেই ভ্রান্তি সংশোধন করতে আবির্ভাব হয় অবতারের। আমেরিকার নিউইয়র্কে স্বামীজী My Master—'মদীয় আচার্যদেব'—এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন। যে চারবছর স্বামীজী আমেরিকা ও ইউরোপে ছিলেন, সে সময়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কখনো কিছু বলেননি; বলেছেন কেবল বেদান্তের কথা।

ক্রমে যখন মানুষ জানতে পারল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ নামে তাঁর একজন আচার্য ছিলেন এবং তিনি অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন পুরুষ ছিলেন, তখন তারা স্বামীজীকে তাঁর গুরুদেব সম্বন্ধে বলবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানায়। এই সূত্রেই তিনি নিউ ইয়র্ক এবং লন্ডনে এই একটি বিষয়ে, My Master—'মদীয় আচার্যদেব' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতার সূচনায় রয়েছে শঙ্করের এই উক্তিটি ঃ অবস্থা যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং সমাজ হয়ে ওঠে দুর্নীতিগ্রস্ত, তখন নৈতিক মূল্যবোধগুলি পুনঃ সংস্থাপনের জন্য এক মহাশক্তি প্রকটিত হন। এইভাবে স্বামীজী বক্তৃতাটি শুরু করেছেন। সুন্দর ইংরেজিতে দেওয়া অসামান্য এই বক্তৃতাটিতে রয়েছে মহান এক আচার্যের অনুপম একখানি চরিত্রায়ন। পূর্বাশ্রমে ছাত্রাবস্থায় এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ব্রহ্মচারী অবস্থায় আমি নিশ্চিতভাবে এই বক্তৃতাটি বার পঁচিশেক পড়েছি। সকল দৃষ্টিকোণ থেকে এটি এতটাই অনন্যসাধারণ! স্বামীজী শুরু করেছেন এইভাবে[১] ঃ

" 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভবদ্গীতায় বলেছেন ঃ যখনই ধর্মের প্রভাব কমে যায় ও অধর্মের প্রভাব বাড়তে থাকে তখনই আমি মানবজাতিকে সাহায্য করবার জন্য জন্মগ্রহণ করি।'

'আমাদের এই জগতে ক্রমাগত পরিবর্তন ও নূতন নূতন পরিস্থিতির জন্য যখনই নূতন সামঞ্জস্যের প্রয়োজন হয়, তখনই এক শক্তি-তরঙ্গ এসে থাকে। আর মানব আধ্যাত্মিক ও জড় উভয় স্তরে ক্রিয়াশীল বলে উভয়ত্র এই সমন্বয়-তরঙ্গের আবির্ভাব হয়। আধুনিক কালে ইউরোপই প্রধানত জড়রাজ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছে, আর সমগ্র জগতের ইতিহাসে এশিয়াই আধ্যাত্মিক রাজ্যে সমন্বয়-সাধনের ভিত্তিস্বরূপ। অধুনা আবার আধ্যাত্মিক স্তরে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে জড়বাদী ভাবসমূহই অত্যুচ্চ গৌরব ও শক্তির অধিকারী; আজ মানুষ ক্রমাগত জড়ের উপর নির্ভর করতে করতে নিজের দিব্যস্বরূপ ভুলে গিয়ে অর্থোপার্জনের যন্ত্রবিশেষে পরিণত হতে বসেছে—এখন আর একবার সমন্বয়ের প্রয়োজন। সমন্বয়ের এই শক্তি এসেছে, সেই বাণী উচ্চারিত হয়েছে—যা ক্রমবর্ধমান জড়বাদের মেঘ অপসারিত করে দেবে। সেই শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে, অনতিবিলম্বেই তা মানবজাতিকে তার প্রকৃত স্বরূপের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে, আর এশিয়া হতেই এই শক্তি চারিদিকে বিস্তৃত হতে আরম্ভ করবে।

---

১ বাণী ও রচনা, ৪র্থ সং, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৪১-৪২

"আমাদের এই বিশ্ব শ্রমবিভাগের নিয়মে পরিকল্পিত। একজন মানুষই সব কিছুর অধিকারী হবে—এ কথা বলা অর্থহীন। কোন একটি জাতিই যে সকল বিষয়ের অধিকারী হবে—এরূপ ভাবা আরও ভুল। তথাপি আমরা কি ছেলেমানুষ! অজ্ঞতাবশত শিশু ভেবে থাকে যে, সমগ্র জগতে তার পুতুলের মতো কাম্য আর কিছুই নেই। যে-জাতি জড়শক্তিতে বড়, সে ভাবে জড়বস্তুই একমাত্র কাম্য, উন্নতি বা সভ্যতা বলতে জড়শক্তির অধিকারই বুঝায়; আর যদি এমন কোন জাতি থাকে, যাদের ঐ শক্তি নেই বা যারা ঐ শক্তি চায় না, তারা নগণ্য—তারা বেঁচে থাকার অযোগ্য, তাদের সমগ্র অস্তিত্বই নিরর্থক।

"অন্যদিকে আর এক জাতি ভাবতে পারে, কেবল জড়বাদী সভ্যতা সম্পূর্ণ নিরর্থক। প্রাচ্যদেশ হতে উত্থিত বাণী একদা সমগ্র জগৎকে বলেছিল ঃ 'যদি কোন ব্যক্তি বিশ্বের সব কিছু অধিকার করে অথচ তার আধ্যাত্মিকতা না থাকে, তবে তাতে কি সার্থকতা? এটি প্রাচ্য ভাব, অপরটি পাশ্চাত্য।'

"এই উভয় ভাবেরই মহত্ত্ব আছে, উভয় ভাবেরই গৌরব আছে। বর্তমান সমন্বয়ে এই উভয় আদর্শের সামঞ্জস্য, উভয় আদর্শের মিলন হবে। পাশ্চাত্য জাতির নিকট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ যেমন সত্য, প্রাচ্য জাতির নিকট আধ্যাত্মিক জগৎ তেমনি সত্য। প্রাচ্য জাতি যা কিছু চায় বা আশা করে, যা থাকলে জীবনটাকে সত্য বলে বোধ হয়, আধ্যাত্মিক স্তরেই সে তা পেয়ে থাকে। পাশ্চাত্য জাতির চোখে সে স্বপ্নমুগ্ধ; প্রাচ্য জাতির নিকট পাশ্চাত্যও সেইরূপ স্বপ্নমুগ্ধ বলে প্রতীয়মান হয়—পাঁচ মিনিটও যা স্থায়ী নহে, এমন পুতুল নিয়ে সে খেলা করছে! আর যে মুষ্টিমেয় জড়বস্তুকে শীঘ্র বা বিলম্বে পরিত্যাগ করে যেতে হবে, তাকেই বয়স্ক নরনারীগণ এত বড় মনে করে—এই চিন্তা করে প্রাচ্য হাসছে। একে অন্যকে স্বপ্নবিলাসী বলে থাকে।

"কিন্তু পাশ্চাত্য আদর্শ মানবজাতির উন্নতির পক্ষে যেমন আবশ্যক, প্রাচ্য আদর্শও সেইরূপ; আর আমার বোধ হয়, পাশ্চাত্য আদর্শ অপেক্ষা ওটি অধিক প্রয়োজনীয়। যন্ত্র কখনই মানবকে সুখী করেনি, কখনই করবেও না। যে আমাদিগকে বিশ্বাস করাতে চায় যে, যন্ত্র আমাদিগকে সুখী করবে, সে জোর করে বলে যন্ত্রেই সুখ আছে; কিন্তু সুখ চিরকালই মনেই বর্তমান। যে মনের উপর প্রভুত্ব করতে পারে সে-ই কেবল সুখী হতে পারে, অপরে নহে। আর এই যন্ত্রের শক্তিই বা কি? যে ব্যক্তি তারের মধ্য দিয়া তড়িৎপ্রবাহ প্রেরণ করতে পারে, তাকে খুব মহৎ ও বুদ্ধিমান বলব কেন? প্রকৃতি কি প্রতি মুহূর্তে

এর থেকে লক্ষগুণ অধিক তড়িৎপ্রবাহ প্রেরণ করছে না? তবে প্রকৃতির পদতলে নত হয়ে তারই উপাসনা কর না কেন? যদি সমগ্র জগতের ওপর তোমার শক্তি বিস্তৃত হয়, যদি তুমি জগতের প্রত্যেকটি পরমাণুকে বশীভূত করতে পারো, তা হলে বা কি এসে যায়? যতদিন মানুষ তার নিজের ভিতর সুখী হবার শক্তি অর্জন না করে, এবং নিজেকে জয় করতে সমর্থ না হয়, ততদিন সে সুখী হতে পারবে না।

"এটা সত্য যে, মানুষ প্রকৃতিকে জয় করবার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছে; কিন্তু পাশ্চাত্য জাতি 'প্রকৃতি' শব্দে কেবল জড় বা বাহ্য প্রকৃতিকেই বুঝে থাকে। এটা সত্য যে, নদী-শৈল-সাগর-সমন্বিতা নানা শক্তি ও ভাবমণ্ডিতা বাহ্য প্রকৃতি অতি মহৎ। কিন্তু তা অপেক্ষাও মহত্তর মানবের অন্তঃপ্রকৃতি—সূর্য-চন্দ্র-তারকা, পৃথিবী তথা সমগ্র জড়জগৎ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনের ঊর্ধ্বে এই অন্তঃপ্রকৃতি আমাদের গবেষণার অন্যতম ক্ষেত্র। পাশ্চাত্য জাতি যেমন বহির্জগতের গবেষণায় প্রাধান্য লাভ করেছে, প্রাচ্য জাতি তেমনি এই অন্তর্জগতের গবেষণায় শ্রেষ্ঠতা লাভ করেছে। অতএব এটাই সঙ্গত যে, যখন আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্যের প্রয়োজন হয়, তখন প্রাচ্য হতেই হয়ে থাকে। এরূপ হওয়াই সঙ্গত। আবার যখন প্রাচ্য জাতি যন্ত্রনির্মাণ শিক্ষা করতে ইচ্ছা করে, তখন তাকে যে পাশ্চাত্য জাতির পদতলে বসে তা শিখতে হবে, এটাও সঙ্গত। পাশ্চাত্য জাতির যখন আত্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব ও ব্রহ্মাণ্ডরহস্য শিখবার প্রয়োজন হবে, তখন তাকেও প্রাচ্যের পদতলে বসে শিক্ষা করতে হবে।

"আমি তোমাদের নিকট এমন এক ব্যক্তির জীবনকথা বলতে যাচ্ছি, যিনি ভারতে এইরূপ এক তরঙ্গ প্রবাহিত করেছেন।"

এরপর, শ্রীরামকৃষ্ণের অসামান্য জীবনকথা বিবৃত করে স্বামীজী উপসংহার করেছেন এইভাবে[১] ঃ

"বর্তমান জগতের সমক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘোষণা এই ঃ মতামত, সম্প্রদায়, গির্জা বা মন্দিরের অপেক্ষা রেখো না। প্রত্যেক মানুষের ভেতরে যে সারবস্তু অর্থাৎ ধর্ম রয়েছে, তার সঙ্গে তুলনায় এগুলো তুচ্ছ; আর যতই এই ভাব মানুষের মধ্যে বিকাশপ্রাপ্ত হয়, ততই তার ভেতর জগতের কল্যাণ করবার শক্তি এসে থাকে। প্রথমে এই ধর্মধন উপার্জন কর, কারোর ওপর দোষারোপ করো না, কারণ সকল মত—সকল পথই ভাল। তোমাদের জীবন দিয়ে দেখাও

১ বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৬২-৬৩

যে, 'ধর্ম' অর্থে কেবল শব্দ বা নাম বা সম্প্রদায় বুঝায় না, তার অর্থ আধ্যাত্মিক অনুভূতি। যারা অনুভব করেছে, তারাই ঠিক ঠিক বুঝতে পারে। যারা নিজেরা ধর্মলাভ করেছে, কেবল তারাই অপরের ভিতর ধর্মভাব সঞ্চার করতে পারে, তারাই মানবজাতির শ্রেষ্ঠ আচার্য হতে পারে—তারাই কেবল জগতে জ্ঞানের শক্তি সঞ্চার করতে পারে।

"তা হলে তোমরা এরূপ হও! কোন দেশে—এইরূপ ব্যক্তির যতই অভ্যুদয় হবে, সেই দেশ ততই উন্নত হবে। আর যে দেশে এরূপ লোক একেবারে নেই, সে দেশের পতন অনিবার্য, কিছুতেই তার উদ্ধারের আশা নেই। অতএব মানবজাতির নিকট মদীয় আচার্যদেবের উপদেশ এই ঃ 'প্রথমে নিজে ধার্মিক হও এবং সত্য উপলব্ধি কর।' আর তিনি সকল দেশের দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ যুবকগণকে সম্বোধন করে বলছেন, 'তোমাদের ত্যাগের সময় এসেছে!' তিনি চান, তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃস্বরূপ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ কর। তিনি চান, তোমরা মুখে কেবল 'ভাইকে ভালবাসি' না বলে, তোমাদের কথা যে সত্য, তা প্রমাণ করবার জন্য কাজে লেগে যাও। যুবকগণের নিকট এখন এই আহ্বান এসেছে, 'কাজ কর, ঝাঁপিয়ে পড়ো, ত্যাগী হয়ে জগৎকে উদ্ধার কর।'

"ত্যাগ ও প্রত্যক্ষানুভূতির সময় এসেছে। জগতের বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে সামঞ্জস্য আছে, তা দেখতে পাবে; বুঝবে—বিবাদের কোন প্রয়োজন নেই এবং তখনই সমগ্র মানবজাতির সেবা করতে পারবে। মদীয় আচার্যদেবের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল—সকল ধর্মের মূলে যে ঐক্য রয়েছে, তা ঘোষণা করা। অন্যান্য আচার্যেরা বিশেষ বিশেষ ধর্ম প্রচার করেছেন, সেইগুলি তাঁদের নিজ নিজ নামে পরিচিত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর এই মহান আচার্য নিজের জন্য কিছুই দাবি করেন নাই। তিনি কোন ধর্মের উপর কোনরূপ আক্রমণ করেন নাই, কারণ তিনি সত্য সত্যই উপলব্ধি করেছিলেন যে, ঐ ধর্মগুলি এক সনাতন ধর্মেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র।"

ভারতীয় ধারণায় *শ্রুতি* ও *স্মৃতি*

উপনিষদের মতো এইসব প্রাচীন গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, আধুনিক কালে যেসব মহাত্মার জন্ম হয়েছে, তাঁদের ভাবনার সঙ্গে এইসব গ্রন্থরাজির কত সামঞ্জস্য রয়েছে। আসলে, একটা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে।

এই যে নতুন সামঞ্জস্যবিধান, তা বস্তুত সেই প্রাচীন সামঞ্জস্যবিধানই; কেবল সেটি ঘটছে আধুনিক পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে। ভারত বারেবারে এই শিক্ষাই লাভ করেছে। অবস্থা বদলায়; আমাদের দরকার হয় প্রাচীন সত্যের পুনরুপলব্ধি—নতুন ভাবে। সত্য একই থাকে, বদলায় শুধু তার বহিরঙ্গ। আমাদের অতিপ্রাচীন ধারাবাহিক ঐতিহ্য থেকে পরম্পরাক্রমে আমরা এই বোধে উপনীত হই। দুটি শব্দ আছেঃ *শ্রুতি* ও *স্মৃতি*। *শ্রুতির* অর্থ 'বেদ', বিশেষত তার উপনিষদ্ অংশসমূহ—যেখানে রয়েছে শাশ্বত সত্যের প্রসঙ্গ; আর *স্মৃতিগুলিতে* আছে সমসাময়িক সামাজিক বিধিনিষেধের উল্লেখ ও আলোচনা। *স্মৃতির* স্থান *শ্রুতির* নিচে। ভারতীয় ঐতিহ্যে এই ভাবটির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছেঃ *শ্রুতি স্মৃতি বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী*—শ্রুতি ও *স্মৃতির* মধ্যে বিরোধস্থলে শ্রুতির প্রামাণিকতাই গুরুত্ব পাবে। *শ্রুতি* হলো চিরন্তন, শাশ্বত। 'সনাতন ধর্ম' বলতে শ্রুতিকে বোঝায়—যেখানে রয়েছে মানুষের স্বরূপ, ঈশ্বরের স্বরূপ, আধ্যাত্মিক অনুভূতিলাভের উপায়—এইসব চিরন্তন সত্যের কথা। এগুলি আমাদের জন্য সত্য, সত্য আমেরিকানদের জন্য, সত্য সকলের জন্য। এগুলি সর্বজনীন সত্য। বিজ্ঞানের সত্যসমূহ যেমন সর্বজনীন, শ্রুতির সত্যও তেমনি সর্বজনীন, কারণ এগুলি এসেছে এমন এক বিজ্ঞান থেকে, যা মানুষকে চর্চা করে তার অন্তর্লীন গভীরতা থেকে; যা মানবীয় সম্ভাবনার বিজ্ঞান। একেই আমরা বলি *সনাতন ধর্ম*; *'সনাতন'* অর্থে যা চিরস্থায়ী, শাশ্বত। ভগবান বুদ্ধ তাঁর উপদেশে বারেবারে এর উল্লেখ করেছেনঃ "এষ *ধর্মঃ সনাতনঃ*"—এই ধর্ম সনাতন বা নিত্য। এর সঙ্গে আসে *যুগধর্ম*—যা কোন বিশেষ যুগ বা সময়কালের, ইতিহাসের কোন বিশেষ পর্বের, কোন বিশেষ শ্রেণীর ধর্ম। এরই নাম *স্মৃতি*।

স্মৃতিগুলি আসে, যায়। ভারতবর্ষে কতগুলি স্মৃতি প্রণীত ও বর্জিত হয়েছিল? আজ পুরনো স্মৃতিগুলি যদি আমাদের জাতীয় গণতান্ত্রিক সংবিধানের পরিপন্থী হয়, তবে তাদের সবগুলিকে পরিহার করা হয়। পুরনো স্মৃতিকে বদলে সমসাময়িক চিন্তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন স্মৃতি গড়ে নেওয়ার সৎসাহস আমাদের আছে। ভারতবর্ষে আছে এই এক মহান ভাবনাঃ 'সামাজিক পরিবর্তন'। এবং সেইসঙ্গে এখানে শাশ্বত শিক্ষাগুলিকে পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুসারে নবরূপে উপস্থাপন করা হয়। তার জন্য প্রয়োজন মহান আচার্যবৃন্দের, কারণ তাঁদের এটি করার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও অধিকার আছে। সেই অধিকার কিন্তু বিশপ, পোপ, পুরোহিত বা ঐরকম কোন প্রথাগত ধর্মীয়

পদাধিকারীর প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদা থেকে আসে না। সে অধিকার আসে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি থেকে; সে অধিকার উৎসারিত হয় একজন প্রকৃত আধ্যাত্মিক আচার্যের অন্তরের অসীম করুণা থেকে। এইভাবেই সৃষ্টি হয় নতুন স্মৃতিসমূহের। ভারতবর্ষ দৃঢ়ভাবে এই আদর্শকে আঁকড়ে থেকেছে। ফল হয়েছে—বৈদিক যুগ থেকে এই আধুনিক যুগ পর্যন্ত বহুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে আমাদের ধর্মে, আমাদের সমাজে, আমাদের দেশে; অথচ আমরা রয়ে গেছি সেই একইরকম। *আমরা শাশ্বত অথচ নিয়ত পরিবর্তনশীল।* 'সনাতন ধর্ম' কথাটির এটুকুই হলো সংক্ষিপ্ত মর্ম।

অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ছিলেন কলেজে বিবেকানন্দের সহপাঠী এবং মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তীক্ষ্ণ মেধা ছিল তাঁর। তিনি বলেছেন ঃ "ভারতের বয়স ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, কিন্তু ভারত কখনো বুড়িয়ে যাচ্ছে না।" ("India is ever ageing, but never old."), এর কারণ হলো, এখানে বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রয়োজনমতো সামঞ্জস্যবিধানের কাজ হয়ে থাকে। এ হলো সেই ভারতবর্ষ, যা আজ নতুন পরিবেশে নব রূপ পরিগ্রহ করছে—নিজের অঙ্গে প্রয়োজনমতো পরিবর্তন সাধন করে চলেছে। অনেক অপ্রয়োজনীয় রীতিনীতি, বিধিবিধান সব কাটছাঁট করে বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। *স্মৃতিকে পরিবর্তন করার—তা-ও আবার শান্তিপূর্ণভাবে—এই যে সৎসাহস, সেটাই হলে নিছক হিন্দু ঐতিহ্যই।* অন্য কোন ধর্ম সে সৎসাহস দেখায়নি। অন্য সব ধর্মে *স্মৃতিগুলিই* সব; তাদের ছোঁওয়া যায় না, এবং কোন সংস্কারক ওগুলিকে পরিবর্তন করতে গেলে তাকে যথেষ্ট নির্যাতন করে হত্যা করা হয়। কিন্তু আমরা বলি—কোন *স্মৃতি* সেকেলে বা অচল হয়ে গিয়ে থাকলে তাকে বদলে নতুন স্মৃতি তৈরি করে নাও। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং বলতেন, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনে মোগল আমলের মুদ্রা চলে না। তার অর্থ, আধুনিক কালে পুরনো *স্মৃতিগুলির* কোন মূল্য নেই। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে নতুন মুদ্রার প্রয়োজন হয়েছিল; ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে আবার প্রয়োজন হয়েছিল নতুন আরেকটির। প্রায় একশ বছর আগে কেউ বিদেশে গেলে ভারতীয় সমাজ তাকে একঘরে করে দিত। কিন্তু আজ আর কে এর তোয়াক্কা করে?

পরিবর্তন অনেক এসেছে; সেগুলি আমাদের ধর্মকে করেছে পরিশুদ্ধ, সমাজকে করেছে স্বাস্থ্যবান। কিন্তু ভুললে চলবে না শ্রুতিকে, সনাতন সত্যকে, মানুষের আধ্যাত্মিক স্বরূপকে এবং সেই সত্য উপলব্ধির পথে জীবনের

অভিযাত্রাকে। এ-ই হলো *সনাতন ধর্ম*। *অবতার* এটির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, এবং সেটিই তাঁর মহৎ অবদান। যিনি শুধুমাত্র একজন সমাজনেতা, তিনি আসেন, মত প্রচার করেন এবং সমাজের কিছু কিছু সংস্কার সাধন করে যান। কিন্তু একজন *অবতার* সমাজকে মোটেই অস্থির করে তোলেন না। সমাজে তিনি প্রচলন করে দিয়ে যান একটি নতুন মূল্যবোধ-ব্যবস্থার; তার সাহায্যে আমরা ভাল-মন্দ বুঝতে পারি, সংস্কার সাধিত হয় এবং সেই অনুসারে আমরা পরিবর্তিত হতে থাকি—নীরবে নিঃশব্দে। এই মৃদু, নিঃশব্দ ভাবেই এই মহান আধ্যাত্মিক পদ্ধতি সমাজের ওপর কাজ করতে থাকে। এটি একটি মহান ভাব। বরণীয় সেই আচার্য যে এসেছেন এবং চলে গেছেন—তা আমরা জানতে পারি না। কিন্তু তিনি রেখে গেছেন অসামান্য এক শক্তি। মাত্র কদিন আগে আমি বহুদূরের দেশ বুলগেরিয়ার সোফিয়া শহর থেকে একটি চিঠি পেয়েছি। দারুণ চিঠি। আলেকজাণ্ডার নামে এক ভদ্রলোক লিখছেন; তিনি বলছেন ঃ "আমার স্ত্রী এবং আমি The Gospel of Sri Ramakrishna (অর্থাৎ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত'-এর ইংরেজি অনুবাদ) পড়ছি। আমার বয়স তিরিশ বছর, স্ত্রীর তেইশ। ওঁর নাম তাম্ভিয়া, আমার আলেকজাণ্ডার। বইটি অসাধারণ। আমরা কিন্তু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আর বেশি কিছু জানি না। আমরা চাইছি, আপনি আমাদের আরো কিছু তথ্য দিন। আমি ব্যাঙ্গালোরে বিখ্যাত চলচ্চিত্র-অভিনেত্রী দেবিকারানীর কাছে লিখেছিলাম। উত্তরে তিনি আমাকে জানিয়েছেন, হায়দ্রাবাদের স্বামীজীর কাছে চিঠি লিখতে।" ভদ্রলোক লিখছেন যে, তিনি আরো জানতে চান শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে, বিবেকানন্দ সম্বন্ধে। এইসব অনুপ্রেরণা লাভ করতে তাঁরা এতটাই ব্যগ্র। তাই আমি লিখলাম ঃ "আমি আপনাকে কয়েকটি বই পাঠিয়ে দেব।" এবং পশ্চিম বার্লিনে একজনকে বললাম বইগুলি ওঁদের পাঠাতে। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো মহান আচার্যরা মানুষের জীবনে প্রবেশ করেন নিঃশব্দে, বিনা কোলাহলে, এবং পাঠকের মধ্যে ঘটতে শুরু করে পরিবর্তন। *অবতার* যখন আসেন, তখন এমনটাই ঘটে। শঙ্করাচার্য এই ধারণাটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন—কিভাবে একজন অবতার সমাজে কর্ম করেন এবং মানুষকে তাদের নিজ নিজ আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে স্থাপন করে ধীরস্থিরভাবে সমাজের রূপান্তরসাধন করেন। কিভাবে তিনি তা করেন? শঙ্করাচার্য মাত্র কয়েকটি বাক্যে এটিকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাই সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করব।

শঙ্করাচার্য-কৃত গীতার ভূমিকা অধ্যয়ন করার সময় আমরা দুটি মহান ভাবের কথা পেয়েছি। এক—সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আচার-আচরণের

পরিবর্তনের দরুন সমাজ অধোগতিপ্রাপ্ত হয়। অত্যধিক লোভ, ক্রোধ এবং ঐজাতীয় অন্যান্য মানসিকতার প্রকাশ দেখা যায়; তারা সমাজের নৈতিক সুস্থিতিকে বিক্ষিপ্ত করে। অতএব, শঙ্করাচার্যের কথায়, ধর্মের অবনতি এবং অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়। উদগ্র ইন্দ্রিয়পরায়ণতা এবং অদম্য কামনাবাসনা বৃদ্ধির ফলে পতনের সূত্রপাত হয়; ফলে ধ্বংস হয় *বিবেক* ও *বিজ্ঞান*। *বিবেক* বলতে বিচার—কি করা উচিত আর কি নয়, তা বিচার করার ক্ষমতা। কোনকিছুর প্রতি অত্যধিক আসক্তি দেখা দিলেই আমাদের সদসৎ বিচারবুদ্ধি ক্ষীণ হতে থাকে। এর সঙ্গেই ব্যাহত হয় *বিজ্ঞান* বা *প্রজ্ঞা*। মানুষ তার ইন্দ্রিয়জ ক্ষুধা সংযত করতে না পারলেই তার মনোজগতে কিছু একটা ঘটে যায়। ইন্দ্রিয়রা এদিক ওদিক ছোটে—*কঠ* উপনিষদের ভাষায় বলতে গেলে—যেমন লাগাম ছাড়া ঘোড়াগুলো গাড়িকে এদিক ওদিক নিয়ে চলে, আর আরোহী হয়ে পড়ে তার অসহায় বলি। মানুষ ও তার সমাজ যখন অধঃপতনের পথে এগোয়, তখন তাদের অবস্থাও হয় এইরকম। ধর্মের গ্লানি হলে স্বাভাবিকভাবেই বাড়ে অধর্ম। নৈতিকতা কম থাকলে মানবসমাজে বাড়ে অনৈতিকতা।

মানবীয় ক্রমবিকাশ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে অবতারের ভূমিকা

ভারতবর্ষে আমাদের অসামান্য এক দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, যখনি এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে সাধারণ মানবীয় প্রজ্ঞা পূর্বের সমতা ফিরিয়ে আনতে অক্ষম হয়ে পড়ে, তখনি পৃথিবীতে এক দৈবী সত্তার আবির্ভাব ঘটে। তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ লাভ করতে আরম্ভ করে এক নতুন ভারসাম্য অবস্থা, মূল্যবোধের এক নবতর উপলব্ধি। ধর্মের হয় উত্থান এবং অধর্মের অবসান। ঠিক এই কারণটির জন্যই আমাদের দেশে নিরন্তর নানা সমস্যা লেগে থাকলেও আমরা বেঁচে আছি বিগত ৫,০০০ বছর ধরে। বুদ্ধের জন্মের আগে এদেশে ছিল বুদ্ধিবাদ সর্বস্বতা আর ব্যক্তিজীবনে ছিল অর্থহীন ধর্মীয় কৃচ্ছ্রতা। সাধারণ মানুষ বেঁচে থাকত নানারকম কুসংস্কার ও মানসিক দুর্বলতা নিয়ে। তারপর বুদ্ধ এলেন খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম বা ষষ্ঠ শতকে। তিনি কোন সমাজসংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটালেন না। তিনি শুধু মানুষের আধ্যাত্মিক আবেগ-অনুভূতিগুলিকে উদ্দীপিত করে দিলেন। ফলে মানুষের মধ্যে আবার জেগে উঠল সততা, বিশ্বাসযোগ্যতা, করুণা ও সেবাপরায়ণতা। এগুলিই মানুষের আধ্যাত্মিক সচেতনতার পরিণাম। মহান আচার্যরা কাজ করেন এইভাবেই, এবং এমন মহান মানুষদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে এইভাবেই জন্ম হয়

বড় বড় সংস্কার আন্দোলনের। এটি কেবল গাছের শাখাপ্রশাখা ও ডালপাতায় জল না দিয়ে গোড়ায় জল দেওয়ার মতো ব্যাপার।

এইসব মহৎ মানুষ কোন সংস্কার আন্দোলন শুরু করে দেন না, কারণ এইসব আন্দোলন সমাজের বা মানুষের মূল ব্যাধিটিকে নিয়ে কাজ করে না। উদাহরণস্বরূপ, শ্রীরামকৃষ্ণ কোন সংস্কার আন্দোলন শুরু করেননি; কিন্তু তাঁর অনুপ্রেরণায় জন্ম নেবে অনেক সংস্কার আন্দোলন; আসবেন কত সাধুসন্ত, শিল্পী প্রভৃতি। তাঁর আগমনের মাধ্যমে মানবসমাজকে প্রদান করা হলো এক মৌলিক আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা। আমাদের দেশে এটিই ঘটেছে বারেবারে। ভারতবর্ষ অধোগতি দেখেছে, আবার দেখেছে পুনরুত্থান ও পুনর্গঠন। কোন জাতি বহুদিন বেঁচে থাকলে প্রায়ই তার এই ধরনের শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি দেখা দেয়, কিন্তু জাতি আবার নবীন হয়ে ওঠে। এই অভিজ্ঞতার নিরিখে ভারতবর্ষ অদ্বিতীয় এবং বহু ঐতিহাসিকই এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

পৃথিবীতে উৎপত্তি হয়েছে আরো অনেক সভ্যতার, তারা তাদের ভূমিকা পালন করেছে কয়েক শতক ধরে; তারপর শুরু হয়েছে পতন এবং অবশেষে এসেছে মৃত্যু। সেসব সভ্যতার চর্চা এখন আমরা করি কেবল গ্রন্থ মধ্যে ও প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালায়। আমাদের নিজেদের সভ্যতার কিন্তু রয়েছে একটি ধারাবাহিকতা। ক্ষণেক্ষণেই এই সভ্যতা হয়ে ওঠে নতুনভাবে উজ্জীবিত, তার দেহে আসে নবযৌবনদীপ্তি, আসে প্রচণ্ড শক্তি এবং তার অবস্থার উন্নতি ঘটতে আরম্ভ করে। শুরু হয় একটি নতুন *যুগের* এবং মানুষের মধ্যে আসে সমুচ্চ নৈতিক সচেতনতা, মানবিক আবেগ ও সেবার মনোভাব।

এডওয়ার্ড গিবনের The Decline and Fall of the Roman Empire 'দি ডিক্লাইন অ্যাণ্ড ফল অফ দি রোমান এম্পায়ার' ('রোম সাম্রাজ্যের ক্রমাবনতি ও পতন') বইটি পড়লে আমরা জানতে পারি, রোমান সাম্রাজ্য ছিল কী বিপুল শক্তিমান! রোমানদের অধীনে ছিল পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, দক্ষিণ ইউরোপ এবং উত্তর আফ্রিকা—প্যালেস্টাইন ও ইসরায়েল। ধীরে ধীরে এসে গেল অবনতি। কী ছিল তার স্বরূপ? কী করেই বা এল তা? জাতিটা সেই একই ছিল, লোকজন ছিল বুদ্ধিমান, কিন্তু বেড়েছিল তাদের সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা। লোকেরা চাইল না শ্রমসাধ্য কাজ করতে, কিংবা পরিশ্রমের জীবনযাপন করতে। প্রত্যেকে চাইল মুনাফা ও সম্ভোগ; সমাজকল্যাণে কাজ করতে উৎসাহী রইল খুব অল্প সংখ্যক লোকই। এই করে রোমানরা অলস হয়ে পড়ল; তারা কেবল সুখের

সন্ধান করল, আর কায়িক শ্রমের কাজগুলো করাল ক্রীতদাসদের দিয়ে। সুখ আর ভোগের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচিবোধ বিকৃত হয়ে গেল; তারা পারস্পরিক হিংসায় এবং উদ্দাম আমোদ-আহ্লাদে মত্ত হয়ে পড়ল। তাদের amphitheatre (অ্যাম্ফিথিয়েটার) নামক 'ক্রমোন্নত আসন শ্রেণী গোলাকার মঞ্চ-বিশিষ্ট প্রেক্ষাগৃহগুলোতে হিংস্র জানোয়ারদের সঙ্গে লড়াই করতে নামিয়ে দেওয়া হতো ক্রীতদাসদের; উচ্চপদস্থ সরকারি কর্তাব্যক্তিগণ ও হাজার হাজার লোক দেখত সে দৃশ্য, আর যখন একটা সিংহ একটা মানুষকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলত, তখন তারা হর্ষধ্বনি করত। এইসব পরিস্থিতিতে সুরুচি ও মানবিক মূল্যবোধের অধোগমন লক্ষ্য করা যায়। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, সে সময়ে লোকে বুঝতে পারেনি যে পতন শুরু হয়েছে; কারণ পতন এসেছিল ধীরগতিতে। সভ্যতা গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে, পড়েও ধীরে ধীরে। শত বছর কেটে যাওয়ার পরেই কেবল লোকে বুঝতে পারে যে, সমাজজীবনে কোথাও কোন ত্রুটি ঘটেছে। রোমান সাম্রাজ্যে ধর্মের অবস্থাটাও গিবন উল্লেখ করেছেন দারুণ একটি বাক্যের মাধ্যমে। রোমান সাম্রাজ্যে সব ধর্মীয় সম্প্রদায় ও ধর্মমতকে সাধারণ মানুষ সমান সত্য বলে বিশ্বাস করতেন, দার্শনিকরা ভাবতেন সেগুলো সমভাবেই মিথ্যা আর বিচারকরা ভাবতেন সমভাবেই ব্যবহারোপযোগী বলে! গ্রন্থের শিরোনামটি— The Decline of the Roman Empire 'রোম সাম্রাজ্যের পতন' খুবই ইঙ্গিতপ্রদ। সেদেশের লোক তখন অনৈতিক জীবন যাপন করত। যখন বিদেশী আক্রমণকারীরা এল, তখন যুবসম্প্রদায় যুদ্ধ করে সাম্রাজ্য রক্ষা করতে চাইল না। যুদ্ধ করার জন্য তারা রেখে দিয়েছিল ভাড়াটে সৈন্যদল।

আমরা আরাম চাই, চাই সুখ। নাইট ক্লাব ছেড়ে কেউ সমরাঙ্গনে যেতে চায় না। এই অধোগতি যখন সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশের লোকেদের আক্রমণ করে, তখন গোটা কাঠামোটাই ভেঙে পড়ে। একটিমাত্র বৈদেশিক আক্রমণে গোটা রোমান সমাজ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল; আর উঠল না। এই হলো রোমান সাম্রাজ্যের কাহিনী। ইজিপ্ট (মিশর), ব্যাবিলোনিয়া, আসিরিয়া প্রভৃতি অন্য অনেক সাম্রাজ্যও একই রকম পতন পর্বের মধ্য দিয়ে গেছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ইউরোপের অনেক চিন্তাবিদ সবিস্ময়ে ভাবতে থাকেন, ইউরোপও এমনই একটা পর্বের মধ্য দিয়ে চলছিল কিনা। ইউরোপীয় সভ্যতা নিয়ে ইউরোপে বিংশ শতকে প্রথম যে বইটি প্রকাশিত হয়, তার নাম *'The Decline of the West'* (পাশ্চাত্যের পতন); লেখক জার্মান দার্শনিক-পণ্ডিত

অসওয়াল স্পেংলার (১৮৮০-১৯৩৬)। গ্রন্থটিতে খুব জোরালো ভাষায় লেখক বলেছিলেন, পাশ্চাত্য সমাজ তার দায়িত্ব পালন করে ফেলেছে; এখন সে পতনের পথে। কিন্তু 'In Defence of the West' (পাশ্চাত্যের সমর্থনে) গ্রন্থের লেখক ফ্রান্সের হেনরি ম্যাশো-এর মতো কিছু রক্ষণশীল ব্যক্তি সেকথা মানেননি; তাঁদের মনে হয়েছিল যে তাঁরা তখনো যথেষ্ট শক্তিশালী, কারণ তাঁদের অধীনে ছিল অনেকগুলি উপনিবেশ। তারপর এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ—যা ছিল আরো সাঙ্ঘাতিক; এবং এখন পাশ্চাত্যে অনেক চিন্তা করা হচ্ছে তাদের সংস্কৃতিতে সম্ভাব্য খামতির প্রসঙ্গ নিয়ে। অত্যধিক সংস্কারহীন বস্তুতান্ত্রিকতা এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদা আসলে এক উৎকট সমাজ-সমস্যার ইঙ্গিত। এইসব কারণে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার পতন নিয়ে আরো নতুন নতুন গ্রন্থ লিখিত হয়ে চলেছে।

আমেরিকা কি পতনের পথে আর কিভাবে তা এড়ানো সম্ভব?

১৯৭১-১৯৭২ সালে গোটা আমেরিকা পরিভ্রমণকালে আমার হাতে এল ১৯ জুলাই ১৯৭১-তারিখের 'Time' পত্রিকাখানি (একটি আমেরিকান সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্রিকা), যার 'American Notes' শীর্ষক বিভাগে 'Of the U.S. and Rome'—এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল এই প্রতিবেদনটি ঃ ভাবতে অবাক লাগে যে, এখনও কিভাবে সেই রোম পররাজ্যের ব্যাপারে মাথা গলানোর প্রশ্নে মার্কিন কল্পনাশক্তিকে উসকে যাচ্ছে আর ঠাণ্ডা লড়াইয়ের জঙ্গীবাজগুলো সারাবিশ্বে কিধরনের নিয়মতান্ত্রিকতা প্রতিষ্ঠা করা আমেরিকার অবশ্য কর্তব্য সে বিষয়ে সেই প্রাচীন সভ্যতার নজির তুলে ধরছে। অন্যদিকে, রোমের প্রসঙ্গ তুলছে তারাও—যারা পশ্চিমের পতন লক্ষ্য করছে প্রত্যেক হিপির মস্তকে এবং গাঁজাখোরদের প্রতিটি গাঁজার ধোঁয়ায়। ক্যানসাস শহরে উত্তর-পশ্চিম সংবাদ-সম্পাদকের কাছে কথা বলার সময় প্রেসিডেণ্ট নিক্সন ওয়াশিংটনে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারি দপ্তরের ইমারতগুলির উল্লেখ করেন এবং বলেন ঃ

'এই স্তম্ভগুলো দেখে কখনো কখনো ভাবি, যেন এদের দেখছি গ্রীসের অ্যাক্রোপলিসে[১]; দেখছি রোমের ফোরামেও[২]—বিশাল, দৈত্যকায় স্তম্ভগুলি সব; আর দু-জায়গাতেই আমি এদের পাশ দিয়ে হেঁটেছি, রাত্রে। মনে মনে ভাবি,

---

১ নগরীর দুর্গ-সমন্বিত সুরক্ষিত অংশ।

২ নাগরিক সভা-সমাবেশের স্থল।

গ্রীস আর রোমের কী ঘটেছিল... দেখুন, আজ পড়ে আছে শুধু ঐ স্তম্ভগুলো। আসলে যা ঘটেছে অবশ্য তা হলো, অতীতের বিরাট বিরাট সভ্যতাগুলো যখন সম্পদশালী হয়ে উঠেছে, যখন তাদের বেঁচে থাকার, উন্নতি করার ইচ্ছা চলে গেছে, তখন তারা অবক্ষয়ের শিকার হয়ে পড়েছে; আর তাতেই সেসব সভ্যতা একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। আমেরিকা এখন ক্রমশ সেই পর্যায়ে পৌঁছচ্ছে।'

নিশ্চিত হওয়ার জন্য নিক্সন তাড়াতাড়ি তাঁর ভরসা (বিশ্বাস) ব্যক্ত করেন এই বলে যে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য প্রয়োজনীয় 'জীবনীশক্তি, সাহস ও বল' এ-জাতির আছে। এই আশাবাদী মন্তব্য সত্ত্বেও সব মিলিয়ে ফলটি দাঁড়িয়েছিল তাৎক্ষণিক স্পেংলার-মতবাদের[১] জয়।

১৯৬৮-১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে আমার আমেরিকা সফরের সময় সেদেশের সুপরিচিত ডুড্‌ল্ (হিজিবিজি) লেখক রজার প্রাইসের একটা বই হাতে এল, যার নাম বেশ চোখে পড়ার মতো ঃ *Decline and Fall by Gibbon and Roger Price.* 'অবনতি ও পতন গিবন ও রজার প্রাইসের রচনায়'। বিখ্যাত বই 'দি ডিক্লাইন অ্যাণ্ড ফল অফ দি রোমান এম্পায়ার'-এর লেখকের নামটি যে প্রাইস তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন তার কারণ শুধু এই নয় যে, প্রাচীন রোম ও তাঁর স্বদেশ আমেরিকার অধঃপতনের মধ্যে তিনি একটি সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন, তার অন্য একটি কারণ—রোমের অধোগতি সম্বন্ধে গিবনের বই থেকে তিনি উপযুক্ত একটি অংশ উদ্ধৃত করেছেন তাঁর বইয়ের বাঁদিকের পাতায়, আর ডানদিকের পাতায় দিয়েছেন দৃষ্টান্তস্বরূপ এক চিত্র—সমসাময়িক আমেরিকান জীবন সম্বন্ধে স্বনির্বাচিত অংশ।

বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার—সাধারণভাবে ইউরোপীয়, আর বিশেষভাবে আমেরিকান সভ্যতার—একটা অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব আছে। এই পাশ্চাত্য সভ্যতার কোনরকম অবক্ষয় হলে তা হবে মানবজাতির এক বিরাট ক্ষতি। আমি নিশ্চিত যে, এই অবক্ষয় রোধ করা যাবে সংস্কৃতিগুলির পারস্পরিক আদান-প্রদান, মিলন ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে—যেমনটি ঘটে চলেছে বর্তমান ভারতবর্ষে, যেমন ভাবে আধুনিক ভারতকে বিবেকানন্দ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। আমেরিকাতেই উনিশ শতকে ঘটে গেছে Transcendentalist ('অতীন্দ্রিয়বাদী') আন্দোলন, যা আমেরিকান সংস্কৃতিকে দিতে চেয়েছে অধ্যাত্মমুখী এক দিশা। সেটিই আরো

---

১ স্পেংলারিজম—অর্থাৎ স্পেংলার (Spengler)-এর মতবাদ। —সব বড় বড় সভ্যতারই উত্থান-পতন আছে।

স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছিল র‍্যাল্ফ ওয়াল্ডো এমার্সন, হেনরি ডেভিড থোরো এবং ওয়াল্ট হুইটম্যান-এর ভাষায়। লণ্ডন ছেড়ে আমেরিকা ফিরে আসার সময় এমার্সন ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবী কার্লাইলের কাছ থেকে পেলেন একখানি গীতা—যার সম্বন্ধে আমরা বর্তমান বক্তৃতাগুলিতে আলোচনা করছি। গ্রন্থটি পেয়ে এমার্সন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধগুলি অন্যরকম ভঙ্গিতে লিখতে আরম্ভ করলেন; সেগুলিতে গীতার ভাবগুলি সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল।

'*Life of Vivekananda*'-তে রোমাঁ রোলাঁ এই মন্তব্যটি করেছেন (পৃঃ ৫২-৫৩) ঃ

"জুলাই ১৮৪৬-এ এমার্সন লিখছেন যে, থোরো তাঁকে স্বলিখিত '*A week on the Concord and Merimack Rivers*' ('কংকর্ড ও মেরিম্যাক নদীতে এক সপ্তাহ') গ্রন্থ থেকে কিছু কিছু পড়ে শোনাচ্ছেন। আসলে এই রচনাটি (পরিচ্ছদ, সোমবার) হলো গীতা এবং সেইসঙ্গে ভারতের অন্যান্য মহান কাব্য ও দর্শনের এক সোৎসাহ প্রশংসা।

"ভারতীয় চিন্তাভাবনা নিশ্চয়ই এমার্সনের মধ্যে জোরালো আবেগ সৃষ্টি করেছিল, যার জন্য ১৮৫৬-তে তিনি এক গভীরভাবপূর্ণ সুন্দর বৈদান্তিক কবিতা লিখলেন, যার নাম 'ব্রহ্ম' (তদেব, পৃঃ ৫৪) ঃ

'If the red slayer think he slays,
Or if the slain think he is slain,
They know not well the subtle ways
I keep, and pass, and turn again.

Far or forgot to me is near;
Shadow and sunlight are the same;
The vanished gods to me appear;
And one to me are shame and fame.

They reckon ill who leave me out;
When me they fly, I am the wings;
I am the doubter and the doubt,
And I the hymn the Brahmin sings.

The strong gods pine for my abode,
And pine in vain the sacred Seven;

But thou; meek lover of the good!
Find me and turn thy back on heaven.' "

(যদি রক্তাঙ্গ হন্তা ভাবে সেই-ই বুঝি মেরেছে,
যদি বা হত ব্যক্তিভাবে, হত হয়েছে সে
সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞানে নাহিক কাহারো,
আমি আসি, চলে যাই, ফিরে আসি আবারো॥

দূরস্থ বা বিস্মৃত, রয়েছে সামনে মোর,
কোন ভেদ নেই ছায়া ও আলোর।
অদৃশ্য দেবগণ মোর কাছে হন বর্তমান,
নিন্দা ও স্তুতি মোর কাছে দুইই সমান॥

মন্দ ভেবে তারা মোরে দেয় দূর করি,
আমায় যখন উড়িয়ে দেয়, ডানা মেলে উড়ি।
আমিই সংশয়, আবার সন্দিগ্ধ আমার মতি
আমিই হই ব্রাহ্মণের গাওয়া স্তুতি॥

শক্তিধর দেবতারা কাতর, আমার আশ্রয় তরে
শুদ্ধ সপ্তজন বৃথা দুঃখ করে।
কিন্তু তুমি, শান্ত সৎ তোমার প্রিয়,
স্বর্গেরে পিছনে রেখে, আমার দিকে চেয়ো॥)

আমেরিকান অতীন্দ্রিয়বাদী থোরো তাঁর বই 'ওয়াল্ডেন'-এ গীতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন এইভাবে (Walden, p 266, S.Chand & Co, New Delhi) :

"প্রাতঃকালে আমি আমার বুদ্ধিকে অবগাহন স্নান করাই ভগবদ্গীতার সুবিশাল মহাজাগতিক দর্শনে, যা রচনার পর দেবতাদের বহু বছর কেটে গেছে এবং যার তুলনায় আমাদের আধুনিক পৃথিবী ও তার সাহিত্যকে অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য বলে বোধ হয়।"

ভৌতবিজ্ঞানের ওপর ভর করে আমেরিকা কিন্তু কেবল জড়বাদেরই বিকাশ ঘটিয়ে চলেছিল। তারপর উনিশ শতকের শেষে এল বিবেকানন্দের বেদান্ত-বিজ্ঞান। শিকাগো ধর্মমহাসভায় এবং তারপর চারবছর ধরে আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের নানা জায়গায় তিনি ব্যাখ্যা করলেন মানবীয় সম্ভাবনার এই বিজ্ঞানকে, যা ঘোষণা করে প্রত্যেক মানুষের অমৃতত্বকে, তার অন্তরের দেবত্বকে।

স্বামী বিবেকানন্দ 'রাজযোগ'-এর ওপর এক বক্তৃতায় বেদান্তের এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়েছেন এইভাবে (C.W. vol-1, p.124) ঃ

"আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম। বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করে আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য। কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান—এগুলির মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায় দ্বারা এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও। এটিই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ। মতবাদ, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির বা অন্য বাহ্য ক্রিয়াকলাপ ধর্মের গৌণ অঙ্গ মাত্র।"[১]

পাশ্চাত্যে এই বাণী নানারূপে ধীরে ধীরে প্রসারলাভ করছে। আমি নিশ্চিত যে, তৃতীয় সহস্রাব্দের প্রথম শতাব্দী থেকেই ইউরোপীয় ও আমেরিকান সভ্যতাগুলির আধ্যাত্মিক মাত্রালাভের লক্ষ্যে ক্রমিক অগ্রগতি অবশ্যম্ভাবী।

সভ্যতাসমূহের অবক্ষয়-প্রক্রিয়াকেই শঙ্করাচার্য তাঁর মনোবৈজ্ঞানিক চর্চায় ঠিক ঠিক তুলে ধরেছেন ঃ *অনুষ্ঠাতৃণাং কামোদ্ভাবাৎ হীয়মান-বিবেক-বিজ্ঞান হেতুকেন।* —ভাবটি অত্যন্ত সহজ সংস্কৃতে প্রকাশ করেছেন। যখন দেখা দেয় *অনুষ্ঠাতৃণাং*, 'নাগরিকদের মধ্যে' অত্যধিক *কাম* অর্থাৎ 'কামনার' উদ্ভব ঘটে; '*কাম'* যখন একটি স্তরের ওপর চলে যায়, তখন সমাজে নানা দোষ দেখা দেয় এবং *'বিবেক ও বিজ্ঞান'*-এর অধোগতি শুরু হয়।' 'ধর্ম হয় পরাভূত'—*অভিভূয়মানে ধর্মে*—এবং 'তখন *অধর্ম* বাড়ে'—*প্রবর্ধমানে চ অধর্মে*। প্রায় সব সমাজেই পরবর্তী কালে এই অবস্থা দেখা দেয়, যদিও তারা সবাই শুরু করে ভালভাবে। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন চিন্তাবিদের লেখায়, যেমন স্পেংলার, যার উল্লেখ আগে করেছি, এমনকি আর্নল্ড টয়েনবীর লেখাতেও একটি ভাবনা ঘুরেফিরে আসে; সেটি এই যে, সংস্কৃতি হলো মানবসমাজের প্রগতিশীল দিক এবং সেটি দুর্বল হয়ে গেলে সভ্যতার শুরু হয় অধঃপতন। স্পেংলারের মতে, সভ্যতা নিজেই পতনের ইঙ্গিত বহন করে আর সংস্কৃতি হলো উন্নতির লক্ষণ। মানুষ যখন চায় আরো আরাম, আরো সুখ, দৈনন্দিন জীবনে আরো যান্ত্রিক-সুবিধা, তখন তার ইন্দ্রিয়তন্ত্র উদ্দীপিত হয়ে ওঠে; চাহিদা বাড়ে এবং সভ্যতার পতন শুরু হয়। যখন আমরা কঠোর পরিশ্রম করে জাতিগঠনের সাধনা করি, তখন আমরা থাকি—দার্শনিক ভাষায় যেমন বলা হয়—'হতে থাকা'র পর্ব; সেটিই সংস্কৃতি। আর যখন তৈরি 'হয়ে গেছে'—তখন সেটিই সভ্যতা, তা থেকেই (সাধনা শূন্য হলেই) পতনের শুরু। একজন গরিব লোক খুব খেটেখুটে একটা

১ বাণী ও রচনা ঃ ১ সং; ১ খণ্ড, পৃঃ ৩৮১

আর্থিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলল। তার ছেলেকে সংগ্রাম করতে হলো না; সে কেবল সেই সম্পদের ওপরই বেঁচে থাকে, ফলে একটা বা দুটো প্রজন্মের মধ্যেই সূচনা হয়ে যায় পতনের। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর আরামের সবরকম বন্দোবস্তের মধ্যে সংগ্রামের আর কোন প্রয়োজন থাকে না; ফলে মানুষের অন্তর্নিহিত বীরসত্তাটির তখন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যায়। সৌভাগ্য কখনো একই পরিবারে তিন বা চার পুরুষের বেশি স্থায়ী হয় না। এইভাবে সংস্কৃতি ও সভ্যতা 'হতে থাকা' ও 'হয়ে গেছে' পর্বের মধ্য দিয়ে চলে; এই হলো স্পেংলার ও অন্যান্যদের বিশ্লেষণ।

কীভাবে ভারত বহু অভিজ্ঞতা লাভ করেছে কিন্তু এড়িয়ে গেছে মৃত্যু

আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি এইসমস্ত পর্বের মধ্য দিয়ে গেছে। বৈদিক যুগের, মহান সংস্কৃতির কথাই ধরা যাক। ঐ সংস্কৃতিকে গড়ে তুলতে মানুষকে কী প্রচণ্ড সংগ্রাম ও কঠোর পরিশ্রমই না করতে হয়েছে; কত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে! তখন মানুষের মন ছিল সক্রিয়, তেজোময় ও প্রচুর প্রাণশক্তিসম্পন্ন। এটি চলেছিল মহাকাব্যের যুগ পর্যন্ত। তারপর এল বিরাট এক ধাক্কা। তিন হাজারের বেশি বছর আগের কুরুক্ষেত্রে সংঘটিত মহাভারতের যুদ্ধ ছিল ভয়ঙ্কর এক ধাক্কা! জাতির সেরা সেরা লোকগুলি হাজারে হাজারে প্রাণ দিলেন যুদ্ধে। আমাদের ইতিহাসে সেটিকে এক যুগ সন্ধিক্ষণ হিসাবে গণ্য করা হয়। কিছু পরে নতুন শক্তি এল, কিন্তু তারও আবার পতন হয়ে গেল। এইভাবে চলল—যেমন ঢেউ ওঠে আর পড়ে; কিন্তু আমাদের অনন্যতা—যার উল্লেখ আমি আগেই করেছি—তা হলে আমাদের অবক্ষয় হয়, কিন্তু আমরা কখনো বিনষ্ট হই না। কোন নতুন শক্তি আসে, আর আমরা আবার সতেজ হয়ে উঠি। উনিশ শতকে কতদূর নিচেই না আমরা নেমে গিয়েছিলাম! সে সময়ের সাহিত্য পড়লে বোঝা যায়, ভারতবর্ষে মানুষের মন অধঃপাতের কত নিচু স্তরে নেমে গিয়েছিল। নিজস্ব শক্তি, উদ্যম, সৃজনশীলতা—সব কিছু অন্তর্ধান করেছিল; জাতি হিসাবে আমরা অর্ধমৃত হয়ে গিয়েছিলাম। সেই অবস্থার মধ্য থেকে এল প্রচণ্ড এক জাগরণ; এল নতুন উদ্যোগ ও বিকাশ। কী করে সেসব ঘটল? এখানেই আসে সেই মহান ভাবটির কথা। কেবল যে একজন মহান আধ্যাত্মিক আচার্য দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয়ে মানুষকে উন্নীত করেন, তা নয়; কখনো কখনো ভাবের আন্তঃসাংস্কৃতিক আদান-প্রদানও ঘটে থাকে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আমাদের বহু অজ্ঞতাপ্রসূত ধারণা নষ্ট করার কাজে সহায়তা করেছিল। নতুন নতুন পথ

দেখিয়ে তা আমাদের আরো শক্তিশালী করে তুলেছিল। পাশ্চাত্যের মানুষ সেটা না চাইলেও ফলত এমনটাই ঘটেছিল; ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য চিন্তার অনুপ্রবেশ ও সংমিশ্রণ ঘটায়, ভারতে এল এক নবজাগরণের নবশক্তির ও নবযৌবনের প্রেরণা।

আন্তঃ-সাংস্কৃতিক ভাববিনিময়ের মাধ্যমে সংস্কৃতির অবক্ষয়রোধ

বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক ভাববিনিময় ঘটতে পারে; কিন্তু সেটিকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে এবং তাকে একটি সৃজনমুখী আন্দোলনে পরিণত করতে প্রয়োজন মহান চিন্তাবিদ্‌দের ও দূরদর্শী নেতৃবৃন্দের। উনবিংশ শতকে ভারতবর্ষ জন্ম দিয়েছিল এইরকম বহু মনীষীর। রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে সে ধারা চূড়ান্ত পর্যায়ে বিকাশলাভ করে তা রূপ নিয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত শক্তিশালী, সৃজনী, সমন্বয়ী এক আন্দোলনের। স্বামী বিবেকানন্দকে দিয়ে শুরু করে উনবিংশ শতকের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, এই জাগরণের ফলে অর্জিত হয়েছিল অসামান্য এক পরিপূর্ণতা ও বিশাল এক সম্ভাবনা—কেবল জাতীয় স্তরেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও। অতএব, শুধু পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ই যথেষ্ট নয়; সে প্রক্রিয়া থেকে উৎপন্ন শক্তিকে ব্যবহার করতে এবং তাকে যথাযথ দিশা প্রদান করতে পারা চাই। স্বামী বিবেকানন্দের সবচেয়ে বড় কাজ হলো, আমাদের ঐতিহ্যের দুর্বলকারী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন অংশগুলি বাদ দিয়ে কেবল তার শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলি নিয়ে তার সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশ থেকে যা গৃহীত হয়েছিল তার উন্নত বিষয়গুলিকে সমন্বিত করা। তিনি আমাদের বলেছিলেন, শীঘ্রই গঠিত হবে এক নতুন ভারত—যে ভারত পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সকল শক্তির সঙ্গে আমাদের আপন শক্তির সমাহার ঘটিয়ে হয়ে উঠবে অতীত ভারতবর্ষের চেয়ে অনেক বেশি মহত্তর। আধুনিক যুগে সেটিই ঘটে চলেছে ধীরে, নিঃশব্দে এবং একদিন তা বিশ্বকে চমকিত করবে। উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্যের গতিময় সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে আমাদের মধ্যে যে প্রচণ্ড জাগরণ ঘটেছিল, তার শক্তিকে স্বামী বিবেকানন্দ এইভাবেই নির্দিষ্ট এক খাতে প্রবাহিত করেছিলেন। সে সময়ে ভারতবর্ষ বিদেশী রাজনীতিক শাসনের অধীনে থাকলেও পশ্চিমের অসামান্য চিন্তাপদ্ধতির প্রভাবও আমাদের ওপর পড়েছিল; তার ফলে আমাদের নতুনভাবে চিন্তা শুরু করতে হয়েছিল। তার আগে পর্যন্ত আমরা যেন সঙ্কীর্ণ, গোষ্ঠীবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একটা খাঁজে পড়ে ছিলাম। তখনকার অবস্থাকে

বিবেকানন্দ তুলে ধরেছেন তাঁর *'কলম্বো থেকে আলমোড়া'* শীর্ষক বক্তৃতাগুলির মধ্যে। এদেশ ও তার নাড়ির স্পন্দনকে বুঝতে হলে, এবং কিভাবে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটানো যায় তা জানতে হলে এই গ্রন্থটি (বাঙলায় *'ভারতে বিবেকানন্দ'* নামে প্রকাশিত) প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের পড়া উচিত। গ্রন্থটিতে স্বামীজী বলছেন ঃ

"যেসব জিনিসের কোন মানে নেই, যেসব জিনিস আগাগোড়া অর্থহীন আজগুবী—তাদের নিয়ে পুরানো সব আলাপ-আলোচনা আর ঝগড়া-বিবাদ দূর করে ফেলে দাও। ভেবে দেখ, বিগত ছ-সাতশো বছরের অবক্ষয়ের কথা—যখন বছরের পর বছর ধরে শয়ে শয়ে বয়স্ক মানুষ মিলে আলোচনা করেছে, জলের গ্লাস ডান হাত দিয়ে ধরে খাব না বাঁ হাত দিয়ে, হাত ধোব তিনবার না চারবার, কুলকুচি করব পাঁচবার না ছবার—এইসব নিয়ে। এই ধরনের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে এবং তার ওপর সবচেয়ে জ্ঞানসমৃদ্ধ দর্শন রচনা করে যারা জীবন কাটিয়ে দেয়, তাদের কাছ থেকে আমরা কী-ই বা আশা করতে পারি?"

ব্রিটিশের সংস্পর্শে এসে এইসব অভ্যাস জোর ধাক্কা খেল। মানুষ আরেকবার ভাবতে বাধ্য হলো। প্রাচীন পণ্ডিতের সন্তানের পক্ষে হয়ে ওঠা সম্ভব হলো নোবেল-বিজয়ী সি. ভি. রমন; সম্ভব হলো আধুনিক ভৌতবিজ্ঞান অধ্যয়ন করে নবপ্রগতির পথে আপন অবদান রেখে যাওয়া। একেই বলে 'নবজাগরণ' বা মানুষের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার। ঊনবিংশ শতকে এটি ঘটেছিল এবং আজ আমরা অসাধারণ সেই ঘটনার ফসল তুলছি। এসেছে নবযৌবনদীপ্তি, এসেছে নতুন শক্তি; কিন্তু এখনো আমরা সম্পূর্ণরূপে বিপদের বাইরে নই। এখনো রয়েছে কত অশান্তি—ব্যাপক দুর্নীতি ও হিংসা; কিন্তু তাতে এটাও প্রমাণিত হয় যে, মানুষের মধ্যে আছে শক্তি—আর সেটা একটা সম্পদ। অবস্থাকে বদলানো যেতে পারে এবং এইসব মহান আচার্যগণ এসেছেন এই শক্তিকে শ্রেয়োতর আকারে রূপান্তরিত করতে। হিংসা ও অপরাধ নিয়ে তাঁরা উদ্বিগ্ন নন। তমঃ থেকে রজঃতে উত্তরণ সত্যিকারের এক উন্নতি। রজঃতে অবস্থানকালে মানুষ তার নিজের তথা সমাজের কাছে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালেও; তমঃ নামক নিষ্প্রাণতা থেকে রজঃতে পৌঁছানোটা অবশ্যই একটা উন্নতি। এর পরের ধাপে উঠতেই হবে এবং সেটা হলো সত্ত্ব—যা আসলে নিয়মানুবর্তী ও সৃজনশীল শক্তি তথা মানবোচিত শক্তির এক অসামান্য পর্যায়। কী বিস্ময়কর অবস্থাই না

তাতে গড়ে উঠতে পারে! ভারতবর্ষ এই শিক্ষা লাভ করেছে কেবল আধ্যাত্মিক আচার্যদের কাছ থেকেই নয়; তার রাজনীতিক নেতাদের কাছ থেকেও। লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক, সুভাষচন্দ্র বসু, মতিলাল নেহরু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যাপন করেছেন মহৎ জীবন। জাতির স্বার্থে তাঁরা ত্যাগ করেছেন অর্থ, ত্যাগ করেছেন শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য। উনবিংশ শতকে এবং বিংশ শতকের প্রথম দিকে এদেশে ছিলেন এমন সব উদারমনা মানুষ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মতো আধ্যাত্মিক মহাপুরুষের পাশাপাশি। গান্ধী ছিলেন প্রচণ্ড এক আধ্যাত্মিক শক্তি। ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ, যাঁর মৃত্যু হয় ১৯২৫-এ। শোনা যায়, শেষকৃত্যের জন্য তাঁর দেহ বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন গান্ধীজী স্বয়ং। চিত্তরঞ্জন ছিলেন একজন দরিদ্র মানুষ। তিনি আইন পড়েছিলেন ও নিজের আইন-ব্যবসা থেকে ভালই রোজগার করেছিলেন। তাঁর বাবা নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করে দারিদ্র্যের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন তাঁর রোজগারের অর্থ দিয়ে প্রথমেই সব ঋণ পরিশোধ করে তাঁর মৃত পিতার নাম দেউলিয়া-তালিকা থেকে অপসারণের ব্যবস্থা করলেন। এই কাজের মধ্যে দিয়েই আমরা পাই তাঁর মানব-মনের মহত্ত্বের পরিচয়। পিতা মৃত, অতএব চিত্তরঞ্জন বাবার সব ঋণ অস্বীকার করতে পারতেন; কিন্তু তাঁর কাছে টাকার চেয়েও মূল্যবান ছিল সম্মান। আজ আমরা সেই চরিত্র হারিয়েছি। আজ টাকাই সব; সম্মানের কোন গুরুত্ব নেই। আশি বছরের মধ্যেই এই ধরনের পরিবর্তন! এইসব মহান ব্যক্তি আমাদের জাতীয় শক্তিকে সঠিক পথে পরিচালনা করে ভারতবর্ষকে দান করেছেন এক নতুন জীবন, এবং তাঁদের সবার ওপরে স্থান হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের, যাঁর প্রভাব এইসব মহান রাজনীতিক নেতার ওপরেও পড়েছিল। রোমাঁ রোলাঁর লেখা বিবেকানন্দের জীবনী পড়লে এই প্রভাবের স্বরূপ বুঝতে পারা যায়। ১৯২১-এ কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করতে কলকাতায় গিয়ে গান্ধীজী বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠ দর্শনেও যান। নিচের প্রাঙ্গণে সমবেত ঘরোয়া একদল মানুষের উদ্দেশে গান্ধীজী বলেন, তিনি বেলুড় মঠে এসেছেন *সত্যাগ্রহ* প্রচার করতে নয়; এসেছেন বিবেকানন্দ যেখানে বাস করতেন সেই স্থান থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করতে, যাতে তিনি তাঁর জাতিকে আরো উপযুক্তরূপে ভালবাসতে পারেন। "বিবেকানন্দকে পড়ে আমার ভারতপ্রেম হাজার গুণ বেড়ে গেছে"—স্বামীজীর উদ্দেশে এই ভাষায় শ্রদ্ধা জানিয়ে গান্ধীজী সেই সমবেত জনতাকে বললেন, ঘরে ফেরার সময় তাঁরা যেন সেই অনুপ্রেরণার কিছুটা সঙ্গে নিয়ে যান।

৩৯ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে স্বামীজী এক তাজা যৌবনশক্তি এনেছিলেন

এই অনন্য প্রাচীন সংস্কৃতিতে, যা তখন প্রায় জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিল। অনেক সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ লেখক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, গতিশীল পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ছোঁয়া লেগে আমাদের এই সংস্কৃতির অবক্ষয় হয়ে শেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ভারতে যিনি ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন করেছিলেন, সেই মেকলে লিখেছিলেন যে, স্বল্প সময়ের মধ্যেই এ সংস্কৃতির অবসান অনিবার্য। ঘটেছিল কিন্তু এর ঠিক বিপরীত। ভারত আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠল; নতুন এক জীবনীশক্তি তাকে অগ্রগতির পথে ঠেলে নিয়ে চলল। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ না এলেও আমরা শক্তিশালী ও সক্রিয় হতাম। সন্দেহ নেই, আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আমাদের শক্তিশালী করত; কিন্তু আমরা হারাতাম আমাদের আপন আন্তরসত্তা—আমাদের সুপ্রাচীন অতীতের সঙ্গে ধারাবাহিকতা যেত হারিয়ে। এইরকম সব মহান আচার্যের জন্যই তা ঘটতে পারেনি।

শঙ্করের গীতা-ভাষ্যের ভূমিকায় আমরা এইসব ভাব লক্ষ্য করি। তখনকার ভারতীয় নেতাদের কেউ কেউ প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব নিয়ে বলেছিলেন যে, পাশ্চাত্যের সঙ্গে আমাদের কোনরকম সংস্রব থাকা উচিত নয়; বিদেশ থেকে কোন ভাব গ্রহণ করা উচিত নয়; আমাদের নিজেদের ভাবেই দৃঢ়বদ্ধ হয়ে থাকতে হবে। দেশ কিন্তু তাঁদের কথা শোনেনি। স্বামীজী কিন্তু বললেন, আমাদের আছে এক মহান সংস্কৃতি; কিন্তু সেইসঙ্গে বললেন, অন্যদেরও আছে মহান ভাবরাশি, এবং আমাদের বিনয়ের সঙ্গে সেইসব ভাব গ্রহণ করতে হবে। তিনি আমাদের পাশ্চাত্যের কাছ থেকে রাজনীতি, অর্থনীতি, জনকল্যাণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা করতে বলেছিলেন। আমেরিকা থেকে ভারতে এক চিঠিতে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছিলেন[১] : "তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্মবিশ্বাস ও সাধনায় ঘোর হিন্দু হতে পারো?"

অন্যদের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণের এই ভাব নতুন নয়। *মনুস্মৃতিতে* আছে: *শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি। অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।।* (২।২৩৮)—'নিম্নশ্রেণীর কাছ থেকেও বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে আহরণ করবে শুভকারী বিদ্যা, নিচজাতির কাছ থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করবে পরম ধর্মের, আর নিকৃষ্ট বংশ থেকেও উত্তম স্ত্রী গ্রহণ করবে।'

এই উক্তিতে লক্ষ্য করা যায় কী এক উদার সামাজিক মনোভাব তখন ছিল! স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, নব্যভারতকে হতে হবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের

১ বাণী ও রচনা, ৪র্থ সং, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩০৮

এক সুন্দর সংমিশ্রণ; বলেছিলেন—ভারতের মাটিতে প্রাচীন গ্রীসবাসী আজ মিলিত হচ্ছেন প্রাচীন হিন্দুর সঙ্গে। ১৮৯৭-এর ফেব্রুয়ারিতে মাদ্রাজে প্রদত্ত The Work before us —'আমাদের উপস্থিত কর্তব্য'[১] শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন একথাগুলি। প্রাচীন ভারতে শিক্ষা ছিল সুসংহত ও সুসমন্বিত। আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে রক্ষা করেও অন্যরা আমাদের যা দিয়েছে তা গ্রহণ করে আত্তীকরণ করেছি। বর্তমানে আবার সেই সংমিশ্রণ জন্ম দেবে নতুন ভারতবর্ষের। ধীর, অবিচল গতিতে এই ভাবের প্রসার ঘটাতে হবে। আজ আমাদের মধ্যে আছে অনেক খুঁত, দুর্বলতা ও দোষ। কিন্তু যে জাতির মধ্যে প্রাণসঞ্চার হচ্ছে, তার গঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এগুলি। বঞ্চিত মানুষ জীবনে কিছু সুযোগ পেলে ভুলভ্রান্তি করে; কিন্তু তারা নিজেদের শুধরে নিতে পারে, কারণ মহান আচার্যগণ আমাদের সেই সংশোধনের প্রক্রিয়া ও পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

সংস্কৃতিগুলির পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভাবটি অতি মহৎ। বস্তুত, এইরকম আদান-প্রদানের ফলেই উৎপন্ন হয়েছে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা। গ্রীক চিন্তাধারা ইউরোপে প্রবেশ করে খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে। ততদিনে গ্রীস পরিণত হয়েছে একটি মৃত জাতিতে। দ্বিতীয় শতকের কাছাকাছি সময়ে গ্রীস রোমান সাম্রাজ্যের অধিকারে আসে। তৃতীয় শতকে সে দেশ গ্রহণ করেছিল খ্রিস্টধর্ম, যা প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতির কাছে ছিল নেহাৎই নিঃসম্পর্কিত। সাধারণত দেখা যায়, খ্রিস্টধর্ম বা ইসলামধর্ম যেখানেই গেছে, সেখানেই তারা প্রাচীন সবকিছুকে ধ্বংস করেছে। অতএব, প্রাচীন গ্রীক চিন্তাধারা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল কেবল গ্রন্থরাজির মধ্যে। পশ্চিম ইউরোপে অধিবাসিগণ ছিল অসভ্য এবং প্রাচীন গ্রীক চিন্তাধারা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ড্যানিয়ুব নদী পেরিয়ে রোমান সাম্রাজ্যের বাইরে অবস্থিত স্ক্যাণ্ডিনেভিয় দেশগুলি ও জার্মানি সবই ছিল অসভ্য বর্বরের দেশ। পরবর্তী কালে রোমানরা গ্রহণ করল খ্রিস্টধর্ম, কিন্তু জীবন সম্বন্ধে ঐ ধর্মের দৃষ্টি ছিল সঙ্কীর্ণ। গ্রীক ও রোমানদের মহান অবদানের মূল্য সে-ধর্ম অনুধাবন করতে না পেরে তাদের বলল—'প্যাগান' বা নিকৃষ্ট ধর্মাবলম্বী। এইসব সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গেল। দ্বিতীয় দশক থেকে ১২৫০ খ্রিঃ পর্যন্ত এই মধ্যযুগকে ইউরোপীয় ইতিহাসে তাই 'অন্ধকার যুগ' বলা হয়।

পরে, ইউরোপের যে মূলকেন্দ্র পূর্ব ও পশ্চিমের সংযোগ রক্ষা করত, সেই

---

১ বাণী ও রচনা ৪র্থ সংস্করণ, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১২৫

রোমান কনস্ট্যান্টিনোপ্‌ল দখল করল তুর্কিরা। মুসলমান ধর্মাবলম্বী এই তুর্কিরা উত্তরোত্তর শক্তিশালী হয়ে নিকটবর্তী সব খ্রিস্টধর্মাবলম্বী দেশগুলি দখল করে নিল। কনস্ট্যান্টিনোপ্‌লের পতন হলো ১৪৫৩ খ্রিঃ এবং অনেক গ্রীক পণ্ডিত নিজের দেশ ছেড়ে বইপত্র সঙ্গে নিয়ে চলে যেতে আরম্ভ করলেন পশ্চিম ইউরোপে। তুর্কির মধ্য দিয়ে ইউরোপীয়ানদের পূর্বদিকে যেতে দেওয়া হতো না; ফলে ইউরোপ সব সংযোগ হারাল পূর্বের সঙ্গে—এমনকি ভারতের সঙ্গেও। এই কারণে পশ্চিম বাধ্য হলো *Cape of Good Hope*—'উত্তমাশা অন্তরীপ' হয়ে ভারতে আসার নতুন পথ খুঁজে বের করতে; অন্যরা আবার ভারতের সন্ধানে পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে আমেরিকা পৌঁছে সেটাকেই ভারত বলে ভাবল। এই হলো আধুনিক ইতিহাস। কিন্তু ১৪৫৩ খ্রিঃ কাছাকাছি সময়ে কনস্ট্যান্টিনোপ্‌লের পতনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক চিন্তাধারা পশ্চিম ইউরোপে প্রবেশ করে তাকে প্রদান করল মানবতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং উদার মনোভাবসমূহ। আর তাই নিয়ে এল ইউরোপীয় ইতিহাস প্রখ্যাত 'রেনেসাঁ' বা নবজাগরণ। এরপর ষোড়শ শতাব্দী থেকে যা কিছু প্রগতি, সে সবই ইউরোপীয় মানসিকতায় উপ্ত গ্রীক-রোমান সংস্কৃতির বীজ থেকে উৎপন্ন ফসল।

পরবর্তী কালে এল সংস্কার-প্রক্রিয়া; খ্রিস্টধর্ম ভেঙে পড়ল এবং কিছু লোক নাস্তিক হয়ে গেল। এদের মধ্যে ছিলেন ভল্টেয়ার, ছিল জার্মানি ও অন্যান্য দেশের 'প্রজ্ঞাদীপ্ত' কিছু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। যাইহোক, এর ফলে উত্থান হলো তারুণ্য-দীপ্তি ও উচ্ছলতায় ভরপুর নতুন ইউরোপের, যাকে আর তার নিজের মধ্যে বেঁধে রাখা গেল না—ঠিক যেমনটি ঘটেছিল প্রাচীন গ্রীসের ক্ষেত্রে। মাত্র আড়াই লক্ষ লোক নিয়ে গঠিত ছোট্ট শহর এথেন্স অসাধারণ শক্তি বিস্তার করেছিল সমগ্র গ্রীস জুড়ে। কালে একটি সাম্রাজ্যে পরিণত হয়ে সে আলেকজাণ্ডারের অধীনে জয় করে নিয়েছিল বহু দেশ—ভারত পর্যন্ত। এখন ইউরোপীয় জাতিগুলিও সেইরকম হয়ে উঠল। তারা প্রচণ্ড শক্তি লাভ করল, কিন্তু সে-শক্তিকে সংহত করে রাখার উপায় না জানায় বেরিয়ে পড়ল বিভিন্ন দেশ জয় করতে, সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করতে এবং অন্যান্য জাতিদের শোষণ ও বিনাশ করতে। অবশ্য তারা কিছু নতুন নতুন ভাব-ভাবনাও দান করেছিল। ইউরোপে তখন নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হলেও বর্তমানে তা পতনের মুখে। আর ঠিক এই পর্বেই যুক্তিসিদ্ধ ও উদার ভারতীয় অধ্যাত্মভাবনা ইউরোপ ও আমেরিকায় পৌঁছে তাদের সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে শুরু করেছে।

ব্রিটেন যখন ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করল, তখন তা ছিল পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে অবাঞ্ছিত এক সঙ্ঘাত। তা এখন সুখের সঙ্ঘাতে পরিণত হয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ভাববিনিময় চলছে এবং এদেশের মানুষ পশ্চিমের অনেক চিন্তাধারাকে স্বাগত জানায়। আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতা রোমের মতো মৃত্যুবরণ করবে না। রোমান সভ্যতাকে শেষ হতে হয়েছিল; খ্রিস্টধর্ম তার দখল নিল। কেবল চার্চই রইল আর রইল তার ক্ষমতা; বাকি সব নিস্তেজ হয়ে মিলিয়ে গিয়েছিল। ঐতিহাসিক অধ্যাপক আর্নল্ড টয়েনবী উল্লেখ করেছেন রোমান প্যাগানিজম (যার প্রতিনিধিত্ব করছিলেন রোমান সেনেটর সীম্মাখাস) এবং ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মের (যার প্রতিনিধিত্ব করছিলেন রোমের বিশপ অ্যাম্ব্রোজ) মধ্যে এক সঙ্ঘাতের। বিশপ মত প্রকাশ করলেন যে, তাঁর খ্রিস্টধর্ম—যা তখন রোমান সাম্রাজ্যে ক্রমশ শক্তিসঞ্চয় করছে—হলো ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাবার একমাত্র পথ। রোমান 'প্যাগান' সেনেটর সীম্মাখাস এই বলে 'প্যাগান' মতকে তুলে ধরলেন যে, নানা পথে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো যায়। খ্রিস্টীয় চার্চ কিন্তু সেনেটরের কণ্ঠরোধ করল। কিন্তু, টয়েনবীর সংযোজন—সেই সেনেটরের কণ্ঠরোধ করা হলেও তিনি যে-মত পোষণ করতেন, তাকে আজও লক্ষ লক্ষ হিন্দু সত্য বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

যাহোক, বর্তমান ভারতবর্ষের পুনর্জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে সব পাশ্চাত্য দেশে নতুন ভাব-ভাবনা প্রবেশ করবে এবং তারা আবার নতুন যৌবনশক্তিতে সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। পাশ্চাত্যে আজ এমন অনেক মানুষ পাওয়া যায়, যাঁরা 'খাও-দাও আর মজা লোটো'—এই ভোগবাদী দর্শনের ভিত্তিতে গঠিত বর্তমান জীবনযাত্রা চায় না। এই মনোভাবের প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল 'হিপি' আন্দোলনে—বিশেষত আমেরিকায় ও পরে ফ্রান্সে। এই আন্দোলনে কোন ছেলে বা মেয়ে বড়লোকের ঘরে জন্মালেও সেই পরিবারের সঙ্গে নিজেকে অঙ্গীভূত করতে চাইছে না। তারা পরতে পছন্দ করছে সহজ, সাধাসিধে জামাকাপড়—যা আসলে ত্যাগের চিহ্ন। সেটা ছিল মানুষের কাছে নবতর এক শক্তি উন্মেষের সূত্রপাত। আপাতত এই ভাব কিছুটা ম্লান হয়ে গিয়ে থাকলেও এর পুনরাবির্ভাব ঘটতে পারে।

শঙ্করাচার্যের রচনা অধ্যয়ন করলে তা থেকে মানবসভ্যতা ও সম্মিলিত মানবীয় প্রচেষ্টা সম্বন্ধে মূল সত্যটি কী তা জানা যায়। সংস্কৃতির গতি ঢেউয়ের মতো—একবার পড়ে, আবার ওঠে। আমাদের দেশে এই 'উঠে আসা'র

সূত্রপাত সর্বদা ঘটিয়েছেন—যেমন আমি আগেই বলেছি—কোন না কোন মহান আধ্যাত্মিক আচার্য। কোন রাজনীতিবিদ, সেনাধ্যক্ষ বা ভৌতবিজ্ঞানীও এমন আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটাতে পারেন না। মানুষের অন্তর্নিহিত সত্যস্বরূপ সম্বন্ধে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কোন দৈবী পুরুষই পারেন এমন এক স্রোত বইয়ে দিতে। এই প্রসঙ্গে আমি আগে নিউ ইয়র্কে প্রদত্ত স্বামী বিবেকানন্দের 'My Master' ('মদীয় আচার্যদেব') শীর্ষক বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত করেছি, যেখানে স্বামীজী অসাধারণভাবে উপস্থাপন করেছেন কিভাবে আধুনিক কালে ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্যের মধ্যে এক নতুন সামঞ্জস্যবিধান ঘটে চলেছে। পারস্পরিক বিনিময়ের মধ্য দিয়ে আসবে এক নতুন সংস্কৃতি ও বিশ্বজনীন সচেতনতা এবং সমাজে আসবে নতুন এক সার্বিক সংহতি ও মৈত্রী।

আমি আগে উল্লেখ করেছি, প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এক মহান অবতার। মহাভারতের যুগ সম্বন্ধে শঙ্কর বলেছেন—এবং আমি আগেই তা উদ্ধৃত করেছি—যখন ধর্ম পরাভূত হলো অধর্ম ও অত্যধিক ইন্দ্রিয়জ কামনা-বাসনার কাছে এবং যখন বিচার ও প্রজ্ঞার অবনয়ন ঘটল, তখন মহান বৈদিক দর্শন ও সনাতন ধর্মের অন্তর্গত আধ্যাত্মিকতাকে রক্ষা করতে নারায়ণ স্বয়ং কৃষ্ণাবতাররূপে দেবকী ও বসুদেবের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন।

এছাড়া ভারতীয় সমাজতত্ত্বের *ব্রাহ্মণ* আদর্শ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমি *ধম্মপদ* থেকে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছি, মানবীয় এই আদর্শের প্রতি ভগবান বুদ্ধের ছিল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। এটি একটি আদর্শ; কোন ব্যক্তি বা *জাতি* নয় এবং প্রত্যেক সমাজেরই উচিত এটিকে নিজের আদর্শ বা লক্ষ্য রূপে ধরে রাখা। *ব্রাহ্মণ*-ভাবের বিশেষত্ব হলো আত্মসংযম, সরলতা, দয়া, সেবাভাব; এখানে *সত্ত্বেরই* প্রাধান্য। ব্রাহ্মণ-স্বভাব মানুষ কখনো উদ্ধত বা আগ্রাসী হন না; তিনি শান্তিতে পূর্ণ এবং সকলের প্রতি আশীর্বচন করেন। আমাদের সময়ে আমরা এমন স্বভাবের প্রকাশ দেখি মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে, যিনি জাতির দিক দিয়ে *বৈশ্য* হলেও গুণের দিক দিয়ে ছিলেন একজন *ব্রাহ্মণ*।

ভগবদ্‌গীতা নামক গ্রন্থটি এই গুণের চর্চা করার সঙ্গে সঙ্গে *ক্ষত্রিয়* ধর্ম নিয়েও আলোচনা করেছে। যে কেউ সিংহাসনে বসলে বা মুকুট পরলেই *ক্ষত্রিয়* হয়ে যান না। গীতা বলছেন, *ক্ষত্রিয়* কখনো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন না : '*যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্*'। তিনি বীর, উদার—কখনো নীচ বা সঙ্কীর্ণ

মনোবৃত্তিসম্পন্ন হন না। আজ আমাদের রাজনীতিক ও প্রশাসকদের এইসব গুণ আত্মস্থ করতে হবে। অবশ্য, প্রত্যেকের লক্ষ্য হলো *ব্রাহ্মণস্বভাব;* লক্ষ্য হলো এমন এক সমাজ যা নিম্নস্তর থেকে উচ্চতর স্তরে বিবর্তিত হয়, বিকাশলাভ করে। মানবীয় ক্রমবিকাশ জৈবস্তরীয় নয়; নিশ্চিতরূপেই তা হলো নৈতিক, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশ। মানুষের উন্নততর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রয়োজন নেই। আমাদের আছে শ্রেষ্ঠ অঙ্গ—মস্তিষ্ক। আমাদের জৈব গঠনতন্ত্রের শক্তিসম্পদকে ব্যবহার করে ক্রমবিকাশকে নিয়ে যেতে হবে উন্নততর স্তরে। এখানেই আসে *'সত্ত্ব'*-এর প্রসঙ্গ। আজ আমাদের আছে প্রচুর শক্তি, যা দিয়ে আমরা মানুষ মারি, ঘর পোড়াই, কারণ সে-শক্তি সত্ত্বের দ্বারা শুদ্ধিকৃত হয়নি। অতএব যা করতে পারার নৈতিক আহ্বান, তা হলো—এই শক্তিকে শুদ্ধ করা, তাকে মানবমুখী করা এবং *ব্রাহ্মণত্বের* আদর্শ অর্জন করা। অবতার আগমন করেন *ব্রাহ্মণত্বস্য রক্ষণার্থম্*—ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ রক্ষা করতে। অবতার আসেন বেদসমূহ ও ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ রক্ষা করতে। বৈদিক *ধর্ম* তথা *সনাতন ধর্ম* স্বরূপত সর্বজনীন; তা অতি পবিত্র ও যুক্তিসিদ্ধ। একসময়ে এটি বিশ্বের বিশাল অংশ জুড়ে প্রসার লাভ করেছিল, তারপর তা সঙ্কুচিত হয়ে গেলেও, বর্তমানে আবার বিস্তারলাভ করছে। বৈদিক *ধর্মের* মধ্যে সব *ধর্মই* বিদ্যমান; বৈদিক *ধর্ম* সকল *ধর্মকে* গ্রহণ করে; অন্য কোথাও আমরা সেইরকম বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে পাই না। বৈদিক *ধর্মকে* রক্ষা করতে ও *ব্রাহ্মণ* আদর্শকে তুলে ধরতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন বসুদেব ও দেবকীর পুত্ররূপে। তাঁর নিজের সম্বন্ধে বলতে গেলে, তাঁর বিশেষ কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার কিছু ছিল নাঃ *'স্বপ্রয়োজন অভাবে অপি'*। আপন *মায়াশক্তিবলে* তিনি মানবরূপ ধারণ করলেন এবং *'বৈদিকম্ ধর্মদ্বয়ং অর্জুনায়োপদিদেশ'*—অর্জুনকে তিনি উপদেশ দিলেন দ্বিবিধ বৈদিক ধর্ম, যথা *প্রবৃত্তি লক্ষণ* ও *নিবৃত্তি লক্ষণ*। অর্জুনের অবস্থা তখন কিরকম ছিল? *'শোকমোহ-মহোদধৌ নিমগ্নায়'*—*শোক* ও *মোহের* মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত। এই দুটি আবেগ জীবনের প্রতিটি আস্পদকে বিকৃত করে দিতে পারে। গীতার প্রথম অধ্যায়ে অর্জুনের বিষাদের বিবরণ থেকে দেখা যায়, শোক ও মোহের এক মহাসাগর অর্জুনকে যেন গ্রাস করে ফেলেছিল।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে, এই জ্ঞানগর্ভ বাণী দিয়েছিলেন এবং তাঁর মধ্য দিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের সকলকে। করুণাপূর্ণ হৃদয়ে মানবরূপ ধারণ করে তিনি এ জগতে এসে বহু ঝঞ্ঝাট স্বীকার করেছিলেন। তাঁর জীবন ছিল বিঘ্নপূর্ণ। এমনিতে মনে হতে পারে যে, যাঁর এমন উচ্চ অবস্থা, তাঁর জীবন ছিল নিশ্চিন্ত,

সহজ; কিন্তু তা একেবারেই নয়; কারণ, সে জীবন ছিল রীতিমতো কঠিন ও কঠোর। মহাত্মা গান্ধী নাকি বলেছিলেন যে, কেবল একজন মহাত্মাই পারেন আরেক মহাত্মার উদ্বেগ-আশঙ্কা অনুভব করতে। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র হনন করা হয়েছিল—ঠিক যেমন হয়ে থাকে আজকালকার রাজনীতিক জীবনে। কেউ একজন অভিযোগ করল যে, কৃষ্ণ মহামূল্যবান স্যমন্তক মণি চুরি করে নিয়েছে; সে একজন চোর। বেচারি কৃষ্ণকে প্রমাণ করতে হয়েছে যে, তিনি নিরপরাধ! মণিটি খুঁজতে খুঁজতে তিনি অবশেষে দেখলেন, দুটি গরিব ছেলে সেটি নিয়ে খেলছে। তখন আবার তিনি ওটি উদ্ধার করে তার মালিককে ফেরত দিলেন। এ রকম মিথ্যা অপবাদের বহু ঘটনা আছে। শ্রীকৃষ্ণ সেগুলিকে উপেক্ষা করতে পারতেন, কারণ তাঁর কিছু পাওয়ার বা হারানোর ছিল না। যাহোক, মনুষ্যদেহ ধারণ করলে অবতারকে নানা যন্ত্রণা ও অপমান সইতেই হয়। যেটুকু সুখ আসে, সেটুকুও অনেক দুঃখের ভারে কমে যায়। মনুষ্য-দেহধারী যেকোন লোককে এর মধ্য দিয়ে যেতে হয়। অবতার কিন্তু এ বিষয়ে সচেতন থাকেন যে, মানুষের দেহ ধারণ করলেও তাঁর অন্তরের গভীরে রয়েছে পূর্ণ দেবত্ব। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত এসেছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে, যেখানে তিনি অর্জুনের মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতিকে দান করেছিলেন গীতার বাণী, যার জন্য এই হাজার হাজার বছর ধরে আমরা তাঁকে স্মরণে রেখেছি।

উপসংহার

অর্জুনকে এই উপদেশ প্রদানের পিছনে শ্রীকৃষ্ণের কী উদ্দেশ্য ছিল? তাই হবে এখনকার আলোচনার বিষয়। শ্রীকৃষ্ণ কেন যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের সঙ্গে কথা বললেন? তিনি কি বিশ্বকে রক্ষা করতে পারবেন? শঙ্করের ভাষ্যে আছে একটি উক্তি : "*গুণাধিকৈঃ হি গৃহীতঃ অনুষ্ঠীয়মানশ্চ ধর্মঃ প্রচয়ং গমিষ্যতি ইতি*"—'সাধারণের থেকে উৎকৃষ্টতর গুণসম্পন্ন নারীপুরুষ আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ অনুধাবন ও অভ্যাস করলে সে-ভাব প্রসারলাভ করে', একটি দীপ্ত প্রদীপ থেকে আরেকটি প্রদীপ প্রজ্বলনের মতো তখন তা ধীরে ধীরে জনগোষ্ঠীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়। যিশু বলেছেন, 'ময়দায় সামান্য একটু খামির মেশালে পুরো রুটিটাই বেশ ফুলে ওঠে।' এইসব ভাব সমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে এবং শেষপর্যন্ত সমাজকে পরিবর্তিত করে দেয়। কিভাবে তা ঘটে এখন তাই আলোচনা করা হবে।

শঙ্কর বলে চললেন : "স চ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিবলবীর্যতেজোভিঃ সদা

সম্পন্ন স্ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্য অজোঽব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽপি সন্, স্বমায়য়া দেহবানিব জাত ইব চ লোকানুগ্রহং কুর্বন্নিব লক্ষ্যতে, স্বপ্রয়োজনাভাবে অপি ভূতানুজিঘৃক্ষয়া বৈদিকং হি ধর্মদ্বয়মর্জুনায় শোকমোহ-মোহদধৌ নিমগ্নায় উপদিদেশ, গুণাধিকৈঃ হি গৃহীতঃ অনুষ্ঠীয়মানঃ চ ধর্মঃ প্রচয়ং গমিষ্যতি ইতি। তং ধর্মং ভগবতা যথোপদিষ্টং বেদব্যাসঃ সর্বজ্ঞো ভগবান্ গীতাখ্যৈঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈ উপনিববন্ধ।"

—'সেই ভগবান, যিনি সদাসর্বদা জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, বীর্য ও তেজের অধিকারী, যিনি তাঁর সর্বব্যাপী মায়া বা মূল প্রকৃতিকে তার ত্রিগুণ (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) সহ বশীভূত করে রাখেন, তিনি স্বয়ং জন্মরহিত, অব্যয়, সর্বভূতের ঈশ্বর এবং স্বরূপত নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব হয়েও, তাঁর মায়ার মাধ্যমে যেন জাত ও দেহধারী-রূপে প্রতীয়মান হন; এবং জগৎকল্যাণের জন্য তাঁকে ক্রিয়াশীল থাকতে দেখা যায়। তাঁর নিজের কোন প্রয়োজন না থাকলেও শুধুমাত্র জীবের কল্যানের জন্য তিনি শোকমোহের মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত অর্জুনকে এই দ্বিবিধ (কর্মের ও মননের) বৈদিক আধ্যাত্মিক বাণী শুনিয়ে ছিলেন এই প্রত্যয়ের সঙ্গে যে, সাধারণের চেয়ে অধিক গুণশালী মানুষের দ্বারা গৃহীত, উপলব্ধ ও অনুষ্ঠিত হলে এই ধর্ম প্রসারলাভ করবেই। (যেমন জ্বলন্ত প্রদীপ থেকে আরেকটি প্রদীপ জ্বালানো হয়।) ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা উপদিষ্ট সেই ধর্ম সর্বজ্ঞ ভগবান বেদব্যাসের দ্বারা সাতশত শ্লোকবিশিষ্ট সুপ্রসিদ্ধ গীতায় রূপায়িত হয়েছে।

গীতার উৎপত্তি সম্বন্ধে এই কথা বলার পর শঙ্কর আরো বললেন ঃ

"তদিদং গীতাশাস্ত্রং সমস্ত-বেদার্থ-সারসংগ্রহভূতং দুর্বিজ্ঞেয়ার্থম্। তদর্থাবিষ্করণায় অনেকৈঃ বিবৃতপদপদার্থ-বাক্যার্থন্যায়ম্ অপি অত্যন্ত-বিরুদ্ধানেকার্থত্বেন লৌকিকৈঃ গৃহ্যমানম্ উপলভ্য অহং বিবেকতঃ অর্থনির্ধারণার্থং সংক্ষেপতো বিবরণং করিষ্যামি।"

—'গীতা-বিজ্ঞান হলো বেদসমূহের সমগ্র শিক্ষার সার-সংগ্রহ, কিন্তু এর অর্থ দুর্বোধ্য। অনেকে এর শব্দ, তাদের অর্থ ও সামগ্রিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে যুক্তিসিদ্ধরূপে উপস্থাপনের প্রয়াস করেছেন। সাধারণভাবে লোকে এটিকে প্রচুর স্ববিরোধী চিন্তার সন্নিবেশ বলে ভেবেছেন। এই দুরবস্থা লক্ষ্য করে উপযুক্ত বিচারসহ মূলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্য দিয়ে আমি এর বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করব।'

শঙ্কর তাঁর ভাবগম্ভীর ভূমিকার উপসংহার ঘটিয়েছেন এইভাবে ঃ

"ইমং দ্বিপ্রকারং ধর্মং নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনং পরমার্থতত্ত্বং চ বাসুদেবাখ্যং পরং ব্রহ্ম অভিধেয়ভূতং বিশেষতঃ অভিব্যঞ্জয়ৎ বিশিষ্ট-প্রয়োজনসম্বন্ধাভিধেয়বৎ গীতাশাস্ত্রম্। যতঃ তদর্থে বিজ্ঞাতে সমস্ত-পুরুষার্থসিদ্ধিঃ ইতি, অতঃ তদ্ বিবরণে যত্নঃ ক্রিয়তে ময়া।"

—'এইরূপে, বিশেষত বেদোক্ত দ্বিবিধ ধর্ম (প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি)-ব্যাখ্যাত হলেও এই গীতা-বিজ্ঞানের লক্ষ্য হলো আধ্যাত্মিক মুক্তি; সেইসঙ্গে এতে তুলে ধরা হয়েছে পরমার্থকে, যা পরম ব্রহ্ম বা বাসুদেব (শ্রীকৃষ্ণ) নামেও অভিহিত; তাই এতে দেওয়া হয়েছে গীতার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, সম্বন্ধ ও বিষয়বস্তু। গীতার অর্থ বোধ হলে সকল পুরুষার্থের প্রাপ্তি ঘটে বলে আমি তার ব্যাখ্যায় সচেষ্ট হচ্ছি।'

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

প্রথম অধ্যায়

অর্জুন-বিষাদ-যোগ

অর্জুন-বিষাদের যোগ

আজ থেকে আমরা মূল ভগবদ্‌গীতা ধরে পাঠ আরম্ভ করব, প্রথম অধ্যায় থেকে। এটি কৃষ্ণার্জুনের মধ্যে কথোপকথন। কীভাবে এটি আমাদের কাছে এসেছে? এখানে একটি তৃতীয় চরিত্র আছে; তিনি হলেন কৌরবদের দৃষ্টিহীন সম্রাট ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী, সঞ্জয়। ভগবান ব্যাস সঞ্জয়কে বিশেষ বরদান করেছিলেন—যার ফলে তিনি রাজপ্রাসাদে সম্রাটের কাছে বসে থেকেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে যা ঘটছে তা দেখতে ও শুনতে পাবেন। এই অনুগ্রহের ফলেই সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্রের ঘটনাবলী জানতে উৎসুক সম্রাট ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের বিবরণ দিচ্ছেন। তাই আমরা পাই, প্রথম অধ্যায় শুরু হচ্ছে ধৃতরাষ্ট্রের একটি প্রশ্ন দিয়ে—

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'ও সঞ্জয়! আমাকে বল, যুদ্ধমনস্ক হয়ে আমার পক্ষের দুর্যোধনাদি পুত্রগণ ও পাণ্ডবেরা ধর্মকর্মের কেন্দ্রভূমি কুরুক্ষেত্রে সমবেত হয়ে বাস্তবিক কি করেছিল?

হে সঞ্জয়, ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে এরা সব কী করেছিল? 'এরা' কারা? সমবেতা যুযুৎসবঃ, 'সেখানে যারা যুদ্ধার্থে একত্রিত হয়েছিল'; মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব। 'দুর্যোধনাদি আমার পুত্রগণ এবং অপর পক্ষে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ। তারা সেখানে কী করেছিল?'

কুরুক্ষেত্র শহরটি দিল্লী থেকে প্রায় ১০৫ মাইল দূরে অবস্থিত। গীতার

সময়েই ঐ স্থান প্রাচীন ও পুণ্যক্ষেত্র, ধর্মক্ষেত্ররূপে পরিগণিত ছিল। আজকালও বিশেষ বিশেষ কালে লক্ষ লক্ষ লোক ওখানে সমবেত হয়ে ওখানকার সরোবরে স্নান করে। ঐ বৃহৎ শহরটিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠছে। এই হলো কুরুক্ষেত্র, যাকে ধর্মক্ষেত্র—ধর্মের স্থান, পুণ্যভূমি বলা হয়। এই কুরুক্ষেত্রে—আমার পুত্রাদি ও যুধিষ্ঠিরাদি—দুই পক্ষ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে লড়াই করতে জড় হয়েছিল। তা, ওরা কি করেছিল?—এই প্রশ্ন ধৃতরাষ্ট্র তাঁর মন্ত্রী সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা।
আচার্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

সঞ্জয় বললেন—'তার পর রাজা দুর্যোধন, পাণ্ডব সৈন্যকে যুদ্ধে ব্যূহবদ্ধ দেখে, তাঁর অস্ত্রশিক্ষাগুরু আচার্য দ্রোণের কাছে গিয়ে এই কথা বললেন।'

রাজা দুর্যোধন, অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র পুত্র, পাণ্ডব সৈন্যকে ব্যূহ-বদ্ধ দেখে, কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষেরই ধনুর্বেদ শিক্ষার গুরু, আচার্য দ্রোণের কাছে গিয়ে এই কথা বললেন। দ্রোণ ভীষ্মের মতোই গভীর শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, মহাভারত-যুদ্ধে এই দু-জনই ছিলেন অতিশয় শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি।

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥

—'হে আচার্যদেব! দেখুন আপনার গুণবান শিষ্য দ্রুপদ-পুত্র কর্তৃক পাণ্ডুপুত্রগণের পরাক্রমী সেনা ব্যূহাকারে সজ্জিত রয়েছে।

উল্লিখিত দ্রুপদপুত্র হলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, যিনি দ্রোণের আপন গুণসম্পন্ন শিষ্য। পরে তার বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥

—'এখানে রয়েছেন বীরগণ, পরাক্রান্ত ধনুর্ধরগণ, যাঁরা যুদ্ধে ভীমার্জুনের সমকক্ষ—রয়েছেন যুযুধান, বিরাট, দ্রুপদের মতো মহাযোদ্ধা; সাহসী ও শৌর্যবান ধৃষ্টকেতু, বীর কাশীরাজ চেকিতান; নরশ্রেষ্ঠ পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ ও শৈব্য; পরাক্রমশালী যুধামন্যু ও বীর্যবান উত্তমৌজা, সুভদ্রাপুত্র ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ—এঁরা সকলেই মহারথ।'

রাজা দুর্যোধন নিজ সৈন্যদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর আচার্যকে বললেন।

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥

—'হে বিপ্রবর! এবার আমাদের পক্ষে যে সব যোদ্ধা রয়েছেন, তাঁদের বিবরণ দিচ্ছি, এঁদের কেউ কেউ যুদ্ধে বিশেষ নিপুণ।'

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥

—'প্রথমে (দ্রোণ) আপনি নিজে, তারপর ভীষ্ম, কর্ণ, পরে সমরজিৎ কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, জয়দ্রথ ও সোমদত্ত পুত্র।'

কর্ণ ছিলেন কুন্তির জ্যেষ্ঠপুত্র, যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। কিন্তু এ সত্য তখনো তাঁরা জানতেন না। সে এক রহস্য। তাই কর্ণ কৌরব পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন।

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥

—'আমার জন্য প্রাণ দিতে কৃতসঙ্কল্প এমন অন্য অনেক বীরও এখানে আছেন, এঁরা সকলেই শস্ত্রনিক্ষেপে সুদক্ষ ও যুদ্ধনিপুণ।'

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ।
পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০ ॥

—'ভীষ্ম-রক্ষিত আমাদের সৈন্য গণনাতীত, কিন্তু ভীম-রক্ষিত অপরপক্ষের সৈন্যদের গণনা করা সহজ, অর্থাৎ অনেক কম।'

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এব হি ॥ ১১ ॥

—'এখন, আপনারা সৈন্যমধ্যে নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করে ভীষ্মকে সহায়তা করুন ও কেবল তাঁকেই রক্ষা করুন।'

ভীষ্ম হলেন সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাঁর অশুভজনক কোন কিছু ঘটলে, তা আমাদের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হবে। তাই, তিনি যাতে সুরক্ষিত থাকেন, তা আমাদের দেখতে হবে।

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২ ॥

—'কুরুকুলের সর্বজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম সিংহনাদ করে শঙ্খধ্বনি করলেন, দুর্যোধনের হর্ষোৎপাদনের জন্য।

ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তিনি নিজে রাজসিংহাসনের দাবিদার হবেন না, যদিও সে সময়ে রাজ-পদের উত্তরাধিকার তাঁরই ছিল, কারণ তিনি যমুনাতীরস্থ ধীবরকন্যা, ব্যাসদেব-জননী, সত্যবতীর প্রীতির জন্য তাঁর ভাবী পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবার সুযোগ করে দিতে চেয়েছিলেন। তাই ভীষ্ম সারা জীবন কুমার-ব্রতী ছিলেন; তিনি সত্যনিষ্ঠও ছিলেন; কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁকে বহুবার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হতে অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু তিনি বলেছেন, 'না আমি ক্ষমতা চাই না'। সেজন্য, ভীষ্ম একজন প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন, বিপুল সাহসের অধিকারী ও অসাধারণ ধীশক্তিমান মানবরূপে স্বীকৃত। মহাভারতে, যুদ্ধশেষে, তিনি স্ব-ইচ্ছায় ক্ষতবিক্ষতদেহ নিয়ে শর শয্যায় শায়িত ছিলেন। বেশ কিছুদিন তিনি এই ভাবে ছিলেন, কারণ মাঘের প্রারম্ভে সূর্য উত্তরায়ণে না গেলে তিনি দেহ ত্যাগ করবেন না; সে সময়টি ১৪ জানুয়ারির কাছাকাছি। শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবেরা সকলে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে তিনি পাণ্ডবদের রাজনীতি ও ধর্মনীতি প্রসঙ্গে নানা বিস্ময়কর উপদেশ দিয়েছিলেন। —সেগুলি মহাভারতের শান্তিপর্বে পাওয়া যায়। সে এক অপূর্ব শিক্ষা। এই ভীষ্মই যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছেন। কিছুদিন পরেই তিনি এই যুদ্ধেই শরীর ত্যাগ করবেন, কিন্তু

যেমন বলেছি; উত্তরায়ণ পর্যন্ত (সূর্যের উত্তরদিকে গতি না হওয়া পর্যন্ত) তিনি প্রাণ রক্ষা করবেন। তারপর তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়। মহাভারতে তার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখা যাবে যে সে ক্রিয়া বর্তমানে আমরা যেমন করে থাকি ঠিক তারই অনুরূপ। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু হলে, দিল্লীতে তাঁর এক অপূর্ব অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সেটিও মহাভারত যুদ্ধের সময় যেমনটি হয়েছিল অনেকটা তারই মতো।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩ ॥

—'ভীষ্মের শঙ্খনাদ করার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্যেরাও শঙ্খনাদ আরম্ভ করলেন; শঙ্খ, নাকাড়া, মাদল, ভেরী, শিঙ্গা প্রভৃতি রণবাদ্য সহসা কৌরব পক্ষ থেকে বেজে উঠে তুমুল আওয়াজ তুলে সেনাদের মধ্যে এক তেজোদ্দীপক পরিবেশের সৃষ্টি করল।'

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥

—'তারপর মাধব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডব অর্থাৎ অর্জুন শ্বেত-অশ্বনিচয়যুক্ত এক চমৎকার বিশাল মহারথে অবস্থান করে নিজ নিজ দিব্য শঙ্খ বাজালেন।'

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ॥

—'হৃষীকেশ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বাজালেন পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ; ধনঞ্জয় অর্থাৎ অর্জুন বাজালেন দেবদত্ত নামক শঙ্খ; এবং ভয়ানক কর্মকারী বৃকোদর অর্থাৎ ভীম বাজালেন পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ।'

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥

—'কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ বাজালেন এবং নকুল ও সহদেব বাজালেন তাঁদের সুঘোষ ও মণিপুষ্পক নামক শঙ্খদ্বয়।'

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥

—'মহাধনুর্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বিরাট এবং অপরাজেয় সাত্যকি।'

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥

—'হে পৃথিবীপতি (অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র)! দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও মহাবীর সুভদ্রাপুত্র (অর্থাৎ অভিমন্যু) প্রত্যেকে নিজ নিজ শঙ্খ বাজালেন।'

স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯ ॥

—'ঐ তুমুল নিনাদ, আকাশ ও ভূমণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হতে হতে, তার তীব্র ফলপ্রদ শক্তিহেতু ধৃতরাষ্ট্র-পক্ষের বীরগণের হৃদয় বিদীর্ণ করল।'

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ॥ ২০ ॥
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।

—'অতঃপর, হে মহীপতি! ধৃতরাষ্ট্র-পক্ষকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে দণ্ডায়মান ও অস্ত্রনিক্ষেপে উদ্যত দেখে, বানর (অর্থাৎ হনুমান) চিহ্নিত পতাকা-যুক্ত পাণ্ডব (অর্থাৎ অর্জুন) স্বীয় ধনু উত্তোলন করে শ্রীকৃষ্ণকে এই কথাগুলি বললেন।'

এই যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ কেবল সারথিরূপেই অংশ নিয়েছিলেন, তিনি কখনো প্রত্যক্ষ যুদ্ধে নামেন নি। এবার শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন দৃশ্যপটে এলেন।

অর্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ ২১ ॥

যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥

অর্জুন বললেন—'হে অচ্যুত, (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ)! দুই সৈন্যবাহিনীর মধ্যস্থলে

আমার রথ স্থাপন করুন, যাতে আমি দেখতে পাই কারা কারা যুদ্ধার্থে এখানে উপস্থিত হয়েছে। যুদ্ধের প্রাক্কালে আমি জানতে চাই কার সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করতে হবে।'

যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩ ॥

—'কারণ আমি তাদের দেখতে চাই—যারা মন্দবুদ্ধি দুর্যোধনকে খুশি করবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে তার পক্ষে লড়াই করতে এখানে সমবেত হয়েছে।'

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪ ॥

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫ ॥

সঞ্জয় বললেন—'হে ভারত অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র, গুড়াকেশ (জিতনিদ্র) অর্থাৎ অর্জুন হৃষীকেশকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে এইভাবে বলায় শ্রীকৃষ্ণ সকল রথের মধ্যে পরম চমকপ্রদ রথখানিকে চালিয়ে উভয় সেনার মাঝখানে, ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্য সব পৃথিবীপতিদের সামনে রেখে অর্জুনকে এইভাবে বললেন, "হে অর্জুন, সমবেত কৌরবগণকে দেখ।" '

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ॥ ২৬ ॥
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি।

—'সেখানে অর্জুন তাঁর সামনে উভয় সেনাদলের মধ্যে দেখলেন—আপন আত্মীয়স্বজন, পিতামহগণ, শ্বশুরগণ, পিতৃব্যগণ, ভ্রাতাগণ, নিজের ও তাদের পুত্রগণ ও পৌত্রগণ এবং বন্ধুগণ, আচার্যগণ ও অন্য সুহৃদ্‌বর্গও রয়েছেন।'

সমগ্র যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে এইটিই ছিল সঙ্কট-সঙ্কুল মুহূর্ত।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্ ॥ ২৭ ॥
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ।

—'তখন কুন্তীপুত্র অর্জুন, সেনাদলের মধ্যে আত্মীয়বর্গকে উপস্থিত থাকতে দেখে গভীর করুণাবিষ্ট হয়ে এইভাবে বলেছিলেন।'

বহযুদ্ধে, বিশেষত গৃহযুদ্ধের সময়, লোকে নিজ নিজ দেশবাসীর সঙ্গেই যুদ্ধ করে থাকে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধে কত লোক নিজ নিজ আত্মীয়বর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল! আমাদের বন্ধুরা অপর পক্ষে ছিল; গৃহযুদ্ধের প্রকৃতিই এই। এটি তো গৃহযুদ্ধেরও বেশি। এটি ছিল একই পরিবারের মধ্যে যুদ্ধ। কৌরবগণ একদিকে আর পাণ্ডবগণ অন্যদিকে। তাদের সকল সুহৃদবর্গ হাতে হাত মিলিয়েছিল। অর্জুনের আপন আচার্যগণও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এবার অর্জুনকে এক অত্যন্ত বিষাদপূর্ণ পরিস্থিতির সামনা-সামনি হতে হলো। অর্জুন সেই মহাদুঃখ প্রকাশ করছেন। এই অধ্যায়কে অর্জুনের দুঃখের যোগ, *অর্জুন-বিষাদযোগ* বলা হয়। *বিষাদ* হলো দুঃখ। সেটি যোগও বটে, কারণ সেই বিষাদ থেকেই ঘটতে থাকে তার মহান পরিণতি। আমরা চিন্তা করতে আরম্ভ করি; আমরা বিচার শুরু করি। তুমি উপদেশ চাও, তোমাকে পথনির্দেশ দিতে পারে এমন কিছু দর্শনও তুমি চাও। তাই এ অধ্যায়টিকে *যোগ—অর্জুন-বিষাদযোগ* বলা হয়।

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্ ॥ ২৮ ॥
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি।

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ॥ ২৯ ॥
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে।

অর্জুন বললেন—'হে কৃষ্ণ! যুদ্ধের জন্য সমবেত আমার এই সব স্বজনবর্গকে দেখে আমার অঙ্গসমূহ অবশ হয়ে যাচ্ছে, মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, সারা শরীর কম্পমান হচ্ছে, আমার রোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে; আমার গাণ্ডীব ধনু হাত থেকে খসে পড়ছে; আমার গাত্রদাহ হচ্ছে।'

অর্জুন এক অত্যন্ত সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে পড়েছেন, তার স্নায়ুমণ্ডলী খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ॥ ৩০ ॥
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।

—'হে কেশব (শ্রীকৃষ্ণের আর একটি নাম)! আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না; আমার মনও যেন ঘুরছে; আর অমঙ্গলসূচক লক্ষণসমূহও আমি দেখতে পাচ্ছি।'

পরের শ্লোকগুলি অত্যন্ত গুরুতর বিভ্রান্তিকর, ভীতিজনক, উদ্বেগপূর্ণ স্নায়বিক অবস্থার এক অতি সুন্দর চিত্রায়ণ।

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে ॥ ৩১ ॥
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।

—'হে কৃষ্ণ! যুদ্ধ ক্ষেত্রে আমার এইসব আপনজনকে সংহার করে কোন মঙ্গল হবে বলে মনে করি না, আমি জয় চাই না, রাজ্যও চাই না, এমনকি সুখভোগও আকাঙ্ক্ষা করি না।'

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ॥ ৩২ ॥
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।

ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ॥ ৩৩ ॥

আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ॥ ৩৪ ॥

—'হে গোবিন্দ! আমাদের রাজ্যে কি প্রয়োজন, আর সুখভোগে ও জীবন-ধারণেই বা কি প্রয়োজন? কারণ, যাঁদের জন্য রাজ্য, ভোগ ও সুখাদি আমরা অভিলাষ করে থাকি, সেই আচার্যগণ, পিতৃব্যগণ, পুত্রগণ, পিতামহগণ, মাতুলগণ, শ্বশুরগণ, পৌত্রগণ, শ্যালকগণ ও স্বজনগণই প্রাণ ও ধনাদির আশা ছেড়ে দিয়ে যুদ্ধে নেমেছেন।'

এই সব ৩২ থেকে ৩৪ শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই অর্জুন খুব কঠিন পরিস্থিতিতে পড়েছেন। অর্জুন যে, সে সময়ে, আরো গভীরতর সঙ্কটে পড়েছিলেন পরবর্তী শ্লোকগুলিতে তা বলা হয়েছে।

এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে ॥ ৩৫ ॥

—'হে মধুসূদন, মধু দৈত্য নিধনকারী শ্রীকৃষ্ণ! এরা আমাকে বধ করলেও গোটা

ত্রৈলোক্যের রাজ্যলাভের জন্যও এদের বধ করতে ইচ্ছা করি না, পৃথিবী-রাজ্যটুকুর জন্য তো কোন কথাই ওঠে না।'

এই ধরনের আবেগের বশবর্তী হয়ে অর্জুন এখন মনে মনে স্থির করে ফেলেছেন যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তিনি সরে যাবেন।

নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাৎ জনার্দন।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতান্ আততায়িনঃ ॥ ৩৬ ॥

—'হে জনার্দন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ! এই সব ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণকে বধ করে আমাদের কি-ই বা সুখ হবে? এই সব আততায়ীদের বধ করলে পাপই আমাদের আশ্রয় করবে।'

ওরা অবশ্যই আততায়ী। কারণ ওরা বহু অপরাধে অপরাধী। ওরা বহু মন্দ কাজ করেছে। ওরা এক সময়ে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারবার চেষ্টা করেছিল। এসব সত্ত্বেও ওদের সঙ্গে এ যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াতে আমি কোন রকম মজা দেখছি না।

তস্মান্নার্হাঃ বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৭ ॥

—'অতএব আমাদের জ্ঞাতি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ আমাদের বধযোগ্য নয়। হে মাধব, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ! স্বজনগণকে হত্যা করে আমরা কিরূপে সুখী হব?'

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৮ ॥

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন ॥ ৩৯ ॥

—'যদিও আমার সামনে একত্রিত কৌরবরা রাজ্যলোভে অভিভূত হয়ে এই সত্য বুঝতে পারছে না, তবু এতে কুলক্ষয়জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহ নিমিত্ত পাপ আছে। হে জনার্দন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ! কুলক্ষয় দোষে বংশ ও সমাজের নাশ হয় এ কথা স্পষ্ট দেখেও আমরা কেন এই পাপ কাজ থেকে নিবৃত্ত হব না?'

এই যুদ্ধের ফলে সমাজের অবক্ষয় হবে, পরিবার ভেঙ্গে যাবে—যার ফলে কত নারী বিধবা হবে, কত শিশু অনাথ হবে। এই কৌরবরা যুদ্ধজনিত এই

সব ফলের কথা জানে না, কিন্তু আমরা তো জানি। আমরা যখন জানি তখন আমরা কেন আর এ বিষয়ে অগ্রসর হই?

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৪০ ॥

—'কুলনাশে, কুলের স্মৃতিরক্ষার্থ চিরাচরিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি নষ্ট হয়ে যায়, বংশের সংস্কৃতিও নষ্ট হয়। ফলে সামাজিক মূল্যবোধ এবং অনাচাররূপ অধর্ম সমগ্র কুলকে—সমাজকে—আরো বেশি অভিভূত করে।'

যুদ্ধের ফলে সমাজে নানা অশুভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বর্তমানে আমরা তা বেশ বুঝতে পারি। যুদ্ধ, বিরোধ, মনোমালিন্যের সময় কতই না অশুভ ভাব ওৎ পেতে থাকে? অর্জুন আসন্ন যুদ্ধ থেকে সরে থাকবার ইচ্ছার কারণ দেখাচ্ছেন। আর তাই তিনি আবার বললেন ঃ

অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪১ ॥

—'যখনই কোন মহাযুদ্ধ ঘটে থাকে, কতগুলিই না বিধবা ও অনাথ সৃষ্ট হয়! অধর্মের প্রাদুর্ভাবে, যখন সামাজিক মূল্যবোধ চলে যায়, কুলস্ত্রীগণ তৎকালীন ভীষণ অবস্থায় পড়ে ভ্রষ্টা হয়ে যায়। আর আমাদের কুলস্ত্রীগণের কিছু অশুভ হলে, সমগ্র সমাজের ক্ষতি হয়। সমাজে বর্ণসঙ্করাদি বহু ভ্রষ্টাচার চলতে থাকে।'

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪২ ॥

—'সামাজিকশৃঙ্খল ভেঙ্গে পড়লে কুল ও কুলভঙ্গকারী উভয়েরই নরকে গতি হয়। তাদের পূর্বপুরুষগণ শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি ক্রিয়ায় নিবেদিত পিণ্ডোদক থেকে বঞ্চিত হন।'

মৃত পিতৃপুরুষ ও অন্যান্যদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও পরবর্তী অনুষ্ঠানাদিতে আমরা এইসব দানাদির মাধ্যমে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। একেই বলা হয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। প্রত্যেক সমাজেই এরকম কিছু অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। ভারতীয় ঐতিহ্যে একেই বলা হয় শ্রাদ্ধ। যুদ্ধের ফলে এগুলি সম্পন্ন করা কঠিন হয়ে পড়লে সমাজ একেবারে বিভ্রান্ত হয়ে যায়।

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪৩ ॥

—'কুলনাশের মতো দুষ্কর্মের জন্য সমাজ ধর্মে, তথা কুলধর্মে, বর্ণধর্মে, জাতি ধর্মে বিভ্রান্তি সৃষ্ট হয়, ফলে কুল ধর্মের ও বর্ণ ধর্মের উচ্ছেদ হয়।'

উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৪ ॥

—'হে জনার্দন অর্থাৎ কৃষ্ণ! আমরা শুনেছি, যে সব নরনারীর কুলে ধর্মানুষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে তাদের নরকবাস অবশ্যম্ভাবী।'

অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৫ ॥

—'হায়! আমরা রাজ্যসুখ ভোগের লোভে স্বজনবর্গকে বধের কাজে উদ্যোগী হয়ে মহাপাপ কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছি।'

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৬ ॥

—'যদি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ, অর্থাৎ কৌরবগণ যুদ্ধে শস্ত্রধারণ করে প্রতিরোধ চেষ্টাবিহীন নিরস্ত্র আমাকে বধ করেন তাতে আমার বেশি কল্যাণ হবে।'

অর্জুন এবার ঐ পরিস্থিতিতে তাঁর নির্দিষ্ট অন্তিম সিদ্ধান্ত শ্রীকৃষ্ণকে জানিয়ে দিচ্ছেন। তিনি চান সম্পূর্ণ নির্বাধ অহিংস পদ্ধতি অবলম্বন করতে। সত্যই, এটি একটি সঙ্কটময় পরিস্থিতি; যুদ্ধারম্ভ আসন্ন, অর্জুন এর জন্য আগেই প্রস্তুত হয়েছেন, তিনি যুদ্ধ চেয়েছিলেন, আর তবু এই সঙ্কট মুহূর্তে দুঃখে অবসাদে অভিভূত হয়ে যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন; এ বিষয়ে তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শ্রীকৃষ্ণকে জানিয়ে দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ কী বললেন? শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সব কথার উত্তর দিয়েছিলেন—তা গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাওয়া যাবে। কিন্তু ঠিক এইক্ষণে এখানে কী ঘটেছিল তা জানালেন সঞ্জয় :

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৭ ॥

সঞ্জয় বললেন—'যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে এইরকম কথা বলে, অর্জুন ধনুর্বাণ ত্যাগ করে শোকাকুল চিত্তে রথে বসে পড়লেন।'

বিভ্রান্তি, শোক, দুঃখে প্রথম অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি। এখানে, যুদ্ধ আরম্ভ হতে যাচ্ছে, এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝে অর্জুনের একটি চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে। 'আমি যুদ্ধ করব না' বলে তিনি সরে দাঁড়িয়ে দয়া, করুণা ও অহিংসার বেশ ভাল ভাল যুক্তি দিয়েছেন—অহিংসা সম্বন্ধে আমরা সাধারণত যা বুঝি ঐ যুক্তিগুলি তার থেকে অনেক উচ্চস্তরের। অনেকে প্রশ্ন করেন ঃ 'অর্জুন কি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত অন্য সকলের চেয়ে উচ্চমানের লোক ছিলেন না? তিনি অহিংসার কথা বলেছিলেন। অহিংসা পরম ধর্ম।' এ বিষয়ে আলোচনা হবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলবেন, অহিংসা সব ক্ষেত্রে সদ্‌গুণ নয়। অহিংসাকে বলবানের ধর্ম, সাহসীর ধর্ম, এক ইতিবাচক ধর্ম হতে হবে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে পরে এই রকম শিক্ষাই দেবেন। শ্রীকৃষ্ণ জানতে চাইলেন ঃ 'এই কঠিন পরিস্থিতিতে তোমার ওপর এই অবসাদ কোথা থেকে এল?' অর্জুনের স্নায়বিক বিপর্যয় ঘটে গেছে। তার শরীর কম্পমান, মন ঘূর্ণায়মান। এ সব কি? যা শক্তির ওপর, নির্ভীকতার ওপর অধিষ্ঠিত তাই সদ্‌গুণ। অর্জুনের এই মনোভাব তার কোন সদ্‌গুণ নয়। তার মানবীয় মনে কিছু একটা ঘটেছে, তাঁর মন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। অর্জুনের মতো একজন সাহসী, নির্ভীক ব্যক্তি এখানে এই যুদ্ধক্ষেত্রে এক ভীরু কাপুরুষের মতো আচরণ করছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের পরিস্থিতিকে এইভাবে দেখেছিলেন ঃ তাঁর প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি দেখালেন কিন্তু তাঁর যুক্তি প্রত্যাখ্যান করলেন। এইভাবে প্রথম অধ্যায়ের ইতি করা হলো।

ইতি অর্জুন-বিষাদ-যোগো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

এই হলো *অর্জুন-বিষাদ-যোগ* নামক প্রথম অধ্যায়ের সমাপ্তি, এখানে অর্জুনের বিষাদজনিত *যোগ* বেশ ভালোভাবেই চিত্রিত হয়েছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংখ্য-যোগ

সাংখ্য এবং যোগ

প্রথম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে আমরা অর্জুনকে, সম্পূর্ণ অবসন্ন হয়ে রথে বসে পড়া অবস্থায় ফেলে এসেছিলাম। ঐ শ্লোকের ভাষা এই পরিস্থিতির গূঢ় ব্যঞ্জনা খুব ভাল ভাবেই প্রকাশ করেছে। ঐ অধ্যায়ের নামই ছিল *অর্জুন-বিষাদ-যোগ।* এর শেষ শ্লোকে সঞ্জয় বলেছেন, *এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ*—'যুদ্ধক্ষেত্রে এই সব কথা বলে, অর্জুন রথে বসে পড়লেন, রথমধ্যে একেবারে ডুবে গেলেন।' সাধারণত যোদ্ধা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে; এই ছিল সে কালের রীতি। দাঁড়িয়ে যুদ্ধ হয়, বসে যাওয়ার অর্থ যুদ্ধ থেকে নিবৃত্তি। *বিসৃজ্য সশরং চাপম্*—ধনুর্বাণ ফেলে দিয়ে। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া সম্পূর্ণভাবে তার বিপরীত কাজ করা। *শোকসংবিগ্নমানসঃ*—অর্থাৎ 'শোকে বা অবসাদে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে।' শেষ শ্লোক অনুযায়ী এই ছিল অর্জুনের মানসিক অবস্থা।

এবার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরু। অর্জুনের মনের এই অবস্থায় ও যুদ্ধ থেকে বিরত হওয়ার স্বপক্ষে নানা যুক্তি প্রদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। কিছু কিছু যুক্তি আমাদেরও মনে সাড়া জাগায়। জগতে কোথাও কেউ এখন যুদ্ধ চায় না। তাই, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও ইউরোপে, লোকে আমায় প্রশ্ন করেছিল : 'মনে হয় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের থেকে ভাল। তিনি শান্তি চান, যুদ্ধ চান না। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যুদ্ধের প্ররোচনা দিচ্ছেন—এ পরিস্থিতি আমরা কিভাবে স্বীকার করতে পারি?'

আমি বলেছিলাম, সে কথা সত্যই বটে। অর্জুন শান্তির, অহিংসার, করুণার কথা বলেছেন আর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এসব মূল্যবোধ ছেড়ে দিয়ে যুদ্ধ করতে আহ্বান করছেন।' কিন্তু এর অর্থ কী? অর্জুনের মনের অবস্থা কি রকম?

অর্জুনের সেই মানসিক অবস্থায় গুণধর্ম বলে কিছু আছে কি? দুর্বলতা কি একটা ধর্ম? স্নায়বিক অবসাদ কি একটা সদ্‌গুণ? এই প্রশ্নগুলি আমাদের জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে। গুণধর্ম শক্তিমান, 'কঠিন উপাদান' দিয়ে তৈরি— সেক্সপিয়রের ভাষায়। ঐ অবস্থায় অর্জুনের মধ্যে সেই কঠিন উপাদান কিছু ছিল না। তিনি কেবল মন্ত্রের মতো প্রেম, করুণা, অহিংসা প্রভৃতি ভাবের কথাগুলি উচ্চারণ করেই চলেছেন। কিন্তু তাঁর নিজের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়—যাকে আজকাল বলা হয় মানসিক বিপর্যয়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দিকে তাকালেন, গীতার কথায়, স্মিত হাস্যে তার সঙ্গে কথা আরম্ভ করলেন। কিভাবে এই মানুষটিকে তার নিজের প্রকৃত মানসিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়? তিনি এরকম ছিলেন না, পরন্তু এই অবসাদ, এই দুর্বলতা এই মুহূর্তেই এঁকে পেয়ে বসেছে। ধর্ম নিশ্চয়ই কঠিনতর বস্তু দিয়ে তৈরি। চরিত্র নিশ্চয়ই আরো কঠিনতর বস্তু দিয়ে তৈরি। অহিংসা নিশ্চয়ই আরো কঠিনতর বস্তু দিয়ে তৈরি। মহাত্মা গান্ধীও বলতেন, 'আমি ভীরুর অহিংসা চাই না। কেবল সাহসীর অহিংসাকেই *অহিংসা* বলা চলে।'

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের দিকে তাকিয়ে দুটি বিখ্যাত শ্লোকে তাঁকে তিরস্কার করলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন, যা কিছু তিনি সত্য বলে মনে করেছেন তা সত্য নয়। রুগ্ণ, দুঃখে উদ্বিগ্ন মন দিয়ে কেউই নিজেকে ঠিক ঠিক বিচার করতে পারে না। দুঃখে উদ্বিগ্ন মন বিচারশক্তি হারিয়ে ফেলে। শান্ত ও স্থির হলে, তবেই আপন মনের অবস্থা ভাল বোঝা যায়। তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই অংশটি গীতা পাঠের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন— জীবনযুদ্ধ থেকে পালাতে নেই। পালানো সহজ। তার জন্য তুমি নানা যুক্তিও দেখাতে পার, অনেকে তা করেও। মনে করো, কারও বাড়িতে ঝামেলা চলেছে, আর সে তার প্রতিকার না করে পালালো কাশীতে। তখন কিছু লোক তাকে বলবে—আহা! তুমি কী চমৎকার, তোমার কত বৈরাগ্য। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তা বলবেন না। তিনি বললেন—তুমি দুর্বল, তুমি তোমার কর্তব্য করছ না, এইসব কর্তব্যকে তুমি পাশ কাটিয়ে যাচ্ছ। মানুষের মনুষ্যত্ব আছে, তা ভুললে চলবে না। তাই জীবনে এইসব সমস্যা আসে, আর শ্রীকৃষ্ণ ও এযুগে স্বামী বিবেকানন্দের মতো লোক আমাদের বলেন—যাও এই সব সমস্যার সম্মুখীন হও। ভেতর থেকে নতুন নতুন শক্তিকে জাগিয়ে তোলো। এই ভাবেই আমাদের জীবনে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে, আর আমাদের মন হয়ে ওঠে অচঞ্চল ও স্থিরসঙ্কল্প—তখন সব বিষয় পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। বিশেষ সময়ে কী

তোমার কর্তব্য? সেটি তোমাকেই খুঁজে পেতে হবে। অর্জুন ভ্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি অবসাদগ্রস্ত। সে অবস্থায় তাঁর বিচারের কোন মূল্যই থাকতে পারে না। আর তাই, সঞ্জয় দ্বিতীয় অধ্যায় এই বলে শুরু করছেন ঃ

সঞ্জয় উবাচ

সঞ্জয় বললেন—

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ ॥

মধুসূদনঃ উবাচ ঃ 'মধুসূদন বললেন' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বললেন; *ইদম্ বাক্যম্*, 'এই কথা শ্রীকৃষ্ণ উচ্চারণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ কী বলেছিলেন তা পাওয়া যাবে পরবর্তী দুটি শ্লোকে। কিন্তু তিনি কাকে বললেন? অর্জুনকে। কী রকম অর্জুনকে? *বিষীদন্তম্* 'গভীর শোকাপন্ন'; *কৃপয়াবিষ্টম্*, 'দয়ার্দ্র চিত্ত'; অর্জুনের অবস্থা তখন শোচনীয় (করুণাযোগ্য), উপরন্তু, *অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্*, 'অর্জুনের চোখ দিয়ে জল পড়ছিল'। এগুলি নিশ্চয়ই স্থিরতা বা সাহস বা বলের লক্ষণ নয়।

এই অবস্থায় অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ একথাগুলি বললেন। অর্জুনের অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। তাতে যথেষ্ট রোগলক্ষণ ছিল, ছিল সুস্থতার অভাব। সুস্থ মন এরকম হয় না। প্রথমে তাই আমাদের জানতে হবে। কোন সমস্যা নিয়ে কাঁদা বা বিলাপ করা সুস্থ অবস্থার লক্ষণ নয়। সমস্যা যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে হয়, তখন অবশ্যই কাঁদতে ও বিলাপ করতে পারা যায়। কিন্তু যদি পার তবে এই সমস্যার মুখোমুখি হতে চেষ্টা কর। এক এক সময়ে সমস্যার সম্মুখীন হওয়া যায় না। বিবেকানন্দ এক জায়গায় বলেছেন, 'সমস্যার সঙ্গে আমি লড়ব, অথবা পালাবার পথ দেখব।' পালানো দোষের নয়, যদি লড়াই করার যথেষ্ট চেষ্টা হয়ে থাকে। এটি একটি ইতিবাচক মনোভাব। শ্রীকৃষ্ণ এই মনোভাবই অর্জুনের কাছে ব্যক্ত করতে যাচ্ছেন, আর এই প্রসঙ্গে তিনি সকল মানুষের জন্য এক বিস্ময়কর জীবনদর্শন ব্যাখ্যা করবেন। আমাদের লোকেদের মধ্যে কেউ হয় তো অর্জুনকে বলবেন, তুমি যা বলেছ তা সত্য, তুমি বাড়ি যাও, দরিদ্রের বেশ পরে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা কর ও সন্ন্যাসীর জীবনযাপন কর। কিন্তু সমস্যা থেকে দূরে পালিয়ে গেলেই তার সমাধান হবে না; কারণ সমস্যা তোমার পেছনে ধাওয়া করবে। তোমাকে কোন না কোন সময়ে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। কী চমৎকার ভাবই না প্রকাশ পাচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের এই দ্বি-শ্লোকী উত্তরে ঃ

শ্রীভগবান, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বললেন :-

শ্রীভগবান্ উবাচ

শ্রীভগবান বললেন—

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন ॥ ২ ॥

এটি সহজ সংস্কৃত, আর গভীর অর্থপূর্ণ ঃ *কুতস্ত্বা, কুতঃ*—কোথা থেকে, *ত্বা*—'তোমার কাছে' এল; *কশ্মলম্*—'এত হীন ভাব', *কশ্মল*—সংস্কৃত কথা, সব মন্দভাবকে বোঝায়। *বিষমে সমুপস্থিতম্,* 'এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে' তুমি এইরকম যুক্তি তুলে ধরছ ও এই দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলেছ। দুই সৈন্যদলের মধ্যে, যুদ্ধ আরম্ভ হয় হয়; এমন সময়ে তুমি বলছ, 'না আমি যুদ্ধ করতে পারব না, চললাম। আমি হৃষীকেশ যাচ্ছি। *অনার্যজুষ্টম্,* 'এ কাজ অনার্যসুলভ, কোন মহৎচিত্ত ব্যক্তি কখনই এমন দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে না।'

আর্য বলতে জাতি নয়; *আর্য* হলো মহৎ চিত্ত ব্যক্তি। *আর্য* কথাটিকে প্রায়ই জাতির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়। প্রথমে পশ্চিমী ঐতিহাসিকগণ এই *আর্য* জাতি তত্ত্ব উপস্থাপিত করে। তাই থেকেই হিট্‌লারের *আর্যজাতির* শ্রেষ্ঠত্ব মনোভাবটি গড়ে ওঠে। হিট্‌লারের মৃত্যুর সঙ্গেই আর্যজাতি তত্ত্বেরও মৃত্যু হয়! কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় *আর্য* কথাটি মহৎ চিত্ত ব্যক্তিকেই বোঝায়। যে কোন সংস্কৃত নাটকে দেখা যাবে কোন ব্যক্তি নাটকের অন্য চরিত্রকে সম্বোধন করতে হলে বলবে 'প্রিয় *আর্য*—মহৎ চিত্ত ব্যক্তি।' বুদ্ধও তাঁর উপদেশাবলীকে *আর্যসত্যানি,* মহৎ সত্য, বলতেন। সেখানে *আর্যের* প্রতিশব্দই হলো মহৎ। মহৎ সত্য—*আর্যসত্যানি,* চারটি। এই অর্থেই *আর্য* কথাটি বুদ্ধ ব্যবহার করেছেন, যেমন করা হয়েছে পূর্বতন বৈদিক সাহিত্যে। *আর্য* কথাটি তাই সংস্কৃত ভাষায় একটি অতি মহান শব্দ। *আর্য* হওয়া মানে মহৎ-চেতা হওয়া। সামান্য হয়ো না, ছোট হয়ো না। তাই শ্রীকৃষ্ণ একে বলছেন, *অনার্যজুষ্টম্,* তুমি যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছ তা 'আর্যেরা নেয় না।' যারা নিকৃষ্টচিত্ত, যারা *আর্য* নয়, তারাই কেবল তোমার দৃষ্টিভঙ্গি নেয়। *অস্বর্গ্যম্,* 'এতে স্বর্গে বা মর্তে কোথাও তোমার গৌরব বৃদ্ধি হবে না।' *অকীর্তিকরম্,* 'এতে তোমার বদনামও হবে' অপযশ হবে। অর্জুন এক মহান যোদ্ধা ছিলেন; তিনি দৌর্বল্যের শিকার হবেন। জগতে তাঁর সুনামে ভাঁটা পড়বে। *অনার্যজুষ্টম্, অস্বর্গ্যম্, অকীর্তিকরম্,* এই তিনটি কথা অর্জুনের ওপর হঠাৎ মানসিক অভিঘাত প্রয়োগ

মাধ্যমে চিকিৎসা পদ্ধতির মতো কাজ করল। মানসিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে এমন চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। তাই শ্রীকৃষ্ণ এখানে সেই ব্যবস্থা নিলেন। অর্জুন এরকম আশা করেন নি, তিনি ভেবেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিঠ চাপড়ে বলবেন—বা! বেশ করেছ। তুমি *এমনই* মহাত্মা সকলের প্রতি তোমার এতই করুণা যে, তুমি কাউকে বধ করতে চাও না। তুমি যোদ্ধা না হয়ে, সন্ন্যাসী ফকির হতে চাও। এই সব কথা যা অর্জুন আশা করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে, তা তিনি পেলেন না। তিনি তাঁকে তিরস্কার করছেন, এই রকম মানসিক আঘাত দিয়ে চিকিৎসা করছেন। এই শ্লোকটি নেতিবাচক পথ দেখিয়েছে। এইবার ইতিবাচক পথ দেখিয়ে শ্রীকৃষ্ণ পরবর্তী শ্লোকে বলছেন—

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥৩॥

এটি একটি শক্তিদায়ী শ্লোক। *ক্লৈব্যম্*—এর অর্থ ভীরুতা, বলা যেতে পারে, দুর্বলতা, সম্পূর্ণ শক্তিহীনতা; যাতে কোন পৌরুষ নেই। *মা স্ম গমঃ পার্থ,* ' হে অর্জুন, এই হীনমন্যতার, ভীরুতার শিকার হয়ো না। কেন? *নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে,* 'এ তোমাতে শোভা পায় না।' তুমি এত বড় বীর, তুমি এত মহান, এত বিরাট। এ রকম ব্যবহার তোমার উপযুক্ত নয়। কী চমৎকার ভাব! আমি যখনই শ্লোকের এই অংশটি পড়ি, এই চমৎকার ভাবটি আমার পছন্দ হয়, শিশুদের বলবার উপযুক্ত—এটি তোমায় মানায় না, তুমি এত ভাল, তুমি এত মহান তুমি যেমন ব্যবহার করছ তা তোমায় মানায় না। এ থেকে মানুষের অন্তরের সর্বোত্তম ভাবটি প্রকাশ পাবে। তাই, *নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে* 'এটি তোমায় মানায় না'—এই কথাটি শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শিক্ষানীতিরূপে তাদের অভিভাবক ও শিক্ষকদের কাছে গ্রহণীয় হতে পারে। সাধারণ ভাবে নর-নারীর পরস্পর কাজ কর্মের ক্ষেত্রেও 'এ ব্যবহার আপনার শোভা পায় না'—কথাগুলি প্রযোজ্য। এর অর্থ হলো, যে নর বা নারী নিজ স্বভাব ভুলে গিয়ে নিজ মর্যাদার পক্ষে হানিকর কিছু কাজ করছে, তাকে তুমি শ্রদ্ধা কর। তাই এটি তার কাছে একটি ইতিবাচক অনুরোধ। এতে তোমার মধ্যে, তথা শ্রোতার মধ্যে, অন্তর্নিহিত উৎকৃষ্ট ভাবটি জাগিয়ে তোলার ক্ষমতা রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, এটি তোমার প্রকৃত রূপ নয়। কোন মায়া তোমাকে আচ্ছন্ন করেছে। এই দুর্বলতা, এই অবসাদ—যাকে স্নায়বিক বিপর্যয় বলে—এ তো তোমার প্রকৃত রূপ নয়। যখন আমাদের স্নায়ু বিপর্যস্ত হয়, আমরা তখন কতই না দুর্বল হয়ে পড়ি, যেন একটি শিশু।

যখন আমি করাচিতে ছিলাম, তখন এক উদারমনা ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে আমার নিবিড় যোগাযোগ ছিল। তিনি এক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং ছাত্রবৃন্দ ও শিক্ষকগণ তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত। একবার তাঁর স্নায়বিক দৌর্বল্য (অবসাদ) দেখা গেল। তাঁর অবস্থা শিশুর মতো হয়ে গেল, তাঁর শক্তি, তেজ ও সাহস যেন একেবারে চলে গেল; কারও সঙ্গে দেখা করতে পারেন না। তিনি কলেজে যান না, বাড়িতে থাকেন। আমি তাঁকে গাড়িতে তুলে নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে গেলাম ও অধ্যক্ষের চেয়ারে বসিয়ে দিলাম; আপনি এমন মহাত্মা, এত উদার—এ কলেজ আপনিই চালাবেন। আমি যেমনি চলে এসেছি, তিনিও কলেজ থেকে চলে এসে, বাড়িতে বসে রইলেন। কারও সঙ্গে তিনি দেখা করতে পারতেন না। কিন্তু ছ-মাস পরে সবই পাল্টে গেল। তিনি সব শক্তি ফিরে পেলেন। এ যেন মেঘ এসে সাময়িক ভাবে সূর্যকে ঢেকে দেওয়ার মতো। আবার আগের মতো অদ্ভুত কর্মযজ্ঞ তিনি চালাতে লাগলেন। তিনি ভারতে আরো দুটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গড়ে তুলে, তাদের উন্নতি সাধন করলেন; পরে অত্যন্ত শান্তিতে দেহত্যাগ করেন।

স্নায়বিক দৌর্বল্যের শিকার হলে, তুমি তোমার ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেল, তোমার পুরানো সত্তার মৃত্যু হয়। প্রকৃত পক্ষে তার মৃত্যু হয়নি; সেই সত্তা যথাস্থানেই থাকে, কেবল দুর্বলতা এসে তাকে মেঘের মতো ঢেকে ফেলে। তাই আমরা যাই মনস্তাত্ত্বিকের কাছে, তিনি যেমন করেই হোক আমাদের সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনেন। এতো প্রাত্যহিক ঘটনা। মানুষ মূলত দেবভাবাপন্ন, অনুভূত দুর্বলতা তার প্রকৃতরূপ নয়; কিছু অন্তর্নিহিত শক্তি তার আছে—আর তাই হলো মূল বৈদান্তিক শিক্ষা। তাই আমেরিকায় যখন স্বামীজীকে প্রশ্নকালে জিজ্ঞাসা করা হয়—স্বামীজী, আপনি কি বেদান্তের নামে এক রকম সম্মোহন বিদ্যা প্রচার করছেন না? —জনগণকে কেবল সম্মোহিত করে বেড়াচ্ছেন। তাৎক্ষণিক প্রত্যুত্তরে স্বামীজী হেসে বলেছিলেন, 'না মশাই, তারা আগে থেকে সম্মোহিত হয়েই আছে, আমি তাদের মোহমুক্ত করছি। তারা বলে, 'আমি সাদা,' 'আমি কালো', 'আমি এইরকম', 'আমি ঐরকম'—এসব মিথ্যা। তুমি হলে সেই অনন্ত আত্মা, সর্বভূতে এক আত্মা; এই হলো তোমার প্রকৃত স্বরূপ। *তত্ত্বমসি, তত্ত্বমসি,* 'তুমিই সেই', 'তুমিই সেই'—তুমি এই ক্ষুদ্র দেহেন্দ্রিয় সর্বস্ব নও—তোমার মধ্যে এক নিগূঢ় সত্তা বিদ্যমান।'

তাই, সব শিক্ষাতেই এই গুণ রয়েছে ঃ শিক্ষা তোমাকে মোহমুক্ত করে।

কিছু দুর্বলতা এসে, তোমার প্রকৃত রূপকে ঢেকে দিয়েছে। আসলে তুমি সবলই। তুমি কিভাবে জানবে, কত রকম তেজ ও শক্তি তোমার মধ্যে রয়েছে। তুমি তা জান না। সেজন্য হতাশ হয়ো না। তুমি এই কষ্টকর অবস্থা অতিক্রম করবে। অতিক্রমণের শক্তি তোমার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। বেদান্ত এই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যেকের কাছেই ঘোষণা করে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ সেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে অর্জুনকে বলছেন—*নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে*, 'এ দুর্বলতা তোমায় শোভা পায় না।' এ সাময়িকভাবে এক আপাত মতিভ্রম, একটা পাতলা মেঘ সেখানে এসে সূর্যকে ঢেকে দিয়েছে। সূর্য সেখানেই আছে; মেঘ সরে যাবে, আবার সূর্যের তেজ বিকীর্ণ হবে। এই ভাবেই তোমাকে মানবিক দুর্বলতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তুমি প্রকৃতপক্ষে দুর্বল নও। তুমি কার্যত সবল। কিন্তু যখন তুমি এই সত্য উপলব্ধি করতে পার না, তখন তুমি প্রতিটি সমস্যা নিয়ে বার বার কাঁদতে থাক, শিশুর মতো। শিশুর একমাত্র ভাষা হলো ক্রন্দন; আর কিছুই নেই। বয়স্ক লোকেরাও শিশুর মতো হয়ে যায়। গত কয়েক শতাব্দীর ভারত সম্বন্ধে পর্যালোচনা করে স্বামী বিবেকানন্দ রোগ নির্ণয় করেছিলেন যে, এটি একটি সদা ক্রন্দনরত জাতি। পরে তিনি বলেন—

> **'আমরা অনেক দিন ধরে কেঁদেছি; এখন আর কাঁদার প্রয়োজন নেই, এখন নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মানুষ হও।'"[১]**

বিবেকানন্দের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে এটি একটি বিখ্যাত অংশ। আমাদের পরিবেশের অপ্রতুলতার কথা ভাবতে ভাবতে সমগ্র জাতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কেঁদেই চলেছে। আমরা আমাদের নিজ শক্তি সম্বন্ধে অবহিত ছিলাম না। ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসছে। হ্যাঁ, সমস্যা আছে; কিন্তু এগুলির সঙ্গে মোকাবিলার পথও আমাদের বার করতে হবে। আর ক্রন্দন নয়। আমাদের নিজ শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে, এইসব সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে।

১৯৬৩-৬৪ খ্রিঃ আমি জাকার্তা গিয়েছিলাম, বিবেকানন্দ জন্ম শতবার্ষিকীর সময়; তখন প্রেসিডেন্ট, ডঃ সুকর্ণো ইন্দোনেশিয় ভাষায় রচিত বিবেকানন্দ-বিষয়ক 'স্বর বিবেকানন্দ' শীর্ষক একটি পুস্তকের মুখবন্ধ লিখেছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় *স্বর* শব্দের অর্থ শব্দ, ইন্দোনেশিয় ভাষায় এর অর্থ কথা, বিবেকানন্দের কথা। সুকর্ণো সেই ভূমিকা লিখেছিলেন, আবার এক ঘণ্টা টি.ভি. অনুষ্ঠানেও অংশ নিয়ে গ্রন্থটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেছিলেন। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত,

---

১ বাণী ও রচনা ৪র্থ সং, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৮৮

আপ্‌পা পন্থ, সেখানে আমার তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ঐ ভূমিকায় এই অদ্ভুত অংশটি স্থান পেয়েছিল। সুকর্ণো বাল্যকাল থেকেই স্বামীজীর ভাবের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর শোবার ঘরে এক সেট বিবেকানন্দ রচনাবলীর ইংরাজি সংস্করণ Complete Works of Swami Vivekananda রাখতেন। তিনি আমাকে বললেন, 'প্রতিদিন রাত্রে আমি এর দুটি একটি পাতা পড়ি।' তাই মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন ঃ

'স্বামী বিবেকানন্দ, আহা! কী সুন্দর নামটি! তিনিই সেই ব্যক্তি ছিলেন যিনি আমাকে শিখিয়েছিলেন, কেমন করে দেশবাসীকে ভালবাসতে হয়, কি করে দেশকে ভালবাসতে হয়, কি করে সমগ্র পৃথিবীকে ভালবাসতে হয়। তিনিই বলেছিলেন, "আমরা বহুদিন কেঁদেছি। আর নয়। এখনি পায়ের ওপর দাঁড়াও, মানুষ হও।" ভবদীয় সুকর্ণো।' গ্রন্থখানি ইংরেজি ও ইন্দোনেশিয়—দুই ভাষাতেই প্রকাশিত হয়েছিল।

তাই দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান যুগে স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে নতুনভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে এবং স্বামীজী এই শ্লোক দুটিকে খুবই পছন্দ করতেন। তাঁর *গীতা*-বিষয়ক আলোচনায় তিনি বলেছেন, যদি তুমি এই দুটি শ্লোকের ভাব বুঝে থাক, তবে তুমি *গীতার* সামগ্রিক ভাবও বুঝতে পারবে। এতে এমন একটি দর্শনের প্রবর্তন করা হয়েছে যা কাদামাটিকেও বীর যোদ্ধায় পরিণত করতে পারে। এই ভাবটিকে ধরতে হবে। আমরা তা পারতাম, আমরা সবাই *গীতা* পড়েছি। কিন্তু আমরা গীতার এই শক্তিপ্রদ বাণীর যথার্থ মর্ম অনুধাবন করতে পারিনি। এখন স্বামীজী এসেছেন ও একই শক্তিপ্রদ মর্মবাণী আমাদের দিয়েছেন সমস্যার সম্মুখীন হতে। ইংলন্ড ও আমেরিকায় *জ্ঞানযোগের* ওপর তিনি যে সব বক্তৃতা দিয়েছেন, তাতে এই বিশেষ সত্যটির উল্লেখ করেছেন, স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে।

তাঁর ভারত পরিব্রজ্যাকালে সম্ভবত বারাণসীতে একবার একদল বানর তাঁকে তাড়া করেছিল। একজন পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হিসেবে তিনি তখন সারা ভারত পর্যটনরত। বারাণসীর বানরগুলি ভয়ঙ্কর। সেই বানরগুলি তাঁকে তাড়া করতে থাকলে স্বামীজী দৌড়ে পালাচ্ছিলেন। দূর থেকে এক *সাধু* চিৎকার করে তাঁকে বললেন, 'বাবাজী, পালিয়ে যেয়ো না; পশুগুলির মুখোমুখি হও।' স্বামীজী ভাবলেন, 'এতো এক চমৎকার শিক্ষা।' তিনি এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে তখুনি ফিরে দাঁড়ালেন বানরদের দিকে। বানরগুলি পালিয়ে গেল। এই গল্পটি

স্বামীজী তাঁর লন্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতায় উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'পশুর সামনাসামনি হও', 'পশুর সামনাসামনি হও।' অন্যথায়, তুমি যদি পালাতে থাক পশুটিও তোমাকে সারা জীবন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে। একে মনুষ্যত্ব বলে না। মানুষের অন্তরে অনেক বেশি সামর্থ্য লুকানো আছে। তাই অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এই ঔষধ প্রয়োগ, যা আমাদের সকলেরই প্রয়োজন। সমগ্র জাতি, তথা এই বিশ্বের দরকার এই ঔষধের।

তাই, দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বললেন ঃ *ক্লৈব্যম্ মা স্ম গমঃ পার্থ*—'ক্লৈব্যের কাছে নতি স্বীকার করো না।' বস্তুত *ক্লৈব্যের* অর্থ হলো যে মানুষ, নরও নয়, নারীও নয়—একরূপ নপুংসক বা ক্লীবলিঙ্গ ব্যক্তি। ক্লৈব্য কথাটির সঙ্গে জড়িত রয়েছে দুর্বলতা, মনোবলশূন্যতার ভাবটি। *নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে*, 'এমনটি তোমার উপযুক্ত নয়।' তোমার স্বভাব এত মহান, বীরত্ব, সাহস, সবই তোমার রয়েছে। *ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ*। অর্জুন হতোদ্যম হয়ে রথের ভেতরে বসে পড়েছিলেন। সেই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ বললেন, *উত্তিষ্ঠ*, 'উঠে পড়'। এই হলো শক্তির প্রথম চিহ্ন। যতক্ষণ শুয়ে থাকা, ততক্ষণ সেই আগের দুর্বলতা রয়েছে। তাই 'উঠে দাঁড়াও' 'উঠে দাঁড়াও' বলা; মানব সত্তাকে জাগাবার এ এক ওজস্বিনী বাণী। নিজের পায়ে দাঁড়াও—মানুষ হও। তাই, এই *ক্লৈব্যকে* ছাড়ো। *ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্বল্যম্*, 'হৃদয়ের এই দুর্বলতা' যা *ক্ষুদ্র* অর্থাৎ হীনতা, তাকে ত্যাগ কর। অর্জুন দাঁড়িয়ে উঠে সমস্যার মুখোমুখি হও। শ্রীকৃষ্ণের এই কথা যেমন অর্জুনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তেমনি আমাদের সকলের ক্ষেত্রেও—যখন আমরা বিপদে পড়ি এবং আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ হয়ে থাকি, তখন আমরা মনে করি, আর অগ্রসর হওয়া যেন আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, অথবা তখন আমরা ভেঙ্গে পড়ি। তখন আমাদের মধ্যে নব বলের সঞ্চার ঘটাতে কাউকে এগিয়ে আসতে হয়। শক্তি আছেই। কিন্তু কেউ স্পর্শ না করলে তার উন্মেষ ঘটে না। আমাদের সকলের তা প্রয়োজন। বস্তুত, তোমার জীবনে তুমি দেখতে পাবে, যদি কেউ দুর্বল হয়, কিছু প্রেরণা দিয়ে তাকে তুমি শক্তিমান করে তোল—সে অনুভব করে তার শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে। এমনকি প্রশংসাসূচক বাক্যেও মানুষের শক্তি বেড়ে যায়। *রামায়ণে* আছে, যখন সীতার অন্বেষণে বহুলোককে এখানে ওখানে পাঠান হয়েছে, হনুমানকে বলা হলো 'দক্ষিণে যাও, তুমি সফলকাম হবেই।' হনুমান কার্যভার নিলেন। তখন অঙ্গদ অথবা অন্য কোন বানর তাঁর প্রশংসা করে বলতে লাগলেন, 'তুমি এত বড় মহাত্মা; তুমি জীবনে কত বড় বড় কাজ

করেছ।' এই সবের কারণে সীতাকে খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে হনুমানের আত্মপ্রত্যয় বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল ও শেষে তিনি কৃতকার্যও হয়েছিলেন।

সামাজিক ব্যবহারে দু-রকম করা যায়; হয় কারও আত্মপ্রত্যয় নষ্ট করে দেওয়া যায়, নতুবা তা বাড়িয়ে দেওয়া যায়। ভারতে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেতিবাচক কাজ করেছি। আমরা পরস্পরের আত্ম-প্রত্যয় বিনষ্ট করে দিয়েছি। অপরের মহৎকাজের প্রশংসা কর; তাতে তখনি তার বোধ হবে, 'আমি পারি, হ্যাঁ, আমি পারি।' এই ভাবেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সঙ্গে ব্যবহার করছেন, বলছেন, উঠে দাঁড়াও। সমস্যার সামনাসামনি হও। দুর্বল হয়ো না। কোনও ধরনের দুর্বলতার মধ্যে কোন গুণধর্মের অবকাশ নেই। বেদান্ত একটি মহৎ শিক্ষা দেয় ঃ দুর্বলতা আর মানবিক গুণধর্ম কখনই এক সাথে যায় না। গুণই শক্তি; দুর্বলতা কোন রকম গুণই নয়। যেখানে সাহস নেই, সেখানে গুণও নেই। *বীরঃ* সংস্কৃত ভাষায় এই মহান শব্দের অর্থ বীরপুরুষ, সাহসী যোদ্ধা বা আদর্শপুরুষ। তার মধ্যেই মানবিক গুণাবলীর অধিষ্ঠান হয়ে থাকে। দুর্বলের ধর্ম কোথায়? ধর্ম, মানবিক গুণ এমনকি সদ্ভাবের ধারণা, অবশ্যই শক্তি ও নির্ভীকতার সঙ্গে সম্পর্কিত। তবেই তা ইতিবাচক হয়। যেভাবেই হোক, আমরা সেভাবে কাজ করিনি, যে লোক অপদার্থ তাকেই আমরা ভাল বলে থাকি, কারণ সে নারী বা নর যাইহোক—কারও ক্ষতি করে না। তার ক্ষতি করবার ক্ষমতাই নেই; এতে সদ্ভাব কোথায়? এতে গুণটাই বা কোথায়? তাই, এইভাবেই শত শত বছর ধরে আমাদের বিচারে ভুল থেকে গেছে। তাই, যে সব বাপ-মা আশ্রমে আসেন তাদের মধ্যে কারও বাড়িতে যদি অপদার্থ ছেলে থাকে, তাঁরা বলেন, 'স্বামীজী, এই একটি ছেলে রয়েছে, একে আপনার আশ্রমের সন্ন্যাসী করে নিন; আপনাদের কাছে এ খুব ভালই হবে।' এর অর্থ হলো, সংসারে যে কোন কাজের নয়, সেই যেন আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে ভাল হয়। কিন্তু এর বিপরীতটিই সত্য। তাই বলি, এ বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ চিন্তাধারাই ত্রুটিপূর্ণ। ওতে বীরত্বব্যঞ্জক মনোভাবের অভাব। ওতে শক্তি আর নির্ভীকতার অবকাশ নেই। আর তাই বিবেকানন্দ এসে প্রচার করলেন—*শক্তি* ও *অভীঃ*—এই দুই মহামন্ত্র।

জবাহরলাল নেহরু স্বামীজীর এই বাণী সম্বন্ধে তাঁর *Discovery of India* গ্রন্থে লিখেছেন, 'তিনি দেশবাসীকে এক সাহসিকতার মনোভাব দিয়ে গেলেন।' যে কোন মহান আচার্যের কাছ থেকে আসা শক্তি, মানবোচিত উদ্দীপনা হলো

তাঁর মহত্তম অবদান। আমাদের এই ধরনের শিক্ষার প্রসার চাই আরো বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে। পুরাকালে শ্রীকৃষ্ণ তা দিয়েছিলেন। তিনি শক্তি ও নির্ভীকতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন, আর সমগ্র বেদান্তই এই শক্তি ও নির্ভীকতার মন্ত্রস্বরূপ। দুর্বলতার ওপর কোন রকম জোর দেওয়া হয়েছে, এমনটি বেদান্তে পাওয়া যায় না। সর্বদাই *অভীঃ, অভীঃ, অভীঃ*। *অভীঃ* এর অর্থ নির্ভীক; নির্ভীক হও, নির্ভীক হও। সমগ্র বিশ্বের এবং মানব সত্তার আদি উৎস হলেন যে ব্রহ্ম, তিনি *অভয়ম্*। ঈশ্বরের নাম কী? অভয়। ঈশ্বরলাভ হলে, নির্ভয় হওয়া যায়। তাই, *অভয়ম্ বৈ প্রাপ্তোঽসি জনকঃ*—*বৃহদারণ্যক উপনিষদে* আছে, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য রাজা জনককে বলছেন ঃ 'জনক, তুমি ভয়হীন অবস্থা অর্জন করেছ।' এই হলো তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা। ভয়হীনতার মাধ্যমেই তোমার আধ্যাত্মিক ভাবের উৎকর্ষ সাধিত হতে পারে; দুর্বলতার মাধ্যমে নয়। সব পশুই দুর্বল; তারা জন্তু। এক মানব সত্তাই ভয়হীন হতে পারে, স্বীয় অন্তরে অধিষ্ঠিত ঈশ্বর সত্তার অনুভূতিতে। বিবেকানন্দ বলেন, উপনিষদের পাতায় পাতায় কেবল একটি বাণীই প্রচার করা হয়েছে—তা হলো নির্ভীকতা ও শক্তি। তুমি কি শক্তিমান? মানব হৃদয়ের জিজ্ঞাসা ঃ মানবের কি কোন দুর্বলতা নেই? বেদান্ত বলে, হ্যাঁ আছে। কিন্তু দুর্বলতা দিয়ে কি তুমি দুর্বলতা দূর করতে পার? দুর্বলতা দূর করা যায়, একমাত্র শক্তির সাহায্যে। ময়লা দিয়ে ময়লা ধোয়া যায় না। কেবল বিশুদ্ধ জলেই ময়লা ধোয়া যায়। তেমনি, আর একটি দুর্বলতা তোমার বর্তমান দুর্বলতাকে দূর করতে পারে না। শক্তিই হলো জাগতিক ব্যাধির একমাত্র প্রতিষেধক। এই হলো বেদান্তের বাণী। আধ্যাত্মিকতার পথে তুমি যতই অগ্রসর হবে তুমি ততই আরো নির্ভীক হবে, আরো শক্তিমান হবে, আরো হৃদয়বান হবে। ভয়হীনতা ও হৃদয়বত্তা—এ দুটি গুণের সংহতি ঘটাতে হবে। সকল ভারতীয় সাহিত্যেই এই দুটি দুরূহ গুণের সমাবেশ দেখা যায়। তীব্র নির্ভীকতা, আর তীব্র হৃদয়বত্তার একত্র সমাবেশ ঘটানো কঠিন কাজ। তুমি এতটাই ভয়ানক হতে পার, যাতে অন্যেরা তোমাকে ভয় পাবে। অথবা, তুমি এতটাই দুর্বল হতে পার যে, যে কোন লোক তোমাকে ভয় দেখাতে পারে। দুই চরম অবস্থাই আমরা দেখেছি। কিন্তু আমাদের সমগ্র সাহিত্যে এই বিরল সমাবেশকেই তুলে ধরা হয়েছে। এই গীতাতেই দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলবেন, 'সেই আমার প্রকৃত ভক্ত'—যে নর বা নারী নির্ভীক ও শক্তিমান হয়েও সর্বজীবের প্রতি হৃদয়বান। সে কাউকেও ভয় করে না; সে অন্যের ভয়ের কারণও নয়, যেহেতু তার স্বভাব এমনই শান্ত। *যস্মাৎ ন উদ্বিজতে লোকঃ লোকাৎ ন উদ্বিজতে চ যঃ* (১২.১৫),

তাই হলো আধ্যাত্মিক উন্নতি ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির লক্ষণ। তাই দেখা যায় প্রত্যেক মানব সত্তা সম্বন্ধীয় সামগ্রিক বিষয়টি হলো বৃদ্ধি, উন্নতি ও পরিপূর্ণতা। এই বিষয়টি নিয়েই শ্রীকৃষ্ণ *গীতার* আঠারোটি অধ্যায়ে নাড়াচাড়া (পর্যালোচনা) করেছেন।

আমার অষ্ট্রেলীয়, মার্কিনী ও অন্যান্য বন্ধুদের, আমি যেমন বলেছিলাম—যুদ্ধ নিয়ে কথা তো কেবল প্রথম অধ্যায়েই আছে। পরে, 'যুদ্ধে'র কথা কোথাও নেই। মানবের সামগ্রিক উন্নতির বিরাট সমস্যাটি নিয়েই তিনি বরাবর পর্যালোচনা করেছেন। সুতরাং এটি যুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ নয়। এতে মানবের উন্নতি ও পূর্ণতাসাধন সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয়েছে। কেউ বলবে না যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং হিটলার ও তার রাজনীতিক ও জাতিবৈষম্যমূলক আদর্শের সম্পূর্ণ পরাজয় ভুল হয়েছিল। যে দর্শন শক্তি ও নম্রতার সমন্বয়ের কথা বলে, সেই দর্শনই মানুষের সু-উন্নত চারিত্রিক বিকাশের পক্ষে সহায়ক হয়। গীতায় একদিকে মহনীয় মানসিক উদারতা এবং অন্যদিকে বিশ্বাস ও দৃঢ় প্রত্যয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কথাও বলা হয়েছে—যাদের সহাবস্থান অনেক সময়েই ব্যর্থ হয়। অনেকে বলে, আমি বিশ্ব নাগরিক। একটু পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে যে তার কোন বিশেষ বিষয়ে প্রত্যয় নেই। সে যেহেতু নিজের কাছে কিছুই নয়, সে যেন আর সকলের কাছে সব কিছুই। এই রকম সস্তা বিশ্বনাগরিকত্ব ভাব, যা কোন কোন লোক গ্রহণ করে, তা আসে গভীরতার অভাব থেকে; মানসিক প্রসার আছে কিন্তু গভীরতা নেই। কিছু গভীরতাসম্পন্ন লোক আছে, তারা আবার গোঁড়া প্রকৃতির। তারা নিজ-বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে থাকে, আর অন্য সকলের সমালোচনা করে। সেরকম গভীরতা তোমরা দেখেছ। কিন্তু স্বামীজী বলেছেন, বেদান্ত চায় গভীরতার সঙ্গে বিস্তার ঃ উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও দৃঢ়বিশ্বাসের সহাবস্থান। এ দুই-এর সমন্বয়েই উৎকৃষ্ট চরিত্র গড়ে ওঠে। আমাদের হতে হবে, 'সমুদ্রের মতো গভীর আর আকাশের মতো বিস্তৃতি'; এই ছিল তাঁর কথা। বেদান্ত চায়, সমগ্র জগতে সব লোকের চরিত্র ধীরে ধীরে ঐরকম হয়ে উঠুক। সুতরাং এখানে রয়েছে বৃদ্ধি, উন্নতি ও পূর্ণতাসাধনের এক নিগূঢ় দর্শন। কিন্তু তা তুমি পাবে না, যখন তোমার মন অবদমিত, যখন তুমি স্নায়বিক ও মানসিক দিক থেকে পর্যুদস্ত। কিছু স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না এলে এই বাণী তোমার কাছে পৌঁছবে না।

তাই শ্রীকৃষ্ণ এই দুটি শ্লোকের মাধ্যমে অর্জুনের ভগ্ন মনে প্রাথমিক প্রলেপ

প্রদান করছেন। প্রলেপের ফল হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই কথাগুলি বলছিলেন, অর্জুন কতকটা শক্তিলাভ করেছিল, তাঁর মন কতকটা স্থিতিশীল হয়েছিল। এরপর তিনি আরো কিছুটা সংলগ্নভাবে কথা বলতে পেরেছিলেন—তাই এবার আমরা দেখব। অর্জুনের কথায় একটু সংহতভাব দেখা যাচ্ছে, পূর্বের বিমর্ষতা আর নেই। শ্রীকৃষ্ণ তা দূর করেছিলেন তাঁর শক্তিপ্রদায়ী বাণীর মাধ্যমে। একটু শান্ত হয়ে, আরো একটু বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণাদায়ী কথাগুলির উত্তরে নিজ যুক্তি দেখাচ্ছেন।

এই হলো দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ থেকে নবম শ্লোকের বিষয়। এই কথাই *কঠোপনিষদের* (১/৩/১৪) কয়েকটি তেজোদ্দীপ্ত কথায় বলা হয়েছে, *উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত*, 'ওঠো, জাগো, লক্ষ্যে না পৌছান পর্যন্ত আর থেমো না।'—স্বামী বিবেকানন্দের সাবলীল অনুবাদে যেমন আছে। কী সুন্দর ভাব! আমাদের মানবজীবন এগিয়ে চলেছে। স্রোতস্বতী নদীর জল পরিষ্কার ও শুদ্ধ; আবদ্ধ জলাশয়ই রোগাদি নানা কষ্টের উৎপত্তিস্থল। আবদ্ধ জীবন, আবদ্ধ মনও তেমন। অর্জুন এখন তাঁর হৃদয়াবেগ ও ভাবপ্রবণতাকে সংযত করতে পারছেন। এই হলো মানবীয় বিকাশের সূচনা। পশু তার আবেগকে সংযত করতে পারে না; কিছু আবেগ এলেই তারা তা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রচালিতবৎ কাজে প্রকাশ করে ফেলে। কিন্তু মানব হৃদয়ের আবেগকে সংযত করতে পারে, তারপর পরিবেশ বুঝতে চেষ্টা করে এবং তারও পরে অবস্থা অনুযায়ী নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। তাই আবেগকে সংযত করাই চিন্তনের প্রথম ধাপ; তারপর কার্যকর প্রস্তুতি গ্রহণ করা। যখনই তোমার গভীর হৃদয়াবেগ আসে, তখনই দেখা যায় যে তোমার মন যেন মেঘাচ্ছন্ন। তোমার অনুভূতি একটু স্থিরপ্রশান্ত হলেই, স্বচ্ছ চিন্তার সূচনা হয়। এই হলো স্নায়ুতন্ত্রের নির্দেশ ঃ পশুরা তাদের হৃদয়াবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের প্রথম ধাপ হলো স্বীয় হৃদয়াবেগকে নিয়ন্ত্রণে আনা। কিছু দেখা গেল, অমনি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে বা তা থেকে দূরে পালালে। কিন্তু, একমাত্র মানুষই পারে নিজ হৃদয়াবেগকে নিয়ন্ত্রণে রেখে, ভাল করে দেখে, বিচার করে, চিন্তা করে, কার্যের পরিণতির কথা মনে মনে পর্যালোচনা করে, তবে কাজের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করতে। এইভাবেই মানুষ পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, পশুরা যা পারে না। শিম্পাঞ্জিরাও মানুষের এই সামর্থ্যের আংশিক অধিকারীও হতে পারে না—স্নায়ুবিদ্ গ্রে ওয়ালটার তাঁর *The Living Brain* গ্রন্থে এই কথাই বলেছেন।

তাই, অর্জুন এখন আরো বেশি মানসিক সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। পরে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের মাঝামাঝি শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর জীবন দর্শনের ব্যাখ্যা শুরু করবেন, তখন বলবেন এই সুষম মন, সুসমঞ্জস মন অবশ্যই চাই। কথাটি হলো *সমত্ব*। আবেগ, অনুভূতিগুলিকে অন্তরে রাখ, একটু শান্ত হতে দাও। তখন তোমার দৃষ্টি স্বচ্ছ হবে; নতুবা ধুলোর ঝড়ে দিল্লীতে জীবনযাত্রার যে অবস্থা হয় তাই হবে। লোকে এর নাম দেয় *আঁধি*; কিছু দেখা যায় না। ধুলায় আকাশ একেবারে ভর্তি হয়ে যায়। তেমনি, নিয়ন্ত্রণবিহীন আবেগ ও অনুভূতি মনের পক্ষে *আঁধির* মতো হয়। তারা থিতিয়ে গেলে, সব জিনিস আবার স্পষ্ট দেখা যায়। তাই আবেগের উচ্ছ্বাসে, অনুভূতির উচ্ছ্বাসে, কিছু করবে না, কিছু বলবে না। এ সময়ে কিছু করলে তা ঠিক হবে না। চিন্তার সাহায্যে অনুভূতিকে সংযত করতে হয়। কোন বিষয়ে উদ্যোগ নেবার পূর্বে বিষয়টি পর্যালোচনা দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ যেমন ভক্তদের বলতেন ঃ যখন কাউকে তার চিঠির উত্তরে কড়া কথায় চিঠি দেবে, চিঠিখানি দু-একদিন বালিশের তলায় রেখে দাও। পরে পাঠিও। তুমি নিজেই তখন চিঠিটা পালটে দেবে। সে সময় তোমার মধ্যে আগুন জ্বলছিল, এখন তা আস্তে আস্তে নিভে এসেছে। চিঠিখানা আগে ডাকে দিলে তোমারই অনুশোচনা হবে যে, এটা আমি কি করে ফেলেছি, গোটা ব্যাপারটাই পণ্ড হয়ে গেছে। মানুষের সে সামর্থ্য রয়েছে। তুমি তা কাজে না লাগালে, তোমার জন্তুর মতো ব্যবহার করা হলো। মানুষকে আমরা চিন্তাশীল পশু বলি, কিন্তু তার চিন্তাটুকু সরিয়ে নিলে, সে পশু বৈ অন্য কিছু নয়। তাই, অর্জুনের ভাব এখন অনেকটা সংযত। ওষুধে কাজ হয়েছে। তিনি এখন শান্ত হয়ে, সংযত মনে, সুসংবদ্ধভাবে কথা বলছেন।

অর্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥

অর্জুন বললেন—'হে কৃষ্ণ, যুদ্ধক্ষেত্রে আমি কিভাবে ভীষ্ম ও দ্রোণের মতো লোকের গায়ে তীর নিক্ষেপ করব? তাঁরা যে আমার পূজ্য।'

এখানে আরো সুসম্বদ্ধ ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়। *সংখ্যে* বলতে 'যুদ্ধক্ষেত্র' বুঝায়। যুদ্ধক্ষেত্রে, কিভাবে আমি *ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি*, 'তীক্ষ্ণবাণ দ্বারা যুদ্ধ করব' ভীষ্ম ও দ্রোণের মতো মানুষের সঙ্গে। তাঁরা যে আমাদের জ্যেষ্ঠ। দ্রোণ

হলেন আচার্য আর ভীষ্ম হলেন প্রপিতামহতুল্য। তাই, শ্রীকৃষ্ণের কাছে অর্জুন প্রথম প্রশ্নটি রেখেছেন। দ্বিতীয়ত

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥৫॥

—'আমার শ্রদ্ধেয় জ্যেষ্ঠদের হত্যা না করে সংসারে ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করাই আমার পক্ষে যথার্থ বেশি কল্যাণকর হবে; এই স্বার্থান্বেষী লোকগুলিকে বধ করে, আমি কেবল রুধিরাক্ত সুখভোগেরই আস্বাদ পাব।'

গুরূনহত্বা, 'গুরুজন হত্যা না করে'; এখানে গুরু অর্থে শুধু আচার্যকে নয়, সকল শ্রদ্ধাস্পদ জ্যেষ্ঠদের বোঝাচ্ছে। *হি মহানুভাবান্*, অর্থে 'মাননীয় ব্যক্তিদেরও' বোঝাচ্ছে। *শ্রেয়ো ভোক্তুম্ ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে*—'এর থেকে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করা আমার পক্ষে আরো বেশি কল্যাণকর হবে।' *হত্বা অর্থকামান্ তু গুরূনিহৈব, ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্*—'স্থূল সম্পদের প্রতি ধাবমান এই গুরুজনদের বধ করে, যে অন্নই আমি মুখে দেব তা অবশ্যই রক্তাক্ত হবে।' *অর্থ-কাম* বলতে, *কাম* বা বাসনা ও *অর্থ* বা সম্পদ বুঝায়। তাদের কেন *অর্থ-কাম* বলা হলো?

এই কথাটি মহাভারতের গোড়াকার একটি ঘটনাকে ইঙ্গিত করছে। যুদ্ধারম্ভের ঠিক আগে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব, যুধিষ্ঠির প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চান নি; তিনি নিরস্ত্র হয়ে পায়ে হেঁটে বিপক্ষ দলের দিকে গেলেন—দুদলে যোদ্ধৃগণ বিস্ময়ে ভাবতে থাকেন, এর অর্থ কী হতে পারে—শেষে তিনি ভীষ্ম, দ্রোণ ও শল্যের পদধূলি নিলেন। তাঁরাই ছিলেন তাঁর কাছে শ্রদ্ধাস্পদ ও বয়োজ্যেষ্ঠ; তিনি তাঁদের অনুরোধ করলেন তাঁর পক্ষে আসতে, অথবা নিরপেক্ষ হয়ে থাকতে। ভীষ্ম, দ্রোণ ও শল্য তিনজনেই একবাক্যে উত্তর দিলেন, 'আমরা তোমার বিপক্ষে থেকে তোমার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করব।' কিন্তু কেন? কারণ আমরা কৌরবদের কাছে, দুর্যোধনের কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। তিনি আমাদের বেতন দিচ্ছেন, অন্ন দিচ্ছেন—আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। তাই, আমাদের পক্ষে তোমাকে সাহায্য করা সম্ভব নয়। তোমার বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ করতেই হবে। তাঁরা তিনজনেই বলেছিলেন (মহাভারত, ভীষ্ম পর্ব, ৩৫)

অর্থস্য দাসো পুরুষো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ;
ইতি সত্যম্ মহারাজ বদ্ধোস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ—

এ ব্যাপারটি আদিপর্বের সঙ্গে জড়িত, যখন ভীষ্ম ছিলেন কৌরবদের অতিথি; দ্রোণও তাই, তবে তিনি বেতন পেতেন এবং একটি নিঃশুল্ক বাসস্থান ও ভাতাও পেতেন কৌরবদের কাছ থেকে। আজকাল যেমন বলা হয়, রাজকর্মচারীকে বেতন ও তদতিরিক্ত ভাতাদিসহ নিয়োগ করা হচ্ছে। দ্রোণও তাই পেতেন, শল্যও। তাই সবাইকেই কৌরবরা বেঁধে ফেলেছিল। *গীতাও ভীষ্মপর্বের* অন্তর্গত। উপরোক্ত শ্লোকটির অর্থ 'মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কারও দাস নয়।' ভাষাটি লক্ষ্য কর। *ইতি সত্যম্ মহারাজ, বদ্ধোস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ,* 'কৌরবরা আমাদের বেঁধে ফেলেছে; তারা আমাদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি দিয়ে থাকে।' আজও তা একইভাবে সত্য! আমরা যে বেতন পাই, তাই আমাদের বেঁধে রেখেছে; যাদের কাছে আমরা চাকুরি করি, তাদের প্রতি আমাদের আনুগত্য রয়েছে; আমরা অন্য কিছু করতে পারি না। কেন এমন হয়েছে? যেহেতু আমরা চাই ইন্দ্রিয়জ তৃপ্তি, খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান, এইসব জিনিস। এ সবই অর্থ সাপেক্ষ। যেহেতু এ সব আমাদের চাই, আমাদের অর্থও চাই, তাই অধিকাংশ লোক অর্থের চাপের বশীভূত হয়। অর্জুন সেই বিশেষ অবস্থার কথাই উল্লেখ করেছেন। তারা *অর্থকাম,* তাদের বধ করে আমি কী পাব? আমি তাঁদের রক্তরঞ্জিত যে খাদ্য পাব, তা আমি খেতে চাই না। আমি বরং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে যে অন্ন পাব তাতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করব। অর্জুনের মতে তা অনেক ভাল। তারপর,

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ ॥

আমাদের সামনে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ, কৌরবগণ সকলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। আমরা বুঝতে পারছি না—এই পরিস্থিতিতে কী করলে আমাদের সত্যই মঙ্গল হবে। *ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো,* 'আমাদের পক্ষে সব থেকে অর্থপূর্ণ ও কল্যাণকর কি হবে আমি তা বুঝতে পারছি না।' কোন্ কাজগুলির মধ্যে? *যদ্বা জয়েম, যদি বা নো জয়েয়ুঃ,* 'আমরা যুদ্ধ জয় করব অথবা—

আমাদের জয় করে নিতে ওদের সুযোগ দেব,' —এদুটি প্রশ্নের বিষয়ে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। কি করলে আমাদের মঙ্গল তা আমি জানি না। *যানেব হত্বা ন জিজীবিষামঃ*, 'যাদের বধ করে আমাদের বাঁচারই ইচ্ছা নেই'; *তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ*, 'আমাদের সামনে যে সব কৌরবগণ, তথা ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ, অবস্থান করছেন, ঐ ওদের সব বধ করে আমার কাছে জীবনের আর কোন অর্থই থাকবে না।' এই ভাবেই তিনি তাঁর সমস্যাকে শ্রীকৃষ্ণের সামনে তুলে ধরছেন, আগের থেকে আরো দৃঢ় ভাবে। তার *পরবর্তী শ্লোক থেকে ঠিক ঠিক আরম্ভ হচ্ছে গীতার শিক্ষা*। অর্জুন বলছেন, 'আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি, তোমার উন্নত বুদ্ধির কাছে শরণাপন্ন হচ্ছি। আমার বুদ্ধি এখানে কাজ করছে না। আমি তোমার ছাত্র, তোমার শিষ্য। আমার পক্ষে যা মঙ্গলকর সেই বিষয়ে আমাকে শিক্ষা দিতে তোমাকে অনুরোধ করছি।' ছাত্র যখন এই ভাবে বলে তখনই গুরু শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। বেদান্তে, জিজ্ঞাসু ব্যক্তি ছাড়া অন্যাকে উপদেশ দেওয়া বিধেয় নয়। বিনা জিজ্ঞাসায় উপদেশ দিলে তার কোন মূল্য থাকে না। তাই, সব ভাষ্যকারের মত হলো—গীতা প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৭ম শ্লোক থেকে, যেখানে অর্জুন বলছেন, 'আমি তোমার কাছে জানতে চাই, আমার পক্ষে সত্যসত্যই কি মঙ্গলকর হবে। আমি নিজে বুঝতে পারছি না। অনুগ্রহ করে আমাকে উপদেশ দাও।'

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌ ॥ ৭ ॥

—'আমার সহজাত (ক্ষত্রিয়) প্রকৃতি চিত্তের দীনতায় অভিভূত হয়ে পড়েছে, আমি আমার *ধর্ম* বা কর্তব্য সম্বন্ধে বিভ্রান্ত; তাই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি ঃ আমার পক্ষে যা মঙ্গলকর তা নিশ্চিতরূপে বলুন। আমি আপনার শিষ্য; আমি আপনার শরণাগত, আমাকে উপদেশ দিন।'

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ, 'আমার সহজাত প্রকৃতি হৃদয়ের দীনতা দোষে অভিভূত'; *ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ*, 'আমি আমার ধর্ম বা কর্তব্য সম্বন্ধে বিভ্রান্ত'; *পৃচ্ছামি ত্বাম্‌*, 'আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি।' আপনার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি; *যচ্ছ্রেয়ঃ স্যাৎ নিশ্চিতং ব্রূহিতন্মে*, 'আমার পক্ষে যা মঙ্গলকর হবে তা আমাকে

নিশ্চিতরূপে বলুন'; *শিষ্যস্তেঽহং,* 'আমি আপনার শিষ্য'; *শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্,* 'আমি আপনার শরণাগত, আমাকে উপদেশ দিন।'

এই শ্লোকে অর্জুন প্রথম অধ্যায়ের শেষের দিকে যেভাবে কথা বলেছিলেন তার থেকে আরো প্রশান্ত ও সংযতভাবে আপন অবস্থা বিশ্লেষণ করছেন। আগে তিনি একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিলেন, মনের সমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি দুঃখে এতই কাতর হয়ে পড়েছিলেন। যেমন আগে বলেছি, এই অধ্যায়ের ২য় ও ৩য় শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ যে ওষুধ প্রয়োগ করেছিলেন, তাতেই অর্জুন কিছুটা শান্ত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর সমস্যাগুলি আরো যুক্তিগ্রাহ্য ভাবে বোঝাতে পারছেন। আমাদের সকলকেই নিজ নিজ জীবনে অনুরূপ অবস্থার ভেতর দিয়ে যেতে হয়। অর্জুন কিছু স্বতন্ত্র নয়, একটি দৃষ্টিকোণ ছাড়া। আমাদের কাউকে যুদ্ধ করতে হয় না। অর্জুনকে সশস্ত্র যুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিল; কিন্তু আমাদের সবাইকে জীবনযুদ্ধে লড়াই করতে হয়—সমস্যার সম্মুখীন হয়ে, সেগুলিকে অতিক্রম করে, জীবনে পরিপূর্ণতা লাভের চেষ্টায়। যুদ্ধের আহ্বান আমাদের সকলের সামনেই রয়েছে। সুতরাং আমরা সকলেই এক একটি অর্জুন হতে যাচ্ছি না, প্রত্যেকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না। তা *গীতার* অর্থও নয়। একটি বিশেষ পরিস্থিতি : তার মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যার আছে সর্বজনীন মূল্য। ঐ পরিস্থিতি থেকে তার সর্বজনীন মূল্যটুকু সরিয়ে নাও। তাই, দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমার্ধের পর সশস্ত্র যুদ্ধের কথা আর শোনাই যায় না। কেবল চরিত্র, পবিত্রতা, ভালবাসা, করুণার কথা। দ্বাদশ অধ্যায়ে সমস্ত উপদেশই 'কে আমার প্রকৃত ভক্ত?' এই প্রশ্নের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। শ্রীকৃষ্ণ বলবেন, 'সে-ই আমার প্রকৃত ভক্ত, যে নিজে শক্তিধর ও ভয়হীন—আবার অপরকেও শক্তিমান ও নির্ভয় করে তোলেন। তিনি অপরের বিনাশ সাধন করতে স্বীয় শক্তি ব্যবহার করেন না' : *যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ,* 'যিনি সংসারে ভয়ের কারণ হন না, আবার সংসারের কারণে ভীতও হন না।' (গীতা ১২/১৫)—এই হলো সুউন্নত চরিত্র। ভীরুলোক সংসারে ভয়ের কারণ হয় না। কিন্তু তার ভীরুতায় কোন গুণ নেই। কিন্তু একজন অসম শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি পৃথিবীর পক্ষে ভয়ের কারণ হতে পারে। কিন্তু তাতে কোন গুণের অবকাশ নেই বরং শক্তিধর হও, নির্ভীক হও—অপরকে সেরূপ হতে অনুপ্রাণিত কর—এই হলো আদর্শ মানবতা। এই হলো মূল শিক্ষা, শুধু *এই গ্রন্থের নয়—আমাদের সমগ্র সনাতন ধর্মসাহিত্যের।* *উপনিষদে, গীতায়, মহাভারতে, শ্রীমদ্ভাগবতে* পাওয়া যায় সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠ মানব মনের বৈশিষ্ট্য

খ্যাপনকারী—সেই সংস্কৃত কথাটি—*অজাতশত্রু*, যার শত্রু এখনও জন্মায় নি। তোমার একজন শত্রু আছে, তাকে তুমি ভালবাস, ক্ষমা কর—সে এক জিনিস। আর, তোমার কোন শত্রুই নেই, তোমার মনে কোন শত্রুর স্থানই নেই—এই হলো মনের উচ্চতম অবস্থা। ঐ সংজ্ঞাটি খুবই অর্থবহ : *অজাতশত্রু*, যার *শত্রু অজাত* অর্থাৎ জন্মায় নি—এটি হলো মানবিক উৎকর্ষের উচ্চতম পর্যায়। সম্ভবত খুব কম লোকেই সে সর্বোচ্চ অবস্থায় উঠতে পারে। কিন্তু এই হলো উচ্চতম অবস্থা। ঐ উচ্চতম অবস্থায় উপনীত হতে হলে, আগ্রাসী মনোভাবকে ক্রমশ কমিয়ে এনে, আরও বেশি প্রেমময় ও শান্তিপ্রিয় হয়ে উঠে আমাদের ঐ অভিমুখে অগ্রসর হতে হবে, আর এই পুরো ব্যাপারটা একটা মানুষের পক্ষে হবে তার যেন এক স্বাভাবিক অগ্রগতি—সে অগ্রগতিটা হলো মানবসত্তার যে কোন অবস্থায় সে যা হয়ে আছে, তা থেকে সেই উচ্চ অবস্থায় সে যা হয়ে উঠতে পারে সেই পর্যন্ত। সাধারণ অবস্থা থেকে উচ্চতম অবস্থার দিকে এই যাত্রাকেই গীতায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে মানবিক উৎকর্ষ সাধনের দর্শনরূপে। এই পথে তোমাকে কখনো কখনো অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করতে হবে লড়াই করে, সংগ্রাম করে—যেমন সংসারে হয়ে থাকে। তা না করলে তুমি তোমার নিজের ও সামগ্রিকভাবে সমাজের উন্নতি সাধন করতে পারবে না। অশুভ শক্তি বৃদ্ধি পাবে, যদি বর্তমান অশুভ শক্তিকে বাধা না দাও। সাধুর কাছে ঐ উপদেশের অর্থ একরকম, আবার গৃহস্থের কাছে অন্যরকম। গৃহস্থের সংসার রয়েছে, তাদের নিজেদের লোকজনের দেখাশুনাও করতে হয়, তাদের কাছে রাখতে হয়, রক্ষাও করতে হয়। যদি কেউ বাড়িতে এসে চুরি করে, গৃহস্থ চোরকে সম্মান দেখিয়ে বলতে পারে না, 'এগুলিও নিয়ে যাও।' কারণ তাতে তার ছেলেমেয়েরা না খেয়ে কষ্ট পাবে। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচরিত থেকে জানা যায় গাজীপুরের পওহারী বাবার মতো কোন কোন মহান *সাধু* এমনটিই করেছেন। যখন এক চোর তাঁর আশ্রম থেকে কিছু চুরি করে পালাচ্ছিল, তিনি চোরের পিছু পিছু ছুটে গিয়ে বললেন, 'তুমি কিছু ফেলে এসেছ, সেগুলি নিয়ে এসেছি, এগুলিও নাও।' এ অতি চমৎকার ভাব। পওহারী বাবার স্পর্শে চোরটির মনে প্রেরণা এলো, ও কিছুদিন পরে সে সংসার ত্যাগ করে সাধু হয়েছিল; হৃষীকেশে তার সঙ্গে বিবেকানন্দের দেখা হয়—তখনই সে পওহারী বাবার সংস্পর্শে এসে তার এই পরিবর্তনের কথা বলে। কিন্তু সাধারণ নাগরিকের পক্ষে এমন করা সম্ভব নয়। সে যা হারায় তা তার হারিয়েই যায়, তার জন্য সে কষ্ট ভোগ করে। সেগুলি হারানোর কষ্ট সহ্য করা তার পক্ষে সাধ্যাতীত। তাকে অবশ্যই

নিজ সম্পদ রক্ষা করতে হবে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে, আর প্রয়োজন হলে, শক্তি প্রয়োগ করেও।

বর্তমান যুগে এই বিশ্বে অহিংস নীতি অবলম্বনকারীদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীই শ্রেষ্ঠ। তাঁর জীবনে বিস্ময়কর দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় ঃ কিছু পুলিশ উত্তরপ্রদেশের একটি গ্রামে চড়াও হয়। সম্ভবত বালিয়া ছিল ঐ গ্রামটির নাম। *সত্যাগ্রহ* আন্দোলনের সময় পুলিশ ব্যাপক ধ্বংস চালিয়েছিল। তারা গ্রামের মহিলাদের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করেছিল। কেউ প্রতিবাদও করেনি। যখন গান্ধীজী এক অনুসন্ধানকারী দল পাঠালেন, তাদের প্রশ্নের উত্তরে ওখানকার লোক বলেছিল, 'গান্ধীজী আমাদের অহিংসনীতি শিখিয়ে ছিলেন। তাই আমরা চুপ করে ছিলাম, কোন বাধা দিইনি।' গান্ধীজী বলেছিলেন, 'এ কথা শুনে আমি লজ্জিত হয়েছিলাম। তোমরা তোমাদের মা-বোনের ইজ্জৎ রক্ষা করতে পারলে না! অহিংসার নামে তোমরা ভীরুর মতো ব্যবহার করেছিলে! এই কি অহিংসা? আমি সাহসী পুরুষের অহিংসা প্রচার করে থাকি, ভীরু কাপুরুষের নয়।' তাই, জীবনে এমন সব পরিস্থিতি উপস্থিত হয়, যেখানে তুমি যদি বেঁচে থাকতে চাও তো তোমাকে মন্দকে বাধা দিতেই হবে। তাই, সমগ্র *সনাতন হিন্দুধর্মের* ঐতিহ্যে—বর্তমানযুগে যাকে *শান্তিবাদ* বলে, অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই আমি প্রতিরোধ করব না এরূপ মতবাদের স্থান নেই। আমাদের চিন্তাধারায় ঐরকম শান্তিবাদের কোন স্থান নেই। অতি স্বল্প লোকেই এই মতবাদ অনুযায়ী চলার কষ্ট সহ্য করতে পারে—তাদের জন্যই এই মতবাদ। অন্যের ক্ষেত্রে, অবস্থা বিশেষে বাধা দান অবশ্য কর্তব্য, হয় শান্তিপূর্ণভাবে অথবা কিছু বলপ্রয়োগে, এতে কোন আগ্রাসী মনোভাব নেই—আছে কেবল মানব জীবনের আবশ্যিক প্রয়োজন।

আমি যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বক্তৃতা সফরে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম, তখন শুনেছি, অল্পবয়স্ক মার্কিনীরা ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছিল ঃ 'এ খুব শয়তানী যুদ্ধ—ওখানে আমেরিকানদের কোন দরকারই নেই।' এই ভাবে প্রতিবাদ করে তারা রাষ্ট্রকে ঐ যুদ্ধ থেকে সরে আসতে বাধ্য করেছিল। এ খুবই চমৎকার! কিন্তু হিটলারের নাৎসী মতবাদের বিরুদ্ধে যখন আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল তখন একটি আমেরিকানও আপত্তি জানায় নি। সেটা ছিল এক বিপজ্জনক মতবাদ। এতে মানবিক প্রেরণা বিনষ্ট হয়ে যাবে। এরকম প্রতিবাদ যদি গত বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্রে সফল হতো তবে মানবিকতা

অনেকাংশে খর্ব হতো। তাই, যে দুষ্ট নীতি (ফ্যাসিবাদ) মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল, তাকে ধ্বংস করতে যে যুদ্ধ হয়েছিল তার বিরুদ্ধে কেউই প্রতিবাদ জানায় নি।

তাই, *মহাভারতের যুগে* ফিরে যাই। রাজসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের মাধ্যমে তাঁকে লাঞ্ছিত করা সমেত কতগুলি দুষ্কর্ম কৌরবগণ করেছিল? এরকম অনেক লাঞ্ছনাজনিত কষ্ট এরা (পাণ্ডবরা) সহ্য করেছিল—তাদের অবলম্বিত নৈতিক মূল্যবোধের বিধি নিষেধের জন্য তারপর তা সহ্যসীমার বাইরে চলে গেছিল। *মহাভারতে* বার বার কীর্তিত হয়েছে : শান্তিই হলো শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। প্রত্যেক রাজ্যেরই অবশ্য কর্তব্য শান্তির পথ অবলম্বন করা, যুদ্ধের নয়। তোমার ওপর চাপিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত, যেভাবেই হোক যুদ্ধ বর্জনীয়—এই ভাবেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সমগ্র *মহাভারতে*, আবার *গীতাতেও*। তাই যখন সেই সঙ্কটময় পরিস্থিতি উদ্ভূত হলো—পাণ্ডবগণ বনবাস থেকে ফিরে এসে পূর্বশর্ত অনুযায়ী অর্ধরাজ্যের ওপর তাদের স্বাধিকার দাবি করলে এবং তাও যখন প্রত্যাখ্যাত হলো, তখনই কেবল তারা তাদের ন্যায্য অধিকার ছিনিয়ে নিতে যুদ্ধের পথ বেছে নিলেন। এমন অবস্থায় তোমার পক্ষে যুদ্ধে অগ্রসর হতেই হবে। তবু তখনও শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'আর একটু অপেক্ষা কর, আমাকে আর একবার চেষ্টা করতে দাও, তোমাদের পক্ষে দূত হয়ে কৌরব রাজদরবারে গিয়ে একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য সওয়াল করতে দাও।' সকলে সম্মত হলে শ্রীকৃষ্ণ কৌরবসভায় যে বক্তব্য রাখেন তা অতীব বিজ্ঞজনোচিত। আজকাল রাষ্ট্রসঙ্ঘে মহাভারতে অন্তর্ভুক্ত এই সব ভাষণের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। সেখানে এমন সব চিন্তাধারার অভিব্যক্তি পাওয়া যাবে যা মহাভারতের উক্তিগুলির সঙ্গে প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায় : মানবিক মূল্যবোধ, শান্তি ও সমন্বয়ের মাহাত্ম্য, বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা, এই সবই সেখানে পাওয়া যাবে। আর তাই, শ্রীকৃষ্ণ সেখানে গিয়ে কি করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, 'এই পাণ্ডবদের যে রাজ্য শঠ উপায়ে তোমরা দখল করে নিয়েছ; তা বেশ। এখন তাদের অর্ধ রাজ্য ফিরিয়ে দাও বাকি অর্ধেক তোমরা রাখ। তারা সেখানে নতুন রাজধানী গড়ে তুলবে।' কৌরবরা বলল, 'না'। তখন শ্রীকৃষ্ণ কথাবার্তা চালিয়ে গেলেন—দাবিকে ক্রমে কমিয়ে এনে বললেন, 'পাণ্ডবদের পাঁচখানি গ্রাম দাও।' তাতেও কৌরবরা 'না' বলল। শেষে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'ওদের অন্তত একখানি গ্রাম দাও যেখানে তারা আপন জায়গায় বাস করে সুখে থাকতে পারে।' উত্তরে কৌরবরা বলে, 'পাণ্ডবদের কিছুই দেওয়া হবে না, *সূচি-মুখাগ্র* ভূমিও না।' এই স্তরে এসে পরিস্থিতি মানবের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। এর পরেও যদি

এই পরিস্থিতি চলতে থাকতো তবে তা খুবই বিপজ্জনক হতো, যেমন হিটলারের যুদ্ধে যা হতে পারত—যদি তিনি জয়ী হতেন। অতএব অশুভকে বাধাদানের প্রয়োজন ছিল এবং পরিস্থিতি গুরুতরও হয়ে উঠেছিল। তাই ধ্বংস সার্বিক হয়েছিল। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এটি একটি বিরাট গৃহযুদ্ধ : *মহাভারত* যুদ্ধ। পরবর্তী কালে পরিস্থিতি এক রকম থাকেনি। তা আয়ত্তের বাহিরে চলে গিয়েছিল। একই রকম ঘটেছিল, যখন শ্রীকৃষ্ণের আপনজনেরা পশ্চিম ভারতের দ্বারকা শহরে মত্ত অবস্থায় একে অপরকে নিধন করেছিল।

মানব জাতির এই হলো দুর্বলতা। তারা কখনো উৎকৃষ্ট লোক হয়, খুবই শান্তিপ্রিয়; তারাই আবার অন্য সময়ে আগ্রাসী, দুর্বৃত্ত ও মারমুখী হয়ে ওঠে। মানব জাতি এইরকমই। গীতা মানবজাতিকে ঐ আগ্রাসী মনোভাব দমন করতে, মানুষকে আরো শান্তিপ্রিয় হয়ে উঠতে, পরস্পরে মিলে মিশে শান্তিতে বাস করতে শিক্ষা দেয়। তাই সমগ্র গীতাতে অর্জুনকে কেন্দ্র করে যে বিশেষ পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়েছিল তাকেই ভিত্তি করে শ্রীকৃষ্ণ মানবের জীবন দর্শনের ব্যাখ্যা দিয়ে চলেছেন। একটি বিশেষ ঘটনাকে বিশ্বজনীন রূপ দিলেই, একটি জীবন দর্শন পাওয়া যায়। একটি বিশেষ ঘটনাকে দর্শন বলা যায় না। সেই একটি বিশেষ ঘটনা থেকে বিশ্বজনীন ধারণার উদ্ভব ঘটানো যায়, তাকে জীবন দর্শন বলা চলে। তাই শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেককেই বলছেন, অর্জুনকে বাস্তব যুদ্ধে নামতে হয়েছিল, তোমাদের সামনে তেমন যুদ্ধ নেই, কিন্তু তোমার সামনে রয়েছে, তোমার জীবন যুদ্ধ; এখানে নানা বিপদ আসবে, তার সামনা-সামনি হবার আহ্বান আসবে। তুমি কি অর্জুনের মতো পালাতে চাইবে? না; তার মুখোমুখি হবে। এই বাণীই তিনি দিয়েছেন সমগ্র ভারতীয় তথা বিশ্বের সকল মানবজাতিকে। এই কাজে অশুভ যা কিছু আছে তার যেন বৃদ্ধি ঘটিয়ে ফেলো না। তোমার কাজ এমন ভাবে কর, যাতে জগৎ আরো একটু উন্নত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর একটি সুন্দর গল্পে এই বিশেষ বিষয়টির উল্লেখ করেছেন। এক বনে একটি বিষধর সাপ বাস করত। তার আশেপাশে ছেলেরা খেলা করত; কিন্তু সাপটিকে ভীষণ ভয় করত। একদিন এক সাধু ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি সাপের গর্তের দিকে যাচ্ছিলেন। একটি ছেলে তাকে বলল, 'মহারাজ, ও পথে যাবেন না, ওদিকে এক বিষধর সাপ আছে।' তিনি বলেন, 'তাতে আমার ভয় নেই।' তিনি সোজা চললেন। সাপটি আগ্রাসী ভঙ্গিতে তাঁর দিকে তেড়ে

এল। কিন্তু তিনি কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করতেই সাপটা তাঁর সামনে খুব শান্ত হয়ে গেল। তারপর সাধুটির সঙ্গে সাপটির কিছু কথাবার্তা হলো। সাধুটি তাকে বলল, 'তুমি লোকের ক্ষতি কর কেন? লোকের ক্ষতিসাধন করাটা ঠিক কাজ নয়। কাউকে হিংসা করো না, আপন ভাবে থাক। অন্যদেরও নিজ নিজ ভাবে থাকতে দাও। এখন থেকে আর কাউকে কামড়াবে না। তোমাকে একটি মন্ত্র দিচ্ছি। এটি মনে করে রাখ। তুমি এই জীবনেই মহত্ত্ব অর্জন করবে। আমি আবার আসব।' এই বলে সাধুটি চলে গেলেন। সেই দিন থেকে সাপটি তার কার্যপ্রণালী বদলে ফেলল। সে শান্ত, শান্তিপূর্ণভাবে ঘোরাফেরা করে, কাউকে কামড়ায় না; আর ছেলেরাও দূর থেকে দেখে যে, সাপটা এখন আর আগের মতো ততটা আগ্রাসী নয়। তারা আরো তার কাছাকাছি এগিয়ে আসে, সাপও কিছু করে না। তারা জানে না এ সব পরিবর্তন কিভাবে হয়েছে, কিন্তু তারা অন্তত দেখেছে যে সাপটা আর বিপজ্জনক নয়, তার সঙ্গে খেলা করা যেতে পারে। তারপর এমন একটা সময় এল যখন তারা সাপের একেবারে কাছেই চলে আসতে পারল। একদিন ছেলেরা সাপটার কাছে এসে তার লেজ ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে ছুড়ে মাটিতে আছড়ে ফেলে দিল; সে আধমরা হয়ে পড়ে রইল। রাত্রে, একটু ভাল বোধ হতে, গর্তে ফিরে গেল। সে ক্রমে রোগা হতে হতে অস্থিচর্মসার হয়ে গেল। কিছুদিন পরে সাধুটি ফিরলেন। ছেলেরা বলল 'সাপটি মরে গেছে, ওদিকে যাবার দরকার নেই।' তিনি বললেন, 'তা হতে পারে না। আমি তাকে মন্ত্র দিয়েছি। জীবনের উদ্দেশ্য কি তা না জেনে সে মরতে পারে না।' তাই তিনি ধীরে ধীরে সাপের গর্তের কাছে গেলেন; তিনি তাকে যে নাম দিয়েছিলেন, সেই নামে তাকে ডাকতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে, সাপটা গুটি গুটি করে গর্তের বাইরে এসে গুরুকে প্রণাম করল। গুরু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কি হয়েছে? এরকম অস্থিচর্মসার হয়েগেছ কেন?' সে বলে, 'সম্ভবত, আপনি আমাকে কারো ক্ষতি করতে বারণ করেছিলেন; আমি কোনরকম পোকামাকড় বা অন্য কোন জ্যান্ত জিনিস খাই না, কেবল শুকনো পাতা খাই, তাই বোধহয় এমনি হয়েছি।' *সাত্ত্বিক* মনে, সে ভুলেই গেছল ছেলেরা তার কি ক্ষতি করেছে। সেসব ঘটনা তার মনেই পড়ল না। সে এতই ভাল হয়ে উঠেছিল। তার কথা শুনে গুরু বললেন, ' কি বোকা তুমি! কিছু একটা নিশ্চয়ই হয়ে থাকবে, মনে কর কি হয়েছিল। পাতা খেয়েই এমন দশা হতে পারে না।' সাপ তখন বলে, 'হাঁ, একদিন ছেলেরা খেলা করছিল, আমাকে শান্ত দেখে তারা আমার খুব কাছাকাছি এলো, ক্রমে সাহস পেয়ে, তারা লেজ ধরে আমাকে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে

মাটিতে ফেলে দিল। আমি রক্তবমি করি, পরে কোনরকমে গর্তে ফিরি। সেইটি কারণ হতে পারে—আমার এই দশার। আপনি আমাকে শিখিয়ে ছিলেন—কারো ক্ষতি না করতে, তাই আমি কারো কোন ক্ষতি করিনি। তাই, আমার এই দশা—এতে আমি মনে কোন কষ্ট পাই না।' গুরু বললেন, 'তুই কী বোকা! অবশ্যই আমি তোকে কারো ক্ষতি করতে, কাউকে কামড়াতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু তুই তো ফোঁস করতে পারতিস। তাতেই তো তারা পালিয়ে যেত। ফোঁস করতে শেখ, না হলে, ওরা তোকে মেরে ফেলবে। এইরকম মনোভাব নিয়ে এ জগতে তুই বাঁচতে পারবি না। তুই অপরের মধ্যে তোর বিষ ঢুকিয়ে দিবি না, ঠিকই। কিন্তু অপরের কৃপার পাত্র হয়ে এভাবে তোর জীবনটা নষ্ট করিস না।' এই কথা বলে শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শকদের বললেন, 'ফোঁস করবে, কিন্তু কামড়াবে না।'

এ শক্তি তোমার আছে, স্বনির্ভর হতে গেলে তোমাকে তা প্রয়োগ করতে হবে; কিন্তু অশুভের প্রতিকারে বিমুখ হয়ে—জগতে অশুভের বৃদ্ধি হতে দিও না। এইটিই উপায়, একেই আমাদের গড়ে তুলতে হবে। সমগ্র *গীতায়* সেই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে। অশুভকে বাড়তে দিও না, তাকে ঠেকাও। কিন্তু এটি নির্বিচার শান্তিবাদের পক্ষে নয়—যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপীয় মানসকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। আমরা ঐরকম শান্তিবাদ চাই না, আমরা চাই শান্তি, চাই মানবিকতা, প্রেম, অপরের জন্য উদ্বেগ; ত্রুটিপূর্ণ এই জগতে বাস করে, আপন স্বার্থ রক্ষা করতে আমাদের শিখতে হবে। সকলেই আমরা সন্ন্যাসী হচ্ছি না। আপন স্বার্থ রক্ষা কর। যদি কেউ এসে তোমার ছেলে বা মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় তুমি নিশ্চয়ই চুপ করে থাকবে না অথবা তোমার দ্বিতীয় সন্তানটিকে ছিনতাইকারীর হাতে তুলে দেবে না, তুমি তা করবে না। যদি তা করো তবে তুমি কোন মতেই মনুষ্যপদবাচ্য হতে পার না। তোমার মধ্যে কোন কিছু একটা গলতি থেকে গেছে। সেই কথাই *গীতা* তোমাকে বলবে। তোমাকে নিশ্চয়ই সক্ষম হতে হবে, আপনার, জনগণের ও জাতির স্বার্থ রক্ষায় সক্ষম হতে হবে—মানব কল্যাণকে বিপর্যস্ত না করে। বিষয়টি কঠিন, কিন্তু যথাসম্ভব সুষ্ঠুভাবে এ কাজের পেছনে লেগে থাকতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ সদাই বলবেন (গীতা ২/৪০)—'এটি উচ্চ আদর্শ, কিন্তু যতটা পার কর—*স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ*।' বিষয়টি এই অধ্যায়েই আলোচিত হয়েছে—'এই ধর্ম স্বল্পমাত্রায় পালিত হলেও তা মহাভয় থেকে আমাদের পরিত্রাণ করবে।'

আর তাই, আপস-মীমাংসার জন্য দীর্ঘদিন আলাপ-আলোচনায় যখন অশুভ শক্তি কোনরূপ শুভ চিন্তার সঙ্গে এক মত হলো না, নিরুপায় হয়ে যখন অত্যন্ত সঙ্কটময় পরিস্থিতি এড়াতে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হয়েছে—তখন অর্জুনকে যুদ্ধে বিমুখ দেখে শ্রীকৃষ্ণ তাকে বললেন, 'না এ মনুষ্যোচিত কাজ নয়, তোমাকে যুদ্ধ করতেই হবে, তোমার হাড় তোমাকে করাবে। পশুশক্তির মুখোমুখি হও। তোমার কিছু একটা হয়েছে, তুমি দুর্বল হয়ে পড়েছ। তুমি ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছ—যেন ভেঙ্গে পড়েছ।' তাই এই অধ্যায়ের ২য় ও ৩য় শ্লোকে অর্জুনকে উদ্বুদ্ধ করতে বলা হয়েছে—*কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্; অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যম-কীর্তিকরমর্জুন। ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে; ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।* আমাদের কালে গান্ধীজীও ঠিক এই কথাই বলেছিলেন : 'পুলিশকে তোমাদের নারীদের লাঞ্ছিত করার সুযোগ দিয়েছ; মানরক্ষা করতে তোমরা অবশ্যই এমনকি তোমাদের দাঁতকেও ব্যবহার করবে।' সবদিক থেকে একজন অহিংসপন্থী হয়েও গান্ধীজীর মুখে ঐ কথা; কিন্তু তিনি জানতেন, কাপুরুষতা আর অহিংসা একসঙ্গে চলে না।

তাই এই মহান গ্রন্থে, গীতার প্রথম অংশে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে—কিভাবে আত্মোন্নতি করতে হয়, আত্মবিশ্বাস জাগাতে হয়, বাধা-বিপর্যয়ের সামনাসামনি হবার সামর্থ্য অর্জন করতে হয়, কিভাবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মনুষ্যপদবাচ্য হতে হয়। গীতার শেষে শ্রীকৃষ্ণ উচ্চতর পর্যায়ের উপদেশে বলবেন : 'সব কিছুই ঈশ্বরে সমর্পণ কর।' এ সবই তো তাঁরই। তুমি তো কেবল যন্ত্র। এই হলো সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। *গীতার* চরম শ্লোকে তাই বলেছেন 'তমেব শরণং গচ্ছ' (গীতা ১৮/৬২), 'সব কিছু ঈশ্বরে সমর্পণ কর।' সকলেই সমর্পণ করতে পারে না। খুব সবল না হলে, তুমি সমর্পণ করতে পারবে না। যার কাছে, বা ব্যাঙ্কে, কোন অর্থ নেই, সে যদি বলে 'আমি ত্যাগ করব।' সে কী ত্যাগ করবে? তোমার অর্থ নেই, বুদ্ধি নেই, কিছুই নেই—তুমি কী ত্যাগ করবে? ত্যাগ করবার জন্য কিছু অর্জন কর। কঠোর পরিশ্রম কর, অর্থ উপার্জন কর, অন্যের আস্থা অর্জন কর। এই হলো, মনুষ্যোচিত শিক্ষার প্রথম স্তর। শিক্ষার শেষ স্তরের কথা *গীতায়* পরে আসবে, তোমার অহংকারকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে সমর্পণ করার মতো আরো বেশি শক্তি অর্জন কর। অর্থ উপার্জন শক্তি ও কঠোর শ্রমসাপেক্ষ, কিন্তু অর্থ দান করতে আরো বেশি শক্তি চাই। তাই নয় কি? উপার্জিত অর্থ দান করা কত কষ্টকর!

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮ ॥

—অর্জুন বললেন ঃ 'পৃথিবীর কোন রকম সমৃদ্ধ রাজ্য বা স্বর্গের অধিবাসীদের ওপর আধিপত্য লাভ করলেও যে আমার ইন্দ্রিয় সন্তাপক শোক নিবারিত হবে তেমন লক্ষণ আমি দেখছি না।'

ন হি প্রপশ্যামি, 'আমি দেখছি না'; *অবাপ্য ভূমৌ অসপত্নমৃদ্ধম্*, 'যে, অন্য দাবিদারহীন সমৃদ্ধ পার্থিব রাজ্য'; *সুরাণাম্ অপি চাধিপত্যম্*, 'স্বর্গের অধিবাসীদের ওপর আধিপত্য', *মমাপনুদ্যাদ্ যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্*, 'আমার ইন্দ্রিয়সন্তাপক শোক নিবারণ করবে।'

শোকে আমাদের সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় সংহতি দগ্ধ করে দিতে পারে। তোমরা কেউ কেউ হয়তো এ অভিজ্ঞতা লাভ করেছ। 'আমি এখন এমনই এক দুঃখজনক পরিস্থিতিতে পড়েছি।' এই হলো অর্জুনের বিবৃতি। তারপর সঞ্জয়ের কথা পরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে। যার ফলে শ্রীকৃষ্ণকে শুরু করতে হলো এ বিষয়ে তাঁর আলোচনা।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯ ॥

সঞ্জয় বললেন—'গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলে, অর্জুন বললেন, ''আমি যুদ্ধ করছি না'', এবং নিশ্চুপ হয়ে রথে বসে রইলেন।'

এখন শ্রীকৃষ্ণ কি করলেন?

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি অর্জুনের মতো বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন নি। দেখা যায় যেখানেই প্রচণ্ড আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও আত্ম-সংযম, সেখানেই মন স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক। স্মিতহাস্য লক্ষ্য

করা যায়; ঐ পরিস্থিতিতে অর্জুন হাসতে পারেন নি। শ্রীকৃষ্ণের মুখের হাসিটুকু, চারিদিকে যে পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়েছে তার ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করার মতো, তাঁর প্রচণ্ড ক্ষমতার চিহ্ন। তোমার মন যখন ক্লিষ্ট অবস্থায় থাকে তখন হাসি ফোটে না। হাসলেও তা হবে বিকৃত হাসি, স্বাভাবিক হাসি নয়। শিশুর হাসি দেখ, কেমন সুন্দর, কেমন স্বাভাবিক; আমরা যতই বড় হতে থাকি, ততই আমরা হাসবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলি। কিন্তু তবু কখনো কখনো কোন রকম স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত হাসি আমাদের আসতে পারে। কিন্তু দুর্দশাক্লিষ্ট অবস্থায়, কোন হাসি আসে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মন নিত্যই তাঁর মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতো। বাহ্য পরিবেশ নিয়ন্ত্রণকারী এ এক প্রচণ্ড মনঃশক্তি। তাই জাগতিক সমস্যা ও উত্তেজনার সামনে তিনি শুচিস্মিত মুখে দাঁড়াতেন। আর সেইভাবেই মানব মনে শান্তভাব ও স্থৈর্য সঞ্চারিত করতেন। মহাভারত কাব্যে বহু নিদর্শন পাওয়া যায়, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতেও শান্ত পরিবেশের সৃষ্টি করেছেন। *প্রহসন্নিব* কথার অর্থ 'যেন হাসছেন'। এখান থেকেই শুরু হয়েছে, ২য় অধ্যায়ের ১১ থেকে ৩৮ শ্লোক পর্যন্ত, চলেছে অর্জুনকে যুদ্ধে প্রণোদিত করা, নানা যুক্তির মাধ্যমে। অর্জুন হলেন *ক্ষত্রিয়*। তাঁর স্বভাবই হলো কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া। প্রত্যেকে যুদ্ধজয়ের জন্য তাঁর ওপর নির্ভর করে। তাই, শ্রীকৃষ্ণ উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বপূর্ণ থেকে ঘোর বৈষয়িক সকল রকম যুক্তি দিয়ে অর্জুনকে নিজ কর্তব্যবোধে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। আধ্যাত্মিক যুক্তিগুলি ছিল, সন্ন্যাস-দর্শন বা জ্ঞান-মার্গ ভিত্তিক—যা সংসারকে অনিত্য বলে ইন্দ্রিয়াতীত অভিজ্ঞতায় বিশ্বাসী—যেখানে আত্মা হলেন চিরমুক্ত, অনাসক্ত। তাই হলো প্রতিটি জীবের প্রকৃত স্বরূপ। সকলের আত্মাই জন্মহীন, মৃত্যুহীন। এই দর্শনের ভিত্তিতে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের সম্মুখীন হতে প্রেরণা দিচ্ছেন অর্জুনকে। কিন্তু তা অর্জুনের মধ্যে দৃঢ়প্রত্যয় উৎপাদনে ব্যর্থ হলো। তখন শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর নিজস্ব দর্শনটি তুলে ধরতে হলো, যাকে অবলম্বন করে আমরা সকলেই জীবনযুদ্ধে লড়াই করতে পারি ও এর সবরকম আহ্বানেরই মুখোমুখি হতে পারি।

এ সবই সম্ভব হয়, *কর্মজীবনে বেদান্ত দর্শনে*, যা শ্রীকৃষ্ণ ৩৯ সংখ্যক শ্লোক থেকে ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছেন সকলের জন্য। *এইটিই হলো মানবের জীবন দর্শন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের মৌলিক অবদান।* প্রথমটির অনুসরণ আমাদের কাজে বাধা দেবে বা সমস্যার সামনাসামনি হতে দেবে না। প্রথমটি অর্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতেও উৎসাহ দেয়। ঐ দর্শনে—আমি তবে সন্ন্যাসী হই—এ সিদ্ধান্তও হতে পারে; যা গ্রহণযোগ্য, তবে অতি অল্প লোকের পক্ষেই। শ্রীকৃষ্ণ

একে এখানে *সাংখ্য* নাম দিয়েছেন—তবে এই সাংখ্য সেই প্রসিদ্ধ *সাংখ্যদর্শন* নয়, সেই *জ্ঞানমার্গ,* যে পথে *নেতি নেতি,* এটা নয় এটা নয়, এইরূপে বিচার করা হয়। জগৎ অনিত্য। আত্মাই চরম, মৃত্যুহীন। তা উপলব্ধি কর, কেন আর নিজেকে এইসব ঝামেলায় জড়ানো! ঐ দর্শনের ঐটিই সিদ্ধান্ত হতে পারে। ঐ দর্শনের ভিত্তিতে, তুমি কাজ করতে পারবে না, সমস্যার সমাধান করতে পারবে না, যুদ্ধে লড়াই করতে পারবে না। তাই ঐ দর্শনের ভিত্তিতে অর্জুনকে যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন করানো গেল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ কার্যকরী বেদান্ত দর্শনের প্রয়োজনীয়তা দেখলেন—যে নূতন দর্শন তিনি *নর-নারীর কর্মজীবনের সঙ্গে তার আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রচেষ্টাকে ভিত্তি করে* গড়ে তুলেছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে ঐটিই হলো কর্মজীবনের, সাধক জীবনের, এক ইতিবাচক জীবনবোধের ভিত্তি; ৩৯ সংখ্যক শ্লোক থেকে এইগুলিই আলোচিত হবে। সঞ্জয় বললেন ঃ

শ্রীভগবান্ উবাচ

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এত কথার পর অর্জুন যখন 'আমি যুদ্ধ করব না' বলে রথে বসে পড়লেন তখন শ্রীকৃষ্ণকে বলতে হলো সেই সব কথা যা এই যোদ্ধাটিকে উপস্থিত সমস্যাগুলির মুখোমুখি হবার জন্য প্রেরণা দেয়; 'এটি খুবই সঙ্কটময় পরিস্থিতি'—*বিষমে সমুপস্থিতম্।* যে পরিস্থিতিতে শ্রীকৃষ্ণ পড়েছেন—নিজ সখা ও শিষ্য, অর্জুনকে নিয়ে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন ঃ

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥

এই শ্লোকে বলা হয়েছে, অর্জুন যে তত্ত্ব মনে পোষণ করছেন, তাতে তো ভীষ্ম ও দ্রোণকে শোকের কারণ মনে করা চলে না। তাঁরা মহৎ ব্যক্তি, তাঁদের জন্য করুণা প্রদর্শন করায় কি ধর্ম সাধিত হচ্ছে। *অশোচ্যান্,* তাঁদের 'শোকের বিষয় করা উচিত নয়।' তাঁরা নিজেরাই মহৎ ব্যক্তি। *অন্বশোচস্ত্বং,* 'তুমি এত দুঃখ পাচ্ছ।' *প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে,* 'অথচ তত্ত্ব কথা বলছ।' *গতাসূন্ অগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ,* ঐ তত্ত্ব অনুযায়ী *পণ্ডিতাঃ* 'জ্ঞানী ব্যক্তিরা মৃত বা জীবিত কারও জন্য শোক করেন না। অতএব সংস্কৃত ভাষায় *পণ্ডিত* একটি মহৎ শব্দ, যদিও বর্তমানে উত্তর ভারতে একথায় অতি সাধারণ লোককে বোঝায়। *পণ্ডিত* কথার উৎপত্তি *পণ্ডা* থেকে, যার অর্থ *আত্ম-বিষয়া-বুদ্ধি*—যে

বুদ্ধি আত্ম-মুখী, অন্তর্নিহিত অনন্ত দেবত্বের দিকে; যার এই বুদ্ধি আছে সেই *পণ্ডিত*। এটাই কথাটির মৌলিক অর্থ। কিন্তু এখন দিল্লীতে পণ্ডিত বলতে রাধুনি বামুনকেও বোঝায়। কিন্তু *গীতায়* এর আর একটি অর্থ দেওয়া হয়েছে। পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ (৫.১৮) : 'যারা সব বিষয়ে সমদর্শী—সকলকে সমানভাবে দেখে—তারাই *পণ্ডিতাঃ*।

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্‌ ॥ ১২ ॥

মানুষের ক্ষেত্রে—আমাদের সকলের মধ্যে রয়েছে এক শাশ্বত তত্ত্ব। আমাদের দর্শন বলে : শরীর আসে আর যায়, আত্মা থেকে যায়। তাই মৃত্যু হলে আমরা বলি, আমরা দেহত্যাগ করেছি, *শরীর ছোড় দিয়া*। আমি আত্মা, আমার একটি শরীর আছে; আমি তা ছেড়ে দিয়েছি। আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে এইরকমই বোঝা যায়। এইভাবে এখানে উপস্থিত জনগণ, তুমি, আমি, আমরা সবাই সর্বদা সেখানে আছি। আমরা নেই, এমনটি কখনো হয় না। আমরা থাকব না, এমনটিও কখনো হবে না। আমরা মরণহীন আত্মা। মানব সম্বন্ধে এই হলো সত্য, ভারতের *সনাতন ধর্ম* তাই শিক্ষা দিয়ে থাকে : মানব সত্তা মূলত ঐশ্বরিক, আমাদের একটি করে পরিবর্তনশীল, মরণশীল শরীর আছে, কিন্তু আমাদের আত্মা দিব্য ও অমৃত। আমরা সকলে *অমৃতস্য পুত্রাঃ*, *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (২.৫) যেমন ঘোষিত হয়েছে। *ন ত্বেবাহং জাতু নাসং নত্বং নেমে জনাধিপাঃ*, 'আমি ছিলাম না, তুমি ছিলে না, এই সব নৃপতিরা ছিলেন না, এমন নয়—পরে আমরা থাকব না এমনও নয়।' *ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্‌*, 'আমরা সর্বদাই রয়েছি, শরীরের মৃত্যুর পরেও'। বিষয়টি কয়েকটি শ্লোকের মাধ্যমে এই অধ্যায়েই আলোচিত হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ পরবর্তী শ্লোকটি দেওয়া হলো।

দেহিনোঽস্মিন্‌ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥

প্রত্যেক দেহধারী মানবকে বিভিন্ন অবস্থার ভেতর দিয়ে যেতে হয় : *কৌমারম্‌*—১২ বছরের কমবয়সী শিশুকে *কুমার* অথবা *কুমারী* বলা হয়; *কৌমারম্‌* হলো ঐ অবস্থা। তারপর *যৌবনম্‌*—যৌবনোচিত অবস্থা; শেষে *জরা*, বার্ধক্য। 'প্রত্যেক দেহধারী ব্যক্তিকে কৌমার, যৌবন ও জরা অবস্থার ভেতর দিয়ে যেতে হয়, তেমনি, মৃত্যু ও পুনর্জন্ম তার জীবন পরিক্রমার অঙ্গ; এতে

সাহসী ব্যক্তি বিভ্রান্ত হয় না। মানবের ক্রমবিকাশ চলতে থাকে নূতন নূতন দেহের মাধ্যমে; পুনর্জন্মের পরিকল্পনায় বিশ্বাস করা—*সনাতন ধর্মের* এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। মানব জন্মের পর জন্ম লাভ করে থাকে যতদিন না অধ্যাত্মজ্ঞানের আগুনে তার নিজ *কর্মের* ফলগুলি একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে যায়—যতদিন স্বীয় অন্তরে নিহিত অমর আত্ম-বিষয়ক সত্যটিকে সে উপলব্ধি করে। তাই আমাদের বলা হয়—এই শরীরের সাহায্যে আধ্যাত্মিক উন্নতিকে ত্বরান্বিত করে শরীরের কাজ শেষ করতে। যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন শরীর কোন না কোন রূপে থাকবে; কারণ, মনুষ্যশরীর—মানবদেহ ধারণ করা কেবল সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের জন্য নয়; তার জন্য পশু দেহ আরো উপযুক্ত। মানব দেহধারণ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে, সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উভয় জ্ঞানই চাই। চরম সত্য উপলব্ধি কর, দগ্ধ করে ফেল তোমার সকল *কর্মফল*; তারপর তোমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, তুমি মুক্ত। শ্লোকে এইরকম বলা হয়েছে। একটি সূক্ষ্ম আত্মা আমাদের মধ্যে রয়েছে; বেদান্ত একে বলে, *সূক্ষ্ম শরীর*। মানব-প্রকৃতির ইন্দ্রিয়াতীত গভীরতম প্রদেশে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালিয়ে আমাদের ঋষিগণ যখন *স্থূলশরীরের* পেছনে *সূক্ষ্মশরীর* আবিষ্কার করেছিলেন, তখনই তাঁরা বুঝেছিলেন যে মৃত্যু কেবল *স্থূলশরীরেরই* হয়, *সূক্ষ্মশরীরের* মৃত্যু নেই—তা সর্বদাই বিদ্যমান—নিত্য। *সূক্ষ্মশরীর* আর একটি *স্থূলশরীর* গড়ে তোলে অতীত জীবনের ঘটনাবলী ভুলে গিয়ে প্রকৃত সত্য স্বরূপ আত্মার অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়ার জন্য। তাই ভারতে উদ্ভূত এই পুনর্জন্মবাদ তথা *দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ*—একটি মহান তত্ত্ব বলে পরিগণিত। অতএব *ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি*, 'মানবিক বিকাশের ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিবর্তনে ধীর, জ্ঞানী, বীর ব্যক্তিগণ মোহগ্রস্ত হন না।' শ্রীকৃষ্ণ এখন আর একটি সুন্দর পরিকল্পনা দিলেন যা আমাদের সকলের জন্য লক্ষিত।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাং স্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪ ॥

প্রথম বাক্যাংশটি হলো *মাত্রাস্পর্শাঃ*; *স্পর্শ* বলতে সংযোগ বোঝায়; *মাত্রাঃ* হলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। আমরা যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কে স্পর্শ করি, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়তন্ত্রের সংযোগ হয়। *মাত্রা* কথাটি আবার মাপ কথার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, *মা* মানে মাপা, কথাটি অপূর্ব। সেদিন আমাদের পরমাণু বিজ্ঞানী রাজা রামান্না মন ও পদার্থ এবং প্রকৃতি ও মন বিষয়ে বক্তৃতা

দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি *মা*, মাপা কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। এ হলো পরিমাপণ-বিজ্ঞানের ব্যাপার, এখানে গণিত শাস্ত্রও এসে পড়ে। সকল পদার্থ-বিজ্ঞান বা ভৌতবিজ্ঞান—পরিমাপ সাপেক্ষ। কিন্তু যখন মানব সত্তাস্থ প্রকৃতির ভৌত মাত্রার ওপারে যাওয়া যায়—তখন কিন্তু আর কোনরূপ পরিমাপ সম্ভব হয় না। ইন্দ্রিয়স্তর পর্যন্তই মাপজোখ চলে তাই *মাত্রা* কথাটি মাপজোখের চিন্তা থেকেই এসেছে; এই ইন্দ্রিয়তন্ত্র তত্রস্থ বিষয়েরই মাপজোখ করতে পারে। এই ভাবেই আমরা জগতের সংস্পর্শে এসে থাকি। *মাত্রাস্পর্শাস্তু* কৌন্তেয়, 'ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের সংযোগ, হে অর্জুন।' ফলে তোমার কি হবে? 'কখনো তোমার বোধ হবে শীত, কখনো গ্রীষ্ম, কখনো সুখ, কখনো দুঃখ।' সংস্পর্শের স্বভাবই তাই ঃ *শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখদাঃ*। কিন্তু সেগুলি *আগম-অপায়িনো*, 'তারা আসে যায়'; তারা থেকে যায় না, *অনিত্যঃ*। তাই যদি হয়, তবে তাদের ব্যাপারে আমাদের সঠিক প্রতিক্রিয়া কি হবে? *তান্ তিতিক্ষস্ব ভারত*, 'সেগুলি সহ্য কর, (মানিয়ে চল) হে অর্জুন।'

এ অতি চমৎকার উক্তি। ইংরেজিতে আমরা বলে থাকি, 'যার প্রতিকার নেই, তাকে সহ্য করতে বা মেনে নিতে হবে'। অসুখ হলে, তুমি ডাক্তারের কাছে যাও, তিনি তোমার চিকিৎসা করবেন; এ বিষয়ে একটা বিজ্ঞান রয়েছে, কিন্তু *তোমার* করণীয় হলো ডাক্তারের সঙ্গে সহযোগিতা করা, অসুখ না সারা পর্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে তাকে সহ্য করা। তাই *তান্ তিতিক্ষস্ব*, 'তাদের সহ্য কর'; এতে মনোবল বা মানসিক শক্তি বৃদ্ধি হয়। যে অসুখ চিকিৎসায় সারে না তাকে সহ্য কর। সহ্য-শক্তি হলো এক প্রচণ্ড শক্তি। দুঃখাদির অভিজ্ঞতা সহ্য করার ক্ষমতা সব মানুষের সমান নয়, কারো বেশি বা কারো কম।

স্নায়ুবিজ্ঞানের ভাষায় ন্যূনতম দুঃখবোধমাত্রায় মানুষে মানুষে তফাৎ হয়। কোন কোন লোক অনেক দুঃখ সহ্য করতে পারে, আর কেউ কেউ সামান্য দুঃখেই কাতর হয়ে পড়ে। আমি যখন মহীশূরের এক ছাত্রাবাসের দায়িত্বে ছিলাম, ১০, ১১ বা ১২ বছর বয়সের ছাত্রদের ম্যালেরিয়া ইনজেকসন দেওয়া আমাদের একটি কাজ ছিল; কিছু কিছু ছেলে ইনজেকসন নিয়ে চলে যেত; দুটি একটি ছাত্র, সূচ দেখেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত! তাদের যন্ত্রণাবোধ মাত্রা ছিল অত্যন্ত কম। তাই, আমাদের ঐ শক্তি বর্ধিত করতে হবে ঃ বল, 'আমি সয়ে নিতে পারব, আমি সহ্য করতে পারব।' জীবনের ছোটখাট দুঃখ কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। তাই শ্রীকৃষ্ণ বললেন, *তান্ তিতিক্ষস্ব ভারত*, 'এগুলি সহ্য কর'। সহ্য করতে না পারলে, তুমি পড়ে যাবে, শেষ হয়ে যাবে। আরো একটু

শক্তি সঞ্চয় করতে পারলে ঐ সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পারতে। তাই বলি, এত দুর্বল হয়ো না। প্রত্যেককেই আরো একটু শক্তি সঞ্চয় করতে হবে যাতে সে জীবনের নানা পরিবর্তন ও সম্ভাবনার মধ্যে টিকে থাকতে পারে। জীবনের সবটাই খেলা বা সুখভোগ নয়; প্রায়ই দুঃখ কষ্ট এসে থাকে। তাই মানব জীবনে পরিবেশের প্রতিষেধক হিসাবে আমাদের শরীর যন্ত্রকে দৃঢ়তর করা খুবই দরকার। শরীর সবল হলে, রোগজীবাণুও সেখানে প্রবেশ করে বংশবৃদ্ধি করতে পারে না। শরীর দুর্বল হলে নানারকম জীবাণু সেখানে প্রবেশ করে। নানা অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে। অতএব শরীর ও মনকে সবল রাখতে হবে।

বস্তুত শ্রীকৃষ্ণ এই ভাবটিকে এই গ্রন্থে বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। মানসিক শক্তি বা মনোবল ও ইন্দ্রিয় সংযম যে কোন পরিচ্ছন্ন মানবের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এইরকম আত্ম-সংযম না থাকলে সাধুতা ও নৈতিক উৎকর্ষতা সম্ভব নয়। দৈনন্দিন জীবনে দুঃখ কষ্ট আসতে পারে। যদি একটু সহ্য করতে পার, তবে হয়তো একটু পরে পরিস্থিতি ভালোর দিকে যাবে। সমুদ্রে সাঁতার দেবার সময় ঢেউ আসে, আঘাত করে, ধাক্কা দেয়। তাই ঢেউ আসবার সময়, নিচু হয়ে যাও, ঢেউ চলে গেলে উঠে পড়। এইভাবেই ঢেউ-এর সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়। ঢেউ আসে যায়, সব সময় থাকে না। তাই তোমাকে এইভাবে ঢেউ-এর সামনাসামনি হয়ে সাঁতার কাটার সামর্থ্য অর্জন করতে হবে। যেহেতু তারা *অনিত্যঃ*, 'সব সময়ে থাকে না'; তাই বলা হয় *তান্ তিতিক্ষস্ব*, 'তাদের সহ্য কর।' সামান্য সহনশীলতায় প্রভূত পরিবর্তন আসতে পারে। আমরা যদি দুর্বলচেতা হই, তবে সামান্য দুঃখকর পরিস্থিতি এলেই আমরা ভেঙ্গে পড়ি; প্রথম ধাক্কাতেই; এ হলো দুর্বলতার নিদর্শন। যদি সামান্য শক্তি থাকে, সে বলতে পারে ঃ আমি সহ্য করব, এই বাধা কাটিয়ে উঠব। একেই বলে নিজের ওপর প্রচণ্ড আস্থা, *আত্ম-শ্রদ্ধা*। শ্রীকৃষ্ণ চান আমরা সকলেই এই *আত্ম-শ্রদ্ধার* অধিকারী হই, আমি বাধা কাটিয়ে উঠবই। আমেরিকাবাসীদের একটি জাতীয় সঙ্গীত হলো, 'আমরা পার হয়ে যাব, আমরা পার হয়ে যাব।' সকল মানুষের মধ্যেই সেই ভাব থাকা উচিত। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *তান্ তিতিক্ষস্ব*। সংস্কৃত ভাষায় *তিতিক্ষা* একটি মহৎ শব্দ। *বিবেকচূড়ামণিতে*, একটি শ্লোকে (২৪) শঙ্করাচার্য এর সংজ্ঞা দিয়েছেন। বেদান্ত শিক্ষার্থীদের অর্জনীয় গুণাবলীর অন্যতম ঃ *সহনং সর্বদুঃখানাম্ অপ্রতীকারপূর্বকম্। চিন্তাবিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে*, 'কোন উদ্বেগ ও ক্রন্দন রহিত হয়ে, কোনরূপ প্রতিরোধের ইচ্ছা রহিত হয়ে—সব দুঃখ সহ্য করাকেই বলে *তিতিক্ষা*।'

পরবর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥

—'যে এই সব অভিজ্ঞতায় (সুখ বা দুঃখে, শীত বা আতপে) ব্যথিত হয় না, *সমদুঃখসুখম্*, 'সুখ দুঃখে সম-মনা হবার সাহস রাখে, *সোঽমৃতত্বায় কল্পতে* কেবল সেই লোকই অমরত্ব লাভের অধিকারী হতে পারে; সেইরূপ নর বা নারী উপলব্ধি করতে পারে অমর আত্মাকে। এ অতি প্রচণ্ড ক্ষমতা। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়েও আমরা কোন কোন নেতার বাহ্য চাপ সহ্য করবার ক্ষমতা লক্ষ্য করেছি। তাঁরা ভেঙ্গে পড়তেন না। তাঁরা সহ্য করতেন; দুঃখের কথা যে আমরা সেই ক্ষমতা হারাচ্ছি; আমাদের আবার ঐ ক্ষমতাকে ফিরে পেতে হবে। মনে আছে সংবাদপত্রে পড়েছিলাম, একবার সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল যখন আদালতে সওয়াল করছিলেন, একজন তাঁকে একটি টেলিগ্রাম দিলে, সেটি পড়ে পকেটে রেখে সওয়াল চালিয়ে গেলেন, তারপর বাড়ি গিয়ে তাঁর মৃতা পত্নীকে দেখলেন। টেলিগ্রামটিতে ঐ খবরটাই ছিল। ঐ নিদারুণ ধাক্কাকে শান্ত ভাবে সামলে নিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে আমাদের মধ্যে কজন পারে। এটা ভালবাসার অভাব নয়; ভালবাসা ছিল। কিন্তু আরো বেশি কিছু ছিল ঃ তা হলো জীবনে উত্থানপতনের আঘাত সহ্য করবার ক্ষমতা। দেহতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র, মনঃতন্ত্রের আকর্ষণকে অতিক্রম করে, তাদের পারে গিয়ে আত্মানুভূতি লাভ করতে প্রচুর সাহসের দরকার। এর জন্য যে শক্তি চাই—এখন থেকে তাকে আয়ত্ত করবার চেষ্টা দরকার। তাই আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য চাই উচ্চ চরিত্র বল। ঐ শক্তির বীজ আমাদের মধ্যে রয়েছে, তার অনুশীলন চাই। অর্থের বিনিময়ে এ শক্তি পাওয়া যায় না। নিজের মধ্যে এই শক্তি নিজে নিয়মিত অনুশীলন করে বাড়িয়ে তুলতে হবে; অন্যে সাহায্য করতে পারে, পথ দেখাতে পারে, কিন্তু কাজটি একান্ত ভাবেই তোমার। এই মানব জীবন, মনঃশারীরিক তেজঃপুঞ্জে ভরা এই মানব জীবনে আমাদের ঠিকমতো কর্ষণ করতেই হবে—তবেই এ থেকে আমরা উচ্চতম মানের ফসল পেতে পারি। অমর আত্মাই যে আমার স্বীয় প্রকৃত স্বরূপ, তা উপলব্ধি করতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই একটি রামপ্রসাদী বাংলা গান গাইতেন ঃ *'মন রে কৃষি কাজ জানো না। এমন মানব জমিন রইলো পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা।*

পরবর্তী শ্লোক উচ্চ অধ্যাত্মবিদ্যায় ভরা।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ॥

অসৎ ও *সৎ* কথা দুটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে এদের অর্থ বিভিন্ন হয়ে থাকে। শুদ্ধ দার্শনিক ক্ষেত্রে এদের অর্থ মিথ্যা ও সত্য। কিন্তু সাংখ্যের সংজ্ঞা অনুযায়ী এক হলো কারণ, অপরটি হলো কার্য। আর *সৎ* হলো কার্য, যার সাহায্যে আমরা দেখি আর অসৎ হলো কারণ। সাংখ্য মতে কারণ আর কার্য ভিন্ন নয়, যেমন কারণ তেমন কার্য। যন্ত্রে যত শক্তি যোগাবে, তা থেকে তত কাজ পাওয়া যাবে। তার বেশি নয়। একেই বলে কারণ ও কার্য অভিন্ন। এই ক্ষেত্রে *সৎ* হলো সত্য, আর *অসৎ* হলো মিথ্যা। তাই শ্লোকে বলা হয়েছে, *ন অসতো বিদ্যতে ভাবো,* 'মিথ্যার কোন অস্তিত্ব নেই'; তেমনি *ন অভাবো বিদ্যতে সতঃ,* 'যা সত্য তার ক্ষেত্রে অনস্তিত্ব কথাটির প্রয়োগ চলে না।' সৎ-ই সত্য, তার অনস্তিত্ব কখনই হয় না। আমাদের চিন্তানায়কগণ যখন সংসার বিষয়ে পর্যালোচনা করেছিলেন, লক্ষ্য করেছিলেন এর দুটি দিক রয়েছে; একটি পরিবর্তনশীল বা অনিত্য, আর একটি অপরিবর্তনীয় বা সত্য। সংসারের প্রতিটি জিনিস প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে। *শঙ্করাচার্য* তাঁর *কঠোপনিষদ্* ভাষ্যে বলেছেন ঃ *প্রতিক্ষণম্ অন্যথা স্বভাবো,* 'প্রতি মুহূর্তে এর অন্যরূপ হচ্ছে।' বাহ্য জগতের এবং অন্তর্জগতের অনেকটারই স্বভাব হলো পরিবর্তন। আর যা কিছু ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়, বেদান্তে তাকেই বলে অসৎ বা মিথ্যা। মিথ্যা কথাটিকে আমরা এই ভাবেই ব্যবহার করে থাকি; এটির অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তা মিথ্যা। এটি প্রতীয়মান হচ্ছে, তবু তা মিথ্যা।

প্রাচীন ভারত, চীন এবং গ্রিসের দার্শনিকদেরও এটি একটি মহান সিদ্ধান্ত। এই হলো অভিব্যক্ত বিশ্বের স্বভাব, যে বিশ্বকে আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে দেখে থাকি, অনুভব করে থাকি, তা সদা পরিবর্তনশীল তাই তা মিথ্যা। যাই পরিবর্তনশীল তাই মিথ্যা। তবে সত্য কোথায়? বেদান্তে বলে হাঁ পরিবর্তনহীন সত্য আছে ইন্দ্রিয়াতীত স্তরে, সেখানেই পাবে সত্যের জগৎ, যা অবিকারী, অনন্ত, সনাতন। ভারতীয় দর্শনে এই পার্থক্য করা হয়েছিল বহু পূর্বে, গ্রিক দর্শনেও দুটি মত আছে, একটি সনাতন, অবিকারী সত্যকে ধরে আছে, অন্যটি পরিবর্তনশীল জগৎকে ধরে আছে। গ্রিক দার্শনিকরা এই পরিবর্তনশীল জগৎকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন এই বলে, 'একই নদীতে তুমি দুবার পা ডোবাও না।' জগৎ এই ভাবেই সদা পরিবর্তিত হচ্ছে। আরো অনেকভাবে এর সমর্থন

পাওয়া যায়, যখন আমরা জড়বস্তুতত্ত্বানুযায়ী আধুনিক পদার্থ বিদ্যা ও সজীব দেহতন্ত্রাদি-অনুসন্ধানী আধুনিক জীববিজ্ঞান পর্যালোচনা করি। যেমন কয়েক বছরে আমাদের দেহের পরিবর্তন হয়; দেহের প্রত্যেকটি অংশেরই পরিবর্তন হয়। তবু আমরা বলি, 'আমি আছি।' আমার অনুভূতি হয় যে আমি একই মানুষ আছি। এই পরিবর্তনশীল জগতের মধ্যে কোথাও কোন রকমের একটা সংহতির বাঁধন আছে। মানুষই তা আবিষ্কার করতে পারে। পশুও পরিবর্তিত হয়, কিন্তু তারা তাদের পরিবর্তনের মধ্যে কোনরূপ সংহতির কথা বুঝতে পারে না। কোথাও যে একটি সংহতি আছে যাকে কেন্দ্র করেই সবরকম পরিবর্তন ঘটে থাকে—এ তত্ত্ব মানুষই অনুভব করে। ঠিক যেমন ছায়া চিত্রে পেছনের পর্দাটি থাকায় পরপর ছবিগুলি মিলে চলচ্চিত্র দেখা যায়—এতেই সংহতির সৃষ্টি হয়। তেমনিই আমরা বিশ্বের বৈচিত্র্যের মাঝে সংহতির অনুসন্ধান করি। প্রথম সত্য হলো পরিবর্তন, আর পরিবর্তনশীল বস্তুমাত্রেই অসত্য বা মিথ্যা।

তাই সত্যের এক চমৎকার সংজ্ঞা পাওয়া যায় গৌড়পাদের *মাণ্ডূক্য উপনিষদ্ কারিকায়* (২.৬)। *আদৌ অন্তে চ যন্নাস্তি বর্তমানোঽপি তৎ তথা; বিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্তো অবিতথা ইব লক্ষিতাঃ*; 'যা আদিতে নেই, অন্তে নেই, তা বর্তমানেও নেই; তাকে সত্য মনে হলেও তাকে মিথ্যারূপে চিহ্নিত করা হয়।' শ্লোকে বলা হয়েছে, যা আদিতে নেই, অন্তে নেই, মধ্যে আছে বলে কেবল মনে হয়, তাই মিথ্যা। তবে সত্য কী? অতীতে, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে যার অস্তিত্ব বিদ্যমান, তাকে সত্য বলা হয়। যা সব সময়েই রয়েছে। এমন সত্য কি আছে? বেদান্ত বলে, হাঁ, তার অনুসন্ধানই বিশ্বের সকল দর্শনের অনুসন্ধানের বিষয়। ভৌত বিজ্ঞানও পরিবর্তনশীল বিশ্বের পিছনে যে একটি সৎবস্তু রয়েছে তারই অনুসন্ধান করছে। বেদান্তে আমরা এ কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলাম এমনই আন্তরিকতার সঙ্গে ও অনুপুঙ্খভাবে যে তার তুলনা জগতে অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। এখানে *সৎ* ও *অসৎ* কথা দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। *ন অসতো বিদ্যতে ভাবো, ন অভাবো বিদ্যতে সতঃ;* এই বাহ্য জগৎ যদি মিথ্যা হয় তবে কোন্ বস্তু সত্য? অমর অনন্ত আত্মা যা, শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, একমেবাদ্বিতীয়ম্, সমগ্র বিশ্বের উৎপত্তি যেখান থেকে, স্থিতি যেখানে, সৃষ্টিচক্রের অন্তে যেখানে তার লয়। এই শ্লোকের একটু পরেই, অপর একটি শ্লোকে বিষয়টি আলোচিত হবে।

সুতরাং আমরা সেই অনন্ত অমর সত্যের উদ্দেশ্যেই *সৎ* কথাটি ব্যবহার করি; আর এই মরণশীল বিশ্বের উদ্দেশ্যেই *অসৎ* কথাটি ব্যবহৃত হয়।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে একমাত্র সত্য বলে বিশ্বাসকেই জড়বাদ বলে, আর আজকাল জড়বাদই হলো শক্তিশালী দর্শন। এ দর্শন পূর্বেও ছিল। যতক্ষণ না গভীর চিন্তায় মগ্ন হওয়া যায় ততক্ষণ এ বিশ্বাস থাকবে। কোন কোন আধুনিক বিজ্ঞানী আধুনিক বিজ্ঞান থেকে জড়বাদকে বিদায় দিতে চাইছেন। গত শতাব্দীতেও টমাস হাক্সলি, যিনি ছিলেন একজন খুবই সূক্ষ্ম চিন্তাবিদ এবং ডারউইনের সহযোগী জড়বাদকে বিজ্ঞান জগতে এক অনধিকার প্রবেশকারী তত্ত্ব বলে বর্ণনা করেছেন। জড় বস্তু একটি প্রয়োজনীয় কল্পনা। কেউই জড়বস্তুকে দেখে নি, তবু এটি একটি প্রয়োজনীয় কল্পনা, যেমন বীজগণিতের প্রশ্নের সমাধানে কল্পিত x, y, z-এর সাহায্য নেওয়া হয়। কিন্তু যারা ভুলে যায় যে এগুলি প্রতীক মাত্র, আর মনে করে এগুলি সত্য বস্তু, তারা মানবজাতির প্রতি এক মস্ত অবিচার করছে। তারা মানবজীবনের সৌন্দর্য নষ্ট করবে। এ হলো গত শতাব্দীতে উচ্চারিত টমাস হাক্সলির সাবধান বাণী। এই শতাব্দীতেও নভোবস্তুতত্ত্ববিদ্ মিলিক্যান বলেছেন ঃ 'আমার কাছে জড়-দর্শন হলো বুদ্ধিহীনতার চরম পরিণতি'। বর্তমানে আরও অনেকেই একথার সত্যতা উপলব্ধি করছে। তাই জড় বস্তু একরকম প্রতীক মাত্র। কেউই জড় বস্তু দেখে নাই। আমরা যা দেখি, ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে, তা হলো এক অসীম সত্য যা, বহির্জগতে জড় বস্তু হিসেবে এবং অন্তর্জগতে আত্মস্বরূপ বলে আমাদের প্রতীতি হয়ে থাকে। জগতে কেবল একটি সত্যই আছে। আমরা তাকে ব্রহ্ম বা আত্মা বলে থাকি। বেদান্তের ভাষায়, তিনি শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। চৈতন্য ঘনীভূত হয়ে যে জড়বস্তুরূপে মানবের ইন্দ্রিয়তন্ত্রের উপলব্ধিতে আসে—পাশ্চাত্যে বিজ্ঞানীরা এখন এই তত্ত্বের মর্ম উপলব্ধি করছে। কেমন চমৎকার ভাবটি! যাতে বলা হয়েছে জড়বস্তুর নানা স্তর আছে ঃ স্থূল জড় পদার্থ, সূক্ষ্ম জড় পদার্থ, অতি সূক্ষ্ম জড় পদার্থ, এমনকি মানব শরীরেও এটি প্রত্যক্ষ করা যায়। এতে কঠিন অস্থি থেকে স্বচ্ছ অক্ষিগোলক পর্যন্ত নানা স্তরের সূক্ষতাবিশিষ্ট পদার্থ দেখা যায়। গাছের ক্ষেত্রে নরম চারাগাছ কঠিন কাষ্ঠে, পাতায়, ফুলে ও ফলে পরিণত হয়; এইরূপে জড় পদার্থ স্থূল, সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্মাদি নানা স্তরের সূক্ষ্মতা বিশিষ্ট হয়ে থাকে, তাই আমরা জানি না ঐ জড় পদার্থের স্বরূপটা কী।

বেদান্ত বলে, চৈতন্যই নানা স্তরের অভিব্যক্তিতে বিভিন্ন বিষয় ও বিষয়িরূপে প্রকাশ পায়। *মুণ্ডক উপনিষদে* (২.২.১১) এই সত্য প্রকাশ পেয়েছে ঃ *ব্রহ্মৈবেদম্ বিশ্বমিদম্ বরিষ্ঠম্*-রূপে, 'বিষয়-বিষয়ী সহ এই অভিব্যক্ত বিশ্বই পূজ্যতম ব্রহ্ম।' অবশ্য, এই দর্শন বহুযুগ পূর্বে ভারতে গড়ে উঠেছিল, আর পশ্চিমী বিজ্ঞান

উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। *Tao of Physics* (পদার্থ বিজ্ঞানের তত্ত্বকথা) নামক গ্রন্থে অধ্যাপক কাপরা—এটিকে একটি প্রকৃষ্ট উপাত্ত বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি *ছান্দোগ্য উপনিষদ্* থেকে একটি হেঁয়ালিপূর্ণ অংশের উদ্ধৃতি দিয়েছেন ঃ *প্রাণো বৈ ব্রহ্ম*, 'প্রাণই ব্রহ্ম', *প্রাণই* তেজ; মানসিক ও জৈব তেজ। কিন্তু এতে সব তেজই নিহিত আছে। তাই সব তেজই ব্রহ্ম। প্রাণো বৈ ব্রহ্ম, 'প্রাণ অবশ্যই ব্রহ্ম', তবে কেন ভুল করে আমরা একে জাগতিক জড়, নিষ্প্রাণ ভৌত তেজ বলে মনে করি? পরের ছত্রে বলা হয়েছে ঃ *কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম*। বড় হেঁয়ালিপূর্ণ উক্তি। *ক* ও *খ* হলো সংস্কৃত ভাষায় ব্যঞ্জনবর্ণের প্রথম দুটি বর্ণ। ব্রহ্মই *'ক'*, ব্রহ্মই *'খ'*। তখন শিষ্য বলেন ঃ 'আমি এই *ক* ও *খ* বুঝছি না। আমি বুঝি *প্রাণই* ব্রহ্ম। আমাকে বুঝিয়ে দিন।' গুরু বুঝালেন ঃ সংস্কৃত ভাষায় *খ*-এর অর্থ আকাশ, যার কোন সীমা নেই; অর্থাৎ ব্রহ্ম হলেন অনন্ত, বিস্তারশীল; তা ঠিকই বোঝা গেল। এটি কি তবে আজকালকার পদার্থ বিদ্যার ও নভোবিদ্যার জড় ভৌত নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের মতো? না এটি আবার *কং*ও বটে ঃ *কং ব্রহ্ম*। সংস্কৃত ভাষায় *ক*-এর অর্থ সুখ, পরমানন্দ। এতে বোঝায়, এর প্রকৃত স্বরূপ হলো চৈতন্য। অতএব ব্রহ্ম অনন্তও বটে, আবার চৈতন্য-স্বরূপও বটে। আর সমগ্র অভিব্যক্ত নিখিল বিশ্ব কেবল ঐ ব্রহ্ম। যথেষ্ট সমর্থন পেয়ে এই পদার্থবিদ উদ্ধৃতি দিয়েছেন *ছান্দোগ্য উপনিষদের* এই বিশেষ পংক্তিটির ঃ *প্রাণো বৈ ব্রহ্ম। কং ব্রহ্ম। খং ব্রহ্ম।* অতএব পরিবর্তন হলো কেবল সেই অবিকারী অনন্ত সদ্‌বস্তুর একটি স্পন্দনমাত্র। ঠিক যেমন সমুদ্রের জল যার স্পন্দন হলো তরঙ্গ। সমুদ্র ব্যতিরেকে তরঙ্গের কোন অস্তিত্ব নেই। এ কেবল সদাই আবির্ভূত ও তিরোহিত হচ্ছে। বর্তমান পদার্থ বিদ্যায় এই ভাষা ব্যবহার করে বলা হয়, পদার্থ হচ্ছে তার পশ্চাৎপটে অবস্থিত সেই অনন্ত সদ্‌বস্তুর তরঙ্গ মাত্র। সমগ্র বিশ্বের অস্তিত্ব কেবল তরঙ্গরূপেই। অনন্ত সদ্‌বস্তুর তরঙ্গস্বরূপ। এখন এগুলি সব আধুনিক পদার্থবিদ্যা ও সৃষ্টিতত্ত্ব পটভূমিতে প্রতিভাষিত থেকে উদ্ভূত সাধারণ সংজ্ঞা ও ধারণা, যা প্রাচীনকালে বেদান্তে বা উপনিষদে কল্পিত হয়েছিল।

তাই এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তঃ ত্বনয়োঃ তত্ত্বদর্শিভিঃ*, এই *অন্তঃ*, 'এই সিদ্ধান্তে' বা *নির্ণয়ে*, কে এসেছেন? *তত্ত্বদর্শিভিঃ*, 'যারা *তত্ত্বম্* উপলব্ধি করেছেন। সংস্কৃত ভাষায় *তত্ত্বম্* কথাটিও সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট একটি মহান শব্দ। *তস্য ভাবঃ তত্ত্বম্, তত্ত্বম্* বলতে কোন বিশেষ বস্তুর প্রকৃতিকে বুঝায়। যেমনটি মনে হয়, তা নয়। ঠিক যেমন 'পৃথিবী সমতল' এটি *তত্ত্বম্* নয় *মতম্*। আমাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান বলে, ভূ-পৃষ্ঠ সমতল। কিন্তু *তত্ত্বম্‌টি*

কী? ভূ-পৃষ্ঠ গোলাকার, পৃথিবী গোলাকার। এর নাম *তত্ত্বম্*। যারা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে *বস্তুতত্ত্বম্* জেনেছে, তাদের সিদ্ধান্ত হলো : যে এই *সৎ*, সত্য, সদাই *বিদ্যমান*। আর যা *অসৎ*, যার অস্তিত্ব নেই, তাতে সত্য নেই। *অসতে* যেটুকু সত্য আছে তা আসে *সৎ* থেকে। তাই, ঋষিরা বিচার করে, এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে, এইরূপ সিদ্ধান্তে এসেছেন। চিন্তা পদ্ধতির অনুশীলন কিভাবে বার বার হয়ে থাকে, দেখা যায় আধুনিক পদার্থ-বিদ্যায় তা ঘটছে। আইনস্টাইনের ভাষায়, 'আজকালের পদার্থ-বিদ্যায়, দুটি সত্য রয়েছে, একটি জড় পদার্থ, অপরটি হলো ক্ষেত্র। দুটিই সত্য হতে পারে না, কারণ ক্ষেত্রই সত্য। জড় পদার্থ হলো কেবল ঘনীভূত ক্ষেত্র।' ভাষা লক্ষ্য কর। বেদান্ত এই একই ভাষা যুগ যুগ পূর্বে ব্যবহার করেছিল; পদার্থবিদ্‌গণ বাধ্য হয়ে বর্তমানে তা ব্যবহার করছেন, কারণ ঋষিরা সত্যেরই অনুসন্ধান করতেন, মতের নয়। এই হলো *তত্ত্ব*, যা কল্পিত, যা মনোরম, তা নয়; এগুলিকে বলা হয় বিশ্বাস ও মতবাদ। এ রকম অনেক থাকুক, কিন্তু *তত্ত্বম্* অন্য জিনিস। এটি একটি মহান্ শব্দ। আমি আশা করি আমাদের দেশবাসী এই শব্দের অর্থ বুঝতে চেষ্টা করুক, আর তা দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করুক।

কোন জিনিষের *তত্ত্বম্* বলতে কি বুঝায়? মনে কর আমার একটা মত আছে। আমি সেটিকে ধরে থাকতে পারি, কিন্তু মতটিকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে—মতটিকে সত্য হতে হবে। তবেই তাকে *তত্ত্বম্*-এর পর্যায়ে ফেলা যায়। নচেৎ তাকে *মতম্*-ই বলা যেতে পারে। *মতম্* হলো ইংরেজি opinion-এর সংস্কৃত প্রতিশব্দ। *তদ্-অস্মাকম্ মতম্*, 'এই হলো আমাদের মত বা, এই হলো আমার ধর্ম'। এটি সত্য নয়, কারণ আমি অনুসন্ধান করে তা দেখি নি। অনুসন্ধানের ফলে সেটি সত্য বলে প্রমাণিত হলে, তবেই তাকে সত্য মত বলা যাবে। সেটি তখন বিরুদ্ধ যুক্তির কাছে টিকে থাকতে পারবে। তাই, জগতে প্রচলিত ধর্মের সংখ্যা বহু—সেগুলি *মতম্*। যা আমাকে সুখী করে, আমাকে আকৃষ্ট করে, আমার প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, তাই *মতম্*। আমি বৈষ্ণব, শৈব, হিন্দু, মুসলমান বা খ্রিস্টান হতে চাই—এসব আমার *মতম্* পর্যায়ে পড়ে। এ একদিক। দ্বিতীয় দিক হলো : যদি তুমি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অনুসন্ধান কর—এই সব *মতম্* বলতে কি বোঝায়? *মতম্*-গুলির বহুত্বের পেছনে কি আছে? এদের পেছনে কোন সত্য আছে কি? তা থেকে আবিষ্কৃত হবে ধর্মের *তত্ত্বম্*। *তত্ত্বম্*-এর আবিষ্কারের ফলে ধর্মে ধর্মে দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যাবে। বৈজ্ঞানিক সত্যগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই। মতবাদেই দ্বন্দ্ব থাকে। আমরা জানি যে মতগুলি

একই সত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। এরপর আর দ্বন্দ্ব থাকে না—কেবল সমন্বয় ও শান্তিই বিরাজিত থাকে। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হতে হবে : তোমার মতকে আমি শ্রদ্ধা করব, তুমিও আমার মতকে শ্রদ্ধা করবে। তুমি একরকম খাদ্য খাও, আমি তাকে শ্রদ্ধা করি। আমি একরকম খাদ্য খাই, তুমিও তাকে শ্রদ্ধা কর। এমন কথা বলবে না, যে, আমার খাদ্যই ভাল, তোমার খাদ্য বিষ। ধর্মের নামে আমরা এইরকমই করেছি, ঐগুলিকে ভুল করে *তত্ত্বম্* বা সত্য বলে ভেবে। *তত্ত্বম্* একেবারে অন্যরকম। তুমি যে কোন খাদ্য খাও তা হলো তোমার মতম্। কিন্তু দেখো যে শরীরের পুষ্টির জন্য যত ক্যালোরি দরকার খাদ্যে যেন সেটুকু থাকে, সেটাই হলো *তত্ত্বম্*।

তাই ধর্মের মধ্য দিয়ে, খাদ্যাভাসের মধ্য দিয়ে *মতম্* ও *তত্ত্বম্*-এর তফাৎ বোঝা যায়। অনুসন্ধান চালালেই আমরা এই সত্যে পৌঁছুতে পারি। আজকাল আমাদের দেশে, প্রশ্ন করতে আরম্ভ করেছে, কেন এতগুলি ধর্ম? তাদের সকলের অন্তর্নিহিত সত্য কী? প্রত্যেক ধর্মই বলে আমার ধর্মই সত্য। কিন্তু তুমি সব সত্যের লেখস্বত্ব সংরক্ষিত করে নিতে পার না। অন্যেরাও বলে তাদের ধর্মই সত্য। এরকম প্রশ্ন এলে, বিষয়টির খুব নিরপেক্ষ বিষয়মুখী অনুসন্ধান দরকার, আর তাই আমাদের প্রাচীন ও নবীন ঋষিরা অনুসন্ধান করেই *মতম্*-কে *তত্ত্বম্*-এর স্তরে উন্নীত করতেন। আর *তত্ত্বম্* একটিই। *তত্ত্বম্* কখনো বহু হতে পারে না। *মতম্* বহু হতে পারে। সুতরাং *তত্ত্বম্* এক, আর *মতম্‌গুলি* একই *তত্ত্বমের* নানা অভিব্যক্তি। এই ভাবেই আমাদের প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরা নানা ধর্মের বৈচিত্র্যের পেছনে যে অদ্ভুত ঐক্য নিহিত রয়েছে তা আবিষ্কার করেছিলেন, ভারতের মাটিতেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ধর্মের নামে অসহিষ্ণুতার নামগন্ধহীন সমন্বয় ও শান্তি, যার অভিব্যক্তি পাওয়া যায় মানব-জাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ, *ঋগ্বেদে* (১.১৬৪.৪৬) : *একং সদ্, বিপ্রা বহুধা বদন্তি*, 'সত্য এক, ঋষিরা নানা নামে একে অভিব্যক্ত করেছেন' এবং বহু শত বর্ষ পরে *শ্রীমদ্‌ভাগবতে* পাওয়া যায় : *বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদাঃ তত্ত্বম্ যৎ জ্ঞানমদ্বয়ম্, ব্রহ্মেতি, পরমাত্মেতি, ভগবানিতি, শব্দ্যতে*। সেই *তত্ত্বম্*-এর ধারণা এখানেও পাওয়া যাচ্ছে। এতে বলা হয়েছে, *বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদাঃ*, 'সত্য বা তত্ত্ববেত্তাগণ একথা বলেন', তাঁরা কী বলেন? *তত্ত্বম্ যৎ জ্ঞানমদ্বয়ম্*, 'একটি তত্ত্বম্ বা সত্যই বিদ্যমান, যা শুদ্ধ, অদ্বৈত চৈতন্যস্বরূপ', যাকে উপনিষদে বলা হয়েছে—শুদ্ধতাস্বরূপ, অদ্বৈত চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম'। এই হলো *তত্ত্বম্*। কিন্তু 'ঐ *তত্ত্বম্* ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও ভঙ্গিতে ব্যক্ত করে থাকে।' এগুলি কি? *ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি*

ভগবানিতি শব্দ্যতে। *শব্দ* বা বাক্য যার দ্বারা একই বস্তু বহু-রূপে প্রতীয়মান হয়। 'কেউ একে ব্রহ্ম নাম দেয়, কেউ একে *পরমাত্মা* বলে, আর কেউ বা বলে *ভগবান*, বিশ্ব-প্রেমিক ঈশ্বর।

এইভাবে, *মতম্* বনাম *তত্ত্বম্* সম্বন্ধে অনুসন্ধান এদেশের প্রভূত উপকার করেছে। অন্য কোন দেশে এ কাজে হাতই দেওয়া হয়নি, একবারও নয়। রাজনীতির দিক থেকে সুবিধাজনক ব্যবস্থারূপে ছাড়া এ কাজে কখনই হাত দেওয়া হয়নি। আজ আমাদের এই ধরনের অনুসন্ধানের উদ্বোধন করতে হবে, নানা প্রকার বিকাশের পেছনে যে সমন্বয়ের ভাবটি রয়েছে তারই খোঁজে। যেমন দর্শনের ক্ষেত্রে, তেমনি ধর্মের ক্ষেত্রে। আমাদের বিবেচনা করতে হবে—*মতম্‌কে* বহুত্বরূপে আর *তত্ত্বম্‌কে* একত্বরূপে; আর বহুত্বকে অবশ্যই একত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে।

পরবর্তী শ্লোকে *গীতায়* বলা হয়েছে ঃ

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি ॥ ১৭ ॥

—'যিনি সমগ্র বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করে আছেন, তাঁকেই অবিনাশী (আত্মা বা ব্রহ্ম) বলে জানবে; সেই অব্যয় সৎবস্তুর (আত্মার) বিনাশ কোন কিছুর দ্বারাই সম্ভব নয়।'

শুদ্ধ-অদ্বৈত-চৈতন্য স্বরূপ অনন্ত সত্য (সৎ-বস্তু) সমগ্র বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করে আছেন। নানা বস্তু সৃষ্ট হচ্ছে আবার বিনষ্টও হচ্ছে, কিন্তু যা থেকে ঐ বস্তুসমষ্টিরূপ বিশ্ব সৃষ্ট হয় তা কোনভাবেই বিনষ্ট হয় না। *বিনাশম্ অব্যয়স্য অস্য ন কশ্চিৎ কর্তুম্ অর্হতি*, 'বিশ্বের পেছনে যে অবিনাশী সৎবস্তু (সত্য) রয়েছে, তাকে বিনাশ করার সামর্থ্য কারও নেই।' *অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি*, 'তাকে বিনাশহীন বলে জানবে।' তাই আবার রয়েছে এই শরীরের মধ্যে-আত্মারূপে; যা 'সেখানে' তাই আবার 'এখানেও' আছে। কিন্তু, কেবল মানবশরীরেই তাকে উপলব্ধি করা যায়, তাই হলো মানবসত্তার সর্বশ্রেষ্ঠ অনন্যতা। পশু শরীরের মধ্যেও তা রয়েছে, কিন্তু ঐ শরীর তাকে, ঐ সত্যকে, বুঝতে সাহায্য করে না। তাই (পরের শ্লোক)—

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥

—'শরীরধারী নিত্য অবিনাশী প্রত্যক্ষ নির্ণয় বহির্ভূত এই সত্তার বিভিন্ন শরীরগুলির কিন্তু বিনাশ আছে, অতএব, হে অর্জুন, যুদ্ধ করে তোমার স্ব-ধর্ম পালন কর।'

'অতএব, যুদ্ধ কর, *তস্মাৎ যুধ্যস্ব*', কেন? এই সত্যের কারণে ঃ শরীরগুলি *অন্তবন্তঃ*, 'তাদের অন্ত আছে', অন্ত মানে মৃত্যু। শরীর মরে, তুমি কখনই তাদের চিরকাল ধরে রাখতে পারবে না। শরীরগুলি কার? *নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ*, '*ঐ শরীরীর*, যে শরীর ধারণ করেছে তার, এই *শরীরী* হলো *নিত্য*, চিরস্থায়ী—আর তারই হলো এই মরণশীল শরীরগুলি। এই সত্যকে জেনে রাখ। *অনাশিনো অপ্রমেয়স্য*, ঐ আত্মা যা এই সব শরীরের মধ্যে রয়েছে, তা *অনাশী*, 'তাঁর বিনাশ নেই', *অপ্রমেয়*, 'প্রত্যক্ষ মাপজোখ বা প্রমাণের অতীত', তাকে বাক্য ও মনের বিষয় করা যায় না। তাই তার নাম *অপ্রমেয়*। জগতের সব জিনিসকে বাক্য-মনের গণ্ডির মধ্যে আনা যায়, কিন্তু আত্মাকে নয়, কারণ আত্মা বিষয় নয়, চিরকালই বিষয়ী—শুদ্ধ চৈতন্য স্বভাব। *কঠ উপনিষদে* (১.২.৯) যেমন বলা হয়েছে ঃ *নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া*, 'এই আত্মা যুক্তি*তর্কের* দ্বারা বোধগম্য হয় না'।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ॥

—'যে মনে করে আত্মাই হনন কর্তা এবং যে মনে করে আত্মা নিহত হন, তারা দুজনেই জানে না যে আত্মা কাউকে নিহত করেন না বা নিজে নিহত হন না।'

এই ১৯ সংখ্যক শ্লোকটি মার্কিন চিন্তক, র‍্যালফ্ ওয়ালডো এমারসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমারসন এই শ্লোকটিকে তাঁর একটি রচনার মধ্যে পদ্যে ছন্দোবদ্ধ করেছেন—যা আমি ভূমিকায় উল্লেখ করেছি। এটি একটি চমৎকার গ্রন্থ যা ঊনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকার অতীন্দ্রিয়বাদী দর্শন বিষয়ক আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল। তাই, *নায়ম্ হন্তি ন হন্যতে*, 'আত্মা কাউকে বিনাশ করেন না, অথবা কারও দ্বারা বিনষ্টও হন না'। এই হলো আত্মার প্রকৃত স্বভাব। পরবর্তী শ্লোকে এই ভাবটিকে আরও সম্প্রসারিত করা হয়েছে ঃ

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বাঽভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥

—'এই আত্মা কখনো জাত বা মৃত হন না; এটি এমন বস্তু নয়, যা একবার জন্ম নিয়ে, পরে বিদ্যমান রইল না; যখন শরীরের বিনাশ হয়, জন্মহীন, সনাতন ও চিরস্থায়ী এই প্রাচীন আত্মাটি বিনষ্ট হন না।'

এই শ্লোকটি *কঠোপনিষদের* ১.২.১৮ সংখ্যক শ্লোকের প্রায় অনুরূপ। *ন জায়তে,* 'আত্মার জন্ম নেই'। স্বভাবতঃ, ন ম্রিয়তে, 'এর মৃত্যু নেই'। *কদাচিৎ,* 'কখনও'। *নায়ং ভূত্বা অভবিতা বা ন ভূয়ঃ,* 'এটি এমন নয় যা একবার হয়ে, পরে বিদ্যমান থাকে না'; *অজো,* 'এটি জন্মহীন'। *জো* শব্দের অর্থ 'জন্ম হওয়া', এই শব্দ থেকেই ইংরেজি ভাষার genetic (জেনেটিক) শব্দের উৎপত্তি। তাই *অজো* হলো, 'জন্মহীন'; *নিত্যঃ,* 'সনাতন'; *শাশ্বতঃ,* 'চিরস্থায়ী'; *পুরানো,* 'বস্তুটি অতি প্রাচীন তবু চির নবীন'; এই হলো *পুরানো* শব্দের অর্থ—আদি শঙ্করাচার্যের মতে—*পুরা অপি নব এবেতি পুরানঃ,* 'প্রাচীন অথচ চির-নবীন'। বর্তমান যুগে, প্রায় ৫০০০ হাজার বছর অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকার পর, ভারতে যৌবন ফুটে উঠেছে। তাই আত্মায় যে গুণ রয়েছে ভারতের তা আছে। ভারত সদা পুরান—যদিও পুরাতন তবু সদাই তাজা। *ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে,* 'শরীরের বিনাশ আত্মায় স্পর্শ করে না। আত্মা একেবারে অস্পৃষ্টই থেকে যায়। কেউই আত্মাকে, মানবের প্রকৃত সত্তাকে বিনাশ করতে পারে না। এই সত্য—মানব সত্তার অমৃতত্বের কথা—উপনিষদে, তথা *গীতায়,* বার বার জোর দিয়ে বলা হয়েছে। *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* সকল মানবসত্তাকে *অমৃতস্য পুত্রাঃ* (২.৫) বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই সত্যের সামান্য জ্ঞানেও আমরা প্রভূত শক্তি, প্রভূত নির্ভীকতা ও প্রভূত করুণার অধিকারী হতে পারি। প্রতিটি সত্তায় একই আত্মা বিদ্যমান আছেন। এই সত্যের জ্ঞান আমাদের সবাইকে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ করে, মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কে প্রেম ও সেবার ভাব ফুটিয়ে তোলে। সমস্ত নীতিজ্ঞানের পেছনেই রয়েছে এই তত্ত্ব : এই একত্বের ভাব মানুষে মানুষে একত্বভাব নিয়েই গড়ে ওঠে নীতিজ্ঞান তখনই কেবল নীতিগর্ভ বোধশক্তি কার্যকরী হয়ে ওঠে। সুতরাং নীতিবোধের পেছনে মৌলিক একত্বের সত্যটি রয়েছে। আমরা মূলত এক।

এই পরিবর্তনশীল শরীর ও মনের জটিল সমাহারের পেছনে মানুষের অন্তরে কিছু শাশ্বত, কিছু অনন্ত সত্তা রয়েছে। এই ছিল মানবিক সত্তা সম্বন্ধে উপনিষদের ঋষিগণের মূল শিক্ষা। আমরা তা জানি না, কিন্তু সত্যের কাছে এই জানা বা না জানায় কিছু যায় আসে না। কারণ, এই সত্যই আবিষ্কৃত ও পুনরাবিষ্কৃত হয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়, আমরা যাতে সেই সত্যকে পুনরায় আবিষ্কার করে পুনর্মুক্তি পেতে পারি। এর জন্য আমাদের স্বর্গের কোন দেবতার ওপর নির্ভর করার দরকার নেই। আমাদের মুক্তির ছক আমাদের অন্তরেই আছে, চিরমুক্ত আত্মারূপে, তাই হলো আমাদের শাশ্বত প্রকৃতি। বেদান্ত সাহিত্যে এই কথার ওপর বার বার জোর দেওয়া হয়েছে। তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই অংশে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মাধ্যমে সকলকে বলছেন, *ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ*, 'এই আত্মার কখনো জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই', ইনি অমৃত স্বভাব, শরীর চলে গেলেও এই আত্মা বিদ্যমান থাকেন। এই অংশের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য বলেছেন; এমন কি ঈশ্বরেরও ক্ষমতা নেই মানবাত্মার বিনাশসাধনের। অতএব সর্বত্র, আমাদের প্রত্যেকের, এমন কি পশু-পক্ষী ও কীট-পতঙ্গদের অন্তরে যে আত্মা, তাই হলো অন্তরতম প্রত্যগাত্মা। এইটুকু তফাৎ যে পশুরা এই সত্য উপলব্ধি করতে পারে না। কেবল মানব সত্তারই আছে এই সত্য উপলব্ধি করার মতো জৈব সামর্থ্য। এইটিই হলো শ্রেষ্ঠ মানবিক স্বাতন্ত্র্য। ক্রমবিকাশ মানুষের মধ্যে সেই স্তর পর্যন্তই এগিয়েছে, যেখানে বহির্জগতের সত্য ও আপন শাশ্বত আত্মা সম্বন্ধীয় সত্য যুগপৎ তার জ্ঞাননয়নে উদ্ভাসিত হয়ে থাকে। এই সত্য যখন মানব বা মানবীর কাছে উদ্‌ঘাটিত হয় সে তখন পূর্ণায়ত হয়ে যায়; কারণ, মনুষ্য স্তরে ক্রমবিকাশের অগ্রগতি এই সত্য আবিষ্কারের দিকে—এর পরিণতি হলো তার স্বীয় প্রকৃত সত্তাকে অমর অনন্ত আত্মা রূপে আবিষ্কারে; এই আত্মাতেই সমগ্র ক্রমবিকাশের পরিপূর্ণতা।

মহান দ্রষ্টাপুরুষ ডেলফির দিব্যবাণীর মাধ্যমে প্রাচীন গ্রীসেরও মর্মবাণী হলো : 'মানব, নিজ স্বরূপকে জান'। তুমি হয়তো নক্ষত্রাদি, পৃথিবী, আরো সব কিছু জানতে পার—তা জান। কিন্তু শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হলো তোমার আপন স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান। যখন তুমি তোমার প্রকৃত স্বরূপকে—তোমার জন্মহীন মৃত্যুহীন চিরশুদ্ধ ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত স্বরূপকে—জানতে পার তখন তোমার জীবনেও অন্যের সহিত তোমার ব্যবহারে কত বড় পরিবর্তনই না আসবে। সবরকম অপরাধ, কর্তব্যকর্মে অবহেলা, ক্ষুদ্রতা, নীচতা মানবজীবন থেকে দূরীভূত হবে।

তাই, প্রত্যেক মানবের ক্ষেত্রেই এ বিষয়ে একটু মনোযোগ দেওয়া একান্তই প্রয়োজন। মানব সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানকে একেবারে পেছনে ফেলে রেখে, সহজ কথায় আপন সত্তার অনুসন্ধানকে বর্জন করে, তোমরা কেবল জড় বিজ্ঞানেরই চর্চা করে এসেছ। দু-শ বছর এই ধরনের পর্যালোচনার পর সৌভাগ্যের বিষয় আধুনিক মানব সভ্যতা আবার ধীরে ধীরে দৃষ্টি ফেরাচ্ছে সকল রহস্যের গূঢ়তম রহস্যের দিকে—মানব সত্তার অন্তরস্থ আত্মার দিকে। আমার প্রকৃত স্বরূপ কি? আমি দেখি, আমি বুঝি, এমনকি জগৎকেও বুঝি, কিন্তু যার এই শক্তি, সেই 'আমি'টির স্বরূপ কি? এটি একটি লক্ষণীয় বিষয়, তাই বহু প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক এই নতুন অনুসন্ধান ক্ষেত্রটির তাৎপর্য লক্ষ্য করে নানা রকমের আভাস ও প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছেন। মানব সত্তা—*সে নর হোক বা নারী হোক তাকে নিয়েই গভীরভাবে পর্যালোচনা করা যাক।* বর্তমানে সবরকম জাগতিক দুঃখ কষ্ট, মানব মনের যাবতীয় বিকারের কারণ হলো—এ বিষয়ের পর্যালোচনাকে অবহেলা করা। আমি কেন ক্ষুদ্র? আমি কেন অপরাধ করি? এ প্রশ্নের উত্তর হলো—আমি আমার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ। আমি মনে করি, 'আমি দেহ মাত্র'। আমি কেবল ইন্দ্রিয়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ ব্যক্তিমাত্র, প্রজনন তন্ত্রে আবদ্ধ ক্ষুদ্র অহংবোধ। আমার প্রকৃত মাত্রা সম্বন্ধে অববোধ—আমার নেই।

তাই, এই শ্লোকগুলিতে বেদান্তের মূল ভাবটিকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে আমরা বাহ্যজগৎ পর্যালোচনা করি; তারপর জগৎ পর্যালোচনাকারী *মানব সত্তাকে* নিয়ে ঃ মানব সত্তা হলো *দ্রষ্টা*; আধুনিক বিজ্ঞানের এক তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ এই; যিনি জগতের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছেন সেই দ্রষ্টার স্বরূপ ও মর্যাদা কি? এবার অবশ্যই আমাদের অনুসন্ধানী আলোটিকে ফেরাতে হবে পারমাণবিক মাত্রা নির্ভর জড় বিজ্ঞানের দ্রষ্টার দিকে, যে জড় বিজ্ঞানে পর্যবেক্ষণই পারমাণবিক ব্যাপারে পরিবর্তন সূচিত করে। এমনকি মনোবিজ্ঞানের নামই পাল্টে যাচ্ছে। একজন মনোবিজ্ঞানী মনোবিজ্ঞানকে 'অস্তিত্বের মনোবিজ্ঞান' আখ্যা দিয়েছেন। আমরা জানি ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান, জানি ফ্রয়েডীয় গভীর অন্তস্তলের মনোবিজ্ঞান, মনঃসমীক্ষণ; এ সবই সেখানে রয়েছে। কিন্তু মার্কিন মনোবিজ্ঞানী আব্রাহাম ম্যাসলো তাঁর পুস্তকে একেই 'অস্তিত্বের মনোবিজ্ঞান' বলেছেন। মানবীয় অস্তিত্বের বা সত্তার এই আত্মাটি কি? যা থেকে সমগ্র জ্ঞানের উৎপত্তি। একে যেন আমরা উপেক্ষা না করি। অতিমাত্রায় ঘনীভূত জীবন নিয়ে বেঁচে থাকতে হলে, নতুন করে এই অনন্ত আত্মার সংস্পর্শ আমাদের অবশ্যই চাই। পাশ্চাত্য

মনোবিজ্ঞানে যে একটি নতুন মাত্রা আসছে এটিই তার নিদর্শন। তাই এই শ্লোকগুলি আমাদের সকলের কাছে এক সুগভীর বার্তা বহন করে। আমরা এই মুহূর্তেই এর পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করতে না পারি, কিন্তু এই সত্যের সামান্য ব্যঞ্জনাও হৃদয়ঙ্গম করতে পারা আমাদের পক্ষে সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আরো বেশি সফলতা, আরো বেশি শান্তি পাব—ঐ পর্যালোচনা থেকে। এই হলো এই শ্লোকগুলির গুরুত্ব। তাই পরবর্তী শ্লোকে কৃষ্ণ বলছেন ঃ

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥ ২১ ॥

—'হে অর্জুন, একে (আত্মাকে) মৃত্যুহীন, চিরস্থায়ী, জন্মহীন ও ক্ষয়হীন বলে জেনো, এইরকম লোক (যিনি এই সত্যকে জেনেছেন) কিরূপে কারও মৃত্যুর কারণ হতে পারেন বা কাউকে হত্যা করতে পারেন?'

জানা চাই যে এই আত্মা, সকলের অন্তঃস্থ প্রত্যগাত্মা, যিনি অবিনাশী, পরিবর্তনহীন, জন্মহীন ও বিকারহীন। আত্মার জগৎ ছাড়া এই অভিব্যক্ত বিশ্বে এমন কিছু নেই যা পূর্বোক্ত বর্ণনার সঙ্গে মেলে। বহির্জগতে সব কিছুই বিনাশশীল, পরিবর্তনশীল ইত্যাদি। আত্ম-সত্যের *প্রত্যক* মাত্রা—এই একটি জায়গায় পূর্বোক্ত পরিবর্তনহীনতা, অবিনাশিত্ব প্রভৃতি গুণাবলীর মূল্য লক্ষ্য করা যায়। বেদান্ত সত্যের দুটি মাত্রা স্বীকার করে ঃ একটি হলো *পরাক্* মাত্রা অন্যটি হলো *প্রত্যক্* মাত্রা। মনে রেখো যে এগুলি সবই বেদান্তের ঋষিগণ কর্তৃক উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা, তাই এগুলি সঠিক ও সর্বজনস্বীকৃত তাৎপর্যপূর্ণ। *পরাক্*, যা বাহ্য, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—ইংরেজি ভাষায় এর অর্থ 'বিষয়'। তাকেই বিষয় বলে যাকে স্পর্শ করা যায়, অনুভব করা যায় এবং দেখা যায়। তাই *পরাক্*, যা বহির্জগতে রয়েছে, যার দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করা যায়। তারপর আসছে আশ্চর্যজনক এক নতুন মাত্রা, তোমার আঙ্গুলটিকে নিজের দিকে ফেরালেই তার অবস্থানের নির্দেশ পাওয়া যাবে। একেই বলা হয় *প্রত্যক্*, ভিতর দিকে। বহির্জগতে প্রকৃতির *পরাক্* মাত্রার পর্যালোচনার পর, আমরা আমাদের অন্তরস্থ কিছু রহস্যের কথা অনুমান করি। রহস্যটি কি? তখনই তুমি নিজের দিকে আঙ্গুল ফিরিয়ে থাকো। তাই একটির নাম *পরাক্*-তত্ত্ব, অপরটির নাম *প্রত্যক্-তত্ত্ব*—*বাহ্য* সত্য ও *আন্তর* সত্য। সত্যের কাছে এ সব পৃথকীকরণের অস্তিত্ব নেই। আমাদের জন্য এই পৃথকীকরণ। এই শরীরকে মানদণ্ড খাড়া করে আমরা বলি এগুলি *বাইরের*, আর ওগুলি *ভেতরের*। ঠিক তেমনি, *প্রত্যক্* ও

পরাক্ প্রকৃতি নামক একই সত্যের দুটি মাত্রা। পাশ্চাত্য ভৌত-বিজ্ঞান প্রকৃতির *পরাক্* দিকটাই জেনেছে, বেদান্ত তার সমন্বয়ী দৃষ্টিতে প্রকৃতির *পরাক্* ও *প্রত্যক্* দুটি মাত্রাই স্বীকার করে; সামগ্রিক দৃষ্টিতে তাই হলো প্রকৃতির আসল রূপ। বেদান্ত বলে ঃ প্রকৃতির দুটি মাত্রা আছে ঃ *অপরা প্রকৃতি* আর *পরা প্রকৃতি*। অপরা মানে সাধারণ বা *পরাক্-মাত্রা, পরা* মানে উচ্চতর বা *প্রত্যক্* মাত্রা। তাই বেদান্ত স্বীকার করে, একই প্রকৃতির দুটি মাত্রা আছে, *পরাক্* ও *প্রত্যক্*, কিন্তু প্রকৃতি দুটি নয়। একই প্রকৃতির দুটি মাত্রা দেখা যায়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে আমরা *পরাক্* মাত্রাটি পর্যালোচনা করি—তারই মধ্যে রাজনীতি, অর্থনীতি ও অন্যান্য বিষয়ের অনুশীলনও অন্তর্ভুক্ত—যাদের কাজ *পরাক্* মাত্রা নিয়ে। কিন্তু ঐ সব কাজে যদি তুমি প্রকৃত সুখ ও কল্যাণ কামনা কর, তবে তাতে একটু *প্রত্যক্* মাত্রার স্পর্শ তোমাকে অবশ্যই পেতে হবে। তুমি যতই আধ্যাত্মিকতার দিকে এগুবে ততই তুমি তোমার পরিবেশকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে পারবে আর ততই তুমি তোমার আশেপাশে প্রেম ও শান্তি বিতরণে সমর্থ হবে। কী মহান এ দুটি কথা ঃ *পরাক্* ও *প্রত্যক্* প্রকৃতি। এখানে শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির *এই প্রত্যক্* মাত্রা সম্বন্ধে বলছেন। এ সত্য ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে উদ্ঘাটিত হয় না, কারণ তা ইন্দ্রিয়স্তরের ঊর্ধ্বে। ইন্দ্রিয়-নিয়ন্ত্রিত মনও এ সত্যের বিকাশ ঘটাতে পারে না। তবে আমরা এ সত্য কিভাবে উপলব্ধি করব? ঐ বিষয় নিয়েই সমগ্র *গীতায়* শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

বাড়িতে, অফিসে বা কারখানায় কাজ করার সময় এবং সব রকম আন্তঃমানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, এই গূঢ় সত্যটি আমরা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে পারি। এই ভাবেই আমাদের জীবনচর্যা চালিয়ে যেতে হবে। পূর্ণ জীবন দর্শনে প্রকৃতির *পরাক্* ও *প্রত্যক্*—দুটি মাত্রাই থাকবে। আমরা বহির্জগৎ নিয়ে কাজ করে যাব। কিন্তু সেই কাজ করতে করতে আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপও উপলব্ধি করব। শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব মৌলিক অবদানের মাধ্যমে প্রাপ্ত এই দিগ্দর্শন পাওয়া যাবে এই অধ্যায়ের ৩৮তম শ্লোকের পরে। এখানে কেবল *জ্ঞান* মার্গের প্রাথমিক ভাবগুলি, আত্মোপলব্ধির পথটিই বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ চেয়েছিলেন অর্জুনের কাজ যেন এই জ্ঞানের ভিত্তিতেই হয়, কিন্তু এই জ্ঞানকে ভিত্তি করেই আবার আমাদের 'কাজ না করার' প্রবণতা গড়ে *ওঠে*। এই সত্যটি আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। আমরা এখানে ওখানে কেন ছুটবো? এই রকমই একটা ধারণা মনের মধ্যে গড়ে *ওঠে*। তাই এই শিক্ষার ভিত্তিতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধের সম্মুখীন হতে অনুপ্রাণিত করতে পারেন নি। এই শিক্ষা তোমাকে

সন্ন্যাসীর মতো ভাবতে শেখায়, তাই *নেতি নেতি* বা 'এটা নয়' 'এটা নয়' 'এ জগৎ মায়াময়, একে নিয়ে আমার কিছু করণীয় নেই, আমাকে আত্মার অমৃত ও শাশ্বত আনন্দমাত্রাটি উপলব্ধি করতে হবে' এই ভাবের ওপর ভিত্তি করে যে জ্ঞান-মার্গ তা জনমানসকে প্রভাবিত করেছিল। শ্রীকৃষ্ণ কিছু পরে তা বুঝেছিলেন। এই দর্শন-চিন্তার মাধ্যমে অর্জুনের এ বোধ জন্মায়নি যে তাকে কাজে নামতে হবে, জীবনযুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে। তিনি ভেবেছিলেন এর চেয়ে নিভৃত কোণে গিয়ে আপন স্বরূপকে খুঁজে বের করা অনেক ভাল কাজ। এই দর্শন-চিন্তাটি শ্রীকৃষ্ণ এখানেই প্রথমে উপস্থাপন করলেন, তারপর রূপদান করলেন তাঁর নিজস্ব দর্শন-চিন্তাটির যাতে কর্মরত নর-নারী ভিত্তিক অধিকতর সুসংহত আধ্যাত্মিকতার কথা বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে আধ্যাত্মিকতার দুটি মাত্রা রয়েছে : কর্ম-ভিত্তিক আধ্যাত্মিকতা ও ধ্যান-ভিত্তিক আধ্যাত্মিকতা : এ দুটিকে একত্রিত করা হয়েছে এক সুসংহত আধ্যাত্মিকতায়। সেই তত্ত্ব আরম্ভ হবে এই অধ্যায়ের মধ্যভাগ থেকে। কিন্তু তার পূর্বে তিনি এই *জ্ঞান*-মার্গটির ব্যাখ্যা করছেন—পরে একে *সাংখ্যপথ* বলে উল্লেখ করেছেন।

গত হাজার বছর ধরে আমরা লক্ষ্য করে আসছি যে, ভারতে এই *জ্ঞান-মার্গ* আমাদের সাধারণ মানুষের কাছে সঠিকভাবে, বোধগম্য হয়নি, কেবল এর 'নেতি' বাচক দিকটির ওপরই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। তার ফলে আমাদের জনগণ হয়ে পড়েছে—আত্মকেন্দ্রিক, নিরীহ, বাহ্যজগতের ঘটনাবলীর ব্যাপারে আগ্রহহীন—এদের মধ্যে কিছুটা উৎসাহহীনতা জেঁকে বসেছে—কারণ এই নিগূঢ় দর্শনকে আয়ত্ত করার মতো আধ্যাত্মিক শক্তি আমাদের ছিল না। এবং প্রায়শই সাধারণ মানুষ শুষ্ক মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। আমরা কখনই দ্বিতীয় অধ্যায়ের *যোগের* বা *বুদ্ধিযোগের* পরবর্তী অংশ বুঝতে পারিনি। কিন্তু কর্মজীবনে বেদান্ত সম্বন্ধে *গীতার* বাণীগুলির সম্যক্ বোধ এখন আমাদের আসছে। *গীতার* সামগ্রিক আধ্যাত্মিকতার রূপটি তুলে ধরাই হলো স্বামী বিবেকানন্দের মহান অবদান। কাউকেই বলতে হবে না : আমি সংসারী। তুমি কর্মরত হও অথবা নানাভাবে সংসারে কাজে জড়িত হও, তবু তুমি সংসারী কখনই নও, তুমি সংসারে আছ কিন্তু সংসারী নও; তোমার স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি সম্বন্ধে তোমার কিছু ধারণা আছে, দিনের পর দিন তুমি সেই ধারণাকে শক্তিশালী করে তুলছ। অতএব, আধ্যাত্মিকতাই এর সামগ্রিক রূপ। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'যদি কোন নর বা নারী আধ্যাত্মিক না হয়, আমি তাকে হিন্দু বলি না।' সব কিছুকেই ব্যাপ্ত করে আছে আমাদের আধ্যাত্মিকতা।

আধ্যাত্মিক হবার জন্য আমাদের উত্তর কাশী বা হৃষীকেশ যেতে হবে না; মোটেই না। তুমি তোমার গৃহ এবং কর্মস্থলেই আধ্যাত্মিক হয়ে রয়েছ। এটা তোমার উত্তরাধিকার। বিবেকানন্দ বলেন, 'আত্মা মাত্রই অব্যক্ত ব্রহ্ম'। কেবল এ বিষয়ে প্রত্যেককে জ্ঞাত হতে হবে ও তদনুযায়ী জীবন যাপন করতে হবে, অবশ্য সে যতটা পারে। এই কথাই শ্রীকৃষ্ণ জনে জনে বলেছেন—এই অধ্যায়ের মাঝামাঝি ২/৪০ সংখ্যক শ্লোকে : *স্বল্পম্ অপি অস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ*, 'এই ধর্মের অল্পমাত্র পালনেই মানব মহৎ ভয় থেকে রক্ষা পেতে পারে।' শ্রীকৃষ্ণ বলে চলেছেন :

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥

—'মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরে, তেমনি জীবাত্মাও জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করে।'

পরিধানের বস্ত্র যখনই পুরাতন হয়, 'লোকে সেই পুরাতন বস্ত্র বিনা বাক্যব্যয়েই ফেলে দেয়', *জীর্ণানি যথা বিহায়, নবানি গৃহ্ণাতি নরঃ অপরাণি*, 'অন্য নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে'। সাধারণত নিজের পরিধেয় বস্ত্র নিয়ে লোকে এই রকমই করে থাকে। *তথা* 'সেইরকম', ঠিক তেমনি ভাবেই *দেহী* 'দেহধারী ব্যক্তি', *শরীরাণি বিহায় জীর্ণানি* 'জীর্ণ, অর্থাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হলে,' জীবনের কাজে অনুপযুক্ত হলে 'শরীরটিকে ত্যাগ করে'—'শান্তভাবে ফেলে দেয়'; এবং *অন্যানি সংযাতি*, 'নতুন দেহ গ্রহণ করে' কর্ম ফল ভোগ করার জন্য, অর্থাৎ অন্য শরীরে প্রবেশ করে।

এই হলো মৃত্যু ও পুনর্জন্ম সম্বন্ধে বেদান্তের চমৎকারী ভাবনা। আমি আমার দেহ ত্যাগ করি। এখনো আমাদের বোধ হয়, আমিই দেহ ছিলাম, এখন এই দেহের নাশ হয়েছে। এখানে এই মনোভাব রয়েছে। তাই, দেহভিত্তিক জ্ঞানই আমরা বুঝি। কিন্তু যারা উচ্চ আধ্যাত্মিক বোধসম্পন্ন, তাঁরা বোঝেন যে এই দেহ এক খণ্ড পুরাতন বস্ত্রের মতো, যা ফেলে দিয়ে আমরা নতুন বস্ত্র পরে থাকি। ৪ জুলাই ১৯০২ খ্রিঃ রাত্রি ৯টার একটু পরেই বিবেকানন্দ যখন কলকাতার কাছে বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করেন, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, শশী মহারাজ, সেই রাত্রেই মাদ্রাজে একটি স্বপ্ন দেখেন। তিনি শুনতে পান বিবেকানন্দ

যেন তাঁকে বলছেন ঃ 'শশী, শশী, আমি থুথু ফেলার মতো আমার দেহটাকে ত্যাগ করেছি।' পরদিন কলকাতা থেকে বিবেকানন্দের দেহত্যাগের সংবাদ বহন করে টেলিগ্রাম এল। তাঁর মতো নর-নারী বলতে পারেন, 'আমি থুথু ফেলার মতো দেহটাকে ত্যাগ করেছি।' অনেকেরই আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নেই। তারা মনে করে দেহই তাদের সত্তা। এটিকে হারালে তারা দুঃখে অভিভূত হয়। তাই বোঝা যায় যে, তারাই যে চিরন্তন আত্মা সে সম্বন্ধে তাদের বোধ আসেনি। কিন্তু এ বিষয়ে সামান্য কিছু অবগতি তাদের আছে। এই সামান্য ধারণা হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন সমাজে ছড়িয়ে আছে। আমরা মৃত্যু সম্বন্ধে কি বলি? 'আমরা দেহত্যাগ করেছি।' ভারতে এমনকি অতি সাধারণ লোকের ভাষা হলো— 'শরীর ছোড় দিয়া' বা 'দেহ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশে অন্যরকম বলে। সেখানে শেখান হয়, দেহই সব। তাই, তারা যখন মরে, ইংরেজি ভাষায় বলা হয়, সে তার আত্মাকে হারিয়েছে। তাই তারা দেহটিকে রক্ষা করে। ভারতে আমরা দেহটিকে রক্ষা করি না পুড়িয়ে ফেলি। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি। অন্য সব দেশে দেহটাকে রক্ষা করে, এমনকি সব রকম ভালভাল জিনিস তার কাছে রেখে দেওয়া হয়। প্রাচীন মিশরীয় ধর্মে, আমরা দেখি মৃতব্যক্তিদের, বিশেষত ফারাওগণের প্রয়োজনানুরূপ জিনিস-পত্র কবরে রাখা হতো। কিন্তু আমরা দেহটিকে পুড়িয়ে ফেলি। *ভস্মান্তম্ শরীরম্*, যেমন *ঈশোপনিষদের* ঋষি বলেছিলেন, 'এই শরীর' যা এতদিন আমার জীবনের উদ্দেশ্য পূরণের একটি উত্তম রাসায়নিক গবেষণাগারের কাজ করেছে, তা এখন জীর্ণ, অব্যবহার্য হয়ে পড়েছে, 'তা ভস্মীভূত হোক'; এর উপাদানগুলি নিজ নিজ রাসায়নিক মৌলিক অবস্থায় ফিরে যাক—এই হলো *ঈশোপনিষদের* ভাষা। পঞ্চদশ অধ্যায়ের *দশম শ্লোকে* শ্রীকৃষ্ণ পরে বলবেন।

উৎক্রামন্তম্ স্থিতম্ বাপি ভুঞ্জানম্ বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥

'দু-রকম লোক আছে, এক *বিমূঢ়াঃ*, 'মূর্খ, অদূরদর্শী, ইন্দ্রিয়-সর্বস্ব লোক', আর অন্যটি—*জ্ঞানচক্ষুষঃ*, 'জ্ঞান-চক্ষু বিশিষ্ট' যাদের জ্ঞানের চক্ষু রয়েছে, তারা অন্যভাবে দেখে। সে কিরকম? যখন তুমি দেহ-স্থিত হয়ে জীবিত অবস্থায় শরীরগত নানা রকম আনন্দ উপভোগ করছ, অথবা যখন শেষ অবস্থায় দেহ ত্যাগ করছ—উভয় ক্ষেত্রেই বিষয়ী (কর্তা) রূপে এমন কিছু থাকে, যা এখানকার সব বিষয়গুলির অভিজ্ঞতা লাভ করছে; এই সত্য কেবল *জ্ঞানচক্ষুষঃ*, সূক্ষ্ম

দৃষ্টিসম্পন্ন লোকই জানতে পারে। *উৎক্রামন্তম্* মানে 'দেহত্যাগ করে গমনোন্মুখ', *স্থিতম্ বাপি* 'যখন দেহে থেকে ইনি কাজ করছেন'; *ভুঞ্জানম্ বা গুণান্বিতম্*, 'যখন সত্ত্ব, রজস্, তমস্-এর মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করছেন।' সদা এই ভাবে স্থিত আত্মাকে '*বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি*, 'মূর্খ ব্যক্তিরা কখনই বোঝে না', *পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ*, 'যাদের জ্ঞানচক্ষু, জ্ঞানের চক্ষু আছে, তারাই এ সত্য দেখতে বা উপলব্ধি করতে পারে। এই মূল শিক্ষা কেবল আমাদের এই আশ্চর্য দেশেই রয়েছে। এখান থেকেই জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই শিক্ষা নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এবং অন্যান্য ধর্মের প্রায় সকল মরমী সাধকেরাই প্রাচীন যুগে এই ভাব পছন্দ করতেন। এবং বর্তমানে এই ভাব সমগ্র পাশ্চাত্যদেশে বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ছে, তার একমাত্র কারণ হলো এর বিকল্প হিসাবে সেই অবৈজ্ঞানিক শয়তান-কল্পনাকে মানতে হয়। এই শয়তানের কল্পনা থেকে জগতের সমস্ত অমঙ্গল এসে থাকে। আর আধুনিক মানসিকতা সম্পন্ন মানব ঐ শয়তানের কল্পনাকে পছন্দ করে না। শয়তানকে নির্বাসন দিলে অন্য কিছু বিকল্পের প্রয়োজন। এই বিকল্পই হলো ঃ কর্ম (বাদ) ও পুনর্জন্ম (বাদ), এই দুটি একত্রে পশ্চিমী ধর্ম-চিন্তায় অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক শয়তান-কল্পনার প্রকৃত বিকল্প। শয়তান-কল্পনা সরে গিয়ে আরো বেশি যুক্তিসঙ্গত বলে কর্মবাদের ভাবটি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে, যদিও তা হাতেনাতে প্রতিপন্ন করা সম্ভব নয়। ভারতের ঋষিদের কাছে, এটি সব থেকে বেশি সন্তোষজনক ও যথাযথ কল্পনা। এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে ঃ নারকেল দু-রকমের— কাঁচা অবস্থায় ডাব আর পাকা অবস্থায় ঝুনো। ডাব অবস্থায় শাঁস খোলের সঙ্গে লেগে থাকে, চাঁচতে গেলে খোলের কিছু অংশও চলে আসে। এই হলো আমাদের সাধারণ মানসিক অবস্থা। আমরা শরীরের প্রতি আসক্ত। শরীরের কিছু হলে তা জীবাত্মাকেও প্রভাবিত করে—এর বিপরীতটাও ঘটে থাকে। কিন্তু ঝুনো নারকেলের কথা ধর; ওটিকে নাড়লে ভেতর থেকে শুষ্ক নারকেল-শাঁসের খড়-খড় শব্দ হবে—শাঁস খোল থেকে ছেড়ে যাওয়ার ফলে এটি হয়। এই হলো আমাদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দৃষ্টান্ত।

পশ্চিমে, সমগ্র ইতিহাসে একটি ব্যক্তিকেই পাওয়া যায়, যিনি এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন—তিনি হলেন সক্রেটিস্। *প্লেটোর কথোপকথনে,* মৃত্যুর সম্মুখীন সক্রেটিসের বর্ণনা আছে। মনে সাহস না থাকলে, আমরা সচরাচর ধীরস্থির ভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে পারি না। আমরা ভয় পাই, বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ি, ইত্যাদি। কিন্তু সক্রেটিসের মন ছিল শান্ত, শান্তিপূর্ণ ও নির্ভীক, কারণ

জ্ঞানের গভীরে তিনি জানতেন—তিনি শরীর নন মৃত্যুহীন আত্মা। প্লেটো সক্রেটিসের বিষপানের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—সেখানে তাঁর অল্পবয়সী শিষ্যবৃন্দ আবেগে অভিভূত হয়ে সক্রেটিসকে ঘিরে বসে ছিল এবং উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র সক্রেটিসই শান্ত ছিলেন। তখন সক্রেটিস তাদের ভর্ৎসনা করে বললেন ঃ 'আমি মহিলাদের চলে যেতে বলেছি, কারণ তারা খুব কাঁদছিল—ফলে মৃত্যুকালে আমি যে শান্তিটুকু চাইছিলাম তা বিঘ্নিত হচ্ছিল, কিন্তু তোমরা যুবকরাও কাঁদছ'। যারা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, তাদের সকলকে লক্ষ্য করেই তিনি এই কথা বললেন। তখন ক্রিটো নামে এক বয়স্ক ব্যক্তি সক্রেটিসকে প্রশ্ন করলেন ঃ 'সক্রেটিস, আমরা কিভাবে তোমাকে কবর দেব?' মানুষটি তখনো মরেন নি। বিষপান করছেন; কিছুক্ষণ পরেই বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হবে এবং তাঁর মৃত্যু হবে। ক্রিটো এখনই ঐ প্রশ্ন করছেন। সক্রেটিস স্মিত হাস্যে প্রশ্নটিকে গ্রহণ করে বললেন ঃ 'ক্রিটো, এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার আগে তোমাকে অবশ্যই আমাকে, আমার প্রকৃত স্বরূপকে ধরতে হবে।' ভাষাটি লক্ষণীয়। প্রত্যেকটি কথায় শুদ্ধ বেদান্তের ভাব। 'তোমাকে অবশ্যই আগে আমাকে, আমার *সত্যস্বরূপ* সত্তাকে ধরতে হবে, তবেই তুমি ঐ প্রশ্ন করতে পার', তিনি আরো বললেন ঃ 'ক্রিটো, প্রভূত আনন্দময় হও। তুমি এই শরীরের কথা বলছ, এটিকে নিয়ে অন্যের শরীর নিয়ে যা কর তাই করবে।' এখানে দেখা যায়, আত্মার অমৃতত্ব সম্বন্ধে এই বিশেষ জ্ঞানই মনে পরম শান্তি, মহনীয় স্থৈর্য, অসীম সাহস ও সমবেত জনগণকে শান্ত করার শক্তি এনে দেয়। অতএব এটি কেবল একটি তত্ত্ব নয়, এটি এক অভিজ্ঞতা, কিন্তু সমগ্র পাশ্চাত্য ইতিহাসে এরূপ ব্যক্তি কেবল এই একটিই পাওয়া যায়—এই কথাই পাশ্চাত্য সাহিত্য বলে। উপস্থিত জনগণ, সেই এথেন্সবাসিগণ ঐ ব্যক্তির মহত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে নি, কারণ তাদের দর্শনশাস্ত্রে মানবসত্তার এই উচ্চতর মাত্রা সম্বন্ধে কোন ধ্যান-ধারণাই ছিল না। যদিও ডেলফির দিব্যবাণীতে এই কথা গ্রীকদের বলা হয়েছিল, 'হে মানব, আত্মানং বিদ্ধি আপনাকে জান', তারা মানুষকে কেবল বাহ্যদৃষ্টি দিয়ে—তার খাওয়া, পান করা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ, তার সাম্রাজ্য বিস্তার ও যুদ্ধ প্রবৃত্তির দিক থেকেই জেনেছিল। এই সব দিক থেকে তারা খুবই প্রতিভাসম্পন্ন ছিল। সক্রেটিসই একমাত্র এই সত্য জেনেছিলেন, তাই গ্রীকেরা ব্যক্তিটিকে বুঝতে পারেনি। এবং তারা তাঁর বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ করল যে তিনিই যুবকদের ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছেন। একবার ভেবে দেখ তদানীন্তন এথেনীয়া রাষ্ট্র এমন এক মহাত্মাকে আদালতে—যুবকদের

বিপথগামী করার দোষে—অভিযুক্ত করে বিষপান করিয়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করল। কি নিদারুণ বিয়োগান্তক পরিস্থিতি! দেশের সুন্দরতম নাগরিক হলেন জনগণের বিচারের পাত্র, কারণ তাদের কাছে মানব-ব্যক্তিত্বের এই উচ্চতর আধ্যাত্মিক মাত্রাটি বোধগম্য হয়নি। তারা আর অন্য সব কিছুই বুঝেছিল।

গ্রীস বা অন্য ইউরোপীয় দেশে বা আমেরিকায় বলতাম ঃ মনে কর সক্রেটিস ভারতে থাকতেন, তবে কী প্রতিক্রিয়া হতো? ভারতের জনগণ তাঁকে বুঝতে পারত, এবং হত্যা করার পরিবর্তে মহান ঋষির মর্যাদা দিত। কিন্তু গ্রীক কৃষ্টিতে মানব ব্যক্তিত্বের এই আধ্যাত্মিক মাত্রাটি কখনই বোধগম্য হয়নি। তারা বোঝে না, এমন কিছু যিনিই প্রচার করবেন তিনি তাদের কাছে দণ্ডনীয় বা বধযোগ্য। প্রভু যিশুর ক্ষেত্রেও একইরকম ঘটনা ঘটেছিল। তিনি যা বলতেন, দেশের যাজক সম্প্রদায় তা বুঝতে পারে নি, তাই তাঁকে শয়তানের দূত বলে দোষী সাব্যস্ত করে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। মনে পড়ে বার্ট্রান্ড রাসেলের সেই প্রসিদ্ধ মন্তব্যটি ঃ 'তুমি যদি লোকেদের শেখার ক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত দ্রুততর বেগে তাদের শেখাতে যাও, তবে তুমি নিজেই বিপদে পড়বে।' সক্রেটিস এমন কিছু শেখাতেন যা জনগণ বুঝত না, কিন্তু প্লেটো ও সামান্য কিছু লোক তা বুঝেছিল। গণতান্ত্রিক এথেন্সের উন্মত্ত জনতা সক্রেটিসকে হত্যা করল। তাই প্লেটো গণতন্ত্রকে ঘৃণা করতেন।

বর্তমানে ভারতেও আমরা গণতান্ত্রিক আহ্বানের সামনাসামনি হচ্ছি। যদি আমরা উদার ও গভীর বৈদান্তিক ভাবধারার পথে চলি, তবেই দেশে আমরা এক প্রগতিশীল মানব সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হব। যদি বেদান্তের উদার ভাবধারার দ্বারা আমাদের চরিত্র প্রভাবিত না হয়, তবে আমাদের গণতন্ত্র হয়ে উঠবে একরকম উচ্ছৃঙ্খল গুণ্ডা-রাজতন্ত্র। এমনকি যখন উন্মত্ত জনতা সবরকম আইনকানুন ভেঙে বিমানবন্দরে তাদের প্রিয় নেতাকে স্বাগত জানাতে দলবদ্ধভাবে ঢুকে পড়ে বা যখন কোন রাজনীতিক দল সহিংস প্রথায় জোর করে জনগণের ওপর ধর্মঘট চাপিয়ে দেয়, তখনই বোঝা যায়, আমাদের দেশে রাজনীতির ক্ষেত্রে, এখনই এরূপ প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যখন আমাদের জনগণ বৈদান্তিক নিয়মানুবর্তিতার সামান্য কিছুও অনুশীলন করবে, আমার আশা যে তারা তা করবে, তখন আমরা ভারতে এক প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ে তুলতে সফলকাম হব। বিবেকানন্দের মতো আমাদের আধুনিক যুগের আচার্যগণ আমাদের সামন্ততন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে রূপায়ণের মতো সর্বাত্মক বিপ্লব গড়ে তুলতে এক নির্দেশ দিয়েছেন। প্রকৃত গণতন্ত্র আসবার আগে আমাদের

চরিত্রের বহু কালিমা মুছে ফেলতে হবে। তা সম্ভব হবে যখন আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি জনগণের কাছে পৌঁছুবে। কেবল শিক্ষা নয়। শিক্ষা আমাদের অমার্জিতও করে তুলতে পারে; আজকাল দেখি বহু শিক্ষিত যুবক ব্যবহারে অমার্জিত। কিন্তু সংস্কৃতির সহযোগে শিক্ষা হয়ে উঠবে এক সংশোধনী প্রক্রিয়া। পশ্চিমদেশে প্রদত্ত কয়েকটি ভাষণে আমি বলেছি—প্লেটোর কথোপকথনের এই অংশটি ঠিক যেন আমাদের উপনিষদের কোন একটি অধ্যায়। এ বিষয়ে এক ব্রিটিশ চিন্তাবিদ ই. জে. উরউইক, তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ, *The Message of Plato* তে বলেছেন যে, উপনিষদ্ না জানলে প্লেটো ও সক্রেটিসকে কখনই বোঝা যায় না, তাঁর গ্রন্থে নানা দৃষ্টান্তও দিয়েছেন।

তাই, মানবসত্তার অমৃতত্ব খ্যাপনকারী এই শ্লোকগুলি বর্তমান যুগে সারা বিশ্ববাসীর কাছে প্রচণ্ড আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। আমরা জীবনের বেঁচে থাকার দিকটাই জানি। জীবনের অন্য দিক—মৃত্যু—সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ। মৃত্যু ও জীবন হলো একই সত্যের দুটি রূপ। ভারতের, তথা মানবজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ *ঋগ্বেদের* এক প্রাচীন শিক্ষা হলো— *'যস্য ছায়া অমৃতম্ যস্য মৃত্যুঃ'*, 'সেই সত্যেরই ছায়া হলো অমৃতত্ব ও মৃত্যু।' অতএব সত্যকে জানতে হলে, জীবন ও মৃত্যু দু-টিই জানতে হবে, কেবল জীবন জানলেই হবে না। গ্রীকগণ কেবল জীবনকেই বুঝেছিল। লোয়েস ডিকিন্‌সন, আর এক ব্রিটিশ পণ্ডিত গ্রীক জীবন সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেছেন—'গ্রীকগণ জীবন বুঝতেন; কিন্তু তাঁরা মৃত্যুর সঙ্গে কখনো বোঝাপড়া করতে পারেন নি। মৃত্যুকালে তাঁদের বোধ হতো, তাঁদের যেন ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কোন শক্তি—যাকে তারা মোটেই পছন্দ করতো না।' তবে আমি আগেই বলেছি, সক্রেটিস ছিলেন একটি ব্যতিক্রম। তিনি জীবন-মৃত্যুর অর্থ বুঝতেন। বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতায়, আমাদের জীবনে একই পরিস্থিতি উদ্ভূত হচ্ছে; আমরা মৃত্যুর অর্থ বুঝি না—মৃত্যু যে শরীরের, আত্মার নয়, তা বুঝি না। মানুষ মৃত্যুহীন। দুটি ভাবকে যতই একত্রিত করা যায়, মৃত্যুভয় ততই কমে আসে। আর বিশেষরূপে আমাদের ভারতে এই শিক্ষার প্রসার আরো বেশি বেশি হওয়া প্রয়োজন। আমরা মৃত্যুভয়ে এতই ভীত। বস্তুত শৈশবে বাড়িতে আমি যদি কখনো মৃত্যুর কথা উত্থাপন করতাম, লোকে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলতো—'ও! না মৃত্যুর কথা একেবারেই তুলবে না। মৃত্যু আসার আগেই আমরা কেন মরতে যাব?' এ হলো ভীরুতার অর্থ। সেক্সপিয়র বলেছিলেন, 'ভীরু ব্যক্তিরা জীবনে বহুবারই মরে, কিন্তু বীর একবার মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ পায় (অভিজ্ঞতা লাভ করে)।' একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। যে

জাতি মৃত্যুকে ভয় করে, তারা কখনই বড় হতে পারে না। মৃত্যুর মুখোমুখি হলেই তুমি মহান হতে পার এই শিক্ষাই স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের দিয়েছিলেন বর্তমান যুগে। তাই, এই শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

আমাদের পরিধেয় বস্ত্র সম্বন্ধে আমরা এ রকম প্রত্যহ করে থাকি। আত্মা সেই রকমই করেন মৃত্যুকালে। এই বস্ত্র জীর্ণ হয়েছে, এই শরীরেও জরা এসেছে, আর একটি নতুনকে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু কখনো কখনো নতুন কাপড়ও ফেলে দিতে হয়। তেমনি কখনো কখনো অল্পবয়সেও মৃত্যু বরণ করতে হয়। কিন্তু সাধারণত জীর্ণ ও পুরানো হলেই কাপড় ফেলে দিয়ে নতুন একটি গ্রহণ করে থাকি। তেমনি, শরীর যখন আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়, তখনই তা মৃত্যু কবলিত হয়। অধিকাংশ লোকই বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত হয়েই মৃত্যুমুখে পড়ে; অল্পবয়সে মৃত্যুর হার অনেক কম।

এরপর কৃষ্ণ বলতে থাকেন ঃ

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥

—'কোন অস্ত্রই আত্মাকে ছেদন করতে পারে না, কোন আগুন তাকে দহন করতে পারে না, কোন জলীয় পদার্থই তাকে সিক্ত করতে পারে না, কোন বাতাসই তাকে শুষ্ক করতে পারে না।'

আত্মা যে কোন অস্ত্রের দ্বারা খণ্ডিত হন না—এটা তাঁর প্রকৃতি। দৃষ্টান্তস্বরূপ তুমি মনকে খণ্ডিত করতে পার না, আহত করতে পার না, এ রকম কিছুই করতে পার না। যদিও জীবাত্মা রূপে, অহং-অভিমানিরূপে, আমি নিজেকে আহত ও খণ্ডিত বলে ভাবতে পারি। কিন্তু মনের কোন রকম ক্ষত হয় না। আমরা শরীরের এই সব সীমাবদ্ধ অবস্থার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলি, আর বলি আমরা ক্ষত হয়েছি। কিন্তু কেউই মনকে কাটতে পারে না। মন তো সূক্ষ্ম; জড় বস্তু নয়। আত্মা তার থেকেও সূক্ষ্মতর। কাজেই কোনরূপ অগ্নিই তাকে দগ্ধ করতে পারে না, কোন জলীয় পদার্থই তাকে সিক্ত করতে পারে না ইত্যাদি।

এরপর আরো ইতিবাচকভাবে তিনি বললেন ঃ

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪ ॥

—এই আত্মাকে ছেদন করা যায় না, শুষ্ক করা যায় না, সিক্ত করা যায় না, শুকান যায় না। (কারণ) পরিবর্তনহীন, সর্বব্যাপ্ত, স্থিতিশীল, গতিহীন এই আত্মা—চিরন্তন।

এগুলি একই ভাবনার পুনরাবৃত্তি।

আমরা যে এই দেহ-মন-সংঘাত নই—এই সত্য উপলব্ধির জন্য আমাদের বার বার বোঝান হয়েছে। এই দেহ-মন-সংঘাতের মধ্যে কিছু গূঢ় তত্ত্ব আছে। এ যেন একটি রত্ন পেটিকা। পেটিকাটি অত্যন্ত সুদর্শন, কিন্তু অন্তরের রত্নটি আরো বেশি মূল্যবান; একথা ভুলো না। এই ভাবনার পুনরাবৃত্তি হয়ে চলেছে, এমনকি আমাদের মরমী সাহিত্যেও। ঈশ্বরের পবিত্র নামই হলো রত্ন; মীরাবাঈ-এর প্রসিদ্ধ দোঁহায় যেমন আছে, *রাম-রতন মই নে পায়ো*। —'আমি রাম নামরূপ রত্নটি পেয়েছি'। এটি মৃত্যুহীন, এর প্রভাবে সব ভয় চলে যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই, মহান মরমী সাধকগণ ও আধ্যাত্মিক গুরুগণ এই তত্ত্ব আমাদের শিক্ষা দেন। এই তত্ত্বই গীতার এই শ্লোকগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে ঃ

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে ।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥

—'বলা হয়, আত্মা অপ্রকট, ভাবনাতীত, বিকারাতীত; আত্মাকে এই ভাবে জেনে তোমার শোক করা উচিত নয়।'

আত্মাকে অব্যক্ত বা অপ্রকট বলা হয়েছে। আত্মার স্পর্শ আমরা কোথাও অনুভব করতে পারি না। *অব্যক্ত*—মানে অপ্রকট। তেমনি, *অচিন্ত্য*—মানে চিন্তায় আনা যায় না। চিন্তার সাহায্যে একে ধরা যায় না। তুমি একে ধারণার মধ্যে আনতে পার না। জগতের সবকিছুকে আমরা চিন্তা অথবা বাক্যের সাহায্যে ধরে রাখতে চেষ্টা করি। কোন বিষয়কে ঘিরে যখন তুমি কোন কথা বল ও চিন্তা কর, তুমি বলে থাক যে তুমি তা বুঝেছ। জাগতিক সকল বিষয় সম্বন্ধে এরূপ করা চলে। কিন্তু আত্মার ব্যাপারে বাক্য ও চিন্তা তাঁকে স্পর্শ করতে না পেরে ফিরে ফিরে আসে। আত্মা তাই অচিন্ত্য। বস্তুত *বৃহদারণ্যক উপনিষদে* (১.৪.৭) আত্মোপলব্ধির সম্বন্ধে বলেছেন ঃ *আত্মা ইতি এব উপাসীত*। আর এ বিষয়ে শাঙ্কর ভাষ্য হলো ঃ

যঃ তু আত্মশব্দস্য ইতি পরঃ প্রয়োগঃ আত্মশব্দপ্রত্যয়োঃ আত্মতত্ত্বস্য পরমার্থতো অবিষয়ত্ব জ্ঞাপনার্থম্। অন্যথা আত্মানম্ উপাসীত ইতি এবম্ অবক্ষ্যৎ।

—'মূল গ্রন্থে *আত্মা* শব্দটির সঙ্গে *ইতি* (এইরূপে) বাক্যাংশটির প্রয়োগ কেবল—আত্ম-সত্য যে প্রকৃতপক্ষে আত্ম-শব্দ ও আত্ম-প্রতীতির বিষয়ীভূত নয়, তা জানাবার জন্য। তা না হলে *শ্রুতি* কেবল *আত্মানমুপাসীত*, অর্থাৎ "আত্মার উপাসনা করবে" শুধু এই কথা বলে ক্ষান্ত হতেন। আমাদের কোন রূপ শব্দ ব্যবহার করতে হবে; তাই আমরা আত্মা শব্দ ব্যবহার করি। কিন্তু এই তত্ত্ব থেকে সরে যেও না যে, আত্মা কোন একটি বস্তু নয়। এ হলো সকল বস্তুর পশ্চাতে অবস্থিত শাশ্বত চৈতন্য। এই কথার ওপরেই বার বার জোর দেওয়া হয়েছে। তাই, *অব্যক্তোঽয়ম্ অচিন্ত্যোঽয়ম্*। এই মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টির প্রগাঢ় গভীরতা খ্যাপন করা হয়েছে *অষ্টাবক্র-গীতার* একটি সুন্দর শ্লোকে ঃ

অচিন্ত্যম্ চিন্ত্যমানোঽপি চিন্তারূপম্ ভজত্যসৌ।

—'তুমি যখন চিন্তাতীত বস্তুর চিন্তা কর, তুমি এক টুকরো চিন্তার আশ্রয় নাও মাত্র'। চিন্তাতীতের চিন্তা করবার সময় তুমি সেই চিন্তাতীতকে মোটেই ধারণা করতে পার না। তুমি কেবল একটি চিন্তা সূত্রের উদ্ভাবন কর এই পর্যন্ত। এটি একটি বিষয়। চিন্তা একটি বিষয়। এই হলো অচিন্তনীয় আত্মা, শাশ্বত আত্মা।

এই সব গূঢ় সত্য সম্বন্ধে, এইরকম সূক্ষ্মজ্ঞান, কেবল যে ভারতীয় সাহিত্যেই পাওয়া যায় তা নয়, চৈনিক তাও দর্শনে, জেন বৌদ্ধ দর্শনে ও খ্রিস্টীয় ও মুসলিম মরমী সাধকদের কিছু কিছু রচনার মধ্যে; কিন্তু তাদের অনুমোদিত ধর্মে, আনুষ্ঠানিক ধর্মে নয়। ওখানেই রয়েছে এই ধারণাতীত সত্য। ওটি হলো আত্মা, শাশ্বত সত্তা, বিষয়ী, দ্রষ্টা—বিষয় নয়। তেমনি *অবিকার্যোঽয়ম্*, পরিবর্তনহীন। সমগ্র জগৎ পরিবর্তনশীল, কিন্তু ইনি পরিবর্তনহীন। এই বাহ্যজগৎ পরিবর্তনশীলতার সূত্রবদ্ধজাল মাত্র। আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না, চিরকাল একরূপ। এই সত্যটিকেই জগৎ খুঁজে বেড়াচ্ছে। সেই শাশ্বত, পরিবর্তনহীন সত্যটি কি? পূর্বে এর স্থলে ঈশ্বর শব্দটি ব্যবহার করা হতো। কিন্তু ঈশ্বর শব্দটি নানা যুক্তিতর্কের জালে জড়িয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত কিছুলোক বলল—আমরা ঈশ্বরকে চাই না। বস্তুত উনবিংশ শতাব্দীর জার্মান দার্শনিক নিৎসে বললেন—ঈশ্বর মৃত। ভাল কথা, এইরকম ঈশ্বরের কোন মর্যাদাসম্পন্ন স্থান নেই। কিন্তু বেদান্তের ঈশ্বর একেবারে অন্যরকম। এই হলো শাশ্বত

আত্মা—প্রতিটি ঘটনার দ্রষ্টা। ইনি প্রতিটি 'ইতি' ও 'নেতি' বাচক ঘটনার দ্রষ্টা। অতএব, এই ধারণার দৃঢ় ভিত্তি আছে ভূয়োদর্শনে, নিজ আত্মার গভীরে।

রমণ মহর্ষি যখন ১৬/১৭ বছরের বালক তখন তাঁর এইরকম অনুভূতি হয়েছিল, এইটিই তাঁর প্রথম ও শেষ আধ্যাত্মিক অনুভূতি; এই সময়ে তিনি অনুভব করেছিলেন যে 'আমার মৃত্যু যেন আসন্ন', তিনি ভয় পেয়ে গেলেন, বাড়ি ফিরে, ঘরের মেঝেতে শুয়ে থেকে আপন মনে বলতে লাগলেন 'আমি মরছি, আমি মরছি'—মৃত্যু সম্বন্ধে তার সমগ্র অনুভূতির অভিনয় করতে করতে। 'হাঁ আমি এই মুহূর্তে মরছি', আমি মরে গেছি। তারপর তিনি উচ্ছ্বসিত আনন্দের মধ্যে দেখলেন যে তিনি তখনও বেঁচে আছেন, ও মৃত্যুকে পর্যবেক্ষণ করছেন। 'আমি' মৃত্যুহীন, যিনি আমার মৃত্যুর সাক্ষী তিনি সেখানে সর্বদা বর্তমান—তিনিই আমার প্রকৃত আত্মা—এই হলো, তাঁরই কথায়, তাঁর প্রথম ও শেষ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা। অবশ্য, এত সহজে তাঁর এই অনুভূতি হবার কারণ হলো এই যে, সৎ-*বাসনা* ও সৎ-সংস্কারসম্পন্ন হওয়ায় অল্প বয়সেই তিনি উচ্চ আধ্যাত্মিক উন্নতির অধিকারী হয়েছিলেন। আমরা এত সহজে ঐ অনুভূতি না পেতে পারি। কিন্তু, এমনকি ঐ সত্যের সামান্য আভাসমাত্রও যদি তুমি পাও—যদি বোঝ যে, 'হাঁ, এতে কিছু সত্য আছে', তবে তাই নিয়ে সাধন পথে এগিয়ে চল। গোড়ায় ঐটুকুই যথেষ্ট। তাই *তস্মাদেবম্ বিদিত্বৈনম্*—'তাঁকে এই ভাবে জেনে', ন অনুশোচিতুম্ অর্হসি—'তোমার শোক করা উচিত নয়'।

তারপর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যুক্তির ধারা পাল্টে বললেন ঃ

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥

—'যদি তুমি মনে কর যে আত্মার জন্ম মৃত্যু সর্বক্ষণ চলেছে, তাহলেও, হে মহাবাহু, সেটি তোমার শোকের বিষয় হওয়া উচিত নয়।'

পরবর্তী শ্লোকে বিষয়টিকে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে ঃ

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥

—'যে জন্মেছে তার মৃত্যু নিশ্চিত; মৃত ব্যক্তির জন্মও নিশ্চিত; অতএব এই অপরিহার্য বিষয় নিয়ে শোক করা তোমার উচিত নয়।'

'যে জন্মেছে তাকে মরতে হবে'—*জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ।* এক ইংরেজ কবি বলেছেন, 'আমাদের হৃদয়স্পন্দন হলো কবরের দিকে শবযাত্রার তাল-স্বরূপ।' এইভাবে সত্যকে আর একরকম ভাবে বলা হলো, যদি তোমার জীবন থেকে থাকে—তবে তোমার মৃত্যুও আসবে। 'অতএব' *তস্মাৎ অপরিহার্যেঽর্থে*—'এই অপরিহার্য পরিস্থিতিতে' *ন ত্বম্ শোচিতুম্ অর্হসি*—'তোমার দুঃখ শোকে মুহ্যমান হওয়া উচিত নয়।'

একটি অত্যন্ত গূঢ় ভাব প্রকাশ পেয়েছে পরবর্তী শ্লোকে ঃ

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥

—'জীবের উৎপত্তি স্থান অজানা, মধ্যে কিছুদিন তাকে দেখা যায়, আবার তা অজানা স্তরে ফিরে যায়। এতে উদ্বিগ্ন হবার কি আছে?'

আদিতে সকল জীবই *অব্যক্ত*—'অপ্রকট'; মধ্যে *ব্যক্ত*—'প্রকট' এবং শেষে আবার *অব্যক্ত*—'অপ্রকট'। এ এক প্রসিদ্ধ উক্তি।

মহাভারতের শান্তিপর্বের সনৎসুজাতীয় পর্বাধ্যায়ে একই সত্য সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে ঃ *অদর্শনাৎ আপতিতঃ পুনশ্চ অদর্শনম্ গতাঃ*—'আমরা অজানা জায়গা থেকে আসি আবার অজানা জায়গায় ফিরে যাই। এ তো আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা। সত্যকে জানতে হবে। অতীত আছে, ভবিষ্যৎ আছে, মাঝখানে আছে বর্তমান। বর্তমান অবস্থাকে আমাদের যথাসম্ভব সৎ কাজে ব্যয় করতে হবে। বিষয়টি কঠিন, কিন্তু এটি প্রগাঢ় সত্যও বটে। এটা সামান্যমাত্র উপলব্ধি করতে হলেও অতীব সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তির প্রয়োজন সেই কথাই বলা হয়েছে পরবর্তী শ্লোকে ঃ

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥

—'কেউ (এই সত্যের) আশ্চর্য রূপটি দেখে; অন্য কেউ এর আশ্চর্য ভাবটির বর্ণনা করে, কেউ শুনে থাকে এর আশ্চর্যভাব সম্বন্ধে; অন্য কেউ কেউ এর সম্বন্ধে শুনেও এর বিষয়ে কিছুই বুঝতে পারে না।'

কেউ এই সত্যের আশ্চর্য রূপটি দেখে, তেমনিই কেউ কেউ এর আশ্চর্য ভাব সম্বন্ধে বলে, কেউ শোনে। কিন্তু অতি অল্প লোকেই একে বুঝতে পারে। এই আত্মা এক বিরাট রহস্য। ইনি সর্বথা বর্তমান কিন্তু কোন সময়েই ধরা দেন না। এটি একটি গুহ্য সত্য। বস্তুত রবার্ট ব্রাউনিং নামে উনবিংশ শতাব্দীর এক ইংরেজ কবি, বেদান্তের ভাবে খুবই প্রভাবিত হয়ে *Paracelsus* (প্যারাসেলসাস) শীর্ষক কবিতাটি লিখেছিলেন। ঐ কবিতায় তিনি আত্মাকে *Imprisoned splendour* বা কারারুদ্ধ দীপ্তি বলেছেন। আমাদের প্রত্যেকের ভেতরেই এক প্রগাঢ় দীপ্তি বর্তমান, কিন্তু তা দেহ-মনসংঘাতের মধ্যে অবরুদ্ধ। ওই কারারুদ্ধ দীপ্তিকে অর্গলমুক্ত করতে হবে। একেই বলে অধ্যাত্ম জীবন। *কঠোপনিষদে* যেমন বলা হয়েছে—*এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়ো আত্মা ন প্রকাশতে* (১.৩.১২)—'এই আত্মা সব জীবেই বর্তমান, কিন্তু গূঢ়-গুপ্ত', খুবই রহস্যময়, ন প্রকাশতে—প্রকটিত হন না। এইটিই হলো সত্য, একেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি। এই দীপ্তিকে তাঁর রুদ্ধ অবস্থা থেকে আমরা মুক্ত করতে পারি। অধ্যাত্ম-জীবনে আমরা তাই করি। সব রকম ঘৃণা, হিংসা ভাব, শোষণ স্পৃহা চলে যাবে—যখন আত্মার আলোক তোমার দৈনন্দিন জীবনপথকে ও মানব-সম্পর্ককে আলোকিত করবে। তাই এই 'কারারুদ্ধ দীপ্তি'র ভাবটি সত্যই খুব সুন্দর।

আত্মা বরাবরই এক রহস্য হয়ে রয়েছেন। কিন্তু এ রহস্য ভেদ করা যায়। সঠিক সাধনপদ্ধতি সহায়ে আত্মাকে উপলব্ধি করা যায়। তাই হলো অধ্যাত্ম জীবন ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বৈদান্তিক কলাকৌশল। এই ভাব প্রকাশ পেয়েছে *কঠোপনিষদের* (১.২.৭) মন্ত্রেও—*আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা, আশ্চর্যোজ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ*—'আত্মার উপদেষ্টাকে আশ্চর্য পুরুষ হতে হবে; শিষ্যকেও আশ্চর্য হতে হবে, যখন এই দুই-এর মিলন হয় অর্থাৎ, 'দক্ষ গুরুর কাছে শিক্ষা পেয়ে যে শিষ্য আত্মতত্ত্বকে উপলব্ধি করে সে শিষ্যও দক্ষ।' অতএব তুমি এই মহান রহস্যের সামনে আশ্চর্যান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে, এঁর উপাসনায় মগ্ন হও। এঁকে নিয়ে আমরা আর কী করতে পারি? আমরা কেবল নীরবে এঁর বিষয়ে ধ্যান করতে পারি, উপাসনা করতে পারি। এঁকে আমরা মনের বা চিন্তার বিষয় করে ধরে রাখতে পারি না। এই হলো এই পরম সত্যের স্বরূপ, যিনি আমাদের আত্মা রূপে আমাদের এত কাছে থেকেও আমাদের থেকে এত দূরে, আমাদের বোধ-শক্তির থেকে এত দূরে যে তাঁকে আমরা বুঝতে পারি না। উপনিষদে এই ভাবের বহু পুনরুক্তি দেখা যায়। ইনি তোমার অতি নিকটে,

আবার অতি দূরে। যে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন তার কাছে ইনি দূরে, আর যে জেনেছে তার কাছে ইনি নিকটে। মানব মুক্তির সমগ্র কেন্দ্রবিন্দুটিই রয়েছে এই বিশেষ রহস্যে ঢাকা। এই তত্ত্বের উপলব্ধিতেই তোমার প্রকৃত মুক্তি। অন্যান্য বিষয় থেকে মুক্তিরও প্রয়োজন আছে, কিন্তু এই মুক্তির মধ্যেই নিহিত আছে অন্য সব মুক্তি। তোমার সবরকম সম্পদ ও শক্তি থাকতে পারে, কিন্তু তুমি হয়তো সম্পূর্ণ বদ্ধ। কিন্তু তোমার প্রকৃত স্বরূপের এই জ্ঞান হলে, তোমার বহু ভোগ্য সামগ্রী না থেকেও তুমি সত্যসত্যই মুক্ত—মুক্তি কথাটির সঠিক অর্থে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, ২৯ সংখ্যক শ্লোকটি কিভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে—এই বিরাট রহস্যকে, এই অন্তরীণ দীপ্তিকে আর তোমাকে আমাকে ও প্রত্যেককে আহ্বান জানিয়েছে—জন্মগত অজ্ঞান পিঞ্জর থেকে একে মুক্ত করতে। ইনি বেরিয়ে আসুন, ইনি প্রকট হোন। তাই, বিবেকানন্দ এক বিজ্ঞানসম্মত বাক্যবিন্যস্ত ধর্মের সংজ্ঞা দিয়েছেন—'ধর্ম হলো পূর্ব হতেই মানবের অন্তরে যে দেবত্ব নিহিত রয়েছে তাকে প্রকাশ করা'। ইনি গুপ্ত আছেন, প্রকাশিত হোন। মানবজীবনে, মানবের পারস্পরিক সম্পর্কে, কি পরিবর্তনটাই না আসবে, যখন এই দেবত্বের সামান্যামাত্রও আমাদের জীবনে সম্প্রকাশিত হবে। এই শিক্ষাই *গীতায়* ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই তো সবে আরম্ভ। আঠারটি অধ্যায়ের সব কটির মাধ্যমে আমরা এই মহান ভাবপ্রসঙ্গে ডুবে থাকবো। সারা বিশ্ব এখন গীতার কথা শুনতে আগ্রহী। আগে ভারতের কিছু লোক মাত্র, অধিকাংশও নয়, এর বাণীর দ্বারা উপকৃত হতো। আজকাল সারা বিশ্বের মানুষ একখণ্ড গীতা পাবার জন্য ক্রমেই বেশি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি, বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়া থেকে এক অনুসন্ধিৎসু আমাকে লিখেছে, 'আমরা কিছুই জানি না, আমাদের দুই-একখানি মাত্র বই আছে। আরো অন্যান্য কিছু বই অনুগ্রহ করে পাঠিয়ে দেবেন। আমরা এই সব ভাব গ্রহণে খুবই ব্যগ্র।' বর্তমানে জাগতিক পরিস্থিতি এমনই।

এমনকি ভৌত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তুমি যখন একটি ক্ষুদ্র জীবন্ত কোষ পর্যবেক্ষণ করছ সেটি বিজ্ঞানীর কাছে, এক বিস্ময়ের বস্তু। জীবকোষের গঠনে বিস্ময়, তার মধ্যে জৈবিক ক্রিয়াকলাপে বিস্ময় সৃষ্টি করছে, গুটিয়ে নিচ্ছে, আকারের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, সংখ্যাবৃদ্ধি করছে—সবই আশ্চর্য ব্যাপার। পদার্থ বিজ্ঞানেও ক্ষুদ্র জড় কণার মধ্যে বিশাল শক্তির অবস্থান লক্ষ্য করে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়; এই হলো পরমাণু বিজ্ঞান। এই ব্যাপারকেও আমরা

আশ্চর্যবৎ পশ্যাতি—বলতে পারি। প্রকৃতির গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে বাহ্য প্রকৃতির আশ্চর্যকারিতা কম বলে মনে হবে, আর সেই তুলনায় অন্তঃপ্রকৃতির অনেক বেশি আশ্চর্যজনক ক্রিয়াকলাপ প্রকাশিত হচ্ছে। সেইরকমই, মানবের অন্তঃপ্রকৃতির পর্যবেক্ষণ, যা পশ্চিমী দেশে সবে আরম্ভ হয়েছে। স্যার জুলিয়ান হাক্সলি যেমন বলেছেন ঃ 'মনঃসমীক্ষা সবে আরম্ভ হয়েছে।' সেক্সপীয়রের এক সুবিদিত রচনায় আছে, 'মানুষ কি এক আশ্চর্য সৃষ্টি।' এই মানব জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, জগৎ-বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারে, তার পারেও যেতে পারে;—তার অন্তরে নিহিত সেই বস্তুটি কী, যা এই সব বিস্ময়ের স্বরূপ? বৃটিশ কবি রবার্ট ব্রাউনিং 'কারারুদ্ধ দীপ্তি' শব্দটি সৃষ্টি করেছিলেন—তা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আধুনিক বিজ্ঞানের মনস্তত্ত্ব ও স্নায়ুতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা যখন মানবের গভীর থেকে গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করবে তখন এই বিস্ময় আরো বেশি বেশি উদ্ঘাটিত হবে। মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণা এক বিরাট আশ্চর্য ব্যাপার। মস্তিষ্ক কিভাবে কাজ করে, কিরূপে বিভিন্ন কোষের সমবেত প্রচেষ্টার ফলে সুসম্বদ্ধ জীবন ও জাগতিক প্রতিক্রিয়া উদ্ভূত হয়, এ সবই আশ্চর্যের বিষয়। কিন্তু সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় হলো উপনিষদ্ যা নিয়ে আলোচনা করে, সেই অনন্ত আত্মা। এই দেহ-মন সংঘাত, যা এত ক্ষুদ্র, যা বাহ্যজগতের তুলনায় এক অতি সঙ্কুচিত এক গঠন-তন্ত্র, তবু তার মধ্যে রয়েছে কি এক বিরাট একটা কিছু এবং এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপারের মীমাংসা করা বর্তমান চিন্তাধারার কাছে সব থেকে বড় রকমের আহ্বান। ভারতীয় চিন্তাধারা সাফল্যজনক ভাবেই এই আহ্বানের সম্মুখীন হয়েছিল। সেই কথাই এই শ্লোকগুলিতে ব্যক্ত হয়েছে ঃ *আশ্চর্যবৎ পশ্যাতি কশ্চিদ্ এনম্।*

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, নিজ *শিব*-প্রকৃতির অসীমতা উপলব্ধি করে *শিব* নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে—*শিব*-নৃত্য আরম্ভ করেন। সচরাচর শক্তি উপচে পড়লে তবেই লোকে নৃত্য করে থাকে। যখন তুমি দুর্বল, শক্তি কম—তখন তুমি কিছুতেই নাচবে না। অন্তরে শক্তির আধিক্য হলেই, তা তোমাকে নৃত্যে উদ্বুদ্ধ করে। এই ভাবেই *শিব*-নৃত্যের উদ্ভব। নিজ অন্তরস্থ *শিব*-প্রকৃতি লক্ষ্য করেই *শিব* অবাক হয়ে যান। তিনি নিজে *শিব*, অনন্ত স্বরূপ। তাই, মানবাত্মার সম্বন্ধে গূঢ়তম আবিষ্ক্রিয়ার ফলেই উদ্ভূত হয়েছে এই সব সুন্দর ভাবগুলি।

বিবেকানন্দ বলেছেন[১], "যে আত্মা জীবাত্মারূপে আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁর

---

১ বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৩০৫

মহিমা, কোন গ্রন্থ, কোন শাস্ত্র, কোন বিজ্ঞান কল্পনাও করতে পারে না।'' এ এক লক্ষণীয় সত্য। সাধারণভাবে, আমরা সীমিত তেজসম্পন্ন জীববিশিষ্ট একটি ব্যক্তিসত্তা মাত্র। কিন্তু আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত ধারণা, প্রত্যেক মানব সত্তার অন্তরে কিছু নিগূঢ় বস্তু রয়েছে। এই ধারণাই এক আশ্চর্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, যখন নর বা নারী সত্যকে বুঝতে চেষ্টা করে। পরে তাই হয়ে ওঠে উপলব্ধব্য বিষয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দার্শনিক ও মরমী সাধক প্যাসক্যাল বলেছিলেন ঃ

'অন্তরীক্ষে বিশ্ব আমাকে ঘিরে থাকে, আর আমি একটি বিন্দুতে পরিণত হই। কিন্তু, মননের সাহায্যে *আমি সেই বিশ্বকে বুঝি*।'

তবে আমার যথার্থ মাত্রাটি কী? আমি কি একটি ধূলিকণা মাত্র? না, ঐ ধূলিকণার অন্তরে রয়েছে মহতী দীপ্তি। তাই হলো আত্মা, যিনি হলেন বিস্ময় উদ্রেককারী। যদি ইন্দ্রিয় মাধ্যমে প্রাপ্ত জাগতিক অভিজ্ঞতা বিস্ময় সৃষ্টি করে, তবে অন্তরে 'অবরুদ্ধ' আত্মা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হবে লক্ষ লক্ষ গুণ বেশি বিস্ময়কর। সেই প্রগাঢ় সত্যটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ভারতীয় মনকে মুগ্ধ করে রেখেছে। এই উপনিষদ্ অনুসারী আবিষ্কারের দ্বারা, আমাদের জনগণ অনুপ্রাণিত হয়ে ভেবেছিল, 'আমাকে ঐ সত্য উপলব্ধি করতেই হবে।' তাই এত লোক বনে, গুহায় চলে যেত ধ্যানমগ্ন হবার জন্য—এই গূঢ় সত্যটিকে উপলব্ধি করতে। ভৌতবিজ্ঞানের কোন রকম প্রয়োগ কৌশল এ কাজে আমাদের সাহায্য করতে পারে না। তাই ভারতের এখানে ওখানে সর্বত্র গিরিগুহা দেখতে পাওয়া যায়। আর ভারতীয় ইতিহাসে এক বুদ্ধের আবির্ভাব দেখা যায়, যিনি যথার্থই সেই 'অবরুদ্ধ দীপ্তি'র অন্তরে প্রবেশ করে এই শাশ্বত সত্যকে জেনেছিলেন। সেই উপলব্ধিতে সাত দিন রাত আনন্দে বিভোর হয়ে তিনি যে বৃক্ষতলে বসে এই বোধিলাভ করেছিলেন, সেখানে পায়চারি করেছিলেন। ঐ বৃক্ষটি পরবর্তী কালে *বোধি বৃক্ষ,* আলোক প্রাপ্তির বৃক্ষ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এই ২৯ সংখ্যক শ্লোকটি সেই বিস্ময়কে প্রকাশ করছে। মানব সত্তা ধূলিকণা নয়, একটি জীব নয়, কিন্তু মুক্ত। সে নর বা নারী, যেই হোক তার মধ্যে কিছু আশ্চর্য বস্তু আছে; এই সত্যটিকে শিশুদের মনে অবশ্যই গেঁথে দিতে হবে। প্রত্যেকটি শিশুর ক্ষেত্রে এইটিই হবে বৈদান্তিক শিক্ষার প্রথম উপদেশ, যার সত্যতা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে, বুদ্ধি পক্ক হলে শিশু বুঝতে পারবে। বৈদান্তিক উপদেশাবলীর মূলে রয়েছে এই একটি সত্য।

তাই ৩০ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥৩০॥

—'যিনি সকল দেহের অন্তরে রয়েছেন তিনি কোনরূপ হননের শিকার হওয়া থেকে চিরমুক্ত; অতএব (হে অর্জুন) তোমাকে সকল জীবের জন্য দুঃখ করতে হবে না।'

এই *দেহী* (জীবাত্মা) অর্থে—যিনি *দেহে* বাস করেন; *নিত্যম্ অবধ্যোঽয়ম্*, 'যাঁকে কেউ কখনও বধ করতে পারে না।' এই হলো এই অনন্ত সত্যের প্রকৃতি। *দেহে সর্বস্য ভারত*, 'সকলের দেহে বর্তমান', এই দেহী বা জীবাত্মা হলেন অবধ্য, হে অর্জুন। তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুম্ অর্হসি, অতএব এ জগতের কোন কিছুর জন্য, কোন জীবের জন্য তোমাকে শোক করতে হবে না। মানবের গঠনতন্ত্রের প্রকৃত মাত্রাটিকে তুমি কোন দিনই স্পর্শ করতে পারবে না। কেউ আমার জামা খুলে নিলে, আমার কোন ক্ষতি হয় না। আমি অন্য একটি জামা পরে নিতে পারি। এই ভাবে আমরা সকল জড় বস্তু সম্বন্ধে বলে থাকি। কিন্তু যারা বিষয়ীকে (কর্তাকে) জেনেছে, তাদের কাছে শরীরের যাই হোক, জীবাত্মা অস্পৃষ্টই থাকেন। জীবাত্মা যদি অপরিবর্তিত থাকেন তবে উদ্বেগের কোন কারণ থাকতে পারে না। মানুষ যত বেশি শক্তিশালী হবে, এই সত্যকে জীবনে ও কাজে প্রকাশ করার সামর্থ্যও তার তত বেশি হবে; সে তত বেশি সাহস, বেশি সহনশীলতার অধিকারীও হবে। হিটলারের নাৎসী কারাগারে বন্দি সেই ইহুদী বৈজ্ঞানিকের মতো; ইহুদীদের সকলের ওপর প্রচণ্ড চাপ এবং তারা নানারকম পীড়ন, নির্যাতন ক্লেশের শিকার হতো; এই রকম নির্যাতনে অনেকে মৃত্যু বরণ করতো কিন্তু একজন বেঁচে ছিলেন। তিনি হলেন ভিক্টর ফ্রাঙ্কিল (Victor Frankil)—এখন নিউইয়র্কে থাকেন। তিনি Man's Search for Meaning (মানবের তাৎপর্য অন্বেষণ) নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি কত চাপের, কত পীড়নের শিকার হয়েছিলেন। তিনি ভেঙ্গে পড়তেন, কিন্তু তিনি নিজ সত্তাকে আত্মরূপে শরীর থেকে পৃথক করে রেখে অনাসক্ত মনে ভাবতেন তিনি যেন সমস্ত ঘটনাবলীর সাক্ষী। তিনি ঐ সব চাপ সহ্য করতে পেরেছিলেন। যুদ্ধের পরেও তাঁর মন অবিচলিত ছিল, তাই তিনি ঐ সব অভিজ্ঞতার কথা গ্রন্থাকারে লিখতে পেরেছিলেন। তিনি এই পদ্ধতির নাম দিয়েছিলেন, 'মনোভাব-নিয়ন্ত্রণ'। তোমার প্রতি অন্যের আচরণকে তুমি নিয়ন্ত্রণ করতে পার না, কিন্তু তুমি ঐ

সব আচরণ সম্বন্ধে তোমার মনোভাবকে নিয়ন্ত্রণ করতে পার। সেইটি তোমার হাতে। Man's Search for Meaning গ্রন্থে ভিক্টর ফ্রাঙ্কিল একটি অতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন। কেউ আমাকে নিন্দা করল, বেশ, সে আমাকে নিন্দা করে চলে গেল। আমি তা অন্তরে গ্রহণ করলাম, পুষ্ট করলাম, ফলে ওটি আমার কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে উঠল; এমনকি আমি আত্মহত্যা করতে গেলাম, কারণ আমি দুর্বল। যদি আমি শক্তিশালী হই, আমি নিজেকে বোঝাব ঃ 'আচ্ছা, সে তো কেবল কয়েকটা কথা বলেছে। বস্তুত, সে কি বলেছিল? ছাব্বিশটি অক্ষরের সব কটিকে এক সঙ্গে নিয়ে একটা বিশেষ নিয়মে সাজান কোন শব্দ।' সেই ভাবে নিজ মনকে বুঝিয়ে সমস্ত ব্যাপারটিকে মন থেকে মুছে ফেলতে পার। এতে বেশ শক্তি চাই। অতএব, মনোভাবের নিয়ন্ত্রণ আমাদের কাছে এক অতি মহান শিক্ষা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরাই আমাদের শত্রু। আমরাই আমাদের মনোবেদনা সৃষ্টি করি। অন্যে একটু কষ্ট দেয় মাত্র। আমরা নিজেরাই সেটিকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলি। এ ক্ষেত্রে মনোভাব নিয়ন্ত্রণ পরিস্থিতিকে সামলে দিতে পারে। এটা যে সত্য, তা প্রমাণিত হয়েছে। ইটালিতে প্রতিষ্ঠিত মার্কিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হাসপাতাল প্রসঙ্গে ভিক্টর ফ্রাঙ্কিল একথার উল্লেখ করেছেন। হাসপাতালের একটি বিভাগ ভর্তি ছিল বেশি রকম আঘাতপ্রাপ্ত লোকে, কারো হাত গেছে, কারো পা গেছে, এই রকম সব লোক, তারা ভীষণ যন্ত্রণায় কাতর। অন্য একটি বিভাগে ছিল যুদ্ধে অল্প আঘাতপ্রাপ্ত সৈন্যেরা। তাদেরও চিকিৎসা চলছে। অনুসন্ধানে জানা গেল, যাদের আঘাত গুরুতর তারা বেশি শান্ত, বেশি সহযোগিতাপ্রবণ; ঐ অনুসন্ধানে আরও দেখা গেল যে, অল্প আঘাত-প্রাপ্ত লোকগুলি অভিযোগ, চাপ সৃষ্টি, এই সব নিয়েই আছে, তাদের কোন মানসিক শান্তি নেই; এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। কী হবে এর ব্যাখ্যা? গুরুতর আঘাত-প্রাপ্ত লোকগুলিরই, অল্প আঘাত প্রাপ্ত লোকেদের থেকে অনেক বেশি কষ্টে থাকার কথা। পরে অনুসন্ধানকারী দলের সিদ্ধান্ত হয়—মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গির শক্তিই এরূপ ঘটিয়েছে। অল্প আঘাতপ্রাপ্ত লোকগুলি জানে যে চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠলেই তাদের আবার যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান হবে। কিন্তু গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত লোকগুলি বুঝেছিল তাদের পক্ষে যুদ্ধ শেষ—তারা তাদের স্ত্রী পুত্র কন্যার কাছে ফিরে যাবে। তাই তারা পূর্ণ শান্তি উপভোগ করছে। পা নেই, তাতে কি আসে যায়—তারা তো আপনজনের সঙ্গে থাকতে পারবে।

এখানে আমরা দু-রকম পরিস্থিতি লক্ষ্য করে থাকতে পারি এবং দু-রকম

পরিস্থিতিতে দু-রকম প্রতিক্রিয়া। এ থেকে মনোভাব নিয়ন্ত্রণের ধারণা প্রমাণিত হয় এবং ঐ গ্রন্থখানিই এই সত্যটি তুলে ধরেছে—তার ফলে *গীতোক্ত* মহান সত্যগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নাৎসী কারাগারে যন্ত্রণাভোগ করার ফলে গ্রন্থকার মনোভাব নিয়ন্ত্রণ আয়ত্ত করেছিলেন, তাই অন্যদের এ বিষয়ে চেতনা জাগিয়ে তোলার জন্য গ্রন্থ রচনা করতে পেরেছিলেন।

এইভাবে সত্য নির্ণিত হয়েছে। গ্রন্থটি আমাদের অতি সংবেদনশীল ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির অস্তিত্ব সমর্থন করে; এটি পড়ার পর যে কোন লোকই আমাদের সত্য প্রকৃতির আশ্চর্য ব্যাপারসমূহকে আরো ভালভাবে বুঝবে। *গীতায়* এই কথাই বলা হয়েছে। *গীতায়* বিশেষভাবে এই বিষয়টির ওপর জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, মানবের জীবন, কর্ম ও পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই আশ্চর্য ব্যাপারটি উপলব্ধি করা যায়। এর জন্য একটি পৃথক জীবনের প্রয়োজন নেই। বিবেকানন্দ যেমন বলেছেন, 'জীবনই ধর্ম' কারণ আধ্যাত্মিকতাই আমার প্রকৃত স্বরূপ। আধ্যাত্মিকতা আমাকে অন্যের কাছ থেকে ধার করে নিতে হবে না। তাই দেখা যায়, *গীতার* এই অধ্যায় ও পরবর্তী সমগ্র অংশ বরাবর শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষার পেছনে মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্বের ধারণাই ব্যক্ত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই প্রথম অংশে, এই সব যুক্তি দিয়ে তিনি অর্জুনকে বলছেন, 'তুমি পার্থিব ব্যাপারে যুদ্ধে নামতে, কেন ভয় পাচ্ছ, তুমি তো সন্ন্যাসী নও, ইহজগতে তোমার কত কি করণীয় রয়েছে।' এত সব যুক্তি দেখানো হচ্ছে, যাতে অর্জুন সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এতেও যখন অর্জুনকে টলানো যায় নি, তখন আরো অনেক জাগতিক যুক্তি দেখিয়েছিলেন, তা পরে আসবে। হাঁ, তিনি জাগতিক যুক্তিও ব্যবহার করেছিলেন; পরবর্তী শ্লোকগুলিতে সেগুলি আলোচিত হবে।

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥৩১॥

—'তোমার স্ব-ধর্মের দিক থেকে, যুদ্ধে সংশয় থাকা শোভা পায় না। কারণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ন্যায্য কারণে যুদ্ধ (ধর্মযুদ্ধ) অপেক্ষা মঙ্গলকর কর্ম আর কিছু নেই।'

তোমার স্ব-ধর্মের দিক থেকেও এই যুদ্ধের আহ্বানে তোমার বিমুখ হওয়া উচিত নয়, কারণ, যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের গৌরব। যুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত কি না সে নিয়ে

খুবই সংশয় থাকতে পারে। দুই-তিন সপ্তাহ পূর্বে আমি এক জায়গায় বলেছি যে জার্মানির নাৎসী আন্দোলনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ একটি ন্যায়-সঙ্গত যুদ্ধ; নাৎসী আন্দোলনের জয় হলে সমগ্র জগৎ একেবারে বিকৃত হয়ে যেতো। তাই সমগ্র জগৎ এক জোট হয়ে যুদ্ধ করেছিল সেই অনিষ্টকর জাতির প্রাধান্য এবং সামরিক স্বৈরতন্ত্রমূলক মতবাদের বিরুদ্ধে—যাতে ১০ লক্ষাধিক লোক নিহত হয়েছিল। কখনো কখনো ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধের পরিস্থিতি আসে। কিন্তু সব যুদ্ধই ন্যায়-সঙ্গত নয়; অন্য লোকেদের পদানত করতে, তাদের ওপর আগ্রাসী হয়ে পড়ে যে যুদ্ধ তা কখনই ধর্মযুদ্ধ হতে পারে না। স্বাধীনতা রক্ষার্থে যে সব যুদ্ধ সেগুলি সবই ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ। পক্ষান্তরে, তুমি যদি তা না কর, তোমাকে খেসারৎ দিতে হবে। তোমাদের পরবর্তী বংশধরগণকেও তার মূল্য দিতে হবে। তাই বলা হয়েছে, *স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য* ঃ তোমার *স্বধর্ম* হলো *ক্ষত্রিয়* ধর্ম—জনগণের স্বাধীনতা রক্ষা করা। এই হলো *ক্ষত্রিয়ের* স্বভাব। আজকে প্রাচীন ভারতীয় ধ্যান-ধারণাকে পাচ্ছি আমরা এক নবতর পরিস্থিতিতে। সেই প্রাচীন যুগের ক্ষত্রিয় হলো আজকের দিনে রাজনীতিক, সৈনিক ও শাসক। তার কাজ কি? তার কাজ হলো জনগণের নিরাপত্তাবিধান, পরিপোষণ ও সেবা। কাউকে এগুলি করতেই হবে। রাজনীতিক ও প্রশাসনিক পরিকাঠামোর ওপর একাজের দায়িত্ব। পুলিসের কাজ হলো রাতে যখন তুমি ঘুমিয়ে থাক, তখন তোমাকে চোর ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করা। যদিও প্রায়শই তারা একাজে সফল হয় না এবং রাত্রে চুরি-ডাকাতি হয়। এতে আমাদের সমাজে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় দক্ষতা ও নিয়মানুবর্তিতার অভাবই প্রকাশ পায়। এইভাবে রাজনীতিক, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ও সকল প্রতিরক্ষাসেবী, এমনকি পুলিসের মতো অসামরিক প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত কর্মীকে *ক্ষত্রিয়* পর্যায়ে ফেলা যায়। তাদের কাজ হলো স্বীয় ক্ষমতা ও শক্তির সহায়ে অন্যের সেবা করা। তাদের হাতে ক্ষমতা। কিন্তু সেই ক্ষমতা জনগণের সেবার জন্য। এই হলো ঐ ক্ষমতার স্বরূপ। তাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির যখন রাজ্যত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, ভীষ্ম তাঁকে বলেন—একটি মজার কথা ঃ *দণ্ড এব হি রাজেন্দ্র ক্ষত্র-ধর্মো ন মুণ্ডনম্ (মহাভারত, শান্তিপর্ব)*—'হে রাজশ্রেষ্ঠ! *ক্ষত্রিয়ের* ধর্ম হলো *দণ্ড*—অর্থাৎ জনসেবায় স্বীয় ক্ষমতার ব্যবহার, *মুণ্ডন*—অর্থাৎ মাথা মুড়িয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ নয়'। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাই বলছেন ঃ *ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে,* 'মহৎকারণ স্বরূপ যে যুদ্ধ অনুপ্রেরণা যোগায়, *ক্ষত্রিয়* তেমন যুদ্ধে আনন্দ পায়', যেমন মানব মুক্তির যুদ্ধ। কিন্তু সব যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ বলা যায় না।

প্রকৃত পক্ষে ইতিহাস কতকগুলি যুদ্ধের নিন্দা করবে, সে যুদ্ধগুলিকে প্রথমে ধর্মযুদ্ধ বলে ভাবা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী পর্যালোচনায় সেগুলিকে ধর্মযুদ্ধের স্তরে ফেলা যায় নি। জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ অবশ্যই ধর্মযুদ্ধ, যেমন হয়ে থাকে সব রকম আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ; আক্রমণাত্মক যুদ্ধ কোন কোনটা ধর্মযুদ্ধ হলেও আবার কোন কোনটা তা নয়। খুব কমই ধর্মযুদ্ধ, অধিকাংশই নয়। ঠিক যেমন, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (U.N) অনুরোধে, ইরাক-ইরানের শান্তি রক্ষার্থে, ভারতের কিছু সেনা ও সামরিক কর্মকর্তাদের পাঠিয়ে ভারত যা করেছিল। একই রকম কাজে আমাদের সেনাকে কঙ্গো ও কোরিয়ায় পাঠান হয়েছিল। এসবের উদ্দেশ্য হলো শান্তিরক্ষা। এগুলি খুবই উত্তম দৃষ্টান্ত, যেখানে আমরা গেছি আক্রমণ করতে নয় বা সম্পত্তি লাভের জন্য নয়, বরং পূর্বে অনুষ্ঠিত শান্তিচুক্তি পালিত না হওয়ায় তাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে। শ্রীকৃষ্ণের—*ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে*—'ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তার বুদ্ধি, সামর্থ্য, মানবপ্রেমের প্রয়োগের জন্য মানবিক মূল্যবোধ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তি মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশে যুদ্ধক্ষেত্রে অংশ গ্রহণের চেয়ে উৎকৃষ্টতর সুযোগ আর কিছু হতে পারে না'—এই উক্তিতে পূর্বোক্ত সব যুক্তিই নিহিত আছে।

এ বিষয়ে পরবর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২ ॥

—'অযাচিত ভাবে—(বীরের) স্বর্গদ্বার উন্মোচনকারী—এইরকম যুদ্ধের সুযোগ পেলে ক্ষত্রিয়গণ সুখী হয়।'

এই যুদ্ধের সুযোগ, *যদৃচ্ছয়া চ উপপন্নং*, 'অযাচিত ভাবে এসেছে', তুমি চাও নি, 'আপনিই এসেছে', *যদৃচ্ছয়া*, 'দৈবক্রমে'; *স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্*, 'স্বর্গের দ্বার খোলা হয়েছে'। *সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধম্ ঈদৃশম্*, 'যুদ্ধ কৌশল প্রয়োগের এমন সুযোগ পেয়ে ক্ষত্রিয়গণ সুখী হয়'। যুদ্ধের অন্যদিক সে পছন্দ করে না। তাই অসামরিক উপদ্রব দমনে, আপনজনকে মারতে ব্যবহৃত হলে সৈন্যদলের অনেকেই অসন্তুষ্ট হয়। তারা মোটেই সুখী হয় না। বিরল অবস্থা ছাড়া কোন জাতিরই এরূপ করা উচিত নয়। এই যুদ্ধ, *যদৃচ্ছয়া উপপন্নম্*, 'দৈবক্রমে এসেছে'; 'পাণ্ডবগণ চেয়েছিলেন, যাতে এ যুদ্ধ না হয়। কিন্তু

কৌরবগণের কোনরূপ বিবেকের তাড়না ছিল না। প্রয়োজন বলে কেউই যুদ্ধ চায় না। *গীতা* যে মহা-গ্রন্থের অংশ, সেই মহাভারত সব সময়ে যুদ্ধ বর্জন নীতির ওপর জোর দিয়ে এসেছে। সর্বদা শান্তির সন্ধান কর। এই মহাপুরাণে যুযুৎসু মনোভাব নেই, যুদ্ধোন্মাদী (বা আক্রমণাত্মক) দর্শনও নেই। কিন্তু মানবীয় পরিস্থিতিতে বৈষম্যের কারণে যুদ্ধ আছে; কখনো কখনো আত্মরক্ষার প্রয়োজন হয়েছে এবং আত্মরক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য যা কিছু কার্যক্রমের প্রয়োজন তা নিতে হয়েছে। মহাভারতে কেবল সেই ভাবেই যুদ্ধকে কাজে লাগানো হয়েছে। গ্রন্থটি আধ্যাত্মিক তত্ত্বপূর্ণ এবং পাণ্ডবদের মহত্তম নেতা হলেন যুধিষ্ঠির, তিনি শান্তি চাইতেন, তাঁর বিদ্বেষের পাত্র কেউ ছিল না; তাঁর আর একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ নাম ছিল, অজাতশত্রু, 'যাঁর শত্রু এখনও জন্মায়নি'। তাঁর ভ্রাতাগণেরও ঐরূপ স্বভাব ছিল, আর শ্রীকৃষ্ণও তাঁদের পরামর্শ দিতেন, যুদ্ধ পরিহার করে, কৌরবদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে, মহাভারতকে সামগ্রিক ভাবে পর্যালোচনা করলে একে যুদ্ধের আখ্যান গ্রন্থ বলা যায় না। কিন্তু যুদ্ধ পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়ে উঠছিল। মানব প্রকৃতি নানাভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। ঔদ্ধত্য, গর্বোন্মত্ততা এবং এবম্বিধ নানা দোষত্রুটি মানব প্রকৃতিতে বাসা বেঁধেছিল। তাই দেখা যাবে নানা ঘটনা ঘটেছে, যা পরিস্থিতিকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। অন্যভাবে মিটমাট করে নেবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। যখন নয়া দিল্লী দূরদর্শনে মহাভারতের ধারাবাহিক চলচিত্র দেখানো হবে, তখন দেখবে কিভাবে একটু একটু করে আখ্যায়িকাটিতে দানা বেঁধে উঠেছে প্রাচীন কালের, প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ১৪০০ অব্দের, বৃহত্তম গৃহযুদ্ধ—যাতে সত্যই ধ্বংস হয়েছিল আমাদের বহু মানুষ ও আমাদের সংস্কৃতি। তারপর পরিস্থিতি বদলে গেল। মহাভারতের যুদ্ধ আমাদের দেশের ইতিহাসে এক যুগসন্ধিক্ষণ।

তারপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন ঃ

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥

—'তুমি যদি এই ন্যায় যুদ্ধে নিজেকে নিয়োজিত না কর, তবে ন্যায়সঙ্গত কর্তব্য কর্মের ও যশের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার জন্য তুমি পাপের ভাগী হবে।'

হে অর্জুন, তুমি যদি এখন যুদ্ধের সম্মুখীন না হও, তবে তোমার কি হবে?

ততঃ স্বধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা, 'তুমি নিজেই ধ্বংস করবে, তোমার স্বধর্ম, তোমার মহনীয় নামযশ', *পাপম্ অবাপ্স্যসি,* 'এবং পাপের ভাগী হবে'।

অকীর্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥৩৪॥

—'লোকে তোমার অপযশের কথা বহুদিন যাবৎ ঘোষণা করতে থাকবে; যশস্বী লোকের পক্ষে, অপযশ মৃত্যুর থেকেও দুঃখদায়ক।

অন্য লোকেও তোমার নিন্দা করবে। তুমি অন্যের কাছে কৌতুকের পাত্র হবে। তারা বলবে, অর্জুন ভীরু ছিল, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেছিল। আর যে একবার যশের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার পক্ষে সেই যশ হারানোর থেকে মরণও শ্রেয়ঃ। এ এক চমৎকার উক্তি। ইংরেজি ভাষায় বলে 'অপযশের পূর্বে মৃত্যু কাম্য'; ঠিক এই রকমই আমরা পেয়েছিলাম বহু পূর্বে *মহাভারতে ঃ সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাৎ অতিরিচ্যতে,* 'অপযশ নিয়ে বেঁচে থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।' এটি এক চমৎকার ভাব। সকল বীর্যবান পুরুষই এই ভাবে চিন্তা করে। আজকাল আমাদের দেশবাসীর মধ্যে অনেকেই এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পারে না। ব্যক্তিগত যশ ও আত্ম-মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতনতা ক্রমেই অধোগামী হচ্ছে। আমি মর্যাদা হারাতে প্রস্তুত, কিন্তু আমি চাই শুধু টাকা, আর কিছু নয়। মানব জীবনে যখন টাকার ভূমিকা বড় হয়ে ওঠে তখন মানসম্মানের গুরুত্ব ক্রমেই কমে আসে; সম্ভ্রান্ত লোক মর্যাদাই চায়, তারা অর্থের বিনিময়ে মর্যাদা হারাতে চায় না। পূর্বে আমি কলকাতাবাসী স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাসের দৃষ্টান্ত দিয়েছিলাম; তার পিতা দারিদ্র্যের জন্য ঋণ রেখে দেউলিয়া হয়ে শরীর ত্যাগ করেন। দাস একজন আইনজীবী হলেন। প্রথম মোকদ্দমায় তিনি কিছু অর্থ পেলেন। সেই অর্থে তিনি কি করলেন? তাঁর প্রথম কাজ হলো আদালতে গিয়ে তাঁর প্রয়াত পিতার নামটিকে মর্যাদাহানিকর দেউলিয়ার তালিকা থেকে মুছে দিলেন—অর্থাৎ পিতৃঋণ পরিশোধ করে দিলেন। এটি হলো টাকার থেকে আত্মমর্যাদাকে শ্রেয়ঃ জ্ঞান করার একটি দৃষ্টান্ত। এই শিক্ষা আমাদের নতুনভাবে নিতে হবে। বিগত কয়েক দশক ধরে আমরা তা হারিয়ে চলেছি। আজকাল কিছু লোক তাদের সমস্ত মানমর্যাদার হানিকে পরোয়া করে না; এ সত্ত্বেও তারা সমাজে বেশ হোমরাচোমরা ব্যক্তি সেজে ঘুরে বেড়ায়। সে (সমাজের) কেন্দ্র বিন্দু হয়ে ওঠে। সে গ্রন্থ রচনা করে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করে। এই রকমই হয়েছে আমাদের ও অন্যদেরও সমাজের বর্তমান অবস্থা।

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥ ৩৫ ॥

—'মহাবীরগণ মনে করবেন যে তুমি ভয়ে রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেছ। যাঁরা এখনো পর্যন্ত তোমাকে সম্মান দিয়ে থাকেন, এখন থেকে তাঁদের কাছে তুমি হেয় হবে।'

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬ ॥

—'তোমার শত্রুগণ, তোমার বিরুদ্ধে নানা রকম অকথ্য কথা বলবে; তারা তোমার সামর্থ্যের, তোমার বুদ্ধির নিন্দা করবে; *ততো দুঃখতরং নু কিম্,* 'এর থেকে অধিকতর দুঃখজনক আর কি হতে পারে?' —অতএব এই ভীরুসুলভ আচরণ ত্যাগ কর। 'তোমার সমস্যার সম্মুখীন হও'—এই হলো ৩৭তম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের চূড়ান্ত উপদেশ।

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

—'তুমি যদি নিহত হও, তবে বীরগণের জন্য উদ্দিষ্ট স্বর্গ লাভ করবে। আর তুমি যদি জয়ী হও, তবে পৃথিবী ভোগ করবে, অতএব, হে অর্জুন, যুদ্ধ করার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে উঠে দাঁড়াও।'

আজকাল, আমরা কতই না শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকি রাজপুত বীরদের, যারা বিদেশী আক্রমণকারীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজেদের জীবন আহুতি দিয়েছিলেন—সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে। আমরা আজও তাদের স্মরণ করি, সম্মান করি। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন ঃ *জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্,* যুদ্ধে জয়ী হলে, তুমি এই পৃথিবী ভোগ করবে অতএব কোন দিক থেকেই তোমার ক্ষতি হবে না। এই আবেদন, মানবসত্তার বীর সুলভ সকল চিত্তবৃত্তির কাছে। *তস্মাৎ উত্তিষ্ঠ কৌন্তেয়*—'অতএব, হে অর্জুন, উঠে দাঁড়াও।' *কৌন্তেয়* অর্থাৎ কুন্তীপুত্র। *যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ* 'উপস্থিত যুদ্ধের জন্য দৃঢ় নিশ্চয় হয়ে'। 'আমি পালিয়ে যাব না, সমস্যার সামনাসামনি হবো'—এই সঙ্কল্পে মন স্থির করে, 'উঠে দাঁড়াও।'

আমি প্রথম অধ্যায় আলোচনার সময় পূর্বে যেমন বলেছি—অর্জুনকে

সত্যকারের এক যুদ্ধের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। আমাদের তেমনটি করতে হয় না। কিন্তু গীতার শিক্ষা আমাদের সকলের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক, কারণ তোমার আমার যুদ্ধ হলো দৈনন্দিন সমস্যা নিয়ে। সেগুলির সামনাসামনি হতে হবে আমাদের, সমস্যাগুলিকে কাটিয়ে উঠতে হবে এবং তার জন্য যথেষ্ট আন্তর শক্তি জাগিয়ে তুলতে হবে। এই দর্শনেরই আবার এক সর্বজনীন প্রয়োগ আছে। শঙ্করাচার্য বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিমিত্ত করেছেন, *অর্জুনম্ নিমিত্তিকৃত্য,* অন্য সকলকে শিক্ষা দেবার জন্য। তুমি ভারতেই থাক বা আমেরিকায়, বা ইউরোপে, রাশিয়ায়, চীনে থাক একই দর্শন প্রযোজ্য। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সব সময়ে যে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুবধ করতে হবে, তা নয়। মোটেই নয়। অতএব, এখন থেকে তুমি একটি বিশেষ দৃষ্টান্তকে সামান্য অর্থাৎ সর্বজনীন ক্ষেত্রে আরোপ করছ। এরপর থেকে জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে এক গূঢ়দর্শন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ছিল অর্জুনকে যুদ্ধ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে প্ররোচিত করা। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে এর উদ্দেশ্য হলো জীবন সমস্যা সমাধানের জন্য সাহসী ও শক্তিমান হতে উদ্বুদ্ধ করা। মানবকে দেখাতে হবে যে পরিবেশ তার বশে। সে যেন পরিবেশের দাস না হয়। মানবকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে, চাই এক বলিষ্ঠ দর্শন। সেই রকম দর্শনই শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র গীতার মাধ্যমে পরিবেশন করেছেন। এটি একটি জীবন-দর্শন, খুবই প্রয়োগ-ধর্মী দর্শন, তাই পরবর্তী শ্লোকগুলিকে গীতায় *যোগ* আখ্যা দেওয়া হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমি তোমায় *যোগ* সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছি। কেবল *যোগ* বললে *প্রাণায়াম* বা শীর্ষাসন প্রভৃতি যোগাসনের কথাই মনে হয়। এখানে সে সব বলা উদ্দেশ্য নয়। এ হলো একটা ব্যবহারিক জীবন-দর্শন। এতে বলা হয়েছে বিভিন্ন মানবিক পরিস্থিতিতে কিভাবে চলতে হবে; এর দ্বারা, তুমি তোমার অন্তরস্থ নিজ আধ্যাত্মিক চেতনাকে গড়ে তুলতে পারবে, ফলে তুমিই হবে তোমার প্রতিবেশীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের যন্ত্র স্বরূপ। এটি হলো সেই সর্বগ্রাহী আধ্যাত্মিক দর্শন, শ্রীকৃষ্ণ যা ব্যাখ্যা করেছেন ও তার সংক্ষিপ্ত নাম দিয়েছেন 'যোগ'। কয়েকটি শ্লোকের পরে এ বিষয়টিতে আমরা আসব। *তস্মাৎ উত্তিষ্ঠ,* 'তাই উঠে দাঁড়াও'। শুয়ে থেকো না, অলস হয়ো না। আরামপ্রিয় হয়ো না। সজাগ হও, তেজস্বী হও, কর্মঠ হও। শ্রীবুদ্ধও বলেছিলেন, সর্বদা সজাগ থাকো। আমাদের মধ্যে অলস ও আরামপ্রিয় হওয়ার একটা প্রবণতা আছে। তা হওয়া উচিত নয়। তাই, বেদান্তে *উত্তিষ্ঠত জাগ্রত* 'ওঠো জাগো', এই কথাটি বার বার বলা হয়েছে। না, জীবন কঠোর পরিশ্রমী লোকের জন্য, দুর্বলের জন্য নয়, নিদ্রালু অলসপ্রকৃতির লোকের জন্য নয়। এই বাণী

প্রাচীন কাল থেকে বার বার এসেছে, যেমন এসেছে এই জনপ্রিয় প্রসিদ্ধ সংস্কৃত শ্লোকটিতে ঃ

উদ্যমেন হি সিদ্ধন্তি কার্যানি ন মনোরথৈঃ।
ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ—

—'উদ্যম, অর্থাৎ কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায়ী কর্মোদ্যমের মাধ্যমেই এ সংসারে সাফল্য লাভ করা যায়; *ন মনোরথৈঃ,* 'দিবাস্বপ্ন দেখে নয়', কেবল কল্পনার দ্বারা নয়। আমি এটা করব, আমি ওটা করব; এই হলো *মনোরথ,* মনকে রথের মতো চালিয়ে, আকাশে উড়িয়ে। ওটি উপায় নয়। তারপর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে ঃ সিংহ বৃদ্ধ হয়েছে, শিকার ধরা ছেড়ে দিয়েছে; সে হাঁ করে শুয়ে থাকে, তার আশা যে, কোন হরিণ তার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে তার মুখে প্রবেশ করবে। সিংহটি এভাবে কোন খাদ্যই পাবে না। দিনের খাদ্য পেতে হলে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। সেইভাবেই, শ্রীকৃষ্ণ মানবজাতিকে বলছেন, কাজ করে জীবনকে উপভোগ কর।

এবার ৩৮তম শ্লোক থেকে নতুন সুর শোনা যাবে। সেই *সুরটি শ্রীকৃষ্ণের মৌলিক দর্শনের শক্তিশালী সুর যে জীবন-দর্শন গড়ে উঠেছে কর্মে পরিণত বেদান্ত-দর্শন থেকে, প্রাচীন উপনিষদসমূহে উদ্ভাবিত মানব সম্ভাবনা বিজ্ঞান থেকে*। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৮তম শ্লোক থেকে শেষ পর্যন্ত চলেছে পূর্ণ মানবোন্নয়ন-বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের ব্যাখ্যা।

শ্রীকৃষ্ণ কি বলছেন?

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥

—'দুঃখ ও সুখ, লাভ ও ক্ষতি, জয় ও পরাজয়কে তুল্য জ্ঞান করে তুমি এই ধর্মযুদ্ধে নিযুক্ত হও। তবেই তুমি পাপে লিপ্ত হবে না।'

সুখদুঃখে, 'আনন্দে ও কষ্টভোগে', *লাভালাভৌ,* 'লাভে ও লোকসানে' *জয়াজয়ৌ,* 'জয় ও পরাজয়ে' মনের সমতা বজায় রেখে চলো। এই সব নানা পরিবর্তমান পরিস্থিতিতে মনকে যথাসম্ভব স্থির রাখতে চেষ্টা কর। *ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব* 'এইরকম সমভাবাপন্ন মন নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ কর', জীবন যুদ্ধেও। তাহলে তুমি পাপে লিপ্ত হবে না। *নৈবং পাপমবাপ্স্যসি,* 'এই মনোভাব থাকলে

তুমি কখনই পাপে লিপ্ত হবে না।' এই মানসিক সমতা একটি চমৎকার ভাব। যখনই তুমি মহৎ কিছু করতে যাবে উত্তেজনার বশে করলে তাতে সফল হবে না। স্থির, ধীর, অবিচলিত কর্মপ্রচেষ্টায় মহৎ কাজে সফলকাম হওয়া যায়। বর্তমানের রাজনীতিতে সবই উত্তেজনাময়। তুমি গিয়ে সমগ্র জনগোষ্ঠীকে উত্তেজিত কর। কিছুকাল পরে এই উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে যায়। কিন্তু যারা মহান কর্মবীর, তাদের স্বভাব এমন নয়। তাদের দৃঢ়-প্রত্যয় থাকে, তারা শান্ত ও অবিচলিত, তারা কাজ করে যায়, তারা সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং মনকে শান্ত ও অবিচলিত রেখে সমস্যাগুলি কাটিয়ে ওঠে। যে নরনারী শান্ত ও অবিচলিত মনে কাজ করে তারাই সব থেকে ভাল কাজ করে। উত্তেজিত নর বা নারী দেখায় যে সে ভাল কাজ করছে; কিন্তু তা কেবল হৈচৈ-সর্বস্ব আর লোক দেখান কাজ। ডঃ রাধাকৃষ্ণন তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেন, এ যুগের নর-নারী ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না; তাদের বিশ্বাস 'ভাল কাজ করে যাওয়া'র ওপরে। কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে 'এতে ভাল কাজ করার থেকে যাওয়া-যায়িটাই (ব্যস্ততা) বেশি'। এত উত্তেজনা, এত হৈচৈ শেষ পর্যন্ত কাজের বেলায় অতি অল্প। আমাদের সমাজে আজকাল এ রকম কাজ প্রচুর হচ্ছে। কিন্তু শান্ত হয়ে, নীরবে, একাগ্রভাবে কাজ করাই হলো প্রকৃত কাজ। সেইরকম কাজের কথাই এখন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন; তাঁর কথাগুলি বাড়ির গিন্নির ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি প্রযোজ্য একজন প্রশাসকের ক্ষেত্রে বা যে কোন একজন পেশাদার কর্মীর ক্ষেত্রে। কাজ হবে শান্ত, নীরব একাগ্রতাসম্পন্ন। মনের প্রবণতা হলো উঁচু নিচুতে ওঠানামা করা। বস্তুত এর ভেতর এক বিরাট মনস্তত্ত্ব রয়েছে। বাহ্যজগতের প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে তরঙ্গ সৃষ্টি করে, জলাশয়ের জল-পৃষ্ঠে একটি ঢিল ছুঁড়ে দিলে ঠিক যেমন হয়ে থাকে। মনও ঠিক তাই। কোন অভিজ্ঞতা বৃহত্তর ঢেউ সৃষ্টি করে, কোন ঢেউ আবার অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের ঢেউ-এর মতো হয়। সেটা ভাল নয়। এতে তুমি তোমার দাঁড়াবার জায়গা থেকে ছিট্‌কে যাবে। এতে তুমি তোমার মানসিক সাম্য হারাবে। আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেরই দৈনন্দিন জীবনের মাঝে কিছুটা পরিমাণ স্থিতিসাম্য বজায় থাকে; তবে আমাদের মধ্যে অসাধারণ কিছু একটা ঘটলে এর ব্যতিক্রম হতে পারে। কিন্তু প্রশিক্ষণের সাহায্যে আমরা মানসিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখবার সামর্থ্য বাড়াতে পারি, কোন অস্থিরতার প্রভাব আমাদের মনের ওপর কাজ করতে থাকলেও। এই বিষয়টি শ্রীকৃষ্ণ এখন বলবেন, কারণ এখন তিনি এক কর্মতত্ত্ব সহ জীবনদর্শন আমাদের উপহার

দেবেন। জীবন ও কর্ম প্রায়ই মনকে বিপর্যস্ত করে দেয়। তাই মনকে সঠিক পথে চালনা করতে শিখতে হবে। মনকে শান্ত ও একাগ্র করে রাখবে। এটি হলো শিক্ষণের প্রাথমিক স্তর। এর পর তিনি *সমত্বম্ যোগ উচ্যতে*, 'যোগই সমত্ব' এইভাবে তাঁর এই দর্শনের সংজ্ঞা দেবেন। এই ধরনের মনই শান্ত ও একাগ্র—সেটাই *যোগ*। সচরাচর তা হয় না।

একটি পশুর কথা ধর। পশু উত্তেজিত হলে, তার মন বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তখনই কাজের মাধ্যমে সেটিকে সে অবশ্যই প্রকাশ করবে। তারপর সে উত্তেজনার উপশম হয়। পশুর ব্যবহারের এই হলো প্রকৃতি। মানুষের ক্ষেত্রে মনের প্রশিক্ষণ শুরু হবার আগে, প্রায়শই ঐরকম ব্যবহারই সে করে থাকে; আদিম যুগে মানুষ ঐ রকমই করত। যদিও তখনই মানবের গঠনতন্ত্রে কিছুটা শান্তভাব এসেছে; কারণ প্রকৃতিই তার ব্যবস্থা করেছে, তাতে স্নায়ুতন্ত্রের ভেতর যা এসে পড়ে পর্যবেক্ষণ করে তবেই তাকে গতিযন্ত্রের মাধ্যমে বাইরে প্রকট হতে দেওয়া হয়। এই আগম ও নির্গমে একটু কালের ব্যবধান অতি সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও থাকে।

সেটা হলো মানব মনের প্রভূত উন্নয়নের সূচনা। শ্রীকৃষ্ণ কেবল উন্নয়নের সূচনারই ইঙ্গিত করছেন। আগম ও নির্গমের মাঝে বিরতিটুকু দাও। মনে কর কেউ আমাকে কটূক্তি করছে, আমি অমনি প্রতি-কটূক্তি করে থাকি। তা করবে না, তাহলে তুমি পশুবৎ, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রবৎ হয়ে গেলে। আর আমরা সব সময়ে বলে থাকি, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সমান ও বিপরীত। এতো যান্ত্রিক নিয়ম। মানুষের ক্ষেত্রে একে পরিবর্তন করা যায়। ক্রিয়া এক মাত্রা হলে, প্রতিক্রিয়া দশমাত্রা হতে পারে, আবার মাত্রাহীনও হতে পারে। এতেই প্রমাণ হয় যে মানুষ স্বাধীন। জীবন যখন ক্রমবিকাশের উষালগ্নে, একেবারে প্রাথমিক স্তরে, তখনই তাতে স্বাধীনতার অঙ্কুরোদ্গম হয়। স্বাধীনতার আর অন্য কোন সংজ্ঞা নেই। তুমি কেবল কোন বাহ্য পরিবেশসৃষ্ট একটি প্রাণী নও। তুমি তোমার প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ কর। যখনই তুমি প্রতিক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ হাতে নিলে, তখনই তোমার মধ্যে মনুষ্যত্ব লাভের সূচনা করলে। এর গতি অন্তর্মুখী হলে—তা হবে অনন্য-সাধারণ। তুমি তোমার মনকে নিয়ন্ত্রণ করছ, অন্তরে শান্তভাব সৃষ্টি করছ। এর থেকে বড় বড় সাফল্য আসবে। মানবিক ক্রমবিকাশের সূচনা হয় স্নায়ুতন্ত্রে নানা বিষয়ে সংবেদজ আগম ও উত্তেজনাপ্রসূত নির্গমের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার সামর্থ্য থেকে। উত্তরোত্তর এই সামর্থ্যের বৃদ্ধি করতে

হবে। এই বিষয়টি বার বার আলোচিত হবে, কারণ, *গীতার সমগ্র বিষয়টি হলো, মানব-মনের প্রশিক্ষণ—মানবের সম্পূর্ণ উন্নয়নের জন্য—পারিপার্শ্বিক জগৎকে এবং নিজেকেও দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত করে।* আমরা বহিস্থ কোন নিপুণ ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রাণী হয়ে থাকি না। আমরাই সেই নিপুণ শক্তি হয়ে নিজ জীবনকে চালাচ্ছি। প্রত্যেকটি মানবসত্তাকে এ কাজ করতে হবে, আর আমাদের স্নায়ুবিজ্ঞান ও শারীর বিজ্ঞান আজকাল বলে—এই নিপুণতার সঙ্গে নিজ জীবনকে চালিয়ে নিয়ে যাবার মতো যথেষ্ট জৈব সামর্থ্য প্রকৃতি মানব সত্তাকে দিয়ে রেখেছে। নর-নারীকে একটি প্রাণী মাত্র হয়েই পড়ে থাকতে হবে না; তারা মুক্ত হতে পারে, আবার এই মুক্তিকে কাজে লাগাতে পারে, এই হলো আধুনিক জীববিদ্যা, স্নায়ুবিদ্যা ও প্রাচীন বেদান্তের শিক্ষা। বেদান্ত এই মুক্তির অভিজ্ঞতাকে চরম উন্নতির স্তর পর্যন্ত নিয়ে যায়। তাই বেদান্ত এটিকে 'মুক্তি' আখ্যা দিয়েছে। মানবের মনে বাহ্য অভিজ্ঞতার আগমন ও নির্গমন কালের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করবার এই প্রাথমিক মানবীয় স্বাধীনতার এই অপূর্ব উন্নতিই হলো সার্বিক স্বাধীনতা বা মুক্তির পথে মানবীয় অভিযানের সূচনা। তার থেকেই লাভ হবে আশ্চর্যজনক কর্ম-সাফল্য।

এই অধ্যায়ের শেষে, নিজ দর্শন ব্যাখ্যা করার পর, শ্রীকৃষ্ণ ১৮/১৯টি শ্লোকে পূর্ণ সাম্য, পূর্ণ স্থৈর্য অর্জনের ফলে মানব মনের যে অবস্থা হয়—তার স্বরূপ সম্বন্ধে বলবেন; *গীতায়* একেই *স্থিতপ্রজ্ঞ* বলা হয়েছে। এটি একটি অতি চমৎকার কথা। *প্রজ্ঞার* অর্থ জ্ঞান বা ধীশক্তি, *স্থিত* মনে অবিচল। আমাদের জ্ঞান সুস্থিত নয়। এ আসে আবার চলে যায়। কিন্তু, অনুশীলনের সাহায্যে আমরা মনকে, বুদ্ধিকে সুস্থিত করতে পারি। ঐ শ্লোকগুলি আপন শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন করছে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে। প্রথমে ব্যাখ্যা পরে দৃষ্টান্ত। ঐ রকম চারিত্রিক গুণরাশির বিকাশ আমাদের নিজেদের মধ্যে অবশ্যই ঘটাতে হবে। তাই, সমগ্র বিষয়টিই প্রতিটি নাগরিককে, প্রতিটি মানব সত্তাকে—নর, নারী, শিশুকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে। এরূপ মানবিক সাম্যভাব গড়ে তোলা যায় কীভাবে? তোমার জন্মগত মনঃশারীরিক তেজপুঞ্জকে কীভাবে কাজে লাগাবে? কীভাবেই বা এর উন্নতি ও বিস্তার ঘটাবে, এর থেকে শ্রেষ্ঠ বস্তুর উদ্ভব ঘটাবে? কে করবে? আমাদের প্রত্যেককে করতে হবে; অন্যেরা সাহায্য করতে পারে। কিন্তু আসল কাজ তোমাকে নিজেকে করতে হবে। যেমন ইংরেজি প্রবাদ আছে, 'তুমি ঘোড়াকে জলের কাছে নিয়ে যেতে পার, কিন্তু জল পান-ক্রিয়াটি তুমি করাতে পার না।' তাই, বেদান্ত বার বার এই বিষয়টির ওপর জোর দেয়, তোমার

চরিত্র ও তোমার জীবন গড়ে তোলা তোমার কাজ, তোমার স্বাধিকার। একাজ অপরের হাতে ছেড়ে দিও না। সাহায্য যে কোন লোকের কাছে নেওয়া চলে; কিন্তু কাজটি তোমার। তুমি যখন বিকশিত হয়ে উঠবে, জগৎ আশ্চর্যান্বিত হবে ঃ হাঁ, এখানে একজনকে দেখছি, যে মনের তেজকে মূলধন করে বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক জীবনরূপ বিরাট কারবারটি গড়ে তুলেছে—ঠিক যেমন কোন ব্যবসায়ী হাজার টাকা মূলধন নিয়ে আরম্ভ করে, পরে কোটিপতি হয়—মূলধনের সঠিক বিনিয়োগের ও আপন পরিশ্রমের ফলে মানবিক ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রেও একই রকম হয়ে থাকে। একটি নির্দিষ্ট মূলধন থেকে নিজের ও জগতের বহু কল্যাণকারী একটি মহৎ ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে কীভাবে? এই বিষয়টি এখন থেকে অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত আলোচিত হবে। অর্জুনের উদ্দেশ্যে বলা হলেও শ্রীকৃষ্ণের কথাগুলি সকলের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। অর্জুন *নিমিত্তমাত্র*, 'যন্ত্রস্বরূপ'। আমার মনঃশক্তির পুঁটুলিটি নিয়ে আমি কী করতে পারি?

শিল্পে ও বাণিজ্যে, আমরা দেখছি, ভারতে ঝুঁকি নিয়েও নতুন নতুন কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। আগে আমাদের জনগণ, বিশেষত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, সাধারণত অলস ও আরামপ্রিয় হতো। তারা সুদে টাকা খাটিয়েই সন্তুষ্ট থাকত। কিন্তু রাজনীতিক স্বাধীনতা লাভের পর তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ, আর কঠিন কাজ করবার মতো নতুন উদ্দীপনা জেগেছে। তাই, কয়েকমাস আগে, India Today নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে একটি বিশদ প্রতিবেদন ঃ ভারতের নতুন নতুন উদ্যোক্তাদের বিষয়ে। দেখলাম, প্রবন্ধটি প্রেরণাদায়ী। একটি লোকের মাত্র এক হাজার টাকা পুঁজি। সেইটুকুই সে বিনিয়োগ করে শিল্পে, আর কঠিন পরিশ্রম করে শিল্পটিকে গড়ে তোলে। এখন সে এক বিরাট শিল্পপতি। এরই মতো, শত শত দৃষ্টান্ত রয়েছে; ভারতে উদ্যম দেখা যাচ্ছে, এই উদ্যোগে নজরে পড়ছে; আমরা আর ভাগ্যের দোহাই দিই না; এরকম দুর্বল হয়ে থাকাটাই আমার ভাগ্য—এমন বলি না। সে চিন্তাধারা চলে যাচ্ছে। গীতার ভাব আমাদের মধ্যে প্রবেশ করছে; যখন এই শত শত উদ্যোক্তা গীতা পড়বে, অনুশীলন করবে, তারা এক নতুন ধরনের কর্মোদ্যোগ গড়ে তুলবে, তার সঙ্গে যুক্ত হবে এক জোরাল জাতীয় কর্তব্যবোধ। তারা ভাববে, যা কিছু আমরা কঠিন পরিশ্রম ও জাতীয় সম্পদের উন্নয়নের বিনিময়ে রোজগার করছি—তা আমরা সকলের কল্যাণে, সমাজের কল্যাণে ব্যয় করব। এই দ্বিতীয় আশীর্বাদ সেই সব উদ্যোক্তারাই পাবে, যখন তাদের আপন আপন প্রবল শক্তি ও উদ্যমের সঙ্গে গীতার বাণী এসে যুক্ত হবে। উদ্যম সদাই সুন্দর।

আমি যখন হাইস্কুলের ছাত্র, তখন একখানি ছোট পুস্তিকায় মেকলে ও তাঁর শিক্ষক জন স্টুয়ার্ট মিলের একটি উক্তি পড়েছিলাম। তিনি বলেছেনঃ 'উদ্যোগের ব্যাপারে সুযোগের পুরোভাগে থাকা আর আনুকূল্য লাভের ব্যাপারে সুযোগের পশ্চাদ্ভাগে থাকাই উচিত।' স্ফূর্তি লুটতে পেছিয়ে, আর কাজের উদ্যমের ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকাই যুক্তিযুক্ত। ঠিক যেমন, যখন ভাত রাঁধতে হবে, আমি সেখানে আছি; আবার খাবার ঘণ্টা পড়ার পর তখনও আমি আছি; আর কিছু লোক কেবল খাবার ঘণ্টা পড়লেই আসে। কিছু লোক রাঁধতে প্রস্তুত—এমন লোক অন্যের তুলনায় অনেক ভাল। উদ্যোগের ব্যাপারে এগিয়ে থাক, আর আনুকূল্য লাভের ক্ষেত্রে যত পার পেছনে থাক। ছোট ছেলেদের একথা বলতে থাক, তবেই আমাদের জাতীয় চরিত্র উন্নতির শিখরে উঠবে। এখন তেমন নয়। কেননা আমরা এখন ছেলেদের শেখাচ্ছি ঃ যদি স্ফূর্তির ব্যবস্থা থাকে ও প্রাপ্তি যোগ থাকে—তবে এগিয়ে থাক। আর উদ্যোগ, যদি ব্যক্তিগত লাভের অবকাশ থাকে তবেই নাও, আর যদি জাতীয় স্বার্থ জড়িয়ে থাকে, তাহলে কিছু করার দরকার নেই। চুপ করে থাক। ঐ শিক্ষাই আমরা ছেলেদের দিচ্ছি, ফলে তাদের চরিত্রের সমূহ হানি সাধিত হচ্ছে। তাই বলি, আমরা যেন এই মহান পুস্তিকাটি থেকে সেই আশ্চর্য নবীন দিগ্‌দর্শনটি লাভ করি, যা আমরা আমাদের শিক্ষাপ্রণালীতে শুধু নামেই দিয়েছি—মানব সম্পদ উন্নয়ন ও মূল্যবোধমুখী শিক্ষার নামে। *গীতা* এই সব ভাবে সমৃদ্ধ অতএব এই বাণী সর্বত্র পৌঁছে দাও, সমাজ, আমাদের শিশু, আমাদের ছাত্র—সকলের কাছে।

আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৮ সংখ্যক শ্লোক আলোচনা করছি। এটি যেন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী শ্লোকের মাঝে বিভাজন রেখা। কাজে সফলতা আনতে মনে কিছুটা স্থৈর্য চাই। তাড়াহুড়োতে কাজে সফল হওয়া যায় না। শান্ত, নীরব, একাগ্র কাজে স্থায়ী ফল হয়। একটি বিষয় আমাদের অবশ্যই শিখতে হবে—যারা কেবল লাফালাফি আর চেঁচামেচি করে তারা মোটেও দক্ষ কর্মী নয়। যারা নীরবে নিঃশব্দে কাজ করে যায়, তারাই জানে কিভাবে কাজ করতে হয়। *গীতার* সমগ্র শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে সর্বোপরি বিষয়টি হলো ঃ কর্ম কৌশল—কীভাবে কাজ করতে হয়? কীভাবে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে হয়? এ বিষয়টি ভাবতে গেলেই মানসিক প্রশিক্ষণের কথাটি উঠে আসে। মনের অবস্থা কী রকম? মন একটু শান্ত ও স্থির না হলে, কোন বড় কাজ করা যায় না। একটু আবেগের ফুটফুটানি দক্ষতা নয়; অল্পক্ষণেই তা বিলীন হয়ে যায়। তাই শ্রীকৃষ্ণ প্রাথমিক শিক্ষায় আমাদের বলছেন, কিছুটা মানসিক স্থৈর্য গড়ে তুলতে।

আমাদের অন্তরে যে সামর্থ্য আছে, তাতেই এটি গড়ে তোলা সম্ভব। আমাদের ঐ সামর্থ্যের প্রয়োগ করতে হবে। আমাদের মন সদাই ওঠা নামা করছে। সেই মনে একটু স্থৈর্য আনতে হবে—একটা অন্তর্মুখী স্থৈর্য।

কয়েক সপ্তাহ আগে এক ভাষণে আমি এক প্রখ্যাত ফরাসী শরীরতত্ত্ববিদের কথা উদ্ধৃত করে বলেছিলাম—*মুক্ত জীবনের জন্য অন্তরে এক স্থিতিশীল পরিবেশের প্রয়োজন।* অন্তরের স্থৈর্য থেকেই আসবে প্রভূত শক্তি, মানবিক পরিস্থিতিতে আসবে প্রচুর সাড়া। যারা হৈচৈ করে, চিৎকার করে, তারা দক্ষ কর্মী নয়। আজকাল, ভারতে কাজের সময় প্রচুর হৈচৈ হয়, প্রচুর চিৎকার চেঁচামেচি হয়। তাতে বোঝায় যে আমরা ভাল কর্মী নই। আমরা কাজে দক্ষ নই। এ কেবল আবেগজাত উত্তেজনা। *গীতা* শিক্ষা দেয়, হৈচৈ করে লোক দেখান কাজ, আর শান্ত, নীরব, স্থির ও দক্ষ কাজের পার্থক্য। বহুকাল পূর্বে, আমি যখন দিল্লীতে ছিলাম, তখন অটোরিক্সা, এক নতুন ধরনের যান, সবে চালু হয়েছে। এগুলি এত শব্দ করতো যে, আমি ভাবলাম—এ নিশ্চয়ই খুব শক্তিশালী যান; আমি উঠলাম। দুলতে দুলতে চলতে আরম্ভ করল, তার সঙ্গে চলল প্রচুর শব্দ; কিন্তু দেখলাম গতিবেগ মাত্র ঘণ্টায় ১২ মাইল! পরে যখন প্রথম শ্রেণীর মোটর যানে গেছি তখন দেখেছি, সেগুলি নিঃশব্দে চলে, কিন্তু গতিবেগ ঘণ্টায় ৮০ মাইল। আমি ইউরোপেও ভ্রমণ করেছি, ঘণ্টায় ১০৬ মাইল বেগে, সেখানকার গাড়িতে কোন ঝাঁকানিও নেই, শব্দও নেই। মানুষের ক্ষেত্রেও এই ধরনের তফাৎ দেখা যায়। যে কাজে দক্ষ নয়, সে কেবল হৈচৈ-ই করে, চিৎকার করে, নানা ঝামেলা সৃষ্টি করে। অন্তরের শক্তি অর্জন করতে পারলে, মানুষ শান্ত, স্থির হয়, আর অন্যের তুলনায় বেশি কাজ করে। জাতি হিসাবে, এই শিক্ষাটি আমাদের পেতে হবে। আমরা মহান কর্মী হতে পারি, আমাদের আশপাশের জগৎটাকে ঠিক মতো পাল্টে দিতে পারি। এই হলো গঠনমূলক কাজ। সে বিষয়টি *গীতার* দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের মহান শিক্ষায় পাওয়া যাবে। তৃতীয় অধ্যায় হলো *কর্মযোগ* অর্থাৎ কর্মের মহান যোগ। তাই এই পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমাদের সাবধান করা হচ্ছে ঃ আমরা যেন মনের শান্তি ও সাম্য যথাসম্ভব বজায় রাখি। এ থেকে মহান কিছু বিষয় স্ফুরিত হয়েছে। শুধু বহির্জগতের কাজই ভাল করে করতে শেখান নয়, অন্তরের গভীরে, আমাদের স্ব-স্বরূপের দিকে অনুপ্রবেশ ঘটাতেও শেখান হয়েছে—যার জন্য চাই সেই অসাধারণ শান্তি ও মানসিক সাম্য।

পূর্বে আমি আধুনিক স্নায়ু বিজ্ঞানের homeostasis বা দেহে আভ্যন্তরীণ

তাপসাম্য সংরক্ষণের ধারণা সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলাম। উন্নত স্তন্যপায়ী জীবের জীবন যুদ্ধে বেঁচে থাকার জন্য প্রকৃতির এই ব্যবস্থা, যার ফলে বাইরের তাপমাত্রার পরিবর্তন শরীরের তাপমাত্রাকে প্রভাবিত করে না, শরীরের তাপমাত্রা একই রকম থাকে। একেই বলে শারীর তাপমাত্রার স্থিতিস্থাপক অবস্থা। কেবল এই থেকেই, প্রকৃতি উচ্চতর মানব মস্তিষ্ক গড়ে তুলতে পেরেছে, যার কাজ হলো মানুষকে মুক্তির পথে, অভ্যুদয়ের পথে, নিয়ে যাওয়া—একথা বলেছেন স্নায়ুবিজ্ঞানী গ্রে ওয়ালটার, তাঁর *Living Brain* (সজীব মস্তিস্ক) গ্রন্থে। 'সব স্তন্যপায়ী জীবের ক্ষেত্রে 'শারীর তাপীয়' স্থিতিস্থাপকতার অর্থ হলো উদ্বর্তন বা টিকে থাকা, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এটি অভ্যুদয়ের সমার্থক।' কী চমৎকার ভাব! প্রকৃতি আমাদের একরকম শারীর-তাপীয় স্থিতিস্থাপকতা দিয়েছেন, তা হলো ভৌতিক। তারই ফলে আমাদের রক্তপ্রবাহে অক্সিজেন ও অন্যান্য পদার্থের মাত্রা স্থির থাকে। কাজ করবার সময়, এর নড়চড় হলে তা আবার স্থিরমাত্রায় ফিরে আসে। তেমনি তাপমাত্রার, নড়চড় হলেও—তা স্থির মাত্রায় ফিরে আসে—আপনা-আপনি। আন্তর শরীরতন্ত্রের এই স্বয়ংক্রিয় সমতাকেও homeostasis বলে। তাই প্রকৃতি মানুষকে বলে—''আমি তোমায় ভৌতিক homeostasis (স্থিতিস্থাপকভাব) দিয়েছি, তোমার মানসিক স্থিতিস্থাপক ভাব তুমি নিজেই গড়ে তোল, তার জন্য আমি তোমাকে আশ্চর্য মস্তিষ্কতন্ত্র দিচ্ছি।' এই প্রেক্ষাপট সামনে রেখেই আমাদের পর্যালোচনা করতে হবে এই শ্লোকটি : *সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥*—জীবনযুদ্ধে প্রবেশের সময় শান্ত ও সাম্যভাব মনে বজায় রাখতে হবে, তবেই তুমি মহৎ ফললাভে সক্ষম হবে। এবার ৩৯ শ্লোকে আসছি :

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥

—হে পার্থ! আত্মোপলব্ধির জ্ঞান সম্বন্ধে তোমাকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, এবার শোন যোগের তত্ত্বকথা, যা দিয়ে তুমি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবে।

তিনি বললেন, এতক্ষণ আমি তোমাকে সাংখ্য বা *জ্ঞানযোগের* তত্ত্ব বলেছি। জগৎ মিথ্যা, একমাত্র আত্মাই সত্য। সেই জ্ঞানাতীত অবস্থায় তুমি আত্মোপলব্ধি করবে। এ সংসার চলমান ছায়ামাত্র। *জ্ঞানযোগে* এইরকম শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে। আর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন *জ্ঞানযোগের* সেই শিক্ষাকে ভিত্তি করে যুদ্ধ করতে। এখন তিনি বলছেন, *এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে*—'এতক্ষণ

আমি তোমায় বলেছি সাংখ্যের চিন্তাধারা অনুযায়ী অগ্রসর হবার কথা'। কিন্তু এখন তুমি আমার কাছ থেকে *যোগ* মতে, তথা *বুদ্ধি-যোগ* মতে, চিন্তা ও কাজের কথা শোন। আমি তোমাকে কর্মযোগের, কর্ম-প্রচেষ্টার যোগের কথা বলতে যাচ্ছি, যার মাধ্যমেও তুমি আধ্যাত্মিকতা লাভ করতে পারবে। তাই, তিনি বললেন *বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু* আমি এখন তোমাকে এই নতুন যোগ-দর্শন, কাজ কীভাবে আমাদের অধ্যাত্মানুভূতির দিকে নিয়ে যায়, তাই বলবো। আর তোমাকে যদি কাজ করতে হয়, তোমার কাজ বাস্তব, যাদের নিয়ে কাজ তারাও বাস্তব; এ অবস্থায়, যদি তুমি মনে কর সংসার অবাস্তব, মিথ্যা, তবে সে কাজে কোন মজা থাকবে না। বস্তুত, আমাদের তো শিক্ষা দেওয়া হয়েছে—সংসার অবাস্তব (মিথ্যা) বলে। আর আমাদের সেখানেই কাজ করতে হবে। আমাদের কাজের মধ্যেই প্রকাশ পাবে আমাদের সম্পূর্ণ অনাসক্তি। আধ-খানা মন দিয়ে কাজ। আজকাল বেশির ভাগ লোকই আধ-ঘুমন্ত হয়ে কাজ করে। তাদের চারিদিকে যে কাজ তাতে তাদের কোন উৎসাহ নেই, অবশ্য বিশেষ দু-একজন ছাড়া। কিন্তু কেন এমন মনোভাব হয়? কারণ নানা পথে লোককে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে—'সংসার মিথ্যা' এই দর্শন। *সব দুনিয়া ঝুটা হ্যায়।* এতে কিছু নেই, আপনাতে আপনি থাক। বহু পূর্বে ঐ শিক্ষা নানাভাবে আমাদের জনগণকে দেওয়া হয়েছিল। শিক্ষার সব দিক না দেখার ফলে আমাদের মন বিকৃত হয়ে পড়েছে। প্রথমত আমরা আত্ম-কেন্দ্রিক এবং অপরের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েছি। এই রকম জীবনদর্শন আমাদের মনের গভীরে প্রবেশ করায় প্রতিবেশীর প্রতি আচরণে আমরা বেদরদি ও উদাসীন হয়ে পড়েছি। কোন মহান আচার্যের বা মহান অধ্যাত্ম *সাধকের* ক্ষেত্রে লোক-ব্যবহারে এই উদাসীনতা থাকে না; কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষেত্রে এর ফল হয়েছে এই যে, তাদের হৃদয় শুষ্ক হয়ে গেছে। অন্যের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েছে। রাজনীতিতেও এই মনোভাব দেখা যাচ্ছে। তাই শ্রীকৃষ্ণ-প্রদর্শিত যোগের পথই হবে আমাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে কড়া দাওয়াই (ঔষধ)। এ যোগ আমরা বুঝিনি বা পালন করিনি—যতদিন না বর্তমান যুগে স্বামী বিবেকানন্দ আবির্ভূত হয়েছেন।

এই *যোগ বুদ্ধি* লাভে কী ফল হবে? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ *বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি*—নিজের মধ্যে এই *বুদ্ধি—যোগবুদ্ধি* জাগিয়ে তুললে একটি বড় ফল হবে, তুমি কাজ করতে করতেই সেইরকম আধ্যাত্মিক মুক্তিই পাবে, যা *জ্ঞানের* মাধ্যমে পাওয়া যায়। তুমি কাজ করতে থাক। তোমাকে কাজের পরিস্থিতি সামলাতে হতে পারে, অন্য লোকজনকেও সামলাতে হতে

পারে। এইসব কাজের ভেতরে থেকেই, এরই মাধ্যমে তুমি সকল বন্ধন থেকে মুক্তি পাবে, অর্থাৎ সব রকম কর্মবন্ধন থেকে—বুদ্ধিযোগ বিনা যা তোমার ঘটতে পারতো। কর্ম বন্ধন সৃষ্টি করে, কেবল যদি তা অজ্ঞানে (অহংবুদ্ধিতে) সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু এই *যোগবুদ্ধির* সহায়তায় তুমি কাজ করলে কোনরকম কর্মবন্ধনে জড়িত হবে না। এইভাবে বুদ্ধিযোগের সহায়তায় কাজ করে, *জ্ঞানযোগী* যে আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভ করে, তুমি তাই লাভ কর। উপরন্তু তুমি একজন প্রেমিক হৃদয়বান প্রতিবেশী-দরদী লোক হবে। তুমি জনগণের ও সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করতে পারবে।

অর্জুনের কাছে, তথা আমাদের সকলের কাছে, শ্রীকৃষ্ণ এই যে নতুন দর্শন ব্যাখ্যা করলেন, তা বিগত হাজার বছরেও আমাদের জীবনে ও কাজে প্রতিভাত হয়নি। কিন্তু বর্তমান যুগে আমরা তা করতে পারবো এবং অবশ্যই করবো। ভারতে আমাদের সমগ্র জীবনযাত্রায় ও কর্মপদ্ধতিতে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন চাই। তা আসে কেবল কঠোর পরিশ্রম থেকে, সেবা বুদ্ধিতে কাজের মাধ্যমে, প্রচুর মানবীয় তাগিদ-বোধে কাজ করে। তাই, এই দর্শন আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের কাছেও। তাই, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *বুদ্ধ্যাযুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি*—'হে অর্জুন, এই যোগবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে কাজ করে, তুমি কর্মজনিত সব বন্ধনকে নাশ করতে পারবে'। কর্ম বন্ধন সৃষ্টি করবে মনে করে তুমি ভয় পাচ্ছ, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, যদি তুমি *যোগবুদ্ধি* অবলম্বন করো, তোমার কোন বন্ধনই হবে না। এই হলো সেই দর্শন যা প্রতিটি মানব সত্তার কাছে আশীর্বাদস্বরূপ, উদ্ধারকর্তাস্বরূপ। অধিকাংশ লোকই কর্মত্যাগ করতে পারে না; কাজেই তারা বন্ধনের ভাগী হয়। কেন এমন হয়? আমরা সকলেই কাজের মধ্যে থেকেও বন্ধন মুক্ত থাকতে পারি, এই হলো এ যোগের সার্বিক বৈশিষ্ট্য। *কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি—কর্মবন্ধম্,* কর্মজনিত 'বন্ধন', তুমিই *প্রহাস্যসি,* 'খণ্ডন করবে'। *কর্ম* থাকবে, *বন্ধন* চলে যাবে। সব লোকের কাছে, এ হলো এক মহান শিক্ষা। এরপর এ পথের একটি সুন্দর লক্ষণের কথা বলছেন শ্রীকৃষ্ণ :

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥

—এতে, অসম্পূর্ণ কর্মপ্রচেষ্টা বিফলে যায় না, বিপরীত ফলেরও সৃষ্টি হয় না। এ ধর্মের একটুও যদি কেউ পালন করে, তবে সে মহা ভয় থেকে রক্ষা পায়।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি, '*যোগবুদ্ধির* এই মহান পথে অসম্পূর্ণ কর্মপ্রচেষ্টা নষ্ট হবার ভয় নেই'। তুমি কিছু কাজ আরম্ভ করলে; কোন একটা পরিস্থিতিতে সে কাজ স্থগিত রাখলে। আবার যখন সে কাজে ফিরে আসবে তখন তোমাকে গোড়া থেকে আরম্ভ করতে হবে। জীবনের বহু ক্ষেত্রে এই রকমই হয়ে থাকে। সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে একথা বিশেষ ভাবে সত্য। কিন্তু এক্ষেত্রে সেরকম অসুবিধা নেই। সাধারণত অনুষ্ঠান আরম্ভ করে অর্ধসমাপ্ত রাখলে, ফিরে এসে বাকি অর্ধেকটা সম্পন্ন করতে পার না; আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হয়। কিন্তু এ পথে সব কাজের ফল জমা হতে থাকে। যতটা পার কর, তারপর ফেলে রাখ আবার কিছু কাল পরে ফিরে এসে, কাজ যেখানে ফেলে রেখেছিলে তার পর থেকে করে যেতে পার। কাজ আরো করে যাও, আরো করে যাও ঃ একে ক্রমপুঞ্জিত উন্নয়ন বলা চলে। বস্তুত এই হলো চরিত্র গঠনের প্রকৃতি। চরিত্র গঠন সব সময়েই ক্রমপুঞ্জিত অর্থাৎ এর ফল ক্রমান্বয়ে জমা হতে থাকে। তুমি কিছু করলে, চরিত্রের কিছুটা গঠিত হলো; তারপর তোমাকে অন্য কাজ করতে হলো, পূর্ব কাজ ভুলে গেলে, তারপর ফিরে এসে আবার আরম্ভ করলে। এই হলো এই চমৎকার শ্লোকটির অর্থ। *নেহ-অভিক্রম-নাশোঽস্তি এবং প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে*, 'এ পথে আরব্ধ কর্ম নিষ্ফল হয় না ও কাজের ভুলের জন্য কোন মন্দ ফলও হয় না। তারপর রয়েছে এক অসাধারণ প্রতিশ্রুতি ঃ *স্বল্পমপস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ*, 'এই ধর্মের এতটুকু পালন করলেও এই দর্শন আমাদের মহাভয় থেকে রক্ষা করে'। চরিত্র গঠন একদিনের কাজ নয়। লেগে থাক, ধীরে ধীরে গড়ে তোল, গড়ে তোল এক মহান চরিত্র, এক দৃঢ় চরিত্র; সময় লাগবে। আর এইভাবেই তুমি তিল তিল করে গড়ে তুলছ, বিপুল মানবীয় সম্পদ সম্বলিত এক আশ্চর্য চরিত্র। তাই, *নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি*, সব চরিত্র গঠনে, কোন *অভিক্রমনাশ নেই*, অর্থাৎ 'অসমাপ্ত চেষ্টা বিফলে যায় না', ইহলোক ত্যাগ করবার আগে যা করেছ, তা তোমারই থাকে। ফিরে এসে, যেখানে ছেড়ে গেছলে সেখান থেকে আরম্ভ কর। মানুষে বাড়ি করবার সময় যেমন করে থাকে; এর সম্ভাব্য ব্যয় যেখানে এক লক্ষ টাকা, সেখানে তার আছে দশহাজার টাকা, তাই সে ভিৎ তৈরি করে, তার ওপর এক পইঠা পর্যন্ত গেঁথে রাখে। এতেই টাকা ফুরিয়ে যায়। এমনই থাক, এতেই এর ভাল হবে। ভিৎ শক্ত হবে। পরে আবার দশ হাজার টাকা জমলে সে আরো একটু গেঁথে ফেলে। পরে আবার টাকা আসে। এইভাবে অনেকগুলি ধাপে বাড়িটি সম্পূর্ণ হয়। এমনই হয়ে থাকে সব চরিত্রগঠন প্রচেষ্টায়, আর এই চরিত্র গঠন প্রচেষ্টার

একটি চমৎকার গুণ আছে, এতে তোমার শক্তি বাড়ে, তুমি নির্ভীক হও—হৃদয়বান হও—সকলের সঙ্গে সমভাবাপন্ন হও। তাই 'এই ধর্মের এতটুকু পালনেও আমরা মহাভয় থেকে রক্ষা পাই—*স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ*। গীতার শিক্ষা হলো—কিছু না পাওয়ার থেকে, অন্তত একটু পাওয়াও ভাল। 'হয় সবটা, নয় একটুও না'—এমন নয়। শ্রীকৃষ্ণ সকলকে বলছেন : আমার শিক্ষা থেকে যতটুকু পার নাও, তোমার জীবন ও চরিত্রের যতটা পার গড়ে তোল। 'ও! ঐ লোকটি কতটা করেছে, আমার সে বল নেই, আমি কিছু করবো না' ভেবে নিজেকে অবসাদগ্রস্ত করবে না। সেটা সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি হবে না। ঐ লোকটি *তার* সামর্থ্য অনুযায়ী করেছে। তুমি *তোমার* সামর্থ্য অনুযায়ী কর। ধাপে ধাপে, একটু একটু করে তোমার মহান চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তোল, তোমার অন্তরস্থ—এই মনঃশারীরিক তেজোপুঞ্জকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগিয়ে। তোমার মনঃশক্তিতন্ত্র থেকে তুমি একটি অসাধারণ (অদ্ভুত) বস্তু তৈরি করতে যাচ্ছ—যার নাম *বুদ্ধি*। *বুদ্ধিযোগ, যোগবুদ্ধি*—বিবেক বা বিচার ক্ষমতা, মানবের ইন্দ্রিয় মন-তন্ত্রের মধ্যে একটি আলোক বিন্দুস্বরূপ। এটিকে গড়ে তুলতে হবে, একই মনঃশক্তি তন্ত্র থেকে। মানব-তন্ত্রের মধ্যেই চলেছে এই বিশাল মনঃরাসায়নিক ক্রিয়া। আমরা সমগ্র শরীরটাকে একটি প্রয়োগশালা (ল্যাবরেটরি)তে রূপান্তরিত করে ফেলি। সেখানেই আমরা ধীরে ধীরে এই *বুদ্ধির* উদ্ভব ঘটাই। *বুদ্ধি* হলো তোমার বিচারপ্রবণ চিন্তা-শক্তি, তোমার বিচার ক্ষমতা, তোমার ইচ্ছাশক্তি ও সব রকম আবেগের সংমিশ্রণের এক সুন্দর সমন্বয়। এটি মানবিক উন্নয়নের শ্রেষ্ঠ যন্ত্র : যুক্তি, কল্পনা ও ইচ্ছাশক্তি এর মধ্যে একীভূত হয়ে আছে। এইরকমই আমাদের প্রয়োজন। *গীতা* বার বার *বুদ্ধির* মাহাত্ম্য খ্যাপন করবেন। *গীতায়* বহুস্থানে এর আবাহন স্তুতি দেখা যায় : *বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ*—'*বুদ্ধির* আশ্রয় নাও'। ঐ *বুদ্ধির* সহায়ে তুমি সবরকম কর্মপ্রচেষ্টায় সফল হতে পার। মূলত বুদ্ধি হলো যুক্তি বিচার, কিন্তু শুষ্ক বৌদ্ধিক যুক্তি নয়। এ যুক্তি আবেগ ও অনুভূতি দিয়ে দৃঢ়ীভূত। সমস্ত কর্ম প্রেরণা আসে আবেগ ও অনুভূতি থেকে, শুষ্ক জ্ঞান থেকে নয়। তারপর আসে ইচ্ছাশক্তি, তার সর্বৈব প্রভাব ও পরিণাম নিয়ে। তাই, এই তিনটিকে একত্রিত করলে পাওয়া যায় মানবিক উন্নয়নের এক আশ্চর্য হাতিয়ার। তারই নাম *বুদ্ধি*। একটি ছাত্র স্কুলে ও কলেজে নানারকম বই পড়ে, কিন্তু এসব পড়ার চরম ফল হওয়া উচিত সেই বুদ্ধির অভ্যুদয়। তারপর আসবে তোমার নিজের ও অপরের জন্য অনেক কিছু বড় বড় সম্পদ। এক ব্যক্তি ডাক্তারের কাছে গেল, তিনি

রোগীকে পরীক্ষা করে বললেন, তোমাকে স্বাস্থ্যের জন্য রোজ এক লিটার দুধ খেতে হবে। রোগী বলে, ডাক্তার, রোজ এক লিটার দুধ খাবার মতো পয়সা আমার নেই। ডাক্তার বলবে, আচ্ছা, তবে রোজ আধ লিটার দুধ খেও। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার বললেন, সিকি লিটার বা তার থেকেও কিছু কম দুধ খেলে তোমার উপকার হবে। এই শিক্ষার ভাবও ঐরকম। এই শিক্ষার যতটুকু তুমি নিতে পারবে ততটুকুই তোমার মঙ্গল। আমি যদি এক লিটার দুধ খেতে না পারি, তবে একটুও খাব না—এ দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক নয়? তাই, *স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ*। ঐ বুদ্ধির ভাবটি কী? পরের শ্লোকে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১ ॥

—হে কুরুকুল বংশধর, একনিষ্ঠ এক *বুদ্ধি* (বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি) একটিই হয়ে থাকে। অব্যবস্থিত চিত্তলোকের উদ্দেশ্য হয় অসংখ্য ও বহুমুখী।

একজনকে বলা হয়েছে *ব্যবসায়ী*, অপরকে *অব্যবসায়ী*। *ব্যবসায়* মানে অধ্যবসায়, চেষ্টা, কঠোর সঙ্কল্প এইসব। বিপরীত ভাব হলো *অব্যবসায়*। এখানে এই *বুদ্ধি-যোগ* দর্শনে রয়েছে একটি *ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি*, কঠোর সঙ্কল্পযুক্ত *বুদ্ধি*। *ব্যবসায়* হলো সঙ্কল্প, কঠোর প্রচেষ্টা। ঐ সবই তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এইটিই তুমি পাও, আর তা হলো একটি, দুটি বা তিনটি বা বহু নয়। সমস্ত শক্তিকে সংহত ও একীভূত করা হয়েছে। মানব দেহটিকে দেখ। এর মধ্যে কত বৈচিত্র্য রয়েছে। কোষ থেকে শরীরের বড় বড় অঙ্গগুলি, প্রত্যেকটি এত বৈচিত্র্যপূর্ণ—তবু তাদের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য রয়েছে। প্রত্যেকটি অঙ্গ, অপর প্রতিটি অঙ্গের জন্য কাজ করে। এখানে পৃথকীকরণও হয়েছে, আবার সংহতিও হয়েছে—আধুনিক জীববিদ্যায় যেমন বলা হয়েছে। বিভাজন ও একত্রীকরণের মাধ্যমেই ক্রমবিকাশ ঘটেছে। ঠিক তেমনি ভাবেই, তুমি যখন অন্তরজীবন গড়ে তোল—অনুরূপ ঘটনাকে ঘটতেই হয়—পৃথকীকরণ ও প্রবলবেগে একত্রীকরণ। ঐ একত্রীকরণই এখানে উল্লিখিত হয়েছে; *একেহ কুরুনন্দন*, '*ঐ ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধি*, হে অর্জুন, এই যোগ দর্শনের মতে, কেবল একটিই'। কিন্তু সাধারণ জীবনে *বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্*, 'যারা *অব্যবসায়ী*, অর্থাৎ ঐরকম দৃঢ়সংকল্পবান নয়, তাদের মন বিক্ষিপ্তভাবে কাজ করে।' সেই গঠনতন্ত্রের মধ্যে কোথাও কোন শক্তির উদ্ভব হয় না। সব কিছু বিক্ষিপ্ত।

মনের দুটি অবস্থা, একটি বিক্ষিপ্ত, অপরটি সংহত। সবরকম যোগ শিক্ষায়, সংহত অবস্থার কথাই বলা হয় ঃ সব শক্তিকে সংহত কর। স্বাভাবিক জীবনে, মন হাজার রকমভাবে বিক্ষিপ্ত। অতএব, তার সেই শক্তি নেই। তাই, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, এই *কর্মযোগে*, ক্রিয়া-দর্শনে, তোমাকে এইরকম বুদ্ধির—সংহত বুদ্ধির—উদ্ভব ঘটাতে হবে—এ এক আশ্চর্য ভাব, কারণ অন্য অবস্থায়, *বহু শাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্*। নিশ্চয়তাহীনের ক্ষেত্রে মন হাজারো দিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে; তা থেকে কোনো শক্তি উদ্ভূত হয় না। আর তাই আমাদের করতে হবে এখানে। তাই, এই শ্লোকে, মানব সত্তার স্বীয় অন্তরে এক একীভূত মনঃশক্তি সৃজনের ভাবটি তুলে ধরা হয়েছে। এই শক্তি ইতস্তত ছড়ান নেই, আমাদের অন্তর থেকে সেই মনের উদ্ভব ঘটাতে হবে। এই হলো এক সুস্থ জীবন-দর্শন ও মানবীয় উন্নয়নের ভিত্তি। *বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ* 'বহু শাখা বিশিষ্ট ও বিক্ষিপ্ত মন' এইরকম বিক্ষিপ্ত শক্তিবিশিষ্ট মনের লোকই আমরা সচরাচর দেখতে পাই। এই রকম মন নিয়ে জীবনের কোন পরিস্থিতিতে সফলকাম হওয়া যায় না, কারণ সর্বশক্তির সংহত চেষ্টা সেখানে নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, গান্ধীজীর মতো মহৎ মনে শক্তির প্রবল সংহতি ছিল কেবল একটি মন, দুটি বা তিনটি নয়। সেই মনই আবার নানা ক্ষেত্রে কাজ করছে। কিন্তু মন কেবল একটিই। নর হোক বা নারী হোক সেই ব্যক্তিটি সমগ্র মনঃশক্তিকে সংহত করেছে নিজের মধ্যে, এই ব্যক্তি যখন আঘাত করে—তার শক্তি হয় প্রচণ্ড। অতএব আমাদের মধ্যে সেই রকম সামর্থ্যের উদ্ভাবন অবশ্যই ঘটাতে হবে, যা হাজার রকমের ক্ষুদ্র মনঃশক্তি বিশিষ্ট (অফলপ্রসূ) হেতু হয়ে ছড়িয়ে পড়বে না। রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে গেলে তার ভেদ করবার শক্তি কমে যায়। রশ্মি কেন্দ্রীভূত হলে তা শরীরকে ভেদ করতে পারে—যেমন পারে এক্স-রশ্মি বা রঞ্জনরশ্মি। মানব-মনের ক্ষেত্রেও তেমনি হয়। সব রকম শিক্ষাক্ষেত্রে, প্রতিষ্ঠানগতই হোক বা প্রতিষ্ঠান-বহির্ভূতই হোক, মনঃশক্তির সংহতির কাজ চালিয়ে যাওয়া উচিত। মনঃশক্তিকে কীভাবে সংহত করা যায়? এতে আঘাত হানবার, ভেদ করার শক্তি দেওয়া কীভাবে যেতে পারে?—তার উপায় উদ্ভাবন করা হবে আমাদেরই কাজ। এ ব্যাপারে অন্য কারো নজর দেবারও দরকার নেই। তারা কেবল ফলটি দেখবে, কী আশ্চর্য উপায়ে জাগতিক পরিবেশকে ব্যবহার করে আমি সাফল্য লাভ করছি। এই হলো সব রকম মানবিক শিক্ষার লক্ষ্যস্থল। কেবল পাঠ্যপুস্তক পাঠ আর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া নয়—তা হলো শিক্ষার বহিরঙ্গ মাত্র। প্রকৃত আভ্যন্তরীণ অংশ হলো মানসিক উন্নতি; মনকে এইভাবে গড়ে তোলা।

পরবর্তী তিনটি শ্লোকে এক গভীর তত্ত্ব পরিবেশন করা হয়েছে ঃ

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২ ॥

—হে অর্জুন, যারা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে তারা বিবেকহীন পুরুষ। তারা বেদের লিপি পাঠেই আনন্দ পায়, আর তর্ক করে বলে অন্য কিছু নেই।

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥

—তারা কামনায় পরিপূর্ণ এবং পুনর্জন্ম ও কর্মফলই যার পরিণাম সেই স্বর্গই তাদের শ্রেষ্ঠ কামনা আর তারা বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম-সর্বস্ব, যার ফলে তারা পেতে পারে শুধুই ভোগ ও ক্ষমতার ঐশ্বর্য।

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥

—যারা ঐ ভোগ ও ক্ষমতার ঐশ্বর্যে মত্ত, যাদের মন ঐ গুলিরই দাসত্ব করে, তাদের মধ্যে *সমাধি*-মুখী *বুদ্ধি* বা বিচারশক্তি উদ্ভূত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

যাদের মন বিক্ষিপ্ত, তারা জাগতিক ও স্বর্গীয় নানা সুখ ভোগের পেছনে ছোটে এবং বেদের কর্মকাণ্ডে উপদিষ্ট নানা আচার ও অনুষ্ঠানাদিতে মেতে থাকে। যারা এই সবে লিপ্ত তাদের মধ্যে *ব্যবসায়াত্মিকা* (বা নিশ্চয়াত্মিকা) *বুদ্ধির* উদ্ভব হয় না। এই শ্লোকে ভগবান বলেছেন, *যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্তি অবিপশ্চিতঃ*, যারা *অবিপশ্চিতঃ*, বুদ্ধিহীন, বিচার বুদ্ধিহীন, তারা *পুষ্পিতাং বাচম্*, ধর্মের নামে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে।

তারা সদাই বেদের উদ্ধৃতি দেয়, বেদে কি বলেছে তা নিয়ে আলোচনা করে। এখানে বেদ বলতে বেদের *কর্ম-কাণ্ড* বা বেদের যে অংশে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি ক্রিয়া আলোচিত হয়েছে, স্বর্গপ্রাপ্তির কথা অঙ্গীকৃত হয়েছে, তাকেই বোঝাচ্ছে। যাতে বলা হয়েছে এই সব যজ্ঞ ও অনুষ্ঠানাদি কর, স্বর্গলাভ হবে। লোকে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মুগ্ধ হয়ে যায়। *কামাত্মানঃ*, 'ইন্দ্রিয়ভোগ্য আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ।' আমি এটা চাই, আমি ওটা চাই। তেমনি *স্বর্গপরা*, 'স্বর্গপ্রাপ্তির প্রতি

একান্ত অনুরক্ত।' বহু ধর্মেই এই স্বর্গপ্রাপ্তির দর্শন রয়েছে। *জন্মকর্মফলপ্রদাম্‌*, 'এর ফল হলো পুনর্জন্ম ও অনুষ্ঠানাদি ক্রিয়াকলাপ।' *ক্রিয়া বিশেষ বহুলাম্‌ ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি*, 'তাতে বহু ক্রিয়ানুষ্ঠানের কথা আছে, কেবল ইন্দ্রিয়ভোগ প্রাপ্তিতেই যার শেষ।' *ভোগৈশ্বর্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্‌*, 'যাদের মন ভোগ আর ক্ষমতালাভের প্রতি আসক্ত'। তাদের কী গতি হয়? *ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে*, 'ঐ *বুদ্ধি* যা তাদের উচ্চতম আধ্যাত্মিক অনুভূতির দিকে নিয়ে যেতে পারে, তা এদের মনে একেবারেই জাগে না। তাদের *বুদ্ধি* ছড়িয়ে থাকে হাজার রকমের বাসনা ও উচ্চাশা ইত্যাদির দিকে। প্রভূত যাগযজ্ঞাদিপূর্ণ আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড—সর্বস্ব বেদের, এ এক কঠোর সমালোচনা। উপনিষদেও এই রকম বৈদিক কর্মকাণ্ডের কথা পাওয়া যায়। এখানেও একই রকম সমালোচনা রয়েছে, কারণ এর দ্বারা চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কোন সহায়তা হয় না, যা একান্তই দরকার—আধ্যাত্মিক উন্নতি ও প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম ও সেবাপরায়ণতা অর্জনের জন্য। এ বিষয়ে নীতি হওয়া উচিত, অনুষ্ঠান কম রেখে চরিত্র গঠনে যথাসম্ভব বেশি মনোনিবেশ করা। এগুলি কোনটাই আসে না এই রকম সুখবাদী দর্শন থেকে, অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে ইহলোকে ও পরলোকে সুখভোগই যার উদ্দেশ্য।

এই কথা বলে, শ্রীকৃষ্ণ বেদগুলির (বেদের কর্মকাণ্ডের) মূল্যায়ন করছেন—যা কেবল *সনাতন ধর্মের* ঐতিহ্যেই দেখা যায়। প্রত্যেক ধর্মের ঐতিহ্যে আপন আপন শাস্ত্রেরই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে। *এই সনাতন ধর্মে* অবশ্য, যদিও আমরা আমাদের পবিত্রতম গ্রন্থ হিসাবে, বেদগুলিকে শ্রদ্ধা করি—কিন্তু তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করি না। তাদের সব সময়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে ফেলা হয়। তাদের মধ্যে সত্য নিহিত নেই। তাতে আছে কেবল সত্য সম্বন্ধে কিছু তথ্য। এ যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ, সে বিষয়ে এভাবেই বলেছেন : তিনি বলেন হিন্দু পঞ্জিকায় ভবিষ্যদ্‌বাণী করে এ বছর এত ইঞ্চি বৃষ্টি হবে। কিন্তু যদি তুমি পঞ্জিকা নেঙড়াও, এক ফোঁটা জলও পাবে না। তেমনি বেদে (কর্মকাণ্ডে) এত ভাল ভাল কথা বলা হয়েছে, ঈশ্বরানুভূতি, আত্মানুভূতি সম্বন্ধেও। কিন্তু বেদ নেঙড়ালে, এমন কিছু পাওয়া যায় না। কেবল নিজ অভিজ্ঞতাকে নেঙড়ালে অর্থাৎ পর্যালোচনা করলে তবেই সত্যকে পাবে, সত্যের অনুভূতি হবে। তাই বলি, বেদে কি লেখা আছে তা আলোচনা কর, তারপর তাকে সরিয়ে রেখে, সাধনা কর, তখন নিজেই সত্য উপলব্ধি করবে। ইতিহাসের গোড়ার দিকেই এ দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের উপনিষদের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল। অন্যতম পুরাতন উপনিষদ্‌, *বৃহদারণ্যক*

উপনিষদের একটি বৈপ্লবিক ঘোষণা রয়েছে, *বেদো অবেদো ভবতি,* 'সত্যানুভূতি হলে বেদের আর কোন মূল্য থাকে না।' অনুভূতি স্তরে বেদ, 'অ-বেদ' হয়ে যায়। কী চমৎকার ভাব! অন্য কোন ধর্মে এমন নির্ভীক ঘোষণা—*বাইবেলের* পারে যাও—*কোরাণের* পারে যাও—পাওয়া যায় না; যদিও তাদের মরমিয়া সাধকগণ সে কথা বলেছেন এবং কখনো কখনো তার জন্য শাস্তিও ভোগ করেছেন। কেবল ভারতেই, এমন কথার ওপর জোর দেওয়া হয়, যাতে বলা হয়েছে—বেদ পড়, শাস্ত্র পড়; তাদের বক্তব্য বোঝ এবং তারপর নিজে এই সত্য উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর। পুঁথিতে যা আছে, তার থেকে অভিজ্ঞতা অনেক উচ্চতর। অতএব, বেদের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও, ভারতে, আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়—আমাদের বেদের পারে যেতে হবে। এই সত্যই এখন শ্রীকৃষ্ণ আমাদের কাছে পরিবেশন করতে যাচ্ছেন ঃ

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫ ॥

—বেদ (বেদের কর্মকাণ্ড) তিনগুণের প্রকাশক। হে অর্জুন, তুমি তিনগুণ থেকে মুক্ত হও, নিষ্কাম হও। সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বের প্রভাব যেন তোমার ওপর না পড়ে। সদা সত্ত্বাশ্রিত হয়ে সাম্যভাব বজায় রাখ, অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্তবস্তুর রক্ষণের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কর; অচঞ্চল আত্মপ্রতিষ্ঠ হও।

কী বৈপ্লবিকই না এই উক্তি! ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা, ' বেদ (বেদের কর্মকাণ্ড) *সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ,* এই তিনগুণের প্রকাশক।' কিন্তু তুমি, অর্জুন, *নিস্ত্রৈগুণ্যোভব,* 'তুমি তিন*গুণের* পারে যাও।' অর্থাৎ তুমি বেদের (কর্মকাণ্ডের) ওপারে যাও। *নির্দ্বন্দ্বো,* 'শীতোষ্ণ, লাভলোকসান, সুখ-দুঃখাদি 'দ্বন্দ্বের পারে যাও।' *নিত্যসত্ত্বস্থো,* 'শুদ্ধ সত্ত্ব প্রকৃতিতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাক'; *নির্যোগক্ষেম,* 'তোমার নিজ *যোগ* ও *ক্ষেম,* প্রাপ্তি ও রক্ষণ বিষয়ে যত্নবান হয়ো না। সবরকম উদ্বর্তন (টিকে থাকা) বিষয়ক দর্শনের পারে যাও এবং *আত্মবান,* সদা আত্ম-প্রতিষ্ঠ হও'। এই রকম কর্মফল প্রাপ্তি আমাদের অবশ্যই হবে—বেদের পারে, শাস্ত্রের পারে গিয়ে আমার ও তোমার কাছে এদের প্রতিপাদ্য বিষয় উপলব্ধি করে। ভারতের প্রত্যেকটি আধ্যাত্মিক আচার্য বলেন, শাস্ত্র গ্রহণ কর, তাদের অন্তর্নিহিত সত্যকে বোঝ, তারপর সেই সত্য উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর। সব সময়ে কেবল শাস্ত্র নিয়ে পড়ে থেকো না। এ ভাবটি বিজয়নগর রাজ্যের চতুর্দশ শতাব্দীর পণ্ডিত বিদ্যারণ্য তাঁর *পঞ্চদশী* নামক বেদান্ত গ্রন্থের এক প্রসিদ্ধ শ্লোকে (৪/৪৬) অতি সুন্দরভাবে

প্রকাশ করেছিলেন। আমরা কীভাবে অধ্যাত্মগ্রন্থের সদ্ব্যবহার করবো। তিনি বলেন ঃ

গ্রন্থম্ অভ্যাস্য মেধাবী জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৎপরঃ।
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেদ্-গ্রন্থম্-অশেষতঃ ॥

—'চাষী যেমন চালের খোঁজে, ধান নিয়ে, তাকে কাঁড়ে, তারপর খোসা ফেলে দিয়ে চালটিকে সিদ্ধ করে খায়, তেমনি *মেধাবী*, 'বুদ্ধিমান লোক' প্রথমে বইখানি পড়ে, *গ্রন্থম্-অভ্যাস্য*, 'গ্রন্থরাজি অনুশীলন করে'; উদ্দেশ্য কী? তোমার উদ্দেশ্য পণ্ডিত হওয়া নয়। তুমি হলে *জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৎপরঃ*, 'জ্ঞানলাভের পর তা উপলব্ধি করাই তোমার আকাঙ্ক্ষা।' তাই যদি হয়, তবে তোমার কর্তব্য কী? গ্রন্থে যা আছে তা সংগ্রহ করে *ত্যজেদ্ গ্রন্থম্ অশেষতঃ* 'তুমি সব গ্রন্থই ফেলে দাও'; আর তাদের কোন মূল্য নেই। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, একজন শহরে তার আত্মীয়ের কাছে চিঠি দেয়, 'তুমি গ্রামে আসবার সময়, এই এই কাপড় আর এতটা সন্দেশ আনবে।' চিঠি পেয়ে আত্মীয়টি তা কোথায় রেখেছে খুঁজে পাচ্ছিল না। সারা বাড়ি খুঁজে অনেক কষ্টে চিঠি পেয়ে, দেখল তাতে লেখা আছে, 'গ্রামে আসবার সময় এই এই জিনিস নিয়ে আসবে।' সে তখন চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দোকানে গিয়ে জিনিসগুলি কিনে আনলো। চিঠিখানি রেখে বার বার পড়বার কী দরকার? আসল কাজ হলো, চিঠি অনুযায়ী জিনিসগুলি কেনা। তেমনি শাস্ত্রে যা আছে সেগুলিকে উপলব্ধি করতে হবে তারপর তার কাছে শাস্ত্রের আর কোন মূল্য নেই। তারপর *ত্যজেদ্ গ্রন্থম্ অশেষতঃ*, তারপর শাস্ত্রনির্ভরতারূপ ভারতীয় প্রবণতাটি ত্যাগ কর।

সব ধর্মের মরমিয়া সাধকগণ এইরূপই করেছে। যখন তাদের অপরোক্ষানুভূতি হয় তখন তাদের কাছে গ্রন্থের আর কী প্রয়োজন? যখন পরীক্ষামূলকভাবে কোন ধর্ম গ্রহণ করা হয়, তখন তোমার গ্রন্থের প্রয়োজন থাকে না। তাই ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দ-ব্রহ্ম-অতিবর্ততে*, 'যখনই তুমি অধ্যাত্ম জীবনের প্রকৃতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হবে, তখনই তুমি শাস্ত্রাদির এলাকার পারে গেলে।' সে সবে আর তোমার প্রয়োজন নেই। সমস্যাটি জানবার জন্যই শাস্ত্রাদির দরকার। এখন তুমি পরীক্ষা নিরীক্ষায় নেমেছ, গ্রন্থপাঠের ছাত্রবিশেষ মাত্র নও। তাই, যখনই তুমি পরীক্ষায় নামবে, তোমার ওপর শাস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ক্রমেই কমে আসবে। তাই, *নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্*, 'জীবনের দুঃখাদি দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত, সম্পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠিত

হয়ে তুমি উদ্বেগশূন্য হও; তুমি তোমার অন্তরাত্মার শক্তিতে শক্তিমান হও।' এই অবস্থাই আমাদের অর্জন করতে হবে। শাস্ত্রাদি গৌণ, উপলব্ধিই মুখ্য। যিশু এই কথাই বলেছিলেন (নব সুসমাচারে) ঃ 'গ্রন্থাদি আমাদের জীবন হরণ করে, আত্মাই জীবনদান করে।' ঐশ্লামিক আধ্যাত্মিকতার বহু প্রাচীন ঐতিহ্যেও মৌলিক তত্ত্বের খোঁজ, আর অমুখ্য জিনিস বর্জন করতে বলা হয়েছে, অবশ্য যখন তা পুরোহিত (মোল্লা) কুলের দাপট থেকে মুক্ত ছিল। পারস্যদেশের মৌলানা জালালুদ্দীন রুমি, তাঁর বিখ্যাত, *মস্‌নাবি গ্রন্থে*—মুসলিম জগতে পবিত্রতার দিক থেকে যার স্থান *কোরাণের* নিচেই সেই গ্রন্থে বলেছেন ঃ

মন জে কুরান মঘজ্জ রা বর্দাস্তম্;
উস্তখান পেসে সগাণ অন্দখ্‌তম্—

—'আমি *কোরাণের* মজ্জাটুকু টেনে নিয়ে, শুষ্ক হাড়গুলি কুকুরের জন্য ফেলে দিয়েছি।'

আমাদের *সনাতন ধর্মের* ঐতিহ্যেও ঐগুলির ওপর সর্বদাই জোর দেওয়া হয়। *সাধনা* ও *অনুভব*, 'অধ্যাত্ম সাধনা ও উপলব্ধি' চাই—পাণ্ডিত্য সেখানে অর্থহীন। এ থেকে কেবল প্রাথমিক সহায়তা পাওয়া যায়, তার বেশি কিছু নয়। তবে, সে অবস্থা কখন লাভ হয়? সে সাফল্য কীরকম? এই বিশেষ প্রসঙ্গে একটি গূঢ় শ্লোক এখানে উপস্থাপিত হয়েছে ঃ

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥

—আত্মজ্ঞানী অধ্যাত্ম সাধকের কাছে, সমগ্র বেদরাশির তাৎপর্য, সমগ্র দেশ জলে প্লাবিত হলে একটি জলাশয়ের যতটুকু প্রয়োজন, ততটাই—অর্থাৎ প্রয়োজন নেই।

যে লোক, যে অধ্যাত্ম সাধক, সত্য উপলব্ধি করেছেন, তাঁর কাছে বেদের কী অর্থ? তারপর তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) এক দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ঃ এখানে এক বৃহৎ জলাশয় রয়েছে, তার কানায় কানায় জল। *যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে*, 'একটি বিরাট সরোবরের কিনারা পর্যন্ত জলে ভর্তি।' তুমি কাছে বসে। এখন কি তুমি একটু জলের জন্য কূপ খুঁড়বে? এত জল তোমার চারিদিকে, হাত বাড়ালেই পাবে। ঠিক তেমনি যার আত্মজ্ঞান হয়েছে, তার কাছে বেদগুলির প্রয়োজন ততটাই, বৃহৎ সরোবরের পাশে বসা লোকের কাছে কূপের

প্রয়োজন যতটা। দৃষ্টান্তস্বরূপ এটি বলা হলো। *তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ,* 'যে আধ্যাত্মিক সাধক সত্যকে জেনেছে, সে, নরই হোক আর নারীই হোক, ঐ দৃষ্টিতে বেদ চর্চা করবে।' চারিদিকে বন্যার জল থাকলে যেমন জলের জন্য একটা ছোট কূপ খননের দরকার নেই, হাত বাড়ালেই তো জল। তাই, এইভাবেই শ্রীকৃষ্ণ বর্তমান প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির জন্য যে সাধনা তা তোমাকে আরো বেশি করে শাস্ত্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যাবে; শাস্ত্রগ্রন্থাদির নির্দেশ কেবল সাধনার সূচনাকালে প্রয়োজন। ধর্মের উদ্দেশ্য কেবল পাণ্ডিত্য নয়, আধ্যাত্মিকতা। শ্রীরামকৃষ্ণ সব সময়ে বলতেন ঃ আধ্যাত্মিক ভাব ও সাধনাবিহীন পণ্ডিতের ব্যবহার শকুনের মতো, যারা আকাশে উড়ে বেড়ায়, কিন্তু নজর থাকে মাটিতে ভাগাড়ের দিকে। যারা *শুধুই* পণ্ডিত, তাদের স্বভাব ঐরূপ। বিবেকহীন, আন্তরিক আধ্যাত্মিক আবেগ-বিহীন পাণ্ডিত্যমাত্রকে আমাদের ঐতিহ্যে কখনই বড় করে দেখা হয় না। ঠিক তেমনি পরের শ্লোকে, শ্রীকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেছেন এক সুন্দর ভাবের, যাকে এই *যোগ-বুদ্ধি* বা *যোগদর্শন* শিক্ষার মূল ভাব বলা যেতে পারে।

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥ ৪৭ ॥

—কেবল কাজেই তোমার অধিকার; কখনই তার ফলে নয়, তুমি যেন কর্মফলের দ্বারা প্রেরিত না হও; তোমার আসক্তি যেন অকর্মের প্রতিও না হয়।

কর্মণ্যেব অধিকারস্তে, 'তোমার অধিকার কেবল কর্মে'। *মা ফলেষু কদাচন,* 'কর্মফলে নয়'। কিন্তু আমরা যদি ফল, অর্থাৎ কর্মফল না পাই, তবে প্রশ্ন করতে পারি আমরা আদপে কোন কাজ করব কেন? যদি তুমি তাই বল, "গীতা বলবেন, 'না—কাজ করতে থাক।' *মা কর্মফল হেতুর্ভূঃ,* 'কেবল কর্মফলের দিকে তাকিয়েই সর্বদা কাজ করো না'।" শেষে গীতা বলছেন, *মা তে সঙ্গোঽস্তু অকর্মণি,* 'অকর্মের প্রতি আসক্ত হয়ো না।' এই শ্লোকটিতে চারটি প্রস্তাবকে একত্রিত করা হয়েছে। প্রথম কেবল কর্মেই তোমার অধিকার; ফলে নয়; ফলই যেন তোমার কর্মের প্রেরণা না হয়; আর কর্ম না করে থেক না। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক, যা মানবের মধ্যে বহু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করতে পারে। ফলের দিকে না তাকিয়ে আমরা কীভাবে কাজ করতে পারি। আমরা এ প্রশ্ন করে থাকি। এটি এখানে একটি গূঢ় বাক্য। আমি কখনো কখনো এমন ছাত্র

দেখেছি, যারা এইরকম শ্লোক শুনে এর বাহ্যভাবটুকুই দেখে। তাই, যখন বাগানের কাজ চলছে—আমি তখন ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়ক—ছাত্রেরা সকলে বাগানে কাজ করে ফুল-ফল ফলাচ্ছে। একজন বলল, কাজেই আমাদের অধিকার, ফলগুলি স্বামীজীর কাছে যাবে! কৌতুকচ্ছলে সে একথা বলেছিল। একদিন তাদের কাছে ঐ শ্লোকটির অর্থ বুঝিয়ে বললাম। তারা এর কিছু গূঢ়তর অর্থ সম্বন্ধে অবহিত হলো। তাই আমাদের সকলেরই এই শ্লোকটির অর্থ একটু বোধগম্য হওয়া দরকার। এই শ্লোকটিকে *গীতার* মূল শিক্ষা বলা হয়ে থাকে। মহাত্মা গান্ধী একটি বই লিখেছিলেন, *অনাসক্তি যোগ*—কর্মফলের প্রতি অনাসক্তি। এই হলো অনাসক্তির অর্থ। আসক্তি মানে লালসা; অনাসক্তি মানে নির্লিপ্ততা। তাই, যখন তোমরা প্রশ্ন কর, আমার কাজের স্বরূপ কী? একাজের ফল কার প্রাপ্য? তখন তুমি নতুন আলো দেখতে পাবে, এই বিশেষ শ্লোকটি থেকে।

এ বিশ্বে আমি একা নই। আমি যে কাজই করি, সে কাজেরই ফলটি আমি গ্রহণ করি, আর সব ভুলে যাই। তা করা যাবে না। আমরা এই বিশ্বের। সেখানে অন্য সব লোকও রয়েছে, আমাদের যা কিছু আছে, তা অন্য সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হবে। এটা *আমার* কাজ, সব কিছুই *আমার*—আমাদের এই স্বাভাবিক বৃত্তি থেকে কিছুটা অনাসক্ত হওয়ার বৃত্তি অর্জনের প্রয়োজন আছে। সব আমার, এই বৃত্তি ছাড়তে হবে। এই বিশাল বিশ্ব আমাদের চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। এদের বাদ দিয়ে আমরা চলতে পারি না। আমাদের ঘিরে যে মনুষ্য জগৎ রয়েছে, তাকে বাদ দিয়ে আমরা মনুষ্য পদবাচ্য হতে পারি না। আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ অন্য সব মানুষের কাছে আমরা কত ঋণী! তুমি যদি সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখ তুমিও সমাজের কাছে একজন নগণ্য ব্যক্তি হয়ে যাবে। তাই, কাজের সেই ভাবটিকে আমাদের মনে রাখতে হবে, যা আমাদের সামনে ধরে রাখে সমাজ কল্যাণও মানব সম্পদ উন্নয়নের ভাবটিকে। আমিই আমার কাজের একমাত্র ফলভাগী, (এভাব ঠিক নয়), অন্য ভাগীদারদের কথাও ভাবতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় ঃ কাঁচা (অপক্ব) 'আমি'কে পাকা (পক্ব) 'আমি'(তে) উন্নীত করতে হবে। এখন অনাসক্তি কার থেকে? অহংবোধ থেকে, আমাদের জৈবতন্ত্রের কেন্দ্রে যে ক্ষুদ্র সত্তাটি রয়েছে তার থেকে। আমাদের মধ্যে এই ছোট 'আমি' পরাহত, আর বড় 'আমি' বিকশিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা এক একটি খর্বীকৃত স্বতন্ত্র জীবই থেকে যাই। যতদিন না আমরা *তুমি* বলতে শিখি, ততদিন আমাদের একটুও উন্নতি হয়নি।

আমরা কাঁচা 'আমি'ই থেকে যাই, যতদিন না এই ছোট 'আমি' প্রসারতা লাভ করে পাকা 'আমি'তে পরিণত হয়; এই পাকা 'আমি'ই উপলব্ধি করতে পারে অন্য সব জীবের সঙ্গে একত্ব-ভাব। তখন আমি কখনো বলবো না যে জগতের প্রত্যেকটি জিনিস কেবল আমারই। আমরা *'আমি'*র পরিবর্তে *'আমরা'* বলতে শিখব। এটি হলো আমাদের উন্নয়নের পথে এক সুবৃহৎ পদক্ষেপ, আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রথম স্তর।

তাই, আজ আমরা মানবের অন্তরস্থ অহংবোধের এই উপাত্ত বা ভিত্তি বিষয় আলোচনা করব। এই বিশেষ লক্ষণীয় উপাত্ত, ক্রমবিকাশের পথে কেবল মানবীয় স্তরেই উন্মোচিত হয়েছিল। পশুর মধ্যে কোন অহংবোধ নেই। শিম্পাঞ্জির অহংবোধ নেই। মনুষ্যেতর কোন প্রাণীর মধ্যে সেটা নেই। কোন পশু যদি এই অহংবোধের উদ্ভব ঘটাতে পারতো, তবে আমরা এখানে থাকতাম না; সেই পশুরাই জগতে আধিপত্য বিস্তার করতো। অহংবোধ একটি চমৎকার নতুন উপাত্ত, আধুনিক ভৌতবিজ্ঞান এখনো পর্যন্ত এ বিষয়ে মাথা ঘামায় নি। বিজ্ঞান বাহ্য জগৎ নিয়েই ব্যস্ত ছিল। সেদিকে অনুসন্ধান চালিয়ে, তার অন্তরে নিহিত শক্তি উন্নততর সভ্যতা গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছে। এই পর্যন্তই তাদের উন্নত চিন্তা। এখন চিন্তার যত অগ্রগতি হয়েছে, অনুসন্ধানের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে মানবসত্তা, আর সেই নিগূঢ় উপাত্ত, অহং বা 'আমি'। এর অর্থ কী? পশুর মধ্যে এটি ছিল না, এমনকি সদ্যোজাত শিশুর মধ্যেও এটি নেই। শিশুর বয়স প্রায় দুই / আড়াই বছর হবার পরেই দেখা যায়, সে বলছে, 'আমি' 'আমি' এটা চাই, ওটা চাই।' ততদিন পর্যন্ত সে বলে, 'এ এটা চায়, এ ওটা চায়।' কিন্তু একটা সময় আসে, যখন শিশুর মধ্যে 'আমি'র সামান্য বিকাশ দেখা যায়। এটি এক নতুন গূঢ় উপাত্ত, যা বর্তমান পাশ্চাত্য স্নায়ুবিদ্যায় উপলব্ধ হচ্ছে, যেমন আমরা ভারতে বেদান্তের মাধ্যমে বহুদিন পূর্বেই উপলব্ধি করেছিলাম এর গূঢ় তাৎপর্য। বেদান্তে একে এক প্রাথমিক উপাত্তরূপে ধরে নেওয়া হয়; এটা এর পরিণত অবস্থা নয়; কেবল অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে মাত্র; আধ্যাত্মিক উন্নতির এখনও অনেক বাকি। এর মধ্যেই রয়েছে *আত্মজ্ঞানে* উন্নীত হওয়ার সমগ্র বিষয়টি; আর এ থেকেই এসেছে গীতায় বর্ণিত কর্মে পরিণত বেদান্তের সামগ্রিক শিক্ষা। সুতরাং বিষয়টিকে একটি নিগূঢ় প্রসঙ্গ রূপে বিবেচ্য, আর এটা আনন্দের বিষয় যে বিগত ৫০ থেকে ৭০ বছর যাবৎ পাশ্চাত্যদেশ এই অহংবোধ ও তার সম্ভাবনার মতো বিস্ময়কর বিষয়ের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছে। এই বিষয়টি বেদান্তের এক ক্ষীণ প্রতিধ্বনিরূপে অভিব্যক্ত হয়েছে, ১৯২০

দশকে H.G.Wells, G.P. Wells এবং Julian Huxley লিখিত *The Science of Life* (জীবনের বিজ্ঞান) নামে একটি গ্রন্থে। সেখানে ৮৭৫-৭৯ পৃষ্ঠায়—ক্রমবিকাশে অহংবোধের স্থান নিয়ে একটি চমৎকার অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ঃ 'নিঃসঙ্গ অবস্থায়, নিস্তব্ধ নিশীথে এবং অসংখ্য চিন্তামগ্ন মুহূর্তে, আমরা সাগ্রহে জানতে চেয়েছি—এই আত্মা যিনি আমার বিশ্বের কেন্দ্রে এত সুস্পষ্টভাবে অবস্থিত, যিনি আকুল আকাঙ্ক্ষাপরবশ হয়ে বিশ্ববৈভবের প্রতি একান্ত অধিকার-সচেতন, সেই আত্মা কি কখনো বিলীন হতে পারে? আত্মাকে বাদ দিয়ে নিশ্চয়ই কোন জগৎ থাকতে পারে না। তবু এই চেতন আত্মার মৃত্যু ঘটে রাত্রে যখন আমরা নিদ্রা যাই এবং যে সব স্তরের ভেতর দিয়ে একটু একটু করে এগিয়ে আমরা নিজ অস্তিত্বের চেতনায় পৌঁছই, সেগুলিকে আমরা খুঁজে পাই না। মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন (যা তার অহংবোধের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত থাকে) হয়তো প্রাকৃতিক বহুবিধ কার্যপদ্ধতির মধ্যে এমন এক পদ্ধতি, যা একদিকে বেশ সুবিধাজনক একটা আপাত ভ্রান্তি, অন্যদিকে যার কৌশলগত মূল্য অপরিসীম।

'মানুষের কাছে বিশ্বের ছবি যত বেশি বুদ্ধিপ্রখর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে, ব্যক্তি জীবনের ওপর তার গভীর মনোযোগ তত বেশি অসহনীয় হয়ে উঠে তার চূড়ান্ত পরিহারই শেষ পর্যন্ত অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে।

'সে তার অহংবোধ থেকে নিষ্কৃতি পায় (এক বৃহত্তর সত্তায়) এই লয়ের মাধ্যমে (তার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে, তার অংশীদার হয়ে) এবং এই সংহতিতে এক নৈর্ব্যক্তিক অমরত্ব লাভ করে, তার ক্ষুদ্র স্বরূপকে এক বৃহত্তর স্বরূপে বিলীন করে দিয়ে। এটাই হলো ধর্মীয় মরমিয়াভাবের অনেকটা অংশেরই সার এবং এটা লক্ষণীয় যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জৈব বিশ্লেষণ আমাদের মরমী সাধকদের কতটা কাছে নিয়ে আসে। এই দ্বিতীয় চিন্তাধারায় স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নিজেকে (আপন ক্ষুদ্র সত্তাকে) হারিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে (বৃহত্তর সত্তায়)। মরমিয়া শিক্ষায় তিনি দেবতার মধ্যে আপনাকে হারিয়ে ফেলেন, আর জীবনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় তিনি নিজের রাম, শ্যাম, যদু, মধুর নামরূপকে ভুলে নিজের ব্যাপক মানুষরূপটিকে আবিষ্কার করেন। ... পাশ্চাত্যের মরমিয়া সাধক এবং প্রাচ্যের ঋষি আধুনিক বিজ্ঞানে ও ব্যবহারিক নৈতিকতার দৈনন্দিন শিক্ষার মধ্যে তাঁদের অনুকূলে একটা জোরালো সমর্থন পান; উভয়েই উপদেশ দেন যে ক্ষুদ্রসত্তাকে বশীভূত রাখতে হবে এবং ঐ সত্তার প্রয়োজন পদ্ধতিগত, উদ্দেশ্যমূলক নয়।'

অহংবোধের 'এক কৌশলগত মূল্য আছে ক্রমবিকাশে। এ হলো এক আপাত ভ্রান্তি', একে শেষ পর্যায় ভেব না। এর উচ্চতর মাত্রাগুলির আবিষ্কার তোমাকে করতে হবে। উপনিষদ্ এই কাজই করে গেছে বহু যুগ আগে। নিজমাত্রার মধ্যেই এ যাতে গড়ে উঠতে পারে, সে বিষয়ে একে কীভাবে সহায়তা করা যায়? এই অভিগমন-কৌশলটি আমাদের মনে রাখতে হবে—এই শ্লোকটি বিচার করার সময় ঃ

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥

আমি যদি আমার সদ্যোজাত ক্ষুদ্র অহং-এর স্তরে থাকতে চাই, আর এর উচ্চতর মাত্রায় ওঠার জন্য একটু যত্ন না করি, তবে আমার কাছে এ *শ্লোকের* কোন অর্থই থাকে না, কিন্তু আমি যদি প্রাথমিক উপাত্তের (ভিত্তির) উর্ধ্বতন স্তরের অভিজ্ঞতা পেতে চাই, তবে এই শ্লোকটি মানবসত্তার উচ্চতর মাত্রায় প্রবেশের দ্বার খুলে দেয়। এবং তাই, আমাদের প্রশ্ন করতে হবে ঃ আমার মধ্যে যে অহংবোধ দেখা যাচ্ছে তার স্বরূপ কী? এই অহং-এর মাধ্যমেই আমি বিশ্বকে পেয়েছি; এর মাধ্যমেই আমি এই বিশ্বের কেন্দ্রস্বরূপ। শৈশব থেকেই, আমরা সকলে এই রূপই বোধ করে থাকি। যখন এই অহংবোধ বাড়তে থাকে, তখন শিশুটিই বিশ্বের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। অন্য সব কিছু যেন তাকে ঘিরে নৃত্য করতে থাকে। কিন্তু শীঘ্রই শিশুটিকে তার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিয়ে এতে অন্যদেরও স্থান করে দিতে হয়। ঐ অহংবোধের বিস্তার চাই, বৃদ্ধি চাই, *আত্ম-বিকাশ* বা আত্মানুভূতি লাভ চাই। অহংবোধের প্রাথমিক উপাত্ত বিষয়ে এই সম্পূর্ণ-দর্শন, যা এখন জৈবতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে আছে, তাকে অনন্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পেতে হবে—এই হলো বেদান্তের ঘোষণা।

বিবেকানন্দের বেদান্ত ও আধুনিক জড়বিজ্ঞানের সম্বন্ধ নিয়ে রোমাঁ রোলাঁ তাঁর *Life of Vivekananda* (১৫শ পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৭, পৃঃ ২৬২-৬৩) গ্রন্থে বলেছেন ঃ

'কিন্তু এটি তাঁর (বিবেকানন্দের) শান্ত অহমিকার কাছে ছিল উপেক্ষণীয় বিষয়, কারণ যেহেতু তাঁর ধর্ম বস্তুবিজ্ঞানকে স্বীকৃতি দেয়, বিবেকানন্দ তাঁর ভাবানুযায়ী নির্বাধ ধর্মবিশ্বাসকে বিজ্ঞান গ্রহণ করুক আর না করুক—নিজেকে অনেক বেশি শক্তিশালী জ্ঞান করতেন। সবরকম নিষ্ঠাবান সত্যান্বেষীকে তাঁর দরবারে স্থান দেবার মতো যথেষ্ট উদারতা ওর মধ্যে (তাঁর ধর্মে) ছিল।'

পৃথিবীর অন্য কোথাও এ বিষয়টি এত ব্যাপকভাবে পরীক্ষিত ও ব্যাখ্যাত হয় নি। আর আমরা আনন্দিত যে কিছু কিছু স্নায়ুতত্ত্ববিৎ ও পদার্থ বিজ্ঞানী আজকাল এই বিষয়টি নিয়ে প্রায় একই রকম ভাবে নাড়াচাড়া করছেন এবং ধীরে ধীরে প্রাচীন বেদান্তে এ বিষয়ে যেমন বলা হয়েছে সেই দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। সমুদ্রের একটি পাহাড়ের চূড়াকে সমুদ্র পৃষ্ঠের ওপরে জেগে থাকতে দেখে শিশু বলবে—ওই ওখানে একটি ছোট্ট পাহাড় দেখা যাচ্ছে; কিন্তু তার পিতা বলবেন ওটি একটি জলমগ্ন বড় পাহাড়, ওর বেশির ভাগ অংশটাই জলের নিচে কেবল একটুখানি সমুদ্রপৃষ্ঠের ওপরে দেখা যাচ্ছে। তেমনি, মানবের ইন্দ্রিয়জ দৃষ্টিতে, অহং একটি ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র বস্তু। কিন্তু এর গভীরতা জানলে—এর অনন্ত মাত্রা বিকশিত হবে। এই হলো উপনিষদের শিক্ষা। কেবল সে দিক থেকেই, তুমি এই শ্লোকটিকে ও পরবর্তী আরো অনেক শ্লোককে অনুধাবন করতে পারবে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের "তত্ত্বমসি" উপদেশটিতেও আমরা পাই—তুমি ক্ষুদ্র অহংমাত্র নও। তুমি নিজেকে যে ক্ষুদ্র আত্মা মনে কর, তাও তুমি নও। তুমি সেই অনন্ত চৈতন্যময়, পরমাত্মা। তত্ত্বমসি উপনিষদের একটি গূঢ় উপদেশ, যা Erwin Schrodinger (আরউইন শ্রোডিঙ্গার) ও J.B.S Haldane (জে.বি. এস হ্যালডেন) এর মতো পাশ্চাত্যের পরমাণু বিজ্ঞানী ও জীব বিজ্ঞানীদের মনকে আকর্ষণ করেছে, এখনও করছে। তাই বলি, এই পটভূমিতে এই শ্লোকগুলি পর্যালোচনা করলে, এর এক নতুন অর্থ প্রতিভাত হয়। আমরা শিশু হয়ে থাকতে চাই না, বড় হতে চাই। এই অহংবোধ শিশুর মতো; এ কেন সর্বদা শিশুর মতো হয়ে থাকবে? অহংবাদীদের কোন কোন ভাষা শিশুদের কথার মতো। দেখা যায় প্রত্যেক সমাজে, বড় বড় লোকও সব সময়ে 'আমি', 'আমি', 'আমি' করে। তারা বোঝে না—তাদের আপন সত্তার উচ্চতর মাত্রাগুলিকে। তারা এর ক্ষুদ্র প্রাথমিক উপাত্তকেই জেনে রেখেছে। যা তার নিজের এবং অন্যেরও প্রচুর চাপ ও যন্ত্রণা সৃষ্টি করে। অতএব, প্রায় আড়াই বছর বয়স থেকে আমাদের মধ্যে যে অহংবোধের প্রকাশ দেখা যায় তার অনন্ত মাত্রাটির বিষয় আমাদের অনুসন্ধান করা দরকার। এইটিই হলো *আত্মজ্ঞান* বা *অধ্যাত্ম-বিদ্যার* বিষয়; একে ভিত্তি করেই শ্রীকৃষ্ণ প্রতিটি মানবের প্রয়োজনে একটি জীবন ও কর্ম দর্শন ব্যাখ্যা করছেন। সমগ্র গীতায় কর্মে নিযুক্ত নর-নারীর কথাই বলা হয়েছে, অন্য অধ্যাত্ম গ্রন্থের মতো নয়, যেখানে প্রার্থনা, ধ্যান, পূজা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উৎসবাদিতে নিযুক্ত নর-নারীর বিষয় আলোচিত

হয়েছে। কিন্তু এই মহান গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু হিসেবে, যে কোন কর্মে নিযুক্ত নর-নারীর আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন ও সাফল্য লাভের বিষয়টিকে বিশদভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে; আর এই ধরনের লোকই হলো জগতে সংখ্যাগরিষ্ঠ। প্রত্যেক লোকই প্রশ্ন করে, যদি কাজের ফলই না পাই, তবে সে কাজ করার সার্থকতা কী? এমন প্রশ্ন করা ও তার উত্তর খোঁজার জন্য চেষ্টা করা ভাল।

The Science of Life গ্রন্থের শেষের দিকে একটি অংশে আধুনিক জীববিদ্যার দার্শনিক তাৎপর্য নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। যে অংশে অহংত্বের অবাস্তবতার বিষয় আলোচিত হয়েছে, তা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম। সেই কথাগুলি স্মরণ কর ঃ মানুষের অহংত্ব, যাকে বলা হয় তার সত্তা, তা হয় তো *প্রকৃতির এমন একটা কলকাঠি* 'যা একদিকে বেশ সুবিধাজনক একটা আপাত ভ্রান্তি, অন্যদিকে যার কৌশলগত মূল্য অপরিসীম।' সমগ্র সৃষ্টিতে বা ব্রহ্মাণ্ডে অহং-ত্বের নামগন্ধ নেই। সমগ্র পশুজগতেও নেই, কেবল মানুষেই অহংবোধ দেখা যায়। আমরা অজ্ঞানবশত আমাদের অহং-ত্বের এই আপাত ভ্রান্তির ওপরেই আমাদের কাজের পরিকাঠামো গড়ে তুলছি। আমাদের জাগ্রত অবস্থায় এই অহং-ত্ব কত বড়ই না এক শক্তিমান 'আমি'র রূপ ধরে; কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় কোন অহং-ত্ব নেই; তার নাশ হয় এবং পরে তা আবার আপন সত্তার চেতনায় ফিরে আসে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর এক সুন্দর উক্তিতে বলেছেন ঃ কোন শিশু যদি প্রভূত শক্তির অধিকারী এমন কোন নর বা নারীর নিদ্রিত অবস্থায় তার মুখে থু থু দেয়, তবে সে তার কোন প্রতিবাদ করে না। তারপর গ্রন্থকারগণ বলেন, এ যেন অনেকটা বিজ্ঞান যাকে বলে অসংস্রব, বিষয়মুখীনতা। মনে কর, তুমি কোন বিষয়ের সত্যতা উদ্‌ঘাটন করতে চাও, তোমাকে অনুসন্ধানের ব্যাপার থেকে এই অহংবোধ সরিয়ে নিতে হবে। অহংবোধ থাকলে বিষয়-বিচারে ভুল থেকে যাবে। ঐ কাজ থেকে নিজেকে অবশ্যই সরিয়ে নিতে হবে। তখনই কেবল বৈজ্ঞানিক, অর্থাৎ বাস্তবানুগ বিচার সম্ভব। আদালতে বিচারককে সঠিক বিচার করতে হলে, নিজ অহংবোধকে অবশ্যই সাময়িকভাবে সরিয়ে রাখতে হবে। তাই, জীবনের অনেক ক্ষেত্রে, আমাদের বলা হয়—অহং-ত্বটিকে সরিয়ে রাখতে; অহং-ত্ব অসত্য, ওটি আমাদের প্রকৃত স্বভাব বা মর্যাদাসূচক নয়। কিন্তু তুমি অহং-ত্বের বাহ্যরূপ ভেদ করে গভীরে গিয়ে এর মূলে পৌছুতে পার। তাই হলো অসীম আত্মা। সকলের সঙ্গে ঐ একই আত্মা বিরাজ করছে। আমাদের মধ্যে যে সত্য আত্মা, সেই একই আত্মা রয়েছেন সকলেরই মধ্যে। তুমি আমি সব এক। যখন যিশুকে প্রশ্ন করা হয়, 'ঐশ্বরিক নির্দেশের মাধ্যমে

কী শিক্ষা আমরা পাই?' তিনি দুটি বিষয় বলেন, 'তুমি সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে, সম্পূর্ণ মন ও হৃদয় দিয়ে তোমার ঈশ্বরকে ভালবাসবে।' তাই হলো প্রথম ও শ্রেষ্ঠ নির্দেশ। দ্বিতীয়টিও প্রথমটির মতো, আর তা কী রকম? 'তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো করে ভালবাসবে।' এই দুটি বিষয়কে অবলম্বন করেই রয়েছে সব নিয়মাবলী ও সকল পয়গম্বরের অস্তিত্ব। এটি মানবজীবনের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মাত্রার একটি সুন্দর সংক্ষিপ্তসার। জার্মান দার্শনিক ও একজন বৈদান্তিক পণ্ডিত, পল ডয়সন, ভারত ভ্রমণের পর মুম্বাইতে ১৮৯২ খ্রিঃ বলেছিলেন ঃ 'প্রতিবেশীকে নিজের মতো করে ভালবাস'—এ এক মহান উক্তি। যদি প্রশ্ন করা যায়, কেন তা করব? বাইবেলে তার উত্তর নেই। তার উত্তর রয়েছে উপনিষদে। তুমি নিজেই তোমার প্রতিবেশী। তোমরা এক। কেবল একটি অনন্ত আত্মারই অস্তিত্ব আছে, যা স্পন্দিত হচ্ছে আমার মধ্যে, তোমার মধ্যে, এই জগৎ-সংসারের সব কিছুর মধ্যে।

অতএব, জন্মসূত্রেই সীমায়িত এই যে অহং-ত্ব, যার ধারণা হলো সূর্যের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণরত গ্রহগুলিই সমগ্র জগৎ, আর সূর্য হলো তার আপন সত্তা—তার থেকে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, অনুভব করতে হবে আমাদের আসল মাত্রাটিকে। তা করতে হলে এই অনাসক্তি একান্তই প্রয়োজন। এই অহংভাবের প্রতি আসক্তি ত্যাগ কর; তাই এই গ্রন্থের সবটাই অনাসক্তি শিক্ষা দিয়েছে। এটি একটি নেতিবাচক ভাব বটে, তবে এর সারমর্ম ইতিবাচক ঃ নিম্নতর কিছুকে ত্যাগ করে তুমি উচ্চতর কোন কিছুর প্রকাশ ঘটাচ্ছ। মহাত্মা গান্ধীর গীতা-ভাষ্যের নাম দেওয়া হয়েছে—*অনাসক্তি যোগ,* শারীর-তন্ত্রের কেন্দ্রে যে ক্ষুদ্র অহংটুকু রয়েছে তার প্রতি আসক্তি ত্যাগ করা। কার্যত জীবনে কি এটা সত্য হয় না; এমন কি এক একটি পরিবারের মধ্যে নর বা নারী যে কাজ করে তা কার জন্য? স্ত্রী, স্বামী বা সন্তানের জন্য, তাদের কল্যাণের জন্য, তার নিজের জন্য নয়। আমরা দেখি জীবনের প্রতিটি বিভাগে লোকে ব্যস্ত হয় তার সমাজের, যে সমাজে সে বাস করে, তার জন্য। তার কাছে আমরা ঋণী। সব কিছুই আমাদের নিজের নয়। ব্যবহারিক জীবনে সমাজের সঙ্গে মানুষের একটা সম্পর্ক থাকে। তাই আমরা কর দিয়ে থাকি। আমরা নিয়মমাফিক চালিত সমাজে বাস করি—যেহেতু সমাজের দায়িত্বে একটি সরকার আছে, সে সরকার ন্যায্যভাবেই ট্যাক্স আদায় করে, আর আমরা তা দিয়েও থাকি। তেমনি, আরো অন্য দায়ও রয়েছে। যখন আমরা এই সত্যটি বুঝি তখনই আমরা আমাদের আমিত্বের (সত্তার) বিস্তার ঘটাই। এইটিই হলো আমাদের করণীয় প্রথম কাজ। দেহতন্ত্রের ভেতর যে সত্তাটি আছে তা

কেবল একটি 'সুবিধাজনক আপাত ভ্রান্তি'। যখনই এটিকে সরিয়ে দেবে, তখনই সত্তা সম্বন্ধে তোমার ধারণার বিস্তার ঘটতে শুরু করবে। তুমি অন্য সকলের সঙ্গে আধ্যাত্মিকভাবে একীভূত হয়েছ, এমন অনুভূতি তোমার হতে থাকবে। এইভাবে, আমি যে কাজই করি, তার ফল আমার একার নয়; তা সকলের ওপরই বর্তাবে। এমন অবস্থা হবে, যখন 'আমি'র একটুও কিছু অবশিষ্ট থাকবে না; সব কিছুই তখন 'আমরা' হয়ে যাবে। আমাদের ক্ষুদ্র সত্তা ভূমার মধ্যে হারিয়ে যাবে। আর তারপর লেখকগণ বলেন, মরমী সাধকগণ বরাবর আমাদের এই শিক্ষাই দিয়ে এসেছেন। ক্ষুদ্র সত্তার উত্তরণ অবশ্যই চাই; এতো উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য নয়। ঠিক এইরকমই আধুনিক জীববিদ্যাও আমাদের শেখায়, তুমি নিজেকে আর রাম, শ্যাম, যদু, মধু রূপে ভেব না, নিজেকে মানুষরূপে উপলব্ধি কর, ঐটিই হবে তোমার আসল পরিচিতি, অন্য সব মানব সত্তার সঙ্গে আধ্যাত্মিক ভাবে একীভূত এক সত্তা।

এখন, পরম সত্যের গভীরে অনুপ্রবেশ করলে এই হবে তোমার দৃষ্টিতে প্রাচীন আধ্যাত্মিক প্রবাহ ও নবীন বৈজ্ঞানিক প্রবাহের পারস্পরিক সম্বন্ধ। এই আলোকে দেখলে, তুমি এই হেঁয়ালীপূর্ণ প্রস্তাবনাটির আরো কিছুই জানতে পারবে; প্রস্তাবনাটির চারটি সূত্র ঃ তোমার কাজ করার অধিকার আছে; তার ফলে নয়; ফলের পেছনে ছুটো না; নিষ্কর্মা হয়ে থেকো না। সবরকম কর্মের ফলের ওপর একচেটিয়া একার দাবির, অন্যথায় কাজ না করার প্রবণতায়, ভারত আজ শীর্ষস্থানে। আমাদের সব রকম ধর্মভাব থাকা সত্ত্বেও আমরা সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে একেবারেই অকৃতকার্য হয়েছি। সর্বসাধারণের সম্পত্তিকে বে-ওয়ারিশ সম্পত্তি ভাবা হয়। সাধারণের জলকলের যেন কোন মালিক নেই। আমরা আমাদের নিজের জলকল নিয়েই ব্যস্ত। রাস্তার কল থেকে জল পড়ে অপচয় হলে আমরা তাতে কোন ভ্রূক্ষেপই করি না—কারণ সেটা তো আমার নয়। এই রকম আত্মসর্বস্ব ক্ষুদ্রতা আমাদের জাতিকে গ্রাস করে দুর্বল করে ফেলেছে। গীতার এই শিক্ষার একটুও যদি আমরা গ্রহণ করি, তবে আমাদের জাতির প্রভূত কল্যাণ হবে—আমরা বুঝব যে আমরা যে পরিবেশে বাস করি সেখানে এক সমাজ আছে, আর সেই সমাজের কল্যাণ সাধন করাও আমাদের দায়। একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক হতে গেলেও, আমাদের এই ক্ষুদ্র সত্তার গণ্ডিরও পারে যেতে হবে। ভারতে বাস করাই যথেষ্ট নয়; তুমি ভারতের ও ভারতের জন্য তুমি। তাই শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় অধ্যায়ে (৩, ১৩) বলবেন, 'যে কেবল নিজের জন্য কিছু পাক করে, সে কেবল ততটা পাপকেই

আত্মসাৎ করে'—*ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্তি আত্মকারণাৎ।* যারা সব নিজেদের জন্যই রাঁধে ও খায়—অপরের কথা ভাবে না—তারা ততটা পাপই ভোগ করে।

বুদ্ধ বলেছিলেন, ক্ষুদ্র আত্মা ভ্রান্তি মাত্র। কোন পৃথক আত্মা নেই। পৃথক আত্মায়, পৃথক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে, বিশ্বাসই হলো সকল অশুভের কেন্দ্র। সবরকম স্বার্থপরতা ও ভ্রষ্টাচার, সব রকম হিংসা, সব রকম শোষণ আসে ওই গণ্ডিবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তাই, আমি যখন সমাজের সঙ্গে আমার একাত্মভাব অনুভব করব, তখন আমি কিছুতেই আমার সমস্ত কর্মফলের কৃতিত্ব নিজে নিতে পারি না। 'আত্মা' কথাটি ব্যাপকতর থেকে আরো ব্যাপকতর হয়ে যায়। এই হলো মানবীয় ক্রমোন্নতির লক্ষণ বা মাপকাঠি। ছোট্ট শিশু চায় অন্যেরা সকলে তাকে কেন্দ্র করে ব্যস্ত থাক। সে যা বলবে তোমাকে তা করতেই হবে, কেননা সে যে কেন্দ্রে রয়েছে। শিশুর পক্ষে তা নির্দোষের হতে পারে, কিন্তু বয়স্ক লোকের ক্ষেত্রে তা নয়। অন্যদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানাতে হবে, তাদের ডাকে সাড়া দিতে হবে, তাদের জন্য কাজ করতে হবে, তাদের সাহায্য করতে হবে। সমাজে পারস্পরিক যোগাযোগের কত প্রয়োজন রয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই একটি শিক্ষার ভিত্তিতেই এসব কিছু হয়ে থাকে। কাজ কর, কিন্তু নিজে তার ফলভোগ করো না। এক উচ্চদৃষ্টিভঙ্গি থেকে তুমি কাজ করতে পার। বর্তমান কালে সেই উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের অবশ্যই থাকা দরকার। বস্তুত আমি যা অনেকবার বলেছি, ভারতের সমবায় সমিতিগুলি, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারগুলি আরো প্রভূত সাফল্যমণ্ডিত হবে যদি আমরা গীতার শিক্ষাকে সম্যক বোঝার চেষ্টা করি। যে জিনিস প্রাকৃতিক নিয়মে আমার নয়, তা সকলের, সেগুলির প্রতি আমাদের আরো বেশি যত্নবান হতে হবে। ঐ একটি শিক্ষাই আমাদের সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে পারে। কিন্তু এখন এর বিপরীত কাণ্ডই ঘটে থাকে। যেহেতু এটি আমার নিজের নয়, এ নিয়ে আমাকে ভাবতে হবে না; এ বিষয়ে আমার কোন আগ্রহ নেই। তাই, যতদিন না এরূপ চারিত্রিক উৎকর্ষ আমাদের জনগণের মধ্যে গড়ে উঠছে ততদিন সবরকমের সরকারী (জনগণচালিত) সংস্থাতেই ভরাডুবি ঘটবে, ওগুলি আশানুরূপ ফল দেবে না। কিন্তু যখন এই শিক্ষাটি পাব, তখন দেখা যাবে যে আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রভূত উন্নতি হচ্ছে। কোন ব্যক্তিগত সংস্থা এই রকম সরকারী সংস্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠবে না। ভারতে সমগ্র ব্যাপারটি বিপরীতমুখী। যে দেশেই যাও দেখবে সরকারী স্কুলগুলি সব থেকে দক্ষ; ভারতে, ঠিক তার বিপরীত। বেসরকারী স্কুলগুলি সব

সময়ে দক্ষভাবে চলে, কিন্তু সরকারী স্কুলগুলিতে সর্বদাই দক্ষতার অভাব। কেন এমন হয়? এ বিষয়ে কেউই মাথা ঘামায় না।

তাই, দেখা যায় যে, কাজের প্রতি এই ক্ষুদ্র স্বার্থবোধই সমগ্র জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং আমাদের স্বাধীনতা উওর অগ্রগতিকে দমিয়ে দিয়েছে। আমাদের ইতিহাসের ক্ষেত্রে, 'আমি, আমার ও শয়তান সর্বপশ্চাদ্বর্তী' এই ইংরেজি উক্তিটি পুরোপুরি সত্য। আর আমরাই শয়তানকে ডেকে এনেছিলাম, তাদের দ্বারাই আমাদের জাতি আক্রান্ত হয়েছে, আর আমরা এখন দেখছি ভারতে ওপরতলা থেকে নিচতলা পর্যন্ত শোষণ, দুর্ভোগ, ভ্রষ্টাচাররূপে শয়তানের খেলা চলছে আর সেইসঙ্গে আছে হিংসা। এই পরিস্থিতিকে আমরা কাটিয়ে উঠতে চাই। তাই, এখানে আমরা পাচ্ছি এই গূঢ় উপদেশটি। লোকে এর গভীরে যত প্রবেশ করবে ততই বুঝবে এর অর্থ কী? পরবর্তী শ্লোকে আমরা পাচ্ছি কর্মের ইতিবাচক দিকটি। কর্মফল ত্যাগ করতে বলা তো কেবল নেতিবাচক। কাজের সময় আমাদের কেমন দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া চাই? তাই হলো পরবর্তী শ্লোকের মর্ম।

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

—'হে অর্জুন, *যোগে* দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়ে ঈশ্বরার্থে কর্ম কর—আসক্তি বর্জন করে, ফলাফলের দিকে কোনরূপ দৃকপাত না করে। মনের এই সাম্য ভাবই *যোগ*।'

এখানে *যোগ* কথাটি আবার এসেছে। *যোগ* বলতে কী বোঝায়? *সমত্বম্*-ই *যোগ*। 'মনের সমতা, মন যখন সম্পূর্ণ সাম্যভাবে স্থিত, তাকেই *যোগ* বলে।' কিন্তু সেই অবস্থায়, কাজ করতে গিয়ে ও মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আমি কিরূপ মনোভাব গ্রহণ করব? যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি—'*যোগে* প্রতিষ্ঠিত হয়ে কাজ কর।' পূর্বে অধিগত ঐ *বুদ্ধিযোগই* হলো সেই মনোভাব যাকে অবলম্বন করে কাজ করতে পারলে তুমি খুবই কার্যকর ফল লাভ করতে পারবে। *সঙ্গং ত্যক্ত্বা*, 'আসক্তি ত্যাগ কর'—যার উৎপত্তি হয় ছিন্নাগ্র সত্তা—অর্থাৎ 'ছোট আমি'—থেকে। ঐ আসক্তিকে ত্যাগ করতে হবে; কিন্তু কিভাবে তা যাবে? যখন তুমি এই ছোট 'আমি'কে স্বীকৃতি দেওয়া থেকে বিরত হবে তখনই বড় 'আমি'টা বিকশিত হতে থাকবে। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়—কাঁচা 'আমি' চলে গেলেই পাকা 'আমি' বিকশিত হয়। অতএব, *সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা*, 'সিদ্ধি

অসিদ্ধিতে—সফলতা ও নিষ্ফলতাতে—সমমনা হয়ে।' নিষ্ফলতায় অত্যন্ত দমে যাওয়া, সাফল্যে অত্যন্ত উৎফুল্ল হওয়া—কোনটাই ঠিক নয়, তাই 'মনে সমতা বজায় রাখতে চেষ্টা কর'—*সমো ভূত্বা।*

মহাভারতে (গীতায় নয়), সঞ্জয় নামে, (সিন্ধুদেশের উত্তরাঞ্চলের) এক যুবা রাজকুমারের কথা আছে; সে যুদ্ধে হেরে গিয়ে খুবই দমে গিয়েছিল ও কর্মবিমুখ হয়ে পড়েছিল। জিতলে, সে খুবই গর্বিত হতো। তার মা, বিদুলা ছিলেন এক বীরাঙ্গনা। ঐ মা ছেলেকে বললেন, 'এমন বিমর্ষ হয়ে থেকো না; মানুষের মতো হও, বীর হও। জীবনে বিফলতা আসতে পারে, আবার সাফল্যও আসতে পারে; সেগুলি যেন তোমাকে বেশি প্রভাবিত না করে। তারা সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো। তুমি তাদের ওপরে থাক।' তার পরই বিদুলা অল্প কথায় পুত্রকে এক সুপ্রসিদ্ধ উৎসাহ বাণী দিয়ে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তা হলো ঃ *মুহূর্তম্ জ্বলিতো শ্রেয়ো ন তু ধূমায়িতম্ চিরম্*—'এক মুহূর্তের জন্য জ্বলে ওঠা, চিরকাল ধূমায়িত হয়ে থাকার থেকে ভাল!' প্রত্যেকটি মানবের পক্ষে এ কী, এক মহতী বাণী! বহুকাল ধরে ধূমায়িত হতে থাকায় কী মজা আছে? তার থেকে এক মুহূর্ত দীপশিখা হয়ে জ্বলে ওঠা অনেক ভাল। ইংরেজ কবি, বেন জনসন, ঐ ভাবটিকে এই ভাবে প্রকাশ করেছেন ঃ সৌন্দর্য আমরা কেবল স্বল্পমাত্রাতেই উপভোগ করতে পারি তেমনি জীবনও অল্পেই পূর্ণতা লাভ করে।' এক শঙ্করাচার্য মাত্র ৩২ বছরে এমনই এক তীব্রভাবে সক্রিয় জীবন যাপন করেছিলেন যা ভারতের মতো এক বিশাল দেশের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছিল। এইভাবে, খুবই উদ্দেশ্যপূর্ণ বীরত্বব্যঞ্জক একটি জীবনদর্শনে এই সব ইতিবাচক দিকগুলি থাকে। এইরূপ জীবনদর্শনে 'আমি' ও 'আমার', 'আমি অন্যদের কিছু গ্রাহ্যই করি না'—এই রকম সব সঙ্কীর্ণ মনোভাবের স্থান নেই।

তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেন ঃ *যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি*—'চেতনার *যোগ*-স্তরে থেকে কাজ করে চল।' ওটি এক বিশাল বিষয়, যার মধ্যে বিবৃত রয়েছে এক সম্পূর্ণ ও সামগ্রিক জীবনদর্শন। বর্তমানে পাশ্চত্যে এটি এক অতীব আকর্ষণীয় বিষয়বস্তু। কিন্তু আমাদের চেতনা স্তরকে কিভাবে ওঠান যায়? যাই হোক না কেন, সমস্ত কাজই একটি বিশেষ চেতনা স্তর থেকে উদ্ভূত হয়। যদি এটি অন্য স্তর থেকে আসে, তবে সে কাজের ফলও হয় ভিন্ন। অপরাধপ্রবণ ব্যক্তির কাজ একরকম। তার চেতনাস্তর এক বিশেষ অবস্থায় রয়েছে। একটি উদার প্রকৃতির লোকও কাজ করে। তার কাজের প্রেরণা আসে অন্য এক চেতনা স্তর থেকে।

তাই, এসে পড়ে চেতনাস্তর উন্নয়নের, *বোধ উন্নমন*-এর, বিষয়টি। আজকাল এ বিষয়টি সব দেশের কাছে আকর্ষণীয়। সরকারী দপ্তরের কোন আধিকারিক বা করণিক যদি জনগণের ব্যাপারে উদাসীন হয়, তবে বুঝতে হবে যে তার কাজকর্ম প্রেরণা পাচ্ছে ক্ষুদ্র সত্তার নিম্নস্তর থেকে, যা বংশানুগত পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আধুনিক জীববিদ্যা বলে জিনগুলি স্বার্থপর, সেগুলি কোন মূল্যবোধের উৎস হতে পারে না। অন্য একজন করণিক বা আধিকারিক, যে জনকল্যাণের কাজে আগ্রহী তার প্রতিক্রিয়া হবে—'আমি আপনার জন্য কী করতে পারি? আমি আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?' এইরকম মনোভাব প্রকাশের মাধ্যমে। এই প্রতিক্রিয়া আসে অন্য এক চেতনাস্তর থেকে, যা জিন সংক্রান্ত গঠনতন্ত্রের ঊর্ধ্বে। যে চেতনাস্তর থেকে ইতিবাচক কাজের প্রেরণা, সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধনের প্রেরণা আসে; তাকেই *যোগস্তর* বা *যোগবুদ্ধি* স্তর বলে। তাই বলা হয়েছে, *যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি*—'যোগের মতো সুবিধাজনক অবস্থানে দাঁড়িয়ে কাজ কর।' সেই জন্য *যোগের* দুটি সংজ্ঞার একটি হলো *সমত্বম্ যোগ উচ্যতে*—'যোগের অর্থ হলো সমতা, ভারসাম্য'। প্রতিটি অভিজ্ঞতা মনে ঢেউ তোলে, ছোট বা বড়। ঐ তরঙ্গ-গঠন নিয়ন্ত্রণের শক্তি তোমাদের আছে। সেই শক্তি ব্যবহার করলে তুমি মুক্ত ব্যক্তি, তুমি সত্যই তোমার উচ্চতর মস্তিষ্ক তন্ত্রকে কাজে লাগাচ্ছ। না করলে, তুমি হয়ে পড়লে পরিবেশের দাসস্বরূপ ক্ষুদ্রপ্রাণী। কেউ যদি বলে 'তুমি কাঁদ', আর তুমি কাঁদতে থাকলে। কেউ যদি বলে 'হাস', আর তুমি হাসতে থাকলে। তোমার কোন স্বাধীনতা নেই। এমন হওয়া উচিত নয়। আমি যখন চাইব তখনই হাসব, অন্যের হুকুমে বা পরিবেশের তাড়নায় নয়—এরই নাম স্বাধীনতা। *সমগ্র গীতার শিক্ষাই হলো—মানবিক স্বাধীনতারূপ সত্যের ওপর ভিত্তি করে*। স্বাধীনতা থেকে আমরা আসি, স্বাধীনতার মধ্যেই বেঁচে থাকি, স্বাধীনতাতেই ফিরে যাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, এই হলো বেদান্তের শিক্ষা। তাই এখানে, যখন নানা পারিপার্শ্বিক অবস্থাবিশেষের চাপ মানসিক সাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে বিঘ্ন ঘটায়, তখন সেই সাম্য বজায় রাখার ক্ষমতাই মানবিক মহত্ত্বের, মানবিক শক্তির, যথার্থ পরীক্ষা। এ বিষয়ে বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। বুদ্ধের মতো উচ্চতম স্তর থেকে সমাজে মানবিক মহত্ত্বের সাধারণ স্তর পর্যন্ত, সর্বস্তরেই নানা ধরনের কৃতিত্ব আমাদের নজরে পড়ে। কিন্তু তুমি যে বাহ্যিক সব প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত তা দেখাতে তোমার যে প্রতিটি পদক্ষেপ সেটাই হলো অগ্রগতি, যথার্থ মানবিক অগ্রগতি। এ বিষয়টির ওপর বার বার জোর দেওয়া উচিত।

পূর্বে, আমি আধুনিক স্নায়ুবিজ্ঞানের কথা উল্লেখ করেছি, যেখানে উন্নততর স্তরের স্তন্যপায়ী থেকে মানব পর্যন্ত সকল জীব-শরীরে তাপ-সাম্য বজায় রাখার মতো সামর্থ্যের কথা এবং মানবীয় গঠনতন্ত্রে রক্ত প্রভৃতি উপকরণের উপাদানগত সমতার কথা বলা হয়েছে। সব ব্যাপারে সাম্য বজায় রয়েছে। কাজ করতে করতে এই সমতার কিছু ব্যতিক্রম ঘটলে, আপনা আপনিই সেই সমতা আবার ফিরে আসে। তারই নাম মনুষ্য শরীরের আভ্যন্তরীণ স্থিতি সাম্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা। এ এক আশ্চর্য সাফল্য, তোমার আমার নয়, প্রকৃতির। এ বিষয়ে খ্যাতনামা ফরাসী শারীর-বিজ্ঞানী ক্লড বার্ণার্ড বলেছেন ও আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি ঃ 'মুক্ত জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজন একটি আভ্যন্তরীণ স্থিতিশীল অবস্থার'। তুমি যদি সত্যই মুক্তি চাও, তবে তোমাকে অবশ্যই একটি স্থিতিশীল আভ্যন্তরীণ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সচেষ্ট হতে হবে—সে পরিবেশ এমন হবে না যা বাহ্য শক্তির প্রভাবে কেবলই ওঠানামা করে। সুতরাং ঐ পর্যন্তই তুমি তোমার জীবনের পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হচ্ছ। তাই, আমাদের স্থাপনা করতে হবে এক স্থিতিশীল আভ্যন্তরীণ পরিবেশ। এ অত্যন্ত কঠিন বিষয়, তাই, ইংলন্ডের গ্রে ওয়ালটারের কথার উদ্ধৃতি দেব, যেখানে তিনি ঐ বিষয়টিকে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় আলোচনা করেছেন তাঁর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক স্যার জোসেফ বারক্রফ্টের (The Living Brain p. 17) কথা দিয়ে ঃ

'কতবারই না আমি লক্ষ্য করেছি শান্ত সরোবরের ওপরে নৌকা চলাচলের ফলে সৃষ্ট তরঙ্গগুলিকে, লক্ষ করেছি তাদের সুষম গঠনকে, প্রশংসা করেছি এরূপ দুটি তরঙ্গ শ্রেণীর সংঘাতে গঠিত স্পন্দনশীল নকশাগুলিকে... কিন্তু সরোবরটিকে অবশ্যই পুরোপুরি শান্ত হতে হবে। ... যে আভ্যন্তরীণ পরিবেশের ছন্দগুলি এখনও স্থিতিশীল হয়নি সেখানে ধীশক্তির উৎকর্ষ খোঁজ করা—আর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ আটল্যান্টিক সমুদ্রের উপরিতলে উপলখণ্ডগুলির মধ্যে ছন্দের খোঁজ করা একই কথা।'

ঠিক সেই রকমই, যে মনে এখনও খানিকটা আন্তর স্থৈর্য আসেনি সেই মনে উচ্চ ধীশক্তির উৎকর্ষ আশা করা সম্ভবই নয়। তাই, সব রকম ধীশক্তির উৎকর্ষ, সৃজনমুখী ক্রমোন্নয়ন ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করতে হলে, আগেই দরকার মানসিক গঠন তন্ত্রের স্থৈর্য। *সমত্বম্ যোগ উচ্যতে*—'যা *সমত্বে* অর্থাৎ স্থৈর্যে বা সমতায় প্রতিষ্ঠিত তাই *যোগ*'; সব কিছুই আমার স্থৈর্য নষ্ট করতে চেষ্টা করে, তাই আমাকে অবশ্যই এমন এক গঠন তন্ত্রের উদ্ভব ঘটাতে হবে,

যাতে মনের সমতা আপনা আপনি বজায় থাকে, যেমন শরীরের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তাই শরীরের ক্ষেত্রে প্রকৃতি যে স্বয়ংক্রিয় আভ্যন্তরীণ সমতার ব্যবস্থা করেছে, তার পরিপূরক হিসাবে স্বীয় প্রচেষ্টায় তোমাকে আপন মনের স্বয়ংক্রিয় সমতা রক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। আমাদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে প্রচলিত দুটি মহৎ শব্দ, *শম* ও *দম*, এই আভ্যন্তরীণ সমতা রক্ষার ব্যবস্থাকেই বোঝায়। *শম* হলো মনের সংযম। আর *দম* হলো ইন্দ্রিয়ের সংযম। আমার মধ্যে *শম* ও *দম* কাজ করলে, এই *সমত্ব* সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে *শম ও দম* কথা দুটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ; *দম* হলো দাঙ্গাবাজ ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণে এনে শান্ত হওয়া। আর *শম* হলো ইন্দ্রিয়তন্ত্রের সঙ্গে জড়িত থাকায় বিক্ষিপ্ত হওয়া মনের সংযমন বা শান্ত ভাব ধারণ। এই দুটি ধর্ম সর্বদা পালনের ফলে এই শান্তভাব, *সমত্বম্* স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। এই হলো যোগের প্রারম্ভিক অবস্থা। এতে বিশেষভাবে অসম্ভব এমন কিছুই নেই, ম্যাজিক বলা যেতে পারে তেমন কিছুও নেই, রহস্যমূলকও কিছু এতে নেই; যে কোন মানুষের পক্ষেই এখানে এখনই দৈনন্দিন জীবনে ও কাজে এই যোগ অভ্যাস করে সফল হওয়া সম্ভব। এতে কেবল সন্ন্যাসীরই অধিকার আছে, তা নয়, পরন্তু প্রত্যেকেরই অধিকার আছে। আর স্বামী বিবেকানন্দ একটি মহৎ উপদেশের ওপর বারবার জোর দিতেন তা হলো ঃ শান্ত ধীর স্থির মানুষই সব থেকে বেশি কাজ করে, অস্থির উত্তেজনাপূর্ণ লোকে নয়। তারা হৈচৈ করতে পারে, কিন্তু তাদের কাজ হয় নিরেস। প্রত্যেকেরই এটি শেখা উচিত।

শ্রীকৃষ্ণ এই মহান শিক্ষাই আমাদের দিচ্ছেন। কাজ কর, কিন্তু যে চেতনাস্তর থেকে তোমার কাজের সূচনা হবে তাকেও অনুরূপ হতে হবে, ধীর ও স্থির হতে হবে; একেই বলে, *বুদ্ধিযোগ* বা *যোগবুদ্ধি—যোগে* প্রতিষ্ঠিত *বুদ্ধি*। ঐ অবস্থাই সব কাজের পক্ষে শ্রেষ্ঠ উৎস। এই সব কাজ সব সময়েই ভাল হবে, নিজের পক্ষে, সকলের পক্ষেও, আর তাই আমাদের সাহিত্যে *শম-দম* সদ্‌গুণদ্বয় সদা প্রশংসিত। মহান কর্মবীরগণ, মহান জগৎ-আলোড়নকারী বীরগণ, অন্তরে *সমত্ব*-ভাব না থাকলে সেই সেই বিশেষ লক্ষ্যের দিকে জগৎকে এগিয়ে নিয়ে যাবার মতো প্রচণ্ড শক্তি আকর্ষণে সমর্থ হতেন না। আর তাই, জীবনকে কার্যদক্ষ করে তুলতে আমাদের সকলের পক্ষে যথাসাধ্য এমনকি এক পা এগিয়ে থাকাটাও ভাল; এই *যোগকেই* পরবর্তী এক শ্লোকে 'জীবনে ও কাজে দক্ষতা' বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অতএব এতে কোন যাদু নেই। এই যোগদর্শন থেকে যাদু ও অলৌকিকত্বের ভাবনা মানুষকে অবশ্যই দূর করতে হবে। এ

একেবারেই জাগতিক বাস্তব। একজন মানুষের হাত ধরে ধীরে ধীরে ওঠাও এবং তাকে জীবনের উচ্চতম স্তরে নিয়ে যাও। এই হলো এ দর্শনের কাজ। এর প্রত্যেকটি তত্ত্বই স্বচ্ছ, আর প্রত্যেকটি তত্ত্বই পরস্পর পরস্পরকে জানাতে ও বোঝাতে পারে। যোগ অভ্যাস করা যায়, তবে কঠিন; সব মহৎ কার্যই তো কঠিন, এমন কি একটি ছোট পাহাড়ে ওঠাও কঠিন। কিন্তু বড় সাফল্য যত কঠিন হবে, মানবমনে সেই সাফল্য অর্জনের আহ্বানও তত জোরাল হবে। 'আমি সহজ জীবন চাই না', এই মনোভাব আসা চাই। কেবল তখনই বীরভাবাপন্ন সমাজ গড়া সম্ভব। কোন সহজ জীবন নয়, 'আমি মূল্য দিয়ে ওটি পেতে চাই', দয়ার দান নয়; কী চমৎকার ভাব!

ভারতে, গুরু নানক থেকে গুরু গোবিন্দ সিং—শিখগুরুগণ, আত্ম-নির্ভরতার এই চমৎকার ভাবটি শিক্ষা দিয়েছিলেন। আরামপ্রদ জীবন খুঁজো না, প্রচুর পরিশ্রম কর, ভিক্ষা করবে না। কাজ কর আর রোজগার কর। এই সব গুরুগণের নিকট প্রাপ্ত মহান শিক্ষা জনজীবনে পালনের নির্দেশ যেমন পাঞ্জাবে দেখা যায় তেমন ভারতের অন্য কোন জায়গায় দেখা যায় না। ভারতের রাজনৈতিক দেশ বিভাগের মতো ভয়ানক দুঃসময়েও—পাকিস্তানী পাঞ্জাব থেকে ভারতীয় পাঞ্জাবে ও দিল্লীতে আগত শরণার্থীরা সম্পূর্ণ কপর্দক শূন্য হয়ে এসেও, কেউ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেনি—কেবল কাজ চেয়েছে। এখানেই দেখা যায় গুরুর উপদেশে তারা যেটুকু নিয়মানুবর্তিতা শিখেছিল তা থেকে কত প্রচুর শক্তিই না তারা পেয়েছিল। তাই, *গীতোক্ত* শিক্ষার একটুও যদি কেউ জীবনে পালন করে তবে সমগ্র জাতিই উপকৃত হবে। কালে পৃথিবীর সব দেশের হাজার হাজার লোক এই *গীতার* দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে।

আজই পড়ছিলাম, Tao of Physics নামে বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক, বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ফ্রিজফ কাপ্রা—এক সমালোচককে বলছেন : 'প্রাচ্য চিন্তাধারার প্রতি আমার প্রথম আগ্রহ জাগে *ভগবদ্ গীতা* পড়ে। *গীতার* শিক্ষাই আমাকে এই পথে চালিত করেছে।'

পৃথিবী জুড়ে এত লোক এই Song Celestial বা 'দিব্য সঙ্গীত' (ভগবদ্ গীতা) পাঠ করছে যে, কয়েক দশক পরে দেখা যাবে, এই সব পাঠ, শিক্ষা, এবং তা জীবনে পালন করার ফলে এক উচ্চতর, পবিত্রতর, পরদুঃখে অধিকতর কাতর, আরো বুদ্ধিমান, আরো কর্মদক্ষ এক মানবসমাজের উদ্ভব হয়েছে। এই সব চারিত্রিক মূল্যবোধ ও গুণাবলীর কথা সমগ্র জগতের জনগণের মধ্যে

প্রচারিত হয়েছে গীতার যোগোপদেশের মাধ্যমে। তাই, এই ৪৮ সংখ্যক শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মাধ্যমে সমগ্র মানব সমাজকে বলেছেন ঃ *যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি,* আর *সমত্বম্ যোগ উচ্যতে*। ৪/৫ বছরের শিশুকেও *সমত্ব*ভাবের একটু আধটু শেখাতে হবে। শিশুরা সাধারণত উত্তেজনাপ্রবণ, আর এ বয়সে তা খারাপ নয়, কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের এ মন্ত্রে অভিষিক্ত করতে হবে ঃ 'এবার মনকে শান্ত করতে চেষ্টা কর; সব সময়ে উত্তেজিত হয়ো না'। এর অর্থ, শিশুকে তার নিজ মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং বাহ্য জগতের খেলনার পুতুল হয়ে আর না চলতে শেখানো। এই হলো *শম* ও *দম* কথার অর্থ। বাহ্য জগতের কেউ বলল, তুমি বোকা, আর তুমি অমনি বিমর্ষ ও মন-মরা হয়ে গেলে; যে লোক তোমাকে বোকা বলেছিল, সে মরে ইহজগৎ থেকে সরে গেছে। কিন্তু তুমি মন-মরা হয়ে জীবন যাপন করছ, কেননা কে কবে তোমায় বোকা বলেছিল। এ যেন এক মার্কিন লেখক যেমন বলেছিল ঃ নিজের মনটিকে অন্যের পকেটে পুরে রাখা হলো তোমার পক্ষে সব থেকে দুর্ভাগ্যের কাজ। তাই নিজের মনকে নিজেরই পকেটে পুরে রাখতে শেখ। 'কোন পরিস্থিতিতে আমার মনোভাব কি হবে তা আমিই ঠিক করব'; এ মনোভাব তখনই আসবে যখন মন সেই সমত্বে প্রতিষ্ঠিত হবে। স্যার জোসেফ বারক্রফ্‌ট্‌ বলেছিলেন—সরোবর শান্ত থাকলে—সেই মানস সরোবরে মানবসত্তার আন্তরজীবনে তরঙ্গ-সংহতির চমৎকার ছন্দের সৃষ্টি হয়; তবু, বাহ্য পরিবেশে শান্তি ও সমতা প্রতিষ্ঠিত না হলে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না। তাই, তুমি যদি মহৎ *ব্যক্তি* হতে চাও, তবে তোমাকে এই সব অবস্থায় স্থিতি লাভ করতে হবে, মনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

তোমার প্রথম কাজ হবে মনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা; আর আমরা কদাচিৎ তা করে থাকি। আমরা যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করি—তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখি—কিন্তু মনই হলো বৃহত্তম যন্ত্র; একে সঠিকভাবে পরিচালনা করার চেষ্টা আমরা করি না। আমরা একে নিজের ভাবে চলার সুযোগ দিয়ে থাকি। তাই, গীতায় আমাদের আর একটি শিক্ষা দিচ্ছেন তোমার যন্ত্র নিয়ন্ত্রণে রাখ, কিন্তু মনকেও নিয়ন্ত্রণে রেখো, কারণ সব যন্ত্রের যন্ত্র হলো মন। তবেই তোমাতে একটা মহৎ কিছু ঘটতে পারে। তাই *যোগের* প্রথম সংজ্ঞা হলো ঃ *সমত্বম্ যোগ উচ্যতে* এবং দুটি শ্লোক পরে ৫০ সংখ্যক শ্লোকে আর একটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, যার অর্থ ও তাৎপর্য আরো অনেক ব্যাপক। এর পরের ৪৯ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥

—'বুদ্ধি-যোগে প্রতিষ্ঠিত মনে যে কাজ হয় তার থেকে (কামনার বশে) কাজ অত্যন্ত নিকৃষ্ট। হে ধনঞ্জয়, বুদ্ধির-মানসিক সমতার—শরণ নাও; যারা স্বার্থ সাধনের উদ্দেশে কাজ করে তারা সত্যই দুর্দশাগ্রস্ত।'

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের মাঝখানে এই কটি শ্লোক খুবই পাণ্ডিত্যপূর্ণ, এগুলি সমগ্র মানব সমাজের জন্য এক গূঢ় জীবন দর্শন ঘোষণা করে—বিশেষত এখনই যেটি পড়লাম, সেই ৪৯তম শ্লোকটি, যাতে বলা হয়েছে ঃ *দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাৎ ধনঞ্জয়,* 'হে অর্জুন, নিজ স্বার্থে করা যে কাজ তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট—বুদ্ধিযোগাশ্রয়ে কৃতকর্ম অপেক্ষা'। *বুদ্ধৌ শরণম্ অন্বিচ্ছ*—'বুদ্ধির শরণ নাও। আপন অন্তরে *বুদ্ধির* উৎকর্ষ সাধন কর।' *কৃপণাঃ ফলহেতবঃ*—যারা ফলের জন্য কাজ করে তারা অত্যন্ত ক্ষুদ্রবুদ্ধি, *কৃপণাঃ*—তারা কঞ্জুস, তারা ক্ষুদ্র-বুদ্ধি। কয়েক বছর আগে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব এক জনসভায় এই শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন যে, যদি লোকে এই শিক্ষাটি তাদের জীবনে অনুসরণ করে, তবে জগৎ অধিকতর বাসযোগ্য হয়ে উঠবে। বেদান্তে *বুদ্ধি* এক মহান শব্দ, গীতায় এ কথাটি বার বার এসেছে। বাস্তবিকই, এ হলো যুক্তি- বিচারের মনোবৃত্তি, ভাল-মন্দ তারতম্য করার শক্তি। এই শব্দটিতে একাধারে ধীশক্তি, আবেগ ও ইচ্ছার সংহতি ঘটেছে। মানবসত্তার মন ও ইন্দ্রিয়তন্ত্রকে এই বুদ্ধিই নিয়ন্ত্রণ করে বা তার তা করা উচিত। মস্তিষ্ক তন্ত্রই ঐ *বুদ্ধির* জৈবযন্ত্র। মানব সত্তায় বুদ্ধিবৃত্তি প্রকাশের সর্বশেষ পর্যায়ে গঠিত হয়েছে মস্তিষ্ক তন্ত্র। মস্তিষ্কের কাজ হলো জীবের স্বয়ংক্রিয় ব্যাপারগুলি ছাড়া মানবদেহের অন্য সব অঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মন করা। এ বিষয়টি বুঝে ও একটু অভ্যাস করতে চেষ্টা করলে, যে কোন লোক মানব স্তরে ক্রমবিকাশের লক্ষ্যে পৌঁছবার যন্ত্র হিসাবে আপন অন্তরে বুদ্ধির বিকাশ ঘটাতে পারে। প্রত্যেকের অন্তরস্থ দেহ-মন সংহতির শক্তি-তন্ত্র (মনঃশারীরিক তেজঃপুঞ্জ) থেকেই বুদ্ধি গড়ে ওঠে। আমরা কেবল ঐ শক্তিকেই শুদ্ধায়নের পর, আবার পরিশোধিত করি, তখন তা *বুদ্ধিতে* রূপায়িত হয়।

আমি প্রায়ই মনঃশক্তির পরিশোধনের বিষয়টির কথা বলে থাকি। সব উচ্চমানের চরিত্রের ভিত্তি হলো মনঃশক্তিগুলির পরিশোধন। অশোধিত মনঃশক্তি থেকেই অমার্জিত চরিত্রের উদ্ভব। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এখন ভারতে তৈল শোধন শিল্প রয়েছে, সেখানে অশোধিত তেলকে শোধন করা হয়, তা

থেকে আমরা চমৎকার পেট্রোলিয়ামজাত সামগ্রী পাই। এ থেকে সুগন্ধি দ্রব্যও পাওয়া যায়। অশোধিত তেলের শোধন একান্তই দরকার। ঠিক সেই রকম প্রকৃতি মানুষকে মানবিক কাঠামোর মধ্যেই এক চমৎকার শোধনযন্ত্র দিয়েছেন যার সাহায্যে অভিজ্ঞতাকে শোধন করে নেওয়া যায়। অশোধিত অভিজ্ঞতা যা তুমি গ্রহণ কর তা শোধিত হয়ে নানারকম চমৎকার চরিত্র-জাত বৃত্তিরূপে বেরিয়ে আসে—যেমন প্রেম, করুণা, শান্তি, কর্ম দক্ষতা, নিষ্ঠা। এ বিষয়টি নিয়ে প্রত্যেকটি যুবকের চিন্তা করা ও জীবনে প্রয়োগ করা উচিত। আমার অভিজ্ঞতাকে কীভাবে শোধন করব? আজকাল, সারা পৃথিবীতে শিক্ষা সম্বন্ধে ধারণা ও তার প্রয়োগ ক্ষেত্রে, অভিজ্ঞতার শোধন সম্বন্ধে অতি অল্পই ভাবনাচিন্তা করা হয়। ফলে আমাদের জীবনে যে ক্লেদ দেখা যায়, তা অতীব ভয়ানক। সাধারণ মানবীয় সম্পর্কে, রাজনীতিতে, সর্বত্রই এই ক্লেদ দেখা যায়; শিক্ষা ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তাতে শোধন ব্যবস্থা নেই; মনঃশক্তি আছে, কিন্তু শোধন নেই; আমরা যে দেহ-মনের সংহতিকে অভিজ্ঞতা শোধনের কাজে ব্যবহার করিনি, ঐ ক্লেদই তার ইঙ্গিত। শ্রীকৃষ্ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে সব শিক্ষা আমাদের দিচ্ছেন—সেই সম্পর্কেই এই সব ভাবনা। যেখানে *বুদ্ধি* নেই, সেখানে আমরা জীবনযাপন ও কর্ম করি জীবনের নিচুস্তর থেকে। তখনই আমরা হয়ে পড়ি *ফলহেতবঃ*—'স্বার্থসাধক ফল প্রেরিত'। তখন আমাদের চিন্তায় 'তোমার' বা 'আমাদের' কথার স্থান মোটেই নেই। এর তুলনায় *বুদ্ধি* স্তর থেকে যে সব চিন্তার ও কাজের প্রেরণা আসে—তাতে স্বার্থচিন্তার সঙ্গে অপরের কল্যাণ চিন্তাও স্থান পায়; 'আমি তোমার জন্যে কি করতে পারি?' —এই মনোভাব সেখানে সদা বর্তমান থাকে। এরই নাম *বুদ্ধি-যোগ* বা *যোগ-বুদ্ধি*—যা হলো উন্নত চরিত্র-শক্তির একমাত্র উৎস। তোমার অন্তরস্থ সেই *বুদ্ধি*—আত্মা বা ব্রহ্ম, সর্বান্তরস্থ দিব্যাত্মার নিকটতম বস্তু। আদি শঙ্করাচার্য একে বলেন *নেদিষ্টম্ ব্রহ্ম*—'ব্রহ্মের নিকটতম'। *বুদ্ধিকে* কেবল একটু পেছন ফিরতে হবে—দেখবে অসীম আত্মা সেখানেই বিরাজমান।

কঠ উপনিষদে এক সুন্দর রথের কল্পনা করা হয়েছে। মানব জীবন হলো পূর্ণতার দিকে যাত্রা। সেখানে দু-রকম যাত্রার কথা আছে: বহির্মুখী যাত্রা—যার জন্য শরীর হলো রথ, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব, মন লাগাম আর *বুদ্ধি* হলো সারথি। রথের মধ্যে বসে আছেন আত্মা বা রথস্বামী। এই বহির্মুখী যাত্রারই পরিপ্রেক্ষিতে এক অন্তর্মুখী যাত্রাও আছে—চরিত্র, উচ্চ আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনের জন্য যার প্রয়োজন। এই সুন্দর রথ-কল্পনাটি কঠোপনিষদের তৃতীয়

অধ্যায়ে (১.৩. ৩-৯) আছে। সেই রথ-কল্পনায়, সারথি হলো *বুদ্ধি।* তাঁরই নির্দেশে ইন্দ্রিয়গুলির বা রথের অশ্বগুলির সমস্ত গতিবিধি চলতে থাকে; অশ্বেই নিহিত থাকে সমস্ত গতি-শক্তি। অশ্বগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাই লাগাম; এবং তা অবশ্যই থাকবে একজনেরই হাতে; সেই একজন হলো *বুদ্ধি*। মানসতন্ত্র বা মনই লাগামের কাজ করে। এইভাবে, *বুদ্ধিই* হলো সমগ্র যাত্রার নিয়ন্তা ও নির্দেশক; যা যাত্রার পদক্ষেপ নির্ণয় করে দেয়। অশ্ব নয়, বুদ্ধিই সামনে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পায়, সেই শক্তিকে ইংরেজিতে বলে far-sight বা দূরদৃষ্টি এবং Fore-sight বা ভবিষ্যৎ দৃষ্টি। ইন্দ্রিয়তন্ত্র এই শক্তিদ্বয় থেকে বঞ্চিত। মানসতন্ত্রে সামান্য দূরদৃষ্টি আছে; ইন্দ্রিয়তন্ত্রের থেকে তা কিছুটা ভাল। *বুদ্ধিতে* পৌঁছুলে, আমরা অনেক বেশি মাত্রায় ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ও *দূরদৃষ্টি* লাভ করি। এরই নাম, প্রজ্ঞা। মানব জীবনের নির্দেশনায় ও মানবের নিয়তি বা অভীষ্ট সাধনে বুদ্ধি হলো এক অতুলনীয় যন্ত্র। তাই, এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ *বুদ্ধৌ শরণম্ অন্বিচ্ছ,* 'বুদ্ধির শরণ নাও'; রথ বা অশ্ব বা লাগাম যেন তোমার যাত্রাকে বিপথে নিয়ে না যায়। সেদিকে নজর রেখ। তেমনি মানব তন্ত্রে, দেহ যেন তোমার জীবনের উদ্দেশ্য ঠিক করে না দেয়। ইন্দ্রিয়তন্ত্র, এমনকি মানসতন্ত্রও যেন তা না করে, কিন্তু বুদ্ধিকে দাও তোমার জীবন যাত্রার পথ নির্দেশনার ভার। মন *কৃপণঃ* বা কঞ্জুস। এখানে এর অর্থ—তুমি সামান্য, ক্ষুদ্র, কোন মহৎ কিছু তোমার দ্বারা সম্ভব নয়। তাই, ৪৯ শ্লোকে বংশগত, পেশাগত, দেশগত, সম্প্রদায়গত বা ধর্মগত ভেদাভেদ নির্বিশেষে বৃদ্ধ বা যুবা প্রত্যেক মানুষের—কর্ম ও জীবন সম্বন্ধে এক সুন্দর ধ্যানধারণা পরিবেশন করেছেন। তারা কীভাবে বাস করবে ও কাজ করবে? তার উত্তর আরো বিশদভাবে দেওয়া হয়েছে পরবর্তী শ্লোকে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ যোগের আরো নির্দিষ্ট ও ব্যাপক সংজ্ঞা দিয়েছেন। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক যোগশিক্ষার হৃদ্‌কেন্দ্র-স্বরূপ, যোগের সুন্দরতম ও সংক্ষিপ্ততম সংজ্ঞা।

সমগ্র বেদান্তকে স্যার জুলিয়ন হাক্সলি কর্তৃক উদ্ভাবিত মাত্র একটি বাক্যাংশে বর্ণনা করা যায়। তিনি চেয়েছেন—আধুনিক বিজ্ঞান বর্তমান অবস্থা থেকে গড়ে উঠুক 'মানব-সম্ভাবনা বিজ্ঞান'রূপে; যথা, ভৌত প্রকৃতির সম্ভাবনা বিজ্ঞানরূপে। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা সংগুপ্ত আছে। আমি কেন সব সময়ে দুর্বল ও সহায়হীন হয়ে থাকব? জীবনের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রগুলিতে উন্নয়ন যেন অবশ্যই সমান্তরালভাবে একই সঙ্গে চলতে থাকে। এই সব ভাব দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই সব শ্লোকের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে। আর এসবেরই পটভূমি হলো কর্মরত মানব, প্রার্থনারত বা ধ্যানমগ্ন বা অতীন্দ্রিয়

ভাবাবিষ্ট মানব নয়। অধিকাংশ লোকই হলো কর্মরত। কর্মরত মানুষ হিসাবে, আমি কিভাবে কাজের পরিস্থিতিকে আমার মনের ও হৃদয়ের বিস্তারের জন্য এবং আমার মধ্যে যে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে তা বিকাশ করার জন্য ব্যবহার করতে পারি। এই হলো মানবের প্রকৃত শিক্ষা এবং তাই পরবর্তী ৫০ সংখ্যক শ্লোকে গীতার মর্মবাণী হিসেবে দেওয়া হয়েছে সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ততম ভাষায়। বস্তুত গীতার সমগ্র দর্শনটি যোগের সংক্ষিপ্ততম সংজ্ঞায় এই ৫০তম শ্লোকে অভিব্যক্ত হয়েছে। যাতে বলা হয়েছে ঃ

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০ ॥

—সমত্ববুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত যোগী এই জীবনেই পুণ্য ও পাপ থেকে সমানভাবেই মুক্ত হন; অতএব তুমি সম্পূর্ণরূপে এই *যোগে* আত্মনিয়োগ কর। *যোগই কর্মে দক্ষতা নিয়ে আসে।*

কী সংক্ষিপ্তই না এই সংজ্ঞা! *বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত দুষ্কৃতে*—'আমাদের নিম্নতর জীবনে আমরা যে ভাল মন্দ কাজ করেছি, সেইসব *সুকৃত* ও *দুষ্কৃত* কর্মের দ্বৈতভাবগুলি—দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ।' কিন্তু 'যখন তুমি *বুদ্ধি* স্তরে উঠবে, তখন তুমি এই দ্বন্দ্বের পারে যাবে'—*বুদ্ধিযুক্তো জহাতি ইহ উভে সুকৃত দুষ্কৃতে*। তস্মাৎ, 'তাই' *যোগায় যুজ্যস্ব*—'নিজে এই যোগের দর্শন ও কৌশলের সঙ্গে যুক্ত হও।' সমস্ত মন ও অন্তর দিয়ে এই *যোগে* প্রতিষ্ঠিত হও। তবে, এই *যোগ* কী? শেষ বাক্যটিতে তা বোঝান হয়েছে। *যোগঃ কর্মসু কৌশলম্*। '*যোগ হলো কর্মে দক্ষতা* ও তৎপরতা।' তুমি কাজ করছ, তা খুব ভাল। একাজ যেমন তোমার সাংসারিক কল্যাণ সাধনের উপায়, তেমনি তোমার নিজ আন্তর উন্নয়নের শিক্ষণ-প্রণালীও বটে। এই হলো গীতার শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভারতে বা বিদেশে অন্য কোন ধর্ম গ্রন্থে, আধ্যাত্মিকতার এই রকম সংজ্ঞা পাবে না। এখানে আধ্যাত্মিকতাকে কাজের দক্ষতারূপে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এ কী রকম সংজ্ঞা? এ হলো বাহ্য জগতের কর্মদক্ষতার সঙ্গে আন্তর জগতের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সমবায়।

দক্ষতা একটি বড় কথা এবং আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার এটি একটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব। সব কিছুতেই দক্ষতা চাই, দক্ষ যন্ত্র, দক্ষ কর্মী, দক্ষ পরিচালক, দক্ষ চিকিৎসক ও দক্ষা সেবিকা চাই। শ্রীকৃষ্ণ এই কর্মদক্ষতার ভাবটির ওপরেও জোর দিয়েছেন ঃ স্বল্পতম চেষ্টায় অধিকতম ফলের উৎপাদন। সেখানে আধুনিক

জীবন ও কাজের নানা বিভাগে দক্ষতা দেখা যেতে পারে। একে স্বীকার করে, গীতা তুলে ধরছেন দক্ষতার এক দ্বিতীয় ও উচ্চতর মাত্রা, আমাদের সভ্যতায় আজকের দিনে যার খুবই প্রয়োজন রয়েছে। কাজে দক্ষতার দু-রকম স্তর থাকে। তুমি যখন কাজ কর, তখন তোমার পারিপার্শ্বিক জগতে কিছু পরিবর্তনও তুমি নিয়ে আস। কাজই সেই পরিবর্তন আনে জগতে। তুমি যদি একটা গর্ত খোঁড়, তাতে জগতের কিছু পরিবর্তন হলো; তুমি বাড়ি করলে, তাতে জগতের পরিবর্তন হলো। আর আজ, তুমি এত সব শিল্পাদি গড়ে তুলছ, তাতে তো পরিবর্তন হচ্ছেই—কখনো ভাল, কখনো মন্দ। তোমার কাজের এই একটি ফল; তোমার কাজের ফলে পারিপার্শ্বিক শক্তিগুলির পারস্পরিক অনুপাত পাল্টে যাচ্ছে। আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতা কাজের এই দিকটার ওপর বিশেষ জোর দেয়, আর তা পশ্চিমের দেশগুলিও মেনে নিচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ একটি দ্বিতীয় দিকের ওপরেও জোর দিয়েছেন, আর এ দিকটি আধুনিক সভ্যতায় খুবই উপেক্ষিত হচ্ছে। কর্মদক্ষতার ফলে মানসিক পরিবর্তন কী হয়, এতে তারই উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ কাজের ফলে তোমার মানসিক উন্নতি কিছু হয়েছে কি? মন কি আরো উন্নত, শুদ্ধ ও উদার, হয়েছে? এ কাজের ফলে তোমার সত্য প্রকৃতিকে কী তুমি উপলব্ধি করতে পেরেছ? তা যদি হয়ে থাকে তবে দক্ষতা একটি দ্বিতীয় মাত্রা লাভ করল।

সাধারণ ভাবে আমরা বলে থাকি, কর্মদক্ষতাই হলো প্রথম ধরনের দক্ষতা। ভাল কর্মী, বলিষ্ঠ ও দক্ষ কৃষক, কারখানার শ্রমিক, প্রশাসক, পেশাদারী শ্রেণীর লোক, প্রত্যেককে সমাজের প্রতি নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পাদনে অবশ্যই দক্ষ হতে হবে। দক্ষতার এটি একটি দিক। এর দ্বিতীয় দিকটি অত্যন্ত উপেক্ষিত, আর শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র গীতাতে এর ওপরই জোর দিয়েছেন। দেখ, কয়েক বছরের কর্মদক্ষতার পর তোমাদের কী হয়েছে। তোমাদের কি আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছে? তুমি, তোমার মধ্যে যে ঈশ্বরীয় স্ফুলিঙ্গ রয়েছে, তার কিছু কি উপলব্ধি করেছ? তুমি কি দেহ-মন সংঘাতের এবং এর আকর্ষণ ও চাপের ওপারে যেতে পেরেছ এবং নিজ অন্তরে শান্ত ও স্থির হতে পেরেছ? এই সব গূঢ় প্রশ্নগুলি আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতায় লালিত কিছু লোক জিজ্ঞাসা করছে। মানব সত্তায় কিছু ঘটেছে কি? সে তো ভাল কর্মী। কিন্তু কয়েক বছর দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে সে তো এখন একজন ভগ্নহৃদয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে। বেতনপ্রাপ্তি ও বেতনের দ্বারা আহৃত জান্তব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া, কাজ এই কর্মীর কোন উপকার করতে পারেনি। কর্মীর অন্তর্জীবনের কি হলো? সে কি অন্তরে সমৃদ্ধ হয়ে

শান্ত ও সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে? এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণ গীতোপদিষ্ট যোগের সংজ্ঞা দিয়েছেন—দ্বিমাত্রিক দক্ষতা; কর্মদক্ষতা ও অন্তরের ব্যক্তিক বা চারিত্রিক দক্ষতা। এ দুটিকে অবশ্য পাশাপাশি চলতে হবে। এ দুটিকে পৃথক করলে চলবে না। একই কাজে যদি দুটি মহৎ বস্তু অর্জন করা যায়, তবে কত বেশিই না লাভ হবে আমাদের?

বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে এই দ্বিতীয় স্তরের গুরুত্ব বড়ই দরকার, কারণ, আমরা দেখছি মানুষ দিন দিন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হচ্ছে, অধিকতর মানসিক দুঃখ-কষ্টে, অপূর্ণতা ও আত্মহননাত্মক প্রবণতার শিকার হচ্ছে। এ সবই রয়েছে এই অতি দক্ষ প্রযুক্তিসর্বস্ব সভ্যতায়। মানুষ পরিণত হয়েছে এক পরিবেশোদ্ভূত জন্তুতে, যা হলো সংস্কৃত ভাষায় ইংরাজি Creature শব্দের প্রতিশব্দ। কারণ, আমরা দক্ষতার ধারণায় তার দ্বিতীয় মাত্রাটিকে উপেক্ষা করেছি। গীতা কর্মরত সকলকে নরম সুরে বলছেন—দ্বিতীয় মাত্রার দিকেও যত্ন নিতে। তোমার কর্মক্ষেত্র যাই হোক না কেন, তোমার সৎ, দক্ষ সমষ্টিগত কর্ম দেখিয়ে, তোমার কাজের সঙ্গে সঙ্গে তুমি যেন সমাজে আশীর্বাদ বহন করে আনতে পার, আরো দেখো যেন সেই সঙ্গে তোমার অন্তর্জীবনও গুণগতভাবে সমৃদ্ধ হয় এবং আনন্দে, শান্তিতে, প্রেমে, মানব-হিতৈষণায় পরিপূর্ণ হয়। এই হলো আধ্যাত্মিক সমুন্নতি। আজকাল একে মানব জীবনের গুণগত সমৃদ্ধিও বলতে পারা যায়।

আর এই প্রথম, আধুনিক বিজ্ঞান, বিশেষত বিংশ শতাব্দীর জীব-বিজ্ঞান, মানব জীবনের গুণগত মানের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। আগে পরিমাণের ওপরেই জোর দেওয়া হতো। কিন্তু আজ মানবিক স্তরে ক্রমবিকাশে অগ্রগতিকে প্রতিভাত করতে গুণগত আদর্শের প্রয়োজন আছে। তোমার জীবনে সেই গুণ কী? আমরা বার বার জোর দিয়ে থাকি উৎপাদনের পরিমাণ, ভোগ্য বস্তুর পরিমাণের ওপর। আর সমস্ত কর্মদক্ষতা তার জন্যই। আর এই ভোগের পরিমাণ দিন দিন লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে—জীবনের বিলাসিতার মাত্রাকে পর্যন্ত ছাপিয়ে; উন্মত্ত ভোগবাদ আমাদের পেয়ে বসেছে। এই হলো বর্তমান সভ্যতা। ফলে মানুষ গুণগত ভাবে দিন দিন দরিদ্র হয়ে পড়ছে। কেন? কারণ আধুনিক বিজ্ঞানের অন্তর্দৃষ্টি ইন্দ্রিয়স্তরের পারে যেতে পারছে না। মানব প্রকৃতির অন্তরে পৌঁছয় না। তাই দক্ষতার একটা দিকের ওপরেই জোর দেওয়া হয় এবং অপরটি হয় উপেক্ষিত। ঐ দ্বিতীয় দিকটির প্রতি আধুনিক মন ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হচ্ছে, তারা বুঝছে যে নিজেকে গুণগতভাবে সমৃদ্ধ করার জন্যও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা আছে।

কোন কোন বিজ্ঞানী নিজেরাই আজকাল সাবধান করে দিচ্ছেন। আমি বৃটিশ জীববিজ্ঞানী স্যার জুলিয়ান হাক্সলির কথা বলছি। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে ডারউইন শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে চিকাগো বিজ্ঞান কংগ্রেসে *The Evolutionary Vision* (*ক্রমবিকাশীয় দূরদৃষ্টি*) এর ওপর বক্তৃতায় এই বিষয়টির উল্লেখ করেছিলেন (*Issues in Evolution, Evolution After Darwin* vol.III, p. 259)

'আমরা যদি সত্যসত্যই একবার বিশ্বাস করি যে, মানুষের ভবিষ্যৎ হলো মানবজাতির অধিকতর সাফল্য ও মানবসমাজ কর্তৃক কীর্তির পরিপূর্ণতা অর্জনের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করা, তা হলে প্রথাগত ব্যঞ্জনায় প্রয়োজন বলতে যা বোঝায় তা গৌণ হয়ে পড়ে। দ্রব্য সম্ভারের উৎপাদনের পরিমাণ অবশ্যই কিছুটা দরকার। মাথাপিছু খাদ্য বা পানীয় বা দূরদর্শন যন্ত্র বা কাপড় কাচা যন্ত্রের কিছুটার বেশি থাকা কেবল অপ্রয়োজনীয়ই শুধু নয়, পরন্তু খারাপও বটে। দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ আরো বড় পরিণামে পৌঁছবার উপায় মাত্র, কিন্তু সেইটাই শেষ পরিণাম নয়।'

শ্রীকৃষ্ণ এইরকম অসুবিধার কথা আগেভাগেই বুঝেছিলেন। তিনি নিজেই ছিলেন এক বিরাট কর্মকুশলী। তাই তিনি কয়েক সহস্র বছর আগে এমন একটি দর্শনের উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন, যাতে দক্ষতার দুটি মাত্রাই স্বীকৃতি পেয়েছিল— যেখানে পরিমাণ ও গুণগত মান একই সঙ্গে স্থান পেয়েছিল। দক্ষ কর্মীরা কি শান্তিপ্রিয়? তারা কি পরস্পরের সঙ্গে শান্তি বজায় রেখে বসবাস করে? তারা কি পরস্পরকে সেবা করে? এগুলি সবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। মানব জীবনের গুণগত মানবৃদ্ধির দ্বারাই সমাজ থেকে যুদ্ধ, হিংসা ও অপরাধপ্রবণতা সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব হতে পারে। এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। কিন্তু, ভারতে আমরা আমাদের জীবনে কাজের দিকটাকে উপেক্ষা করছি। বর্তমানে ঐ দিকটার উন্নতি ঘটান বিশেষ দরকার। আমাদের দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপরতার মতো সমস্যা দূর করা সম্ভব নয়, যদি না আমরা কাজ, দক্ষ কাজ ও সংঘবদ্ধ কাজের ওপর জোর দিই; আমাদের জাতীয় চরিত্রে এগুলির সম্যক উন্নতি ঘটান খুবই দরকার। আমরা যখন ভাল কর্মী হব, পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও পরিষেবামূলক কাজকর্ম করতে থাকব, তখনই আমরা গণদারিদ্র্যের সমস্যা সমাধানে সক্ষম হব। আশি কোটি* লোক যদি যথেষ্ট খেতে পায়, উপযুক্ত শিক্ষা পায়, সর্বসুবিধাযুক্ত বাড়িতে বাস করতে পায়, তবে তা হবে একটা চমৎকার উন্নতির

* বর্তমানে শতকোটিরও অধিক।

লক্ষণ। অতএব, পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের দক্ষতা উন্নতিশীল দেশগুলির মধ্যে আমাদের সকলের কাছে এক নিগূঢ় সমাচার, বিশেষত ভারত ও আফ্রিকার কাছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও আমাদের দক্ষতার দ্বিতীয় মাত্রাটিকে উপেক্ষা করলে চলবে না। এখনই আমরা উপেক্ষা করতে আরম্ভ করেছি এবং তার তিক্ত ফলও পাচ্ছি। মানসিক চাপের আধিক্য, স্নায়বিক চাপের প্রাবল্য, ভগ্ন মানসিকতার তীব্রতা—এই সবই আমাদের সাথি হচ্ছে। আমাদের কাছে ধর্ম যেন এখনো কেবল আচার অনুষ্ঠানসর্বস্ব অথবা ঐ কাজের জন্য পুরোহিতকে কিছু দক্ষিণা দানের মধ্যেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। মনের প্রশিক্ষণ না হলে, ঐ সবের দ্বারা কোন উপকার হবে না। সব রকম সুখ ও শান্তি মন থেকে, মনের মধ্যেই আসে; তা বাইরে থেকে আসে না। মনের উপযুক্ত শিক্ষা হলেই, তা প্রশান্ত হয়। অতএব, আমরা যে কাজই করি, সেই সঙ্গেই কাজের অঙ্গ-হিসাবে মনের প্রশিক্ষণ অবশ্যই চালাতে হবে, ভারতে এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ যত্ন নিতে হবে—যদি আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আধ্যাত্মিক গুণগুলিকে বজায় রাখতে চাই।

তাই, ব্যক্তিত্বের দক্ষতা এবং আন্তর দক্ষতার ভাবটি—আজকাল পৃথিবীর সব দেশেই বিশেষভাবে দরকার হয়ে পড়েছে। সোভিয়েট রাশিয়া এই মহান দর্শনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। সেখানে ঐ শিক্ষা দেবার উপযুক্ত লোক নেই। লোকে এই নিগূঢ় বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু। তাই *গীতার* মতো বই সেখানকার বেশি বেশি লোক খুঁজছে ও পড়ছে। আমি নিশ্চিত যে নিজে *গীতা* পড়ে ও সেই শিক্ষা যথাসম্ভব নিজ জীবনে ও কাজে প্রয়োগ করে তারা কিছু ভাল ফল পাবে। *যোগঃ কর্মসু কৌশলম্*, এই বিশেষ উক্তিটি, আধ্যাত্মিক জীবনের এক অনন্য ধরনের সংজ্ঞা, যা মানবের সাংসারিক জীবনের বিরোধী নয়, অথচ দুটি জীবনকে মিলিয়ে নিয়ে চলে। *গীতার যোগ* মানব জীবনের দুটি মাত্রাকে, বাহ্য জীবন ও আন্তরজীবন দুটিকে, মিলিয়ে নিয়ে কাজ করে। বাহ্য জীবন হলো কাজের, আন্তরজীবন হলো আন্তরিক উৎকর্ষ সাধনের। *গীতা* মানবের ধর্ম নিরপেক্ষ জীবন ও ধর্ম জীবনের মধ্যে খুব একটা বিরাট ব্যবধান আছে বলে মনে করে না। ঐ ব্যবধানের ওপর সেতু নির্মাণ করেছেন শ্রীকৃষ্ণ বহু যুগ পূর্বে। অতএব, এই সংজ্ঞা প্রত্যেক চিন্তাশীল মনে, প্রত্যেক যুক্তিবাদী মনে, অজ্ঞেয়বাদীর মনে, এমনকি নাস্তিকের মনেও—যারা 'ধর্ম' কথাটিকে ভয় পায় তাদের মনেও—সাড়া জাগাবে। এ সবের মধ্যে, ধর্ম বলতে সচরাচর যে সব মত বা আচার অনুষ্ঠানাদি বোঝায়, তা নেই। জীবনের এক সমন্বয়ী দর্শন,

জীবন-দর্শন ও আধ্যাত্মিক সাধন, *গীতোক্ত যোগ* থেকে পাওয়া যায়। প্রত্যেক মানুষের উদ্দেশ্যেই এই যোগ। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সকলকেই *যোগী* হতে বলছেন। প্রত্যেকের কানে কানে বলছেন '*যোগী* হও', একথা শুনে আমরা অনেকেই হয়তো ভুল ভাবে মনে করতে পারি, '*যোগী* হওয়া' মানে, আমাদের নিশ্চয়ই কোন বিশেষ ধরনের মানুষ হতে হবে, যারা ঐন্দ্রজালিক বা অলৌকিক কাজ বা ঐরকম কিছু দেখাতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, 'না আমি এগুলিকে উদ্দেশ্য করে বলিনি, একেবারেই সাধারণ জীবনকে উদ্দেশ্য করেই বলেছি। তবে তার সঙ্গে একটু গভীরতা সংযোজন করেছি।' আহা কী সর্বজনীনই না এই দর্শন! তুমি বেঁচে আছ, কাজ করছ, অন্যের সঙ্গে তোমার আদান প্রদান চলছে, আর এ সবের মধ্যে থেকেই—তুমি তোমার মনকে, তোমার হৃদয়কে গড়ে তুলছ। তোমার অন্তরস্থ দিব্য স্ফুলিঙ্গকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করছ। এইভাবে এ সমান্তরাল উন্নয়ন চলতে থাকে, বাহ্যজগতে সামাজিক কল্যাণ ও উন্নয়ন, অন্তর্জগতে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ও তার পরিপূর্ণতা।

এ সব ভাবনার কিছুটা আমাদের কাছে আসছে, আধুনিক জীববিজ্ঞান যা বলছে, মানব স্তরে ক্রমবিকাশের লক্ষ্য ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি, সংখ্যাবৃদ্ধি বা জৈবিক প্রাণধারণের ব্যাপারটাই শুধু নয়। এসব কথা স্যার জুলিয়ান হাক্সলি প্রমুখ বিংশশতাব্দীর জীববিজ্ঞানীদের। মানব-পূর্ব ক্রমবিকাশের স্তরে এগুলিই লক্ষ্য ছিল বটে। প্রত্যেক প্রাণীই ইন্দ্রিয়তৃপ্তি চায়; তার সংখ্যাবৃদ্ধিও চায়; তার জৈবিক প্রাণধারণও দরকার। কিন্তু, বিংশ শতাব্দীতে মানব স্তরে ক্রমবিকাশের এক নতুন লক্ষ্য পাওয়া গেছে। তাকেই হাক্সলি পরিপূর্ণতা বলেছেন; ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি, জৈবিক প্রাণধারণ, সংখ্যাধিক্য—এগুলি সব গৌণ। মুখ্য উদ্দেশ্য হলো পরিপূর্ণতা অর্জন; কী চমৎকার সংজ্ঞা! পরিপূর্ণতা ভাবটির সন্নিবেশ ঘটিয়েই হাক্সলি চয়ন করেছিলেন পূর্বোল্লিখিত এই কথাগুলি ঃ 'ক্রমবিকাশের লক্ষ্য যদি পরিপূর্ণতা, তবে আমাদের দরকার হবে মানব-সম্ভাবনা-বিজ্ঞান নামে একটি নতুন বিজ্ঞানের।' কি এ সম্ভাবনাগুলি এবং সেগুলিকে কাজে পরিণত করা যাবে কিভাবে? পাশ্চাত্যে তা এখন পাওয়া যায় না। কিন্তু ভারতের বেদান্ত পর্যালোচনা করলেই পাওয়া যাবে ঐ সব সম্ভাবনাময় বিজ্ঞানটি এবং জীবনে তার প্রয়োগের কৌশলের সন্ধান। আর তাই এর থেকে সম্যক উপকার পেতে হলে এই *যোগের কর্মসু কৌশলম্,* সংজ্ঞাটির অনুধ্যান করতে হবে সকলকে। শ্রীকৃষ্ণ চুপিসারে সকলের অন্তরে *যোগী* হবার ভাবটির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। মুসৌরীস্থ লাল বাহাদুর শাস্ত্রী প্রশাসনিক শিক্ষা কেন্দ্রে আমি বলেছিলাম *'যোগঃ*

কর্মসু কৌশলম্' বিষয়ের ওপরে, কারণ ভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যক (I.A.S) একেই নীতিবাক্য রূপে গ্রহণ করেছে। কেবল I.A.S-এর জন্য নয়, পরন্তু প্রত্যেকের জনাই এই নীতি। শ্রীকৃষ্ণ সকল সরকারি কর্মচারীকে বলছেন '*যোগী হও*' শিক্ষককে, ডাক্তারকে ও সকলকেই বলছেন '*যোগী হও*'। কিরকম *যোগী?* যেমন সচরাচর দেখা যায় সে রকম সস্তা *যোগী* নয়—যা বাহ্য বেশ ও আকৃতির একটু পরিবর্তন করলেই হওয়া যায় এবং যাদের সহজেই পাওয়া যায়। *যোগী* হলে তোমার মধ্যে অতলান্তিক পরিবর্তন আসবে। তোমার অন্তরস্থ শক্তিগুলির আনুপাতিক হারে নূতনত্ব আসবে। তাই হলো মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি; আর তা কাজের ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে, মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তেমনি হয়ে থাকে। *এর থেকে উজ্জ্বলতর, ব্যাপকতর, আরো বেশি প্রয়োগকুশল বাণী আর কী হতে পারে!*

কঠোর পরিশ্রম কর, তোমার কাজের মাধ্যমে সমাজে সুখ ও কল্যাণ নিয়ে এস। এ কাজ কেবল ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ও পূজাদি অনুষ্ঠান মাত্র দ্বারা সম্ভব নয়। এই ভুল আমরা করেছি। আমরা অনুষ্ঠান উৎসবাদির সহায়তায় বৈষয়িক উন্নতি করতে চেয়েছিলাম। ধনলাভের আশায় লোকে ধনাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করে ও তাঁর সামনে *আরতি* করে। অনেকেই বোকার মতো এই কাজ করতো। যাও কাজ কর। কাজই লক্ষ্মী সৃষ্টি করেন। লক্ষ্মী হলেন দক্ষতাপূর্ণ সহযোগিতাপূর্ণ শ্রমের ফসল। বিগত কয়েক শতাব্দী আমরা এই সত্যটিকে বেমালুম ভুলে গেছিলাম ঃ লোকে কাজ করার পর লক্ষ্মীদেবী প্রতিকৃতির সেবা পূজা করতে পারে। জ্ঞানদায়িনী দেবী সরস্বতীকে না বুঝে, কেবল সরস্বতীদেবীর প্রতিকৃতি পূজায় জ্ঞানলাভ হয় না। এগুলি কেবল প্রতীক উপাসনা, কেবল বছরে একবার পূজার জন্যই প্রতিকৃতি। কঠোর ও ফলপ্রসূ পরিশ্রম করে ও পুস্তকাদি অধ্যয়ন করে ও আপন মননের মাধ্যমে প্রকৃষ্ট ভাবে সুখী হও; এইভাবেই জ্ঞানলাভ হয়। এ শিক্ষা আমরা ভুলেছি। এ শিক্ষা আমাদের নতুন করে লাভ করতে হবে, নতুন করে গ্রহণ করতে হবে। আমাদের লক্ষ্মী-সরস্বতীর প্রকৃত ভক্ত হতে হবে, আধুনিক কালে নতুন পাঠ নিতে হবে—যার ওপর স্বামী বিবেকানন্দ বিশেষ জোর দিয়েছিলেন, তা হলো—লক্ষ্মী হলো সরস্বতীর আরাধনার ফল। তোমার জ্ঞানবৃদ্ধি যত হবে, তুমি ততই ধনবৃদ্ধি করতে পারবে। অজ্ঞতায় ডুবে থাকলে ধনসম্পদ অর্জন করা যায় না। অতএব, প্রথমে জ্ঞানলাভের পথে চল; অর্থাৎ সরস্বতীর আরাধনা কর। তারপর, সেই জ্ঞানকে তোমার পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক শক্তির ওপর প্রয়োগ

কর। তাতেই লাভ হবে ধনসম্পদ, তাই হবেন লক্ষ্মীদেবী। তাঁরা হলেন অতি সুন্দর প্রীতিবদ্ধ দুই ভগিনী। পুরাকালের অভিজ্ঞতায় তাঁরা ছিলেন দুই ঈর্ষাপরায়ণা ভগিনী; লক্ষ্মী এলেই সরস্বতী চলে যান, আর সরস্বতী এলে লক্ষ্মী সরে যান! আমাদের ক্ষেত্রে সেটাই ছিল সত্য। ধনী লোকের জ্ঞান লাভ বেশি নাও হতে পারত, আর জ্ঞানীলোকের বেশি ধনসম্পদ নাও থাকতে পারত। এইরকমই ছিল আমাদের অবস্থা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর প্রকৃত অর্থ না জানার ফলে বর্তমানে আমাদের প্রতি বাড়িতে, প্রতি সমাজে, এই ভগিনীদ্বয়কে ফিরিয়ে আনতে হবে। *প্রথমে* সরস্বতীকে *পরে* লক্ষ্মীকে। তুমি তোমার জ্ঞানকে কাজে লাগাও, লক্ষ্মী লাভ করবে।

আমরা বলে থাকি শুদ্ধ বিজ্ঞান আর ফলিত বিজ্ঞান। অর্থনীতি ও পরিবেশের উন্নতির ফলে, জ্ঞান রূপায়িত হচ্ছে পণ্যে। আজও আমাদের গ্রামের লোক যদি ভাল শিক্ষা, প্রবেশিকা পর্যন্ত না হলেও অন্তত অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পেতো, কতই না উন্নতি হতো সারা ভারতে। প্রকৃত পূজা হলো অধ্যয়ন, গভীর চিন্তা ও কঠোর পরিশ্রম। এগুলিকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে ভারতে। কিন্তু আর্থিক সমৃদ্ধির সঙ্গে যদি আমাদের মনের ও হৃদয়ের দারিদ্র্য আসে, তবে তা হবে দুঃখের ব্যাপার। এই দারিদ্র আমাদের মন ও হৃদয় থেকে দূর করতে হবে আমাদের অন্তরে আধ্যাত্মিক জাগরণ ঘটিয়ে। যারা ভাল কর্মী হয়ে উন্নত চরিত্র, সমাজ চেতনা, সেবা ও আত্মোৎসর্গের মনোভাবের উন্মেষ ঘটাতে পেরেছে তারা হবে যে কোন জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বর্তমানে সারা বিশ্বে বেশি সংখ্যায় এই ধরনের লোক তৈরি করাই আধুনিক *গীতার* উদ্দেশ্য এবং *গীতা* তা করবে; লোকে খুঁজছে এমনই যুক্তিগ্রাহ্য, কার্যকরী ধর্ম, যাতে কোন অলৌকিক কাহিনীভিত্তিক মতবাদ বা যুক্তিহীন গোঁড়ামি ও আচার-আচরণের বাঁধাবাঁধি নেই। অতএব এই সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞাটিকে পর্যালোচনা করতে হবে এবং তা নিয়ে চিন্তা করতে হবে এবং নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে কাজে লাগাতে হবে।

আগেই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ঃ 'এর সামান্যও ভাল ঃ *স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ*। যদি ভারতে উৎপাদনে দক্ষতা শতকরা পাঁচভাগ বাড়ে, তবে আমরা দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপরতা থেকে রেহাই পাব। শ্রীকৃষ্ণ আমাকে *যোগী* হতে বলছেন, কিন্তু আমি তো পুরাপুরি *যোগী* হতে পারব না; সুতরাং আমি যা আছি তাই থাকব; এ মনোভাব ঠিক নয়। শতকরা এক ভাগ হোক, পাঁচভাগ

হোক বা যতটুকু তোমার পক্ষে সম্ভব তুমি ততটুকুই *যোগী* হও। এর সবটুকুই তোমার ও তোমার সমাজের জন্য প্রভূত আশীর্বাদ বহন করে আনবে। এই সত্য আমাদের সব সময়ে মনে রাখতে হবে। সমাজ থেকে সবরকম আলস্যকে দূর করে দিতে হবে; ধর্মের নামে, আমরা অলস হয়ে পড়ি; ধ্যানের অছিলায়, সমাধির অছিলায় শতাব্দীর পর শতাব্দী আমরা আলস্য ও নিদ্রাকে প্রশ্রয় দিয়েছি। *গীতার* মাধ্যমে আমাদের কাছে আসছে উদাত্ত আহ্বান, শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খধ্বনি, আমাদের জাগাবার জন্য। একাদশ অধ্যায়ে (৩৩ শ্লোকে) তিনি বলবেন ঃ *তস্মাৎ ত্বম্ উত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্,* 'অর্জুন উঠে পড়', *তস্মাৎ ত্বম্ উত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব,* 'মানবের প্রাপ্য গৌরব লাভ কর।' প্রত্যেক মানুষের জন্মগত গৌরব রয়েছে। কিন্তু আমরা সেই গৌরব হারিয়ে ফেলেছি, এখন তাকে উদ্ধার করতে হবে *জিত্বা শত্রূন্,* দারিদ্র্য ও পিছিয়ে পড়া ভাব রূপ 'শত্রুকে জয় করে'। আর তারপর, *ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্,* 'আমাদের এই সুন্দর দেশে জীবনকে পুরাপুরি ভোগ কর।' তখন সে রাজ্য কতই না চমৎকার হবে! যখন দেশ দারিদ্র্য ও পিছিয়ে পড়া ভাব থেকে মুক্ত হবে, তখন সেইরকম দেশে বাস করা ও সে দেশের লোকের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান করা সুখপ্রদ হবে। সে পরিবর্তন আসবে, যখন আমাদের জনগণ আরো বেশি সংখ্যায় এই যোগ দর্শনকে কাজে লাগাবে।

স্বামী বিবেকানন্দ এর নাম দিয়েছিলেন, 'কর্মজীবনে বেদান্ত' বা 'প্রয়োগকুশল বেদান্ত'। বেদান্ত এখনো আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে, যাকে বলে চা বা কফির আড্ডায় বসে চর্চা। সারা ভারতে এরকম বেদান্ত চর্চা আমরা করেছি। মহীশূরে থাকাকালীন বাস্তবিকই আমি এরূপ চর্চা লক্ষ্য করেছি। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর অনেকগুলি পণ্ডিত জড় হয়ে বলবে, 'এখন কিছু আলোচনা করা হোক। কোন্ বিষয় ধরা হবে?' একজন বলবে, 'আমাদের কাপড় পরিষ্কার নয়, তাই আমাদের নিজ *সম্প্রদায়* নিয়ে আলোচনা চলতে পারে না; আমরা অন্য *সম্প্রদায়* নিয়ে আলোচনা করব!' এমনই ছিল তাদের মানসিক সঙ্কীর্ণতা, আর এমনি ভাবে মহান বেদান্ত হারিয়ে গেল এইসব কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রথা ও বাকযুদ্ধের জলাভূমিতে। তখনই স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সঙ্গে নিয়ে এলেন, প্রয়োগ কুশল বেদান্তের সিংহগর্জন।

এই প্রথম আমরা জাতীয় স্তরে—আমাদের দেশে এক বৈদান্তিক সমাজ ও সভ্যতা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাচ্ছি, যেখানে জাগতিক কল্যাণ ও আধ্যাত্মিক

উন্নতি একসঙ্গে পাশাপাশি চলবে। এই হলো *গীতার যোগ* দর্শন। এর সমর্থন পাব যখন আমরা *গীতায়* শেষ শ্লোকটি নিয়ে পর্যালোচনা করব, সেখানে সঞ্জয় সমগ্র *গীতার* উপসংহারে বলেছেন, 'যেখানেই শ্রীকৃষ্ণের চেতনা, যেখানেই অর্জুনের চেতনা বিদ্যমান, সেই সমাজেই *শ্রী* অর্থাৎ সমৃদ্ধি, *বিজয়* অর্থাৎ বিরুদ্ধ পক্ষের ওপর আধিপত্য, *ভূতিঃ*, সার্বিক কল্যাণ এবং *ধ্রুবানীতিঃ*, নিত্য ন্যায় বিচার।' মানব জীবন ও নিয়তির দিক থেকে এটি গীতার একটি সুন্দর সার-সংগ্রহ। তাই, আজ আমাদের পূর্ণ উদ্যম দিতে হবে প্রয়োগকুশল বেদান্তের ওপর। তত্ত্ব আমাদের প্রচুর আছে, মণ মণ তত্ত্ব; কিন্তু এক ছটাক অভ্যাসই, মণ মণ তত্ত্বের সঙ্গে তুল্যমূল্য। এই শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। আমরা যেন যথাসাধ্য এই বেদান্তে প্রতিষ্ঠিত জীবন যাপন করি।

স্বামী বিবেকানন্দ তাই কর্মজীবনে বেদান্ত অনুসরণের ওপর বার বার জোর দিয়েছেন। ১৮৯৭ খ্রিঃ মাদ্রাজে এক বক্তৃতার বিষয় ছিল 'বেদান্ত ও ভারতীয় জীবনে তার প্রয়োগ।' কয়েকমাস পরে, লাহোরে এক বক্তৃতায় তিনি আমাদের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে বলছেন ঃ 'মুছে ফেল এই ছুঁৎমার্গের ও জাতিভেদের কালিমা'। আমরা যেন মানুষের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করতে শিক্ষা করি, পশুর মতো নয়। যখন আমাদের লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত নাগরিক বেদান্তের ভাবকে নিজের মধ্যে আত্তীকৃত করে নিতে পারবে, তখনই ভারতে এক আমূল বিপ্লব আসবে তার রাজনীতিক ও সামাজিক কার্যকলাপে। সশস্ত্র বিপ্লবে, কত লোকের জীবননাশ হয়, অথচ শেষে তেমন বেশি উপকার দেখা যায় না। কিন্তু এ ধরনের বিপ্লবে, এই চিন্তাবিপ্লবে, এই দৃষ্টিভঙ্গির বিপ্লবে—উপকার স্থায়ী হবে। সেটাই আমাদের প্রয়োজন। কয়েকটা কাজ করলেই ও কয়েকটি কাজ না করলেই যে ঐ বিপ্লব আসবে, তা নয়। এ যেন ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, রাজনৈতিক কর্মী প্রভৃতি সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আচরণ-বিধি নির্ণয় প্রসঙ্গে আলোচনা। আচরণ-বিধি নিয়ে তোমাদের গোটা শাস্ত্রগ্রন্থ থাকতে পারে। তাতে কি এসে যায়? তুমি যখন আমার দিকে তাকিয়ে আছ, তখন আমি অন্যায় করব না। আর যখন তুমি তাকিয়ে নেই, তখন আমার যা খুশি তাই আমি করব। এই হলো তোমাদের তথাকথিত আচরণ-বিধি। এতে একটু ভাল হতে পারে, যদি এ বিষয়ে আমার ঐকান্তিকতা থাকে। অন্যথায় আমার কাছে ঐ সব ইতি ও নেতিবাচক নির্দেশগুলির মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। আজকাল লোকে যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্বনিন্দুক হয়ে পড়েছে, কোন কিছুর ভাল দিকটা তাদের নজরে পড়ে না। তাই, ইতি বা নেতিবাচক কোন নির্দেশই তোমার

সহায়ক হবে না। কিন্তু, কেউ যদি তার মনের পরিবর্তন ঘটাতে পারে, 'এটিই ভাল পথ' বলে তার স্থির বিশ্বাস হয়, তবে সেই ব্যক্তিতে উচ্চ চরিত্রের উদ্ভব ঘটবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে কাজের পেছনে যে চিন্তা থাকে, তাকে কাজে লাগানো দরকার। তাহলেই, কেবল এই কাজ নয়, পরবর্তী প্রত্যেকটি কাজই, ঐ নতুন চিন্তা অনুযায়ী হবে। অতএব আমাদের দরকার, চিন্তায় বিপ্লব নিয়ে আসা।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন : সারা ভারতে সুস্থ নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক ভাব ছড়িয়ে দাও। তাতেই এক মহান বিকাশ সাধিত হবে। এটাই হলো গীতোক্ত এই যোগের গুরুত্ব। সর্বদা মনে রাখতে হবে যে এটি পুরাপুরি কর্মসাধ্য। এই যোগের সহায়ে আমাদের কাজ ও জীবন নতুন রূপ পায় এবং এরূপ ব্যক্তি সৌন্দর্যে ও গুণে সমৃদ্ধ হয়। আর তাই দেখা যাচ্ছে যে *যোগঃ কর্মসু কৌশলম্* হলো একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞামাত্র। দুটি শ্লোকে পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ যোগের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন : *সমত্বম্ যোগ উচ্যতে,* 'মনের সমতাই যোগ'। দুটি সংজ্ঞাই পরস্পরের পরিপূরক। তবে শেষের সংজ্ঞাটির অর্থ অনেক বেশি ব্যাপক। *যোগঃ কর্মসু কৌশলম্,* এই শিক্ষা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে, কারণ আজকাল আমাদের এমন এক দর্শনের প্রয়োজন যাতে মানবজীবনে সৎগুণাবলীর বিকাশ ঘটে। কেবল উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়ার ফলে বর্তমান সভ্যতায় স্থিতিশীলতা প্রায় বিনষ্ট হতে বসেছে।

পুরোহিতকে কিছু দক্ষিণা দিয়ে ধর্মস্থানে কিছু মন্ত্রপাঠ করালেই ধর্মলাভ হয় না। আমরা অধিকাংশই সেই রকম ধর্মেই বিশ্বাস করে থাকি। ধর্ম সম্বন্ধে ধারণা কতদূর নিচুস্তরেই না নেমে গেছে! হরিদ্বারের মতো জায়গায় যা দেখেছি, তাই নিম্নতম স্তর বলে মনে হয়; ওখানে গিয়ে পাণ্ডাকে পাঁচটি টাকা দিয়ে একটি গাভীর লেজটি ধর—তাতেই তুমি স্বর্গে চলে যাবে। অনেকের কাছে সেটাই হলো ধর্ম। কত নিচুস্তরে আমরা নেমেছি। ফলে *তোমার* কী হয়েছে? কিছুই না, কেবল *পাণ্ডা* পাঁচ টাকা পেয়েছে, আর তুমি গাভীর লেজটি ধরেছ; তুমি যেমন ছিলে তেমনিই আছ, গাভীও তেমনি আছে, পাণ্ডাও তেমনি আছে। কিছুই তফাৎ হয়নি। কিন্তু এই অন্তরের উন্নতি, আধ্যাত্মিক উন্নতি, আধ্যাত্মিক বিকাশ, আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে হচ্ছে, এ বিষয়ে বড় করে দেখাবার কিছু নেই, চটকদার কিছু নেই। আমরা ভেবেছিলাম দর্শনধারী সাধু হব। লোক দেখান সাধু; লোক দেখান সাধুত্ব বলে কিছু নেই। দেখতে অতি সাধারণ, এমন লোকও

বিরাট একজন সাধু হতে পারেন। আমাদের সমাজে এমন সাধুই আমরা চাই। পেশাদারী সাধু আমাদের আছে। ভারতে এদের সংখ্যাই অত্যধিক। কিন্তু সাধুত্ব তোমার মধ্যে বিকশিত হবে সাধারণ নিয়মানুযায়ী স্বাভাবিকভাবে। এইরকম সাধুত্ব আমাদের প্রয়োজন সারা ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা অবস্থায়। অন্যথ্যায় এক বিশাল বটবৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে, আর তাকে ঘিরে রয়েছে ক্ষুদ্র গুল্মাদি; এইরকমই হলো ভারতের দশা—সামনে কয়েকজন বিরাট আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ আর তার চারদিকে রয়েছে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানবক।

যদি কোন সাধারণ নাগরিক তার কর্ম পরিস্থিতিকে ঠিক ভাবে কাজে লাগায়, তাতেই তার আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ঘটবে। এই রকম জীবন চর্যার ব্যাখ্যাই গীতার আঠারোটি অধ্যায় ধরে করা হয়েছে। *গীতায়* যে *যোগের* বাণী প্রচারিত হয়েছে, আমরা তার সূচনায় মাত্র পৌঁছেছি। এখন থেকে আরম্ভ করে, *যোগের* ভাব সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হতে থাকবে, ঠিক যেমন গঙ্গোত্রী থেকে উৎসারিত হয়ে, নতুন নতুন উপনদীর জলধারায় পুষ্ট হতে হতে ক্রমান্বয়ে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর আকারে এলাহাবাদে এসে গঙ্গা এক বিশাল নদীর রূপ নিয়ে পবিত্রতা ও কৃষিকার্যের সমৃদ্ধি স্বরূপিণী হয়েছেন। সেই রকম *গীতার*ও সমৃদ্ধি ঘটেছে অধ্যায়ের পর অধ্যায় যেমন এগিয়েছে, নতুন নতুন ভাব এসেছে, জীবনের নতুন নতুন মাত্রার কথা এসেছে, নতুন মূল্যবোধের ইঙ্গিত এসেছে। বিশেষত *ভক্তির* উত্তাল তরঙ্গ এসেছে একটু পরে। চিত্রপটে *ভক্তিরও* আবির্ভাব হলে *কর্মের* আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। এ ধরনের বিকাশ পরে আসবে। এই তো সবে সূচনা তাই বলা হয় আমাদের চিন্তায় ও দৃষ্টিভঙ্গিতে নূতনত্ব আনতে এই সংজ্ঞাটির মহান ভূমিকা রয়েছে। *যোগ-বুদ্ধি, বুদ্ধি-যোগ*—দুটিই ব্যবহৃত হয়—যে *বুদ্ধি যোগে* প্রতিষ্ঠিত অথবা যে *যোগ বুদ্ধিতে* প্রেরণা যোগায়, তাকেই আমাদের নিয়োগ করতে হবে কর্ম সম্পাদনে ও মানবিক সম্পর্ক নির্ধারণে, ঐ *বুদ্ধিই* তোমাকে নিয়ে যাবে তোমার আধ্যাত্মিক মাত্রায়।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন পাশ্চাত্যে সাফল্যের সঙ্গে চার বছর কাজ করে ভারতে ফিরলেন, তখন তিনি ভারতে জাতি-গঠন ও মানুষ-তৈরির কাজটিকে গড়ে তুলতে মনোনিবেশ করলেন—যার নাম দেওয়া হয় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন। গীতায় যেমন *যোগঃ কর্মসু কৌশলম্* কথাটি পাওয়া যায়, তেমনই একটি সংক্ষিপ্ত আদর্শবাণী ঃ *আত্মনো মোক্ষার্থম্ জগদ্ধিতায় চ*, 'আপন মোক্ষসাধনে ও সেই সঙ্গে জগতের কল্যাণের জন্যও'। জগৎ-কল্যাণ ও নিজের

মোক্ষ—দুটি কাজকে একত্রে করতে থাক। আদর্শ-বাণীর প্রথম অংশে গুরুত্ব না দিলে, আমরা কেবল কাজের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হব, পুরানো হয়ে গেলে যাকে আবর্জনার স্তূপে ফেলে দেওয়া হবে। এই অবস্থা আমাদের হবে। কিন্তু তা হওয়া উচিত নয়। *আত্মনো মোক্ষার্থম্*, তোমাকে মুক্তি থেকে আরও মুক্তির পথে অগ্রসর হতে হবে। তা সম্ভব হবে না, যদি তুমি তোমার কর্মপরিস্থিতিকে অন্তরের দিকে ফিরিয়ে না দাও। তুমি একটি উৎপাদনক্ষম ব্যক্তিমাত্র নও; যন্ত্রও তো একটি উৎপাদনক্ষম বস্তু। কোন কোন যন্ত্র তুমি আমি যা কাজ করি, তার থেকে বেশি কাজ করতে পারে। যখন তুমি কাজ থেকে বিরত হও, তখনও তোমার কিছু মূল্য আছে—তা তোমার অন্তরে, আর সেইটিই তোমার প্রকৃত মূল্য। দেশবাসীকে ওঠাও, জগৎবাসীকে ওঠাও, মানবিক উন্নতির শিখরে। এই তো বাইরের কাজ। এ কাজ করতে করতে, *আত্মনো মোক্ষার্থম্*, আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভ কর। নিজে আধ্যাত্মিক পূর্ণতা অর্জন কর। *গীতায় যোগের* যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাতেই এই নির্দেশ-বাণী নিহিত রয়েছে, আর রয়েছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনে স্বামীজী কথিত আদর্শবাণীতে। এই আধুনিক যুগে পুরাতন গীতা থেকে কি চমৎকারই না এক নতুন বাণী বেরিয়ে এসেছে, নতুন আচার্যদের কাছ থেকে, সর্বজনীন মঙ্গলের জন্য।

যোগ হলো সমগ্র *গীতার* মর্ম কথা। লোকমান্য তিলক তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *গীতা রহস্যে* লিখেছেন, সমগ্র *গীতায় যোগ* ও তদনুরূপ বাক্যের উল্লেখ রয়েছে আশি বারের অধিক। *গীতার* শেষে সঞ্জয়ও ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন, যে ব্যাসদেবের কৃপায় আমার যোগেশ্বর কৃষ্ণের স্ব-মুখে বিবৃত যোগ ব্যাখ্যা শোনার আনন্দময় সুযোগ হয়েছিল। আবার গীতার প্রতি অধ্যায়ের শেষে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে যে এটি যোগশাস্ত্রের বা যোগ-বিজ্ঞানের একটি ব্যাখ্যা ঃ *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে*, 'এই ভাবে, এই *ভগবদ্‌গীতায়*, কৃষ্ণার্জুনের কথোপকথনের মাধ্যমে *যোগ* বিজ্ঞানের অন্তর্গত *ব্রহ্মবিদ্যা* (ব্রহ্মবিজ্ঞান) থেকে সঙ্কলিত, একটি উপনিষদই আলোচিত হয়েছে।'

আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে *গীতায়* সম্পূর্ণ জোর পড়েছে কর্মী মানব-মানবীর ওপর, আর কিভাবে তার কর্ম-পরিস্থিতিকে কাজে লাগানো যায়—নিজের ও জগতের কল্যাণে তার ওপর। কয়েকটি শ্লোকের পর, অর্জুন এই প্রশ্নই জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছেন, যা হলো—স্থৈর্য ও শক্তির স্বরূপ কী? আর শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দেবেন দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষের কয়েকটি প্রসিদ্ধ শ্লোকে। এখন পরবর্তী ৫১ সংখ্যক শ্লোকটি ধরা হচ্ছে ঃ

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১ ॥

—'সমত্ববুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানী কর্মজাত ফল ত্যাগ করে জন্মরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হন এবং সব রকম উপদ্রবের পারে যে অবস্থা, তাই প্রাপ্ত হন।'

কর্মজম্ ফলম্, 'কর্মজনিত যে কোন ফল'; যাদের *যোগ-বুদ্ধি* আছে, তারা ঐ ফলগুলির ব্যবহার জানে। তারা কখনো ঐ ফলগুলি নিজের জন্য ব্যবহার করেন না। *কর্মজম্ বুদ্ধিযুক্তা হি, ফলং ত্যক্ত্বা*—'তারা ফলগুলি মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে ত্যাগ করে'। *মনীষিণঃ*—'জ্ঞানী ব্যক্তিগণ; *জন্মবন্ধ বিনির্মুক্তাঃ*, 'তারা জন্ম ও মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়'। *পদম্ গচ্ছন্তি অনাময়ম্*, 'তারা সমস্ত উপদ্রব থেকে মুক্ত অবস্থা লাভ করে। কখন? এখানে, এই জীবনেই। বেদান্তে ও *গীতায়*—মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে গিয়ে কোন ফলপ্রাপ্তির আশ্বাস দেয় না; পরন্তু বলে এই জীবনেই ফল পাবে, এর সত্যতাও তুমি বুঝবে। এটি করা সম্ভব এবং মানুষে তা করেছে। আমিও তা করতে পারবো। তাই, আমি আমার জীবন ও কাজকে এমন ছাঁচে গড়ছি যে কর্মজ আনন্দ এই জীবনেই আমার আয়ত্তে আসবে। তা হলে গুণমান, যাকে আমি বিংশ শতাব্দীর জৈব ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনার মূলবিষয় বলে আগেই উল্লেখ করেছি। আমাদের জীবনে ও কাজে এইটিকেই অর্জন করতে হবে। এই দর্শনই শ্রীকৃষ্ণ এখানে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করছেন।

সব জায়গায়, শঙ্করাচার্য বলেন, *ইহৈব, ইহৈব*—এখানেই এখানেই। সাধারণত ধর্ম আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে কিছু পাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। *গীতা* ও উপনিষদে সে দর্শন শেখান হয়নি। এতে সবই 'এখানে ও এখন'। মানবের সেই অনন্ত স্বরূপ। কখন তুমি তা উপলব্ধি করবে, তা করবে এখানেই। এই ভাবেই মানবজীবনে পরিপূর্ণতা আসে, এই সংসারেই। বলা হয় বুদ্ধ বোধগয়ায় *বোধি, জ্ঞান* লাভ করেছিলেন। আর তাই বেদান্তে ও বৌদ্ধধর্মে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সম্বন্ধে ধারণা খুবই স্বতন্ত্র। তুমি 'একে' পাবে এখানে এবং এখনই। আর শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধের ক্ষেত্রে, এমন কাহিনী পাবে, যেখানে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র, এমনকি স্বর্গস্থ দেবগণ নেমে এসেছিলেন এই দুই মহান ব্যক্তিত্বের আশীর্বাদ পাবার জন্য। যে কেউ ইহলোকে সত্য উপলব্ধি করে, সেই আমাদের বা অন্যদের দেবতাদের থেকে অনেক উন্নততর। মানব-তন্ত্রের মাহাত্ম্য এই যে তার মধ্যে সত্য উপলব্ধি করার মতো জৈব সামর্থ্য সহ দেবত্ব বিদ্যমান। এখানে

ও এখনই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি লাভের মতো বিশিষ্ট কীর্তির সঙ্গে কোন স্বর্গলোকের তুলনা হতে পারে? তাই ৫২তম শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২ ॥

—'যখন তোমার বুদ্ধি মোহাত্মক অবিবেকরূপ কলুষ অতিক্রম করবে, তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত কর্মফল বিষয়ে বৈরাগ্য লাভ করবে।'

অর্জুনকে উপলক্ষ করে আমাদের সকলকেই একথা বলা হচ্ছে। আমাদের মন সদাই বিভ্রান্ত, *যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধিঃ ব্যতিতরিষ্যতি*, 'যখন তোমার মন *মোহের* এলাকা পার হবে' তখন সেই শুদ্ধ মনের স্বচ্ছ চিন্তা আমাদের সাহায্য করবে মোহের সাগর পার হতে। আর তুমি তা করলে, *তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ*, 'তখন তুমি যা শুনেছ ও যা তোমার শোনার সম্ভাবনা রয়েছে, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হবে।' আমি এই বিষয় শুনতে চাই, আমি এ বিষয় জানতে চাই ঃ এই চিন্তায় মন সদাই চঞ্চল। কিন্তু এখন তার অন্ত হবে এবং মানসিক স্থৈর্য আসবে। তোমার বই পড়া বা এটা ওটা শোনার আর দরকার হবে না। তুমি এগুলির পারে চলে গেছ। জিজ্ঞাসু যে গ্রন্থাদির পারে যেতে পারে, বেদান্তে এই ভাবটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই বিষয়টি পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে আরো আলোচিত হবে। ৫৩তম শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

—'নানা মন্তব্য শ্রবণে বিক্ষিপ্ত তোমার চিত্ত যখন পরমাত্মাতে স্থির ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হবে, তখন তুমি আত্মজ্ঞান লাভ করবে।'

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না, 'এখান থেকে এটা ওখান থেকে ওটা শুনে, এ গ্রন্থে এটা ও গ্রন্থে ওটা পড়ে, বিরুদ্ধ ভাবের দ্বন্দ্বে তোমার মন বিচলিত থাকে, কোন শান্তি পায় না। যখন এইরকম পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়, *যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা*, 'যখন তোমার মন স্থির হয়'। নানা বিষয় শুনে ও পড়ে মনে যে চাঞ্চল্য আসে, তাকে অতিক্রম করে তোমার মন যখন স্থির হয়, কোথায়? না, *'সমাধিতে'*। *সমাধি* কাকে বলে? শঙ্করাচার্য বলেন, *অস্মিন্ সমাধীয়তে ইতি সমাধিঃ*, 'যেখানে তুমি প্রতিষ্ঠিত হও, অর্থাৎ তোমার আত্মায়'; তোমার এই অনন্ত আত্মায়। *অচলা*

বুদ্ধিঃ, '*বুদ্ধি* হয়ে যায় *অচলা,* অচঞ্চল স্থির'। আধ্যাত্মিক অগ্রগতির ফলে তোমার এই অবস্থাই হবে। আধ্যাত্মিক বিকাশ, আধ্যাত্মিক উন্নতির মতো ব্যাপারও আছে।

গীতার সমগ্র শিক্ষায় দেখা যায়—আধ্যাত্মিক উন্নতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সাধারণ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে, এই আধ্যাত্মিক উন্নতির ভাবটির ওপর কখনো কোন জোর দেওয়া হয় না। আমরা পুরোহিতকে ৫টি টাকা দিয়ে থাকি। তিনি কিছু অনুষ্ঠান করেন, আর তাতেই আমরা সন্তুষ্ট, কিন্তু আমরা একভাবেই থাকি। আশি বছর বয়সেও, মনের কোন পরিবর্তন নেই, একেবারেই নেই। কিন্তু অধ্যাত্ম বিজ্ঞান—যা *গীতার* অপরনাম—তাতে আধ্যাত্মিক উন্নতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। আধ্যাত্মিক দিক থেকে তোমার কি উন্নতি হচ্ছে? আধ্যাত্মিক দিক থেকে তুমি কি উন্নত থেকে উন্নততর হচ্ছো? তুমি কি আরো বেশি হৃদয়বান হয়েছ? তোমার জীবনে ও কাজে অনন্ত আত্মা কি বিকশিত হচ্ছেন? এই সব হলো আধ্যাত্মিক উন্নতি। আধ্যাত্মিক উন্নতি বিনা, ধর্ম কেবল একঘেয়ে ধর্মীয় আচরণ হয়ে দাঁড়ায়। এতে কোন মঙ্গল হয় না, বরং বহু ক্ষতি হতে পারে। এসবই কেবল গোঁড়ামি ও লোক দেখানো কাজ। আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে বিশেষ মনোযোগ না দিলে, ধর্মানুষ্ঠানে এই সব এসে যায়। জগতের অধিকাংশ ধর্মের ক্ষেত্রেই ঐ একই কথা। বিবেকানন্দ একটি চিঠিতে (C.W. vol.VII, p. 501) লিখেছেন ঃ

> **'জগতের ধর্মসমূহ প্রাণহীন উপহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের চাই চরিত্র।'**

এই দৃষ্টিকোণ থেকে আজ প্রত্যেক ধর্মই নিষ্প্রাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, ধর্মের নামে আমরা যতই দুষ্টামি, খুনোখুনি ও মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করি না কেন, বর্তমানে সেরূপ ধর্মের কোন মূল্য নেই। নরনারীর মধ্যে আধ্যাত্মিক উন্নতি যাতে হয়, সেই দিকে মনোযোগ দেওয়া চাই। শরীরের বৃদ্ধির সঙ্গে, মানসিক উন্নতির সঙ্গে, আধ্যাত্মিক উন্নতিও হয়। তার ওপর বার বার জোর দাও। যোগশক্তি লাভের জন্য তপস্যা চাই। আমাদের ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হবে। এর কোন বাহ্য প্রকাশ নেই, লোক দেখানো কিছু নেই। সরল গৃহকর্ত্রী বা ক্ষেতমজুর, প্রত্যেক লোকেই আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে পারে। এ তাদের জন্মগত অধিকার। সুতরাং জীবনের প্রতি কাজে লোকে আধ্যাত্মিক ভাবকে গড়ে তুলছে, এমনটি হলে—তা হবে এক মহান পরিস্থিতি, যখন আরো অনেকে গীতাকে

যে ভাবে বোঝা উচিত সেই ভাবে বুঝবে, যোগকে যখন সকল দেশের নরনারীর আধ্যাত্মিক উন্নতি ও পরিপূর্ণতারূপে বুঝবে। আমরা যেন আমাদের অনন্ত সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হই। সেই সর্বাধিক সারবান মনোভাবটি আমাদের গড়ে তুলতে হবে—লোকের মন, কাজ ও পরস্পর মানবিক সম্বন্ধ পর্যবেক্ষণ করে। শঙ্কর *সমাধি* কথাটি ব্যাখ্যা করেছেন, *অস্মিন্ সমাধীয়তে ইতি সমাধি* বলে। 'যেখানে মন প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকেই *সমাধি* বলে'। সেটি কী বস্তু? তা হলো তোমার অসীম দিব্যস্বরূপ, আত্মা।

যোগের মাধ্যমে, তুমি উপলব্ধি করবে তোমার আপন সত্য স্বরূপকে। কেমন চমৎকার ভাব! আমরা আমাদের আপন স্বরূপকে জানি না। যখন আমাদের মানসিক বিকার হয়, মানসিক বা স্নায়বিক বিপর্যয় ঘটে, আমরা আমাদের আপন স্বরূপকে হারিয়ে ফেলি। সে সময় আমরা শিশুর মতো ব্যবহার করি। তখন কোন মনস্তত্ত্ববিদ এসে আমাদের আপন সত্যস্বরূপে ফিরিয়ে আনেন। আমরা আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠি। অতএব, আমাদের নিজের জন্য যা মহত্তম কাজ করণীয় তা হলো, আপন স্বরূপে *অবস্থিত* থাকা। তা কীরূপ? আমি আত্মা, আমি অনন্ত, নিত্য শুদ্ধ, নিত্য মুক্ত, নিত্য বুদ্ধ, এই হলো আমার প্রকৃত স্বরূপ। আমি যেন সেই স্তরে উঠি। এখন আমরা এক সম্মোহিত অবস্থায় রয়েছি। আমাদের প্রকৃত স্বরূপ না জেনে আমরা নানা রকম অপকর্ম করে চলেছি। তাই বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যবাসীকে বেদান্ত দর্শন উপহার দিলেন, যার সাহায্যে তারা মানুষকে সম্মোহন-মুক্ত করতে পারবে। মানুষ আগে থেকেই সম্মোহিত হয়ে আছে, আমি কালো, আমি সাদা, আমি নর, আমি নারী, আমি ধনী, আমি নির্ধন—এ সবই তো সম্মোহন। বিবেকানন্দের বেদান্ত মানুষকে তার নিজ সত্য স্বরূপে স্থাপন করে তাকে সম্মোহন-মুক্ত করে। এরই নাম *যোগ*। *তদা যোগম্ অবাপ্স্যসি*, 'তখন তুমি সত্যই যোগে অধিষ্ঠিত হবে'। তাই, শ্রীকৃষ্ণ যখন বিষয়টির কথা তুললেন, অর্জুন প্রশ্ন করার সুযোগ পেলেন। এতক্ষণ অর্জুন কেবল শুনছিলেন। এই অধ্যায়ের গোড়ায়, তিনি কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। এখন আর একটি প্রশ্ন করার সুযোগ পেলেন; আর দেখা যাবে সেগুলি যেন আমাদের সকলের তরফ থেকেই করা হয়েছে। আমরাও ঐ বিষয়ে জানতে চাই।

অর্জুন উবাচ—

'অর্জুন বললেন'—

দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই শেষ অংশে, ৫৪ থেকে ৭২ শ্লোকে, পূর্ণ স্থৈর্য, শক্তি

ও অসীম অনুকম্পা বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। মানব সত্তায় মহান কিছু ঘটেছে। যা কিছু সামান্য ও ক্ষুদ্র তা ধুয়ে মুছে গেছে। সেটি কিরকম অবস্থা? আমরা তাই জানতে চাই। তাই অর্জুন আমাদের সকলের তরফে প্রশ্ন করলেন ঃ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৪ ॥

—'হে কেশব, স্থির বুদ্ধি *সমাধি*মগ্ন ব্যক্তির কী লক্ষণ? এইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞব্যক্তি কিভাবে কথা বলেন, কিভাবে বসেন, আর কিভাবেই বা চলাফেরা করেন?'

স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কীভাবে জীবনধারণ করেন। কিভাবে নড়াচড়া করেন, কথা বলেন এবং আচরণ করেন? এই হলো অর্জুনের মূল প্রশ্ন। বাইরে থেকে তাঁকে তোমার আমার মতো দেখায়; কিন্তু অন্তরে বেশ কিছু প্রভেদ রয়ে গেছে। এ বিষয়টি আমাদের সকলের মনে রাখার মতো। আমরা সকলে বাহ্যত একরকম। কিন্তু অন্তরের উপাদান সামগ্রী ভিন্ন ধরনের। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ঃ কিছু আগেই গণেশ উৎসব হয়ে গেছে; অনেক বাড়িতেই তৈরি হয়েছে সেই মোদক; সুন্দর মেঠাই; যার ভেতরে আছে নারকেল ও তালগুড়, আর বাইরে চালগুঁড়ির আস্তরণ; ভারি সুস্বাদু। এখন এতে তো নারকেল ও তালগুড় আছে। মনে কর ভেতরে ডালের বেসন দেওয়া হলো, তবে ওটি নিম্নমানের মেঠাই হবে। অতএব, বাইরে থেকে দেখতে খুব ভাল; ভেতরে ভিন্ন বস্তু থাকতে পারে। তেমনি, সব মানুষ দেখতে একরকম, কিন্তু অন্তরের উপাদান ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। কেউ হয়তো খুব উদার, সে কেবল ভাবছে কিভাবে সকল মানুষের সুখ হয়, কল্যাণ হয়; বাহ্যত তাকে সাধারণ মানুষের মতোই দেখায়। আর একজন লোক সামান্য ও ক্ষুদ্র, লোককে প্রতারণা করারই চেষ্টা করছে। তাদের দুজনকে দেখতে একরকম, কিন্তু অন্তরে, তারা ভিন্ন। ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শতাব্দীর মহান নাট্যকার ভাসের *অভিমার* নাটকে, একটি শ্লোকে বলা হয়েছে; *প্রাজ্ঞস্য মূর্খস্য চ কার্য-যোগে সমত্বম্ অভ্যেতি তনুঃ ন বুদ্ধিঃ*—'যখন একটি জ্ঞানী লোক ও আর একটি মূর্খ লোক কাজ করে, দৈহিক স্তরে তাদের মধ্যে সমতা থাকে, কিন্তু *বুদ্ধি* স্তরে বৈষম্য দেখা যায়।' এই খানেই আমরা মানুষের চরিত্র বুঝতে পারি। আমাদের অবশ্যই বাহ্য আকৃতির পারে গিয়ে অন্তরে কি আছে তা দেখার মতো শক্তি থাকা চাই। আর তাই, কিভাবে মানুষ প্রজ্ঞাকে স্থির করে, *স্থিতপ্রজ্ঞ* হয়, *স্থিত* মানে 'স্থির', প্রজ্ঞা মানে 'বোধশক্তি', তাকে কিরকম দেখায়; *কা ভাষা?* তার স্বভাব কি রকম? *সমাধিস্থস্য কেশব,* 'যে আত্মায় প্রতিষ্ঠিত

হয়েছে', *স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্?* স্থির বুদ্ধি লোক কি বলে থাকে ঐরূপ লোক কেমন ভাবে বসে বা চলে বেড়ায়? প্রশ্নগুলি সব অর্জুন একটি শ্লোকে করছে। তাই শ্রীকৃষ্ণ এর উত্তর দিচ্ছেন, দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত বাকি শ্লোকগুলিতে।

শ্রীভগবান উবাচ—

শ্রীভগবান বললেন—

এই শ্লোকগুলির প্রত্যেকটি খুবই অর্থবহ। এগুলিতে মানবমনের গভীরতা মাত্রার বিজ্ঞান রয়েছে, যা আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান এখনো জানে না। পৃথিবীর কোথাও মানব মনের এরূপ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন পর্যালোচনা পাওয়া যায় না—মনের গভীরতম দেশ পর্যন্ত, তারপর প্রজ্ঞা পর্যন্ত, কেবল ঐ অনুসন্ধানলব্ধ জ্ঞান নয়। মনের গভীর প্রদেশের পর্যালোচনা পাশ্চাত্যদেশে বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই মাত্র শুরু হয়েছে, ফ্রয়েডের অবচেতন মনের বিশ্লেষণের ভেতর দিয়ে। ঐ পর্যালোচনায় মানবের নিকৃষ্ট চিত্রটি প্রকাশ পেয়েছে। আর পাশ্চাত্যে ঐ বদ্ধ সংস্কার, যাকে ফ্রয়েডীয় মতবাদ বলা হয়, তার থেকে মুক্ত হবার জন্য চেষ্টা চলেছে। ফ্রয়েড যতটা গভীরতা পর্যন্ত পর্যালোচনা করেছিলেন, তা সামান্য, ফলে কেবল কাম, হিংসা ও অযৌক্তিকতাই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু, তাঁর সময় থেকেই কার্ল য়ুঙ ও পরে ম্যাসলো প্রভৃতি আমেরিকাবাসী শিষ্যদের সময়েও চেষ্টা চালান হয়েছে—মানব মনের গভীরে কাম ও হিংসা ছাড়াও অন্য কিছুর সন্ধানে সে কাজ চলেছে। সে কাজ, মানব মনের গভীর অন্তস্তলের তত্ত্ব সম্বন্ধে ভারতের যে অবদান তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। আজকাল মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে একটা সুন্দর মিলনসেতু রচিত হয়েছে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই শ্লোকগুলি প্রভূত তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

—'হে পার্থ, পরমার্থ দর্শনে প্রত্যগাত্মাতেই পরিতৃপ্ত হয়ে, যোগী যখন সমস্ত মনোগত বাসনা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেন, তখন তাঁকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।'

যে অবস্থায় যোগী *স্থিতপ্রজ্ঞ* হয়, সে অবস্থাটি কী? যখন 'আমি এটি চাই, ওটি চাই', অন্তরের এই সব বাসনাকে তিনি বর্জন করেছেন, যখন মন ও হৃদয় এটা ওটা লাভ করার জন্য আর লালায়িত হয় না। জীবনে এমন একটা

পর্যায় আসে যখন মানুষ উপলব্ধি করে যে সামান্য সামান্য এই বাসনাগুলি অনন্ত নিত্যমুক্ত আত্মারূপ তার আপন স্বরূপের তুলনায় অতি তুচ্ছ। কেন আমি ঐগুলির সঙ্গে নিজেকে একাত্মবোধ করব? এইভাবে বুদ্ধিযুক্ত বোধের সহায়তায়—যখন বুঝব যে আমার অনন্ত আত্মার সমমূল্য কিছু নেই, পাঁচ টাকা বা লক্ষ টাকাও নয়, বহির্জগতের অন্য কোন বৃহৎ উপঢৌকনও নয়, তখন আমরা বাসনা জয় করতে পারব। ঐগুলি কিভাবে আমার প্রকৃত স্বরূপের অনন্ত মূল্যমানের কাছে সমতুল্য হতে পারে? এই অন্তরের গভীরে অনুপ্রবেশের জন্য বহুদিনের সাধন সংগ্রামের পর এই জ্ঞান অর্জন করা যায়। শিশুর মতো আমরা বলি 'আমি এটা চাই, আমি ওটা চাই'। শিশু তার আপন স্বরূপ বোঝে না। তাই সে সব সময়ে কিছু খেতে চায়, কিছু কামড়াতে চায়, কিছু খেলনা চায়; শিশু-মন সদাই বহির্মুখ। মন পরিণত হলে, বোঝে এ জিনিসগুলি নিজ প্রকৃত স্বরূপের তুলনায় কিছুই নয়। এটা হবে জীবনের একটা মহান সাফল্য। আজকাল, অবশ্য বহু লোকেরই ধারণা নেই যে, এই অন্তরস্থ আত্মা, আমার এই নিজস্ব অনন্ত মাত্রা, বাহ্যজগতের সমস্ত তুচ্ছ বস্তুনিচয় অপেক্ষা অনেক অনেক বেশি মহীয়ান। কাম-কাঞ্চন, নাম-যশ—এসবের থেকে বহু বহু গুণ বড়; বাসনার প্ররোচনায় আমরা বাহ্য জগতের এই সব জিনিসের পেছনে ছুটি। আর বাসনা হলো মনের বহির্দেশে বিচরণের ফল। আমি আপন অন্তর নিয়ে তৃপ্ত নই, আমি বাহ্য জগৎ থেকে কিছু পেতে চাই। এই ভাবেই বাসনা কাজ করে। কিন্তু বিচারের সাহায্যে, *যোগ* অভ্যাসের দ্বারা, ধাপে ধাপে এগিয়ে আমরা যে মানস-স্তরে এসে পৌঁছাই—তাই এবার আলোচিত হবে।

প্রজহাতি যদা কামান্, মনোগতান্, 'যখন হৃদয়ের সমস্ত *কাম* বা বাসনা দূরীভূত হয়', এইটি হলো একটি ঘোষণা; আর শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে বলেছেন যে কেবল ওতেই তুমি *স্থিতপ্রজ্ঞ* হবে না। 'আমার কোন বাসনা নেই।' এটি একটি বিকারগ্রস্ত রোগীর মানসিক অবস্থা হতে পারে। এতে কোনরূপ আধ্যাত্মিক ভাব নাও থাকতে পারে। তুমি যখন মনোরোগের হাসপাতালে যাও, তখন দেখবে কিছু লোকের কাজে বা কথার সঙ্গে উপদেশের প্রথম ছত্রে—'আমি কিছু চাই না'—এই কথার মিল রয়েছে—যা মনস্তত্ত্বের ভাষায়, একরকম উদাসীন মনোভাব থেকে উদ্ভূত। এ রকম মানসিক রোগী হাসপাতালে দেখা যায় তারা একটি কোণে থাকে, কিছুতেই তাদের যেন স্পৃহা নেই। তারা সব সময়ে আপনাতেই মগ্ন। তারা কি *স্থিতপ্রজ্ঞ?* মোটেই না। তাই, প্রথম ছত্রই যথেষ্ট নয়। আচার্য শঙ্কর বলতে চান যে, এর সঙ্গে আরো বেশি কিছু যোগ

করতে হবে। তাই বলা হয়েছে দ্বিতীয় ছত্রে : *আত্মন্যেব আত্মনা তুষ্টঃ*, 'যে স্বীয় প্রত্যগাত্মাতে আপনি মগ্ন থেকে আনন্দ পায়।' সেই জন্যই সে বলে, আমি কিছু চাই না। এই হলো প্রকৃত বা ইতিবাচক ত্যাগের স্বরূপ। আমার মধ্যে অনন্ত কিছু রয়েছে। এই সব সামান্য জিনিস নিয়ে আমার কী হবে? এসবই তুচ্ছ, এদের কোন মূল্য নেই, শিশুদের খেলনা, ফানুস প্রভৃতির পেছনে ছোটার মতো। বড় হয়ে আমরা বলি, 'আমি শিশু নই, এ সব জিনিস আমার চাই না।' ঠিক তেমনই পরিপূর্ণতার উচ্চতম অবস্থায় মানব মন বাইরের কোন আকাঙ্ক্ষিত যোগ্য বস্তুতে আকৃষ্ট হয় না। কোনরূপ চেষ্টা করে নয়, আপন অনন্ত স্বরূপের জ্ঞান থেকে উদ্ভূত এক চেষ্টাহীন স্বতঃস্ফুরিত কার্যপ্রণালীর সহায়ে। আমি সেই অনন্ত আত্মা। এই সব জিনিসে আমার কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে? এই হলো ত্যাগ—যা স্বভাবজ ও স্বতঃস্ফূর্ত।

আমি, খুব গোড়ার দিকের শতকের এক ক্যাথলিক খ্রিস্টান সন্তের গল্প পড়েছিলাম। তাঁর এক ম্যাজিস্ট্রেট বন্ধু ছিল। ঐ ম্যাজিস্ট্রেট অন্য এক বন্ধুকে বলছিল, 'মরার আগে আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি এই সন্তকে দিতে চাই, ইনি আমার বন্ধু?' সেই লোকটি সন্তকে সে কথা বলে। তখন সন্ত বলেন, 'তিনি কি বলেছিলেন? আমি মরার আগে, আমার সমস্ত সম্পত্তি ঐ সাধুকে দিতে চাই। সে কি ঐ কথা বলেছিল?', 'হ্যাঁ মশায়।' 'সে কি জানে না যে আমি তার আগে ইতোমধ্যেই মারা গেছি?' কেমন সুন্দর প্রকাশ ভঙ্গি! এই সব সামগ্রীর কাছে আমি আগে থেকেই মৃত। এর কোনটি-রই আমার প্রয়োজন নেই। এখন, এই হলো এক স্বাভাবিক অবস্থা। কোন লোককে খোঁচা দিয়ে দিয়ে তার মধ্যে এ বোধ জাগাবার প্রয়োজন নেই। কারণ সেই আগেই এর থেকে বড় কিছু, যথা ঈশ্বরে প্রেম তথা *ভক্তি*, লাভ করেছে। *ভক্তিতে* যে সম্পদ পাওয়া যায় তার সঙ্গে কি পার্থিব সম্পদের তুলনা হয়? তাই, শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তিতে বলা হয়েছে, আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ, 'কেউ আপন অনন্ত আত্মার সান্নিধ্য লাভেই সন্তুষ্ট।' তখনই, *স্থিতপ্রজ্ঞঃ তদা উচ্যতে*, 'এমন লোককে *স্থিতপ্রজ্ঞ* বলা যেতে পারে।' আমার হৃদয় শূন্য নয়। প্রথমে আমি একে সব রকম সীমিত বাহ্য বাসনা থেকে মুক্ত করেছিলাম, কিন্তু আমি একে শূন্য রাখি নি, আমি একে অসীম আত্মায় ভরে ফেলেছি। এরপর আর কোন বাসনা আসতে পারে না।

উপনিষদে এর নানা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, বিশেষত *বৃহদারণ্যক উপনিষদে*, যেখানে '*আপ্তকাম, আত্মকাম, অকাম*' —এই তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

সেখানে তিনটি কথা বলা হয়েছে। প্রথমটির অর্থ হলো 'আমার সব রকম বাসনা পরিতৃপ্ত' কিভাবে? না *আত্মকাম* হয়ে, 'কেবল আত্মাকে উপলব্ধি করে' তখনই ঐ অবস্থা হয়। আর সেই অবস্থাতেই তুমি *অকাম*, অর্থাৎ কামনাশূন্যও হয়ে পড়। প্রত্যেক মানুষের পক্ষে এ অবস্থা-লাভ করা সম্ভব, সঠিক বিচার ও নিজের অন্তহীন, মরণহীন, দিব্য, সত্য স্বরূপের উপলব্ধির মাধ্যমে। আমি এই ক্ষুদ্র দেহ-মন সংঘাত নই। আমি ক্ষুদ্র *প্রাণী* নই। জীবনের সীমাবদ্ধ স্তরেও এ রকম চিন্তা খুবই ফলপ্রদ। আমি যেমন প্রায়ই বলি, এক ব্যক্তি বলে : আমি গ্রামের স্কুলে সামান্য শিক্ষকতার কাজ করি অথবা আমি একজন অফিসের সামান্য কেরানি মাত্র। এইরূপ চিন্তার ফলে এই ব্যক্তি নিজেকে ক্ষুদ্র করে ফেলে—ভুল দৃষ্টিভঙ্গির ফলে। তার ওরূপ করার প্রয়োজন নেই। সে বলতে পারে, আমি স্বাধীন ভারতের একজন নাগরিক, কেরানির কাজ করি। শিক্ষকতা করি। ঐভাবে তুমি তোমার সত্তাকে প্রথম স্থান দিয়েছ, কর্মকে দ্বিতীয়। সচরাচর আমরা কর্মকে প্রথম স্থান দিয়ে, আপন সত্তার জন্য কোন স্থান আর খুঁজে পাই না! যে ছোট্ট কাজটুকু তুমি কর, তারই সঙ্গে নিজ সত্তাকে জড়িয়ে ফেল। কেউ সামান্য নয়, যদি না সে নিজে নিজেকে সামান্য করে তোলে। তুমি তো স্বাধীন ভারতের নাগরিক। এর থেকে বড় আর কি পদমর্যাদা তোমার থাকতে পারে? সুতরাং, সমাজনীতি ও রাজনীতি মিশ্র জীবনেও, এই দৃষ্টিভঙ্গি মানবিক মর্যাদার ধ্যানধারণায় অনেকখানি পরিবর্তন আনতে পারে। আর আধ্যাত্মিক জীবনে, এতে আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়। আমি অনন্ত আত্মা বা আমি ঈশ্বরের সন্তান। বাসনা ত্যাগ বড় কঠিন; কিন্তু এ কাজ সহজ হয়, যখন নিজ সত্যস্বরূপ সম্বন্ধে তোমার উপলব্ধি বেশি বেশি স্বচ্ছ হতে থাকে। ওদের তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করো না। 'আমি তাদের চাই না' এই দৃষ্টিভঙ্গি আসবে। আমি পূর্ণ। কী চমৎকার ভাব! এই শিক্ষাই মানুষকে *স্থিতপ্রজ্ঞ* বা স্থির প্রজ্ঞাসম্পন্ন করে তোলে। সেই স্থিরতার শতকরা পাঁচভাগ লাভ করলেও তোমার জীবন ও কর্ম বহুগুণ ঋদ্ধ ও আনন্দময় হয়ে উঠবে। আমরা এমন আশা করতে পারি না, যে লক্ষ লক্ষ লোক এইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে উঠবে। কিন্তু, এখানে আদর্শ রইল, এই লক্ষ্য সামনে রেখে আমরা সকলে অগ্রসর হতে পারি। এক ধাপ অগ্রসর হলে, তাই হবে আশীর্বাদস্বরূপ। যতখানি এগুবে ততই মঙ্গল।

স্বর্গীয় অজ্ঞাবাদী চিন্তাবিদ বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর গ্রন্থে, '*Impact of Science on Society* (pp 120-21), বলেছেন :

'আমরা, উপায়-সম্পর্কীয় মানবিক জ্ঞান ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মানবিক বোকামি, এই দুই-এর দৌড়ের মধ্যস্থলে রয়েছি। মানুষ যদি বাহ্যজ্ঞানের সমৃদ্ধির সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ না ঘটায়, বাহ্যজ্ঞানের প্রবৃদ্ধি তার দুঃখ কষ্টের বৃদ্ধি ঘটাবে'।

ঐটিই হলো মানবের ক্রমবিকাশের লক্ষ্য। মানব সত্তা তার পার্থিব সম্পদের থেকে মহত্তর—এ সত্য আমরা তখনই বুঝি যখন সঙ্কটে পড়ি।

আর আমি এ সত্যকে প্রতিভাত হতে দেখেছি, গত বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন বহুলোক ব্রহ্মদেশ ছেড়ে ভারতের মূল ভূ-খণ্ডে চলে আসছিল। আমি ১৯৩৯ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত রেঙ্গুনে ছিলাম। সেই সময়েই জাপান ওখানে বোমা ফেলে ও রেঙ্গুন আক্রমণ করে; শহরের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, আর লোকে ঐ শহর ছেড়ে ভারতে চলে আসতে শুরু করে। তাদের বাড়ি ছিল—অন্ধ্র, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, বাংলা বা তামিলনাড়ু প্রদেশে; প্রত্যেকেই নিজ নিজ সম্পত্তির যতটা সম্ভব ভারতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, তাই তারা নিজ নিজ গৃহস্থালি থেকে, বড় রেডিও, বিছানা, কম্বল ও বহু দামি দামি জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়েছিল। কিন্তু কিভাবে তারা ভারত পর্যন্ত দীর্ঘ পথ পার হয়ে ঐগুলিকে বয়ে নিয়ে যেতে পারবে? কিছুদূর গিয়ে একটি জিনিসকে রাস্তায় ফেলে যেতে হলো, তারপর একটা-একটা করে আরো জিনিস ছেড়ে যেতে হলো, শেষ পর্যন্ত সে নিজে ও তার একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিই সঙ্গে রইলো। কেবল নিজেকে নিয়েই তারা ভারতে পৌঁছেছিল। এই রকম পরিস্থিতিতে, এইরকম অভিজ্ঞতা পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও নিশ্চয়ই হয়েছে।

সঙ্কটের সময়েই বোঝা যায় যে চরম মূল্যবান বস্তু হলো একমাত্র মানুষ নিজে, তার নিজ অধিকারভুক্ত সম্পত্তিগুলি নয়। তাদের ঐ সম্পদগুলিকে আমি পথে পড়ে থাকতে দেখেছি। তারা জানতো যে বেঁচে থাকলে এই সব সম্পদ আবার হবে। আমাদের মধ্যে কত লোকেই না বাসনারূপ ঝড়ের ধাক্কায় পড়ে যায়। কিন্তু আমাদের শেকড় যদি শক্তভাবে গাড়া হয়, কিছুই আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে না। সেই শেকড় প্রোথিত আছে আত্মায়। আমার জীবনের শেকড় যদি গাড়া থাকে আত্মজ্ঞানে, তবে কিছুই আমাকে নড়াতে পারবে না। এর সঙ্গে খুবই মিল রয়েছে নব-সুসমাচারে বর্ণিত যিশুর এই সুপ্রসিদ্ধ গল্পটির ঃ

'এক মূর্খ বালির ওপর তার বাড়ি তৈরি করেছিল, বৃষ্টি নামল, তারপর বন্যা এলো, ঝড় বইতে লাগল এবং বাড়িটি আঘাত পেতে পেতে পড়ে গেল। কিন্তু এক বুদ্ধিমান লোক পাথরের ওপর বাড়ি করেছিল—বৃষ্টি নামল, বন্যা

এল, ঝড় বয়ে গেল, এবং বাড়ির ওপর আঘাত এল, কিন্তু তাতে বাড়িটি পড়ে যায় নি, কারণ তার ভিত্তি ছিল পাথরের ওপর।'

এটি একটি অতি সুন্দর গল্প তুমি যদি তোমার সমগ্র জীবনকে আত্মারূপ পাহাড়ের ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোল, তবে কিছুই তাকে নড়াতে পারবে না। তারই নাম স্থির চরিত্র। আধ্যাত্মিক সচেতনতা থেকে উন্নত মানের চারিত্রিক বল গড়ে ওঠে; এরূপ চরিত্রবান ব্যক্তিকে কেউ লক্ষ টাকা ঘুষ দিতে এলে, সে তাকে বলবে, 'অনুগ্রহ করে এখান থেকে সরে যান।' এ শক্তি কোথা থেকে আসে? কেবল মানবসত্তার এই আধ্যাত্মিক মাত্রা থেকেই মানব তার ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলেছে তার অসীম প্রকৃতিরূপ পাহাড়ের ওপর। কেবল বালির ওপর গড়া হলে পাঁচ টাকা ঘুষরূপ সামান্য বাতাসেই সে পড়ে যেত। লোকে যখন এই গীতার ভাব বুঝবে তখন ঐ স্থির, দৃঢ় অবস্থা আসবে। যাতে লোকে ঐ ভাবগুলি জীবনে কাজে লাগিয়ে প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য হয়ে ওঠে—সামান্য বাহ্যশক্তির প্রভাবে সাম্য হারিয়ে না ফেলে—সেই উদ্দেশ্যেই এই ভাবগুলি গীতায় সন্নিবেশিত হয়েছে। তাই, *আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ* 'যখন মানব একমাত্র আত্মোপলব্ধিতেই তুষ্টি অনুভব করে', *স্থিতপ্রজ্ঞঃ তদা উচ্যতে*, 'তখন সে স্থিতিশীল প্রজ্ঞার অধিকারী বলে খ্যাত হয়'। যারা সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেও আনন্দেই থাকে তাদের ব্রতই সার্থক। যে সব সন্ন্যাসী প্রফুল্ল, করুণাপরায়ণ, মানবপ্রেমী তাদের সন্ন্যাস সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও উচ্চস্তরের। যে সন্ন্যাসী শুষ্ক, লোক ব্যবহারে অশালীন, সে সন্ন্যাসীর কোথাও কোন গলদ আছে, সে আত্মানন্দরূপ অমূল্য রত্ন হারিয়েছে। আনন্দাপ্লুত সন্ন্যাসই হলো মানব সত্তার চির আকাঙ্ক্ষিত অবস্থা। এই হাসি কোথা থেকে আসে? অন্তরের কোন অসীম দিব্যভাব থেকে আসে, বাহ্যজগৎ থেকে নয়। আদি শঙ্করাচার্য এই ভাবটি প্রকাশ করেছেন তাঁর *বিবেক চূড়ামণি* গ্রন্থের ৫৪৩ সংখ্যক শ্লোকে ঃ

নির্ধনোঽপি সদা তুষ্টোঽপ্যসহায়ো মহাবলঃ।
নিত্যতৃপ্তোঽপ্যভুঞ্জানোঽপ্যসমঃ সমদর্শনঃ ॥

কি চমৎকার অভিব্যক্তি!

'সে ব্যক্তি একজন অসাধারণ পুরুষ, যিনি কোন ঐশ্বর্য, কোন ক্ষমতা বা কোন সম্পদের অধিকারী না হয়েও আনন্দময়, উৎসাহপূর্ণ; কোন সহায়ক না থেকেও যিনি অনন্ত শক্তির অধিকারী; কোন ইন্দ্রিয় ভোগে লিপ্ত না হয়েও যিনি তৃপ্ত; নিজে অতুলনীয় হয়েও যিনি অন্য সকলকে নিজের সঙ্গে সমান জ্ঞান করেন।'

অসমঃ সমদর্শনঃ, তিনি নিজে এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গের মতো *অসমঃ*, অতুল্য; কোন চূড়াই তার সমান নয়, তবু তিনি সকলকে সমান জ্ঞান করেন। আমাদের জীবনে, রাজনীতির ক্ষেত্রে একজন লোকই এই শ্লোকে বর্ণিত আদর্শের কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন; তিনি হলেন মহাত্মা গান্ধী। এই মহত্ত্বকে আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব বলা হয়। সাধারণ মহত্ত্বে এরূপ গুণের অভিব্যক্তি নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "নিজের অনন্ত প্রকৃতি উপলব্ধি করে শিব আনন্দে নৃত্য করেন।" আমাদের সকলের মধ্যেই এ সম্ভাবনা চাপা রয়েছে। আমরা এ জগতের বহু ব্যষ্টির মধ্যে এক একটি ব্যষ্টি নই। একটি টেবিল বা চেয়ার বা অন্য একটি আসবাব, এটা বা ওটা, আমাদের প্রকৃত স্বরূপের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না। এ সত্যের সামান্য যখন আমাদের বোধগম্য হয়, তখনও আমাদের ধন সম্পত্তি থাকবে, কিন্তু আমরা এগুলির দাস হয়ে থাকব না। গীতায় এই কথাটির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জীবনযাত্রা যেমন চলছিল তেমনি চলবে, কিন্তু মূল্যায়ন পদ্ধতি যাবে বদলে। কয়েকটি টাকার জন্য আমি লোককে ঠকাব না। আমি টাকার মূল্য বুঝি, কিন্তু আরো বুঝি যে অর্থের থেকে মানুষের মূল্য অনেক বেশি। এইভাবে এই বোধ মানবজীবনের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত সবটাকে পাল্টে দিতে পারে। যেমনই হোক, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনের একটু পরিবর্তনে আমরা আরো বেশি সুখী হতে পারব। ধর, তোমার পরিবারে, সামান্য অর্থের জন্য প্রায়ই ঝগড়াঝাঁটি লেগে আছে; এ তো এক ভয়ানক পরিস্থিতি। ভাই, বোন মারামারি করছে, ঝগড়া করছে। ঐ সমগ্র চিত্রটির পরিবর্তন আসবে, যদি গীতার এই বাণীর প্রভাব মনগুলিকে নাড়া দেয়।

আমাদের জনগণকে অবশ্যই বিষয় ও ব্যক্তির জন্য আরো বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে চিন্তা করতে ও অনুভব করতে শিখতে হবে। ভগিনী বিধবা হয়েছে; তাদেরই এগিয়ে আসতে হবে, তার এই শোচনীয় অবস্থাতে তাকে সহায়তা করতে, সেবা করতে, তার সঙ্গে প্রতারণা করতে নয়। এইরকম নীচতা সমাজকে কখনই উৎপীড়ন করবে না, যখন মানব মন সামান্য একটু আধ্যাত্মিকতার, সামান্য *স্থিতপ্রজ্ঞের* দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত হবে। তাই, স্থিতপ্রজ্ঞ পর্যায়ে এই প্রথম শ্লোকটি প্রচুর সম্ভাবনাময় ঃ তা হলো তুমি বাহ্য প্রলোভন স্বাভাবিকভাবে ত্যাগ করে থাক, কারণ তোমার অন্তরে অধিষ্ঠিত শ্রেয়স্কর বস্তুটিকে তুমি উপলব্ধি করেছ। বড় জিনিস পেয়েছ বলে ছোট জিনিসকে তুমি ত্যাগ করেছ। তোমার নিজ শ্রেষ্ঠত্বকে, তোমার অন্তরস্থ অসীম সত্তা কর্তৃক ন্যস্ত সীমিত সত্তারূপে,

তুমি উপলব্ধি করেছ। ঐ জ্ঞান, এর সামান্যও, নষ্ট করে দেয় সমাজ জীবনের সঙ্কীর্ণতাকে—যা বর্তমানে সমাজকে পীড়িত করছে। জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে আমাদের সকলের কাছে এর প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে, কারণ এই অনন্ত ও শাশ্বত আত্মার ওপর রয়েছে আমাদের জন্মগত অধিকার, আর সে বিষয়ে আমাদের অবহিত হতে হবে।

গান্ধীজীর কালে এ শ্লোকগুলি তাঁর আশ্রমে প্রতিদিন পাঠ করা হতো, কারণ এতে এতই প্রেরণাদায়ী শক্তি রয়েছে। এমনকি এ বিষয়ে চিন্তা এবং এই ভাবগুলি নিয়ে ধ্যানই মানবের উন্নয়ন ও আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির পক্ষে এক মহান শিক্ষা।

জীবনে সাফল্য অর্জন করতে হলে, একটু মানসিক স্থিতিশীলতা আমাদের চাই। চঞ্চল মন কোন মহৎ কাজ করতে পারে না। অধিকাংশ লোকেরই কিছুটা পরিমাণ স্থিরতা তাদের মধ্যে থাকেই। তাতেই বোঝা যায় যে তারা এ বিষয়ে মনকে কিছুটা প্রশিক্ষণ দিয়েছে। সেই প্রশিক্ষণই এখানে বিস্তারিত ভাবে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে, যথেষ্ট অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে, যাতে তুমি অন্তর্জীবনে আরো বেশি বেশি স্থৈর্যের অধিকারী হতে পার। তাই এ বিষয়ে দ্বিতীয় শ্লোকের প্রবর্তন ঃ

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥৫৬॥

—'যার মন দুঃখে উদ্বিগ্ন হয় না, যে সুখের জন্য লালায়িত নয়, যে বিবেচনাহীন আসক্তি, ভীতি, ক্রোধ থেকে মুক্ত, বাস্তবিক তিনিই হলেন স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি।'

যিনি *স্থিতধীঃ*, 'যে ব্যক্তির *ধীঃ* বা *বুদ্ধি স্থিত*, অচঞ্চল', তাঁকেই *মুনি* বলা হয়। সংস্কৃত ভাষায় *মুনি* শব্দের সঠিক অর্থ হলো, *মননশীলো মুনিঃ*, গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি। সাধারণত যিনি মৌনব্রত অবলম্বন করেন তাঁকেই আমরা মুনি বলে থাকি। এ হলো ঐ আশ্চর্য সংজ্ঞাটির অতিবাহ্য অংশমাত্র। এর সারভূত অংশ হলো, 'গভীর চিন্তায় মগ্ন হওয়া'। আমাদের সাহিত্যে *মুনি* ও *ঋষি* কথা দুটি প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। *মুনি* এক মহান শব্দ। কোন *মুনির* মুখমণ্ডল দেখ, দেখবে তা একটি চিন্তাশীল মুখ, হাল্‌কা নয়, শূন্য বা গভীরতাহীন নয়। বর্তমানে আমরা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত, গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে, অধিক লোকের চিন্তাশক্তির জাগরণের এবং লোকপ্রীতি ও জনসেবামূলক কার্যনামে সামিল হওয়ার সামর্থ্যের ওপর। যাদের জীবন অসংযত আবেগে ও কাজের মাতামাতিতে ভরা, এখনকার অধিকাংশ

রাজনীতিকের ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে, তারা আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নস্যাৎ করে দিতে পারে। কিন্তু দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ গণতন্ত্রে আমাদের প্রয়োজন আরো বেশি সংখ্যক মুনিসুলভ গুণসম্পন্ন মানুষের। *মননশীলো মুনিঃ*, 'চিন্তাশীল মানুষই হলো *মুনি*।' সমাজের সব রকম উন্নতির মূলে হলো চিন্তাসামর্থ্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে *মুনি* শব্দটি ব্যবহার করার সময় আমাদের বোধ হতে পারে, 'ও! এতো খুব উঁচু আদর্শ! আমরা কেমন করে ঐরকম *মুনি* হয়ে উঠতে পারব?' কিন্তু, নিজ নিজ স্তরে আমরা *মুনি* হতে পারি। *মুনিত্বের* অনেকগুলি স্তর আছে। *দুঃখেষু অনুদ্বিগ্ন মনাঃ*, 'যার মন দুঃখে মুষড়ে পড়ে না'—এই ছত্রটি আমাদের অবশ্যাই সর্বদা মনে রাখতে হবে। সেই রকম, *সুখেষু বিগত স্পৃহঃ* 'সুখের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণে যার মন আনন্দে আত্মহারা হয় না'।

এর পর আসছে এক সুন্দর অভিব্যক্তি ঃ *বীতরাগ ভয় ক্রোধঃ*, 'যে আসক্তি, ভয়, ক্রোধ—এই প্রকার তিন ক্ষতিকর আবেগকে অতিক্রম করেছে।' একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পার হলে এই আবেগগুলি সমাজের সুখ-শান্তির পক্ষে খুবই হানিকর। তাই *গীতায়* এই ভাবটির প্রকাশ বার বার দেখা যায়। ৪র্থ অধ্যায়ের আলোচনার সময় এই শিক্ষাটি আরো বিশদভাবে দেওয়া হয়েছে। বেদান্তের সর্বত্র ভয়কে অশুভরূপে দেখা হয়েছে। বেদান্ত ভয়কে কোন ধর্মীয় গুণ হিসাবে প্রশ্রয় দেয় না। এই শিক্ষাটি আমাদের সমাজকে অবশ্যাই গ্রহণ করতে হবে। শিশু-শিক্ষণের ক্ষেত্রে আমরা শিশুদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দি, এটার ভয়, ওটার ভয় ইত্যাদি। বেদান্তে বলে, 'না শিশুদের ভয়শূন্য পরিবেশে বড় হতে দাও। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, 'অভীঃ হওয়া পুণ্য; ভয় পাওয়া পাপ,' ওটি বেদান্তের শিক্ষা। শিশুর নৈতিক শিক্ষায় *ভয়ের* কোন স্থান নেই। সাধারণ অবস্থায় ভয়ের কিছু অবকাশ তো আছেই। যদি একটা বাঘ এসে যায়, আমি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরবো না! এ ভয় যুক্তিযুক্ত, বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। কিন্তু অযৌক্তিক ভয়ে অস্বাভাবিক ব্যবহার অবশ্যাই বর্জনীয়। আমরা শিশুদের মধ্যে অনেক রকম অস্বাভাবিক ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে থাকি। তাই যথার্থ নৈতিক জীবন তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে না। শিশুদের ভয় দেখিয়ে নীতিবান করতে হবে—সাধারণ লোকের এই রকম একটা ধারণা আছে, যেমন পুলিসের ভয়, লোক মতের ভয়; এই রকম ভয় সামনে রেখে আমরা সদাচারী হয়ে ওঠার চেষ্টা করি। বেদান্ত চিন্তায় চারিত্রিক উন্নয়নের মনস্তত্ত্বে ভয়ের স্থান নেই। অন্য কোন সাহিত্যে ভয়কে মানুষের পক্ষে এতদূর অশুভ ভাবা হয় না। কেবল ভয়হীনতাকেই সদ্‌গুণ বলা যায়, ভয়কে নয়। আমি মিথ্যা বলি, কেন? আমি ভয় পাই, তাই মিথ্যা বলি। আমার কোন ভয় না থাকলে, আমি কখনই

মিথ্যা বলব না। আমি পিতামাতার কাছে সত্য বলবো। অতএব, ভয়হীনতার পরিবেশে শিশুরা মানুষ হলে, তারা স্বভাবতই নীতিবান হবে। তারা অকপটে সত্য কথা বলবে। জীবনে তারা স্বতঃস্ফূর্ত হবে। শিশুদের মনে কখনই ভয়ের সঞ্চার করতে নেই। আমাদের বড়দের মধ্যেও ভয় অতিক্রমণের চেষ্টা করতে হবে। মহান গ্রন্থ, এই *ভগবদ্গীতায়* বার বার এই ভাবটির উল্লেখ পাওয়া যায়। তাই, আসক্তি, ভয় ও ক্রোধকে অতিক্রম করতে হবে।

ক্রোধ-দমন খুব কষ্টসাধ্য; কিন্তু তার জন্য চাই মনের প্রশিক্ষণ। প্রথমে আমরা ক্রুদ্ধ হই; কিছু পরেই আবার ঠাণ্ডা হয়ে যাই। তারপর, আমাদের অবশ্যই চিন্তা করতে হবে ঃ কেন আমি ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম? আমি সংযম হারিয়েছিলাম; এখন আবার চেষ্টা করব। এইভাবে, বার বার ইচ্ছা-শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ও উচ্চতর উদ্দেশ্যের প্রতি আত্মোৎসর্গের মনোভাব নিয়ে, আমরা ভয়-বিদ্বেষাদি মন্দ আবেগগুলিকে ধীরে ধীরে বশীভূত করতে পারি। আমরা ক্রোধে 'ফেটে' পড়ি। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলিয়াম ম্যাক্‌ডুগ্যালের বিখ্যাত—*Character and the Conduct of Life* গ্রন্থে ক্রোধ-সমস্যার এক সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, একে নিয়ন্ত্রণে আনবার এবং কাজে লাগাবার উপায়ের কথাও বলেছেন। জীবনে ক্রোধের প্রয়োজন আছে। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে কোন আবেগই, এমনকি ক্রোধও, স্ব-স্বরূপে মন্দ নয়। কিন্তু, জানতে হবে কিভাবে এদের কাজে লাগাতে হয়। মানব জীবনে ক্রোধেরও একটা স্থান আছে। তোমার আশেপাশে কিছু অন্যায় হচ্ছে দেখলে; তোমাকে অবশ্যই সংযত ক্রোধের উদ্রেক ঘটাতে হবে। তোমার মনে ক্রোধ না থাকলে ঐ ব্যাপারে সঠিক প্রতিকারের জন্য এগুতে পারবে না। মন্দ-কাজ বেড়েই চলবে। অতএব, ক্রোধকে সামাজিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে সঠিক খাতে প্রবাহিত করান যেতে পারে। ভারতে সেটা আমরা দক্ষতার সঙ্গে করতে পারি না। আমাদের ক্রোধ আছে, কিন্তু তাকে আমরা কখনই সমাজের মধ্যে কদাচারের প্রতিকারে ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রয়োগ করি না। এইটিই হলো চরিত্র-গঠন প্রশিক্ষণের অন্যতম বৃহত্তম অংশ। ম্যাক্‌ডুগাল একে 'ন্যায়সংগত' ক্রোধ আখ্যা দিয়েছেন। আমরা এতরকম অন্যায় চারিদিকে দেখছি, কিন্তু আমরা তা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলি আমাদের কিছু করণীয় নেই; অথচ বাড়িতে আপন পোষ্যদের সঙ্গে ব্যবহারে আমরা প্রচুর অনর্থক ক্রোধ করে থাকি। তাই, আমরা এই আবেগকে সঠিক পথে চালাতে পারি না। একে শিক্ষা দাও, সমাজ-কল্যাণের পথে একে কাজে লাগাও। তাই বলি, আমাদের সমষ্টি জীবনে ক্রোধের প্রচুর

মূল্য রয়েছে। এই ক্রোধ না থাকলে, মন্দ কাজ বৃদ্ধি পাবে। ভারতে এইটিই আমাদের বিশেষ দোষ। ন্যায়সংগত ক্রোধের উদ্রেকও আমাদের হয় না। আমরা ঘটনা ঘটে যেতে দিই। এইরকম দৃষ্টিভঙ্গির ফলে গড়ে উঠেছে অন্যায় আচরণে পূর্ণ এক সমাজ। বর্তমান যুগে কিছু কিছু উন্নতি দেখা যাচ্ছে। তাই, যদিও ক্রোধকে দূরীভূত করতে হবে, তবু একে কেবল তুলে ফেলে দিলেই দূর করা যাবে না। এ এক স্বয়ংক্রিয় ব্যাপার—যা সঠিক পথানুবর্তী শিক্ষার মাধ্যমে উদ্ভূত করে তুলতে হবে।

আমাদের প্রত্যেকটি আবেগকে শিক্ষা দিয়ে নিয়মানুবর্তী করে তুলতে হবে। আবেগের শক্তিটুকু আমাদের নিতে হবে এবং তাকে কোন সদুদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে। এইভাবে এই আবেগগুলির অভিমুখ গঠনমূলক কাজের দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। এই ভাবেই আমরা চরিত্র গঠন করতে পারি। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, 'আবেগ, নিয়ন্ত্রিত ও কাজের দিকে নিয়োজিত হলে, তাকেই চরিত্র বলা *হয়*'। সাধারণ ক্রোধ, যা গর্ব ও দাম্ভিকতাবশত প্রকাশিত হয়, তা একধরনের গতিহীন শক্তি। এর কোন মূল্য নেই; আমাদের একে বশীভূত করতে হবে। ক্রোধ সংবরণের পদ্ধতির কথা এইসব বইয়ে বলা আছে; কিন্তু বই-এর কথা মূল্যহীন হয়ে পড়ে—যদি না সেগুলিকে অভ্যাসে পরিণত করি : 'আমাকে অবশ্যই সংবরণ করতে হবে', 'আমি বশীভূত করবই।' তখন দেখবে; তুমি ধীরে ধীরে জয়ের দিকে এগিয়ে চলেছ।

পৃথিবীর বহু দেশে আমি দেখেছি, একটি প্রশ্ন বারংবার করা হয়েছে : ক্রোধকে বশীভূত করা যায় কিভাবে? পাশ্চাত্য দেশেও নর-নারী কখনো কখনো শিশুদের ওপর রাগ করে; পড়শীর ওপর রাগ করে; তারাও চায় ক্রোধকে বশীভূত করতে। তাই, আমি এইসব বলি। কিন্তু আরো একটি চটজলদি পদ্ধতির কথাও বলি। 'যখনই তুমি ক্রুদ্ধ হবে, দানপাত্রে কিছু খুচরো পয়সা ফেলে দাও;' এর ফলে দানপাত্রটি যখন ভরে আসবে, তখন তুমি ক্রোধ ত্যাগ করতে পারবে। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, ক্রোধ প্রশমনের পর যার ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলে, তার কাছে ক্ষমা চাওয়া। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *স্থিত ধীঃ*, 'যার *ধীঃ* বা *বুদ্ধি স্থিত*, স্থিতিশীল হয়েছে'। *মুনিরুচ্যতে*, 'তাকে *মুনি* বলা হয়'। প্রত্যেক নাগরিককে এই সব গুণের অল্পমাত্রও অধিকারী হতে হবে। তবেই আমরা এক সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে পারি। কখনো মনে করো না যে হিমালয়ে কিছু কিছু *মুনি* ও *ঋষির* অবস্থানই যথেষ্ট, আর আমাদের সকলের এখানকার মতো ক্ষুদ্র হয়ে

থাকলেই চলবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত ভুল। আমরা প্রত্যেকেই নীতিগত ভাবে এক এক ইঞ্চি করে লম্বা হবো—এইভাবে আমাদের আবেগপ্রবণতাকে সংযত করতে চেষ্টা করলে। *মুনি* হও, চিন্তাশীল হও, সবরকম সামাজিক উন্নতির পেছনে চিন্তাশক্তি কাজ করে। মহান চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ নতুন নতুন ধ্যানধারণার প্রবর্তন করেন। সেইভাবেই সমাজের অগ্রগতি হয়।

কিন্তু, এমনকি বার্ট্রাণ্ড রাসেলও বলেন, প্রত্যেক শিশুরও একটা স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি আছে। আমাদের বর্তমান শিক্ষানীতির একটা উদ্দেশ্য হলো শিশুদের এই গুণটি উন্মেষের পথরোধ করা। কেমন এই মন্তব্য ঃ শিক্ষায় চিন্তাশক্তি নষ্ট হয়! শিক্ষালাভ না করেও মহান চিন্তাশীল ব্যক্তি হয়েছেন—এমন দৃষ্টান্তও আছে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় ঐরূপ চিন্তাশক্তি লাভ করা যায় না। এতে চিন্তাকে রুদ্ধ করে দেওয়া হয়, কারণ এতে বই-পড়া—আর মুখস্থ করার ওপর জোর দেওয়া হয়। কিন্তু যেটা দরকার তা হলো, চিন্তাশক্তির উন্মেষ ঘটানো। শিক্ষাপদ্ধতিতে এর স্থান চাই, তবেই চিন্তাশীল লোকের, *মুনির* সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্যেও চিন্তা করার কোন প্রশ্নই নেই। সব কিছু কেবলই উত্তেজনা, সাময়িক উন্মাদনা, আর উন্মাদনাগ্রস্ত ক্রিয়াকলাপ। সমগ্র পদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটাতেই হবে, যদি আমরা এমন নর-নারী গড়ে তুলতে চাই, যারা ভবিষ্যতে এক মহান সমাজের উপযুক্ত হবে, মহত্তর সমাজ গড়ে তুলতে সমর্থ হবে। এই হলো, এই শ্লোকের ও এর মধ্যে বিশেষভাবে সন্নিবিষ্ট বাক্যগুলির গুরুত্ব। এইরকমই হলো পরের শ্লোকটি ঃ

যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৭॥

—'যিনি সর্ব বিষয়ে আসক্তিহীন, ভাল জিনিস পেয়ে আনন্দিত হন না, বা মন্দ জিনিস পেয়ে বিরক্ত হন না—তাঁর প্রজ্ঞাই স্থিতিশীল।'

তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা, 'তার প্রজ্ঞা বা বুদ্ধিই দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হয়ে আছে।' 'কার?' *যঃ সর্বত্র অনভিস্নেহ,* 'যে সম্পূর্ণ অনাসক্ত।' *তৎ তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্, ন অভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি,* 'যে, কল্যাণকর ব্যাপার ঘটলে আনন্দিত হয় না, আর অকল্যাণকর কিছু ঘটলেও বিমর্ষ হয় না।' এমন লোকেরই মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ আছে বুঝতে হবে। তারই প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। জীবনে এইসব গুণের কিছুটা থাকা চাই; এই ধরনের নরনারীর সন্ধানও পাওয়া যায়। আমরা পশুর

মতো নই, বাহ্য উত্তেজনা যতটুকু ঠিক ততটুকুর প্রতিক্রিয়াই তাদের থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের ক্ষমতা আছে কোন উত্তেজনার জবাবে প্রতিক্রিয়া প্রকাশের পূর্বে পরিস্থিতি বিচার-বিবেচনা করে দেখার। সেই ক্ষমতা প্রয়োগের ফলেই আমরা এইরকম বৌদ্ধিক স্থৈর্য বেশি বেশি করে লাভ করি। তাই পরের শ্লোকে বেদান্ত সাহিত্যের একটি প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তকে তুলে ধরা হয়েছে ঃ

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ॥

—'কচ্ছপ যেমন (ভয় পেলে) অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে সঙ্কুচিত করে ভেতরে ঢুকিয়ে নেয়, তেমনই যখন কেউ ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়াদি থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে নেয়, তখন তাঁর প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি স্থিতিশীল হয়েছে বোঝা যায়।'

আমরা দেখেছি, বাহ্য বিপদের আশঙ্কা হলেই কচ্ছপ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে তার পিঠের শক্ত খোলার নিচে ঢুকিয়ে নেয়। সেখানে কোন কিছুই আর তাদের ক্ষতি করতে পারে না ঃ কচ্ছপ জানে কখন ঢুকতে হয়, কখন বেরুতে হয়। তেমনি আমাদেরও গড়ে তুলতে হবে ঐ কচ্ছপসুলভ সামর্থ্য। আপনাকে নিজের মধ্যে প্রত্যাহার ও বাইরে বেরিয়ে আসার ঃ *যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ,* 'কচ্ছপ যেমন তার সকল অঙ্গকে ভেতরে ঢুকিয়ে আত্মরক্ষা করে,' তেমনি, *ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ,* 'আমাদের গড়ে তুলতে হবে—ইন্দ্রিয়গুলিকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় থেকে প্রত্যাহার ও পরে প্রকাশ করার সামর্থ্য।' এই সামর্থ্য, এই স্বাধীনতা, যখন আমরা অর্জন করব, তখন আমরা *স্থিতপ্রজ্ঞ* হব। *তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা,* তার প্রজ্ঞা, বুদ্ধি হয় সুপ্রতিষ্ঠিত। আমাদের সাহিত্যে, পশুসুলভ আচরণ পর্যবেক্ষণের কত বর্ণনাই না পাওয়া যায়! মহাভারত ও রামায়ণে পশুসুলভ আচরণ পর্যবেক্ষণের ও তার থেকে শিক্ষণীয় বিষয় বস্তুর বর্ণনায় ভর্তি। আমাদের সাহিত্যে পশুর গল্প প্রচুর পাওয়া যায়; ভারতবর্ষ থেকে এগুলি নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে—এই সব পশুর গল্পে পৃথিবীর সব দেশের শিশুই উৎসাহিত হয়; এমনকি বয়স্করাও। এর পর মানবমনের এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক পর্যালোচনা সম্বলিত পরবর্তী শ্লোকটি আসছে ঃ

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥ ৫৯ ॥

—'বিষয়গ্রহণে বিরত ব্যক্তির কাছে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু প্রত্যাখ্যাত হয়, কিন্তু

বিষয়াসক্তি থেকে যায়। কিন্তু, ঐ আসক্তিও থাকে না, যখন সেই পরম পুরুষকে উপলব্ধি করা যায়'।

এই শ্লোকে প্রত্যেকটি কথাই বিশেষ অর্থবহ। আমরা মানবসত্তাকে ওপর ওপর পর্যালোচনা করতে পারি, কিন্তু তাতে তার কাজের, সাফল্যের ও বিফলতার কোন মূল্যায়ন হয় না। আমরা যদি মানবতন্ত্রের গভীরে প্রবেশ করে খুঁজে বার করতে পারি সেখানে কোন শক্তি কাজ করছে, তবে একটি সুস্থিত ব্যক্তিত্বকে সুপ্রতিষ্ঠ করতে পারি। ঠিক যেমন আধুনিক পাশ্চাত্য ইতিহাসে, মনে করা হয় যে বিংশশতাব্দীর শুরু পর্যন্ত, মানব মনের যুক্তিপ্রবণতাভিত্তিক এক জ্ঞানোন্মেষের যুগ ছিল। ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব ঐ অনুমান অস্বীকার করেছে। ঐ জ্ঞানোন্মেষ কী? অবচেতন ও অচেতন মন থেকে উত্থিত শক্তির তোড়ে ঐ জ্ঞান এক নিমেষে উড়ে যায়। এ খুব বড় আবিষ্কার, এক রকমের গভীরদেশের মনস্তত্ত্ব, পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে বৈপ্লবিকও বটে। ফ্রয়েড এর মধ্যে যৌনভোগ ও দৌরাত্ম্যের সন্ধান পেলেন।

কিন্তু মন-গভীরের প্রকৃত পর্যালোচনা উপনিষদের ঋষিরা বিশদভাবে করেছিলেন চার সহস্র বছরেরও আগে; তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন চিরমুক্ত মরণহীন শাশ্বত আত্মা সম্বন্ধে উজ্জ্বল সত্যকে, যে আত্মার, যে মানবসত্তার অবস্থিতি হলো অবচেতন মনের পশ্চাৎপটে, ইন্দ্রিয়াবদ্ধ অহং বা জীবাত্মারও পেছনে। গীতায় মানবের জীবন ও নিয়তি ব্যাখ্যাত হয়েছে সম্পূর্ণ উপনিষদের মানবসম্ভাবনা-বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে। গীতায় মানব মনের আন্তরজ্ঞানকে উচ্চতম ও গভীরতম স্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। *বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ*। *দেহী,* 'এক শরীরী মানব সত্তা' স্বগতোক্তি করেন ঃ 'আমি আজ কিছু খাব না' এবং উপবাস করলেন। কিন্তু, উনি প্রকৃতপক্ষে উপবাসী নন। মনে খাবার ইচ্ছা প্রবল। এইভাবে, প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা সম্বন্ধেই ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়কে সরিয়ে নিলেই তুমি আত্ম-সংযত পুরুষ হলে না। ঐ পুরুষ *রসবর্জরূপ* বর্ণিত হয়েছেন; *রসম্* হলো ভোগের ইচ্ছা; *রসম্,* সেই ইচ্ছে এখনো রয়েছে। সেই ভোগেচ্ছাকে কি তুমি বশীভূত করতে পার? তাহলে তো তুমি আশ্চর্য পুরুষ। ওটি একটি মহান উক্তি, যা দ্বিতীয় পংক্তিতে পাওয়া যাবে। *পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে,* 'যখন পরমাত্মাকে উপলব্ধি করা যায়,' তখন ঐ ভোগেচ্ছাও দূর হয়। যখন, ঈশ্বরস্বরূপ সর্বভূতস্থ আত্মাকে উপলব্ধি করা যায় ওই ভোগেচ্ছাটুকুও আর থাকে না। *বিষয়* হলো ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর সংস্কৃত পরিভাষা। আর *বিষয়ী*

হলো কর্তারূপ মানব সত্তার পরিভাষা। এ দুটি পরিভাষা বেদান্তে ব্যবহৃত হয়। যখন ভোগেচ্ছা চলে যায়, তখনই কেবল তুমি মুক্ত। অন্যথা, ভোগেচ্ছা থাকলে সব সময়ে নতুন পরিস্থিতির, নতুন ধরনের আহ্বানের, উদ্ভব হতে পারে; নতুন ধরনের প্রলোভন আসতে পারে। কিন্তু যখন ভোগাকাঙ্ক্ষাই চলে যায় তখন তুমি সম্পূর্ণ মুক্ত হলে। এটি হলো মানব মনের সর্বোচ্চ অবস্থা, যেখানে ভোগেচ্ছা সমূলে উৎপাটিত হয়েছে—অনন্ত আত্মারূপে স্বীয়স্বরূপের জ্ঞানের মাধ্যমে।

ভগবান শিবের তপস্যা নিয়ে পুরাণের এক গল্প আছে। এটি পাওয়া যায় মহাকবি কালিদাসের *কুমারসম্ভবম্* নামে সংস্কৃত কাব্যে, যেখানে হিমালয়ের প্রেক্ষাপটে পার্বতী শিবকে পতিরূপে পেতে আগ্রহী। তিনি শিবের কাছে এলেন; শিব তখন সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসধর্ম পালন করছেন; পার্বতী শিবের কাছে অনুমতি চাইলেন, তাঁর সেবাধিকার পাবার জন্য। সন্ন্যাসীর পক্ষে যুবতী নারীর সেবাগ্রহণ উত্তম পরিস্থিতি নয়, কারণ এর ফলে তাঁর অন্তরে যেটুকু ভোগবাসনা রয়েছে তা উদ্দীপিত হয়ে উঠবে। কিন্তু শিব ছিলেন ভিন্ন ধরনের। শিব তাকে অনুমতি দিয়ে বললেন, 'হাঁ, তোমাকে সেবা করবার স্বাধীনতা দিলাম। আমার উদ্বেগের কোন কারণ নেই।' কালিদাস এই বিষয়টি উত্থাপন করেছেন একটি সুন্দর শ্লোকে (১.৫৮) ঃ

প্রত্যর্থ ভূতম্ অপি তাং সমাধেঃ
শুশ্রূষমাণাং গিরিশো অনুমেনে;
বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে
যেষাং ন চেতাংসি ত ইব ধীরাঃ।

—'পার্বতী যখন সানুনয়ে শিবের সেবাধিকার প্রার্থনা করলেন, শিব জানতেন যে একাজ তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে; তা জেনেও তিনি তার সেবা স্বীকার করলেন'—*গিরিশো অনুমেনে; গিরিশ* বলতে শিব, *অনুমেনে* মানে অনুমতি দিলেন। পরে কালিদাস নিজেই এর ব্যাখ্যা দিচ্ছেন ঃ 'সেই সব লোকই ধীর অর্থাৎ ধীমান ও বীর্যবান', *তে ইব ধীরাঃ*, যারা এই পরিস্থিতিকে ভয় করে না, কারণ, *বিকার হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাম্ ন চেতাংসি*, 'যাদের মন উত্তেজক পরিস্থিতি সত্ত্বেও উত্তেজিত হয় না'।

অতএব, এই সত্যটি ঃ পরব্রহ্মের উপলব্ধিতে ভোগেচ্ছাও চলে যায়। শিব তাঁর নিজের অনন্ত, শাশ্বত, শিব-প্রকৃতিকে জানেন; যেমন পুরাণোক্ত সমুদ্র-

মন্থন থেকে জানা যায় যে সমুদ্র-মন্থন থেকে উদ্ভূত বিষ পান করেও তাঁর কোন ক্ষতি হয়নি। এবং বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, প্রত্যেক মানব সত্তাতেই ঐ শিব-প্রকৃতি রয়েছে এবং ঐ জীব সেবাই শিবের সেবা।

কালিদাস উল্লেখ করেছেন, যে শিব কামদেবকে (ভারতীয় কিউপিডকে) ভস্ম করার পরে ও পার্বতীর কঠোর তপশ্চর্যায় উত্তীর্ণ হবার পরেই শিব-পার্বতীর বিবাহ হয়। শিবের পার্বতীকে এই গ্রহণ বৃত্তান্তও কালিদাস বর্ণনা করেছেন আর একট প্রসিদ্ধ শ্লোকে ঃ

অদ্য-প্রভৃত্যবনতাঙ্গি তবাস্মি দাসঃ
কৃতঃ তপোভিরিতি বাদিনি চন্দ্রমৌলৌ;
অর্হায় স নিয়মজম্ ক্লমম্ উৎসসর্জ
ক্লেশঃ ফলেন হি পুনঃ নবতাম্ বিধত্তে—

শিব বললেন ঃ 'এখন থেকে, হে নিষ্কলুষ, আমি তোমার দাস; তুমি কঠোর তপস্যা করে আমাকে কিনে নিয়েছ। চন্দ্রমৌলি শিব এ কথা বলায়, পার্বতী তপশ্চর্যার নিয়মপালনজনিত সকল রকম চাপ ও ক্লেশ কাটিয়ে উঠলেন; ক্লেশাদি যখন ফলপ্রসূ হলো তখন সব ক্লেশ ও যন্ত্রণা নবরূপে সৃষ্টি হলো'।

উভয়ের এই আধ্যাত্মিক গরিমার কারণে কালিদাস গ্রন্থের সূচনায় বলেছেন, 'হে শিব, হে পার্বতী, আমি তোমাদের প্রণাম করি বিশ্বের পিতামাতা-রূপে; *জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী-পরমেশ্বরৌ*। আশ্চর্য হতে হয়, যখন মানবজাতির বংশপরিচয় দিতে গিয়ে পুরাণে বলা হয়, এইরকম লোকই হলো তাদের আদি পিতা-মাতা! এ সত্য, প্রাচীন বেদান্তে এবং এ যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিতে উল্লিখিত হয়েছে ব্রহ্ম ও শক্তির তথা শিব ও পার্বতীর, নিরাকার ঈশ্বর ও সাকার ঈশ্বরের মিলনরূপে বা নিরঙ্কুশ অভিন্নতারূপে। তাই প্রত্যেককে আহ্বান জানান হয়েছে গীতার এই শ্লোকে ঃ

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥

—'যখন পরব্রহ্মের উপলব্ধি হয়, তখন এমনকি রস বা জীবসত্তার গোপন আকাঙ্ক্ষাও দূরে সরে যায়।' এইরূপ লোককে কোনরূপে প্রলোভিত করা যায় না; এরূপ ব্যক্তিই, ধীরঃ। এই হলো বেদান্তের ভাষা। তাই, যখন আমাদের

এরূপ সাধন-সংগ্রাম চলতে থাকে—তখন আমার ইন্দ্রিয় তন্ত্রের ব্যাপারে সতর্ক থাকা অবশ্য কর্তব্য। ওগুলি অত্যন্ত প্রবল। এই ভাবই পাওয়া যায় পরবর্তী শ্লোকে।

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥

—'হে কুন্তীপুত্র! বিক্ষুব্ধ ইন্দ্রিয়গ্রাম—পূর্ণজ্ঞান লাভে যত্নশীল ধীমান ব্যক্তিরও মনকে প্রবল বেগে ছিনিয়ে নিয়ে যায় বিপথে।'

যদি চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনকেই শিক্ষার উদ্দেশ্য রূপে স্বীকার করা হয় তবে এই সব সত্য সম্বন্ধে প্রত্যেক মানবের, ছেলে বা মেয়ের, অবহিত থাকা উচিত। মানব তন্ত্রের গঠন কি রকম? তাদের বিশেষ লক্ষণগুলিই বা কী কী? সেগুলিকে আমাদের জানতে হবে, তবেই জীবন যাত্রায় সুফল পাওয়া যাবে। অজ্ঞতা বেশ একটা মজার ব্যাপার নয়। সম্পূর্ণ শারীরতন্ত্রের মধ্যে মানবের এই ইন্দ্রিয়তন্ত্রটি খুবই শক্তিশালী। এরই প্রেরণায় প্রত্যেকটি কাজ সম্পাদিত হয়। অতএব ঐ ইন্দ্রিয়তন্ত্রের প্রকৃতি কিরূপ সে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। *যততো হ্যপি কৌন্তেয়,* 'মানব এই ইন্দ্রিয়তন্ত্রকে নিয়মের বশে আনতে চেষ্টা করেও', *পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ। বুদ্ধিমান জ্ঞানী পুরুষেরাও*—এ রকম লোকও দেখে যে 'ইন্দ্রিয়-যন্ত্রগুলি তাদের পেছনের দিকে টানছে।' *ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ,* 'প্রবল ইন্দ্রিয়যন্ত্রগুলি জ্ঞানী লোকের মনকেও পশ্চাৎদিকে টেনে নিয়ে যায়।' এই হলো ইন্দ্রিয় শক্তির প্রকৃতি।

আমাদের অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের সকল গ্রন্থেই এ বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। মানবের ব্যক্তিত্ব যদি দেহ, ইন্দ্রিয়গ্রাম ও মনেই শেষ হয়ে যায় তবে ইন্দ্রিয় সংযমের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে বর্তমানে প্রচলিত সমস্ত বস্তুবাদী দর্শনেরই এই অবস্থা। কিন্তু দেহেন্দ্রিয় মন-সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব অর্থহীন হয়ে পড়ে, যখন বেদান্তের রীতি অনুযায়ী মানবের গভীর দেশে অনুসন্ধানের ফলে প্রকাশ পায় প্রতিটি মানবের অন্তরস্থ আত্মার উজ্জ্বল মুক্ত সত্তা। মনুস্মৃতিতে একটি সুন্দর মন্তব্য রয়েছে। *বলবান্‌ ইন্দ্রিয়গ্রামো,* 'সমগ্র ইন্দ্রিয়তন্ত্রই খুব প্রবল'। *বিদ্বাংসমপি কর্ষতি,* 'তারা বিদ্বান ব্যক্তিদেরও (মনকেও) উড়িয়ে নিয়ে যায়।' এই সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছে। বেদান্তের ঘোষণা হলো মানবের আন্তরদেশে অভিযাত্রায় পৌছান যায় এর নিগূঢ়

সত্যের নিকট; অতএব ইন্দ্রিয় শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মানুবর্তী করা প্রয়োজন। যে কোন চরিত্র গঠনে, ইন্দ্রিয় শক্তির কিছুটা নিয়মানুবর্তিতা একান্ত প্রয়োজন; অন্যথায় কোন রকম চরিত্র গঠনই সম্ভব হয় না। ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলির প্রতি ইন্দ্রিয়ের এই যে আসক্তি, তা পশুস্তর থেকেই আমাদের মধ্যে নিহিত রয়েছে আর সেটাই হলো *মায়ার* জগৎ যেখানে আমরা বাস করি। আমাদের মায়ার পরিবেশেই বাস করতে হবে। তাই, ঈশ্বরে মাতৃভাব সাধন প্রসঙ্গে মরমিয়া গ্রন্থসমূহের অন্যতম দেবী-মাহাত্ম্যম্ গ্রন্থে (১.৫৫) বলা হয়েছে ঃ

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা;
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি—

মহামায়া হলেন সেই পরম (উচ্চতম) *মায়া,* যাঁকে আদি শঙ্করাচার্য তাঁর *বিবেকচূড়ামণির* ১০৯ শ্লোকে *মহাদ্ভুতা অনির্বচনীয়রূপা,* 'মহাবিস্ময়করী ও বর্ণনাতীতা' রূপে বর্ণনা করেছেন। এ যেন—আধুনিক পদার্থ বিদ্যার কোয়াণ্টাম্ (Quantum) তত্ত্বে, হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তা সূত্রের সঙ্গে চৈতন্যের মিলন ঘটালে যা পাওয়া যেতে পারে—তারই প্রতিধ্বনি; যা *জ্ঞানী,* বুদ্ধিমান লোকের মনকেও টেনে নিয়ে যায়। এই *মায়াই* আদি দৈবীমাতা বা *আদ্যাশক্তি,* শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাখ্যায়, যিনি দু-ধরনের *মায়াশক্তি* ব্যবহার করেন—একটি, *অবিদ্যাশক্তি* বা টেনে নামবার শক্তি, অপরটি হলো *বিদ্যাশক্তি* বা ওপরে তোলার শক্তি। কখনো কখনো শোনা যায়, অতি উন্নত ব্যক্তিও প্রকাণ্ড ভুল করছেন, কারণ সেই মুহূর্তে তারা *অবিদ্যা মায়ার* প্রভাবে পড়েছিলেন। সমাজে প্রায়ই এরূপ ঘটে থাকে। তাই এ সম্বন্ধে 'সতর্কবাণী' উচ্চারিত হয়েছে।—এ বিষয়ে, জ্ঞান দরকার, মনের সতর্কতা দরকার।

আমরা আমাদের অভ্যন্তরস্থ অনেকগুলি শক্তি নিয়ে কাজ করে থাকি, ঐ শক্তিগুলি আমাদের গ্রাস করে দিতে পারে; আমরা যেন তাদের নিয়ন্ত্রণ করি, নিয়মানুবর্তী করি—তারপর যাত্রাপথে অগ্রসর হই—উচ্চতম স্তরের পরম পরিপূর্ণতার দিকে। মনকে উত্তম পরিস্থিতিতে রাখবে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি তাকে অধম পরিস্থিতিতে নিয়ে যাবে, তাদের সে শক্তি আছে। অতএব, তার সঙ্গে বোঝাপড়া কর। পরবর্তী ৬৪ ও ৬৭ সংখ্যক শ্লোকে আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হবে। আমরা কি অসহায় হয়ে থাকবো? না! তুমি তোমার ইন্দ্রিয়গুলিকে তাদের বিষয়বস্তুর মধ্যে কাজ করতে দাও, ভয় পাবার দরকার নেই, যদি তুমি তাদের ওপর প্রভুত্ব করতে পার, যদি তুমি তোমার অন্তরস্থ

মনঃশক্তির মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা গড়ে তুলতে পার। যদি তা না কর, তবে সংসার সমুদ্রে তোমার জীবন-জাহাজের ভরাডুবি হবে। দুটি শ্লোক একটু পরেই আসবে। তাতে, আমাদের ইন্দ্রিয়তন্ত্রকে বা ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে পরিহার করতে বলা হয়নি, পরন্তু তাদের ব্যবহার শিক্ষা করতে বলা হয়েছে। এমন যেন না হয় যে ভোগ্যবস্তুকে গ্রহণ করতে গেলে ঐ বস্তুই তোমার ঘাড়ে চেপে বসল। তোমাকেই প্রভু হতে হবে। হিন্দীতে একটি প্রবাদ আছে, *কম্বল ছোড়তা নহি*। বন্যার জলে একজনের নজরে পড়ল; কম্বলের মতো একটা জিনিস ভাসছে। সে ভাবলো, এটা একটা ভাল কম্বল। সেটিকে নেবার জন্য সে এগিয়ে গেল। তীরের লোকেরা অপেক্ষা করছে, কিন্তু সে ফিরছে না। তারা তাকে ওটাকে ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসতে বলল! পারছি না, ওটা আমায় ছাড়ছে না! ফিরে এস! আমি পারছি না। কারণ ওটা ছিল একটা ভালুক, আর ভালুকটি তাকে ধরেছে! তাই *কম্বল ছোড়তা নহি* 'কম্বল আমায় ছাড়ছে না!' এই হলো গল্প। বেদান্ত মানবকে এই শিক্ষাই দেয় মানবীয় ক্রমবিকাশের লক্ষ্য—আধ্যাত্মিক স্বাতন্ত্র্য—অর্জনের জন্য। বিবেকানন্দ বার বার বলেছেন ঃ 'কাজ কর প্রভুর মতো, ক্রীতদাসের মতো নয়।' যদি ঘোড়া তোমার গাড়িকে তার ইচ্ছামতো নিয়ে যায়, তবে তো তুমি এক অসহায় বলিস্বরূপ হয়ে পড়লে। তুমি আরোহী, তোমার স্বাধীনতা রইল না; এমনটি হতে দিও না। তাই পরের শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥

—'দৃঢ়চেতা যোগী, সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত করে, পরমাত্মারূপী আমাতে সমাহিত হয়ে অবস্থান করে; যার ইন্দ্রিয়গণ সংযত, সে নরই হোক আর নারীই হোক, তাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।'

অতএব, *তানি সর্বাণি সংযম্য*, 'তোমার অন্তরস্থ সব ইন্দ্রিয়শক্তিকে সংযত কর।' একটিকেও ছেড়ে দিও না। একটিও যদি তোমার আওতার বাইরে থাকে, সেইটিই তোমাকে গ্রাস করে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট। *সংযম্য* বলতে নিয়মের অধীনে এনে, নিয়ন্ত্রণে এনে।' তারা থাকবে; আমরা তাদের ধ্বংস করব না। আমরা চাই এক অতি শক্তিশালী ইন্দ্রিয়তন্ত্র। কিন্তু তারা নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কোথাও যেতে গেলে যেমন আমাদের দরকার কতকগুলি শক্তিশালী অশ্ব—তবেই আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতে পারব। কিন্তু অশ্বগুলিকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। তা না হলে, তা হবে *অশ্বের* যাত্রা, তোমার যাত্রা নয়! তা হওয়া উচিত নয়।

তাই ঐ শ্লোকে বলা হয়েছে, *যুক্ত আসীত মৎপরঃ*, 'আমার শরণাগত হয়ে জীবনযাপন কর—মনঃশক্তি ও ইন্দ্রিয়শক্তিকে সংযত করে'। *বশে হি যস্য ইন্দ্রিয়াণি*, 'যার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ইন্দ্রিয়তন্ত্র' এবং তার অন্তর্গত শক্তিসমূহ, *তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা*—তারই জ্ঞান স্থিতিশীল হয়েছে'। যার জন্য মন ও বুদ্ধির অস্থিরতা হয়, তা হলো ইন্দ্রিয়তন্ত্র, তাকে তো আগেই বশীভূত করা হয়েছে। সেগুলিকে নিয়মানুবর্তী করে তুলতে হবে; চরিত্র গঠন প্রশিক্ষণের এইটি হলো সূচনা। শিশুরা কিছু ভুল করলে, মা বলবে, 'অমন কাজ করো না'। তাঁরা প্রথমেই কেন এটা কর, ওটা করবে না বলে থাকেন? কারণ শৈশব অবস্থায় ইন্দ্রিয়জ প্রেরণা শক্তির কিছু প্রশিক্ষণ দরকার। আমরা যতদিন তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি আমাদের পিতা মাতা আমাদের সাহায্য করবেন, তাঁরা অবশ্যই তা করবেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজেরাই ঐ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করি। আমরা জানি, কি করতে হবে, কি করতে হবে না, কতদূর অগ্রসর হতে হবে; এ ধরনের প্রশিক্ষণ আমরা নিজেরাই নিজেদের দেওয়ার চেষ্টা করে থাকি। এ রকম মন যা, প্রভূত শক্তিশালী ইন্দ্রিয়তন্ত্রকে নিয়মে রাখার ক্ষমতা রাখে; সে মন নিশ্চয়ই খুব স্থিতিশীল হয়।

আমরা ইন্দ্রিয়তন্ত্র থেকে শুরু করে থাকি। বাস্তবে, একটা পাথরের কথা ধর, তার কোন ইন্দ্রিয়তন্ত্র নেই। কেবল সজীব প্রাণীতেই ইন্দ্রিয়তন্ত্র বিদ্যমান। জীবকোষ থেকে মানুষ পর্যন্ত ঊর্ধ্বতন সব কোষে এই ইন্দ্রিয়তন্ত্র বর্তমান, সরল ও জটিল আকারে। সিম্পাঞ্জি স্তর পর্যন্ত ইন্দ্রিয়তন্ত্র বাহ্য জগৎ অথবা ইন্দ্রিয়ের বিষয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মনুষ্য স্তরেই কেবল ইন্দ্রিয়ের প্রেরণাকে 'না' বলার একটু ক্ষমতা দেখা যায়। ঐ 'না' বলার ক্ষমতাকে সু-লালিত, শক্তিশালী ও দৃঢ় করে তুলতে হবে। যার পেছনে কালক্ষেপ করার অর্থ আছে সেটিকে নিয়েই অগ্রসর হতে হবে, অন্যগুলিকে নিয়ে নয়। ঐ শক্তি আসে কেবল আধ্যাত্মিকতা থেকেই। এই ধরনের প্রশিক্ষণেই উচ্চমানের চরিত্র গঠন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব। আর তাই এসেছে এই ভাবটি, *বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি*, 'ইন্দ্রিয়গুলি যার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে,' *তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা*, 'তারই বুদ্ধি *দৃঢ়প্রতিষ্ঠ*'। এই মনুষ্যশরীর তো মৃতদেহ স্বরূপ। কি বস্তু একে প্রাণবন্ত করে? ইন্দ্রিয়শক্তি, ঐ শক্তি শরীরকে প্রভূত শক্তির কেন্দ্রে পরিণত করে, আর সেই শক্তির পরিচালনার ভার রাখতে হবে আমার নিজের হাতে। অন্য কেউ আমার জন্য, তা করতে পারে না; যদি আমি তাদের পরিচালনা করতে না পারি, তবে ঐ শক্তিগুলিই আমাকে পরিচালনা করবে। তাতে আমাদের জীবনে একের পর এক ব্যর্থতা আসবে।

এই সত্যই গীতা আমাদের কাছে তুলে ধরবেন ৬৪ ও ৬৭ সংখ্যক—দুটি চমৎকার শ্লোকে। তাই এই ৬১ তম শ্লোকে আলোচিত হচ্ছে ইন্দ্রিয়তন্ত্রের ব্যবহার নিয়ে। এর ব্যবহার না জানলে—আমাদের পড়তে পড়তে শেষে সম্পূর্ণ বিনাশ প্রাপ্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। অল্প সময়ে এমনটি ঘটে না। ধাপে ধাপে, ধীরে ধীরে আমরা গড়িয়ে নেমে যাই। এই গড়িয়ে নেমে যাওয়াই মানব জীবনের এক চমৎকার অভিজ্ঞতা। তুমি যদি অল্প ঢালু রাস্তায় একটি গাড়ি রাখ, সে গাড়িটি ধীরে ধীরে নিচে নামতে আরম্ভ করবে—যদি তুমি গতিরোধক প্রক্রিয়ার প্রয়োগ না করে থাক; পরে সেটি আরো দ্রুত অধোগতিসম্পন্ন হয়ে শেষপর্যন্ত ধ্বংস হবে। সেই রকম, মানবতন্ত্রে অধোগতির প্রবণতা রয়েছে। গীতা ঐ বিষয়ে পরবর্তী দুটি প্রসিদ্ধ শ্লোকে আলোচনা করবেন ঃ

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ৬২ ॥

—'বিষয় সমূহের চিন্তা করতে করতে তাদের প্রতি মানুষের আসক্তি জন্মায়, আসক্তি থেকে সেটি লাভ করার কামনা জাগে, না পেলে কামনা ক্রোধে পরিণত হয়।'

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎস্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥

—'ক্রোধ থেকে আসে মোহ এবং মোহ থেকে স্মৃতি শক্তির বিলোপ হয়। স্মৃতি বিভ্রমে মানুষের সদসদ্ বিচার বুদ্ধি বিনষ্ট হয় এবং বিচার বুদ্ধি বিনষ্ট হলে মানুষের আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না।'

জীবনে আমাদের অধঃপাত হয় কিভাবে? মনে কর, তুমি একটি কারাগার দর্শনে গেছ; তুমি দেখলে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে কারাগারে রাখা হয়েছে। সে কী করেছিল? সে, একজন নর কিংবা নারী, এক দোকান থেকে কিছু জিনিস চুরি করেছিল; এই পর্যন্তই। এখন পর্যালোচনা কর চৌর্যবৃত্তি কিভাবে লোকটির মধ্যে এল। কিভাবেই বা তা বেড়ে উঠল, শেষ পর্যন্ত কিভাবে তাকে কারাগারে আসতে হলো। তুমি দেখবে এই শ্লোকগুলিতে তার উত্তর রয়েছে। *ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ,* 'যখন তুমি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় নিয়ে বার বার চিন্তা করতে থাক, আর দেখছ তারা কত আকর্ষণীয়, তখন কি হয়? *সঙ্গস্তেষু উপজায়তে*—'মনে তাদের জন্য আসক্তি জন্মায়।' 'আমি এটা পছন্দ করি।' প্রথমে আমি

কেবল দেখছি। পরে, আমি আকৃষ্ট হয়ে গেছি, আসক্ত হয়েছি, বস্তুটির প্রতি। তারপর কি হয়? *সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ*, 'আমি অবশ্যই ওটিকে পেতে চাই', ঐ ইচ্ছা বা কাম—আসে ঐ আসক্তির মাধ্যমে।' তাই, প্রথমে বিষয় দর্শন, সেটিকে নিয়ে বহুক্ষণ চিন্তন, বিষয়ের প্রতি *আকর্ষণ*, পরে সেটিকে *লাভ* করার বাসনা। আর যদি লোকে বাধা দেয়, *কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে*, 'কামনা থেকে ক্রোধের উদ্রেক'—যদি কেউ তল্লাভে বাধা সৃষ্টি করে। তরপর কি হয়? *ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ*, 'ক্রোধ হলে মোহ দেখা দেয়।' তুমি পরিবেশের কথা ভুলে যাবে, তোমার নিজ ব্যক্তিত্বের কথাও ভুলে যাবে, তোমার বংশপরিচয় ভুলে যাবে, সে অবস্থায় সব কিছুই ভুল হয়ে যায়। তাই, মনস্তত্ত্বে বলা হয়, নর-নারী যতক্ষণ ক্রোধের বশে থাকে, ততক্ষণ সে উন্মাদ। ক্ষণিক উন্মত্ততাকেই ক্রোধ বলে। সে সময় তুমি সব রকম সম্পর্ক হারিয়ে ফেল। তখন কী হয়? *ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ, 'ক্রোধ থেকে সম্মোহঃ'*, মোহ বা ভ্রান্তির উদ্ভব হয়। এরপর তোমার স্বচ্ছ চিন্তা থাকে না। সব কিছুই গোলমাল হয়ে যায়। সে সময় মনের প্রকৃতি এমনই। যেটি যেমন সেটিকে তেমন ভাবে দেখতে পায় না। তারপর, *সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ*, 'সম্মোহ থেকে তুমি স্মৃতি শক্তি হারিয়ে ফেলো।' 'তুমি কে? তোমার পদ কি? তোমার পরিচয় কি? তুমি যে একটি সৎ পরিবারভুক্ত—সেসব ভুলে যাও। তাই তুমি তখন অসৎ কাজে লিপ্ত হতে তৈরি হয়ে যাও। সব রকম দুর্বলতা এসে গেছে; ঠিক যেমন শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে—নানারকম ব্যাধির প্রকোপে তখন বাইরের থেকে সবরকম অধিবিষের আমন্ত্রণ হয়। শরীর তাদের সুযোগ দেয়, ফলে শরীর পূর্ণমাত্রায় দোষযুক্ত হয়ে পড়ে। মনেরও ঠিক সেইরকমই হয়। এইভাবে শেষপর্যন্ত আমরা তলিয়ে যাই। *ক্রোধাৎভবতি সম্মোহঃ, সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ, স্মৃতি ভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ*, 'যখন স্মৃতি লুপ্ত হয়, সেই সঙ্গে আমাদের পরিবেশ পরিচয় প্রভৃতির স্মৃতিও চলে যায়, তখন *বুদ্ধিনাশঃ*।' 'সেই ভাল-মন্দ নির্ণয় ক্ষমতা, সেই বিচার শক্তি, একমাত্র যে শক্তি নির্ণয় করতে পারে—কী কর্তব্য আর কী অকর্তব্য—সেটি পুরাপুরি চলে যায়'; *বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি*, 'বুদ্ধিনাশহেতু তোমার সব কিছু শেষ হয়ে যায়'। এইভাবে, ধাপে ধাপে আমাদের অধঃপতন ঘটে।

আমাদের অবশ্যই জানতে হবে, মনের প্রকৃতিকে; তবেই আমরা এর বিরুদ্ধে লড়াই করে আরো সুস্থ ও সুস্থিত ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে পারি। তাই, এই দুটি শ্লোকে বলা হয়েছে, ভাল লোকেও মন্দ কাজ করে থাকে ও পরে নানা দুর্ভোগের শিকার হয়। বহির্বিশ্বে ভ্রমণকালে, আমি প্রায়ই সংবাদপত্রে

পড়তাম—সুপার বাজারে চুরি হয়েছে। অনেক দেশে—ভারতেও আমরা এখন সুপার বাজার চালু করেছি—তুমি ভেতরে ঢুকে গিয়ে, কিছু জিনিস তুলে নিয়ে, সেগুলিকে কাউন্টারে এনে দাম দিয়ে চলে যাও। কিছু লোক সুপার বাজারে চুরি করে। আমেরিকায় বন্ধুরা আমাকে বলেছিল, যে প্রায় দশ শতাংশ জিনিস চুরি যায় কিন্তু এই দশ শতাংশকে রক্ষা করতে হলে বেশি খরচ হয় বলে তারা দশ শতাংশ ক্ষতি অগ্রাহ্য করেছে। কোন লোক, ভদ্রবেশী লোক, ঢুকলো—হতে পারে কোন কূটনীতিকের আত্মীয়, তিনি আকর্ষণীয় কিছু দেখে চুপি চুপি তার ব্যাগে পুরে নিলেন। কখনো কখনো তারা ধরা পড়ে যায়। তখন কল্পনা কর ঐ মর্যাদাহানিকর অবস্থার জন্য তার দুঃখের কথা। এই সব পরিস্থিতির কথাই বলা হয়েছে এই শ্লোক কটিতে। এইসব মন্দ সম্ভাবনাসমূহের কথা জেনে রাখা ভাল, তাহলে আমরা যথাযথ সাবধানতাসূচক ব্যবস্থা নিতে পারি। আমাদের বিচারবুদ্ধিকে জোরদার করতে পারি, যাতে ইন্দ্রিয়তন্ত্র থেকে উদ্ভূত শক্তি বিচারবুদ্ধির ক্ষয় না করতে পারে। আমরা যেন ইন্দ্রিয়তন্ত্রকে বুদ্ধির সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি; বুদ্ধি যেন ইন্দ্রিয়তন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়। সারথী যেন অশ্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়; অশ্বই যেন সারথীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই হলো উপনিষদ্ ও গীতার ভাষা। আর তাই, এ দুটি শ্লোকের পর, আমি যে শ্লোকটির কথা উল্লেখ করেছিলাম, সেই ৬৪তম শ্লোকটিতে বলা হচ্ছে ঃ

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

—'কিন্তু সংযতচিত্ত পুরুষ, প্রিয় বস্তুতে স্বাভাবিক আসক্তি ও অপ্রিয় বস্তুতে স্বাভাবিক বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হয়ে এবং নিজ ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে সংযত রেখে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের মধ্যে বিচরণ করে (দেহস্থিতির জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু মাত্রই গ্রহণ করে) চিত্তে চিরপ্রসন্নতা লাভ করেন।'

গীতায় আমাদের বলা হয়নি যে ইন্দ্রিয়ভোগ্য সংসার ত্যাগ করে কোন এক কোণে গিয়ে সন্ন্যাস জীবনযাপন করতে হবে, তা মোটেই নয়। সংসারে থাক, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের মধ্যেই থাক। এতে কোন দোষ নেই, কিন্তু যেসব শক্তির প্রবণতা রয়েছে তোমাকে নিচে টেনে নিয়ে যাবার তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে নিজশক্তি বৃদ্ধির জন্য তোমাকে কিছু কাজ করতে হবে। তাই, *রাগদ্বেষ-বিযুক্তৈস্তু,* যখন তুমি *রাগ* অর্থাৎ আসক্তি ও *দ্বেষ* অর্থাৎ অনাসক্তি থেকে নিজেকে বিযুক্ত কর এবং *বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়ৈঃ চরন্,* 'তোমার ইন্দ্রিয়তন্ত্রকে

ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহের মধ্যে বিনা বাধায় বিচরণ করতে দাও' (চরন্ অর্থাৎ বিনাবাধায় নড়াচড়া করা)।' কিন্তু *আত্মবশ্যৈঃ,* 'ইন্দ্রিয়গুলিকে বশে রেখেছেন এমন পুরুষের দ্বারা'; *বিধেয়াত্মা,* 'সংযত-চিত্ত পুরুষ', এমন পুরুষ, *প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি,* 'চিত্তপ্রসন্নতা, অর্থাৎ প্রকৃত শান্তি, স্থৈর্য, উদ্বেগহীনতা প্রাপ্ত হন।' মনের শান্ত, প্রফুল্ল ও মুক্ত অবস্থাকে *প্রসাদ* আখ্যা দেওয়া হয়। 'এরকম পুরুষই স্থৈর্য লাভ করেন'—*প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি*। মনের স্থৈর্য, প্রসন্নতা, লাভ করলে তোমার কি হবে? আজকাল আমরা জীবনের গুণগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলে থাকি। মনের এই অবস্থাতেই জীবনের ঐরূপ গুণগত উৎকর্ষ তোমার লাভ হয়ে থাকে। এই বিষয়টিই পরবর্তী শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে ঃ

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥

—'চিত্তের প্রসন্নতায় বা শান্তিতে সবরকম দুঃখের নিবৃত্তি হয়। কারণ শান্ত চিত্ত বুদ্ধিমান পুরুষ শীঘ্রই স্থৈর্যে প্রতিষ্ঠিত হন।'

যখন চিত্তে *প্রসাদ* বা শান্তি লাভ হয় তখন *সর্বদুঃখানাম্ হানিঃ* 'সব রকম দুঃখের নাশ হয়,'। সংসারের নানা প্রলোভনের মধ্যে বাস করছে, এমন সাধারণ লোকেরও অন্তরে এই স্থিরবুদ্ধি থাকে, তা আমি লক্ষ্য করেছি। ১৯৬০ খ্রিঃ আমি যখন কলকাতাস্থ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সম্পাদক, আমাদের আন্তর্জাতিক অতিথি আবাসে বসবাসকারী এক ব্যক্তি দশ হাজার টাকা সমেত একটি টাকার থলি ও সেইসঙ্গে উড়োজাহাজের টিকিট ও পাসপোর্ট হারিয়ে ফেলে বা বরং বলা যায় ঘরে ফেলে রেখে দিল্লী চলে যায়। সেখানে গিয়ে দেখে যে সবই হারিয়ে গেছে। তারপর আমাকে কলকাতায় ফোন করে। কি ঘটেছিল? এ ঘরটির দেখাশুনা করার ভার যে কর্মীটির ওপর ন্যস্ত ছিল সে দেখে—দশ হাজার টাকাশুদ্ধ থলিটি, টিকিটগুলি—সবই ঘরে পড়ে রয়েছে। দেখ ঐ কর্মীটির মহত্ত্ব, সে তো সামান্য সাতশত টাকা মাসিক বেতন পায়; তবু সে শান্তভাবে ব্যাপারটিকে অফিস-কর্তৃপক্ষকে জানালে, আর বলল "ঐ লোকটি জিনিসগুলি ফেলে যাওয়ায় কষ্টে পড়েছে, আপনারা যেন অবশ্যই জিনিসগুলি তার কাছে পৌছে দেন।" এই কর্মীটি সহজেই ঐ টাকাগুলি আত্মসাৎ করতে পারতো; তার প্রয়োজনও ছিল; কিন্তু, না! সে ব্যাপারটি অন্যভাবে দেখলো। এমনভাবে কোন ঘটনাকে দেখার রেওয়াজ ক্রমেই কমে আসছে। কি কারণ? ইন্দ্রিয়তন্ত্র অত্যন্ত প্রবল, আর তাদের নিয়ন্ত্রণকারী বুদ্ধি হলো দুর্বল।

অন্যলোকের সমস্যাকে নিজের করে দেখা হলো এক রকমের আধ্যাত্মিক সামর্থ্য। এ সামর্থ্যের অধিকারী সকলেই হতে পারে। কিন্তু সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে আবার কেউ কেউ এ সামর্থ্যের অধিকারী নাও হতে পারে। ভারতে বর্তমানে দু-ধরনের দরিদ্র লোক আছে, এক হলো সাধারণ দরিদ্র লোক, আর অন্যটি হলো যারা দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট ধনী। পরের থাকের লোকগুলির আছে অনেক, কিন্তু তাঁরা সব সময়ে আরো চায়, তাই তারা ভ্রষ্টাচারের পথে অতিরিক্ত চাহিদা মেটাবার চেষ্টায় থাকে; তাদের মধ্যে এই *বুদ্ধির* বিকাশ হয় না, কারণ এই বুদ্ধি হলো এক আধ্যাত্মিক গুণ, যা সামাজিক পদমর্যাদার ওপর নির্ভর করে না। সমাজের যে কোন স্তরের মানুষ এগুণের অধিকারী হতে পারে। তাই, *প্রসন্ন চেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে,* 'প্রসন্ন চিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি শীঘ্রই স্থিতিশীল হয়ে আসে।' এই অংশে এইটিই হলো গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি; ৬৪, ৬৫ সংখ্যক শ্লোক দুটির মিলিতভাবে ব্যাখ্যা এক সঙ্গে চলেছে। এবার যখন আমরা ৬৭তম শ্লোকে পৌঁছব, তখন এর বিপরীত ভাবটি দেখব। যখন *আত্মবশ্যৈঃ বিধেয়াত্মার* এই গুণটি মানুষের থাকে না, তখন সে নীতি ভ্রষ্ট হয়। এই সব ব্যাপারে প্রত্যেককেই আত্মপ্রচেষ্ট হতে হবে। এই সবই তো মানবিক সাফল্য। আকাশস্থ এক অজ্ঞাত স্বর্গে যাবার জন্য চেষ্টা না করে, এই পৃথিবীতেই এক সুরুচিসম্পন্ন মানুষ হয়ে, তোমার অন্তরে যে অনন্ত আত্মা লুকিয়ে আছেন তাকে উপলব্ধি কর না কেন?

কেবল একটি প্রাণী হয়েই থেকো না; মুক্ত হও; মানবজাতির কাছে এই হলো বেদান্তের চরম বাণী। কয়েকটি শ্লোকে এই কথাটি বার বার ব্যক্ত হয়েছে; ইন্দ্রিয়স্তরে এই সংযমই হলো *যোগ*; আর ইন্দ্রিয়-সুখের স্তরে পড়ে থাকাকেই বলে *ভোগ*। আমরা সকলেই জীবন শুরু করি *ভোগ* নিয়ে, কিন্তু বেদান্ত ও মানব-সম্ভাবনা বিজ্ঞান মানবজাতিকে বলে, সর্বক্ষণ এই *ভোগের* স্তরে থেকো না, একটু একটু করে *যোগ* স্তরে উঠে এসো। শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়টিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন—তুমি যদি *ভোগ থেকে যোগে* না ওঠ, তবে রোগে পড়বে, অর্থাৎ তুমি সব রকম মানসিক ও স্নায়বিক রোগের ও সামাজিক চাপের শিকার হবে। তিনি আবার তিন স্তরের *আনন্দের* কথা বলেছেন—যা সকলেই পেতে পারে, *বিষয়ানন্দ, ইন্দ্রিয়ভোগে* যে আনন্দ পাওয়া যায়, *ভজনানন্দ,* স্তব-স্তুতি ও *ভজন* গানে যে আনন্দ পাওয়া যায়, আর *ব্রহ্মানন্দ,* যা লাভ করা যায় আমাদের ব্রহ্মরূপ অনন্ত অমৃত স্বভাবের উপলব্ধিতে। অতএব এগিয়ে চল, ইন্দ্রিয় ভোগের স্তরে পড়ে থেকো না। শিশু সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় ভোগের স্তরেই থাকে।

সে যখন বড় হয় সে কিছু উচ্চতর ভোগের ইঙ্গিত পেতে পারে। সে ভাবে 'ঐদিকে যাই'। তা করতে গেলেই ইন্দ্রিয়তন্ত্রকে কিছুটা নিয়মে নিয়ে আসা চাই। আইনের অনুশাসন মেনে সুনাগরিক হতে গেলেও তোমার প্রয়োজন ইন্দ্রিয়তন্ত্রের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ, *গীতা* এরই ওপর বার বার জোর দেন—*উদ্দেশ্যরূপে নয়—এটাকেই চরম প্রাপ্তি হিসেবে নয়।* এই পর্যায়ের প্রথম *শ্লোকে* যখন শ্রীকৃষ্ণ *স্থিতপ্রজ্ঞের* স্বভাবের ব্যাখ্যা আরম্ভ করেছিলেন, তখন বলেছিলেন—তোমাকে সব রকম ইন্দ্রিয়াসক্তি বর্জন করে শূন্যমনা হতে হবে না। তাতেই মানুষ *স্থিতপ্রজ্ঞ* হয় না। মনকেও অন্তরস্থ আত্মার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। ইন্দ্রিয় স্তরের ঊর্ধ্বে তোমার নিজ অনন্ত সত্তাকে উপলব্ধি কর। তবেই নর বা নারী *স্থিতপ্রজ্ঞ* হয়। কেবল নেতিবাচক ত্যাগের মনোভাবকে বেদান্ত সাহিত্যে শ্রদ্ধাও করা হয় না, প্রচারও করা হয় না। এটিকে এমন কিছু হতে হবে, যা তোমাকে আনন্দ দেবে। ইন্দ্রিয়তন্ত্র তোমাকে যে আনন্দ দেয়, ইন্দ্রিয়তন্ত্রের ঊর্ধ্বে যার অবস্থিতি, তা তোমাকে সেই আনন্দের কোটি গুণ বেশি আনন্দ দেবে। এইরকম ভাষাই ব্যবহার করা হয়েছে উপনিষদে। আনন্দের স্বরূপ বিষয়ে অনুসন্ধানের প্রসঙ্গে *তৈত্তিরীয় উপনিষদে* বলা হয়েছে, যে পৃথিবীতে মানুষের আনন্দ, স্বর্গের দেবতাদের আনন্দ, ও অন্য সব রকমের আনন্দই—প্রত্যেকের এবং সকলের অনন্ত প্রকৃতিস্বরূপ যে আত্মা তার আনন্দের সামান্য অংশ মাত্র। অতএব, এই দুটি শ্লোক আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছে এ জগতের নানা স্তরে থাকার, কাজ করার ও আনন্দ উপভোগ করার। *গীতায়* এই বিষয়টির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

পরবর্তী ৬৬ তম শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬ ॥

—'অস্থির (অসমাহিত) ব্যক্তির (আত্মা সম্বন্ধে) জ্ঞান থাকে না। সে বিষয়ে এরূপ নর বা নারীর কোন ধ্যান-ধারণাও থাকে না; পরমার্থ বিষয়ে ধ্যান-ধারণাবিহীন লোকের কোন শান্তি নেই, আর যার শান্তি নেই সে সুখ পাবে কিভাবে?'

ধাপে ধাপে। কী সুগভীর মনস্তত্ত্বই না পাওয়া যায় এখানে! এটি কোন মত বা তত্ত্ব নয়, যা কেবল বিশ্বাসমাত্র করেই তুমি চলে যেতে পার; নিজে নিজেই পরীক্ষা করে দেখ, এটা সত্য কি না? তোমার মনকে, তোমার নিজ প্রতিক্রিয়াকে

পর্যালোচনা কর। তাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে, *নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য*, 'যে *অযুক্ত*, তার কোন *বুদ্ধি* নেই। যে *বুদ্ধি* দিয়ে আমাদের সুস্থির জীবন গড়ে তুলতে হবে ও আমাদের অন্তরের প্রকৃত স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করতে হবে, যুক্তি বিনা এবং ইন্দ্রিয়স্তরে সংযম ছাড়া সে *বুদ্ধি* আসে না।' যে *বুদ্ধি* আত্মার সঙ্গে যুক্ত, যে *বুদ্ধি* আত্মার নিজ স্পন্দনে স্পন্দিত 'সে বুদ্ধি ইন্দ্রিয়স্তরে আত্ম-সংযমে অভ্যস্ত না হলে আসতে পারে না।' এই হলো প্রথম ঘোষণা; *ন চাযুক্তস্য ভাবনা*, 'ইন্দ্রিয় সংযম বিনা কোনরূপ ধ্যান সম্ভব নয়।' *ভাবনা* কথাটি 'ধ্যান'-এর অর্থবোধক। এর অন্য অর্থ হলো, আধ্যাত্মিক কল্পনা—যে কল্পনা ধরতে পারে মানবীয় ব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মিক মাত্রা থেকে বিচ্ছুরিত বিকিরণসমূহকে। এ এক চমৎকার গুণ—কল্পনাশক্তি। এখানে এর অর্থ হলো, সেইরকমের ধ্যান, যা দিয়ে আমরা আমাদের দেহতন্ত্রকে সুস্থিত করে—ইন্দ্রিয়স্তরের পারে যার অবস্থান ক্ষণিকের জন্য তার দর্শন পাওয়া। *ন চাভাবয়তঃ শান্তিঃ*, 'ঐ রকম ধ্যানশীল মন বিনা কোন আপাত শান্তি পাবেন, কিন্তু মানসিক শান্তি আসে না।' আজকাল অতি উন্নত শিল্পভিত্তিক সভ্যতার যুগে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মানসিক উত্তেজনা ও চাপের মোকাবিলা করতে হয়। আর প্রত্যেকেই এই চাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য আগ্রহী, কারণ ঐরূপ চাপ ও উত্তেজনা নিয়ে তুমি তোমার জীবনে, এমনকি কাজেও, আনন্দ পেতে পার না। তুমি তোমার কর্মক্ষেত্রের পরিবেশে বিচরণকারী একটি প্রাণী মাত্র। যে ধ্যানপ্রবণ অবস্থায় তুমি আপনার মধ্যে আপনি পূর্ণ শান্তিতে বিরাজ কর, তা আসবে না, যতক্ষণ না তুমি তোমার অধঃস্তন ইন্দ্রিয়জ শক্তিতন্ত্রকে এইরূপে সংযত করছ। অবশেষে *অশান্তস্য কুতঃ সুখম্?* কি সুন্দর অভিব্যক্তি! ঐ *শান্তি* লাভ না হলে, কোথায় সুখ? মন সব সময়েই উত্তেজিত, তা হলে সুখ কোথায়? সুখ এক চমৎকার অবস্থা। যখন তুমি প্রসন্ন, তুমি শান্ত, তুমি পরিপূর্ণ, কেবল তখনই আসে সুখ। সুতরাং যদি সুখলাভই তোমার উদ্দেশ্য হয়, তবে মনকে তদনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে; আবার মনকে পরিচালনা করতে হলে, অধঃস্তন ইন্দ্রিয়তন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে; তবেই এক সুশৃঙ্খল আন্তরজীবনের সূচনা হবে।

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতো এক অজ্ঞেয়বাদী চিন্তাশীল ব্যক্তি তার *The Conquest of Happiness* গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে বলেছেন যে, সুখ পেতে হলে তোমার জীবনে তিনটি একীকরণ সম্পন্ন করতে হবে: তোমার ও সমাজের মধ্যে একীকরণ; তোমার ও বাহ্য প্রকৃতির মধ্যে একীকরণ; তোমার ও তোমার মনের অন্তর্জগতের মধ্যে একীকরণ।' *আত্মবশ্যৈঃ বিধেয়াত্মা*, 'তুমি যদি অন্তরে

কঠোর সংযম অভ্যাসের দ্বারা সম্পূর্ণ স্ববশীভূত হও', তবে তুমি ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহের মধ্যে স্বাধীনভাবে, অর্থাৎ অনাসক্ত হয়ে বিচরণ করতে পার। তা না হলে ওটি মনুষ্য জীবনের এক বিষাদজনক ঘটনার রূপ নেবে; যেমন পরবর্তী ৬৭-তম শ্লোকে ব্যাখ্যাত হয়েছে। তুমি গ্রীক সাহিত্য থেকে আমাদের মহাভারত পর্যন্ত নানা ধরনের সব বিয়োগান্ত পরিস্থিতিগুলি পর্যালোচনা করে দেখতে পার, এতে দেখবে সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত বিয়োগান্ত ঘটনায় ভরা। তেমনি সেক্সপিয়ার ও গ্যেটের ক্ষেত্রেও তাই। আমাদের চারিদিকেই বিয়োগান্ত পরিস্থিতি দেখতে পাই। এবার, এই মানব-জীবনের বিয়োগান্ত পরিস্থিতিকে এখানে একটি শ্লোকে তুলে ধরা হয়েছে। এমন বিয়োগান্ত পরিস্থিতি হয় কেন? কারণ, মানব সত্তায় বা তৎসংশ্লিষ্ট সত্তাগুলিতে নিয়মানুবর্তিতা বা সংযমের কিছুটা অভাব আছে। সেটি সুন্দর ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে পরের শ্লোকে ঃ

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭ ॥

—'বিষয়ের প্রতি ধাবমান ইন্দ্রিয়গুলির অনুসরণে যার মন ব্যস্ত, ঐ ইন্দ্রিয়গুলিই তার বিবেক বুদ্ধি হরণ করে নেয়—যেমন ঘূর্ণিঝড় জলে ভাসমান জাহাজকে বিপথে টেনে নিয়ে যায়।'

ইন্দ্রিয়গুলিকে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি হরণ করে নিয়ে যায়। 'ইন্দ্রিয়তন্ত্র যখন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি ধাবমান হয় মনও তাদের অনুসরণ করে'; *ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাম্ যন্মনোঽনুবিধীয়তে*; যখন মন ঐরকম কাজ করে, তখন মানব সত্তার কী দশাই না হয়; *তদস্য হরতি প্রজ্ঞাম্*, 'মানুষের যেটুকু প্রজ্ঞা থাকে তাও বিলুপ্ত হয়ে যায়।' দৃষ্টান্ত কি? *বায়ুর্নাবম্ ইব অম্ভসি*, 'সমুদ্রে ঝড় উঠলে তা যেমন ভাসমান জাহাজকে বিপথে নিয়ে যায়'। এই হলো বিয়োগান্ত পরিস্থিতি, আর সব বিয়োগান্ত পরিস্থিতির একটি সাধারণ লক্ষণ হলো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলা ও পারিপার্শ্বিক শক্তির দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়া। মঞ্চে অভিনীত বিয়োগান্ত নাটক দেখতে খুবই ভাল লাগে; কিন্তু স্বীয় জীবনে অভিনীত হলে তা হয় বিপজ্জনক। যাকে তুমি বিয়োগান্ত পরিস্থিতি রূপে দেখছ তা অবশ্যই তোমাকে অশুভের প্রভাব থেকে বিমুক্ত করবে, যাতে তুমি বিয়োগান্ত পরিস্থিতির হাত থেকে রেহাই পাও; ওরা এর নাম দেয় বিয়োগান্ত পরিস্থিতির বিশোধন তত্ত্ব। তুমি একটা বিয়োগান্ত পরিস্থিতি দেখলে; তোমার মধ্যে বিশোধন ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেল—এই কথাটি কোষ্ঠশুদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। বিয়োগান্ত

পরিস্থিতি দেখে তুমি পেয়ে যাও এক মানসিক বিশোধন। আশা করা যায়, এর পর তুমি আর ঐরূপ বিয়োগান্ত পরিস্থিতি ঘটাবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, লোকে বিয়োগান্ত পরিস্থিতি দেখে, নিজ জীবনে তার পুনরাভিনয় করে বসে। সেটি হয় আরো বড় ধরনের বিয়োগান্ত পরিস্থিতি। এমন পরিস্থিতির অবকাশ হতে দিতে নেই।

জগতের বহু সাহিত্যে সর্বত্র সর্বদা-ঘটিত এই মানবিক বিয়োগান্ত পরিস্থিতিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং একজন গ্রন্থকার সেটিকে অতি সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছেন। তিনি হলেন জার্মান নাট্যকার ও কবি গ্যেটে, তিনি তাঁর The Faust (দি ফাউস্ট) নামক গ্রন্থে এর রূপায়ণ করেছেন। ফাউস্ট হলো ঐ গ্রন্থের মূল চরিত্র। সম্ভবত ১৪ পরিচ্ছেদের একটি অংশের নাম 'বনে ফাউস্টের স্বগতোক্তি'। বনে বসে ফাউস্ট শান্তভাবে নিজের সঙ্গে কথা বলে চলেছেন। তিনি ভাবছেন, আমার কি হয়েছে। তারপরই আসছে সেই সুপ্রসিদ্ধ অংশটি ঃ

> **'অহো, মানবের ভগ্নদশার জন্য ঃ আমি জানি আমাদের বর্তমান ব্যর্থ প্রয়াসই কারণ। তুমি দিয়েছ সেই আনন্দ শান্তি যা আমাকে আনে দেবতাদের কাছে, আরো কাছে, আর দিয়েছ সেই অন্ধকার সঙ্গীটিকেও, যাকে আমি ছাড়তে পারি না, যদিও অবজ্ঞায় সে করে মোর দর্প চূর্ণ এবং একটি কথায়, একটি নিঃশ্বাসে, উল্টে দেয় তোমার সকল উপহার ও নষ্ট করে তাদের। আমার হৃদয়ে জ্বালিয়ে দেয় এক ক্রমবর্ধমান আগুন, যা জ্বলতে থাকে, যতদিন না বাসনার তাড়নায় আমি থুবড়ে পড়ি প্রাপ্তির দিকে, আর প্রাপ্তিতে অবসন্ন হই, বাসনার উপভোগে।'**

এরই নাম মানব জীবনে বিয়োগান্ত পরিস্থিতি। 'বাসনার তাড়নায় আমি থুবড়ে পড়ি প্রাপ্তির দিকে, আর প্রাপ্তিতে অবসন্ন হই বাসনার উপভোগে।' এই হলো মানুষের ভগ্নদশা। কোন দর্শন শাস্ত্র কি আমাকে সহায়তা করতে পারে এই বিয়োগান্ত পরিস্থিতির মধ্যে প্রবেশ না করার ব্যাপারে? গীতা ঐ দর্শনই উপস্থাপিত করছেন, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের কাছে নয়, কোন বিশেষ মতের কাছে নয়, কোন বিশেষ জাতির কাছে নয়—বিশ্বমানবের কাছে। আমাদের সামগ্রিক জীবনকে অবশ্যই সাফল্যমণ্ডিত করতে হবে। তার জন্য আমাদের চাই কোন বিজ্ঞান-সম্মত দর্শনের নির্দেশনা। দুটি চিত্রকে আমাদের সামনে অবশ্যই রাখতে হবে ঃ আমি কি চাই আমার জীবনের বিনাশ হোক? আমি কি চাই আমার জীবন-জাহাজের হোক ভরাডুবি আর আমি কষ্ট পাই?

অথবা আমি কি চাই আনন্দে ও শান্তিতে পূর্ণ হয়ে জীবনের শিখরে বিচরণ করি? ঐটিই আমার প্রশ্ন নিজের কাছে, আর এর উত্তর আমায় পেতেই হবে। এই ভাবেই *গীতা* প্রত্যেককে উচ্চতর জীবন লাভের সংগ্রামে প্রবর্তিত করছেন, তাতে কিভাবে জয়ী হওয়া যায় সে বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত, কিছু ধারণা জোগান দিয়ে, কিন্তু বলছেন প্রত্যেককে আত্মপ্রচেষ্টাতেই বা নিজে নিজেই একাজ করতে হবে। অন্য কেউ এ কাজ তোমার জন্য করে দিতে পারে না; এ কাজের জন্য অন্যকে বকলমা দেওয়া চলে না। বিবেকচূড়ামণিতে, ৫১ তম শ্লোকে শঙ্করাচার্য এ বিষয়টি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

ঋণমোচনকর্তারঃ পিতুঃ সন্তি সুতাদয়ঃ।
বন্ধমোচনকর্তা তু স্বস্মাদন্যো ন কশ্চন॥

—'যদি পিতা ঋণগ্রস্ত হয়, পুত্রাদি বা অন্য কেউ তার হয়ে, শোধ করতে পারে, কিন্তু পিতা দাসত্ব বা বন্ধনদশাগ্রস্ত হলে—তিনি নিজে ছাড়া অন্য কেউ সে দশা ঘোচাতে পারে না।' আবার ৫২-তম শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ 'যদি আমার মাথায় ভারি বোঝা থাকে,' *মস্তক-ন্যস্ত-ভার,* 'কেউ এসে আমার মাথা থেকে বোঝাটি নামিয়ে দিয়ে আমাকে মুক্তি দিতে পারে'; *ক্ষুধাধিকৃতদুঃখঃ তু বিনা স্বেন ন কেনচিৎ,* 'কিন্তু যদি কেউ ক্ষুধার্ত হয়, তাকে নিজেকে খেতে হবে, অন্য কেউ খেলে হবে না।' অতএব, ৫৪-তম শ্লোকে পাই—

বস্তুস্বরূপং স্ফুটবোধচক্ষুষা স্বেনৈব বেদ্যং ন তু পণ্ডিতেন।
চন্দ্রস্বরূপং নিজচক্ষুষৈব জ্ঞাতব্যম্ অন্যৈরবগম্যতে কিম্॥

কী চমৎকার এই শ্লোকটি!

'সত্যবস্তুর স্বরূপ', *বস্তুস্বরূপম্, বস্তু* হলো বেদান্তের একটি মূল্যবান পারিভাষিক শব্দ। যা কিছু অস্তিত্ববান তাকেই *বস্তু* বলা হয়। ঐ টেবিলটি *বস্তু,* তেমনি আত্মাও *বস্তু*। ব্রহ্মাও *বস্তু*; তারা সকলেই অস্তিত্ববান সত্যবস্তু। একটি হলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অপরটি ইন্দ্রিয়াতীত। *বস্তু-স্বরূপকে* কিভাবে জানবে? *স্ফুট বোধ চক্ষুষা স্বেনৈব বেদ্যম্,* 'তুমি অবশ্যই এ বস্তুকে নিজে উপলব্ধি করবে, স্বচ্ছ বিচারক্ষম চক্ষু উদ্ভাবন করে।' *বোধ-চক্ষু,* জ্ঞান-চক্ষু, বিচার-চক্ষু; *স্ফুট* কথার অর্থ হলো স্বচ্ছ; *স্বেনৈব বেদ্যম্,* 'অবশ্যই মানুষকে নিজে আপন আত্মপ্রচেষ্টায় জানতে হবে', *ন তু পণ্ডিতেন,* 'তোমার হয়ে একজন পণ্ডিত জেনে দেবে, এমন নয়।' তাঁর পর আসছে দৃষ্টান্ত ঃ *চন্দ্র স্বরূপম্ নিজ চক্ষুষৈব*

জ্ঞাতব্যম্, অন্যৈরবগম্যতে কিম্? 'পূর্ণচন্দ্রের সুন্দর রূপটি, অবশ্যই তোমাকে দেখতে হবে—স্বচক্ষে; তোমার হয়ে অন্য কেউ কিভাবে দেখবে?' বেদান্তে অনুক্ষণ এর ওপরেই জোর দেওয়া হয়, আমাদের নিজেদের মধ্যে উচ্চ থেকে উচ্চতর চেতনার উন্মেষ ঘটানর ওপর। ঐটিই হলো আধ্যাত্মিক উন্নতি ও সাফল্যের উপায়। *গীতা* হলো ঐ মানবিক উন্নয়নের বিজ্ঞান ও তার ক্রিয়া কৌশল : পশুসুলভ ভাব থেকে স্বাধীন ভাব, পশুসুলভ ভাব থেকে স্বর্গ সুখের আস্বাদন। আর সেই জন্যই পরবর্তী ৬৮-তম শ্লোকে বলা হয়েছে :

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

—'অতএব হে মহাবাহো, সেই নর বা নারীর জ্ঞান স্থিতিশীল প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার ইন্দ্রিয়গণ শব্দাদি বিষয় থেকে সর্বপ্রকারে নিবৃত্ত হয়েছে।'

তস্মাৎ 'অতএব', এই যদি সত্য হয়, তবে তার পর কী? *যস্য ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ নিগৃহীতানি সর্বশঃ,* 'যার ইন্দ্রিয়গুলি সব দিক (বিষয়) থেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে'। স্বাধীন দেশের নাগরিক হতে গেলে, আমাদের কিছুটা আত্ম-সংযম চাই; তাছাড়া নাগরিকত্ব বলে কিছুই থাকতে পারে না। আর নৈতিকতাবোধ, সবরকম উচ্চতর মূল্যবোধ, আসে এই ইন্দ্রিয়-শক্তি-সংযমন থেকে। ইন্দ্রিয় ও তার বিষয় পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। কিন্তু আমাকে দেখতে হবে, *তারা* যা করতে চায় তা যেন করতে না পারে। আমি চাই, *আমি* যা চাইব তারা তাই করবে। ঐ সত্যটি আবার তৃতীয় অধ্যায়ে উপস্থাপিত হবে আরো একটু বিস্তারিত ভাবে। *তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা* 'ঐ ব্যক্তির প্রজ্ঞা, বিচার বুদ্ধি, স্থিতিশীল হয়'। এই কথা বলে *গীতা* এক অপূর্ব ভাব পরিবেশন করেছে, যা চীনের মহাপুরুষ তাও-এর বহু উপদেশে পাওয়া যায়। ৬৯তম শ্লোকে বলা হয়েছে :

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯ ॥

—'যা সর্বভূতের কাছে রাত্রিস্বরূপ, তাতেই আত্মসংযমী পুরুষ জেগে থাকেন। যাতে ভূতগণ জেগে থাকে, তা আত্ম-দর্শী মুনির কাছে রাত্রিস্বরূপ।'

সংস্কৃত ভাষায় *নিশা* কথাটির অর্থ হলো 'নিদ্রা' বা 'রাত্রি'। তারপর *জাগর্তি*

কথাটির অর্থ 'জেগে থাকা'। অতএব, এই শ্লোকে এক চমৎকার লোকমত-বিরোধী সত্যের অবতারণা করা হয়েছে। *যা নিশা সর্বভূতানাং* 'সত্যবস্তুর যে ভাবটি সকল লোকের কাছে অন্ধকারস্বরূপ বলে বোধ হয়', *যোগী* সেখানে উজ্জ্বল আলোর অস্তিত্ব অনুভব করেন এবং *যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ,* 'সত্যবস্তুর যে ভাবটিতে লোকে উজ্জ্বল আলো দেখে *যোগী* সেখানে অন্ধকার দেখে'। এই হলো তুলনা—দুরকম দেখার মধ্যে। একটি ক্ষেত্রে যা *নিশা*; অন্য ক্ষেত্রে তা *নিশা* নয়, সেখানে তা *জাগ্রৎ*। এর বিপরীত ভাবও সত্য। *যোগী* আত্মোপলব্ধি করে, সে সম্পদ ও সুখের এবং ক্ষমতার পেছনে ছোটে না। যা হোক সংসারী লোকের উচ্চতর বিষয়ে কোন আগ্রহ থাকে না, সে বরং সুখী হয় যখন কেউ তার কাছে গিয়ে বলে, 'আমি লোভের বশে টাকার পেছনে ছুটবো, এমন কি লোককে ঠকাবো, মারামারি করব।' সে ক্ষেত্রে *যোগী* অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখে না।

শিশু খেলনা নিয়ে খেলে; এতেই সে প্রচুর আনন্দ পায়। কিন্তু পিতামাতা খেলনায় আগ্রহী নয়। তাদের খেলার জন্য অন্য ধরনের 'খেলনা' আছে। শিশুরূপে আমরা যখন খেলা করি—তাতে কতই না ডুবে থাকি, সে সময়ে খেলাই আমাদের সব কিছু। আমার মনে আছে, বালকরূপে আমরা যখন ফুটবল খেলেছি, রাত্রি হয়ে গেছে—বল দেখা যাচ্ছে না—তবু প্রত্যেকে খেলেই চলেছে; ঐ বয়সে এইটাই ছিল জীবনের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানব জীবনের এইটাই স্বভাব; আমরা একটা সুখ থেকে আর একটা সুখের দিকে, আরো উচ্চতর সুখের দিকে ধাবমান হই। তাই, বেদান্তে বলা হয়েছে, আনন্দের নানা মাত্রা আছে; একটার পর একটার অন্বেষণ আমাদের করে যেতে হবে; কোন একটি বিশেষ স্তরে গিয়ে থেমে গেলে চলবে না। কোন স্তরকেই অবজ্ঞা করা উচিত নয়; প্রত্যেক স্তরেরই একটা নিজস্ব মূল্য আছে। কিন্তু, এগিয়ে চল এগিয়ে চল; এই হলো বেদান্তের চরম বাণী *চরৈবেতি, চরৈবেতি,* 'এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো' যা বলা হয়েছে *যজুর্বেদে*; কোন একটা বিশেষ স্তরে পৌঁছে আটকে যেও না।

সভ্যতাগুলি যখন ইন্দ্রিয় ভোগের স্তরে পৌঁছে থেমে থাকে, তাদের ক্ষয় হয়, শেষে তারা ধ্বংস হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ একটি সুন্দর গল্পে বলেছিলেন, *এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও।* বাংলা ভাষায় যা, *এগিয়ে যাও,* হিন্দিতে তা *আগে বাঢ়ো,* ইংরেজিতে March Onward 'তালে তালে পা ফেলে অগ্রসর হও'। এক

কাঠুরে বনে কাঠ কাটতো, অল্প কাঠ, তাই বাজারে বিক্রি করে অন্ন সংস্থান করত; এইভাবে বহুদিন চলেছে। একদিন এক সাধু ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি কাঠুরেকে ঐ কাজে নিযুক্ত দেখে কেবল বললেন, *'এগিয়ে যাও'* আরো অগ্রসর হও। প্রথমে কাঠুরে ঐ কথায় তেমন গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু একদিন সে ভাবলো, আমি তো কেবল এখানেই কাঠ কাটছি। সাধুটি আমায় এগিয়ে যেতে বলেছিলেন। তাঁর কথামতো তাই করে দেখি না কেন? সে আরো একটু গভীর বনে ঢুকলো, সেখানে সে আরো ভাল ভাল কাঠ পেল, আর তা বিক্রি করে আরো বেশি টাকাও পেল; তখন সে বলে, এখানেই বা থামব কেন? আরো গভীরে যাই না কেন? তাই করে সে এক তামার খনিতে এসে পড়ল, তারপর সোনার খনি, শেষ পর্যন্ত হীরার খনিতে এল; এইভাবে সে প্রচুর ধন সম্পদের মালিক হলো। এই হলো শ্রীরামকৃষ্ণের *'এগিয়ে যাও'* গল্পটি। তাই, আধ্যাত্মিক জীবনও ঐরকম। *এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও,* আরো মহত্তর অভিজ্ঞতা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে; সকলের ক্ষেত্রেই এক একটি আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার অবস্থা তার জন্য অপেক্ষমান থাকে। এর পর আসছে এক অতি মহান উক্তি। কী সেই মনের স্বরূপ, যা উত্তেজিত হয় না, যা এইসব পারিপার্শ্বিক নানা চাপের মধ্যেও বিচলিত হয় না? একমাত্র একটি উপায় আছে *গীতার* এটিকে ব্যক্ত করার; তা হলো একটি বিশেষ উপমার মাধ্যমে। সেটি দেওয়া হয়েছে পরের শ্লোকে ঃ

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥

—'যেমন পরিপূর্যমাণ স্থির সমুদ্রে (নানা) নদীর (বন্যার) জল প্রবেশ করে, (সমুদ্র তবু আলোড়িত হয় না), তেমনি মুনির মনে বাসনারাজি প্রবেশ করলেও, তিনি শান্তিতে থাকেন, কিন্তু কাম্য বস্তুর কামনা যিনি করেন—তাঁর শান্তি বিঘ্নিত হয়।'

যে ব্যক্তি নানা বাসনার ও ইন্দ্রিয়ভোগের পেছনে ছোটে, সে এক ধরনের; আর এক রকম ব্যক্তি হলো, যিনি নানা ভোগবাসনার অনুপ্রবেশ সত্ত্বেও অন্তরে বিক্ষুব্ধ হন না—পরন্তু সম্পূর্ণ শান্ত ও স্থির অবস্থায় থাকেন। এর বাসনা, ওর

বাসনা, সব ঐ ব্যক্তিতে অনুপ্রবেশ করেও তাকে কোন ভাবেই উত্তেজিত করতে পারে না। সে মনের স্বরূপ কী? এটি এক বিশাল সমুদ্রের মতো, *আপূর্যমাণম্, অচল প্রতিষ্ঠম্ সমুদ্রম্; সমুদ্র,* 'সাগর'; *আপূর্যমাণম্,* 'কানায় কানায় ভর্তি'; এবং *অচল প্রতিষ্ঠম্,* 'পবর্তের মতো অচল'; *আপঃ প্রবিশন্তি,* 'জল প্রবেশ করে'; তদ্বৎ 'তেমনি'; কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে, 'যার ভেতর সব কামনা প্রবেশ করেও (তাকে বিচলিত করে না)', *স শান্তিম্ আপ্নোতি,* 'সেই-ই শান্তি লাভ করে'; *ন কামকামী* 'কামের কামনাকারী নয়'। বৌদ্ধ ভাষায়, তারা বলে, *বোধি চিত্তম্, চিত্তম্* অর্থাৎ একজন বুদ্ধের মন। *বোধি চিত্ত* এক আশ্চর্য *চিত্ত* বা মন। সেখানে সব কিছুই প্রবেশ করতে পারে, তবু চিত্তের প্রশান্তি নষ্ট হয় না। তাই, এই শ্লোকটি সেইরকম মানব সত্তার উল্লেখ করেছে, যিনি স্বীয় অন্তরে প্রচণ্ড শক্তি ও স্থৈর্যের প্রতিষ্ঠা করেছেন; পারিপার্শ্বিক নানা আকর্ষণ তার মনে কোন বিরূপভাব আনতে পারে না; ঐ ব্যক্তি সম্পূর্ণ শান্ত ও স্থির, 'বিশাল হ্রদ যেমন আলোড়ন শূন্য হয়ে থাকে, *মহাহ্রদবৎ অক্ষোভ্যমানঃ,* যেমন শঙ্করাচার্য বলেছেন, *কঠোপনিষদের* ভাষ্যে। তাই, এই বিশেষ শ্লোকটিতে অর্জিত পূর্ণতার কথাই উল্লিখিত হয়েছে। এবং তাই,

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

—'যিনি ইন্দ্রিয়াসক্তি শূন্য, সমস্ত বাসনা ত্যাগ করেছেন, 'আমি' ও 'আমার' বোধ বর্জিত হয়ে জীবনযাপন করেন, তিনি শান্তিলাভ করেন।'

'আমি' ও 'আমার' থেকেই বাসনা। যদি তোমার সঙ্গে একত্ব বোধ করি, আমার বাসনা ততটুকু কম হবে। তখন তোমার বাসনা তৃপ্তিই হবে আমার আকাঙ্ক্ষা। তাই, সুস্থ সমাজে আমরা সংযতমনা লোক পেয়ে থাকি। অপরের ক্ষতি করে আমি কিছু পেতে চাই না। আবার আমি অপরের জন্য কাজও করব। সেইখানেই আসে সাধুতা, নীতিবোধ। *স শান্তিম্ অধিগচ্ছতি,* 'সে শান্তি লাভ করে'। অন্য ক্ষেত্রে কেবল লোভই থেকে যায়।

আগে আমি শ্রীমদ্ভাগবতের (১১.৭.২৯) রাজা যদুর আখ্যানটি উল্লেখ করেছিলাম, সেখানে রাজা এক শান্ত আত্ম-প্রতিষ্ঠ পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর দেখা পান; রাজা সন্ন্যাসীকে প্রশ্ন করেন, আপনি কিভাবে পূর্ণ যৌবনে এইরূপ শান্তির অধিকারী হলেন? 'যে বয়সে অন্যেরা নানা বাসনায় দগ্ধ হচ্ছে', *জনেষু*

দহ্যমানেষু। এ থেকেই বোঝা যায় যে আলোচিত বিষয়টি কেবল তত্ত্ব বা মত নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতা।

এবারে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ, ৭২-তম শ্লোকে আসা যাক। এই শ্লোকটি ঘোষণা করছে যে মানবের ক্রমোন্নতির চরমে—ইহ জীবনেই, এই মানব শরীরেই—পৌঁছান যায়।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাঽস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

—'এই (স্থিতপ্রজ্ঞ) অবস্থা হলো, মানবের ব্রহ্মে অবস্থান, *ব্রাহ্মী স্থিতি*, হে পৃথাপুত্র, এই অবস্থা লাভ করে, কেউই মোহগ্রস্ত হয় না। অন্তিমকালেও এ অবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে, মানবের ব্রহ্মের সহিত একত্বানুভূতি হয়।'

এষা, 'এই হলো' (হাত দিয়ে দেখিয়ে) *ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ*, 'হে অর্জুন, একেই বলে *ব্রাহ্মী স্থিতিঃ*, ব্রহ্মে তথা পরম ও অন্তরতম সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া'; *নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি*, 'একবার এ অবস্থা প্রাপ্ত হলে মোহ আর তোমাকে পরাভূত করতে পারবে না।' *স্থিত্বা অস্যাম্ অন্তকালে অপি ব্রহ্মনির্বাণম্ ঋচ্ছতি*, 'তুমি জীবনের অন্তিমকালেও যদি এ অবস্থায় পৌঁছুতে পার, তখনও তুমি *ব্রহ্ম নির্বাণম্*, ব্রহ্মে *নির্বাণ*, ব্রহ্মের সহিত একত্বভাব প্রাপ্ত হবে', এই পৃথিবীতেই, অন্য কোন স্বর্গলোকে নয়; এ অবস্থা যৌবনে প্রাপ্ত না হলেও, ধীরে ধীরে যথেষ্ট অধ্যাত্ম শক্তি সঞ্চিত হলে বৃদ্ধ বয়সেও, শরীরের পতন হবার আগেও এ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। *স্থিত্বা অস্যাম্ অন্তকালেঽপি*, 'মৃত্যুর ঠিক পূর্বেও এ অবস্থা লাভ করে', *ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি*, 'ব্রহ্মের সহিত একত্ব ভাব প্রাপ্ত হবে'।

শঙ্করাচার্য এ বিষয়ে যা মন্তব্য করেছেন তা খুবই প্রেরণাদায়ী; তা হলো ঃ 'যদি তুমি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেও ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হও, তা হবে অতি চমৎকার; কিন্তু আরো কত বেশি চমৎকার ব্যাপার হবে যদি তা কম বয়সে, যৌবনে প্রাপ্ত হয়ে—তারই অনুপ্রেরণায় সারা জীবন কাটানো যায় !'

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমাদের সকলের কাছে এই বাণীই দেওয়া হয়েছে। এ বাণী যুক্তিযুক্ত, কার্যকর ও এ বাণী বিশ্বজনীন। আমাদের সকলেই এই মনোভাব অন্তরে জাগিয়ে তুলতে পারি, আর এই সাফল্য আমরা এই জীবনেই অর্জন করতে পারি। এই হলো *গীতার* শিক্ষা।

আজ দ্বিতীয় অধ্যায়ের পাঠ সম্পূর্ণ হলো। এরপর আমরা *কর্মযোগ* সংজ্ঞক

তৃতীয় অধ্যায়ে প্রবেশ করব। এই অধ্যায়ে সংশয় ও তার মীমাংসাগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে; এই সংশয় যেমন অর্জুনের তেমনি তোমার এবং আমারও। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে যোগের দার্শনিক তত্ত্ব ও সাধনা ব্যাখ্যাত হয়েছে এবং চতুর্থ অধ্যায়ে দেখা যাবে যে এই যোগে সমগ্র জীবনের আধ্যাত্মিকতাই ব্যাখ্যাত হয়েছে, কেবল প্রার্থনাকালীন জীবনের অধ্যাত্মবোধটুকুই নয়। 'তুমি আধ্যাত্মিক' এ কথার অর্থ হলো তোমার জীবন ও কর্মের পরিপ্রেক্ষিতে তোমার আধ্যাত্মিক প্রকৃতির স্বরূপ কি, তা তোমার জানা আছে। সমাজে, অধিকাংশ লোকই গৃহস্থ, যাদের নির্দিষ্ট কাজ করতে হয়, সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালন করতে হয় ও শিশুদের দেখাশুনা করতে হয়; কোন মরমী ভাবের আবেশে অভিভূত হয়ে তারা গদিওয়ালা আরামকেদারায় অথবা অন্য কোথাও শুয়ে থাকতে পারে না; তারা আধ্যাত্মিক হবে তাদের জীবন ও কর্ম অনুযায়ী। যেখানে তুমি কর্মী, সেখানে তোমাকে ঐ কর্মের প্রতি নজর দিতে হবে। এই ভাবে *গীতা,* আধ্যাত্মিকতা যে আমাদের জন্মগত অধিকার—সে কথার ওপর জোর দিয়ে—আমাদের কর্মজীবনকে গভীর আধ্যাত্মিকভাবে গড়ে তোলার উপযোগী যোগের বাণী আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। আমাদের প্রকৃত স্বরূপ হলো—অনন্ত, অমৃত স্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্ম।

এখানে সেই গূঢ় ও সূক্ষ্ম আত্ম-সত্যের একটি বর্ণনা দেওয়া হয়েছে; যা প্রাচীন ঔপনিষদিক ঋষিদের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছিল, এবং আধুনিক কোয়াণ্টাম ও কণা-বিষয়ক পদার্থবিদ্যায় যার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। কঠোপনিষদে (১.২.২০-২১) বলা হয়েছে ঃ

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতু প্রসাদাৎ মহিমানমাত্মনঃ॥

—আত্মা পরমাণুর মতো বস্তুকণার থেকে ক্ষুদ্রতর, আবার মহৎ বা কসমস (ব্রহ্মাণ্ড) থেকেও বৃহত্তর; এটি নিজ নিজ জীবাত্মারূপে সকল জীবের হৃদয়-কন্দরে বর্তমান; এর মহিমা সেই সব ব্যক্তির দ্বারা অনুভূত হয়, যারা সব বাসনা ত্যাগ করে মন ও ইন্দ্রিয়তন্ত্রের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আয়ত্ত করেছেন; এরূপ ব্যক্তিই তখন সব রকম দুঃখ থেকে মুক্ত হন।'

আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ;

—'একস্থানে অবস্থান করেও, আত্মা দূর-দূরান্তরে চলে যান, শয়নে থেকেও সর্বত্র ঘুরে বেড়ান।'

Tao of Physics গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক ফ্রিজফ্ কাপ্রা তাঁর Uncommon Wisdom নামক তৃতীয় গ্রন্থে, দৃঢ়প্রতিষ্ঠ নিউটনীয় কার্যকারণ তত্ত্বের স্থলাধিকারী Principle of Uncertainty in Quantum Physics -এর আবিষ্কর্তা ওয়ারনার হাইসেনবার্গের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন উল্লেখ করে বলেছেন (পৃঃ ৪২-৪৩) ঃ

"আমি হাইসেনবার্গকে প্রাচ্য দর্শন সম্বন্ধে তাঁর নিজের ভাবনা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমায় খুবই আশ্চর্য করে বললেন—তিনি যে কেবল পদার্থবিদ্যার কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও প্রাচ্য চিন্তাধারার মধ্যে সাদৃশ্যগুলি সম্বন্ধে অবহিত তাই নয়, পরন্তু তাঁর নিজ বৈজ্ঞানিক গবেষণাও অন্তত অবচেতন স্তরে, ভারতীয় দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত।"

'১৯২৯ খ্রিঃ হাইসেনবার্গ কিছুদিন প্রখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতিথি হয়ে ভারতে কাটিয়েছিলেন, তখন তাঁদের মধ্যে বিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বহু কথাবার্তা হয়েছিল। এইভাবে ভারতীয় চিন্তাধারায় প্রবিষ্ট হয়ে তিনি যে খুবই তৃপ্ত হয়েছেন, সে কথা তিনি আমায় বলেছেন। তাঁর প্রত্যক্ষ হতে থাকে যে আপেক্ষিকতা, পারস্পরিক সম্বন্ধতা ও অনিত্যতাকে বাস্তব সত্যের মৌলিক ভাব রূপে স্বীকৃতি দান, যা তাঁর নিজের ও সহ-পদার্থবিদ্দের পক্ষে খুবই দুরূহ ছিল, তা ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের একেবারে ভিত্তিস্বরূপ। তিনি বলেন, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে এইসব কথোপকথনের পর, যে সব ভাবকে আগে বাতুলতার নিদর্শন বলে মনে হতো—সহসা সেগুলিকে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ বলে বোধ হতে লাগল। এই সাক্ষাৎ আমার পক্ষে খুবই সহায়ক হয়েছিল"।'

প্রজ্ঞানম্ ব্রহ্ম, 'ব্রহ্ম হলেন শুদ্ধচৈতন্য স্বরূপ'—এটি *ঐতরেয় উপনিষদের* কথা; *অয়মাত্মা ব্রহ্ম,* 'এই জীবাত্মা হলেন ব্রহ্ম'—এটি *মাণ্ডুক্য উপনিষদের* কথা। *কঠোপনিষদের* (২.২.১৫) যে কথা—'এই আত্মা সকল আলোকের আলোকস্বরূপ'—যা প্রতিধ্বনিত হয়েছে, বাইবেলের নব সুসমাচারে (New Testament-এ)—'যে আলোক মর্ত্যে সমাগত প্রত্যেকটি জীবাত্মাকে আলোকিত করে'—এই বাণী, তা হলো ঃ

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ ;
তম্ এব ভান্তম্ অনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বম্ ইদং বিভাতি ॥

—'(আত্মায়) সূর্যালোকের দীপ্তি নেই, নেই চন্দ্রালোকের ও নক্ষত্রালোকের; নেই বিদ্যুৎছটারও; (গৃহে রক্ষিত) অগ্নির কী কথা, আত্মার দীপ্তিতে অন্য সব কিছু দীপ্তিমান হয়; আত্মার আলোকেই প্রকটিত বিশ্ব হয় আলোকিত।'

বহুত্বে একত্বরূপ সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম আলোকিত করছে সম্পূর্ণ প্রকটিত বিশ্বকে—একথা মুণ্ডক উপনিষদে (২.২.১১) দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে সানন্দে ঘোষিত হয়েছে ঃ

ব্রহ্মৈবেদম্ অমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম
পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ;
অধশ্চোর্ধ্বং চ প্রসৃতম্
ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বম্ ইদং বরিষ্ঠম্—

—'এই সমগ্র প্রকটিত বিশ্ব তো কেবল অবিনশ্বর ব্রহ্মই; সামনে ব্রহ্ম, পেছনে ব্রহ্ম, ডান দিকে ব্রহ্ম, বাঁদিকে ব্রহ্ম; এই প্রকটিত বিশ্ব শুধুই এই পূজনীয় ব্রহ্ম।'

এই মহান *যোগ*-বিজ্ঞান, যা কর্মজীবনে প্রযোজ্য বেদান্ত নামে খ্যাত ও *গীতার* দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে প্রথম ব্যাখ্যাত—তা পরবর্তী অধ্যায়গুলির ভাবসমূহের দ্বারা আরো দৃঢ় ও পরিপুষ্ট হবে।

তৃতীয় অধ্যায়ে প্রবেশের পূর্বে আমি দুটি সত্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত করতে চাই। প্রথমত *গীতায়* আধ্যাত্মিক সত্যগুলি বার বার তুলে ধরা হয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবে এই ব্যাখ্যাতেও তা করা হয়েছে। সাহিত্যে পুনরাবৃত্তিকে একটি দোষ বলে ধরা হয়। কিন্তু, শঙ্করাচার্য তাঁর উপনিষদ্-ভাষ্যে প্রাচীন *মীমাংসকদের* উক্তি উল্লেখ করে দেখিয়েছেন, 'অধ্যাত্ম সত্য বোঝাতে পুনরুক্তি দূষণীয় নয়', *ন মন্ত্রাণাম্ জামিতা অস্তি*। সেগুলি সহজে বোঝা ও ধরে রাখা যায় না, তাই এ বিষয়ে পুনরুক্তির সহায়তা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত এই শেষ শ্লোকের এবং *গীতা* ও উপনিষদের অনুরূপ উক্তিসমূহের গুরুত্ব যেখানে মানবীয় ক্রমবিকাশের আধুনিক জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির

পরিপ্রেক্ষিতে, বলা হয়েছে যে, মানবজীবনের উদ্দেশ্য হলো আধ্যাত্মিক অনুভূতি, যা *এখানেই* ও *এখনই* লাভ করা যায়, কাল্পনিক মরণোত্তর স্বর্গে নয়।

আধুনিক জীববিজ্ঞান মানব সত্তার অনন্যতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং মানবিক ক্রমবিকাশের উদ্দেশ্যকে বোঝবার ও তা লাভের পথ সম্বন্ধে নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এই ব্যাপারটি আমি প্রয়াত প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী স্যার জুলিয়ান হাক্সলির নিজের ভাষাতেই তুলে ধরছি, যেমন তিনি তাঁর Evolution : The Modern Synthesis শীর্ষক শেষ গ্রন্থে মূল অংশের শেষ দুই পৃষ্ঠায় লিখেছেন, যেটি তার সত্যকথন, স্বচ্ছতা ও সাহসিকতার জন্য আমি খুব পছন্দ করি। আমার The Message of the Upanisads গ্রন্থটি* পড়ে তিনি আমাকে একটি পত্র দিয়েছিলেন—সেটি ও আমার বিস্তারিত উত্তরটি—যা এখন ঐ গ্রন্থের পরিশিষ্টে (P. 571-72) স্থান পেয়েছে—তা হলো :

"উপনিষদগুলির রচনাকাল বিবেচনা করলে, সেগুলি যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, সে বিষয়ে আমি সহমত...।

"আমার Essays of A Humanist রচনা সংগ্রহে এবং Evolution : The Modern Synthesis গ্রন্থে আমি নানারূপে বিকশিত ক্রমবিকাশের রীতি, পদ্ধতি ও মূল প্রবণতাগুলিকে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।'

হাক্সলি তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থে মানবীয় ক্রমবিকাশের প্রণালী ও লক্ষ্য স্থিরীকরণের কতকগুলি অবস্থার (শর্তের) কথা উল্লেখ করেছেন :

এক : 'এটি একেবারে স্তব্ধ অথবা অধোমুখী যেন না হয়।' এই বিষয়ে ভারতের বেদান্ত শিক্ষা দেয়—যেহেতু জীবন হলো সাফল্যে উপনীত হবার এক জয়যাত্রা, একে কোন স্তরেই থেমে যেতে দেওয়া উচিত নয়; এটি প্রকাশ পেয়েছে *কঠোপনিষদের* (অধ্যায়-৩) উদাত্ত আহ্বানে, স্বামী বিবেকানন্দকৃত যার সহজভাষ্য হলো 'Arise! Awake! and stop not till the goal is reached'— 'ওঠো! জাগো! লক্ষ্যে না পৌঁছে থেমো না।'

আবার, 'আর এই মানবীয় উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কেবলই মানবজীবনে অর্জিত নতুন গুণাবলী অনুযায়ীই তা সূত্রায়িত করা যেতে পারে।'

এই চাহিদা মেটাতেই বেদান্তে চার *পুরুষার্থের* ধারণা—'মানবের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যাবলী' প্রবর্তিত হয়েছে।

আবার, 'আমাদের নির্ধারিত গুরুত্ব অনুযায়ী—মানব বহুভাবে প্রাণীকুলের

* গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ 'উপনিষদের সন্দেশ' ('উদ্বোধন', জুলাই, ১৯৯৮) পৃঃ ৫৩৭, ৫৪০ দ্রষ্টব্য।

মধ্যে অনন্য; তার উদ্দেশ্য নির্ধারণের পূর্বে তার অনন্য বা বিশেষ গুণাবলীর সঙ্গে তারও অন্য সব প্রাণীর মধ্যে সাধারণ গুণগুলিও বিবেচনা করতে হবে।'

উপরোক্ত চার *পুরুষার্থের* শিক্ষাতেও এ বিষয়টির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে; এই শিক্ষায় শেষ *পুরুষার্থ* অর্থাৎ মোক্ষ বা আধ্যাত্মিক মুক্তির বিশেষ উল্লেখ আছে; আর সে বিষয়ে আধুনিক জীববিদ্যার কিছুই জানা নেই। হাক্সলি (তদেব পৃঃ ৫৭৭) আরো বলেন ঃ

'স্পষ্টতই মানুষের পক্ষে সামগ্রিক ভাবে তার নিজের পছন্দমতো একটি উদ্দেশ্য সূত্রাকারে স্থির করা সহজ হবে না।'

এর উত্তরে বেদান্তে দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে, যে বেদান্তের পদ্ধতিতে ঐ কাজ সহজ হবে এবং মানবীয় সম্ভাবনা বিজ্ঞান তথা মানব সত্তার গভীরতা বিজ্ঞানের সূত্র অনেক অনেক আগে থেকে প্রবর্তন করে তা সহজ করাও হয়েছে। তা থেকে আমরা মানবীয় ক্রমবিকাশের লক্ষ্য এবং তার পথ ও পদক্ষেপের একটি পূর্ণায়ত মানবীয় ক্রমবিকাশ বিজ্ঞানের সমস্ত উপাদানই পেতে পারি। *মূল্যবোধ বিজ্ঞান যে ভৌতবিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের মধ্যে সেতুস্বরূপ*—এ সত্য বেদান্তে পূর্বেই সূত্রায়িত হয়েছিল।

হাক্সলি বলে চলেছেন ঃ 'এর মধ্যে বহু চেষ্টা হয়ে গেছে। আজ ব্যক্তির ওপর সমাজের কর্তৃত্ব ও ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠত্ব—এই দুই-এর মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে তার অভিজ্ঞতা আমাদের হচ্ছে।'

বেদান্ত দুটিকেই স্বীকৃতি দিয়েছে; কোন কোন স্তরে সমষ্টির মতই গ্রহণীয়; অন্য সব স্তরে তার মত গ্রাহ্য নয়, ব্যক্তিকেই শীর্ষে স্থান দেওয়া হয়েছে।

পরে হাক্সলি বলেন ঃ 'আর একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখনও চলেছে, তা হলো—পরলোকে কোন ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে লক্ষ্য স্থির করার ভাবনা, আর ইহজীবনেই উন্নতি বিধানের দিকে স্থিরলক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া, এ দুই-এর মধ্যে এইরূপ বড় ধরনের দ্বন্দ্বের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত মানব জাতির কোন একক মহান উদ্দেশ্য থাকতে পারে না এবং উন্নতি যদি হয়ও তা হবে একটু একটু করে—ধীরে ধীরে।'

হাক্সলি ও পাশ্চাত্যের অধিকাংশ মননশীল ব্যক্তিগণ এবং বহু ভারতীয় আধুনিক চিন্তাবিদ্ জানেন না যে, বেদান্ত বহুপূর্বেই ইহলোক ও পরলোকের দ্বন্দ্ব দূর করে দিয়েছেন—উপনিষদ্ এবং ভগবদ্গীতার মাধ্যমে। এদের

সবগুলিতেই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও জীবনের সাফল্যকে, জোরালো ভাষায়, একটি নিগূঢ় অভিজ্ঞতারূপে দেখান হয়েছে—যা, *এখানে* ও *এখনই*, এই জগতেই, এই শরীরেই লাভ করতে হবে। *মুণ্ডক উপনিষদে* (১.২.১০) কোন অতিপ্রাকৃত স্বর্গে গমনের বাসনার বিরুদ্ধে জোরাল ভাষায় বলেছেন ঃ

ইষ্টাপূর্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং
নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ;
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বে-
মং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি। (মুণ্ডক, ১,২,১০)

—'তারা একেবারে মূর্খ, যারা মনে করে, ইহলোকে কিছু যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে পুণ্য অর্জন করে শ্রেষ্ঠ স্বর্গসুখ ভোগ করবে আর ভাবে যে এর থেকে শ্রেয়স্কর আর কিছু নেই; কিন্তু স্বর্গে সুখভোগের পর, পুণ্যক্ষয় হয়ে গেলে— তাদের এই মনুষ্য-জগতেই ফিরতে হয়, অথবা আরো নিম্নস্তরে নেমে আসতে হয়।'

একই ভাব গীতাতেও (৫.১৯) পাওয়া যায় ঃ

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ —গীতা ৫/১৯

—'এখানেই (এই মরলোকেই) তাঁরা পারস্পরিক সম্পর্ক যুক্ত সাংসারিক অস্তিত্বকে জয় করেন—যাঁরা মনকে *সাম্যে* বা একত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছেন; কারণ, ব্রহ্ম তো সব রকম মন্দভাব শূন্য ও সর্বভূতে সমভাবে বর্তমান; অতএব, এইরূপ লোক ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত।'

হাক্সলি আরো বলেন ঃ 'এই রকম বড় বড় দ্বন্দ্বগুলির মীমাংসা না হলে, মানবজাতি কোন একটি মুখ্য উদ্দেশ্যে স্থির হতে পারে না।'

এই বিষয়টি আমি আমার Practical Vedanta and The Science of Values (কলকাতা অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশনা) গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি।

বর্তমান যুগে, যখন সমগ্র জগতে বেদান্তের ভাব ছড়িয়ে পড়বে, যখন জগতের বিভিন্ন অংশের চিন্তাশীল লোক বুঝবে ঃ হ্যাঁ, এইখানেই রয়েছে সমগ্র মানবজাতির উপযোগী একটি চরম উদ্দেশ্য; যেমন দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে

উল্লিখিত হয়েছে, যা প্রত্যেকের সাধ্যানুযায়ী অনুসরণ করতে হবে; আর হাক্সলির মতো ঐকালের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বলবেন ঃ হাঁ, এখন আমরা মানবীয় ক্রমবিকাশের এক সাধারণ উদ্দেশ্য আবিষ্কার করেছি, যথা, ব্রহ্মের বা আত্মার বা সমগ্র ক্রমবিকাশের অনন্ত ও অদ্বিতীয় উৎসের উপলব্ধি—যার জন্য ক্রমবিকাশের ফলে মানব সত্তায় সংযোজিত হয়েছে প্রয়োজনীয় জৈব সামর্থ্য; অতএব মানবসত্তার 'ব্রহ্মোপলব্ধির সামর্থ্য রয়েছে'। *ব্রহ্মাবলোক ধিষণাম্*, *শ্রীমদ্ভাগবতে* একে যেমনভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। শঙ্করাচার্য একটি মানুষের জীবৎকালেই তার এই উপলব্ধিকে সমগ্র বিশ্বের *উৎস* বলে উল্লেখ করেছেন এবং তদীয় *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্* ভাষ্যে—তুলনা করেছেন ভারতীয় *পৌরাণিক* দৃষ্টিতে সৃষ্টি শেষে, *প্রলয়কালে*, ব্রহ্মে লীন হওয়ার সঙ্গে; আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানেও একই রকম দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে বলা হয়েছে—কালে, কোটি কোটি বছর পরে, সমগ্র বিশ্ব সঙ্কুচিত হবে এককত্বের অবস্থাতে (State of Singularity)(কারণ, বুদ্ধিতত্ত্ব তাদের কাছে তখনো গ্রহণীয় হয়নি)।

আর এক চমৎকার ব্যাপার হলো, শঙ্করাচার্য *মহাভারতের বিষ্ণুসহস্রনামের*, ১৯-তম শ্লোকের ভাষ্যে—*ত্বষ্টা* (বিষ্ণুর ৫২তম নাম)-কে সেই তেজরূপে গ্রহণ করেছেন যা *তনুকৃতম্*, *প্রলয়* বা ব্রহ্মাণ্ডের লয় (Cosmic dissolution) কালে বিশ্বকে সঙ্কুচিত করে।

ইতি সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

—এই হলো সাংখ্য এবং যোগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের সমাপ্তি।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

তৃতীয় অধ্যায়

কর্ম যোগ

কর্মের যোগ

আমরা গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের পর্যালোচনা সম্পূর্ণ করেছি, বিশেষত শেষ কয়টি শ্লোকের যেখানে যোগদর্শন আলোচিত হয়েছে ও শেষ করা হয়েছে *স্থিতপ্রজ্ঞের*, সুস্থির প্রজ্ঞাবিশিষ্ট ব্যক্তির, প্রকৃতি নিয়ে। এবং সমগ্র অংশটি শেষে রয়েছে শেষ শ্লোকের ঘোষণা : *এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ,* 'অর্জুন, এই হলো *ব্রাহ্মী স্থিতি*, 'ব্রহ্মে, চরম সত্যে, প্রতিষ্ঠিত অবস্থা, *নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি*, 'যদি, তুমি এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হও, তবে তুমি কখনই মোহে পড়বে না'। *স্থিত্বাঽস্যাম্ অন্তকালেঽপি*, 'মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও যদি এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হও, *ব্রহ্ম নির্বাণম্ ঋচ্ছতি*, 'তুমি ব্রহ্মে নির্বাণ, অর্থাৎ সমাধি লাভ করবে'।

গত কয়েক সপ্তাহে আমি অনেকবার বলেছি, স্থির মন, দৃঢ়চিত্ততা, মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এলোমেলো মন—যা চঞ্চল হয়ে ওঠে সামনে পড়া সামান্য মনোমোহনকারী বস্তু দেখে, তা তোমার কোন কাজে লাগবে না জীবনের পরিপূর্ণতা অর্জনের ক্ষেত্রে। তাই, মনের প্রশিক্ষণই হবে আমাদের মহত্তম কাজ—তা সংসার জীবনের জন্যই হোক, আর উচ্চতর জীবনের জন্যই হোক। মনকে তোমার বন্ধু করে নাও, সেই কথা গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে বলা হবে, মনকে শত্রু করে তুলো না। প্রায়শই আমাদের মনই আমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, আর আমরা সে জন্য কষ্ট পাই। সমগ্র শিক্ষা ও ধর্মের এবং মানবের সবরকম পারস্পরিক সম্বন্ধের উদ্দেশ্য কেবল এইটিই : কীভাবে মনকে দৃঢ় স্থির ও জীবনের পরিপূর্ণতা অর্জনের যন্ত্রস্বরূপ করতে পারি। তাই, দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে ছিল সেই উচ্চগ্রামের উক্তিটি *এবং জোরের সঙ্গে বলা হয়েছিল ঐ অবস্থা উপলব্ধি করা চাই এখানে ও এখনই, ইহলোকে এই জীবনেই,* সুদূর কোন স্বর্গরাজ্যে নয়। ঐ ভাবের অভিব্যক্তি চাই, বারংবার। আমাদের শ্রেষ্ঠ কাজ হবে এই : সম্পূর্ণভাবে সংযত জীবন, আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন মন আর জীবনের পরিপূর্ণতা লাভের জন্য ঐ মনের প্রশিক্ষণ।

বেদান্তের চিন্তায়, পর জীবন বা পুনর্জন্মের কথা কেবল তখনই আসে যখন এই জীবনেই উদ্দেশ্য পূরণে সফলকাম না হই। তখন বেদান্তের কথা হলো— আচ্ছা, তুমি আর একটু সুযোগ পাবে। এ বিষয়টি ষষ্ঠ অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু সব থেকে ভাল কাজ হবে জীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়া এই জীবনেই সম্ভব করে ফেলা; *ইহৈব, ইহৈব* অর্থাৎ 'এখানেই' *গীতার* ৫ম অধ্যায়ের ১৯তম শ্লোকে একথা বলা হয়েছে। এতে একটু বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। ঐ জোরের সঙ্গে, মনের প্রশিক্ষণের ওপর এবং নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধের বিকাশের ওপর জোরও দেওয়া হয়েছে; কেবল এগুলির দ্বারাই এই জীবনেই পরিপূর্ণতা লাভ করা সম্ভব। *এই* যদি আদর্শ হয়, তবে নিছক আচার অনুষ্ঠানাদির কোন অর্থই থাকে না; আর আমরা এই জীবনেই ও এখানেই ঐ আদর্শ জীবন রূপায়ণে সফল হতে চাই, দূরে অন্য কোথাও নয়। এইভাবে আমরা ৩য় অধ্যায়ে প্রবেশ করছি, যেখানে অর্জুন আরও একটি প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়েছেন, আর যেমন গত রবিবারে বলেছিলাম, দেখা যাবে এই সব প্রশ্নগুলির অধিকাংশই আমাদের নিজেদের প্রশ্ন। এই বিষয়টির ওপর আমাদের মনেও প্রশ্ন জাগে। তাই কখনো অর্জুন প্রশ্ন করছেন, আবার কখনো শ্রীকৃষ্ণ প্রশ্নটিকে ধরে নিয়ে তার উত্তর দিচ্ছেন। এইভাবে তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভ হচ্ছে দুটি শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্ন দিয়ে ঃ

অর্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১ ॥

অর্জুন বললেন—'হে জনার্দন (কৃষ্ণ) আপনার মতে যদি জ্ঞান কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়, তবে হে কেশব, কেন আমাকে এই ভয়ানক হিংসাত্মক কর্মে নিয়োজিত করছ?'

হে কৃষ্ণ, আপনি যদি মনে করেন কর্ম অপেক্ষা বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ, যে *বুদ্ধি-যোগের* সম্বন্ধে পূর্ব অধ্যায়ে ৪৯তম শ্লোকে, উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, '*যোগ-বুদ্ধি* জাগিয়ে তোলো'; যদি আপনি তাই মনে করেন, তবে 'কেন আমাকে এই ভয়ানক কর্মে নিয়োজিত করছেন?'

তৎ *কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব?* আমি *যোগবুদ্ধি* জাগিয়ে তুলবো। (তবে) কেন আমাকে যুদ্ধের তাণ্ডবে নেমে পড়তে বলছেন? এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন। পরে তিনি প্রশ্নটিকে আরো বিশদভাবে বুঝিয়ে বলছেন ঃ

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২॥

—'এই সব আপাত পরস্পরবিরুদ্ধ কথায় আপনি যেন আমার বোধশক্তিকে গোলমালে ফেলে দিচ্ছেন, নিশ্চিতভাবে একটি পথ বলে দিন, যে পথে গেলে সর্বোচ্চ সিদ্ধি পাব।'

'বিভ্রান্তিকর কথা দিয়ে যেন' আপনি আমার মনকে মোহগ্রস্ত করছেন। *ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন*, 'বিভিন্নভাবে মিশ্রিত কথা দিয়ে'। তার ফলে আমার মন বিভ্রান্ত হচ্ছে, মোহগ্রস্ত হচ্ছে। *তদ্ একম্ বদ নিশ্চিত্য* 'তাই, সেই পথটির কথা নিশ্চিত করে আমাকে বলুন', যেন *শ্রেয়োঽহম্ আপ্নুয়াম্*, 'যা আমার পক্ষে কল্যাণকর হবে বলে আপনি মনে করেন।' এই হলো অর্জুনের প্রার্থনা। আগের অধ্যায়ের ৪৯তম শ্লোকে আমরা দেখেছি, *দূরেণ হ্যবরম্ কর্ম বুদ্ধিযোগাৎ ধনঞ্জয়* 'আমাদের সাধারণ কর্ম *বুদ্ধি-যোগের* তুলনায় নিকৃষ্ট'। অতএব *বুদ্ধৌ শরণম-ন্বিচ্ছ*, 'বুদ্ধির শরণ নাও।' তাই অর্জুন সেই সূত্র ধরে বলছেন ঃ আমি বুদ্ধিকে জাগিয়ে তুলবো, আমি এই ভাবকে জাগিয়ে তুলবো; কেন আমাকে কাজ করতে হবে? কেন আমি এই কাজে আমার শক্তিক্ষয় করবো, বিশেষত, যুদ্ধের মতো এই ভয়ানক কাজে? এই হলো প্রশ্ন। আর শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ে ও পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এরই জবাব দিচ্ছেন।

গীতায় বার বার আলোচিত এই বিষয়টি এমনই যে, তা ভারতীয় মনকে শত শত বছর ধরে উদ্বিগ্ন করে রেখেছে। *কর্ম বনাম অকর্ম*—এই বিষয়টি ধর্ম সাহিত্যে বার বার আলোচিত হয়েছে ঃ আমরা কেন সক্রিয় হবো? আমরা কেন নিশ্চুপ হয়ে থাকবো না? যেমনই হোক, আত্মা তো সম্পূর্ণভাবে কর্মহীন। আমি যদি আত্মা হতে চাই, আমাকেও তো কর্মহীন হতে হবে; তাই এই অকর্ম-তত্ত্বের একটা মস্ত আবেদন রয়েছে ভারতীয় মনে। কেন আমাকে কাজ করতে হবে? এই চিন্তা এমন ভাবে গড়ে উঠেছে যে আলস্য ক্রমেই মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে! চিন্তার এই ঐতিহ্যের জন্যই তার *নৈষ্কর্ম্য* অথবা কর্মহীনতা, ভারতীয় মনে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রাধান্য পেয়ে আসছে; সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে এই ভাবটি আরও জোরদার হয়ে উঠেছে *নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি* নামক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বৈদান্তিক গ্রন্থটির প্রভাবে। যার অর্থ অকর্মের পথে *শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি*। ঐ *নৈষ্কর্ম্যের* ভাব ধীরে ধীরে গৃহস্থের মনকেও প্রভাবিত করেছে; আর যখনই নৈষ্কর্ম্যের তাৎপর্য সম্যকভাবে উপলব্ধি না হয়েছে, তখনই তা জাতিকে ধ্বংসের পথে

ঠেলে দিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ 'কর্ম ও অকর্ম' বিষয়টি *গীতায়* বিশ্লেষণ করেছেন; কিন্তু কেবল বর্তমান যুগেই *গীতার* অর্থ সঠিকভাবে বোধগম্য হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের প্রায়োগিক বেদান্তের ওপর তেজঃপূর্ণ উপদেশাবলীর মাধ্যমে। প্রকৃত আধ্যাত্মিক পদ্ধতিতে কর্ম অকর্ম হয়ে যায়—এ শিক্ষা *গীতার* ৪র্থ অধ্যায়ের ১৮ নং শ্লোকে পাওয়া যায়; এই অধ্যায়ে, শ্রীকৃষ্ণ কর্ম ও অকর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন এবং কর্মের গুরুত্বের ওপরও জোর দিয়েছেন, যেমন দেখা যাবে নানা শ্লোক আলোচনাকালে।

শ্রীভগবান্ উবাচ

শ্রীভগবান বলেছেন—শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীভগবান বলা হয়েছে, মহাভারতে ও অন্যান্য সাহিত্যে; 'সেই পরমেশ্বর' বললেন ঃ

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩॥

—'হে নিষ্পাপ অর্জুন, সৃষ্টির আদিতে জগৎকে আমি দুটি পথ দেখিয়েছিলাম, একটি জ্ঞান-পথ জ্ঞানীদের জন্য, অন্যটি কর্ম-পথ *যোগী* (অর্থাৎ কর্মযোগী)-দের জন্য।' দ্বিতীয় অধ্যায়ের মাঝামাঝি শ্রীকৃষ্ণ নিত্য শুদ্ধ মুক্ত স্বভাব নিষ্ক্রিয় আত্মার কথা বলেছেন, *এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু,* 'এখন পর্যন্ত আমি তোমাকে *বুদ্ধির* কথা বলেছি, যার অনুরাগ ছিল *সাংখ্যের* প্রতি, কর্মহীন ও হৃদয়ের গভীরে ধ্যানে প্রতিষ্ঠিত জীবনের প্রতি। এখন *বুদ্ধিতে* প্রতিষ্ঠিত *যোগ*-পথের যে সব কথা বলছি তা শোন।' যদি জ্ঞানের পথে উচ্চতম *মোক্ষে* পৌছান যায় তবে নিষ্কাম *কর্মের* পথেও উচ্চতম *মোক্ষে* পৌছান যাবে। এই দুটি পথই রয়েছে। গীতা বলবেন, এ দুটির মধ্যে *কর্ম-যোগো বিশিষ্যতে,* '*কর্মের* পথই শ্রেয়ঃ।' এ থেকে *অভ্যুদয়* ও *নিঃশ্রেয়স* দু-রকম ফলই পাওয়া যায়। এ হলো গীতায় সেই এক ভাবনার বিকাশ যে, কোন এক বিশেষ আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ার সহায়তায় তুমি কর্মকে অকর্মে পরিণত কর ঃ তুমি নৈষ্কর্ম্যের ফল পাবে কর্মেরই মাধ্যমে। এ এক অসাধারণ সাধনা। চীন দেশের তাও দর্শনেও এ বিষয়টির ওপর খুব জোর দেওয়া হয়। বস্তুত, বর্তমান ব্যবস্থাপন-কৌশলে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয়। আমেরিকায় থাকতে MIT-র সঙ্গে যুক্ত এক চীনা বৈজ্ঞানিকের লেখা একটি গ্রন্থ পড়েছিলাম; তাতে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, এই সব ব্যবস্থাপন কৌশলে তুমি সব সময়ে কাজ করছ, কিন্তু কোন একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক কৌশল অবলম্বনে

তুমি ক্রিয়াকর্ম থেকে ক্ষান্ত হয়ে যাও। মনের একটি শান্ত ও স্থির অবস্থা আছে যখন তুমি অনেক কাজ কর কিন্তু তা তোমার অনুভূতির মধ্যেই আসে না, তুমি তার কোন ভার বোধই কর না। আজকাল আধুনিক ব্যবস্থাপন কৌশলে এইরকম গবেষণা অনেক বেশি প্রশংসা পাচ্ছে। প্রচণ্ড দায়িত্বভার রয়েছে, তৎসত্ত্বেও কাজের মধ্যেই তুমি নৈষ্কর্ম্যের ফল লাভ করছ। শ্রীকৃষ্ণ এই ভাবটিকে গীতার ৫/১৮ শ্লোকটিতে প্রকাশ করেছেন। এখানে তার কারণ দেখিয়েছেন ঃ

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

—'কাজ না করে কেউ নৈষ্কর্ম্য অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়তা (মোক্ষ বা নিষ্ক্রিয় আত্মারূপে অবস্থিতি) লাভ করতে পারে না; কেবলমাত্র কর্ম ত্যাগ দ্বারা কেউ পূর্ণতা অর্জন করতে পারে না।'

এটি একটি অতিস্বচ্ছ সরল উক্তি। *ন কর্মণাম্ অনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে,* 'প্রকৃত নৈষ্কর্ম্য, নিষ্ক্রিয়তা কাজ না করে অর্জন করা যায় না'। আমি কাজ না করে নৈষ্কর্ম্য অবস্থা লাভ করব—তা কখনো হয় না; ন চ সংন্যসনাৎ এব, 'কর্ম ত্যাগ করেও না', *সিদ্ধিং সমধি গচ্ছতি* 'কারও আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভ হয় না।' প্রথমে কাজ আরম্ভ কর, তারপর তা ত্যাগ কর। এই হলো *সংন্যাসন্*; অন্যটি হলো *কর্মণাম্ অনারম্ভ*, 'কোন কাজ আরম্ভই না করা'। এই শ্লোকের এই চিন্তাধারাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ; সমাজের ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য বহুধা বিস্তৃত। কিছুক্ষণ কঠোর পরিশ্রম করার পর, তুমি এখন ঘণ্টাখানেক জিরিয়ে নাও। সারাদিন কাজ করার পর, সন্ধ্যায় তুমি ধ্যান বা উচ্চতর আধ্যাত্মিক উপাসনাদির মাধ্যমে বিশ্রাম কর। তোমার বেশ ভাল লাগে। তা না করে, সারাদিন অলসভাবে বিনা কাজে কাটিয়ে, তুমি চাও ঐ ধ্যানানন্দ! তা কি সম্ভব? এ যেন এক বেকার লোককে এক মাসের ছুটি দেওয়ার কথা বলা! বেকারের কাছে ছুটির কী অর্থ? কাজে নিযুক্ত লোকই একমাত্র ছুটি উপভোগ করতে পারে। কিন্তু আমাদের লোকেদের এখনো এই শিক্ষাটি হয়নি। বেশ কিছুদিন কঠোর-পরিশ্রম করার *পরেই* কেবলমাত্র ছুটি-উপভোগের প্রকৃত আনন্দ লাভ করা যায়। প্রথমে কর্ম, তারপর আসবে *নৈষ্কর্ম্য*। আমাদের সকলকে বিশেষত ভারতবাসীকে উল্লেখ করেই শ্রীকৃষ্ণের ঐ উক্তি ঃ নৈষ্কর্ম্যের আনন্দ লাভ সম্ভব হয়, কর্ম-প্রচেষ্টায় তোমার শক্তি উজাড় করে দেওয়ার পরেই। তাই তিনি বলেছেন, *ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি*, 'কেবল কর্ম-ত্যাগেই

তুমি নৈষ্কর্ম্যের পূর্ণ সাফল্য লাভ করতে পার না। কর্মতত্ত্বই হলো এক নিগূঢ় জ্ঞানের বিষয়।' শ্রীকৃষ্ণ পরবর্তী অধ্যায়ে ১৭শ শ্লোকে বলবেন, *গহনা কর্মণো গতিঃ* 'কর্মের গতিপ্রকৃতি রহস্যময়,' দুর্জ্ঞেয়।

প্রায় ৮০ বছর আগে, একজন খুবই প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক, মনে হয় তিনি এল, পি. জ্যাকসিই হবেন, এই সত্যটির উল্লেখ করেন ঃ তুমি যদি কর্মের গতি লক্ষ্য করে চল, তবে শেষে দেখবে তা নৈষ্কর্ম্যে পরিণত হয়েছে, আর যদি নৈষ্কর্ম্যর গতি লক্ষ্য করে চল, শেষে দেখবে কর্মই রয়েছে। সকল সমাজেই এরকম দেখা যায়। কর্ম আমাদের কাছে এক রহস্যময় দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ একই কথা ব্যবহার করেছেন ঃ গহনা কর্মণো গতিঃ, 'কর্মের তত্ত্ব রহস্যময়', দুর্জ্ঞেয়। তাই তিনি এই তত্ত্বটির ওপর আলোকপাত করেছেন এই অধ্যায় এবং পরবর্তী অধ্যায়ে। তিনি বলে চলেছেন ঃ

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫ ॥

—'কর্ম না করে কেউ ক্ষণকালও থাকতে পারে না; কারণ সকলেই প্রকৃতি (বা স্বভাব) জাত গুণের (বা শক্তির) প্রভাবে অসহায় হয়ে কাজ করতে বাধ্য হয়।'

নর বা নারী ক্ষণকালের জন্যও কোন না কোন কাজ না করে বসে থাকতে পারে না। ভাষাটি লক্ষণীয়! প্রত্যেকেই কাজ করছে; নানা ব্যাপার চলেছে। মৃত্যু ছাড়া প্রকৃত কর্মলেশহীন অবস্থা কোথায়? তুমি বলতে পার একটা টেবিল বা চেয়ার তো কর্মহীন। কিন্তু মানুষ সর্বদাই একভাবে বা অন্যভাবে কাজ করেই চলেছে। *ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ*, 'কোন কাজ না করে, কেউই ক্ষণকালের জন্যও থাকতে পারে না।' *কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ* 'সকলেই স্বভাবজ গুণের প্রভাবে অসহায় হয়ে কাজ করে।' মানব জীবন এইভাবেই চলে। একটা কিছু আমাদের টেনে এনে কাজে লাগায়। সেইটি হলো আমাদের অন্তরস্থ প্রকৃতি। আমাদের একাজ, সেকাজ বা অন্য কোন কাজ করিয়ে প্রকৃতি নিজে অভিব্যক্ত হয়। অতএব, এইটিই হলো প্রথম শিক্ষা, তা আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে। আমি যদি হায়দ্রাবাদ থেকে চলে যাই, ছুটি কাটাতে কাশ্মীরে সেখানেও আমি কাজ করি। তবে অন্য ধরনের কাজ, এই পর্যন্ত। তবু কাজ চলেছেই। ছুটিতেও কাজ, কিন্তু যে ধরনের কাজ করছিলাম তেমনটি নয়; কাজের পরিবর্তন হয়, এই পর্যন্ত। সব ছুটিতেই কেবল কাজের ধরন বদলায়,

ভিন্ন পরিবেশ অনুযায়ী, এই পর্যন্ত। *কার্যতে হি অবশঃ কর্ম, অবশ,* 'তোমার ইচ্ছা না থাকলেও।' *রাজসিক, তামসিক* ও *সাত্ত্বিক* প্রকৃতি রয়েছে আমাদের অন্তরে; রাজসিক প্রকৃতি আমাদের বাধ্য করে, একাজ সেকাজ করতে। তাই বলা হয়, আমরা কাজকে এড়িয়ে যেতে পারি না। যদি তাই হয়, তবে আমি কিভাবে কাজ করব? পরবর্তী দুটি শ্লোকে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে—তাই শ্লোক দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ; তাতেই রয়েছে একটি নিগূঢ় কর্মদর্শন।

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬॥

—'যে মূঢ় ব্যক্তি কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে, মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা করে সেই মোহগ্রস্ত ব্যক্তিকে মিথ্যাচারী বলা হয়।'

এখানে শ্রীকৃষ্ণ সাবধান বাণী উচ্চারণ করছেন! তা এই যে, তুমি যদি 'এমনটি কর, তুমি মিথ্যাচারী হবে। পরবর্তী ৭ম শ্লোকে তিনি এর অপর দিকটি তুলে ধরছেন ঃ এই ভাবেই কাজ করতে হয়, যার ফলে তোমার মহত্তম পরিণাম লাভ হয়। প্রথম আচরণ মিথ্যাচারীর কাজ; দ্বিতীয় আচরণে ব্যক্তির প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি পায় এবং তার উন্নতি হতে থাকে। তাই তিনি বলেছেন ঃ 'সেই ব্যক্তিকে *মিথ্যাচারী* বলা হয়'; সংস্কৃতে *মিথ্যাচারীই* ইংরেজি hypocrite শব্দের সঠিক প্রতিশব্দ। এখন, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ 'সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে', *কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য; য আস্তে মনসা স্মরন্,* 'কিন্তু মনে সর্বদা ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা করছে', যদিও শারীরিক ভাবে সে একেবারে স্থির। এরকম লোক *মিথ্যাচারী*। মানুষের ব্যবহারে এরকম মিথ্যাচারিতা প্রচুর দেখা যায়। আমরা ভেবেছিলাম, যে 'নৈষ্কর্ম্য' একটি উচ্চ আদর্শ। কিন্তু এতে আমাদের আধ্যাত্মিকতায় আমরা বেশি উন্নত হতে পারিনি। আমাদের ইন্দ্রিয়াসক্তি বড় প্রবল। তাই, আমরা অন্তর্ঘাতী পথে গোপন পদ্ধতিতে এ সব করতে চেষ্টা করি। এই হলো মিথ্যাচার, যা সরল নয়। সৎ উপায় হলো ঃ তুমি কি এটি চাও? হ্যাঁ, আমি চাই। অসৎ বা কুটিল উপায় হলো ঃ আমি এটি চাই না, কিন্তু সেগুলির খোঁজ করতে থাকি নানান বঙ্কিম পথে। এ রকম মিথ্যাচার আমাদের মধ্যে এসে পড়েছে নৈষ্কর্ম্য, অনাসক্তি প্রভৃতির মতো উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধে যথার্থ ধারণার অভাবে। আমাদের বর্তমান অবস্থায় আমরা সৎভাবে বলতে পারি, হাঁ, আমি ইন্দ্রিয়ভোগ চাই। এতে কোন মিথ্যাচার নেই। আমি কোন বস্তু পাবার জন্য ছুটছি, খুঁজছি, চাইছি—কিন্তু কেন মিথ্যাচারী হতে যাব? মনের উন্নতি

হলে, আমি বলতে পারব, আমি এটি চাই না কারণ অন্তরে আমি উচ্চতর বস্তু লাভ করেছি। এতে কোন মিথ্যাচার নেই। তাই, *কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্ ইন্দ্রিয়ার্থান্*, 'কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা করছি'—এরূপ ব্যক্তি মিথ্যাচারী ছাড়া আর কিছু নয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক মানবকে বলছেন, মিথ্যাচারী হয়ো না। এবং তাই পরের শ্লোকে এ কথা আরো স্পষ্ট ভাবে বলছেন ঃ

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭॥

—'কিন্তু হে অর্জুন, যিনি মনের দ্বারা কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে ও অনাসক্ত থেকে, কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে কর্মযোগের দিকে চালিত করে, সে-ই অন্য সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।'

স বিশিষ্যতে, 'তিনি-ই শ্রেষ্ঠ হন।' *কে? ইন্দ্রিয়াণি মনসা সংযম্য*, 'যিনি মনের সাহায্যে কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত রাখেন।' মনই প্রভু। *আরভতে অর্জুন কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগম্*, 'হে অর্জুন, তিনি কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্মযোগ আচরণে ব্যস্ত হন'; এরূপ ব্যক্তিবিশেষ *যোগবুদ্ধি* সহায়ে এটি করেন; *ঐ কর্মই কর্মযোগে* রূপায়িত হয়, যা কেবল কর্ম নয়—এমন কর্ম, যা মানুষের আধ্যাত্মিকতার উন্নতি সাধন করে। *অসক্তঃ*, 'অনাসক্ত'। মন সম্মুখস্থ বস্তুনিচয়ের প্রতি একেবারেই আসক্ত নয়। তার মন এ সব বস্তু থেকে অনাসক্ত হয়ে পড়েছে। অতএব, সে যে কাজই করুক তা আরো বেশি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। *অসক্তঃ স বিশিষ্যতে*, 'এরূপ অনাসক্ত ব্যক্তি অতি উৎকৃষ্ট, বিশিষ্ট'। এইখানেই আসছে কর্মে মানবিক বৈশিষ্ট্যের উৎকর্ষ। *এই বিশেষ শ্লোকটি কর্মে বৈশিষ্ট্য যে কি বস্তু, তার শ্রেষ্ঠ বর্ণনা। নিয়ম্য*, 'সংযত করে', *ইন্দ্রিয়াণি*, 'কর্মেন্দ্রিয়সকল', *মনসা*, 'মনের দ্বারা,' *আরভতে কর্ম-যোগম্*, 'ঐ মনোভাব নিয়ে কর্ম-*যোগ* আচরণ করে'; এইরূপ ব্যক্তিই *কর্ম-যোগী*। স বিশিষ্যতে, 'সে অতি বিশিষ্ট ব্যক্তি'; প্রত্যেকের কর্তব্য হওয়া উচিত মনকে এই শিক্ষা দেওয়া। ওখানে প্রভুত্বের ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। কর্মী কাজের মধ্যে হারিয়ে যায় না, সদামুক্ত থাকে। মুক্তভাবে কাজ করা, এই হলো অন্তর্নিহিত ভাব। আর বেদান্ত বার বার বলছে, মুক্তভাবে কাজ কর, মুক্তভাবে দান কর, জনগণের জন্য যা কর তা খোলামনে তাদের প্রতি উৎসর্গ কর, কঞ্জুসের, কৃপণের মতো অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ মনে নয়। সঙ্কীর্ণমনা হয়ে কাজ করা ঠিক নয়।

এরপর শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সকলকে উপদেশ দিচ্ছেন ঃ

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ ॥ ৮॥

—'তুমি শাস্ত্রোপদিষ্ট নিত্য কর্তব্য কর্মগুলি কর; কারণ কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করাই শ্রেয়ঃ; কর্মহীন হলে তোমার দেহরক্ষাও সম্ভব হবে না।'

নিয়তম্ কুরু কর্ম ত্বম্, 'যা কিছু করণীয়, তা ভাল করে কর।' *নিয়তম্* শব্দের অর্থ যা কিছু করণীয়, করতে হবে। মনে কর তুমি অফিসে কাজ কর, তোমার ওপর কতকগুলি দায়িত্ব ন্যস্ত আছে ঃ সেগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন কর— কাউকে যেন তদারক করতে বা বলতে না হয়, এটা কর, ওটা কর। আমাদের আত্মমর্যাদা গড়ে তোলা দরকার, যার ফলে আমরা আমাদের সামর্থ্যের পূর্ণ প্রয়োগ করে আমাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব সুসম্পন্ন করি। এই মনোভাবই শ্রেষ্ঠ, মুক্ত পুরুষের মনোভাব, যা দাসসুলভ মনোভাবের থেকে একেবারেই ভিন্ন ধরনের—যে দাস তাকে ঠিক মতো কাজ করার জন্য একজনকে দণ্ড হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এ মনোভাব ভুল, ঠিক নয়। তাই, *নিয়তম্ কুরু কর্ম ত্বম্*, 'তোমার কর্তব্য বলে যেটুকু দায়িত্ব তোমার ওপর আরোপিত আছে, তা নিখুঁত ভাবে কর, ভালভাবে কর'। *কর্ম জ্যায়ো হি অকর্মণঃ*, 'কর্ম অকর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ'। *শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেৎ অকর্মণঃ*, 'তুমি যদি কাজ না কর, তবে তোমার পক্ষে শরীরের যত্ন নেওয়াও সম্ভব হবে না।' শরীর রক্ষার জন্য তোমাকে কিছু কাজ করতে হবে। *শরীর-যাত্রা, জীবন-যাত্রা*, এইসব কথা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। শরীরটাকে একটি সজীব সত্তারূপে চালু রাখতেও তোমার কিছু কাজ করা দরকার। তুমি যদি বল, আমি সম্পূর্ণভাবে কর্মহীন হয়ে থাকব, তা সম্ভব নয়। কর্মের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার সঙ্গে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত *যোগবুদ্ধির* ওপরেও। অতএব, কোন কাজ না করে কিছু লাভ করার ভাবটি, একটি অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গি—এ যেন কোন ম্যাজিক বা অলৌকিক ক্রিয়া ঘটিত হবার জন্য অপেক্ষা করা; কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটবে না। কেবল, তুমি পিছিয়ে পড়বে, এই অলৌকিক ঘটনাটিই ঘটবে। সংস্কৃত ঐতিহ্যে একটি শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

উদ্যোগিনম্ পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি;

দৈবম্ নিহত্য কুরু পৌরুষম্-আত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ —

'লক্ষ্মী বা সৌভাগ্য তার কাছেই আসেন যে মানুষ সিংহস্বরূপ আর উদ্যোগী,' *উদ্যোগিনম্, পুরুষসিংহম্,* 'মানুষের মধ্যে সেই সিংহস্বরূপ ব্যক্তি,' *উপৈতি লক্ষ্মী,* 'লক্ষ্মী এমন লোকের কাছেই এগিয়ে যান আশীর্বাদ নিয়ে'। *দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি,* 'নিম্নস্তরের মানুষই *কাপুরুষ,* যে নিজ অদৃষ্টের ওপর নির্ভর করে'। তাই, শ্লোকটিতে বলা হয়েছে, *দৈবম্ নিহত্য,* 'ভাগ্য সম্বন্ধে সকল ভাবনাকে দূর করে দিয়ে', *কুরু পৌরুষম্ আত্মশক্ত্যা,* 'নিজের অন্তরস্থ শক্তির সহায়ে উদ্যোগী হও, কর্মযোগী হও।' *যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি, কোঽত্র দোষঃ?* 'চেষ্টা করেও যদি তুমি নির্দিষ্ট অভীষ্ট বস্তু লাভ না কর তবে তাতে দোষ কোথায়?' ঐরূপ তীব্র সংগ্রামের, ঐ চেষ্টারই প্রয়োজন সব থেকে বেশি। তবে যারা সংগ্রামের পথ গ্রহণ করে তাদের অধিকাংশই অভিষ্ট ফল পায়। কদাচিৎ না পেলেও সেই কারণে তোমার কর্মোদ্যম ও কর্মতৎপরতা ত্যাগ করা উচিত নয়। তারপর তিনি বলেছেন, এই শরীরের দ্বারা ও শরীরাভ্যন্তরে আমরা যে কাজ করি, তাকেই আমাদের নিজ নিজ আধ্যাত্মিক মুক্তি অর্জনের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করতে পারা যায়। এইটি হলো *গীতার* মূল শিক্ষা। সাধারণত তুমি যে সব কাজ কর তাতে বন্ধন বৃদ্ধি ঘটায়, কিন্তু যদি কাজের মূল উদ্দেশ্যকে আধ্যাত্মিকতার দিকে ফিরিয়ে রাখা যায়, তুমি দেখবে যে ঐ কাজই আধ্যাত্মিক মুক্তির হাতিয়ার হয়ে উঠবে।

ঐ ভাবটি এখন অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করা হবে ৯ম শ্লোক থেকে; বৈদিক সাহিত্যে বিশেষত কর্মকাণ্ডে, সদা-ব্যবহৃত একটি অতি প্রাচীন শব্দ, *যজ্ঞ*-ভাবনার, মাধ্যমে। *যজ্ঞ* কথাটির অর্থ হলো উৎসর্গ, সাধারণত শাস্ত্রীয় আচারগত উৎসর্গ। প্রত্যেক মতের, প্রত্যেক ধর্মের একটি অংশ হলো উৎসর্গ ঃ তুমি অগ্নি প্রজ্বলিত কর, তাতে নানা বস্তু আহুতি দাও। তাকেই বলে বৈদিক যজ্ঞ বা উৎসর্গ। বেদের প্রাচীন কর্মকাণ্ডে, নানা রকমের যজ্ঞের কথা উল্লিখিত আছে। তাই একাজকে যজ্ঞ বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ এ কথাটি গ্রহণ করে, একে এক নতুন অর্থে ভূষিত করে, একে নীতিগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুললেন। এ কাজটি তিনি করেছেন ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ে। *যজ্ঞ* বা উৎসর্গ ঃ একে ভিত্তি করেই সমগ্র জগৎ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এই কথাই তিনি বলবেন। যজ্ঞের অর্থ কী? ৯ম শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯॥

—'যে কাজ *যজ্ঞের* জন্য ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে করা হয় তা এই জগতে বন্ধনের কারণ হয়; হে কুন্তীনন্দন, তাই তুমি কেবল অনাসক্ত হয়েই যজ্ঞানুষ্ঠান কর।'

যজ্ঞ-বুদ্ধিতে যে সব কাজ করা হয় না, সেগুলিই এ জগৎকে কর্ম-পাশে বেঁধে ফেলে। যদি ঐ কাজ যজ্ঞ-বুদ্ধিতে কর তবে কোন বন্ধনই হয় না। তাই, *তদর্থম্ কর্ম কৌন্তেয়,* 'তোমার কাজগুলি *যজ্ঞ*-বুদ্ধিতে কর', *মুক্তসঙ্গঃ সমাচর,* 'ঐ কাজ অনাসক্ত হয়ে কর', তবে কর্মপাশে আবদ্ধ হবে না। এ কথা বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত যজ্ঞ-তত্ত্ব ভিত্তিক। এ কথা সব ধর্মের ক্ষেত্রেই সত্য ঃ ইহুদি ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ হলো, উৎসর্গ করা। এর অন্তর্নিহিত ভাব হলো, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কিছু উৎসর্গ কর, বাকিটা তোমার থাকবে। এই হলো *যজ্ঞের* নিগূঢ় ভাব। অতএব তুমি যজ্ঞাবশিষ্ট গ্রহণ করে জীবনযাত্রা নির্বাহ কর। প্রথমে দাও; দানের পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই মঙ্গলদায়ক। তাই, *মনুস্মৃতিতে, মহাভারতে* এবং অন্যান্য গ্রন্থেও এই ভাবটি বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। বন্ধন তখনই আসে যখন তুমি নিজের জন্য রন্ধন কর, নিজের জন্য আহার কর। অন্যের জন্য কর্মানুষ্ঠান করার পর যখন তুমি আহার কর, সেই অবশিষ্ট অন্ন শুদ্ধ ও পবিত্র। এই রকম ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে। 'যে কেবল নিজের জন্য রন্ধন করে, কেবল নিজের জন্যই আহার করে', সে কেবল ততটা পাপই গ্রহণ করে, একথা শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রই বলবেন। এই হলো মানবের সমাজের প্রতি, প্রকৃতির প্রতি এবং সমগ্র জগতের প্রতি কর্তব্য পালন করা। ভুলো না যে আমরা সকলে পারস্পরিক সম্বন্ধে বাঁধা। এই *অধ্যায়ের কেন্দ্রীভূত ভাবটি হলো পারস্পরিক সম্পর্কের ভাবনা।* ঠিক যেমন আমরা যজ্ঞে আহুতি দিলে দেবতারা তা ভোগ করেন ও প্রতিদান হিসাবে আমাদের জন্য পাঠিয়ে দেন বৃষ্টি ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী। প্রাচীন ভাব এইরকম। ঐ ভাবকে বিস্তৃত কর সারাজীবনের ক্ষেত্রে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রে; আচার-অনুষ্ঠানাদিতে গাঁথা এর নোঙর তুলে নাও। এই ভাবকে মানব-মানবান্তর দর্শনে, প্রকৃতি-প্রকৃত্যান্তর দর্শনে পরিণত কর। একে নৈতিক ও ধার্মিক ভাবাপন্ন করে তোল। তবে আমরা বুঝতে পারব শ্রীকৃষ্ণ *যজ্ঞ* কথাটি নিয়ে এই অধ্যায়ে ও পরে কী বলতে চেয়েছেন। *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ,* 'যখন *যজ্ঞ*-ভাবনায় কাজ করা না হয়, এ জগৎ কর্ম-জনিত বন্ধনে আবদ্ধ হয়'; এই হলো সহজ শিক্ষা। স্বার্থপর লোকই

কেবল নিজের জন্য কাজ করে। স্বভাবতই তা বন্ধনের কারণ হয়; জীবনের এই বিন্দুতে সঙ্কোচন, যজ্ঞ-ভাবের অনুপ্রেরণা বিনা কোন কাজ বন্ধনের কারণ হয়। অতএব, *তদর্থম্ কর্ম কৌন্তেয়,* 'যজ্ঞের মনোভাবে কাজ কর', *মুক্তসঙ্গঃ* 'অনাসক্ত হয়ে'। এই কথা শ্রীকৃষ্ণ পরবর্তী শ্লোকেও বলেছেন ঃ

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০॥

—'প্রজাপতি (সৃষ্ট জীবসকলের প্রভু) আদিতে (আপন সত্তা থেকে) *যজ্ঞসহ* মানবরূপে প্রকট হয়ে বললেন, "এই যজ্ঞ অবলম্বন করে তোমরা বৃদ্ধি পাবে; এটিই হবে তোমাদের বাসনাপূরণকারী দুগ্ধবতী গাভীর সমান"।'

এই *যজ্ঞ*-ভাবনা কেবল পৃথিবীকে নিয়েই নয়, এ কেবল আমাদের মানবিক অভিজ্ঞতাতেই সীমিত নয়। এর একটি অতিজাগতিক মাত্রাও আছে। সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই এই *যজ্ঞ*-ভাবনার ভিত্তিতেই অবস্থান করছে। সর্বত্রই দেওয়া-নেওয়া চলেছে, চিন্তাজগতে এ এক অপূর্ব অভিব্যক্তি, বেদান্তে যেমন এর উল্লেখ পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় *গীতাতে।* নেবার আগে দাও; তা হলেই তুমি শ্রেষ্ঠ বস্তুটি পাবে। এই বিশ্বে একত্বভাব বিদ্যমান। প্রতিটি জিনিস অন্য জিনিসের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিছুই সম্পর্কহীন নয়। এ এক চমকপ্রদ ভাবনা, আধুনিক পদার্থ বিদ্যাতেও এরূপ পাওয়া যায়; সেখানে বলা হয়েছে যে—পৃথিবীর যে কোন জায়গায় একটি ঘটনা ঘটলে তা সমগ্র জগৎকে প্রভাবিত করে। হতে পারে সামান্য, কিন্তু এই পারস্পরিক সম্বন্ধভাব আছে। এ তত্ত্বটিকে আরো বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে পাশ্চাত্য জীববিজ্ঞানে। সমস্ত রকম জীবন্ত প্রাণী নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যে জড়িত, জীববিদ্যায় সে বিষয়ের ওপর খুব জোর দেওয়া হয়। ডারউইন থেকে আরম্ভ করে, জীব বিজ্ঞানে প্রকৃতি নিয়ে পর্যালোচনা করে সকল বস্তুর মধ্যে এই পারস্পরিক সম্বদ্ধভাব আবিষ্কৃত হয়েছে। বিজ্ঞানের বইগুলিতে এ বিষয়ে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। পাখি উড়ে বহুদূরে চলে যায়; তুমি সেই পাখিটিকে ধরে তার পা দুটিকে পরীক্ষা কর। তুমি সেই পায়ে কাদা রয়েছে লক্ষ্য কর, আর তাতে কয়েকটা শস্য-বীজ দেখতে পাও। সেই কাদা ও বীজ মাটিতে পুঁতে দেওয়া হলো, সেগুলির অঙ্কুর বেরুল; পাখিটি কিন্তু তা জানল না। পাখিটি প্রকৃতির যন্ত্রস্বরূপ হয়েছে এই বিশাল ব্যাপ্তির কাজে এবং পারস্পরিক সম্বদ্ধ ভাবকল্পনার প্রতিষ্ঠাকল্পে। তেমনি যদি তুমি একটি প্রজাতিকে নষ্ট কর, তাহলে তুমি কৃষি

ব্যবস্থাকেই নষ্ট করবে। জীব বিজ্ঞানে সব থেকে নিরীহ জীব কেঁচোর দৃষ্টান্ত নেওয়া হয়েছে; এরা মাটির প্রভূত উপকার করে—এর পুষ্টির ব্যবস্থা করে ও উর্বরতা বৃদ্ধি করে। কিন্তু আমরা এর সেবা বুঝতে পারি না, যতক্ষণ না কোন বৈজ্ঞানিক আমাদের বলে দেন। কেঁচো প্রভূত কাজ করে। আমরা লোভে পড়ে প্রকৃতিকে নষ্ট করি ও পরে কষ্ট পাই। অজ্ঞানতাবশত আমরা পৃথিবীর পরিবেশে যে বিশাল ভারসাম্য বর্তমান তাকে নষ্ট করছি। *সেই প্রাচীন যজ্ঞ-ভাবনাই আজকাল গড়ে উঠছে পরিবেশের ভারসাম্যের মতো সত্যরূপে।*

সেই বিশ্বপ্রকাশক প্রজাপতি প্রথমে বিশ্বকে প্রকাশ করলেন, এই বিশ্বকে প্রতিপালনের জন্য এই *যজ্ঞ*ও প্রকাশ করলেন। *সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ*, '(স্বীয় সত্তা থেকে) এই বিশ্বকে *যজ্ঞ*সহ প্রকাশ করে, *প্রজাপতি* বহুকাল পূর্বে বলেছিলেন'; তিনি কি বলেছিলেন? হে যজ্ঞ, তুমি এই সব জীবের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ হও; তোমার কারণেই তারা সর্বতোভাবে উৎকৃষ্ট জীবনযাপনে সক্ষম হবে। *অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্*, 'এই *যজ্ঞের* সাহায্যেই তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হোক', *এষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্*, 'তোমাদের সকলের কাছে এটি যেন *কাম ধেনু*-স্বরূপ হয়', কামধেনু হলো পুরাণে বর্ণিত বাসনাপূরণকারিণী গাভী। এইভাবে আমাদের বলা হয়েছে যজ্ঞ-ভাবকে আরো শক্তিশালী করতে। তা হলে সমাজের সুখ বৃদ্ধি হবে। আজকাল এই ব্যাপারটিকে আমরা আরো বেশি করে বুঝতে পারি আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে; আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, আন্তর্জাতিক সহায়তাই হলো আজকালকার ভাষা।

ওখানেও দেখা যাবে *গীতোক্ত যজ্ঞ*-ভাবনা প্রকাশিত হচ্ছে মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। সমাজের ভেতর তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর। বর্তমানে স্ব-জাতীয় সমাজই আন্তর্জাতিক সমাজে রূপায়িত হয়েছে, এর মধ্যে জগতের উদ্ভিদ ও পশু সম্বলিত প্রাকৃতিক পরিবেশেরও স্থান হয়েছে। অতি উদার দৃষ্টির মধ্যে সব কিছুরই স্থান রয়েছে।

এই বিষয়ে, স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খ্রিঃ মাদ্রাজে প্রদত্ত 'Vedanta and its Application to Indian Life'—'ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা'[1] বিষয়ে এক বক্তৃতায় বলেছেন ঃ

"আমাদের উপনিষদ্ ঠিকই বলেছেন—অজ্ঞানই সবরকম দুঃখের কারণ। সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের যেকোন অবস্থায় প্রয়োগ করি না কেন, দেখা

১ বাণী ও রচনা, ১ম সং ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১০২-০৩

যায়, একথা সম্পূর্ণ সত্য। অজ্ঞানতাবশতই আমরা পরস্পরকে ঘৃণা করি, পরস্পরকে জানি না বলেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা নেই। যখনি আমরা পরস্পরকে ঠিকমতো জানতে পারি, তখনি আমাদের মধ্যে প্রেমের উদয় হয়, তা হবেই তো কারণ আমরা সবাই কি এক নই? অতএব দেখতে পাচ্ছি, চেষ্টা না করলেও আমাদের সকলের একত্ব ভাব স্বভাবতই এসে থাকে।

"রাজনীতি ও সমাজনীতি ক্ষেত্রেও যে-সব সমস্যা বিশ বছর আগে শুধু জাতীয় সমস্যা ছিল, এখন আর জাতীয় ভিত্তিতে সেগুলির সমাধান করা যায় না। ঐ সমস্যাগুলি ক্রমশ বিশাল আকার ধারণ করছে। আন্তর্জাতিক ভিত্তিরূপ প্রশস্ততর ভূমি থেকেই শুধু ওগুলির মীমাংসা করা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি, আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ ও আন্তর্জাতিক বিধান—এই হলো এ যুগের মূলমন্ত্র। সকলের ভেতর একত্বভাব কিভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, এটাই তার প্রমাণ।"

ইংরেজি ভাষায় ওরা সৃষ্টি কথাটি ব্যবহার করে, কারণ লোকের বিশ্বাস ছিল দ্বৈত ভাবের ওপর, যেমন কুমোর কাদা থেকে পাত্রগুলি তৈরি করছে। সৃষ্টিকর্তা পৃথক, উপাদান পৃথক, আর তৈরি করা পাত্রগুলিও পৃথক। এই হলো সৃষ্টি। কিন্তু, বেদান্তে এ রকম সৃষ্টিভাবনার কোন স্থান নেই। *সৃষ্টি* কথাটি ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসাবে, ভুল করে, creation কথাটির ব্যবহার চলে আসছে, কিন্তু বস্তুত এর প্রতিশব্দ হওয়া উচিত projection বা প্রক্ষেপ। ঈশ্বর আপন সত্তা থেকেই এই জগতকে প্রক্ষিপ্ত করলেন; প্রথমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, পরে নক্ষত্র-খচিত আকাশ এবং সব রকম প্রাণবন্ত জীব এবং ক্রমে মনুষ্যজাতি। সব কিছুই সেই এক বস্তু থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং কালে সমগ্র জগৎ সেই এক বস্তুতে ফিরে যাবে, লয় পাবে। এই হলো প্রক্ষেপরূপে ভারতীয় সৃষ্টি-ভাবনা। উপনিষদে প্রক্ষেপরূপে সৃষ্টি ভাবনার তিনটি দৃষ্টান্ত রয়েছে ঃ প্রথম—মাকড়সা জাল বুনছে, তাতেই বাস করছে আবার সেই জালকে আত্মসাৎ করছে; দ্বিতীয়—মাটি থেকে গাছের চারা গজিয়ে উঠছে; তৃতীয়—জীবন্ত মনুষ্যদেহ থেকে লোম বেরুচ্ছে। এইসব কাজই হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, একাজে দ্বিতীয় কোন কারণের বা উপাদানের অবদান নেই; ঠিক তেমনই এক বস্তু থেকে বহুর উদ্ভব। *একোঽহম্ বহু স্যাম্*, 'আমি এক, বহু হইব।'

সমাজ বলীয়ান হয়, সমাজের মানুষ প্রগতিশীল হয়, যদি এই *যজ্ঞ*-ভাবনা সমাজের মানুষকে প্রেরণা জোগায়। যদি সমাজের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক

দেওয়া নেওয়া না থাকে, তবে সমাজ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে হতে অধঃপতিত হয়।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥

—'এর দ্বারা *দেবগণকে* পোষণ কর, *দেবগণও* যেন তোমাদের পোষণ করেন; এই পারস্পরিক পুষ্টির দ্বারাই তোমরা শ্রেষ্ঠ কল্যাণ লাভ করবে।'

আমেরিকায় প্রকাশিত *The Secret Life of Plants, 'উদ্ভিদের গোপন জীবন'* গ্রন্থটিতে *দেব* কথাটির উল্লেখ বারবার করা হয়েছে; এ হলো প্রাকৃতিক শক্তিতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করা। *দেবান্ ভাবয়তানেন,* '*যজ্ঞ* দ্বারা *দেবগণকে* সাহায্য বা পোষণ কর'; *তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ,* 'তাঁরাও, দেবগণও, তোমাদের সাহায্য বা পোষণ করবেন।' তারপর বলা হয়েছে, *পরস্পরম্ ভাবয়ন্তঃ,* 'পরস্পর পোষণ ক্রিয়া বা পুষ্টিকরণ চললে', *শ্রেয়ঃ পরম্ অবাপ্স্যথ,* 'সকলেই শ্রেষ্ঠ পর্যায়ে উন্নীত হবে'। পারস্পরিকতা, পরস্পর নির্ভরশীলতাই প্রগতির পথ, নিজেকে গুটিয়ে রেখে অপরের সংস্পর্শ বর্জিত থেকে নয়, পরস্পর লড়াই করে নয়, একে অন্যের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে স্বার্থসাধন করে নয়। আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করি, ফলে আমরাও প্রকৃতির অবদান থেকে বঞ্চিত হই। এ রকম হওয়া উচিত নয়। নষ্ট করার জন্য প্রকৃতির সৃষ্টি হয়নি। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু সে সম্পদের ভাণ্ডার আবার পূরণ করার ব্যবস্থাও করতে হবে। যদি তা পূরণ না কর, তবে তুমিই কষ্টে পড়বে। আজকাল সারা পৃথিবী এ সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন। এই প্রসঙ্গেই আমাদের দেখতে হবে *গীতার* তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বিবৃত *যজ্ঞকে*। তিনি বৈদিক পটভূমি থেকে *যজ্ঞের* ভাবটি গ্রহণ করে, তা ব্যাখ্যা করেছেন আপন দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে, আর সেগুলি হয়ে উঠেছে সম্পূর্ণরূপে মানবিক, ইহজগতে আমাদের সকলের কাছে প্রভূত মূল্যবান সম্পদ। তাই ব্যবহৃত হয়েছে এই ভাষা—*পরস্পরম্ ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরম্ অবাপ্স্যথ,* 'পরস্পরকে সহায়তা কর তবে দুজনেরই অগ্রগতি হবে; পরস্পরে ধ্বংসাত্মক কাজ করলে দুজনেরই বিনাশ হবে।

দেখা যায় একটি জনগোষ্ঠী, একটি বিশেষ ক্ষেত্রে, এই সত্যটিকে নতুন করে ভাবছে। আমেরিকায় Women's Liberation Movement, 'নারীমুক্তি আন্দোলন' গড়ে উঠেছে। প্রায় বিশ বছর আগে বিশালরূপে এর সূচনা হয়,

'আমরা পুরুষের দাস হয়ে থাকতে চাই না, আমরা রান্নাঘরে বাঁধা থাকতে চাই না, এ আমাদের কাছে কারাগার-স্বরূপ, আমরা যেন এর বাইরে বেরিয়ে পড়ি, নিজের মতো চলতে পারলেই আনন্দ।' এই ভাব নিয়েই ঐ মুক্তি আন্দোলন আরম্ভ হয়। মুক্তি আন্দোলনের প্রসিদ্ধ প্রবক্তা বেটি ফ্রিড্যান প্রণীত *The Feminine Mystique, 'নারীসুলভ রহস্য'* বিখ্যাত পুস্তকটি নিয়েই এই মুক্তি-আন্দোলনের সূচনা হয়। বিশ বছর পরে, এখন পরিবারগুলি ভেঙ্গে যাচ্ছে, সন্তানদের পিতা মাতা নেই, তাই আমেরিকার সমাজে বহু সমস্যার উদ্ভব ঘটছে, আর এই মহিলাই সারা আমেরিকা ঘুরে লিখলেন তাঁর দ্বিতীয় পুস্তকটি, *The Second Phase (of The Liberation Movement)*, তাতে তিনি গৃহস্থালি ও রান্নাঘর থেকে মুক্ত ও উচ্চপদে নিযুক্ত এমন বহু নারীর মন্তব্যের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। তাদের নালিশ হলো, যে তারা প্রকৃত মুক্তি অর্জন করেনি; তারা বলে এখনো আমাদের এক বহু শিল্পের মধ্যে একটি দফা হিসাবে ধরা হয়ে থাকে; আমাদের ব্যক্তিত্বের সন্ধান আমরা মোটেই পাইনি। নিঃসন্দেহে আমরা মোটা অঙ্কের বেতন পাই; কিন্তু তা তো প্রকৃত মুক্তি নয়। এই লেখক, বেটি ফ্রিড্যানই তাই একটি দুটি সুন্দর ভাব তুলে ধরেছেন; ভাবগুলি পুরাতন নূতন প্রেক্ষাপটে পরিবেশিত হয়েছে মাত্র। তাঁর প্রথম মতটি হলো—*পুরুষের মুক্তিকে বাদ দিয়ে নারীমুক্তি নেই।* এ ভাবটি আমার খুবই পছন্দ; এটি যেন *গীতার—পরস্পরম্ ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরম্ অবাপ্স্যথ*—উক্তিটির প্রতিধ্বনি। ঠিক তাঁর কথাগুলি আমি আমার *Women in the Modern Age* (*নবযুগের নারী*) নামক পুস্তিকায় উল্লেখ করেছি; পুস্তিকার প্রকাশক হলেন ভারতীয় বিদ্যাভবন। এই দৃষ্টান্ত দিয়ে আমি বোঝাতে চেয়েছি যে আমরা কোন কাজ একাই করে ফেলব মনে করলেও তা পারি না। কিছুদিন আমরা চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু পরে দেখি যে তা সম্ভব নয়। অন্যদেরও সঙ্গে চলতে হবে; তা না হলে কেউই খুশি হতে পারবে না; নারীগণ সুখী হবে না, পুরুষগণও হবে না। এমতো অবস্থায় শিশুরাও কখনো সুখী হবে না।

তাই, *পরস্পরম্ ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরম্ অবাপ্স্যথ*—এই অপূর্ব বাণীটি শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত মানবজাতির উদ্দেশেই দিচ্ছেন। এমন কি সোভিয়েট ইউনিয়ন ও আমেরিকার সম্পর্কও আজকাল—*পরস্পরম্ ভাবয়ন্তঃ*—এই তত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে তোলা হচ্ছে। তারা পরস্পর চিরশত্রু ছিল। আগে লৌহ যবনিকা এই দুই দেশকে তফাতে রাখতো, পরে বংশ যবনিকা, তাও এখন সরে যাচ্ছে। এই হলো সুস্থ আন্তর্জাতিক মানবিক শৃঙ্খলাবোধের গোড়াপত্তন। এই বোধটি দিব্য সৃষ্টিকর্তা

সৃষ্টির সঙ্গে জগৎকে দিয়েছিলেন : এটিই হলো *যজ্ঞভাব*। এই যজ্ঞবোধকে দৃঢ় কর, তবেই আমরা সুখী হব; একে দুর্বল করলে আমরা উপদ্রবের মধ্যে পড়ব। এই *যজ্ঞ* কেবল মানবের সঙ্গে মানবের সম্পর্ক নিয়েই নয়, এই *যজ্ঞ*ভাবনায় মানবের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কও বাদ পড়ে না। আজকাল মানুষের সঙ্গে তার মানবিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের পারস্পরিকতা প্রচুর স্বীকৃতি পাচ্ছে। এই হলো তৃতীয় অধ্যায়ের *যজ্ঞ* ভাবনার শিক্ষাটির ব্যাপক প্রচারের ক্ষেত্র। পরবর্তী অধ্যায়ে আরো কয়েকটি প্রাসঙ্গিক ভাবের কথা বলা হবে।

সুস্থ সামাজিক জীবনের তত্ত্বটির ভিত্তিও হলো *পরস্পরম্ ভাবয়ন্তঃ* তত্ত্ব; পরস্পর মারামারি করে নয়, পরস্পর সাহায্য করে, সেবা করে; এ সবের সহায়তায় সকলেই উচ্চতম স্তরে উঠতে পারবে। প্রকৃতি থেকে নিয়ে, তাকে ফিরিয়ে না দিলে, তোমাকেই কষ্ট পেতে হবে। নাও আবার ফিরিয়ে দাও, নাও আর ফিরিয়ে দাও; এই হলো সুস্থ মানব-পরিবেশ সম্পর্কের প্রকৃতি। আর যেমন আগেও বলেছি, আজ ভোগবাদিতা, অতি যন্ত্র-নির্ভরতা, অত্যধিক শিল্পায়নের কুফল এবং মানব কর্তৃক গৃহীত নানা প্রতিকার ব্যবস্থার দরুণ যে পরিবেশ দূষণ ও তৎসহ সূর্য-কিরণের দ্রুতস্পন্দিত অংশের ক্ষতিকারক প্রভাবের বিরুদ্ধে পৃথিবীর রক্ষা কবচ স্বরূপ ozone (ওজোন) স্তর দুর্বলীকরণ প্রভৃতি—দোষের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা ঐ তত্ত্ব বুঝতে পারছি। অতএব, বিষয়টি মানব সত্তার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; আর সমগ্র বিষয়টি *যজ্ঞ*, এই একটি কথাতেই নিহিত আছে, যে কথার আদিকালে অর্থ ছিল 'আনুষ্ঠানিক যজ্ঞীয় আহুতি'। কিন্তু *গীতায়* এর অর্থ হলো এই নৈতিক বোধ, সেবার মনোভাব, এই দেবার সামর্থ্য কেবল নেওয়ার নয়। তাই, এর অর্থ হলো *পরস্পরম্ ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরম্ অবাপ্স্যথ*। প্রকৃতিকে যদি বেশি শোষণ করা যায়, তবে প্রকৃতি মানবজাতিকেই ধ্বংস করে ফেলবে, আর বর্তমানের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা সেই শিক্ষা ভালভাবেই পাচ্ছি।

আমরা যখন ১৬শ শ্লোকে আসব তখন চক্রম্ সংজ্ঞাটিকেই পাব, যার অর্থ চাকা বা যুগাবর্ত। *গীতাতেই* এই সংজ্ঞাটি ব্যবহৃত হয়েছে 'ecological cycle' বা 'জীব-উদ্ভিদপরিবেশ চক্র'কে লক্ষ্য করে। ঠিক যেমন দেখা যায় বীজ, তা থেকে অঙ্কুর, তা থেকে চারা, তা থেকে ফুল, ফল, আবার বীজ; এখানে একটি *চক্র* রয়েছে। তেমনি সূর্যের তেজ পৃথিবীতে আসছে, তার সংযোগে হচ্ছে গাছ, প্রাকৃতিক শক্তি, পশু ও মানব এবং শেষে ঐ তেজ আবার ফিরে যায় : এভাবে এখানেও একটি *চক্র* রয়েছে। গীতার এই অধ্যায় অনুযায়ী এটি হলো এর

বিশ্বতত্ত্ব। আমরা কেবল পৃথিবী ও নিকটস্থ পরিবেশ নিয়েই ব্যস্ত, কিন্তু বাস্তবে *যজ্ঞ* হলো এক বিশ্বতত্ত্ব, যা প্রকাশ করছে—আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক ভাবনাকে। তাই পরবর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২॥

—'দেবতাগণ *যজ্ঞ* দ্বারা আরাধিত হয়ে তোমাদের বাঞ্ছিত ভোগ্যবস্তু দেবেন, তাই এই দেবতা-প্রদত্ত বস্তু দেবতাদের নিবেদন না করে যে ভোগ করে, সে নিশ্চয়ই চোর।'

তুমি প্রকৃতিকে ফিরিয়ে দিলে, প্রকৃতিও তোমাকে ভাল ভাল জিনিস দেবে। আমরা এখনই দেখছি ভারতে আমাদের বনসম্পদ দিন দিন ক্ষীণ হয়ে আসছে, আর আমাদের আবহাওয়াও প্রতিকূল হচ্ছে। ফলে আমরাও অসুবিধায় পড়ছি। এইভাবে আমরা উপলব্ধি করছি—*ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে*, 'প্রকৃতির দেবতাগণ তোমার পক্ষে যা কল্যাণকর সেই সব বস্তু ফিরিয়ে দেবেন'—এই কথাটির সত্যতা। কিন্তু *তৈর্দত্তান্ অপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে*, 'যদি তুমি তাঁদের প্রদত্ত জিনিস ভোগ কর, অথচ তাঁদের ভাগ তাঁদের না দাও'—তবে কী হবে? না—*স্তেন এব সঃ* 'এরকম লোক চোর রূপে গণ্য হবে।' প্রকৃতি ও প্রকৃতি-দেবতাগণের প্রাপ্য যে ফিরিয়ে দেয় না, *গীতা* তাদের চোর আখ্যা দেন। সে হিসাবে আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার মানুষগুলি চোর। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, পরিস্থিতির গুরুত্ব আমরা বুঝেছি এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আর চোর হয়ে থাকব না। তাই তো বনসৃজনের ও দূষিত নদী পরিষ্করণের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে সারা ভারতে। যা আমরা ক্রমে খুব বেশি নষ্ট করেছি তার কিছু ফিরিয়ে দিচ্ছি। তবেই আমরা প্রকৃতি প্রদত্ত সামগ্রী ভোগ করতে পারি। *স্তেন* কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ হলো 'চোর'। প্রকৃতির কাছে মানবজাতি চোর হয়ে গেল, পরিবেশের দিক থেকে এবং সেই চোরকে শাস্তি পেতেই হবে। আর সে শাস্তি এখনই আরম্ভ হয়েছে; নদীগুলি সব এবং অন্যান্য জল-ভাণ্ডারও দূষিত হয়েছে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এই দূষণ অতিমাত্রায় বেড়েছে।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩॥

—'যে সব সদাচারী ব্যক্তি যজ্ঞাবশেষ (নিবেদিত অন্ন) গ্রহণ করে জীবনধারণ

করেন, তাঁরা সমস্ত রকম পাপ থেকে মুক্ত হন; পক্ষান্তরে, যারা (কেবল) নিজের জন্যই রান্না করে থাকে, তারা কেবল পাপান্নই সেবন করে।'

যজ্ঞের পর যা কিছু খাও তাই *যজ্ঞশিষ্ট*, '*যজ্ঞে* আহুতি দেবার পর যে দ্রব্য পড়ে থাকে।' এটি একটি শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা। *যজ্ঞশিষ্টের* অপর নাম *প্রসাদ*। *প্রসাদ* হলেই তা পবিত্র খাদ্য; যা প্রসাদ নয় তাতে শরীরতন্ত্রের উন্নতি ঘটাবার মতো কিছু থাকে না। সমাজে বাস করতে গেলেও, তুমি রোজগার কর, কর দাও, যা বাকি থাকে তাই তোমার সম্পদ তোমার ভোগের জন্য, কৌশলে কর ফাঁকি দেবার চেষ্টা করলে সমাজের ক্ষতি হয়, তুমিও কষ্ট পাও। মূল্য না দিলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে না, এই ভাবনাটি প্রত্যেকের মনের মধ্যে গেঁথে দিতে হবে। স্থিতিশীল সমাজ গড়তে হলে আমাদের যে মূল্য দিতে হয় তাকেই *কর* বলা হয়। যারা কর ফাঁকি দেয় ও তার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করে তারা নাগরিক পদবাচ্য নয়, তারা কেবল জাতির *মধ্যে* আছে, অথচ জাতির অঙ্গ নয়, জাতির জন্যও নয়; তারা সুশৃঙ্খল সমাজে বাস করবার উপযুক্ত নয়। তারা এক জনবিরল দ্বীপে পৃথকভাবে নিজের মতো জীবনযাপনের উপযুক্ত; কিন্তু, মানবসঙ্গ বর্জিতভাবে বাস করার ফলে প্রায়শ তাদের মধ্যে মানবিক সহানুভূতি বোধও গড়ে ওঠে না। *কিল্বিষ*, মানে 'পাপ বা অশুভ'।

তার পরেই আসছে সেই উক্তিটি : *ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্তি আত্মকারণাৎ*। এটি খুব মহৎ ভাব। 'যে কেবল নিজের জন্য পাক করে এবং অন্যের কথা না ভেবে পৃথক ভাবে ভোজন করে, সে কেবল ততটা পাপান্নই ভোজন করে'। এই ভাষাই প্রয়োগ করা হয়েছে। *অঘম্* মানে পাপ; *পাপ* মানেও *পাপ*; *যে পচন্তি*, 'যারা পাক করে'; *আত্মকারণাৎ*, 'কেবল নিজের জন্য'। আমি কেবল আমার জন্য পাক করছি; আমি অন্যের কথা ভাবি না। এরকম মনোভাব খুব খারাপ। তাই, প্রায়শ আমাদের প্রাচীনপন্থী হিন্দু গৃহস্থালিতে *ভূত যজ্ঞ* পালন করা হয়ে থাকে। এই প্রথায় রন্ধনের পর পক্ক অন্নের সামান্য অংশ সরিয়ে রাখা হয়, ভিখারিকে, পক্ষীকে বা যার প্রয়োজন)তাকে দেওয়া হয়ে থাকে। ঐ অংশটুকু পৃথক করে রাখা হয়; বাকিটুকুই কেবল গৃহের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। এই শ্লোকে যে ভাব পরিস্ফুট হয়েছে, তদনুযায়ীই এ কাজ করা হয়। *গীতায়, মহাভারতে, মনুস্মৃতিতে*, এভাব প্রকাশিত হয়েছে : *অঘং তু কেবলম্ ভুঙ্ক্তে যে পচন্তি আত্মকারণাৎ* 'যে নিজের জন্য পাক করে সে কেবল ততটা পাপান্নই ভোজন করে।' ঐরকম আত্মকেন্দ্রিকতা কোন মতেই প্রশংসা পায় না।

তাই, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা। পাপান্ন ভোজন করো না, পুণ্যান্ন ভোজন কর; খাদ্য যদি প্রসাদ হয়, তবে তা পুণ্যের সমান হলো। তুমি পক্ক খাদ্যের কিছুটা অন্যকে দিয়েছ বাকিটা নিজের ব্যবহারে লাগিয়েছ; এ অতি সুন্দর। ওখানেও *যজ্ঞ*-বোধে কাজের মূল্য প্রকাশ পাচ্ছে। এই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে, *ঈশা উপনিষদের* প্রথম মন্ত্রে ঃ *তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা,* 'ভোগসুখ আস্বাদন কর ত্যাগের মাধ্যমে'। তখনই কেবল তুমি জীবনের উচ্চতম ভোগ লাভ করতে পার। তুমি যদি কেবল তোমার নিজের জীবনের কথা ভাব, তবে তুমি জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ কখনই উপভোগ করতে পারবে না। তাই ১৪শ ও ১৫শ শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে *চক্রম্* বা 'জীবনচক্র' বা জীবন শৃঙ্খলের কথা।

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪॥

—'অন্ন থেকেই প্রাণী-শরীর উৎপন্ন হয়; বৃষ্টি থেকে অন্নের উৎপত্তি; *যজ্ঞ*-ধূম থেকে মেঘ ও পরে বৃষ্টি-সৃষ্ট হয়; আর *যজ্ঞ* উৎপন্ন হয় কর্ম থেকে।'

এই হলো ঘটনা পরম্পরা। অন্ন থেকেই আমাদের সকলের উৎপত্তি। 'সমস্ত সজীব প্রাণীরই উৎপত্তি অন্ন থেকে', *অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি*। অন্নের উৎপত্তি কীভাবে? *পর্জন্যাৎ অন্নসম্ভবঃ,* 'মেঘ তথা বৃষ্টি থেকে অন্নের উৎপত্তি।' বৃষ্টিপাত বন্ধ হলেই, খাদ্য উৎপাদন কমে যায়। *যজ্ঞাৎ ভবতি পর্জন্যো,* 'যখন তুমি সকল পরিবেশের ক্ষেত্রে এই যজ্ঞ ভাবনাকে জাগিয়ে রাখবে, তখন বৃষ্টিও যথাসময়ে পড়তে থাকবে'; অন্যথায় নিজ পরিবেশ নষ্ট করে বারিপাত পদ্ধতির নিয়মশৃঙ্খলা তুমি নষ্ট করে ফেলতে পার। বেদের *কর্মকাণ্ডে* যা ছিল অনুষ্ঠানাদির ভাবনা, তাই *গীতা* ত্যাগ ও সেবারূপ নৈতিক ভাবনার রূপ নিয়েছে। তারপর, *যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ, 'যজ্ঞের* উৎপত্তি কর্ম থেকে।' *যজ্ঞের* অর্থ হলো, তোমার ও তোমার কাছাকাছি সকলের কল্যাণের উদ্দেশে কর্ম করা। এর নাম *যজ্ঞ*। *যজ্ঞ* হলো একটি কর্ম। তাই, দেখা যাচ্ছে, *অন্ন, পর্জন্য, যজ্ঞ,* আর এবার *কর্ম*—এই চারটি পর পর এসেছে। তারপর ঐ ধারা আরো এগিয়ে চলেছে ঃ

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫॥

—'জানবে যে, যজ্ঞাদি *কর্ম* বেদ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, আর বেদের উৎপত্তি নিত্য অক্ষর পুরুষ থেকে। অতএব, সর্বার্থ প্রকাশক বেদ সর্বদা *যজ্ঞে* প্রতিষ্ঠিত।'

'জানবে যে ব্রহ্ম থেকে *কর্মের* উৎপত্তি', এখানে ব্রহ্ম অর্থে বেদ। বেদ প্রায়শই ব্রহ্ম নামে উল্লিখিত হয়। বেদে *কর্ম* ব্যাখ্যাত হয়েছে। সেখানেই রয়েছে এই শিক্ষা। *ব্রহ্ম অক্ষর সমুদ্ভবম্*; বেদের উৎপত্তি কোথায়? 'নিত্য, অক্ষর সত্যস্বরূপ থেকে।' সেই অক্ষর ব্রহ্ম থেকে বেদের উৎপত্তি হয়েছে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ও মানব জীবন এবং তার নিয়তি সম্বন্ধে পরম্পরাক্রমে নানা সত্যরূপে। *তস্মাৎ সর্বগতম্ ব্রহ্ম নিত্যম্ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্*, 'অতএব সর্বার্থ প্রকাশক এই ব্রহ্ম সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন।' যখনই তুমি কোন পরার্থে কর্মের অনুষ্ঠান কর তখনই তোমার অনন্ত ব্রহ্মের, নিত্য সত্যের প্রকাশ ঘটাতে আরম্ভ করেছ। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলেছেন[১] :

" 'ত্যাগ ও সেবাই' ভারতের জাতীয় আদর্শ—ঐ দুটি বিষয়ে তাকে উন্নত করুন, তা হলে অবশিষ্ট যা কিছু আছে, তা আপনা হতেই উন্নত হবে।"

কী চমৎকারই না এই শিক্ষা! সমগ্র নৈতিক জীবন দুটি নীতিতে কেন্দ্রীভূত : ত্যাগ ও সেবা। ত্যাগ কিসের? আত্ম-কেন্দ্রিক অহঙ্কার বা স্বার্থেরই ত্যাগ চাই। বিরাট আত্মার অভিব্যক্তি হোক। তখন প্রত্যেকটি কাজই সেবার রূপ ধারণ করবে। তাই ত্যাগ হলো প্রাক্-মূল্য প্রাথমিক আবশ্যকতা। পরবর্তী মূল্য হলো সেবা। কোনরকম ত্যাগ না করে তুমি সেবা করতে পার না। আমি যদি কোন লোককে সাহায্য করতে চাই, তবে সেই অনুপাতে আমাকে ত্যাগ করতে হবে আমার নিজের স্বার্থ। আর তাই এই *যজ্ঞ*-ভাবনা বলতে বোঝায়, ত্যাগ ও সেবা।

এইভাবে বেদের একটি অনুষ্ঠান-ভিত্তিক ভাবনা রূপান্তরিত হয়েছে এক অতি উচ্চনীতিতে, যা সমন্বয় ঘটিয়েছে সমাজস্থ এক মানব গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য মানব গোষ্ঠীর এবং মানবজাতির সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির। তাই শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলেছেন যে, এই অসীম ও অবিনাশী ব্রহ্ম-সত্য প্রকাশ পায় আমাদের দ্বারা সাধিত প্রত্যেকটি *যজ্ঞ*-ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। কী চমৎকারই না এই ভাবনা। তোমার কাজকে যজ্ঞে পরিণত করলে, যে ব্রহ্মকে দূরে অবস্থিত বলে মনে হতো তাঁর সান্নিধ্য পাওয়া যাবে। পশু জাতি, উদ্ভিদ জাতি ও মানবজাতির রক্ষার দায়িত্ব আমাদের ওপর ন্যস্ত কারণ আমাদের ধীশক্তি রয়েছে, যার সাহায্যে আমরা এদের সকলকে যেমন ধ্বংস করতে পারি, তেমনি পারি তাদের রক্ষা ও পুষ্টিবিধান করতে। মানুষ যদি তাদের কর্মে *যজ্ঞ*-ভাব এনে এই দায়িত্ব পালন

১ বাণী ও রচনা ১ম সং, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭৮

না করে, তবে সে সব কিছুরই বিনাশ সাধন করে শেষে নিজেরও বিনাশ সাধন করবে। তাই বলা হয়েছে, সব কিছুই *যজ্ঞ*-কেন্দ্রিক বা উৎসর্গভাবের ওপর প্রতিষ্ঠিত—কেবল অনুষ্ঠান নয়, উৎসর্গের মনোভাবে কাজ। এ যেন এক বিরাট আত্মা বা সত্তা—সকলের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে ও অন্যান্য মানব সত্তার সঙ্গে, একত্ববোধে ও তাদের প্রতি সেবাভাবে প্রতিষ্ঠিত। এইরকম সেবা ও উৎসর্গের পর অবশিষ্ট যা থাকবে তারই ভোগে আমাদের আনন্দ। তাই, এবার ১৬শ শ্লোক ধরব, সেখানে এ ব্রহ্মাণ্ডচক্রের ভাবটির বিকাশ ঘটেছে আরো সুস্পষ্ট ভাবে।

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬॥

—'হে পার্থ, এ জগতে যে ব্যক্তি প্রচলিত কর্ম চক্রের অনুগামী না হয়ে পাপময় জীবন যাপন করে ও ইন্দ্রিয়ভোগে আনন্দ পায়, সে বৃথাই জীবনধারণ করে।'

শ্রীকৃষ্ণ এই সত্যের ওপর খুবই জোর দিয়েছেন। এই চক্র, এই পারস্পরিক সম্পর্কের চক্র, বিশ্ব সৃষ্টির আদি থেকে প্রচলিত আছে। ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এই চক্র প্রচলিত হয়েছে—'এই পারস্পরিক সম্পর্কে জড়িত বৃত্তটি'—*এবং প্রবর্তিতম্ চক্রম্*। 'যে ব্যক্তি এই জীবনে ঐ চক্র অনুসরণ না করে'—*ন অনুবর্তয়তি ইহ*; যে এই চক্র-ভাবনাকে উপেক্ষা করে, ভঙ্গ করে, সে জীবনকে একদেশ-দর্শী, স্বার্থপ্রণোদিত, স্বার্থ-কেন্দ্রিক প্রভৃতি নানা দোষে দুষ্ট করে ফেলে; এরূপ ব্যক্তির কী হয়? *অঘায়ুঃ* 'তার জীবন হয় পাপময়', অশুভ। *আয়ুঃ* মানে জীবন, আর *অঘ* মানে পাপ বা অশুভ। সে কেন *অঘায়ুঃ?* কারণ সে *ইন্দ্রিয়ারামো,* 'কেবল ইন্দ্রিয়ভোগেই সে আনন্দ পায়'; সে প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্য কোন যত্ন নেয় না—ঠিক যেমন দুষ্টলোকে সরকারের নিষেধ সত্ত্বেও লুকিয়ে লুকিয়ে বনে শিকার করে, সুন্দর পাখি, দুষ্প্রাপ্য প্রাণী এবং গাছপালা ইত্যাদি নষ্ট করে; লোকে এ সব করে; কিন্তু কেন? তারা এগুলিকে বিক্রয় করে প্রচুর অর্থ লাভ করতে চায়, আরামের জীবনযাপন করবে বলে; তারা পাপময় জীবনযাপন করে, কারণ তারা *ইন্দ্রিয়ারামঃ,* 'তাদের আনন্দ কেবল ইন্দ্রিয় ভোগেই'। ইন্দ্রিয়াসক্তি চরিতার্থ করা একটা সীমার মধ্যে থাকলে—তা ভাল হতে পারে; কিন্তু সীমাকে অতিক্রম করে গেলে, তা বিপজ্জনক।

আজকাল, এই বিষয়ে যে সমস্ত আন্তর্জাতিক আলোচনা সভা হয়, সেখানে

মানুষের প্রয়োজন ও তার চাহিদা—এই দুই-এর মধ্যে একটা পার্থক্য করা হয়। গান্ধীজী বলেছিলেন, মানুষের প্রয়োজন মেটাবার জন্য যথেষ্ট জিনিস পৃথিবীতে আছে, কিন্তু তা তার চাহিদা মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। চাহিদা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। তারা কেন এমনটা করে? কারণ আমরা সব সময় আমাদের ইন্দ্রিয়াসক্তির কাছে নত হয়ে চলি। মন বিচার করতে পারে না, যদিও প্রত্যেকটি মানব সেই আশ্চর্য সামর্থ্যের অধিকারী, সে অধিকার পশুদের নেই। অতএব, সমগ্র সমাজ যখন *ইন্দ্রিয়ারামঃ*, 'কেবল ইন্দ্রিয়ভোগেই অনুরক্ত', তখন সমাজের অধঃপতন হতে থাকে। বস্তুত সমস্ত সভ্যতার অধঃপতন শুরু হয় যখন সেই সমাজে *ইন্দ্রিয়ারাম* লোকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। আমাদের ভারতীয় ইতিহাসে বার বার এরূপ অবস্থা হয়েছে—এই *ইন্দ্রিয়ারাম* অবস্থাতেই সমাজের উন্নতি অবরুদ্ধ হয়; *মোঘং পার্থ স জীবতি*, 'হে পার্থ! এ সব লোকের জীবন বৃথা, শূন্য, অর্থহীন, সৃষ্টিশক্তিহীন'। *মোঘ* মানে অর্থহীন। তারা যে জীবন যাপন করে, এই *ইন্দ্রিয়ারাম* জীবন হলো অর্থহীন জীবন। সব পশুই এভাবে জীবনযাপন করে। আর মানুষও তাদেরই অনুসরণ করছে! মানুষ তার নিজস্ব অনন্যতা ভুলে যায়; সে অপরের কল্যাণে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে পারে। কিন্তু এই *ইন্দ্রিয়ারাম* অবস্থা তাকে এই ব্যাপৃত থাকতে দেয় না। তাই এ দুয়ের মিলনে : *অঘায়ুঃ ইন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি*, তার জীবন হয় বৃথা—একেবারে অর্থহীন, অন্তঃসারশূন্য। দৃষ্টান্তরূপে আমাদের ভারতকে ধর : ত্রিশ কোটি লোক, দারিদ্র্য, পিছিয়ে পড়া ভাব ও নিরক্ষরতায় ভুগছে। আর শতকরা অল্পলোকের প্রচুর অর্থ রয়েছে; তারা এতেই মত্ত। ওদিকে তাকাও! এক শূন্য অর্থহীন জীবন। তারা পারিপার্শ্বিক জগতের বিষয়ে একটুও মাথা ঘামায় না।

গত কয়েক শতাব্দী ধরে ভারতে এ ধরনের যে সব লোক পাওয়া যায় তাদের লক্ষ্য করে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খ্রিঃ ২০ আগস্ট লেখা এক চিঠিতে বলেছেন[১] :

'তাদের জন্য আমার দুঃখ হয়। তাদের কোন দোষ নেই। তারা শিশু, অতি শিশু, যদিও সমাজে তারা মহাগণ্যমান্য বলে বিবেচিত। তাদের চোখ নিজেদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিসীমার বাইরে আর কিছু দেখতে পায় না। তাদের গতানুগতিক কাজ—আহার, পান, অর্থোপার্জন ও বংশবৃদ্ধি—যেন গণিতের নিয়মে অতি সুশৃঙ্খলভাবে পর পর সম্পাদিত হয়ে চলেছে। এর বেশি তারা আর কিছু জানে

---

১ বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৬৫-৬৬

না। বেশ সুখী তারা! তাদের ঘুমের ব্যাঘাত কিছুতেই হয় না। শত শত শতাব্দীর পাশব অত্যাচারের ফলে সমুত্থিত শোক, তাপ, দৈন্য ও পাপের যে কাতর ধ্বনিতে ভারতাকাশ সমাকুল হয়েছে, তাতেও তাদের জীবন সম্বন্ধে দিবাস্বপ্নের ব্যাঘাত হয় না। সেই শত শত যুগব্যাপী মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক অত্যাচারের কথা, যাতে ভগবানের প্রতিমাস্বরূপ মানুষকে ভারবাহী গর্দভে, আর ভগবতীর প্রতিমাস্বরূপা নারীকে সন্তানধারণ করার দাসীস্বরূপা করে ফেলেছে এবং জীবন বিষময় করে তুলেছে, এ কথা তাদের স্বপ্নেও মনে ওঠে না।'

এই হলো ১৬শ শ্লোকের বিস্ময়কর উক্তিটি। ১৭শ শ্লোকে আর এক ধরনের জীবন সকল মানবজাতির সামনে তুলে ধরা হয়েছে। যখন কোন লোক পবিত্র, সংযত হয়ে, তার আপন অনন্ত সত্তাকে, আত্মাকে উপলব্ধি করার পথে চলেছে—তখন সে এক স্বতন্ত্র লোক হয়, কোনরূপ বাহ্য কর্তব্যবোধে আবদ্ধ হয় না, কিন্তু তার প্রেম, করুণা ও সেবাভাব স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। তার অস্তিত্বই সমাজের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ; এই ভাবটিই ১৭শ শ্লোকে প্রকাশ পেয়েছে ঃ

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭॥

—'কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত, কেবল আত্মাতেই আনন্দ লাভ করে, তাকে কোন কর্তব্য কর্ম করতে হয় না।'

ঐ ব্যক্তির কোন *কার্যম্*, 'কর্তব্য কর্ম' থাকে না, কারণ সে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। বিকাশ পূর্ণত্ব লাভ করেছে, আত্মার অমরত্ব উপলব্ধিতে। কীভাবে তা প্রাপ্ত হওয়া গেছে? *আত্মরতিরেব স্যাৎ*, অনন্ত আত্মাতেই সে সম্পূর্ণ আনন্দিত। 'তার আনন্দ পুরাপুরি সেই অনন্ত আত্মাতে', সকলের অন্তরস্থ ঈশ্বরে। *রতি*, মানে আনন্দ, আবার যৌন-সুখও বটে। *রতি* কথায় সব রকম সুখই বোঝায়, আর এখানে *রতি* হলো *আত্মরতিঃ এব স্যাৎ*, সে লোক প্রচুর আনন্দ পেয়েছে কেবল আত্মাতে, অনন্ত আত্মাতে, সর্বভূতস্থ এক আত্মাতে; *আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ*, 'যে মানবসত্তার সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয়েছে এই আমাতে'। এইরকম লোকের বাহ্য কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না। সে লোক তার আনন্দের জন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বস্তু পেতে চায় না। সে অন্তরে পূর্ণ আনন্দ উপভোগ করে। ঐ ভাষাটি উপনিষদ্ থেকে নিয়ে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। ঐ আনন্দ আসে কেবল ক্রমবিকাশের

উচ্চতম স্তরে। *রতি* বা সুখ আমরা চাই, আমরা চাই আনন্দ। শুরুতে আমরা তা পেয়ে থাকি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে, কিন্তু আমরা যখন বিকশিত হই, আমরা উপলব্ধি করতে থাকি যে আমরা সেই অনন্ত আত্মা, যা বাহ্য জগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল বস্তুর সেরা। ঐ জ্ঞান যখন আসবে, আমরা এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারব। *আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ,* 'কেবল আত্মাতেই আনন্দ পায়'। এরূপ ব্যক্তি, *তস্য কার্যম্ ন বিদ্যতে,* 'তাকে কোন কর্তব্য পালন করতে হয় না।' সে তখন সম্পূর্ণ মুক্ত এবং তদতিরিক্ত মানব জাতির কাছে সে আশীর্বাদ-স্বরূপ হয়। কর্তব্য আমাদের কখন পালন করতে হয়? যতদিন আমরা ত্রুটিপূর্ণ, আমরা অপূর্ণ। কিন্তু যখন কেউ অনন্ত আত্মাকে উপলব্ধি করে, সে তখন সমাজের কল্যাণ করে, কর্তব্য হিসাবে নয়, সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে নয়, স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম ও সেবার ফল্গুধারা থেকে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে, আনন্দস্য মীমাংসা, 'আনন্দের অনুসন্ধান' নামে একটি অনুচ্ছেদ আছে। আর ঐ উপনিষদে বলা হয়েছে, 'সব রকম মানবীয় আনন্দই আত্মানন্দের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মাত্র', *এতস্য এব আনন্দস্য মাত্রম্ উপজীবন্তি*।

যখন তোমার আত্মোপলব্ধি হয়, তখন তোমার মন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর দিকে একেবারেই ছুটবে না, কারণ তখন কোন বাসনা থাকে না, অতএব তদনুযায়ী কর্মও থাকে না। বাসনা ছাড়া কোন কাজও সম্পাদিত হতে পারে না। বাসনার প্রেরণায় আমরা কাজে নিযুক্ত হই। *তস্য কার্যম্ ন বিদ্যতে*। কেন? তা পরবর্তী শ্লোকে বোঝান হবে।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮॥

—'তাঁর (আত্মজ্ঞানীর) কোন কর্মানুষ্ঠান করে জাগতিক কোন বস্তু লাভ করার নেই, কর্মানুষ্ঠান না করায় তার কোন ক্ষতিও নেই—কোন আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর জন্য অন্য কোন লোকের ওপর তার নির্ভর করার দরকারও নেই।'

'তার পক্ষে কিছু কাজ করে ফল লাভ করার দরকার নেই', *নৈব তস্য কৃতেনার্থো*। একটি দশ বার বছরের ছেলেকে ধরো। তাকে সব সময়েই শেখাতে হবে, 'কঠোর পরিশ্রম কর, কঠোর পরিশ্রম কর। তোমাকে বহুবিধ অভীষ্ট সিদ্ধ করতে হবে।' বস্তুত এই ইংরাজি 'achievement' (কর্মানুষ্ঠান করে সিদ্ধিলাভ করা) কথাটি একটি 'technical' (বিশেষ প্রায়োগিক বা পারিভাষিক) শব্দ,

কার্ল যুঙ (Carl Jung) যার ব্যবহার করেছেন তাঁর *'Modern Man in Search of a Soul'* (pp 118-20)—'আত্মার সন্ধানে এযুগের মানুষ'—নামক গ্রন্থে। কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের অনুশীলন বা আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির জন্য জীবনে এক বিশেষ কালের গুরুত্বের বিষয়ে যুক্তি দিতে গিয়ে কার্ল যুঙ (Carl Jung) বলেছেন ('Modern Man in Search of a Soul' pp 125-26) ঃ

'মানুষের জীবন সায়াহ্নের অবশ্যই একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে, তা কখনো জীবন প্রভাতের এক করুণার্হ (করুণা উদ্রেককর) লেজুড় মাত্র হতে পারে না। জীবন প্রভাতের বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে নির্ভর করে ব্যক্তির উৎকর্ষের ওপর, বাহ্য জগতে আমাদের সুরক্ষার ওপর, স্বজাতির সংখ্যাবৃদ্ধির ওপর এবং আমাদের শিশুদের যত্ন নেওয়ার ওপর। স্পষ্টত এই হলো প্রকৃতির লক্ষ্য। কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌছে গেলে, উদ্দেশ্যপূরণ হলে—এমনকি সাফল্যের অতিরিক্ত পাওয়া হয়ে গেলে—অর্থোপার্জন, অধিকার-সীমার সম্প্রসারণ, জীবনের বিস্তার—কি সমভাবেই চলতে থাকবে সবরকম যুক্তি-ভাবনার সীমানা ছাড়িয়ে? যে জীবন সায়াহ্নে পৌছেও, প্রভাতের নিয়ম—অর্থাৎ স্বাভাবিক লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে চলে, তাঁকে স্বীয় আত্মিক ক্ষতিসাধন করে এই কাজের জন্য গুনাগার দিতে হবে, ঠিক যেমন এক বাড়ন্ত যুবককে তার বালকত্ব বজায় রাখতে গিয়ে স্বীয় ভুলের জন্য সামাজিক জীবনে ব্যর্থতার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। অর্থসংগ্রহ, সামাজিক পদমর্যাদা, পরিবারবর্গ এবং সন্তানসন্ততি—এগুলি আমাদের সহজ স্বভাব ছাড়া আর কিছু নয়—এগুলি সংস্কৃতি নয়। স্বভাবের যা লক্ষ্য, তার পারে হলো সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিই কি দৈবাৎ জীবনের দ্বিতীয় কালগত পর্যায়ের অর্থ ও লক্ষ্য হতে পারে?'

একটি যুবককে অবশ্যই বলতে হবে—কঠিন পরিশ্রম কর। জগৎ সংসারে প্রবেশ করে কিছু *করে* দেখাও। এরই নাম কীর্তি। যুবা বয়স মোটেই চুপ করে থাকার বা বিনা কাজে বসে থাকার সময় নয়। একেবারেই নয়। এমনটি হলে তার জীবনটাই বরবাদ হয়ে যায়। ঐ ব্যক্তি বেরিয়ে পড়ুক, কাজ করুক, তার বাসনা পূরণ করুক, কিছু কীর্তি রাখুক—এই স্তরে এইগুলি যেন তার জীবনের লক্ষ্য হয়। ঐসব কীর্তি অর্জনের পর ঐ ব্যক্তিকে অবশ্যই আরো উচ্চতর বিষয়ে চিন্তা শুরু করতে হবে। তারপর সে তার মনকে কাজ ও অভীষ্ট সিদ্ধির লক্ষ্য থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে নেয়। তখন সে কোন একটা কিছুর—আপন প্রকৃত স্বরূপের, অভাব বোধ করে এবং ভাবে ঐ সত্যকে উপলব্ধি করার

কথা। এই হলো মানবজীবনের দ্বিতীয় কালগত পর্যায়। আর যুঙ (Jung) একেই বলেছেন 'Culture' বা 'সংস্কৃতি'।

তাই, এই বিশেষ লোকটির, আত্মাকে নিয়েই যার জ্ঞানার্জন, আনন্দলাভ ও খেলা—তার আর এখান-ওখান ছুটে এ সংসারে পাবার কিছু নেই। সে পূর্ণকাম হয়েছে। একান্তই যদি সে কিছু করে তবে তা পরার্থে কিছু কল্যাণকর কাজ। তার নিজের লাভ করার কিছু নেই। এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়েরই শেষে তাঁর বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ একটি অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন ঃ

> **'কড়ায় ঘি ঢাল; ঘি গরম হলে তাতে কাঁচা লুচি ছাড়; ছ্যাক্ কল কল শব্দ হবে—যতক্ষণ লুচি কাঁচা থাকবে। লুচি পাকা, অর্থাৎ পুরো ভাজা হয়ে গেলে ঐ শব্দ বন্ধ হবে। একেবারে শান্ত ও নিঃশব্দ।'**

জীবনের গোড়ার দিকে আমরা সবাই কল কল করি—আমাদের নানা কর্ম করতে হয় বলে। শ্রীরামকৃষ্ণ আরো বলেন ঃ 'পাকা ঘিয়ে, যদি কাঁচা লুচি ছাড়, তবে আবার শব্দ হবে'।

১ অন্যের ইচ্ছাপূরণ করতে হবে; একাজ স্বাধীন ইচ্ছাপ্রসূত, স্বভাবের তাড়নায় নয়। এই হলো দ্বিতীয় অবস্থা। শ্রীকৃষ্ণ এটির কথা পরে উল্লেখ করবেন। যখন তোমার নিজের কিছু চাহিদা নেই, তখন অন্যদের সাহায্য কর যাতে তারা তাদের জীবনের আশা পূর্ণ করতে পারে। এ অতি চমৎকার জীবনাদর্শ। এদুটি মাত্রাই মহান, দুটিকেই স্বাগত জানাও। কীর্তি বড়, কিন্তু ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ আরো বড়; জীবনে আমরা দুটিই চাই। তাই, *নৈব তস্য কৃতেনার্থো ন অকৃতেনেহ কশ্চন,* 'কাজ করেও সে নিজে কিছু লাভ করে না, না করেও সে লাভ করে না। সে পূর্ণকাম হয়েছে।' *ন চ অস্য সর্বভূতেষু কশ্চিৎ অর্থব্যপাশ্রয়ঃ,* 'নিজ লাভের জন্য কিছু করতে তাকে অন্য কারো কাছে যেতে হয় না।' কারণ, সে যে শ্রেষ্ঠ, চির-পবিত্র, চির-মুক্ত আত্মাকেই লাভ করেছে।

এই শ্লোকে মানবজাতিকে বলা হয়েছে যে, ইন্দ্রিয়জ সমস্ত আসক্তি ও বাসনার পারে একটি অবস্থা আছে। আজকাল, পাশ্চাত্য সভ্যতা তার চিন্তাবিদদের জানিয়ে দিচ্ছে যে ভোগলিপ্সার দৌরাত্ম্য মাত্রাতিরিক্ত হওয়ায় তাদের সভ্যতা ধ্বংসের দিকে চলেছে। আমেরিকা সম্বন্ধে বলা হয় পৃথিবীর শতকরা ৬ শতাংশ লোক সারাবিশ্বে উৎপন্ন পণ্যের ৪০ শতাংশ ভোগ করছে। যেমনই হোক, পৃথিবীতে ভোগ্যপণ্যের জোগানের একটা সীমা আছে। তাই,

সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রতিবাদ আসছে ভোগবাদের এই ভ্রান্ততত্ত্বের বিরুদ্ধে, আর যখন জগৎবাসী বুঝবে যে মানব ব্যক্তিত্বের ইন্দ্রিয়স্তরের ওপরে আরো সব মাত্রা আছে, তখনই, কেবল তখনই, মানবীয় শক্তি অন্তর্মুখিনতার দিকে ফিরবে ঃ সে ভাববে, দেখি না আমার নিজ স্বরূপটি কিরকম, আমি তো এই ইন্দ্রিয়তন্ত্রটি নই, আমার উচ্চতর আরো কিছু আছে। সেই ব্যক্তির কথাই এখানে বর্ণিত হয়েছে। *ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ,* 'এটা সেটা দাও বলে তাকে কারো কাছে প্রার্থী হয়ে যেতে হয় না।' এই রকম লোকই পূর্ণতা লাভ করেছে, কৃতার্থ হয়েছে। এখানেও সেই অবস্থা। এই অপূরণীয় বাসনাপূর্ণ অবস্থা যেমন আছে, তেমনি আছে কৃতকৃতার্থতারূপ অন্য অবস্থাটিও। তাই, শ্রীকৃষ্ণ ঐ বিষয়টি নিয়ে এখানে আলোচনা করছেন। পরবর্তী ১৯তম শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥ ১৯॥

—'অতএব, তুমি অনাসক্ত হয়ে সর্বদা কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান কর; আসক্তিশূন্য হয়ে কাজ করলে মানুষ শ্রেষ্ঠ অবস্থা, অর্থাৎ মুক্তিলাভ করে।'

তস্মাৎ, 'অতএব', *অসক্তঃ সততম্ কার্যম্ কর্ম সমাচর,* 'সর্বদা অনাসক্ত হয়ে কর্তব্যকর্ম সাধন কর'। তুমি যত খুশি কাজ করতে পার, যদি তোমার 'এটা চাই', 'ওটা চাই'—এরকম মনোভাব-যুক্ত ইন্দ্রিয়ভোগ-বাসনার তাড়না না থাকে। *অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরম্ আপ্নোতি পূরুষঃ,* 'যে অনাসক্ত হয়ে কর্মানুষ্ঠান করে সে শ্রেষ্ঠ অনুভূতি লাভ করে'। *পরম্ আপ্নোতি,* 'সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থা লাভ করে', এখানে, এই জীবনেই। এই শিক্ষার ওপরেই *গীতায়* বার বার জোর দেওয়া হয়েছে। অনাসক্ত হওয়া খুবই কঠিন। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে আমরা এই প্রচেষ্টার শুরুই করব না। প্রথমে এ প্রচেষ্টা কঠিন বোধ হতে পারে, কিন্তু যেমন চেষ্টা করতে থাকবে ততই দেখবে—আরো বেশি বেশি ক্ষেত্রে তুমি অনাসক্তভাবে কর্মানুষ্ঠান করতে পারছ; নিরন্তর সংগ্রাম চালানোর ফলে আমরা আমাদের জীবনকে অনাসক্তির ভাবে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারব। কাজ চলেছে, কিন্তু আসক্তি নেই; এ কেন অসম্ভব হবে। বস্তুত প্রায়ই দেখা যায়, যখন এই উপদেশগুলি শুনি, তখন মনে হয়—'ওহো, এটা অসম্ভব!'—ওটি কেবল সাধু ও সন্তদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিছু লোক তা-ই মনে করে।

গান্ধীজীকে একবার অহিংসা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়। লোকে বলে, 'ওহো, এ অসম্ভব।' তখন গান্ধীজী বলেন, 'এই বিস্ময়কর বিজ্ঞানের যুগে কত অসম্ভব জিনিস সম্ভব হয়ে যাচ্ছে! তবে এটাই বা সম্ভব হবে না কেন?' গান্ধীজীর সময়ের পরে, আমরা আরো কতো অসম্ভব জিনিসকে সম্ভব হতে দেখেছি ঃ মানুষ চন্দ্রপৃষ্ঠে নেমেছে, চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠকে দেখেছে। এর আগে আর কেউই চাঁদের অপর পৃষ্ঠ দেখেনি। গত হাজার বছর ধরে আমাদের বলা হয়েছে, 'চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠ কেউ দেখেনি।' কিন্তু কী অসম্ভব কাজেই না আজকাল আমরা সফলকাম হচ্ছি! আমরা চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠ *দেখেছি*। আমরা চাঁদে *গেছি* সেখানে নেমেছি। তবে অসম্ভব কী? ঠিক তেমনি, 'ওহো, আমি আসক্তি দমন করতে পারি না, আমি ক্রোধ সংযত করতে পারি না, আমি এটা বা ওটাকে সংযত করতে পারি না। এটা সম্ভব নয়।' বলো না যে এটা অসম্ভব। অসম্ভব বলে কিছু নেই। মানুষের মনে প্রচুর সামর্থ্য রয়েছে। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখ, তাহলেই তুমি সফলকাম হবে। ঐ মনোভাবকে অবশ্যই জাগাতে হবে। তখনই কেবল এই সব ভাব মানুষের জীবনে ও কাজে রূপায়িত হবে। অতএব, আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে অনাসক্ত হয়ে কাজ আরম্ভ করে দিতে পারি; পরে ঐ অনাসক্তি অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রসারিত করব। কিন্তু এ এক অতি আশ্চর্য শিক্ষা। কাজ যত চলতে থাকে, আসক্তি তত দূরে সরে যায়। আসক্তি বন্ধনের কারণ—দুই-এরই বন্ধন। এমনকি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম দুজনেরই মুক্তির কারণ হয়, আসক্তি দু-জনকেই বেঁধে রাখে। যে জন আসক্ত, আর যার প্রতি আসক্তি হয়েছে, দু-জনেই বাঁধা পড়েছে। *সততম্*, মানে সর্বদা; *কার্যম্ কর্ম সমাচর*, 'জীবনে যে সব কর্তব্য রয়েছে তা করে ফেল'; এসব কাজ খুব আগ্রহ ও ভক্তির সঙ্গে কর। কিন্তু মনে যেন অনাসক্তির ভাবটি বজায় থাকে।

তারপর শ্রীকৃষ্ণ একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝান, কীভাবে নিজ কাজের দ্বারা, সমাজের প্রতি নিজ দায়-দায়িত্ব পালনের দ্বারা কোন কোন লোক সর্বোচ্চ উপলব্ধির অধিকারী হয়েছে। বহু পুস্তকে যা স্থান পেয়েছে, সেই প্রখ্যাত দৃষ্টান্তটি হলো বিহারের মিথিলা নগরীর রাজা জনক সম্বন্ধে গল্পটি। জনক এক রাজ্যের রাজা ছিলেন, তিনি আবার ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রহ্মানুভূতিসম্পন্ন পুরুষও ছিলেন। যুবা সাধু শুককে তাঁর পিতা রাজা জনকের কাছে পাঠিয়েছিলেন আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভের জন্য। তাই, শ্রীকৃষ্ণ ঐ দৃষ্টান্তটি এখানে উল্লেখ করেছেন ঃ মনে করো না যে কেবল নির্জনে বা বনেই অনাসক্তি অভ্যাস করা যায়। পারিপার্শ্বিক জাগতিক দায়িত্বের মধ্যেও তুমি এই অভ্যাস চালাতে পার—সেটাই হলো

বীরত্ব। যেখানে কোন কিছুই তোমার অসুবিধে সৃষ্টি করার নেই, সেখানে অনাসক্তি পালনে কোন বীরত্ব নেই। ঐ কথাই শ্রীকৃষ্ণ ২০তম শ্লোকে বলবেন ঃ

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি ॥ ২০॥

—'জনক ও আরো অনেকে (নিষ্কাম) কর্মানুষ্ঠানের দ্বারাই পূর্ণতা (মোক্ষ) অর্জন করেছিলেন; এমনকি লোক সংগ্রহের (লোক কল্যাণের বা সামাজিক সুস্থিতি বজায় রাখার) জন্যও তোমার কর্ম করা উচিত।'

জনকের মতো মহান রাজাগণ সকলেই কর্ম করে পূর্ণতা বা মুক্তি অর্জন করেছিলেন। *সংসিদ্ধিম্* মানে 'পূর্ণতা' লাভ, কর্মনৈব হি, 'কেবল কর্ম করেই তাঁরা' *সংসিদ্ধি*, 'পূর্ণতা অর্জন' করেছিলেন। তাঁরা আসক্তি জয় করেছিলেন; একচ্ছত্র অধিপতিরূপে সিংহাসনে বসে, প্রজাগণের দ্বারা সম্মানিত হয়ে; তিনি আত্মহারা হয়ে যান নি। এ এক বিস্ময়কর সাফল্য। যখন আত্মজ্ঞানের সামান্যও মানুষ উপলব্ধি করে এই তেজের অধিকারী হয়, তখন তাতে এমন শক্তি আসে যার ফলে সে (প্রলোভন সত্ত্বেও) সততার পথ থেকে টলে না। সাধারণ লোক সামান্য ক্ষমতা পেয়েই বাহ্য জগতের *সামান্য* প্রলোভনে আত্মহারা হয়ে যায়; সে লোক কতই ক্ষুদ্র! এদিকে আর এক শ্রেণির লোক রয়েছে—সামনে প্রচুর প্রলোভন থাকা সত্ত্বেও যার মনে এতটুকুও চাঞ্চল্য সৃষ্ট হয় না। একেই দৃষ্টান্তস্বরূপ নেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে স্থিরবুদ্ধি লোকের বর্ণনা প্রসঙ্গে ঃ *আপূর্যমাণম্ অচল প্রতিষ্ঠম্ সমুদ্রম্ আপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ*, 'যার মন কানায় কানায় ভর্তি বিশাল হ্রদের মতো অচঞ্চল থাকে, বহু নদী এসে পড়লেও, সে হ্রদে কোন চাঞ্চল্যে কোন তরঙ্গেরও সৃষ্টি হয় না।' আমাদের মনকে তেমনি হতে হবে। এই কথাই গীতায় আগে বলা হয়েছে। দৃঢ়, স্থির মন, বিশাল মন, বীরত্বব্যঞ্জক মন চাই, নেহাৎ ক্ষুদ্রমনা মানুষের মতো নয়। বহু দেশে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্রমনা লোক ক্ষমতায় রয়েছে। তেমনটি হওয়া উচিত নয়, হওয়ার দরকারও নেই। কিছু দৃঢ়চেতা, বীরভাবাপন্ন লোক অবশ্যই থাকা চাই। এ সব তখনই আসবে যখন আমরা এ ধরনের সংগ্রাম শুরু করব। তখন এ দেশে এবং অন্য প্রত্যেকটি দেশে মহনীয় কিছু ব্যাপার ঘটবে।

বহু লেখক লর্ড অ্যাকটনের (Lord Acton's) বিখ্যাত উক্তিটির উল্লেখ

করে থাকেন, যাতে বলা হয়েছে—ক্ষমতা মানুষকে দুর্নীতি-পরায়ণ করে; সর্বময় ক্ষমতা সম্পূর্ণ দুর্নীতিগ্রস্ত করে। *গীতা* আমাদের এমন এক জীবন ও কর্ম দর্শন দিয়েছেন, যা ক্ষমতাকে দুর্নীতিমুক্ত রাখে। এ বিষয়টি আবার *গীতার* ৪র্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে *রাজর্ষি* ভাব অবলম্বনে।

এর দ্বারা মানুষে মানুষে সম্পর্ককে আরো বেশি সুখদায়ক করে তোলা সম্ভব হবে। তাই তিনি বলেছেন ঃ *কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিম্ আস্থিতা জনকাদয়ঃ* 'কর্ম ত্যাগ না করে (অথবা বনে না গিয়ে) জনকের মতো রাজাও সংসিদ্ধি, অর্থাৎ পূর্ণতা অর্জন করেছিলেন নানা কাজের মধ্যে থেকেও'। *লোক সংগ্রহম্ এবাপি সংপশ্যান্ কর্তুম্ অর্হসি,* 'মানব-সমাজের স্থিতিশীলতাকে সুদৃঢ় করার জন্য'। মনে কর তোমার নিজের কোন বাসনা নেই; তুমি মুক্ত; তোমার কোনরূপ কর্মানুষ্ঠানই করার প্রয়োজন নেই। তবু তোমাকে কাজ করতে হবে, কারণ অন্যের তাতে প্রয়োজন আছে; তোমাকে তাদের সহায়তা করতে হবে। এরই নাম *লোকসংগ্রহ,* 'মানব সমাজের স্থিতিশীলতাকে সুদৃঢ় করার জন্য'। *গীতার এই লোক সংগ্রহের, লোককল্যাণের ভাবনাটি অতি চমৎকার।* আমার সমাজের একটি লোকও কেন কষ্ট পাবে? যেমন গান্ধীজী বলেছিলেন, আমি এখানে রয়েছি—আমার সমাজের ক্রন্দনরত শেষ মানুষটির চোখের জল মুছে দিতে। এখানেও আবার কাজ চলেছে—তবে নিজের জন্য নয়। এ কাজ অন্যের কল্যাণে। *গীতার* এই *লোকসংগ্রহ* ভাবটি, নীতিশাস্ত্রের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাব। কীভাবে দেখা যাবে যে, কেবল আমাদের নিজ সমাজই নয়, পরন্তু আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী তথা সমগ্র জগৎ আরো সুখদায়ক, আরো সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠছে? আমি এ কাজে লাগতে প্রস্তুত, এতে আমার কোন স্বার্থ নেই—এক্ষেত্রে এমনই দৃষ্টিভঙ্গি থাকা চাই। তাই, শ্রীকৃষ্ণ আরো বলছেন ঃ *লোক সংগ্রহমেবাপি,* 'এমনকি মানব সমাজের স্থিতিশীলতার দৃঢ়ীকরণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও; কেউ যেন চুপ করে বসে না থাকে। তোমার কোন বাসনা না থাকলেও অন্যের কল্যাণে কাজ কর। সংসারে আমাদের নিজস্ব সমস্যা কত রয়েছে, তার ওপর পরের প্রতি আমরা আরো কতটা সহানুভূতি দেখাতে পারি? অতএব কাজ করে যাও, পরস্পর সাহায্য বিনিময় হোক। *পরস্পরম্ ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরম্ অবাপ্স্যথ।*

যে সব মহান সত্য আজ ভারতকে প্রেরণা যোগাতে পারে—এই 'পরস্পরং ভাবয়ন্ত'র ভাবটি তাদের অন্যতম। স্বাধীনতার চল্লিশ বছরে আমরা কী সাফল্য অর্জন করেছি? আমরা দূর করতে পারতাম নিরক্ষরতা, এমন কি আমাদের কোটি কোটি লোকের শোচনীয় দারিদ্র্যকেও। কিন্তু উচ্চস্তরের লোক এতই

স্বার্থকেন্দ্রিক হয়ে উঠল যে তারা অন্য কারো কল্যাণের চেষ্টায় যত্নবান হলো না। সব কলেজ, স্কুলগুলি শহরের কাছে, শহরের ভেতরে বা কাছে স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছে। এতে গ্রামাঞ্চল উপেক্ষিত হয়েছে। তার ফলে প্রায় ৩০ কোটি লোককে তমসাচ্ছন্ন অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে। ফলে এক একপেষে উন্নয়ন হয়েছে, মনে হবে আমরা শক্তিশালী হয়েছি, কিন্তু মূলে আমাদের অনেক দুর্বলতা রয়েছে। যদিও পৃথিবীতে বিজ্ঞান কর্মীর সংখ্যায় আমরা তৃতীয় বৃহত্তম দেশ, তবু আমাদের দেশে ত্রিশ কোটি লোক শোচনীয় ভাবে দারিদ্র্যগ্রস্ত। এরূপ বিজ্ঞান-কর্মীর প্রয়োজন আছে কি? আমাদের চিন্তাজগতে এই রকম বৈপ্লবিক চিন্তা সবে আসতে আরম্ভ করেছে। এতে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে।

এই প্রসঙ্গে, গীতার আদর্শ আমাদের প্রচুর প্রেরণা জোগাবে—এই সবকে জাতীয় চরিত্র-শক্তিতে রূপায়িত করতে ও আমাদের মানবিক পরিস্থিতির সম্ভাবনাময় রূপান্তর ঘটাতে। তাই, *লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুম্ অর্হসি* '*লোকসংগ্রহের* দৃষ্টি থেকেও, আমাদের উদ্যমের সঙ্গে কাজ করা উচিত'। সংগ্রহ মানে রক্ষা করা, যত্ন নেওয়া, কল্যাণ করা ইত্যাদি; *লোক* মানে জনগণ, বিশেষত সাধারণ লোক—সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে দেশে কোটি কোটি লোকের সুখ ও কল্যাণের কথা। গান্ধীজী সেই সময়কার এক কংগ্রেসী দেশভক্তকে বলেছিলেন, 'যখন তোমার কোন বিশেষ প্রশ্ন সম্বন্ধে সন্দেহ জাগবে, এক মিনিট নীরবে থেকে নিজেকে এই প্রশ্ন কর : "যদি আমি এ কাজ করি, তাতে কি সমাজের নিম্নতম স্তরের লোকের কোন কল্যাণ সাধিত হবে?" যদি এতে ওদেরও কল্যাণ হয়, তবে সে কাজ করতে পার'। গান্ধীজী এরূপ আদর্শই রেখে গেছিলেন। কীভাবে কার্যসূচী স্থির করতে হয়? আমাদের স্বার্থসিদ্ধি হয় এমন কাজ কি আমরা নির্বাচন করতে পারি? কখনই না। প্রশ্ন কর : 'এতে কী দরিদ্রতম ও নিম্নতম স্তরের লোক উপকৃত হবে?' যদি তাই হয়, তবে সে নির্বাচন পুরাপুরি ঠিক হয়েছে। এ রকম বহু চিন্তা আমাদের জাতির কাছে আসা উচিত। জাতির উপরি-স্তরে আমরা খুবই আত্মকেন্দ্রিক। যা কিছু ভাল নীতি আমাদের সংসদে গৃহীত হয়, তা যখন কাজে পরিণত করতে যাওয়া হয়, তখন তার ফল কর্মচারীদের প্রত্যেকটি স্তরে কিছু কিছু করে অপহৃত হতে থাকে, সমাজের অতি নিম্নস্তরের লোকের কাছে তার অতি সামান্যই গিয়ে পৌছায়। সব সময়ে এই অভিজ্ঞতাই আমাদের হয়েছে। তা চলে যাবে যখন আমরা সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারব—এই সব শিক্ষাগুলি যা রয়েছে গীতায় এবং মানুষ-গঠন ও জাতি-গঠনমূলক বিবেকানন্দ-সাহিত্যে। অতএব *লোক-সংগ্রহ*

হলো সাধারণ লোক-কল্যাণমূলক কর্মের একটি বলিষ্ঠ ভাব; তা যেন অবশ্যই সব সময়ে আমাদের মনে জাগরূক থাকে। আমি দেখেছি, আমাদের কিছু কিছু গ্রামে ক্ষমতাশালী লোকেরা নিজেদের জন্য ভালটুকু সরিয়ে রাখে, আর সাধারণ লোকের কল্যাণের কথা ভাবতেই চায় না। জাতি এই ভাবে চলতে থাকলে সার্বিক জাতীয় উন্নয়ন হবে কী করে? তাই, এই লোকসংগ্রহ-মূলক দর্শনের অন্তত কিছুটাও যেন আমাদের জনগণের মনে ও প্রাণে অবশ্যই স্থান পায়।

তারপর শ্রীকৃষ্ণ একটি সর্বজনীন সত্যের কথা আমাদের বলেছেন। সমাজে এমনটিই দেখা যায় যে—সাধারণ লোক অন্য প্রসিদ্ধ লোকের অনুকরণ করে থাকে। মনে কর, গ্রামে একজন নাম করা লোক আছেন। তিনি যা করেন, অন্যেরা চায় সেই রকমটি করতে। সমাজে এই নকল করার, অনুকরণ করার প্রবণতা রয়েছে। সমাজ বিজ্ঞানে এ বিষয়ে পাঠ করা হয়। এইরকম হয় বলে, নামকরা লোকেদের অবশ্যই দৃষ্টান্তস্বরূপ হতে হবে, যাতে তাঁর অনুকরণ যারা করবে তারা ভাল হতে পারে, মন্দ নয়। সুতরাং সমাজে যিনি খ্যাতনামা পুরুষ তাঁকে নিজ চারিত্রিক ও ব্যবহারিক মানের উৎকর্ষ একটা স্তরে বজায় রাখতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ এবার এই বিষয়টি নিয়ে বলবেন নিজ দৃষ্টান্ত অবলম্বনে—তৃতীয় অধ্যায়ের এই অংশটি খুবই চমৎকার। তিনি বলেছেন ঃ

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ২১ ॥

—'*শ্রেষ্ঠ* ব্যক্তিরা যেমন যেমন আচরণ করেন, অন্যেরা তাই অনুসরণ করে; কার্যক্ষেত্রে তিনি যে মান রক্ষা করে চলেন—অন্য লোক তাই অনুসরণ করে।'

শ্রেষ্ঠঃ মানে যে ব্যক্তি সমাজে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত; যে ব্যক্তি অর্থে, বুদ্ধিতে বা রাজনীতিক ক্ষমতায়, যে কোন একটিতে, অন্যকে ছাড়িয়ে যায় তাকেই সেই সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হয়; 'সে যা করে, অন্যে তাকে অনুকরণ করতে চেষ্টা করে।' এই হলো মানব সমাজের প্রকৃতি ঃ *যদ্‌যদ্ আচরতি শ্রেষ্ঠঃ তদ্ তদ্ এব ইতরো জনঃ; স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকঃ তৎ অনুবর্ততে,* 'সে চরিত্রে ও ব্যবহারে যে মান রক্ষা করে চলে অন্যেরা তারই অনুবর্তন করে।' কী সুন্দর ভাব! তথাপি, উল্টো পথে চলাও সম্ভব। তাই, আজকাল উপরতলার লোক নীতিভ্রষ্ট হওয়ার ফলে, সমাজের নিম্নস্তরের লোকের মধ্যেও নীতিভ্রষ্টতা ছড়িয়ে পড়েছে। অতএব ওপরের স্তরের ব্যক্তিদের চরিত্র অবশ্যই উচ্চমানের হওয়া চাই। মানব সমাজের ব্যবস্থা সম্বন্ধে সভ্যতার গোড়ার দিকের শতাব্দীগুলিতে

আমাদের যে ধারণা ছিল, সেই চমৎকার ব্যবস্থা এখনো চলেছে ও পালিতও হচ্ছে; সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, যথা *ব্রাহ্মণ,* দরিদ্রতম হতেন। এরা নর-নারী নির্বিশেষে, নিজেদের চারিত্রিক মান ও লোক ব্যবহারের উৎকর্ষ যুগ যুগ ধরে বজায় রেখেছিলেন—যতদিন না তা অবক্ষয়ের যুগে তার সামগ্রিক অবনতি ঘটেছে। উপক্রমণিকায় আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়কে তাঁর জমিদার আদালতে তার পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বলে। ক্ষুদিরাম উত্তর দেন, 'আমি দুঃখিত, এ কাজ আমি করতে পারব না। আমি জানি, আপনার কথা সত্য নয়, আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পারব না।' জমিদার ছিল দুষ্ট লোক, তাই তাঁকে বলে, 'তবে আপনাকে কষ্ট পেতে হবে'। 'কষ্ট পেতে হয় তো হবে, তবু আমি কেবল সত্যই বলব। আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে যাব না।' এই কারণে জমিদার শ্রীরামকৃষ্ণের পিতাকে গ্রামছাড়া করেন। তিনি তাঁর সামান্য পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে দুই ছেলে ও তাদের মাতাকে নিয়ে পথে নেমে চলতে থাকেন। কিছু দূরে অন্য এক গ্রামের সৎ জমিদার তাঁদের দেখতে পায় ও ক্ষুদিরামকে বলে, 'আপনি আসুন, আমার কামারপুকুর গ্রামে এসে বসবাস করুন। আমি আপনাকে এক খণ্ড জমি দান করছি।' সেই গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম হয়। জীবনের সদ্-গুণাবলী ও নৈতিক চরিত্রের উচ্চমান লক্ষ্য করুন; অর্থই সব নয়। স্বাধীনতা লাভের পর, বছরের পর বছর আমরা ঐ সামর্থ্য—ঐ চারিত্রিক তেজ হারাচ্ছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা রাজনীতিক স্বাধীনতা চেয়েছিলাম। আমাদের কষ্ট পেতে হয়েছে, পুলিশের প্রহার আমাদের পিঠে পড়েছে। তবু অনেকে এগিয়ে গেছেন এবং কষ্ট সহ্য করে স্বাধীনতার মূল্য দিয়েছেন। তখন আমাদের যে সামর্থ্য ছিল, এখন তার প্রায় সবটাই চলে গেছে। এই হলো আমাদের বর্তমান দুর্ভাগ্য।

যদ্ যদ্ আচরতি *শ্রেষ্ঠঃ তত্তদেবেতরো জনঃ,* 'শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে পথে যায় অন্য লোক তারই অনুগমন করে'; *স যৎ প্রমাণম্ কুরুতে লোকস্তৎ অনুবর্ততে,* 'সে যে কর্মকে প্রামাণিক বলে নির্ধারণ করে দেয় লোকে তাই করে।'

যদি বাড়িতে পিতা উচ্চ চারিত্রিক মান রক্ষা করে চলেন, মাতাও উচ্চ মান রক্ষা করেন, তবে ছেলেরাও পিতা-মাতাকে অনুসরণ করবে। লোকে প্রায়শই ভুলে যায় যে তাদের আশেপাশে বেশ সমালোচনাপ্রবণ ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন শিশুরা ঘোরাফেরা করছে। তারা চোখ রাখছে তাদের মাতাপিতারা কি করছেন। তাঁরা যদি

মন্দ কাজ করেন তবে ছেলেরা পরস্পরে বলাবলি করবে ঃ 'আচ্ছা, আমরাও ওর দ্বিগুণ মন্দ কাজ করব'। এইটাই স্বাভাবিক। তাই, শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন, সমাজের শিখরে অবস্থান করা সহজ নয়। তোমাকে উচ্চমানের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে যেতে হবে। এইটি হচ্ছে না। বস্তুত মানব সমাজে মন্দলোকই বেশি সংখ্যায় সব রকম সম্মান পাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া বা আমেরিকা বা ইংলন্ডে সংবাদপত্রে মন্দ লোকেরাই সংবাদে অগ্রাধিকার পায়; কেউ ব্যাঙ্ক থেকে বা ট্রেনের যাত্রীর কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ ডলার লুট করেছে; সংবাদপত্র সেই ডাকাতকেই এক বীর পুরুষরূপে চিত্রিত করে, তার সম্বন্ধে বই লেখা হয়, ফলে সে স্বল্পকালেই কোটিপতি বনে যায়। সৎ লোকের কোন স্থান নেই। এ এক উল্টো ধরনের সামাজিক মূল্যবোধ। এখানে শ্রীকৃষ্ণ সমাজ কল্যাণের জন্য এই উপদেশ দিচ্ছেন। সাবধান! যদি তুমি নেতৃস্থানীয় হও, তবে তোমার গোষ্ঠীর অন্য সকলের সামনে এক উত্তম দৃষ্টান্ত রাখ। নেতা হওয়া খুব সহজ নয়। তোমাকে নিজ আচরণ সম্বন্ধে খুবই সংযত হতে হবে—একজন সর্দারকে অর্থাৎ নেতাকে, অবশ্যই *শিরদার,* উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মস্তক দেবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এই শিক্ষাই তিনি *কর্মযোগ,* কর্ম সম্বন্ধীয় যোগ, নামে তৃতীয় অধ্যায়ে দিচ্ছেন। সমাজে বাস করার ও কাজ করার সময় আমাদের কতটা সজাগ থাকতে হবে, যাতে সমাজের কল্যাণই বৃদ্ধি পায়, মন্দটা নয়। নেতৃত্বের প্রকৃত অর্থ এই। তাই, একথা বলে, শ্রীকৃষ্ণ নিজ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। অতি সুন্দরভাবে তিনি তা বলেছেন ঃ 'এ জগতে আমার কোন কিছু লাভ করার নেই, তবু দেখ আমি কেমন কাজ করে চলেছি।' পরবর্তী তিনটি শ্লোকে তিনি এই বিষয়েই বলবেন।

জ্যেষ্ঠের কত বড় দায়িত্ব, কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমাদের স্কুলগুলিতে উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র, নিম্ন শ্রেণীর ছাত্র, দুই-ই আছে। নিম্নশ্রেণীর ছাত্রেরা উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে থাকে। উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের ব্যবহার যেমন হবে, নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের ব্যবহার সেই রকম হবে। শ্রীকৃষ্ণ এই ভাবটিকে একটি সামাজিক সত্যরূপে প্রকাশ করেছেন, যে সত্যে নেতৃস্থানীয় লোকেদের সামাজিক দায়িত্ববোধের কথা নিহিত রয়েছে। পরবর্তী ২২তম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করে বলছেন, 'হে অর্জুন, আমার দিকে তাকাও' ঃ

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি ॥ ২২॥

—'হে পার্থ, তিন লোকে আমার কোন কর্তব্য কর্ম নেই, আমি পাইনি এমন

কিছু নেই, আমাকে পেতে হবে এমন কিছুও নেই, তবু আমি লোককল্যাণের জন্য কর্ম করে চলেছি।'

ঈশ্বরাবতাররূপে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'হে অর্জুন, আমার দিকে তাকাও, তিন লোকে আমার কিছু লাভ করার নেই, তবু আমি সর্বক্ষণ নিজেকে কাজে নিযুক্ত রাখি।' সমাজ থেকে তোমার কিছু লাভ করার প্রয়োজন থাকলেই, তার প্রতিদানের কথা ভেবেই কর্তব্য বোধ আসে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি। ঈশ্বরাবতার হয়েও শ্রীকৃষ্ণ রাজনীতিক নেতা, আধ্যাত্মিক আচার্য, দার্শনিক প্রভৃতি নানা ভূমিকায় কাজ করেছেন, তার বর্ণনা পাওয়া যায়, *মহাভারতে*। প্রত্যেকেই নির্দেশের জন্য তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতো, তিনি তো অনায়াসেই অলস জীবন-যাপন করতে পারতেন। তাঁর কোন কাজই করার দরকার ছিল না। তাঁর প্রয়োজন মতো সব কিছুই তাঁর পক্ষে পাওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু তিনি বলছেন, 'না, আমি সব সময়ে কাজ করে চলেছি, যদিও আমার নিজের কিছু লাভ করার নেই'। তিনি অতীব কর্মব্যস্ত থাকতেন। তাঁকে প্রায়ই গুজরাটের সমুদ্র তীরবর্তী দ্বারকা থেকে ভারতের বর্তমান রাজধানীর কাছে দিল্লীতে আসতে হতো। কতবারই না তাঁকে রাজস্থানের মরুভূমি পার হতে হয়েছে, আরো দূরে বিহারে মগধ প্রদেশে যেতে হয়েছে! *মহাভারতের উদ্যোগপর্বে* যেমন সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে—যাচ্ছেন পাণ্ডবদের দূত হয়ে, কৌরবদের কাছে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য সওয়াল করতে এবং যুদ্ধ এড়াতে ও কৌরবদের কাছে প্রার্থনা করতে—পাণ্ডবদের অর্ধরাজ্য ফিরিয়ে দেবার জন্য, অন্যথায় অন্তত পাঁচখানি গ্রাম দেবার জন্য। আমার ইচ্ছা হয়—কোন পণ্ডিত মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত রাজনীতিক ও কূটনীতিক ভাষণগুলি নিয়ে একখানি বই লেখেন। পাঠকবর্গ ঐ সব ভাষণের প্রতিধ্বনি পাবেন আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রদত্ত ভাষণগুলির মধ্যে!

শ্রীকৃষ্ণ কেন এত কর্ম করেছেন? তা ব্যাখ্যা করেছেন পরবর্তী শ্লোকে ঃ

যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ২৩॥

—'হে পার্থ, আমি যদি অনলস হয়ে কর্মে ব্যাপৃত না থাকি, তবে নর-নারী আমার দৃষ্টান্ত অবলম্বন করে কর্মবিমুখ হবে।'

'আমি যদি অলস হয়ে থাকি, কোন কাজ না করি, তবে অন্যলোক আমার

দিকে তাকিয়ে চিন্তা করবে : "এতো বেশ ভাল মতলব, আমিও কাজ না করে থাকি না কেন।" ' ভাষাটি হলো, *যদি হি অহম্ ন বর্তেয়ম্*, 'আমি যদি কাজ না করি', *জাতু কর্মণি অতন্দ্রিতঃ*, 'সর্বদা ও মহা উদ্যমের সঙ্গে'; আমি যদি এভাবে কাজ না করি, *মম বর্ত্ম অনুবর্তন্তে*, 'লোকে *আমার* পথই অনুসরণ করবে', *মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ*, 'হে অর্জুন, সব লোক সব রকমে।' তাতে অন্যায় কি আছে? তারা কষ্ট পাবে। তাদের কাজ করা দরকার, রোজগার করা দরকার, তাদের এত সব করতে হবে—কিন্তু তারা যদি না করে, শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে? তবে শ্রীকৃষ্ণ লোকেদের কাছে এক অশুভ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ও সেইভাবে তাদের জীবনকে ধ্বংসের পথে চালিয়ে তাদের শত্রু বলে পরিগণিত হবেন।

বাড়িতে পিতাকে পুতুল নিয়ে খেলতে হয় না; কিন্তু শিশুদের সে খেলার প্রয়োজন আছে, কিন্তু শিশুদের উৎসাহ দেবার জন্য পিতাও শিশুদের সঙ্গে খেলায় যোগ দেন। পিতামাতা ও শিশুদের মধ্যে এরকম যোগাযোগ শিশুদের বড় হয়ে ওঠার পক্ষে অত্যন্ত জরুরি। তাই, শ্রীকৃষ্ণের মতো একজন মানব, যাঁর এসবের কোন প্রয়োজন নেই, বলেছেন, 'আমার দৃষ্টান্ত দেখ, আমি কঠোর পরিশ্রম করছি, আমি যদি অলস হই তবে জনগণ কষ্ট পাবে।' এই ভাবটিই প্রকাশ পেয়েছে পরের শ্লোকে :

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্ ।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

—'আমি যদি কাজ না করি, তবে এইসব লোক উৎসন্ন যাবে, আর আমিই হবো বর্ণ সঙ্করাদি সামাজিক বিশৃঙ্খলার হেতু এবং সে জন্য প্রজাগণের বিনাশের কারণ।'

আমি যদি চুপ করে বসে থাকি, অলস হয়ে পড়ি, কোন কাজ না করি, তবে 'আমি এই সব লোকজনের বিনাশের কারণ হবো', *উৎসীদেয়ুঃ ইমে লোকা। সঙ্করস্য চ কর্তা স্যাম্ উপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ*, 'আমি সমাজে বিশৃঙ্খলার এবং বহুতর লোকের সাফল্য লাভের সম্ভাবনার বিনাশের হেতু হবো।' এতে এক গূঢ়সত্য নিহিত রয়েছে, আর আমাদের সামাজিক ইতিহাসেই এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। উচ্চ মরমীভাব নামে, নৈষ্কর্ম্য বা অকর্মের তত্ত্ব আমাদের জানা ছিল। আমরা এ তত্ত্ব অধিগত করে, এ থেকে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করতে

পারতাম। কিন্তু কয়েক শতাব্দী পরে সাধারণ লোকও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে লাগল : ফলে আলস্য, কর্মে নিরুৎসাহ, ন্যূনতম কর্ম, কর্মবিমুখতা, গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে কর্ম করার সামর্থ্যহীনতা, এই রকম দোষগুলি আমাদের বহু লোকের চরিত্রে প্রকাশ পাচ্ছে। অধ্যাত্ম জগতের আচার্যগণের কাছে কর্মের দ্বারা অর্জিত কোন ফললাভের প্রয়োজন ছিল না, তাই তাঁরা নৈষ্কর্ম্য অবলম্বন করতেন—কিন্তু না বুঝে এঁদের অনুসরণ করতে গিয়ে আমাদের সাধারণ লোক তত্ত্ব অধিগত করতে পারল না, ফলে, তাঁদের আধ্যাত্মিক উন্নতিও হলো না, সাংসারিক সুরাহাও হলো না। তবু আমাদের জনগণ তাঁদেরই অনুসরণ করতে থাকলো। এখন আমরা চেষ্টা করছি, জনগণকে তাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ঐ 'পবিত্র আলস্য' ও কর্মে উদ্যমহীনতা থেকে মুক্ত করতে। দৃষ্টান্ত হিসাবে আমাদের গ্রামের লোকেদের ধর। কোন রকম উন্নয়নের কাজে তাদের উৎসাহ নেই। তারা গ্রামের উন্নয়নের কাজে, গ্রামীণ আর্থিক অবস্থার, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের কাজে এক সঙ্গে মিলতে পারে না; অতি অল্প কয়েকটি গ্রাম বাদে, এ কথা অধিকাংশ গ্রামের পক্ষেই সত্য। শত শত বছরের ভ্রমাত্মক অভিজ্ঞতার ফলেই এই বদ-হজম, তত্ত্বের মর্ম বোধে ব্যাঘাত তাদের হয়েছিল। এ সবের পরিবর্তন চাই। এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রদত্ত দর্শন (বা তত্ত্ব) ও তাঁর *গীতাকে* আমাদের চাই। ঐভাবে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের এখানকার সমাজের সকলকে কিছু গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলছেন। আর তাই এই তিনটি শ্লোকে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে একাধারে দৃষ্টান্ত ও উপদেষ্টারূপে পাই। তবে, কী হবে কর্ম-বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি?

পরের দুটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, দুরকমের লোক আছে : বিদ্বান ও অবিদ্বান।

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

—'হে ভারত। অবিদ্বানগণ আসক্ত হয়ে যে ভাবে কাজ করে, বিদ্বানগণ অনাসক্ত হয়ে সেইভাবেই কাজ করেন, লোক-কল্যাণের জন্য।'

সংস্কৃত ভাষায় বিদ্বান মানে, যার জ্ঞান হয়েছে, জ্ঞানবান ব্যক্তি। অবিদ্বান মানে যার জ্ঞান হয়নি। এই দু-রকমের লোক জগৎকে দু-রকমভাবে দেখে থাকে। এই কথা শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে বলছেন। শ্লোকগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত আমাদের গণতান্ত্রিক সমাজে নাগরিকের দায়িত্বের ক্ষেত্রে। এই

শ্লোকগুলিতে আমাদের জন্য এক গূঢ় মর্মবাণী রয়েছে। আমি যদি অ-বিদ্বান হই তবে কাজ করব কি করে? আমি কঠিন পরিশ্রম করি, কিন্তু তা কেবল আপন ধন-বৃদ্ধির জন্য। অন্যের কথা একেবারেই ভাবি না। এই হলো অবিদ্বানের কাজের ধরন। অন্যটি হলো বিদ্বানের কাজের ধরন। সকলের কল্যাণের জন্য কঠিন পরিশ্রম কর, দেশের—তথা সমগ্র জগতের—উন্নতির উদ্দেশ্যে। ঐ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কঠিন পরিশ্রম কর। ঐ দৃষ্টিভঙ্গির কথাই এই শ্লোকে একটি নিগূঢ় কথার মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে, তা হলো ঃ *লোকসংগ্রহম্, সমগ্র জগতের হিত কামনায়*। কঠিন পরিশ্রম না করলে, জগতের হিত সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিত হতে পারবে না। আর যখন কঠিন পরিশ্রম করবে, তখন ঐ প্রেরণার কথা মনে রাখবে—'আমি অবশ্যই লোকের সেবা করব; আমি অবশ্যই তাদের সাহায্য করব—আমার ব্যক্তিগত সাফল্যের সঙ্গে তারাও যাতে সাফল্য লাভ করতে পারে'। এই ভাবে সামাজিক দায়িত্ববোধ নিয়ে আমাকে কাজ করতে হবে। কেবল তবেই আমার সঠিকভাবে কাজ করা হলো। তাই শ্লোকে বলা হয়েছে, *সক্তঃ*, 'আসক্ত'। নিজের প্রতি আসক্তি, নিজের সুখ, নিজের আরাম প্রভৃতির প্রতি আসক্তি। এই রকম লোকই হলো *সক্তঃ*, 'আসক্ত'। *কর্মণি*, 'কর্মেতে'। কারণ এই কাজের মাধ্যমে, আমি নিজের ভোগবৃদ্ধি করব ঃ বেশি টাকা রোজগার করে, বেশি সুখভোগ করব। তাকেই বলা হয় *সক্তাঃ কর্মণি*। তারা কারা? *অবিদ্বাংসঃ*, 'অজ্ঞান ব্যক্তিগণ'। তারা যে সব কাজ করে তা কেবল নিজেদের ফাঁপিয়ে তোলার জন্য। তাই তাদের অজ্ঞান বলা হয়। *অবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত*, 'অজ্ঞান ব্যক্তি, যেমন কাজ করে', তেমনি, *কুর্যাৎ বিদ্বান্*, 'জ্ঞানবান ব্যক্তিও করবে।' কী তাদের উদ্দেশ্য? তাদের প্রেরণা অন্যরকম। 'তাদের প্রেরণা হলো সমগ্র জগতের সুখ ও কল্যাণের জন্য', *চিকির্ষুঃ লোকসংগ্রহম্*। *লোকসংগ্রহম্*; *লোক* মানে 'পৃথিবীর লোক', *সংগ্রহ* মানে তাদের কল্যাণ, তাদের স্থিতি, তাদের শক্তি; এ সবই *সংগ্রহ* কথাটির মধ্যে নিহিত আছে। *লোকসংগ্রহ* ভাবটি অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক ধরনের কাজে অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকে; এই কর্ম জগতেও আমরা গভীর আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন হতে পারি, যদি লোকসংগ্রহ আমাদের প্রেরণার উৎস হয়।

সমগ্র *গীতাতে, কর্ম-যোগের* ব্যাখ্যাতে *লোকসংগ্রহের* ভাবটিকে সর্বদা সামনে রাখা হয়েছে। আমরা সবাই পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। এই পরস্পর নির্ভরশীলতার ভাবটি আমরা শুনেছি এই অধ্যায়ে ১১শ শ্লোকে যেখানে বলা হয়েছে ঃ *পরস্পরম্ ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরম্ অবাপ্স্যথ*। যখন কোটি কোটি লোকের

সুখ নেই, তখন আমি কী ভাবে সুখী হতে পারি? আজকালও একই দেশের মধ্যে দুটি জগৎ আমাদের নজরে পড়ে ঃ একটি হলো নিতান্ত দরিদ্র, বিষাদময় দারিদ্র্যে নিমজ্জিত; অপরটি হলো, অতি ধনী, অত্যধিক ঐশ্বর্যে জীবন কাটায় এবং ভোগমুখী। আত্মার মরণ না হয়ে থাকলে এরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয় কেমন করে? অতএব কঠোর পরিশ্রম করো যাতে ঐ বৈষম্য আর না থাকে। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *কুর্যাৎ বিদ্বান্*, 'বিদ্বান ঐ রকম কাজ করবেন', *চিকির্ষুঃ লোকসংগ্রহম্*, 'সমগ্র জগতে সুখ ও কল্যাণের পুনরাবর্তন ঘটানোর জন্য'। এ একটি চমৎকার ভাব। গণতন্ত্রে নাগরিকের দায়িত্ব প্রসঙ্গে এই ভাবটি আমরা পেয়ে থাকি। একটি জাতির মধ্যে কেবল বাস করলেই সেই জাতির নাগরিক হওয়া যায় না, তাকে জাতির অঙ্গ হতে হবে, তাকে জাতির জন্য উৎসর্গীকৃত জীবন হতে হবে; তাকে দেশের লোকের প্রতি দরদী হতে হবে। কেবল তখনই তাকে প্রকৃত নাগরিক বলা যেতে পারে। এইরূপ নাগরিকত্বে বিদ্বানের দৃষ্টিভঙ্গি নিহিত রয়েছে বুঝতে হবে। প্রত্যেক লোকের পক্ষেই যে কোন দেশের নাগরিকত্ব নিতে গেলে, এইটিই হবে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি। পরবর্তী শ্লোক হলো ঃ

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬॥

—'কর্মে আসক্ত অজ্ঞব্যক্তিদের বোধশক্তিতে অস্থিরতা সৃষ্টি করা উচিত নয়, জ্ঞানী ব্যক্তিদের উচিত নিজে সম্যকভাবে যোগবুদ্ধিতে থেকে কাজ করে জ্ঞানহীনদেরও সকল কাজে প্রবৃত্ত করা।'

যদি তোমার আশেপাশে অজ্ঞ লোক থাকে, তাদের বুদ্ধি, তাদের প্রেরণায় অস্থিরতার সৃষ্টি করবে না। তাদের বোধশক্তির যাতে উন্নতি হয়, সেই ভাবে তাদের সাহায্য করবে। সে কাজে তাদের মানসিক অস্থিরতা সৃষ্টি করবে না, তাদের মনে বিভ্রান্তিসূচক ভাব সৃষ্টি করে এমন কিছুও করবে না। তারা যে সব কথা শুনতে প্রস্তুত নয়, তেমন কথা বলে তাদের হতবুদ্ধি করে দিও না; এটা ঠিক নয়। তাদের বোঝাতে চেষ্টা কর, তাদের ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে চল। এই হলো উপদেশ। কাউকে হতবুদ্ধি করে দেবার জন্য কিছু বলা ঠিক নয়। কারণ তারা তত বুদ্ধিমান বা শিক্ষিত নয়; নানা রকম অদ্ভুত কথা বলে তাদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা উচিত নয়। তাই, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ*, লোকের মনে বুদ্ধিভেদ, মানসিক বিভ্রান্তি, সৃষ্টি করবে না; যে সব লোক তত বুদ্ধিমান নয়, অথচ কর্মে আসক্তিবশত কাজ করতে

ইচ্ছুক, *অজ্ঞানাম্ কর্মসঙ্গিনাম্। জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্*, 'বিদ্বান, জ্ঞানীরা, অন্যদের মতোই কাজ করবেন এবং তাদের কাছে ঐ পথেই আদর্শ স্থানীয় হবেন'; এবং এই ভাবেই তাদের উচ্চতর স্তরে উঠতে সহায়তা করবেন। তাদের *সঙ্গেই* আমাদের চলতে হবে।

বহু কালপূর্বে আমি এক আমেরিকাবাসী লেখক ব্রুস বার্টন (Bruce Barton)-এর একটি বই পড়েছিলাম। সেখানে তিনি বলেছিলেন, 'ভাল শিক্ষক ছাত্রের স্তরে নেমে এসে ধীরে ধীরে তাদের ওপরে তুলে দেন'। তুমি যদি চলতি গাড়িতে উঠতে চাও তাহলে তোমাকে *গাড়ির সঙ্গে খানিকটা ছুটে* তবে তাতে উঠতে হবে; অন্যথা করলে তোমায় ভুগতে হবে। মহান আচার্যেরা এই ভাবেই কাজ করতেন। লোকেদের সঙ্গে চলতে থাক, সেই সঙ্গেই তাদের শিক্ষা দাও। যিশু ও বুদ্ধের মতো লোক ঐ পর্যায়ের। সকল দক্ষ আচার্যই ঐ পর্যায়ের। শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ প্রকৃতির লোক ছিলেন। বিবেকানন্দ নিউইয়র্ক ও লন্ডনে প্রদত্ত *মদীয় আচার্যদেব (My Master)* শীর্ষক দুটি বক্তৃতায় ১৮৯৬ খ্রিঃ বলেছেন[১] :

'কোন ব্যক্তির বিশ্বাস নষ্ট করতে চেষ্টা করো না। যদি পারো তবে তাকে কিছু ভাল জিনিস দাও। যদি পারো তবে মানুষটি যেখানে আছে, সেখান থেকে তাকে একটু ওপরে তুলে দাও। এইরূপই কর, কিন্তু মানুষটির যা আছে তা নষ্ট করো না। কেবল তিনিই আচার্য নামের যোগ্য, যিনি আপনাকে এক মুহূর্তে যেন সহস্র সহস্র বিভিন্ন ব্যক্তিতে পরিণত করতে পারেন; কেবল তিনিই যথার্থ আচার্য যিনি অল্প সময়ে ও অল্প আয়াসেই শিষ্যের স্তরে আপনাকে নামিয়ে নিয়ে যেতে পারেন—যিনি নিজের শক্তি শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত করে তার চোখ দিয়ে দেখতে পান, তার কান দিয়ে শুনতে পান, তার মন দিয়ে বুঝতে পারেন। এইরূপ আচার্যই যথার্থ শিক্ষা দিতে পারেন, অপর কেউ নয়। যাঁরা কেবল অপরের ভাব নষ্ট করতে চেষ্টা করেন, তাঁরা কখনই কোন উপকার করতে পারেন না।'

অতএব, যে সব লোক তেমন উচ্চ শিক্ষিত বা জ্ঞানের অধিকারী নয়, তাদের কিছু বিমূর্ত ভাব শিক্ষা দিয়ে তাদের মনকে বিশৃঙ্খল করে দিও না—এইটুকু পর্যন্তই তোমার কাজ। শিক্ষার অর্থ, কোন মানুষকে ধীরে ধীরে উচ্চ অবস্থায় তুলে আনা। তাই, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন : *জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি*, 'সে কাজ করছে, তুমিও তার মতো কাজে লেগে যাও'; তার সামনে একটি দৃষ্টান্ত খাড়া কর।

১ বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৮৬-৮৭

কারণ সেটি তার দরকার আর তুমিও তার সেই বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য তাকে শিক্ষা দিচ্ছ। একজন প্রকৃত *যোগী* অপরের স্তরে নেমে এসে তাকে ধীরে ধীরে উচ্চস্তরে তুলে দেন তার অজ্ঞাতসারে। ঐ লোকটির বর্তমান অবস্থিতির উর্ধ্বে উন্নতিসাধনের জন্য আচার্যের সংস্পর্শই যথেষ্ট। এই দৃষ্টান্তই বিদ্বান ব্যক্তিকে সমাজে আদর্শরূপে স্থাপন করতে হবে।

তারপর আসছে আর একটি অধ্যায় যেখানে প্রকৃতির সম্বন্ধে এবং প্রকৃতিতে ও মানব সত্তাতেও সমভাবে ক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ভারতীয় দর্শনে উদ্ভূত—সমগ্র প্রকৃতির *ত্রিগুণাত্মিকাভাব, সত্ত্ব, রজঃ* ও *তমঃ* এই তিন শক্তিই যে প্রকৃতির মূল উপাদান—এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি যথার্থই চমৎকার। এই গুণগুলি তোমাতে যেমন আমাতেও তেমনি রয়েছে। প্রকৃতি আমাদের মধ্যেও যেমন, বহির্জগতেও তেমনি আছেন। এই মহান দার্শনিক সত্যটি উপস্থাপিত হয়েছিল প্রাচীন সাংখ্য দর্শনে এবং পরে বেদান্ত ও অন্যান্য দর্শনেও তা গৃহীত হয়েছিল। *সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ*—একটি হলো জাড্যতা বা *তমঃ*, অন্যটি হলো প্রচণ্ড তেজশক্তি বা *রজঃ*; আর অপর টি শান্তভাব বা *সত্ত্ব*। এগুলির সাম্যাবস্থায় কোন সৃষ্টি নেই; এই সাম্যাবস্থা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নভোবস্তুবিদ্যার (astrophysics-এর) এককত্বাবস্থা (state of Singularity)-এর তুল্য। সেই সাম্যাবস্থা ভেঙ্গে গেলেই বা বিঘ্নিত হলেই মহাজাগতিক বিবর্তন প্রবর্তিত হয়। তবেই বৈচিত্র্য-সৃষ্টি সম্ভব। অতএব প্রকৃতি আদিতে *সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ* এই তিনগুণের সম্পূর্ণ সাম্য অবস্থায় ছিল। তারপর সৃষ্টির সময় কী হলো? সামান্য অসাম্যের সূচনা হয়, তার বিস্তার হতে থাকে এবং তাইতেই বিশ্বের ক্রমবিকাশ ঘটেছিল, একের বহু হওয়া। *প্রকৃতি* হলো ইংরাজি Nature-এর প্রতি শব্দ; সব কিছুই *সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ*—এই তিন শক্তির খেলা। আলস্য তোমাকে পুরাপুরি অভিভূত করে ফেলেছে, তুমি স্থির হয়ে বসে থাকো। তখন তোমার মধ্যে *তমঃ* শক্তি প্রবল। তুমি অত্যন্ত কর্মচঞ্চল, তেজে ভরপুর, তখন তোমার মধ্যে *রজঃ* প্রবল। কিন্তু, যখন তুমি সম্পূর্ণ সাম্যভাবে প্রতিষ্ঠিত ও শান্ত—মাঝে মাঝে ঐ মানসিক অবস্থাও আমাদের হয়ে থাকে—তখন *সত্ত্বই* তোমার মধ্যে প্রবল। এখন *সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ*—এই তিন গুণ এবং এই জীবনেই তাদের পারে কীভাবে যাওয়া যায়—তাই হবে *গীতার* ১৩, ১৪, ১৫শ অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়।

কর্মের ব্যাপারে, তোমার আমার মধ্যে কোন্ জিনিসটি কাজ করতে থাকে? শ্রীকৃষ্ণ বলেন, *প্রকৃতিই* তোমার আমার মধ্যে কাজ করছে—*তিনগুণের* মাধ্যমে। তাই ২৭তম শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭॥

—'প্রকৃতির গুণ তিনটিই সব কাজ করে থাকে; অহঙ্কারে বিমূঢ়-চেতা হয়ে মানুষ মনে করে, "আমিই কর্তা"।'

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ; এই সব কর্মই বস্তুত করে থাকে ঐ তিনটি গুণ—*সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ* রূপ *প্রকৃতির* তিনটি শক্তি। তাদের সংযোগে ও বিন্যাসের ফলেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয়। সেই প্রকৃতিই আবার আমাদেরও সৃষ্টি করেছেন, বিশ্বের ও জীবের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও বিকাশ ঘটিয়েছেন। কালে এই প্রেক্ষাপটে মানবের আবির্ভাব ঘটেছে। প্রকৃতির কাজ সর্বত্র চলেছে। এ বিষয়ে এই ভাষাই ব্যবহৃত হয়; কিন্তু কার্যত অহঙ্কারবশত মানুষ নিজেকে এসবের কর্তা মনে করে। *অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা* 'অহংবৃত্তিতে পূর্ণ মূর্খ মানব', সে কী বলে? *কর্তা অহম্ ইতি মন্যতে*, 'সে মনে করে "আমিই কর্তা"।' প্রকৃতি আমাদের সকলকে সামান্য অহংজ্ঞান দিয়েছেন, সেই অহংজ্ঞানের প্রভাবে সব কাজে আমাদের কর্তৃত্ববোধ এসে যায়। কার্যত আমাদের অন্তর ও বাহিরের সব কাজই প্রকৃতির দ্বারা সম্পাদিত। অতএব প্রকৃতিই হলেন কর্তৃত্বকর শক্তি, তবে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চিন্তায় যে প্রকৃতি শুধুই বাহ্য প্রকৃতি মাত্র, তেমনটি নয়; বেদান্তে মনুষ্য প্রকৃতিকেও এই শক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; বেদান্তে মনুষ্য প্রকৃতি বলতে তার বাহ্যপ্রকৃতিও বোঝায়, আবার অন্তঃপ্রকৃতির উচ্চতর মাত্রাকেও বোঝায়—যে মাত্রা বুদ্ধিরূপে প্রকাশ পায়; নিম্নতর জড় বাহ্য প্রকৃতি, তথা *অপরা প্রকৃতি* ও উন্নততর অন্তঃপ্রকৃতি, তথা *পরা প্রকৃতির* মধ্যে পার্থক্য আলোচিত হয়েছে *গীতার* সপ্তম অধ্যায়ের ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোকে। জাগতিক রসায়ন ও ভৌতবিজ্ঞান তোমার ও আমার মধ্যে দেহগত জৈব-রসায়ন বিজ্ঞান ও জৈব ভৌতবিজ্ঞানের রূপ নিয়েছে। অতএব দেহের একটা নিজস্ব কার্যনীতি আছে। তেমনি আছে স্নায়ুতন্ত্রেরও। কিন্তু আমরা ভাবি 'আমরাই সব করছি।' কার্যত কর্তা আমরা নই। প্রকৃতিই আমাদের এই সব কাজে প্রেরণা দিয়ে থাকে। এই নিগূঢ় সত্যটিকে আমাদের আজ অবশ্যই বুঝতে হবে। তুমি খেতে চাও। আসলে প্রকৃতিই তোমাকে খেতে প্ররোচিত করছে। তেমনি আরো কত কি তুমি করতে চাও প্রকৃতিই তোমাকে ঐসব করতে প্ররোচিত করছে। কার্ল য়ুঙ (Carl Jung)-এর একটি মন্তব্যে আমরা পূর্বে দেখেছি যে—যখন আমরা বিবাহ ও

সন্তানোৎপাদন করি তখন আমরা কেবল বহিঃপ্রকৃতির যন্ত্ররূপেই তা করে থাকি।

এই সত্যটিকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে ঃ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ও দেহতন্ত্রে উভয়ত প্রকৃতি এক প্রচণ্ড শক্তির আধার। শ্রীকৃষ্ণ পরে বলবেন, 'আমরা প্রকৃতির প্রেরণাকে বাধা দিতে পারি না'। প্রায় সব সময়েই আমাদের ঐ প্রেরণার কাছে নতি স্বীকার করতে হয়, সম্মতি জানাতে হয়। *কিন্তু সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা যেন উপলব্ধি করে যে, মানুষের ক্ষেত্রে প্রকৃতির একটি উচ্চতর মাত্রা রয়েছে—সেটি হলো বুদ্ধি শক্তি, সেটি আবার মানবীয় স্বাধীনতার কেন্দ্রবিন্দু*। এই বুদ্ধির যখন বিকাশ ঘটে, আমরা তখন বাহ্য ভৌত প্রকৃতির বেষ্টনীর পারে যেতে পারি। দুটিই প্রকৃতি, একটি হলো নিম্নতর বা অপরা প্রকৃতি, আর অন্যটি হলো উচ্চতর বা *পরা প্রকৃতি*। দুটির মিলনেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণতা সূচিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলেছেন, *প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ*, 'প্রকৃতির বিভিন্ন *গুণ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ*—তারাই এই সব কাজ করে থাকে'। কিন্তু মানব অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে গর্ব ও দম্ভের সঙ্গে, *কর্তা অহম্ ইতি মন্যতে*, মনে করে 'আমিই সব করছি'। প্রকৃতির নিয়মে নানা কারণে মানবের স্বাধীনতা সীমিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের প্রজননগত গঠন-ব্যবস্থা নিজের মতো চলে; ফলে অহংবোধের স্বাধীনতা সীমায়িত হয়ে পড়ে। প্রকৃতির এই শক্তিগুলির কাছে মানবকে বশ্যতা স্বীকার করতেই হয়।

যে প্রাকৃতিক গুণগুলি আমাদের মধ্যে কাজ করছে তাদের স্বীকৃতিদানই শ্রেয়। মানব-মন সংক্রান্ত বর্তমান গবেষণাকেই, দৃষ্টান্তরূপে ধরা যেতে পারে। সচেতন মন অহংত্বের কর্তৃত্বে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অবচেতন ও অচেতন মনের আজ্ঞাবহ হয়ে থাকে। সমগ্র প্রকৃতির ভাবই হলো এই। প্রকৃতি সচেতন অহংকে নির্দেশ দিচ্ছে, কিন্তু অহং মনে করে 'আমি স্বাধীন'। এ কথা স্বীকার করে নেওয়া ভাল, তাহলে স্বাধীনতার আশা যদি আদৌ থেকে থাকে—তবে এই সত্যটিকে জেনে নিয়ে এবং বহিঃপ্রকৃতি থেকে মুক্ত হবার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নিয়ে আমরা তা অর্জন করতে পারি এবং উপলব্ধি করতে পারি আমাদের নিজ উচ্চতর প্রকৃতি বা *পরা প্রকৃতিকে*। *সেইখানেই আসছে আধ্যাত্মিকতার বিষয়*। আধ্যাত্মিক অবগতি (*জ্ঞান*) ও উপলব্ধি (*বিজ্ঞান*) এই স্তরেই আমাদের মধ্যে এসে থাকে।

আমরা আগেও যেমন দেখেছি, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধর—আমরা খাই, পান করি, শরীরের উন্নতি বিধান করি; এমনকি আমরা স্কুলে যাই, পড়াশুনা করি ও পরীক্ষায় নম্বর পাই ও একটি চাকরি জোগাড় করি। তারপর আমরা বিবাহ করি, পরিবার প্রতিপালন করি; তোমরা দেখবে, এর প্রায় সবটাই প্রকৃতির খেলা মাত্র। প্রকৃতিই তোমায় এটা ওটা করার জন্য প্ররোচিত করে। যা ঘটছে তার সবটাই এইরকমই। কিন্তু তোমার যখন আধ্যাত্মিক বোধ হবে, তখন তুমি প্রকৃতির এই ক্রিয়াকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে ও তাদের ধর্মসঙ্গত, নীতিগত ও মূল্য-সচেতন করে তুলতে পারবে। *বেদান্তে বলে সব মূল্যবোধেরই উৎস রয়েছে আত্মায়।* আধ্যাত্মিক সচেতনতাকে জাগিয়ে তুললে এ কাজ তুমি পারবে। তা যতদিন না হয়, ততদিন এ সবই প্রকৃতির খেলা মাত্র। পশুদের ক্ষেত্রে প্রকৃতি পুরাপুরি আধিপত্য করে। মানুষের ক্ষেত্রে এ অবস্থার উদ্ভব হলে, সে মানুষ পশুর সমান। নর-নারীর মধ্যে এই সামান্য অহঙ্কার, একটু স্বাধীনতাবোধ এসেছে। কিন্তু তা খুবই দুর্বল; এর বেশিটাই এখনো প্রকৃতিসর্বস্ব। *সমগ্র ধর্ম ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের বিষয়টিই হলো বেদান্ত—যা শিক্ষা দেয় এই সামান্য স্বাধীনতাবোধকে কীভাবে শক্তিশালী করে, তার দ্বারা মানবসত্তাকে প্রকৃতির দাসত্ব থেকে মুক্ত করে, যথার্থ স্বাধীনতায় প্রতিষ্ঠিত করা যায়।* কেবল মানব জীবনেই এ কাজ করা সম্ভব। কিন্তু অহংবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কেবল অন্যায় দাবি করলেই তা হবে না। প্রকৃত পক্ষে অহংবোধ কখনো মুক্ত নয়। জাগ্রত অবস্থার অহংবোধ বিনাশপ্রাপ্ত হয় নিদ্রায়, তখন স্বপ্নের অহং আবির্ভূত হয়; আর দুটি অহংবোধেরই অবলুপ্তি ঘটে সুষুপ্তিতে। এই অহং প্রকৃতির শক্তির কাছে বাঁধা হয়ে আছে। *এই অহং-এর পেছনে রয়েছে আত্মা, আমাদের স্বাভাবিক অনন্ত শিবস্বরূপ—যা হলো সমস্ত মুক্তির ও সমস্ত মূল্যবোধের একমাত্র উৎস।* এই সত্য যখন তুমি উপলব্ধি করবে তখনই তুমি প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হবে। তাই, *গীতায়* বরাবর এই দুটি কথা বলা হয়েছে। সাধারণত, আমরা নিম্ন প্রকৃতির শক্তিতে আচ্ছন্ন। কিন্তু ঐ শক্তির পারে যেতে *পারা* যায়। ধীরে ধীরে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে ওদের পারে যাও; অহঙ্কার ও দম্ভের সঙ্গে নয়, অহংবোধের পারে যে সত্য রয়েছে—তোমার সেই অনন্ত সত্তা, আত্মাকে জেনে। *গীতায় ঐ সত্য সর্বদা আলোচিত হবে—প্রতিটি মানব সত্তার আধ্যাত্মিক মুক্তির বাণী রূপে। এ হলো আমাদের জন্মগত অধিকার।* বর্তমানে আমরা প্রাকৃতিক শক্তির বশে রয়েছি। প্রকৃতি আমাদের কাজ করতে বাধ্য করে। তাই, প্রকৃতির সঙ্গে সম্মুখ সমরে নেব না, তাতে কোন দিনই তুমি জয়ী হতে পারবে না; এ যুদ্ধে

তোমাকে কৌশল অবলম্বন করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ বলবেন, দম্ভের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া মূর্খের ভাব। বিজ্ঞ ব্যক্তি, যিনি সত্যটি জেনেছেন, তিনি কীভাবে চিন্তা করেন? পরের শ্লোকে তারই বিশ্লেষণ হবে।

তত্ত্ববিৎ তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮॥

—'হে মহাবাহো, গুণবিভাগ ও কর্ম বিভাগের ইন্দ্রিয় সকল নিজ নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত আছে। ইহা জেনে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করেন।'

যিনি তত্ত্বজ্ঞ অর্থাৎ, বিভিন্ন বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সত্য জ্ঞান যাঁর হয়েছে, তাঁর কাছে *তত্ত্বই* সত্য; শঙ্করাচার্য এটি এইভাবে বুঝিয়েছেন—*তস্য ভাবঃ তত্ত্বম্*, 'কোন বিষয়ের সত্যকেই *তত্ত্বম্* বলে; *তত্ত্ববিৎ*, 'যিনি সত্যকে জেনেছেন' ঃ তিনি কিভাবে চিন্তা করেন? *গুণকর্ম বিভাগয়োঃ*, '*গুণ* ও *কর্মের* বিভাগের বিষয়ে' সত্যটিকে যারা জানে; *গুণ* মানে প্রাকৃতিক শক্তি, *কর্ম* মানে ক্রিয়া—একটি অপরটির নির্দেশে সম্পাদিত হয়। যারা গুণ ও কর্মের সম্পর্ক বিষয়ে সত্যটুকু জানে, তারা কিভাবে চিন্তা করে? *গুণা গুণেষু বর্তন্তে*, '*গুণের* মাঝেই *গুণ* কাজ করে থাকে,' *গুণগুলি* পরস্পরের ওপর ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। *ইতি মত্বা*, 'সত্যকে জেনে', *ন সজ্জতে*, 'আসক্ত হয় না'। তখন অহংবোধ অনাসক্ত হয়ে আধ্যাত্মিক স্তরে উঠে যায়। যখন কেউ প্রাকৃতিক *গুণের* শক্তির হাতে ধরা পড়ে যায়, তখন সে ক্রীতদাসে পরিণত হয়। যখন কেউ অনাসক্ত হয়, তখন সে মুক্ত হয়। তাই এই ক্ষেত্রে, *গুণা গুণেষু বর্তন্তে*, '*গুণগুলি* গুণের মধ্যে ক্রিয়াশীল; *সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণগুলি* বহিঃপ্রকৃতিরূপে, আবার অন্তর্গুণগুলি ইন্দ্রিয় মন যুগ্মতন্ত্ররূপে; এসব *গুণগুলির* পারস্পরিক ক্রিয়াশীলতা ছাড়া আর কিছু নয়। এই সত্য জেনে, *ন সজ্জতে* 'মানব আসক্ত হয় না'। *সব রকম অহংত্বের হিসেব নিকেশ থেকে এক অদ্ভুত অনাসক্তির মনোভাব জাগরিত হয় এবং গীতা এই অনাসক্তি ভাবটির ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে*। আধুনিক বৈজ্ঞানিক মানসিকতাতেও অনাসক্তি ভাবের ওপর জোর দেওয়া হয়ে থাকে। জীবন প্রবাহ বইছে, আমি এতে রয়েছি, কিন্তু আমি এর প্রতি নিরাসক্ত। এই ভাবেই শ্রীকৃষ্ণ এই মহান ভাবটিকে ফুটিয়ে তুলছেন।

মহাভারতে এই *গুণের* ভাবটি বহু স্থানে ব্যক্ত হয়েছে। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই *গুণের* খেলা। বর্তমান পদার্থবিদ্যা প্রকৃতির তিন-চারটি ক্রিয়াশীল বলের কথা বলে থাকে। আমরা সেগুলিকে বুঝতে চেষ্টা করছি। তার মধ্যে একটি হলো

মহাকর্ষ, তারপর বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় শক্তি আর তারপর পরমাণুর মধ্যেকার দুর্বল শক্তি ও তার প্রবল শক্তি। এখন এই শক্তিগুলি নিয়েই সমগ্র প্রকৃতি গঠিত। পদার্থ বিদ্যায় এগুলিকে একীভূত করা এখনো সম্ভব হয়নি। কিন্তু এ কাজের চেষ্টা চলেছে; নভোপদার্থবিদ্গণ অবশ্য State of Singulrity (এককত্বের অবস্থা)কে একীভূত অবস্থা বলে ধরে নেয়। *গুণ*-ভাবনা একটি নিগূঢ় বিষয় যাতে প্রকৃতির শক্তিগুলিকে পর্যালোচনা করা হয়েছে মানবীয় ভাব ও বিশ্বভাব দু-দিক থেকে এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যাকে বুঝতে চেষ্টা করছেন আধুনিক বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার মাধ্যমে। শ্রীকৃষ্ণ বলে চলেছেন ঃ

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯॥

—'*প্রকৃতির গুণের* দ্বারা ভ্রান্ত ও নিজেদের সেই সব *গুণের* ক্রিয়াদির অঙ্গ মনে করে তাতে আসক্ত মন্দবুদ্ধি ও অজ্ঞ ব্যক্তিদের—পূর্ণজ্ঞানী ব্যক্তিদের পক্ষে বিচলিত করা উচিত নয়।'

যারা মূঢ় মন্দবুদ্ধি তারা এই সত্য বোঝে না। তারা *গুণ* প্রবাহের অঙ্গস্বরূপ: এই সব লোককে শিক্ষা দিতে হবে ধীরে ধীরে। তাদের মনকে অস্থির ও চঞ্চল করে দিও না। পরন্তু ধীরে ধীরে তাদের শিক্ষা দিতে থাক। অন্যথায় তাদের উপকারের পরিবর্তে অপকারই করা হবে। *প্রকৃতেঃ গুণসংমূঢ়াঃ,* 'যারা প্রকৃতির গুণে বিভ্রান্ত হয়েছে', *সজ্জন্তে গুণকর্মসু,* '*গুণের* দ্বারা প্রেরিত ক্রিয়াদির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে'। এই সব মন্দবুদ্ধিলোকেদের, *তান্ অকৃৎস্নবিদোমন্দান্, কৃৎস্নবিৎ ন বিচালয়েৎ,* 'পূর্ণজ্ঞানী ব্যক্তিগণ যেন অস্থির করে না তোলেন'। যদি পার তবে তাদের সাহায্য কর আরো ভালভাবে বুঝতে। কিন্তু কখনই যেন তাদের অস্থির অবস্থায় ফেলো না। *তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ,* 'যিনি পূর্ণ সত্যকে জেনেছেন, তাঁরা যেন আংশিক সত্যকে মাত্র যারা জেনেছে তাদের অস্থির করে না তোলেন'। তারপর শ্রীকৃষ্ণ এই প্রথমবার তাঁর নিজের সর্বভূতে অন্তরাত্মারূপ দিব্যপ্রকৃতির কথা সামান্যমাত্র উল্লেখ করেছেন; পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এই ভাবটির ওপর আরো আলোকপাত করা হবে।

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০॥

—'সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করে—আমার নিয়োগে কাজ করছ মনে

করে—আত্মার কেন্দ্রীভূত মন নিয়ে, প্রত্যাশা ও স্বার্থপরতা ত্যাগ করে, মানসিক উদ্বেগরহিত হয়ে, যুদ্ধ (কর্ম) করতে থাক।'

এটি একটি সুন্দর শ্লোক! *যুদ্ধ* মানে সংগ্রাম। *যুধ্যস্ব,* 'সংগ্রাম করতে থাক', জীবন-সংগ্রাম চালিয়ে যাও! কীভাবে? *বিগতজ্বরঃ* 'উদ্বেগ, অর্থাৎ, অন্তরের টানাপোড়েন রহিত হয়ে' শান্ত ও প্রসন্ন মনে; *ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্য,* 'সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করে'। প্রকৃতি যাঁর অভিব্যক্ত শক্তিমাত্র, সেই প্রকৃতির অন্তরালে ও পরপারে অবস্থিত এক দিব্য অনন্ত চৈতন্য আছেন। *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* যেমন বলা হয়েছে, *মায়াম্ তু প্রকৃতিম্ বিদ্যাৎ, মায়িনম্ তু মহেশ্বরম্,* 'সমগ্র প্রকৃতিকেই *মায়া* বলা হয়, আর পরমেশ্বর হলেন এই *মায়ার* অধীশ্বর'।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ঃ বাজি আর বাজিকর; বাজি সত্য নয়, কেবল বাজিকরই সত্য। কেবল বাজির ওপর মনঃসংযোগ করবে না। মনে রাখবে বাজি দেখাতে গেলে বাজিকরকে চাই। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্য,* 'তোমার সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করে', যে আমি রয়েছি *মায়ার* পারে, *মায়ার* প্রভুরূপে, *অধ্যাত্ম চেতসা,* 'আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলে' মনের আধ্যাত্মিক কাঠামোটিকে তৈরি করে, *নিরাশীঃ,* 'লোভ রহিত হয়ে', *ভূত্বা নির্মমো,* ' "আমি" ও "আমার" ভাব থেকে মুক্ত হয়ে, *যুধ্যস্ব,* 'জীবন যুদ্ধে অগ্রসর হও', বিগতজ্বরঃ, উদ্বেগ ও মানসিক চাপ রহিত হয়ে'।

এই হলো *গীতার কর্ম-যোগ* নামক অধ্যায়ের নিগূঢ় বাণী। উদ্বেগশূন্য হয়ে কাজ কর। হৈ চৈ না করে কাজ কর। এটি একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বাণী। সাধারণত, শান্তভাবে কাজ করার শক্তি আমাদের নেই। তাই কাজ করতে গিয়ে আমরা প্রচুর গোলমালের সৃষ্টি করি, হৈ চৈ করে থাকি। যন্ত্র যখন তার দক্ষতা হারায় বা তাতে ঠিকমতো তেল দেওয়া হয় না, তখন সে প্রচুর আওয়াজ তোলে। যন্ত্র ভাল অবস্থায় থাকলে তা নিঃশব্দে চলে, অযথা কোন আওয়াজ করে না। আগেকার দিনে আমাদের জলের পাম্প চললে প্রচুর আওয়াজ হতো; আজকাল আওয়াজ শূন্য পাম্প পাওয়া যায়। আমাদের যন্ত্রে দক্ষতা আরো বাড়ছে। এমনকি আমাদের পুরানো অটোরিক্সাগুলি কি আওয়াজই না করতো। ঘণ্টায় মাত্র বার মাইল চলে, কিন্তু তাতেই এত আওয়াজ! এদিকে প্রথম শ্রেণীর মোটর যান ঘণ্টায় ৮০ মাইল বেগে চলেও তেমন আওয়াজ করে না। তেমনি মানবের গঠনতন্ত্রে, জীবনে ও কাজে দক্ষতা বলে একটি বস্তু আছে। সে দক্ষতার মাপ হয় নিঃশব্দে

সে কতটা বেশি কাজ করে তা দিয়ে। হৈ চৈ করে কাজ করলে দক্ষতা কমে যায়। আমরা এমন সব লোক দেখেছি, যারা বাড়ির কাজেও হৈ চৈ করে—অথচ আসল কাজের বেলায় সামান্য। নিঃশব্দে শান্তভাবে কাজ করে দেখ না কেন? কাজের বোঝা হাসিমুখে বহন কর, যেন সেটা কোন বোঝাই নয়। সব রকম দক্ষ কর্ম নিষ্পত্তির পেছনে এই রকম আধ্যাত্মিক শক্তি, অবশ্যই থাকে। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *বিগতজ্বরঃ*। *জ্বরঃ* কথাটির সংস্কৃত ভাষায় অর্থ হলো 'পীড়াজনিত উত্তাপ'; *বিগত* মানে 'ব্যতিরেকে'। এখানে জ্বর বলতে মনের ওপর চাপ, উত্তেজনা, হৈ চৈ বোঝাচ্ছে, বিশেষত হৈ চৈ যুক্ত কাজ, এমন সব লোক আছে কাজের সময় যাদের চেঁচামেচির বিরাম থাকে না। এরকম কাজে দক্ষতা থাকে না। *গীতায়* আমাদের বলা হয়, কাজের সময় একেবারে শান্ত ও স্থিরভাবে থাকতে। জেট হাওয়াই জাহাজে ঘণ্টায় ৬০০ মাইল বেগে গেলেও গতি সম্বন্ধে আমাদের কোন বোধ থাকে না; এই হলো যান্ত্রিক দক্ষতার চিহ্ন। মানবের শরীর-যন্ত্রকেও সেই রকমভাবে কাজ করার জন্য শিক্ষা দিতে হবে ঃ *যুদ্ধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ*। এই হলো *গীতার* বিশেষ জরুরি আদেশ যা বর্তমানে ভারতে আমাদের বুঝতে হবে ও কাজে প্রয়োগ করতে হবে।

আমাদের সমস্ত জাতীয় সমস্যার সমাধান আমরা তখনই করতে পারব, যখন আমরা দক্ষ ও সৎকর্মী হব, শান্তভাবে, নিঃশব্দে ও স্থৈর্যের সঙ্গে কাজ করে যাব। যারা মনে করে কাজে অনেক প্রেরণা চাই, অনেক হৈ চৈ চাই—তারা না জানে কর্মবিজ্ঞান, না জানে কর্মকৌশল। যে নিঃশব্দে কাজ করে, দেখা যায় তার কাজই সব থেকে ভাল হয়। *সমত্বম্ যোগ উচ্যতে*; শ্রীকৃষ্ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁর যোগ সম্বন্ধীয় বাণীর সংজ্ঞা দিয়েছেন 'সাম্যভাব', *সমত্বম্*, এবং *যোগঃ কর্মসু কৌশলম্*, 'যোগ হলো কাজে দক্ষতা'। যদি তুমি দক্ষতার সঙ্গে কাজ কর, কিছুই তোমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে না; তোমার ক্রোধও যদি নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে তা হবে ঘটনার সঙ্গে সম্পূর্ণই প্রসঙ্গোচিত; কিন্তু ক্রোধ যদি তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করে, তবে বুঝতে হবে তোমার মধ্যে কিছু দোষত্রুটি আছে। তাই, এ ব্যাপারে, এই বিশেষ শিক্ষাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ৩১তম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, সে ক্ষেত্রে কাজের মন্দ ফল থেকে মুক্ত থাকা যায় কি করে ঃ

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ ॥ ৩১॥

—যারা *শ্রদ্ধাপূর্ণ* হৃদয়ে বা পূর্ণ প্রত্যয়ে দৃঢ় ধারণা নিয়ে এবং তুচ্ছ ত্রুটি দর্শন

না করে, সর্বদা আমার শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করবে, তারাও সকল কর্মের (মন্দ-ফল) থেকে মুক্ত হবে'।

যে উপদেশ আমি এখানে দিলাম, সেগুলি যে শ্রদ্ধা ভক্তিসহকারে শুনবে ও জীবনে পালন করবে, তারাও সব রকম পারস্পরিক সম্পর্কাভিমান ও বন্ধন থেকে মুক্তি পাবে ও পূর্ণ আধ্যাত্মিক মোক্ষ লাভ করবে। *জ্ঞানী* মুক্তি পায়, *কর্মযোগীও* মুক্তি পাবে। কর্ম বন্ধনের কারণ; কিন্তু এক উপায় আছে যা অবলম্বন করলে তুমি কর্মের বন্ধনকে সরিয়ে রাখতে পার, ফলে কর্মই তোমার মোক্ষের কারণ হবে। *সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে এটি একটি মহতী বাণী*। তাই শ্রীকৃষ্ণের বাণীকে, *গীতা* বা মানবাত্মার সঙ্গীত বলা হয়েছে, আর স্যার এডুইন আরনল্ড এর নাম দিয়েছেন A Song Celestial (দিব্য সঙ্গীত)। কোটি কোটি লোক কর্ম-যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েও এই কর্মদর্শন অনুসরণ করে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভ করবে। বিশ্বের কর্মযজ্ঞে নিয়োজিত সকল মানুষকে শ্রীকৃষ্ণ এই মহতী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রায় সকলেই কর্মী, তা সে ধনী হোক বা নির্ধন হোক, অথবা সমাজের চোখে উঁচু হোক বা নিচু হোক। *তাই, একে সমগ্র মানব জাতির পক্ষে এক সর্বজনীন দর্শন বলে আখ্যা দেওয়া হয়।* তারপর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'যারা এ উপদেশ শুনতে চায় না, এমনকি একে অবজ্ঞা করে, তারা নিম্নস্তরের জীবন যাপন করবে।'

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥

—'কিন্তু যারা আমার এই উপদেশকে অবজ্ঞা করে এবং সম্পূর্ণভাবে সবরকম জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি রহিত হয়ে আমার এই উপদেশ অনুসরণ করে না, তারা মননশক্তিশূন্য ও বিনাশপ্রাপ্ত বলে জানবে।'

যারা; এতৎ অভ্যসূয়ন্তো, 'এই উপদেশকে অবজ্ঞা করে'; *ন অনুতিষ্ঠন্তি মে মতম্*, 'আমার এই উপদেশ অনুসরণ করে না'; *সর্বজ্ঞান বিমূঢ়ান্ তান্*, 'তারা সর্ব প্রকার জ্ঞান শূন্য'; তাদের কী গতি হয়; *বিদ্ধি নষ্টান্*, 'জানবে তারা ধ্বংস হয়েছে'; *অচেতসঃ*, 'মননশক্তি শূন্য হয়েছে'। এ ঠিক ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মতো, যে পথে ঢুকেছে সেই পথে বেরিয়ে যেতেও পারে; কিন্তু সে তা জানে না, সে বুদ্ধি হারিয়েছে আর কেবল খাঁচার মধ্যেই ছুটাছুটি করে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ একটা *উপায়* আছে, যে পথে সকলে মুক্তি পেতে পারে, আর আমি তা বলে দিচ্ছি।

তাই, এক মহান আচার্য আসেন ও আমাদের বলে দেন যে, আমরা বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি এবং আমাদের এর বাইরে যেতে হবে; এর উপায়ও আছে। তাই *গীতার যোগদর্শন* সকলের জন্য : আমাদের মুখোমুখি হতে হবে সংসারের আহ্বানে, কাজের আহ্বানে, এই সব প্রকৃতির—আমাদের অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ ভৌত প্রকৃতির আহ্বানে, আর সেই আহ্বান গ্রহণ করে, আচার্যের এই উপদেশ অনুসরণ করে আমাদের এই জীবনেই মোক্ষলাভ করতে হবে। এই হলো সারা মানবজাতির উদ্দেশ্যে উচ্চারিত শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ় বাণী। তাই তো আজ খেটে খাওয়া মানুষদেরও নজর পড়ছে *গীতার* দিকে। অলস লোকের কাছে এ শিক্ষার কদর নেই, পরিশ্রমী লোকই এর মর্ম উপলব্ধি করে থাকে। যারা কাজ করে, অন্তরের প্রেরণায় উদ্দীপনা ও আনন্দের সঙ্গে, তারা কাজের ভেতরেই শেখে মানবের মনে ও হৃদয়ে বিরাজিত শান্তি ও সমতার স্বরূপ কী; কী অদ্ভুত আনন্দই না পাওয়া যায় এইভাবে কাজ করে! এ যেন (বরফের ওপর দিয়ে) হড়কে বা ভেসে চলা। যখন আমরা হড়কে বা পিছলে যাই, তখন কোন চাপ বা ঘর্ষণ বোধ হয় না, বাতাসেই আমরা এদিকে ওদিকে চালিত হই। জীবন হয়ে যায় ঝুলন্ত অবস্থায় পিছলে চলার আজকের দিনের hang gliding-এর মতো বলা যেতে পারে। জীবন ঠিক ঐভাবেই চলতে থাকে, একেবারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, স্বাভাবিক ভাবে; কীরূপে? তোমার দেহতন্ত্রের অভ্যন্তরে যে পরিবর্তন ঘটেছে, তারই কারণে। এক নতুন উপাদান অন্তরে প্রবেশ করেছে, এ হলো উচ্চ প্রকৃতি, *অধ্যাত্ম চেতসা,* 'আধ্যাত্মিক চেতনা সমন্বিত হয়ে'। তাই সব কাজই ভিন্নরূপ ধারণ করেছে। যে কোন লোকই এইভাব নিজ জীবনে কার্যত পালন করে দেখাতে পারে। যতদিন আমরা মনে প্রশিক্ষণবিহীন অবস্থায় থাকব, ততদিন আমরা কাজ করে শ্রান্ত হবো, বিষণ্ণ হবো, সারাদিনে আমাদের মানসিক অবস্থার বহুবার উত্থান ও পতন হবে। কিন্তু, যখন তুমি এই *অধ্যাত্ম চেতস্,* 'তোমার মন আধ্যাত্মিক চেতনার প্রতি উন্মুখ' হবে, তখন তুমি এই সব অসুবিধাগুলির মোকাবিলা ক্রমেই আরো ভালভাবে করতে পারবে। এমন নয় যে, একদিনেই তুমি সাফল্য লাভ করবে, কিন্তু বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এর প্রয়োগ করে তোমার আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে, তখন তুমি হাসি মুখে আরো গুরু দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে। গীতা সমগ্র মানবজাতির কাছে এই সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

তাই, *গীতা অতি প্রাচীন গ্রন্থ হয়েও, কত আধুনিক, আর যে সময়ে আমরা বাস করছি তার পক্ষে সব দিক থেকে কতই না প্রাসঙ্গিক!* কেবল সত্যেরই

থাকতে পারে এর মতো এমন সর্বকালীন প্রাসঙ্গিকতা, কোন মতবাদের নয়। মহান গ্রন্থগুলি হলো সর্বকালীন গ্রন্থ, অমর সাহিত্য। প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে *মহাভারতের* যুদ্ধ ঘটেছিল। তখনই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই বাণী শুনিয়েছিলেন। এত হাজার বছর পরেও, চমকপ্রদ আধুনিক যুগের প্রত্যেকটি মানুষের কাছে এর প্রাসঙ্গিকতা লক্ষ্য করার মতো, শুধু ভারতে নয়, বহির্ভারতেও। সে বাণীতে রয়েছে ঃ মানুষ কীভাবে বন্ধন মুক্ত হতে পারে, যে মুক্তিতে আছে মানুষের জন্মগত অধিকার, আর তা প্রত্যেকের অন্তরে অধিষ্ঠিত, কেবল সে জানে না কীভাবে এর বিকাশ ঘটাতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সহায়তা করছেন, আমাদের অন্তরে সদা বিদ্যমান এই মুক্তির বিকাশ ঘটিয়ে। এই হলো *কর্মযোগ* নামক তৃতীয় অধ্যায়ের মহান বাণী। আরো শিক্ষা পাওয়া যাবে পরবর্তী শ্লোকগুলিতে। আর শেষের দিকের এক অদ্ভুত সপ্ত-শ্লোক গুচ্ছে আলোচনা করা হয়েছে—সমাজে অপরাধের উৎস ও তা দমনের উপায় নিয়ে।

শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলেছেন ঃ

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩॥

—'জ্ঞানী ব্যক্তিও স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কাজ করে থাকেন; প্রাণিগণ স্ব স্ব প্রকৃতিকে অনুসরণ করে; তাকে দমনের চেষ্টায় কী ফল হবে?

প্রকৃতি কথাটি কয়েকটি শ্লোকেই ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা একে স্বভাব বলি। সমগ্র বহিঃপ্রকৃতি যেমন রয়েছে, তেমন রয়েছে আমাদের অন্তঃপ্রকৃতি। এই দেহ-ইন্দ্রিয়-মনের জটিল সমবায় আর বহিঃপ্রকৃতি একই ভৌত উপাদান থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই হলো বেদান্তের শিক্ষা, আর আধুনিক বিজ্ঞানের শিক্ষাও তাই। প্রকৃতি তাই, কেবল বাইরে নয় আমাদের অন্তরেও অবস্থিত রয়েছেন। আমাদের শরীর, আমাদের ইন্দ্রিয়তন্ত্র, এমনকি আমাদের মন, এ সবই তোমার আমার মধ্যস্থ বহিঃপ্রকৃতির এক একটি ঘাঁটি। সেই প্রকৃতি আমাদের অন্তরে প্রচণ্ড বল প্রয়োগ করে আমাদের টেনে নামিয়ে দেয় সাধারণ পশু জীবনযাপন করতে; এই প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া করতেই হবে। শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন, জ্ঞানবান ব্যক্তিও অন্তঃপ্রকৃতির দ্বারা প্ররোচিত হয়ে বিশেষভাবে কাজ করে থাকে। *সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যা,* 'আপন প্রকৃতিবিশেষ নির্দেশ করে ঐ ব্যক্তি কীভাবে কাজ করবে, কী বিশেষ লোক-ব্যবহার অবলম্বন করবে; *প্রকৃতি* তথা

আমাদের অন্তঃপ্রকৃতি, নির্দেশ করবে, আমাদের কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধেও। আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের সর্বক্ষণ বহির্মুখী হবার প্রবণতাই হলো *প্রকৃতি*, আর আমাদের মনও ইন্দ্রিয়গুলিকে অনুসরণ করে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বাহ্য বস্তুর দিকে ছোটে। এ কাজ করে, আমরা আমাদের নিজ নিজ অন্তরে সৃষ্টি করি আর এক নতুন ধরনের প্রকৃতি, যথা, সহজাত প্রবণতা—যাকে বলা হয় *সংস্কার* বা *বাসনা*, যা বৈদান্তিক মনস্তত্ত্বের একটি সুন্দর বৈজ্ঞানিক পরিভাষা। এগুলি থাকে আমাদের মনের অন্তরে, চেতন-স্তরের নিচে, মানব মনের অবচেতন ও অচেতন স্তরে—আর তাই হলো সহজাত প্রকৃতির অপরিমার্জিত অবস্থা। সবকিছু সেখানে আছে এবং বেরিয়ে আসতে চায়, চেতন মনের মাধ্যমে নিজেদের অভিব্যক্ত করতে চায়; আর কেবল তুমি, আমি নয় *জ্ঞানবান্ অপি* 'জ্ঞানী ব্যক্তিও' অন্তরের এই শক্তির দ্বারাই চালিত হয়। জ্ঞানবান হয়েও এই সব শক্তির দ্বারা সে কোন বিশেষ দিকে পরিচালিত হয়।

বেদান্ত চায় যে লোকে বুঝুক, তাদের ওপরে কোন্ শক্তি কাজ করছে? *বেদান্তের* উত্তর হলো ঃ দুটি-শক্তি আছে ঃ বহিঃশক্তি ও আন্তর শক্তি। লোকে এই আন্তর শক্তিগুলিকে উপেক্ষা করে চলে। তাই তারা কষ্টে পড়ে। আমরা যদি এদের উপেক্ষা না করি, আর আমরা যদি জানতে পারি—এই আন্তরশক্তিকে কাজে লাগানোর পদ্ধতি, তবে আমরা উন্নততর ও পূর্ণতর জীবন যাপন করতে সক্ষম হব। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে সে শিক্ষা দেওয়া হবে। তাই, *প্রকৃতের্জ্ঞানবান্ অপি*, 'এমনকি, *জ্ঞানী*, বিদ্বান ব্যক্তিও তার অন্তরে অধিষ্ঠিত প্রকৃতির শক্তি দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়ে' *প্রকৃতিম্ যান্তি ভূতানি*, 'জীব প্রকৃতির প্রেরণাকেই অনুসরণ করে', নিগ্রহঃ কিম্ করিষ্যতি, 'কেবল এদের দমন করে কি ফল হবে?' তুমি প্রাকৃতিক শক্তিকে দমন করতে পার না। সেটা পথ নয়। তাদের শিক্ষা দিতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন, 'তাদের নতুন দিকে চালিত কর', তাঁর কথায় সোজা বাংলায়, *মোড় ফিরিয়ে দাও*। তাদের দমন না করে এইসব প্রেরণাকে নতুন নতুন নৈতিক, চারিত্রিক, আধ্যাত্মিক দিকে চালিত কর। এ তোমার নিজের দায়। এ চেষ্টায় তোমার সাহায্য দরকার হলে—তুমি *গীতা* ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক গ্রন্থাদির মধ্যে খোঁজ কর। এ বিষয়ে সেগুলিই তোমায় নির্দেশনা দেবে। এ সমস্যা সকলের, বিশেষত মানুষের। পশুকুল নিয়ন্ত্রিত থাকে প্রকৃতির দ্বারা, তারা প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে না। পশুদের মধ্যে প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মানুষের মধ্যে প্রকৃতির বাহ্য ও আন্তর দুই রূপই বিদ্যমান, উপরন্তু সেখানে আরো কিছু রয়েছে, যা হলো

প্রকৃতির সর্বোচ্চ অভিরূপ আত্মা। আত্মাই হলো মানুষের মুক্তির উৎস, দেহ-মন সংঘাতের মাধ্যমে আত্মা অভিব্যক্ত হন মুক্তির প্রেরণারূপে ঃ 'আমি আমার জীবনকে নিজের হাতে নিয়ে—তাতে রূপ দিতে চাই। আমি চাই না যে প্রকৃতি এর রূপ দেয়'। এইভাবে দেখা যায় প্রত্যেকটি মানব শিশুর মধ্যে মুক্তির একটি উপাদান রয়েছে—কিন্তু কোন পশুর মধ্যে তা নেই। *বেদান্তে তাই মানবীয় গঠনতন্ত্রকে চিৎ-জড়-গ্রন্থি, চিৎ ও জড়ের সমবায় অর্থাৎ* চেতনা ও জড় পদার্থের মিলিত ভাব বলা হয়। এই দুটি মানবীয় গঠনতন্ত্রে মিলিত হয়ে আছে। জড় পদার্থ হলো সেই বস্তু যা প্রকৃতি আমাদের মধ্যে সংস্থাপন করেছে, আর যাকে বলা হয় চেতনা সেটিও উপস্থিত রয়েছে আমাদের উচ্চতর স্বভাবে বা *পরা-প্রকৃতিতে*; ক্রমবিকাশে, এর উচ্চতর সম্প্রকাশ দেখা যায় মানবীয় এই গঠনতন্ত্রে। আমরা এক কঠিন পরিস্থিতিতে আছি। ঐ চেতনা ও তার মুক্তির জন্য প্রেরণা যদি না থাকতো, যদি *কেবল* সাধারণ প্রকৃতিই থাকতো, তবে আমাদের জীবন-সংগ্রাম বলে কিছু থাকতো না; সে অবস্থায় আমরা প্রত্যেকটি জৈবিক প্রেরণায় ইতিবাচক সাড়া দিতাম। কিন্তু যেহেতু ঐ চেতনা রয়েছে, আর তা আবার এই প্রকৃতিরই সঙ্গে যুক্ত—তাই এর বিরুদ্ধে তুমি বিদ্রোহও করে থাক। ঐ সংগ্রাম থেকে সব রকম নৈতিক জীবন, সব রকম সংস্কৃতি, সব রকম সভ্যতা উৎসারিত হয়েছে। আমার নিজের প্রকৃত স্বভাবকে, যা স্বরূপত শুদ্ধ চেতনা, তাকে তুলে ধরতে চাই। বেদান্ত বলে, আমরা এক একটি *চিৎ-জড়-গ্রন্থি, চিৎ* অর্থাৎ 'চেতনা' এবং *জড়* অর্থাৎ 'অচেতনতা বা জাড্যতা'—এদের পারস্পরিক মিলিত অবস্থা। বাহ্য প্রকৃতি হলো জড়, সেই প্রকৃতিই নিজেকে অধিষ্ঠিত করেছে আমাদের অন্তরে; সেটি শক্তিশালী হলে, আমাদের অভিভূত করে ফেলে। *প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি*, 'এমনকি *জ্ঞানী* ব্যক্তিও এর চাপে অভিভূত হয়ে পড়ে'।

জগন্মাতার প্রতি উৎসর্গীকৃত মহান *ভক্তি-গ্রন্থ, দেবী মাহাত্ম্যে*, একটি শ্লোক (১.৫৫) আছে ঃ

> জ্ঞানিনাম্ অপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
> বলাদ্ আকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥

—'ঐ জগন্মাতাই, মহামায়া, মহতী মোহিনী শক্তিরূপে প্রকটিত হয়ে—এই প্রকটিত জগতে লীলাকালে *জ্ঞানীদের* মনকেও আকর্ষণ করে নিয়ে যায়, মোহগ্রস্ত জীবনের দিকে, ভ্রান্তিপূর্ণ কাজের দিকে।'

আর তাই আমাদের সাবধান হতে হবে। আমাদের অন্তর সর্বৈব সরল নয়। মানবজীবন হলো একটি সংগ্রাম। মানব জীবনকে সংগ্রামরূপে চিন্তা করা এক চমৎকার ধারণা। পশুরা উচ্চতর স্তরে বিকাশ লাভের জন্য সংগ্রাম করে না। আমরা করি। তাদের সংগ্রাম কেবল খেয়ে, পান করে, আর স্ত্রী পুরুষে সঙ্গম করে বেঁচে থাকার জন্য; আমাদের সংগ্রাম কেবল বেঁচে থাকার জন্য নয়, আমাদের অন্তরের কোন বস্তু বিকশিত হতে ও দেহ-মনের জটিল সমবায়ের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। এইভাবেই আমরা গড়ে তুলি আমাদের সংস্কৃতি; আমাদের সভ্যতা ঃ প্রকৃতিকে প্রত্যাখান করে, তাকে অতিক্রম করে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে। প্রকৃতি বলে রোদে বৃষ্টিতে বাস কর; মানব সত্তা বলে, 'না', আর তৈরি করে বাড়ি ঘর ইত্যাদি। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সংস্কৃতিবান ও সভ্য লোককেও প্রকৃতির চাপে পড়তে হয়। সভ্য জগতের সর্বত্রই এরূপ দেখা যায়। কেবল সভ্যতাই সব নয়, মনুষ্য জীবনের একটি গভীরতর মাত্রা আছে। সভ্যতা তো কেবল আরো বেশি আরাম, আরো বেশি সুবিধা, আর তার জন্য আরো বেশি সাজসরঞ্জাম। কখনো কখনো আমি, একশত বছর আগেকার বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর ডিস্‌রেলির কথার উদ্ধৃতি দিয়ে থাকি; তিনি বিরাট পণ্ডিতও ছিলেন। তিনি বলেন, 'ইউরোপীয়গণ অগ্রগতির কথা বলে, কিছু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাহায্যেই সে এক সমাজ গড়ে তুলেছে, যে সমাজ আরামকে সভ্যতা বলে ভুল করে।' যেহেতু আমরা বেশি আরামে আছি, অতএব আমরা বেশি সভ্য—এ ধারণা সঠিক নয়। উচ্চতর কিছু ভাব আছে, যার সম্প্রকাশ আমাদের ঘটাতে হবে। আরামের জীবন সত্যিকারের সভ্য জীবন নয়। তাই একটি শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ *প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি*, 'জীব প্রকৃতির প্রেরণাকেই অনুসরণ করে'। আমরা যা কিছু করি তার অধিকাংশই প্রকৃতির প্রেরণায় যেমন আমি পূর্বে সুইজারল্যাণ্ডের কার্ল য়ুঙ-এর এক উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেছিলাম। এই সব ব্যাপারে, যা কাজ করছে তা সরল প্রকৃতিরই কাজ মাত্র। কিন্তু সেইটিই সব নয়। সংস্কৃতি বা ব্যক্তিত্বের সমুন্নতির মতো কিছু বিষয় আছে। সেখানে তুমি তোমার নিজের ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছ। সেখানে তুমি প্রকৃতিস্তরের পারে, তোমার অন্তরে, কিছু নতুন মাত্রার সম্প্রকাশ ঘটাতে চেষ্টা করছ। তা থেকেই আসে নীতি, চরিত্র ও উচ্চতর আধ্যাত্মিক জীবন।

ভারতীয় চিন্তাধারায় মানবজীবনকে চারটি স্তরে ভাগ করা হয় ঃ *ব্রহ্মচর্য*, 'ছাত্রজীবন', *গার্হস্থ্য*, 'বিবাহিত জীবন' *বাণপ্রস্থ*, 'অবসর প্রাপ্ত জীবন', *সন্ন্যাস*, 'ত্যাগের জীবন'। শেষের দুটি স্তরে উচ্চতর মাত্রার বিষয়ে আরো বেশি

নিবিড়তার সঙ্গে অনুশীলন করা হয়েছে। প্রথম দুটি স্তরেও উচ্চতর মাত্রার বিষয় কিছু করার সুযোগ থাকলেও, কিন্তু এই স্তরে জীবন-সংগ্রাম এতই তীব্র যে ওদিকে আমরা বেশি মনোযোগ দিতে পারি না। কিন্তু এখন যেহেতু তুমি তোমার কাজে কিছুটা সাফল্য লাভ করেছ, তোমার পরিবার হয়েছে, নাম, যশ, সবই হয়েছে—এখন তোমার নিজের একটি জীবন দর্শন গড়ে তোলার সময় এসেছে। তাই হলো জীবন 'সায়াহ্নে'র—দর্শন। আমি কি *গুণগতভাবে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছি?* কী চমৎকার ভাব! আরো শান্তি, আরো আনন্দ, আরো করুণা— এই ধরনের আধ্যাত্মিক উন্নতিই হওয়া উচিত মানুষের জীবন সায়াহ্নের মূল কর্মপ্রচেষ্টা। তুমি জীবন প্রভাতের কার্যধারাকে জীবন সায়াহ্নেও চালিয়ে যাও, তার কী ফল হবে? কার্ল য়ুঙ-এর পূর্বোল্লিখিত উদ্ধৃতি অনুযায়ী তা হবে— ব্যক্তিত্বের অবনতি। আমরা দিনে দিনে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে থাকবো, কারণ তখন জগৎ সংসার আমাদের বাতিল করে দেয়, প্রকৃতিও আমাদের ত্যাগ করে।

বংশানুগতি পদ্ধতির ধারণাকে দৃষ্টান্ত করা যেতে পারে। যতদিন কোন প্রাণী প্রজনন-ক্ষম থাকে ততদিন প্রকৃতির কাছে তার মূল্য আছে। প্রজনন-শক্তি চলে গেলে, তার বিষয়ে প্রকৃতির আর কোন আগ্রহ থাকে না। প্রকৃতি তোমাকে ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু *তুমি* কেন নিজেকে ত্যাগ করবে? তোমার সামর্থ্য রয়েছে জীবনকে উচ্চতর স্তরে, প্রকৃতিরও ওপরে নিয়ে যাবার। চিরকাল প্রকৃতির স্তরে জীবন যাপন করো না। এ অতি গূঢ় সত্য। আমাদের জীবনের অনেকটাই থাকে প্রকৃতি স্তরে—এই ভাবটির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে *গীতার* এই শ্লোকগুলিতে। আমরা একে স্বীকার করে নিয়েছি, কিন্তু সব সময়ে এরূপ করার দরকার নেই। আমরা প্রকৃতির এই বন্ধন থেকে নিজেদের উদ্ধার করতে পারি। আমাদের মধ্যে এমন কিছু আছে যা মুক্ত। সেই মুক্তির বিকাশ আমরা ঘটাতে পারি। এখানেই আসছে একটি উচ্চতর জীবন-দর্শন, কিন্তু এ দুটি যেন পরস্পর বিরোধী না হয়। তারা যেন একের পর আর একটি এসে থাকে। প্রথমে চাই কাজে *সাফল্য*, নিশ্চয়ই যেমন য়ুঙ বলেছেন—একটি বিশ বছরের যুবক 'নাভির দিকে তাকিয়ে' বসে বসে স্থির হয়ে ধ্যান না করে, কঠোর পরিশ্রম করুক, অর্থ উপার্জন ইত্যাদি কাজ করুক। অন্যথায় সে তো অকর্মণ্য হয়ে পড়বে। এই শ্লোকগুলিতে ঐ সত্যকেই শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ করেছেন। *সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ; স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ সদৃশং চেষ্টতে,* 'মানুষ নিজ *প্রকৃতি* অনুযায়ী কাজ করে।' জ্ঞানীও ঐরূপ কাজ করতে বাধ্য হয়। *নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি?*

কেবল দমন করে কি করা যেতে পারে? এখানে দমন করলে ওটি ওখান দিয়ে বেরিয়ে পড়বে অন্যরূপে।

তুমি প্রকৃতির বিনাশ সাধন করতে পার না। প্রকৃতি যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। কিন্তু এর সঙ্গে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা তোমায় জানতে হবে। বেদান্তের আধ্যাত্মিক বাণীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের উদ্ঘাটন করতে এক অচেতন মনঃ প্রকৃতির সমীক্ষণের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। মানব প্রকৃতির বিরুদ্ধে রণংদেহি উগ্রমনোভাব পোষণ না করে, আমরা প্রকৃতিকে শিক্ষা দিয়ে থাকি, আর উচ্চ থেকে উচ্চতর, আরো উচ্চতর স্তরে উঠতে থাকি। কোন সামনাসামনি লড়াই নয়, কোনরূপ দমন নয়। দমন করার কোন অর্থই হয় না, অবদমিত শক্তি অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে আসার পথ বের করে নেয়। বস্তুত ছদ্মরূপে বেরিয়ে আসে। এটি পাশ্চাত্যে মানব-মনস্তত্ত্বে ফ্রয়েডের বড় বড় অবদানের মধ্যে একটি : যা কিছু তোমার কাছে সুখকর নয়, যা কিছু তোমার বিবেকবুদ্ধির কাছে প্রিয় নয়, তা তুমি মনের মধ্যে চেপে রাখ। তা ক্রমে অবচেতন বা অচেতন স্তরে চলে যায়। সেখান থেকে সেটি আবার বেরিয়ে আসে ছদ্মরূপে, এরকম সেরকম বিকৃত ব্যবহারের প্রকাশস্বরূপ মানসিক বিকার ও সংঘাতের বিভিন্ন রূপ ধরে। তারা কি তা তুমি জান না। একজন মনস্তাত্ত্বিক বা মনো-বিশ্লেষণকারী হয়তো আরো ভাল বুঝবে, আর তাই সে বিশ্লেষণের সাহায্যে খুঁজে বার করবে যে ঐ মানসিক বিকার সৃষ্ট হয়েছে কোন অবদমিত শক্তি থেকে। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, অবদমন কোন উপায় নয়, ঐ শক্তিকে শিক্ষা দাও; *তাদের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব*।

শ্রীরামকৃষ্ণ এ বিষয়টিকে একটি সরল উক্তিতে প্রকাশ করেছেন, *মোড় ফিরিয়ে দাও*, 'এইসব শক্তির অভিমুখের পরিবর্তন ঘটাও'। ওগুলি সব এক একটি শক্তিকেন্দ্র; প্রত্যেকটি আবেগই এক একটি শক্তিকেন্দ্র, প্রত্যেকটি মানসিক অভিজ্ঞতাই এক একটি শক্তিকেন্দ্র। শক্তিকে শুদ্ধ করে, তার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দিতে হবে। এ সামর্থ্য আমাদের আছে। কেবল এ কাজ করতে হবে সাবধানে ও বিচার করে, সরাসরি দ্বন্দ্বের মাধ্যমে নয়। যারা প্রচুর আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী তারা সামনাসামনি দ্বন্দ্বের মাধ্যমে একাজ করতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা পারে না, আর তাদের সেরকম করাও উচিত নয়। এতে তারা যুদ্ধে পরাজিতই হবে। এই হলো *নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি*, 'কেবল দমন করে কী হবে'? বরং বিভিন্ন প্রবণতার আবেগগুলির উৎস অনুসন্ধান কর, বিচারশীল মন নিয়ে; এতেই তুমি উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে উঠতে পারবে। বিচার-বিবেক কথাটির উল্লেখ বার বার করা হয়েছে। অতএব, এই হলো মানব সত্তায় অন্তর্নিহিত প্রকৃতি

সম্বন্ধে শিক্ষা, আবার একই প্রকৃতি রয়েছে বাইরেও। তাই শ্রীকৃষ্ণ পরে বলবেন যে, বহিঃপ্রকৃতি ও আমার দেহস্থ স্নায়ু-মন তন্ত্রাদি—এই দুই-এর মধ্যে সমতা রয়েছে, রয়েছে পারস্পরিক আকর্ষণ। ৩৪তম শ্লোকে তিনি বলছেন ঃ

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্নবশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ ॥

—'সকল ইন্দ্রিয়েরই (অনুকূল ও প্রতিকূল) বিষয়ভেদে যথাক্রমে আসক্তি ও বিদ্বেষ ভাব স্বাভাবিক; কিছুতেই তাদের অধীনে বশীভূত হবে না, (কারণ) এ দুটি জীবের পক্ষে (শ্রেয়ঃ লাভের) রাজপথে—দস্যুর সমান অর্থাৎ বাধা সৃষ্টিকারী।'

ইন্দ্রিয় এবং *ইন্দ্রিয়স্যার্থ* কথা দুটির অর্থ যথাক্রমে ইন্দ্রিয় ও তার বিষয়। 'এ দুটি পরস্পর সম্পর্কিত'; *ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য অর্থে*। কীভাবে তারা সম্পর্কিত? দুটি আবেগের মাধ্যমে, একটি হলো *রাগ* বা আসক্তি, অপরটি হলো বিদ্বেষ (ঘৃণা)। বিষয় যদি অনুকূল হয় তবে আমি আসক্ত হই; যদি প্রতিকূল হয়, তবে আমি তার প্রতি বিদ্বেষ যুক্ত হই, তাকে ঘৃণা করি। এইভাবেই আমরা সমস্ত বাহ্য বিষয়ের ব্যাপারে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে থাকি। সুখকর অভিজ্ঞতাকে স্বাগত জানান হয়। দুঃখজনক অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দূরে থাকতে চেষ্টা করি। এইভাবে আমরা বাহ্য ভোগ্য জগৎ সম্বন্ধে ব্যবহার করে থাকি। *রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ*, '*রাগ* ও *দ্বেষ* দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে'। বাহ্য ইন্দ্রিয় ভোগ্য জগতে মানবীয় গঠনতন্ত্র বেশ ভালভাবেই প্রতিষ্ঠিত আছে—*রাগ* ও *দ্বেষ*—এ দুটি আবেগের মাধ্যমে। তারপর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *তয়োঃ ন বশমাগচ্ছেৎ*, 'এদের বশীভূত হয়ো না।' কেন? *তৌ হি অস্য পরিপন্থিনৌ*, 'তারা মানবের জীবনে শ্রেয়ঃ লাভের রাজপথে দস্যুরূপে (প্রতিকূলরূপে) সুপরিচিত।' লক্ষণীয় হলো ভাষাটি ঃ *পরিপন্থিনৌ*। তুমি পথে চলেছ, এক দস্যু এসে তোমার সব কিছু লুটপাট করে নিয়ে গেল। আজকাল আমাদেরই জীবনে, বাসে, ট্রেনে, সর্বত্র এইরকম রাহাজানদের দৌরাত্ম্য আমরা দেখতে পাচ্ছি। তারা আমাদের কাছ থেকে কী লুট করে? আমাদের বিচারবুদ্ধি (বিবেক), আমাদের প্রজ্ঞা, আমাদের ধীশক্তি। অতএব সতর্ক হও। সজাগ থাকো—এই ভাষাই ব্যবহার করা হয়েছে। এই রকম সাবধান বাণী উচ্চারিত হয় সকল পথচারীর জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে। আমরা সকলেই পথচারী। আমরা জীবনযাত্রা শুরু করেছি শিশুরূপে, আর এই জগতে

চলেছি তীর্থযাত্রী হিসাবে—এটা সেটা অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য। আমাদের সকলকে লক্ষ্য করেই এই সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছে। তুমি জীবনে সাফল্য লাভ করতে চাও, তবে সাবধান হও। এই দস্যুরা সেখানে রয়েছে। কাজেই যাত্রাপথে তুমি অসতর্ক হতে পার না। তারপর ঃ

শ্রেয়ান্‌ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

—'দোষযুক্ত হলেও নিজের *ধর্ম*, উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরের ধর্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; *স্বধর্ম* সাধনে মৃত্যুবরণ করতে হলেও, তা কল্যাণকর; অন্যের *ধর্ম* অনুষ্ঠান করা বিপদ-সঙ্কুল।'

প্রত্যেকেরই রয়েছে তার নিজ নিজ *ধর্ম* বা জীবনযাপন, কর্মসম্পাদন ও মানবিক সম্পর্ক স্থাপন পদ্ধতি। মানসিক বিন্যাস অনুযায়ী মানুষ বিশেষ মানসিক প্রবণতার ও কর্ম সামর্থ্যের অধিকারী হয়ে থাকে। তাই হলো এক জনের *ধর্ম*। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, অন্যের *ধর্ম* অনুযায়ী জীবন যাপন করার থেকে *স্বধর্মে* থেকে প্রাণত্যাগ করাও শ্রেয়ঃ। ঐ *ধর্ম* ওর পক্ষে ভাল, তোমার নিজ *ধর্ম* তোমার কাছে ভাল। তোমার নিজ মনোবিন্যাসের ভিত্তি করে তোমার *ধর্ম* কী রূপ নিয়েছে তার অনুসন্ধান কর। *শ্রেয়ান্‌ স্বধর্মো বিগুণঃ,* 'নিজ ধর্ম উচ্চমানের না হলেও, তা তোমার কাছে সর্বোৎকৃষ্ট জানবে'। প্রত্যেক মানুষের স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী এই হলো শিক্ষা, তোমার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপের যেমন স্বাতন্ত্র্য থাকে। একইভাবে মানসিক স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। তা গড়ে ওঠে মানুষের জীবনের বিশেষ বিশেষ গতি, প্রবণতা, প্রতিক্রিয়া পছন্দ ও অপছন্দকে ভিত্তি করে। এই সবগুলি নিয়েই মানুষের স্বাতন্ত্র্য গড়ে ওঠে; মানুষের উচিত এটির প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়া, অন্যের স্বাতন্ত্র্যকে নকল না করে। নিজের অবস্থা সম্বন্ধে লজ্জিত হয়ো না। এই শ্লোকে আমাদের পক্ষে আত্ম-বিশ্বাস, আত্ম-নির্ভরতা আপন মানসিক বিন্যাসের ওপর যে আমাদের নিজস্ব আস্থা থাকা দরকার, তা উল্লেখ করা হয়েছে। একে উন্নততর অবস্থায় পরিবর্তিত করা যেতে পারে, কিন্তু একে কখনই অন্যের সঙ্গে বিনিময় করা উচিত নয়—নিজেকে অন্যের ছাঁচে গড়ে তোলা—উচিত হবে না। তখনই প্রশ্ন জাগে, 'আমরা জীবনে বড় বড় ভুল ও অপরাধ কীরূপে করে থাকি? অপরাধের নিদানতত্ত্ব কী? এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আসবে এই তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে। এই প্রসঙ্গে অর্জুন একটি খুবই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তুলেছেন ঃ

অর্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬॥

অর্জুন বললেন—'তবে, হে কৃষ্ণ মানুষ কীরূপ প্ররোচনায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন কোন বলের দ্বারা নিয়োজিত হয়ে, অপরাধমূলক কাজে প্রবৃত্ত হয়?'

এই প্রশ্ন প্রতিটি মানুষের মনের নিভৃতে যখন তখন জেগে ওঠে। অর্জুন মানবজাতির একজন প্রতিভূ মাত্র। অর্জুন বলেন, 'মানুষ কীরূপ প্ররোচনায় অপরাধমূলক কাজ করে?' *অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ম্*। *কেন* বলতে বোঝায় কীরূপ বা কার দ্বারা; *প্রযুক্তঃ*, অর্থাৎ প্ররোচনায়। *পাপম্ চরতি*, 'পাপ বা অপরাধ করে থাকে'। *পূরুষঃ*, 'মানুষ'। *পাপম্*, ধর্মশাস্ত্রে এর অনুবাদ হলো অন্যায় কাজ। সামাজিক রাজনীতিক চিন্তায় পাপের অর্থ হলো অপরাধমূলক কাজ। সমাজের বিরুদ্ধে, অন্য মানুষ অথবা অন্য জীবের বিরুদ্ধে, অপরাধ করা। বেদান্তে পাপে ও অপরাধে কোন পার্থক্য করা হয় না। প্রশ্ন হলো ঃ কেন মানুষ অপরাধ বা মন্দ কাজ করে থাকে? হিংস্র রক্তপাত, খুন, ডাকাতি; বস্তুত আজকাল নানা রকমের অপরাধ দেখা যায়, প্রতিদিনই তা বেড়ে চলেছে। তাই, জানা দরকার—এ অপরাধের উৎস কোথায়, কীভাবেই বা একে সমাজ থেকে নির্মূল করা যায়। বস্তুত সমাজবিজ্ঞানে ও অপরাধ বিজ্ঞানে এ বিষয়ে আমরা পাঠ ও পর্যালোচনা করে থাকি। *গীতা*, এ বিষয়ে—*মানব-সম্ভাবনা-বিজ্ঞানের* মাধ্যমে মানব-ব্যক্তিত্বের গভীর-মাত্রার বৈদান্তিক পর্যালোচনাভিত্তিক এক অন্তর্দৃষ্টি আমাদের কাছে উপস্থাপন করছেন। *অনিচ্ছন্নপি*, 'ঐ ব্যক্তির অনিচ্ছা সত্ত্বেও'—বলে অর্জুন প্রশ্ন করছেন; একথা সব ক্ষেত্রে না হলেও অনেক অপরাধীর ক্ষেত্রে সত্য; আরো জোর দিয়ে অর্জুন বলছেন, *বলাদিব নিয়োজিতঃ*, 'যেন কোন শক্তির দ্বারা নিযুক্ত হয়ে'। এই বাকি সাতটি শ্লোকে অপরাধ, তার নিদান তত্ত্ব ও তা নির্মূল করার উপায় নিয়ে এক গভীর প্রজ্ঞাসম্পন্ন পর্যালোচনা করা হয়েছে।

শ্রীভগবান্ উবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭॥

শ্রীভগবান বললেন—'এ হলো রজোগুণসম্ভূত, দুষ্পূরণীয় কামনাজাত এবং উগ্রপাপ-সৃষ্ট—কামপ্রবৃত্তি, এটি ক্রোধও বটে; একে এখানে (মানব জীবনে) শত্রু বলে জানবে।'

শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে বলছেন ঃ *কাম এষ ক্রোধ এষ,* 'এটি হলো অপূরণীয় বাসনা, আবার ক্রোধও বটে' *রজোগুণ সমুদ্ভবঃ,* 'তারা মানবের রজোগুণ জাত; *মহাশনো মহাপাপ্মা,* 'মহাভোগী ও মহাপাপী'; *বিদ্ধি এনম্ ইহ বৈরিণম্,* 'একে এখানে অর্থাৎ মহাশত্রু বলে জানবে।'

কাম একটি মহান শব্দ। একে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়েছে। *মনুস্মৃতিতে* কামের প্রচুর প্রশংসা রয়েছে। *অকামস্য ক্রিয়া নাস্তি,* কাম বা আন্তরিক বাসনা ছাড়া মানুষ কোন কাজই করতে পারে না। সব কাজই হয়ে থাকে *কামের* প্রেরণায়। অতএব, এখানে কামের প্রশংসা করা হলো। আমাদের গ্রামীণ জনগণকে ধরো, লক্ষ লক্ষ মানুষ রয়েছে—কিন্তু উচ্চতর জীবনের জন্য তাদের কোন বাসনা নেই; তাই তারা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করে; তাদের নিরক্ষরতাতেই তারা সন্তুষ্ট—যদিও কাছেই স্কুল রয়েছে। তারা একেবারে বাসনাহীন। আমরা কি বলতে পারি, যে তারা এক একজন মহান ঋষি হয়ে গেছে? না, মোটেই না। কেবল তাদের ব্যাপারে, প্রথম শিক্ষা হলো, তাদের মধ্যে বাসনা জাগিয়ে তোলা। ছোট ছেলেটি রয়েছে; তার মধ্যে জানার বাসনা জাগিয়ে তোল; ফলে সে স্কুলে যাবে। আর পরে কঠোর পরিশ্রম করে আগের থেকে কিছুটা ভাল ভাবে জীবন কাটাবে। অতএব, জীবনের প্রথম স্তর হলো *কাম*।

ঠিক তেমনি, *ক্রোধ,* রাগ; কখনো কখনো আমাদের *ক্রোধের* প্রয়োজন থাকে। আগে উল্লেখ করেছি, মানব জীবন কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ে, যদি সেখানে ক্রোধের—সামাজিক অভদ্রতার বিরুদ্ধে ক্রোধের মতো আবেগ না থাকে। *কাম* ও *ক্রোধের* একটা স্থান আছে; কিন্তু তাদের সংযত, নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে। তারা যেন অন্ধ সেপাই। এখানে দরকার মানবোচিত শিক্ষার, যে শিক্ষায় নৈতিক ও চারিত্রিক সচেতনতার মাধ্যমে মূল্যবোধেরও স্থান থাকবে। সেই স্তরে, তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে—*কাম* ও *ক্রোধকে;* সীমা ছাড়িয়ে গেলে তোমাকে অবশ্যই *কামের* কাছে 'না' বলতে হবে, তেমনি *ক্রোধের* ব্যাপারেও 'না' বলতে হবে। তখনই, আমরা লক্ষ লক্ষ লোকের সমাজে শান্তিতে বাস করতে পারবো। আমি যদি একটা দ্বীপে একা বাস করি, তখন সেখানে আমার *কাম* ও *ক্রোধের* ব্যাপারে আমার নিয়ন্ত্রণ ও সংযম পালনের দরকার হয় না। ঐ দ্বীপে আমি ইচ্ছা মতো সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে, দৌড়তে, কিছু নিতে, সেখানকার সব কিছুর ওপর রাগও করতে পারি। তা আমি পারি। কারণ সেখানে কোন উদ্বেগ নেই। কিন্তু সমাজের ভেতর, যেখানে অন্য মানুষ রয়েছে—তাদের ওপর তো তোমার

কাম ও *ক্রোধের* প্রতিক্রিয়া হবে, অতএব সেখানে তোমার পক্ষে এই দুটি শক্তিকে সংযত রাখা প্রয়োজন। তাদের সংযত না করলে, তারা দুষ্ট শক্তিতে পরিণত হবে। সংযত থাকলে তারা দুষ্ট নয়। *কাম* কথাটির অর্থ কী, তা স্মরণে রাখবে। এই *গীতারই* ৭ম অধ্যায়ে ১১শ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের বলবেন, 'আমিই সর্বজীবের অন্তরস্থ *কাম,* কিন্তু সে *কাম ধর্মের* বা নীতিবোধের অবিরোধী,' *ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ*। অতএব, *কাম* সব সময়েই নিন্দনীয় নয়। কিন্তু নির্বাধ *কাম,* অসংযত *কাম,* এমনকি *ক্রোধও* এবং তৎসহগামী অন্য অশুভ বৃত্তি বা বস্তুকে আমাদের মূল শত্রু বলে জানবে।

বেদান্ত বলে, প্রত্যেক জীবেরই ছয়টি শত্রু রয়েছে। তারা সকলেই মানব সত্তার অন্তরে, যথা ঃ *কাম, ক্রোধ, লোভ* অর্থাৎ ভোগেচ্ছা; *মোহ* অর্থাৎ ভ্রান্তি; *মদ্* অর্থাৎ গর্ব ও দম্ভ; *মাৎসর্য* অর্থাৎ ঈর্ষা। এগুলিকে *ষড়-রিপু,* 'ছয়টি-শত্রু' আখ্যা দেওয়া হয়। কেবল মানুষই এগুলিকে আয়ত্তে রাখতে পারে ও আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্যে দমনও করতে পারে। এদের মধ্যে *কাম* ও *ক্রোধ* হলো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও বিপজ্জনক। এ দুটিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলে অন্য চারটিকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ। তাই উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন ঃ তারা দু-টি ঃ কাম ও ক্রোধ। তাদের উৎস কোথায়? একটি সুন্দর মনস্তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ঃ *রজোগুণ সমুদ্ভবঃ* , 'মানব সত্তায় অন্তর্নিহিত *রজোগুণের* আধিক্য থেকেই এদের সৃষ্টি।' প্রথমে *তমস্* অর্থাৎ জড়ভাব। যখন তুমি *তমঃগুণে* আচ্ছন্ন, তখন তুমি ভালও কর না, মন্দও কর না। এই টেবিলটির বা চেয়ারটির মতো, এরা সব *তমাচ্ছন্ন; রজোগুণের* বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই, ঐ কাজ ভাল অথবা মন্দ হবে; যখন ভাল ভাবের প্রাধান্য হয়, তখন মানুষ অন্য লোকের সেবায় তৎপর হয়; যখন মন্দের প্রাধান্য হয়, তখন অত্যধিক *কাম* ও *ক্রোধের* প্রকাশে ক্ষতিকর কাজের প্রাদুর্ভাব ঘটে। তাই আমাদের দরকার শিশুকে শিক্ষা দিয়ে, তাকে *তমোভাব* থেকে *রজোভাবে* উন্নীত করা। আর তার মধ্যে *কাম* অর্থাৎ বাসনা জাগিয়ে তোলা ঃ 'আমি এটা চাই, আমি ওটা চাই, যদি কোন *বাধা* থাকে আমাকে তা দূর করতে হবে আমার সর্বশক্তি দিয়ে।'। অতএব, কাম ও ক্রোধকে এইভাবে মানব কল্যাণের কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়। শিশুকে অবশ্যই শেখাতে হবে এ দুটিকে সংযত রাখতে—যাতে ও দুটি সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর না হয়।

এই রজোগুণ এবং তাদের সৃষ্ট *কাম* ও *ক্রোধ* যদি তাদের আশ্রয়দাতা কর্তৃক ঠিক মতো নিয়ন্ত্রিত না হয়, তবে ওগুলি তাকেই অসুবিধায় ফেলবে। এ

দুটি হলো *মহাশনো মহাপাপ্মা*, 'বিরাট ভোগী ও বিরাট পাপী'। *অশন* মানে ভক্ষণ, আর *মহা* মানে বিরাট; বিরাট ভোগী। এর অর্থ হলো, অগ্নিতে যেমন ইন্ধন জোগালে তা বেড়ে উঠে আরো ইন্ধন ভস্ম করে নির্বাপিত হয় না; কাম ও ক্রোধও সেইরূপ। বাসনার ভোগ্যবস্তু যতই জোগাও—তার তৃপ্তি নেই, আরো আরো চায়। মানবের বাসনার ঐ স্বভাব। আগে কবি গ্যেটের ফাউস্ট নাটক থেকে এই সুন্দর উদ্ধৃতি দিয়েছি—বনে তার স্বগতোক্তির ঃ

'ওহো, মানবের হতদশার জন্য ঃ আমি এখন জানি
আমাদের অতৃপ্ত বাসনাই যে দায়ী।
সে গড়ে তোলে এক এলোমেলো (বাসনার) আগুন
আমার ভোগ বিরাগী অন্তরে,
যতদিন না আমি প্রাপ্তিতে এসে থমকে দাঁড়াই।
প্রাপ্তিতে আবার বাসনার জ্বালায় নিস্তেজ হয়ে পড়ি।'

ওতেই বোঝা যাচ্ছে *মহাশনঃ* কথার অর্থ, বাসনা অন্তহীন। একটি তৃপ্তি হলে, তার জায়গায় দশটি জেগে উঠবে। আজকাল অর্থনীতির ভাষায় একে চাহিদা ও লোভ বা এককথায় ভোগবাদিতা আখ্যা দিয়ে থাকি। মানবের চাহিদা আমরা মেটাতে পারি; মানবের লোভকে আমরা তৃপ্ত করতে পারি না। এ জগতে যথেষ্ট সম্পদ রয়েছে, যা দিয়ে আমরা চারশো কোটি মানুষের চাহিদা মেটাতে পারি, কিন্তু তাদের লোভকে তৃপ্ত করতে পারি না। সমাজে যদি লোভকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তবে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাথমিক চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে না। এই হলো, আধুনিক যুগের একটি সমস্যা। অর্থনীতিবিদ, দর্শনশাস্ত্রবিদ ও চিন্তাবিদ সকলেই আজকাল একটি বিষয়ের ওপর জোর দিচ্ছেন—তা হলো আমাদের লোভকে, তথা ভোগবিলাস বাসনাকে সংযত করার ওপর। দৃষ্টান্ত, বহু লেখক আমেরিকার সমালোচনা করে। ৬ শতাংশ লোক পৃথিবীর ৪০ শতাংশ সম্পদ ভোগ করে। এই হলো বর্তমান আমেরিকা। আমেরিকাবাসীরা নিজেরাও এ সমালোচনা করে থাকে। এটা ভাল নিদর্শন। আমরা মানবীয় পরিস্থিতিকে ক্রমেই আরো ভালভাবে বুঝতে চেষ্টা করছি ঃ যে, লোকের চাহিদা মেটাবার মতো যথেষ্ট রসদ থাকলেও, সামান্যমাত্র কিছু লোকের দুষ্পূরণীয় লোভ মেটাবার মতো যথেষ্ট সম্পদ আমাদের নেই; এই লোভের জন্যই প্রকৃতি ধ্বংস হচ্ছে, প্রাকৃতিক পরিবেশের সমতা বিপর্যস্ত হচ্ছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, পাখির কথা ধর। কত পাখি এখন লুপ্ত হয়ে গেছে, কারণ

লোকে পাখি শিকার করে চলেছে, পাখির পালকের জামা তৈরি করার জন্য, শৌখিন মানুষের, বিশেষত মেয়েদের। মরিসাসে ডোডো নামে এক পাখি ছিল। দু-শ বছর আগেও তারা সেখানে ছিল। ঔপনিবেশিকগণ সেখানে গিয়ে তাদের গুলি করে করে মেরেছে। ডোডো পাখি ওজনে খুবই ভারি, তাই তাড়াতাড়ি উড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারে না। তাই আজ তারা লুপ্ত। তাই ইংরেজি ভাষায় বলে 'ডোডোর মতো মৃত'। তিমির সংখ্যাও কমে আসছে, তেমনি অন্য অনেক প্রজাতির জন্তুর ক্ষেত্রেও। এইভাবে মানুষের এ জগতে টিকে থাকার মতো যে প্রাকৃতিক পরিবেশের সমতা রক্ষার প্রয়োজন—তা এই লোকেদের জন্য বিপর্যস্ত হচ্ছে। অতএব, *মহাশনঃ*, মহাভোগী, কথাটি এক আশ্চর্য কথা, বর্তমান মানবীয় পরিস্থিতি নিয়ে আমরা যা চিন্তা করে থাকি, তার সঙ্গে এর প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

মহাপাপ্মা, দ্বিতীয় শব্দটি, তোমার সেই বৃত্তিকে বোঝায়, যা তোমাকে অশুভ, ধ্বংসাত্মক কাজে প্ররোচিত করে। সবরকম পাপ, অশুভ কর্ম ও অপরাধ আসে *কাম* ও *ক্রোধ*, এই দুই বৃত্তির শক্তি থেকে, যার উৎস হলো *রজোগুণ*। একটু গভীরভাবে চিন্তা কর আমাদের অন্তরস্থ *রজঃকে* আমরা কীভাবে কাজে লাগাতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ পরে এর উপায় বলে দেবেন ঃ *সত্ত্বের* স্পর্শে তোমার *রজসের* তীব্রতাকে হ্রাস করে তাকে এক উচ্চমাত্রার দিকে চালিত কর। একে শুদ্ধ করতে পারলে একটা মহৎ কিছু ঘটতে পারে। ঐ একই শক্তি, তোমার মাধ্যমে, শত শত লোকের মনে শান্তি নিয়ে আসবে। *কাম* ও *ক্রোধ* যদি কেবল নিজস্বার্থের সঙ্গে যুক্ত থাকে তা হলে এমনটি হয় না। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ *বিদ্ধি এনম্ ইহ বৈরিণম্*। *ইহ*, 'এই মনুষ্য জগতে'; *এনম্* 'একে'; *বিদ্ধি*, 'জেনো'; *বৈরিণম্*, 'শত্রুরূপে'। এই হলো প্রথম উত্তর।

পরের শ্লোকে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে ঃ বেদান্ত সকল জীবের মধ্যে দিব্য স্ফুলিঙ্গের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছে, কারণ বিশ্বের বিকাশ ঘটেছে অনন্ত দিব্য সৎবস্তু থেকে। আমাদের অজ্ঞান ও ভ্রান্তি লুকিয়ে রেখেছে ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিং-য়ের ভাষায় সেই 'কারারুদ্ধ দীপ্তি'কে; জ্ঞানকে কিছু দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে; *আব্রিয়তে*, অর্থাৎ 'ঢেকে রাখে'।

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮॥

—'আগুন যেমন ধোঁয়াতে ঢাকা হয়ে যায়, দর্পণ যেমন ধুলোয় ঢাকা হয়ে যায়,

গর্ভ যেমন বেষ্টনকারী ঝিল্লির দ্বারা ঢাকা থাকে, তেমনি এইটি (সৎবস্তু) ওইটির (রজসের) দ্বারা ঢাকা থাকে।'

তিনটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। মানবের এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান, এই বিচার-সামর্থ্য (বিবেক), মানব সত্তার অন্তরে লুকান আছে। কিভাবে? ঠিক এমনিভাবে : *ধূমেন আব্রিয়তে বহ্নিঃ*, 'যেমন আগুন ধোঁয়ায় ঢাকা হয়ে যায়'; *যথা আদর্শো মলেন চ*, 'যেমন দর্পণ ধুলোয় ঢাকা পড়ে'। তৃতীয়ত *যথোল্বেন আবৃতো গর্ভঃ*, 'যেমন গর্ভস্থ শিশু গর্ভবেষ্টনী অতি পাতলা চামড়ার থলেতে লুকানো থাকে', *তথা তেন ইদম্ আবৃতম্*, 'তেমনি এই (জ্ঞান)টি ঢাকা থাকে ওটির (*কাম-ক্রোধরূপে* প্রকটিত রজো-গুণের) দ্বারা'। এই কথা বলে, পরবর্তী *শ্লোকে* পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে প্রত্যেক মানবের অন্তরে যে *জ্ঞান* রয়েছে তা ঢাকা থাকে *কামের* দ্বারা।

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯॥

—'হে কুন্তীপুত্র, জ্ঞান ঢাকা থাকে, জ্ঞানীর চিরশত্রু এই (অসংযত ভোগ বা) কামরূপ দুষ্পূরণীয় আগুনের দ্বারা।'

মানবের অন্তরস্থ এই *জ্ঞান* সংগুপ্ত থাকে, ঢাকা থাকে এর দ্বারা। কার দ্বারা? মানবের *নিত্যবৈরী*, 'চিরশত্রু' *রজোগুণজাত* এই *কাম* ও *ক্রোধের* দ্বারা। অসংযত, *কাম* ও *ক্রোধ* সকল মানবের চিরশত্রু। *নিত্যবৈরী* কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ 'চিরকাল ধরে শত্রু', একবার দুবারের জন্য নয়, সারা জীবনব্যাপী। *জ্ঞানিনো*, 'জ্ঞানবানে'র এই *জ্ঞান* তারা ঢেকে রাখে, আর *জ্ঞান* ঢাকা থাকলেই মানুষ সব রকম অপকর্ম করে থাকে। *কামরূপেণ কৌন্তেয়*, 'হে অর্জুন, *কামের রূপ ধরে*'; *দুষ্পূরেণ অনলেন চ*, 'অতৃপ্তনীয় আগুনের মতো'। এই হলো অপরাধের উৎস সম্বন্ধে *গীতার* শিক্ষা; কিন্তু আমরা জানতে চাই, কীভাবে এর কবলের বাইরে যাওয়া যায়। কীভাবে এই অপরাধের ও অপরাধ-প্রবণতার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

মানব মনে যখন রজঃ ও তমঃ-এর প্রাধান্য প্রবলাকার ধারণ করে, তখন অপরাধ ও অপরাধমূলক নানা সমস্যার উদ্ভব হয়, কিন্তু যখনই মন *সত্ত্বের* স্তরে উন্নীত হয়, সমস্ত পরিস্থিতি পালটে যায়। মানব শান্ত, স্থির, শান্তিপ্রিয় ও করুণাপ্রবণ হয়। মন ঐরূপ অবস্থায় পৌঁছুলে, মানুষ অপরাধ করতে পারে না,

এ অবস্থা কেমন করে আমরা লাভ করব? প্রত্যেকের মনঃ-শিক্ষণের মাধ্যমে। সব কিছুই রয়েছে মনে; তোমার মন যদি সুস্থ থাকে, তবে তোমার সব কাজই সুস্থ হবে। মন অসুস্থ হলে, তুমি যা করবে তাতেই চাপ সৃষ্ট হবে তোমার মধ্যে, সমাজের মধ্যে। *আবৃতম্ জ্ঞানম্ এতেন,* এর দ্বারাই জ্ঞান ঢাকা হয়ে যায়। মনে কর, আমি একজন সুসভ্য লোক; আমি যখন অপরাধ করি, সেই সময়ে আমার স্বরূপ, আমার মর্যাদা প্রভৃতি সম্বন্ধে আমার জ্ঞান সাময়িকভাবে আমার কাছ থেকে লুকিয়ে পড়ে। *কাম* ও *ক্রোধই* ঢেকে দেয় আমার স্বরূপ, আমার মর্যাদা সম্বন্ধে আমার আন্তর জ্ঞানকে। মানুষ যে মূলত দিব্য সত্তা বিশিষ্ট, এই তত্ত্বটির ওপর বেদান্তে সর্বদা জোর দেওয়া হয়। আবরণকারী শক্তিগুলি দিব্যভাবকে ঢেকে দেয়। সূর্য সদাই উজ্জ্বল। কিন্তু এক খণ্ড মেঘ তাকে ঢেকে দিতে পারে। তখন সূর্যকে আর দেখা যায় না। তেমনি এই দিব্য সত্তা, এ সম্বন্ধে জ্ঞান, রজো-গুণজাত *কাম* ও *ক্রোধের* প্রবল প্রভাবে ঢাকা পড়ে যায়। এদের থেকেই অন্য সব মন্দ বৃত্তির সূচনা হয়। এই বিশেষ সমস্যাটির সুষ্ঠু সমাধান আমাদের করতে হবে।

আমরা লক্ষ্য করেছি, যে সমস্যার উদ্ভব ঘটে *অসংযত* বাসনা থেকে, অদম্য আকাঙ্ক্ষা থেকে, আজকাল যাকে বলা হয় *অসংযত* ভোগবাদিতা বা ভোগবিলাসবাদ। এই ভোগবাদের দরুণ প্রকৃতি কত ভাবেই না বিনাশপ্রাপ্ত হচ্ছে! সমাজে এই সব অপরাধের, এই সব ধ্বংসাত্মক কাজের উৎস খুঁজতে গেলে আমরা দেখবো যে মানসিক সংযমের অভাব থেকেই এগুলির উৎপত্তি। স্বাভাবিক মানসিকতায় যে কাজ আমরা কখনো করি না, সেই কাজে আমাদের প্ররোচিত করে যে কাম-শক্তি—তাকে সংযত রাখতে আমাদের মনকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। তাই এই বিশেষ অভিব্যক্তি, *জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা,* 'জ্ঞানান্বেষীর পক্ষে চিরশত্রু'। বাসনাই আমাকে কাজে প্রবৃত্ত করে। তাই বাসনার সংযম একান্ত কর্তব্য। সব সংস্কৃতি, সব সভ্যতাই মানবিক বাসনার ফলশ্রুতি; কিন্তু যখন তুমি একজন সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হও, তখন তোমার সেই বাসনা সংযত হয়। সকল সংস্কৃতিতে ও সভ্যতাতেই, বাসনাও যেমন আছে, তাকে সংযত রাখার প্রচেষ্টাও তেমনি রয়েছে। সমাজই বাসনা সংযম-শিক্ষণের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। সমাজে অন্যের ক্ষতি হয় এমন কাজ আমি করতে পারি না। এর জন্য রয়েছে দেওয়ানী আইন, রয়েছে ফৌজদারী আইন। রয়েছে রাজনীতিক বিধানসভা, আর আমার ব্যক্তিগত মানসিক বিবেকবুদ্ধি। এ সমস্তই রয়েছে মানবের অন্তরস্থ এই প্রবল শক্তিকে সংযত রাখতে; কিন্তু বাসনা তখনই

মানবের চিরশত্রুতে পরিণত হয়, যখন তাকে ঠিকমতো নিয়ন্ত্রিত ও সংযত করা না হয়। তোমার সমস্ত জীবনই বৃথা হয়ে যাবে—এই কারণে।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত রাজা যযাতির কাহিনী এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। তার প্রচণ্ড ভোগ লিপ্সা ছিল সুখের জীবন, আনন্দের জীবন, সংসার জীবনযাপনের প্রতি। তিনি তা করলেন; বৃদ্ধ হলেন। তিনি পুনরায় যুবা হতে চাইলেন; তিনি পুত্রদের কাছে যৌবন ভিক্ষা করলেন। এক পুত্র পিতাকে নিজ যৌবন দান করে, নিজে তাঁর জরা গ্রহণ করল। রাজা আবার সুখভোগে লিপ্ত থেকে বৃদ্ধ হলেন। তখন তাঁর মনে এইটুকু চিন্তা এল ঃ শরীর তো দ্বিতীয়বার জরাগ্রস্ত হলো। কিন্তু বাসনা তো এখনো যুবা ছেলের মতোই রয়ে গেছে। বাসনার তো জরা এলো না। তা তো সদাই তাজা। তাই, তাঁর একটু চিন্তা করার অবকাশ হলো এবং পরে তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হলো এক মহান তত্ত্বজ্ঞান, এক সুন্দর শ্লোকের মাধ্যমে ঃ

'ন জাতু কামঃ কামানাম্ উপভোগেন সাম্যতি;
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এব অভিবর্ধতে॥'

—'বাসনার উপভোগে বাসনার তৃপ্তি আসে না; এতে কেবল বাসনাই বৃদ্ধি পায়—যেমন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে অগ্নি প্রশমিত হয় না, বরং আরো জ্বলে ওঠে।'

এ এক প্রগাঢ় জ্ঞান, যা ভারতের ঋষিদের কাছে ইতিহাসের গোড়ার দিকেই প্রতিভাত হয়েছিল।

আজকাল জগৎ ঐ জ্ঞানেরই সন্ধানে ফিরছে। বর্তমান সভ্যতা ঐ একই সমস্যা নিয়ে কষ্ট পাচ্ছে ঃ শুধু আকাঙ্ক্ষা নতুন নতুন ভোগ্যপণ্যের জন্য, নতুন নতুন ভোগের সরঞ্জামের জন্য—যা সুদক্ষ প্রযুক্তি বিদ্যা তাদের জন্য প্রস্তুত করছে, প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট করে ও পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা ও অসুবিধাদি সৃষ্টি করে। জড়বাদী দর্শনে এই সব ইন্দ্রিয় ভোগের আকাঙ্ক্ষা ও তাদের তৃপ্তির ওপরে উচ্চতর বা মহত্তর আর কিছু নেই। মানুষের জীবন ও পরিণাম সম্বন্ধে আরো অধিক ভাবগ্রাহী একটি দর্শনের প্রয়োজন, আর *গীতায়* সেইটিই পাওয়া যায়। এতে মানবকে কেবল 'বাসনা নিয়ন্ত্রণে'র কথাই বলে না, বলে 'বাসনাকে আরো উচ্চতর বস্তুর দিকে মুখ ফেরাতে'। ইন্দ্রিয়ভোগের আকাঙ্ক্ষা ও তার তৃপ্তিই মানুষের উচ্চতম অবস্থা নয়। ইন্দ্রিয় স্তরের পারে, তার ওপরেও মানবের

ক্রমোন্নতি হয়ে থাকে। *গীতা* মানুষকে শুষ্ক নীরস সন্ন্যাসিরূপে ছেড়ে দেয় না, বলে, 'অন্য সব উচ্চ শিখর জয় করতে হবে; একটা বিশেষ স্তরে আবদ্ধ হয়ে যেও না।' বর্তমান সভ্যতা নীরবে সেই জ্ঞানেরই অন্বেষণ করছে। তাই যযাতির প্রজ্ঞা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আধুনিক সভ্যতার সমস্যা-বিষয়ক রচনাতে। *ন জাতু কামঃ কামানাম্*। জাতু, অর্থাৎ 'কখনো না'। কামভোগে কখনো কামের তৃপ্তি হয় না। এতে ভোগাকাঙ্ক্ষা ক্রমেই বাড়তে থাকে, আগুন নেভাতে ঘৃত ব্যবহার করলে আগুন আরো বেশিই জ্বলে ওঠে। এই জ্ঞানটিই কোন কোন আধুনিক রচনায় অভিব্যক্ত হচ্ছে।

আমেরিকার একটি কমিশনের প্রতিবেদনের একটি বাক্য উদ্ধৃত করতে চাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই একটি *হুভার কমিটি কমিশন* বসান হয় আমেরিকার তদানীন্তন অর্থনীতিক গতিপ্রকৃতির বিষয়ে পর্যালোচনা করতে। সেই প্রতিবেদনে এই বাক্যটি রয়েছে, যাতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে ভারতে বহুযুগ পূর্বে উচ্চারিত যযাতির উক্তিটি, তার অন্তর্নিহিত ভাবটুকু বাদ দিয়েঃ 'এই পর্যালোচনায় প্রকাশ পেয়েছে যে মানুষের কামনার শেষ নেই।' এটি হলো প্রথম বাক্য। দ্বিতীয়টি হলো, 'এমন কোন নতুন কামনা নেই, যা পরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই নবতর কামনার পথ উন্মুক্ত করে দেয় না'। এই হলো মানব মনের স্বভাব। অতএব আমার করণীয় কী? আমি কি কামনার জগতে কামনার স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলব? না। কিন্তু সেই জ্ঞান আধুনিক চিন্তা জগতে আসতে দেরি আছে। আধুনিক চিন্তাজগতে অতীন্দ্রিয় স্তরের অভিজ্ঞতার আভাসমাত্রও পৌছায়নি। দ্বিতীয় অংশটি, যা ইতি-বাচক, *ভগবদ্-গীতা* এবং উপনিষদেও আলোচিত হয়েছে। মানব-জীবনের আধ্যাত্মিক মাত্রার বিষয়ে এই রকম শিক্ষা, আধুনিক বিজ্ঞানে, বিশেষত স্নায়ু বিজ্ঞানে ও জীব বিজ্ঞানে, ধীরে ধীরে আসছে। আধুনিক জীববিজ্ঞান বলে মানবিক স্তরে ইন্দ্রিয়ভোগের পরিতৃপ্তিই ক্রমবিকাশের লক্ষ্য নয়। অবশ্য মনুষ্য-পূর্ব দশায় জীবের ক্রমবিকাশে ঐটিই লক্ষ্য ছিল। ঐ একটি বাক্যই যথেষ্ট আমাদের একথা বলতে যে, আধুনিক জীববিজ্ঞান ঠিক পথে চলেছেঃ যে মনুষ্য-পূর্ব দশায়, ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে—ইন্দ্রিয় ভোগের পরিতৃপ্তি, সংখ্যা বৃদ্ধি, জৈব উদ্বর্তন। বর্তমান জীববিজ্ঞানে, মনুষ্য-স্তরে এগুলির ওপর দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, প্রাথমিক পর্যায়ের গুরুত্ব দেওয়া হয় অন্য কিছুর ওপর। সেটি আবার কী? পরিপূর্ণতা লাভ, সাফল্যমণ্ডিত হওয়া। তুমি কি পরিপূর্ণতা লাভ করেছ? তা যদি তুমি লাভ না করে থাক, তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে, জীববিজ্ঞান

চর্চার গোড়ার দিকে সেগুলি একেবারেই বোধগম্য ছিল না। আমাদের এক নতুন ধরনের ক্রমবিকাশে সাফল্য লাভ করতে হবে—যা জৈব মাত্রার ঊর্ধ্বে, ইন্দ্রিয়াতীত—এই ভাষাতেই যাকে বোঝাতে হয়। জৈবিক—ক্রমবিকাশে আমরা মনুষ্যস্তর পর্যন্ত পৌঁছেছি—বহুমুখী কর্মশক্তিসম্পন্ন মস্তিষ্ক তন্ত্রটি পেয়েছি। এর সাহায্যে তোমার পছন্দমতো যে কোন ছোটখাট যন্ত্র তুমি তৈরি করে নিতে পার ঃ যেমন, আমাদের শরীরে দুটো ডানা গজিয়ে তোলার পরিবর্তে তুমি এরোপ্লেন (উড়োজাহাজ) তৈরি করতে পার। মনুষ্যস্তরে জৈবিক ক্রমবিকাশ যদি অপ্রাসঙ্গিক হয়, তবে মানবিক ক্রমবিকাশের প্রবণতা ঠিক কোন্ পথে?

এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী স্যার জুলিয়ান হাক্সলি ১৯৫৯ খ্রিঃ ডারউইনের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত চিকাগো বিজ্ঞান কংগ্রেসে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে। তিনি বলেছিলেন, *'ক্রমবিকাশ এখন শারীরিক বা আঙ্গিক স্তর থেকে মনস্তাত্ত্বিক বা মনোজাগতিক স্তরে উন্নীত হয়েছে।'* এই মনের বিস্তারকে জৈবতন্ত্রের পারে যেতে হবে এবং সমাজের অন্য সব মনঃস্তরের সঙ্গে প্রেম সম্বন্ধ গড়ে তুলতে হবে। এরই নাম প্রেম বা ভালবাসা। এটাই আবার করুণা। এটি হলো মানবতাবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়। এর ফলে তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে। এ এক আশ্চর্য ভাব। তাই বলা যায়, বর্তমান জীব বিজ্ঞান ধীরে ধীরে মানবিক শক্তিকে এক ইতিবাচক পথে চালিত করছে, কেবল নেতিবাচক দিকে নয়; আর তাই হলো বেদান্তের মূল ভাব। এই মানব সত্তাকে কীভাবে উচ্চতম সম্ভাবনার স্তরে উন্নীত করা যাবে, যে কাজের সামর্থ্য তার মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে। ভারতে আমরা যুগ যুগ আগে উপনিষদ্‌গুলিতে এর *মানবীয় সম্ভাবনা বিজ্ঞান* গড়ে তুলেছিলাম। আর স্যার জুলিয়ান হাক্সলিই এই মানবীয় সম্ভাবনা বিজ্ঞান কথাটি উদ্ভাবন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমাদের চাই চলতি ভৌত বিজ্ঞানের অতিরিক্ত একটি নতুন বিজ্ঞান, আর তিনিই এর নামকরণ করেন 'মানব-সম্ভাবনা বিজ্ঞান'। মানব সত্তাকে ক্রমবিকাশের ঐ উচ্চতম স্তরে নিয়ে যেতে হলে ঐ বিজ্ঞানের নির্দেশ অনুযায়ী চলা প্রয়োজন। যখন তুমি বেদান্ত পর্যালোচনা করবে, যখন তুমি *গীতা* পর্যালোচনা করবে, তখন দেখবে সেগুলিও ঠিক ঐ মানব-সম্ভাবনা বিজ্ঞান।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ধর, ঘৃণা। তুমি ঘৃণাকে অতিক্রম করতে পার। এ এক *মানব-সম্ভাবনা*। আবার ঘৃণাও এক মানব-সম্ভাবনা; আবার ঘৃণাকে নিয়ন্ত্রিত করাও

এক মানব-সম্ভাবনা। তেমনি কামনা, লোভ, এও এক মানব-সম্ভাবনা; তাকে নিয়ন্ত্রণ করা, তাকে উচ্চতর শক্তিতে রূপান্তরিত করা, তাও এক মানব-সম্ভাবনা। তাই বলি, বেদান্ত যুগ যুগ আগে এক মানব-সম্ভাবনা বিজ্ঞান গড়ে তুলেছিল। এই শ্লোক কয়টি ঐ বিজ্ঞানেরই উপাঙ্গ শাখা প্রশাখা।

ঐ বিজ্ঞানে সামাজিক অপরাধের মতো বিশেষ প্রশ্নের সম্বন্ধে কী বলা হয়েছে? অপরাধ কীভাবে লাঘব করা যাবে? আমাদের সকলের কাছে একটি উপায় আছে ঃ প্রহরীর সংখ্যা বাড়ান! সংসদে আইন-কানুন অনুমোদন করা। আমরা বরাবর এমনটিই করে থাকি। এখন আমরা বুঝেছি যে এর দ্বারা ফল লাভ একেবারেই সম্ভব নয়। আইন প্রয়োগ করে মানুষকে নীতিবান করা যায় না। এই মহান শিক্ষাটি আমাদের অর্জন করতে হবে। *মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি বলে একটা কিছু আছে।* শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হবে ঐ আধ্যাত্মিক উন্নতির উন্মেষ ঘটানোতে ও সমাজের অন্য লোকজনের সঙ্গে শান্তিতে বাস করতে পারে এমন সুরুচিসম্পন্ন নাগরিক হতে আমাদের সহায়তা করা। সংসদে অনুমোদিত আইনের মাধ্যমে ঐ নীতিবোধ আসে না। আসে শিক্ষা থেকে। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হলো, 'মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা আগে থেকেই রয়েছে তার বিকাশ ঘটান'। আমাদের উন্মেষ ঘটাতে হবে, আমাদের অন্তর্নিহিত ঐ সুন্দর সম্ভাবনাগুলির, যাতে শান্তিপ্রিয়তা, মানবিকতা, উৎসর্গ ও সেবার মনোভাব প্রভৃতি আমাদের অন্তর থেকে ফুটে ওঠে; তবে এ সম্ভব হয় যদি আমরা মানবের মন নামক অদ্ভুত বস্তুটিকে ঠিক মতো পরিচালিত করতে পারি। অতএব সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাই হলো মনের প্রশিক্ষণ, বহু তথ্য দিয়ে মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করে ফেলা নয়। মনের প্রশিক্ষণরূপে শিক্ষাব্যবস্থাকে গ্রহণ করা—জগতে কোথাও নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তথ্য দিয়ে মস্তিষ্ককে ভরিয়ে ফেলা হয়। সেদিক থেকে আমাদের দেশে, ভারতে, শিক্ষা ব্যবস্থা সব থেকে শোচনীয়। মহান কুশল আচার্য শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত, *গীতার* এই উপদেশাবলী, আজকাল আমাদের খুব বেশি দরকার। ভারতে মন-শিক্ষণের অভাব সব চেয়ে বেশি। সামান্য আত্ম-সংযম পালনে আমাদের দেশবাসীর চরিত্র বদলে যাবে।

স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের যেমন শিখিয়েছেন, এখন থেকে ভারতবাসীকে মনের প্রশিক্ষণের ওপর সব থেকে বেশি জোর দিতে হবে। তুমি মন্দিরে যাও। তুমি কি সেখানে মনকে শিক্ষিত করে তুলেছিলে? তুমি কি সেখানে মনের চঞ্চলতা দূর করে তাকে শান্ত ও একাগ্র করে তুলতে পেরেছিলে। এইভাবে

সমস্ত জীবন ধরে আমাদের মন-প্রশিক্ষণ চলতে থাকে। মন-প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হলে তুমি হবে মনের প্রভু, তা না হলে তুমি হবে তার দাস। তখনই তুমি অপরাধ কর, যখন তুমি তোমার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বা বাসনার দাস হয়ে গেছ। এই মনোপ্রশিক্ষণ বিষয়টি কেবল স্কুল কলেজের ছাত্রদের জন্যই নয়। প্রত্যেক দেশবাসীকে জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একলাই থাক আর কর্মক্ষেত্রে পাঁচজনের সঙ্গেই থাক এই কাজটি করে যেতে হবে ঃ মনকে শিক্ষা দেওয়া—যাতে কর্মদক্ষতা বাড়ে ও আত্ম-সংযম লাভ করা যায়। মন ও তার কাজকে বুঝতে আরম্ভ করলে, আমার মধ্যে যে কাম ও ক্রোধের শক্তি কাজ করে তার সংস্পর্শে আসা যায়। কোন শয়তান বাইরে থেকে এসে আমায় জ্বালাতন করে না। ঐ 'শয়তান' আমার নিজের মধ্যে রয়েছে। তাই আমাদের সাহিত্যে শয়তানের স্থান নেই। তুমি নিজেই তোমার অন্তরস্থ 'শয়তান'। তোমাকে অবশ্য এটিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে, চালিত করতে হবে। তাই মনোপ্রশিক্ষণ প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

বিবেকচূড়ামণি ১৮১তম শ্লোকে শঙ্করাচার্য বলেছেন ঃ *তন্মনঃশোধনং কার্যং প্রযত্নেন মুমুক্ষুণা,* 'যারা মুক্তি চাইবে, তাদের অবশ্যই বহুলায়াসে মনঃপ্রশিক্ষণে যত্নবান হতে হবে।' *বিশুদ্ধে সতি চৈতস্মিন্ মুক্তিঃ করফলায়তে,* 'মন শুদ্ধ হলে, *মুক্তি* বা স্বাতন্ত্র্য করতলে ফল প্রাপ্তির মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।' তুমি অনুভব করতে পার যে ঃ 'হাঁ, আমি মুক্ত, আমি মুক্ত'। কীভাবে? মন শিক্ষণ প্রাপ্ত হলে। সেই মন আবার শুদ্ধ। মুক্তি—যাতে আমার জন্মগত অধিকার, আমি তা আজ পেয়েছি। এতদিন আমি তা অনুভব করিনি। তাই, যে *রজঃ* ও *তমঃ* শক্তি মনকে *কাম* ও *ক্রোধে* প্ররোচিত করে তাকে *সত্ত্বে* রূপান্তরিত করতে হবে। তা আমাকেই করতে হবে। অন্য কেউ তা আমার জন্য করে দিতে পারে না। বার বছরের ছেলে বা মেয়েকে তার পিতামাতা উপদেশ দিতে পারেন, কিন্তু মনঃশিক্ষণের কাজ তাকে নিজেকে করতে হবে। একজন অন্যের মনকে শিক্ষা দিতে পারে না। তা বোঝান হয়েছে এই ইংরেজি বাক্যে ঃ তুমি ঘোড়াকে জলের ধারে নিয়ে যেতে পার, কিন্তু জল পান করতে হবে ঘোড়াকে—সে কাজে তুমি তাকে সাহায্য করতে পার না। তাই পিতামাতা শিশুদের অবশ্যই বলবেন, 'আমি সাহায্য করতে পারি কিন্তু তোমার মনকে শিক্ষা তোমাকেই দিতে হবে'। মনঃশিক্ষণ *সর্বক্ষণ* চলতে থাকে—কাজের সময়ের অবসর সময়ে, মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সময়ে—সর্বত্রই আমরা মনকে শিক্ষা দিয়ে থাকি, নীরবে, স্থিরভাবে, অবশ্য যদি একাজের *বিজ্ঞান* ও *কলাকৌশল* আমাদের জানা

থাকে, আর এর প্রয়োজন সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই। বর্তমানে এইটিরই অভাব। *আমরা এর প্রয়োজন বুঝি না*। অন্তরের স্বভাব দ্বারা পরিচালিত হয়ে আমরা হুড়োহুড়ি করে কাজে লেগে যাই; মন যা বলে, আমি তাই করি; আর মন অনুসরণ করে ইন্দ্রিয়ের নির্দেশ। মন তো ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে আছে। তাহলে মূল আদেশ আসছে ইন্দ্রিয়ের কাছ থেকে; এ এক অস্বাভাবিক অবস্থা, এর মোড় ঘুরিয়ে দিতে হবে; অবশ্যই মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ইন্দ্রিয়গুলিকে। কুকুরের মাথাই যেন লেজটিকে নাড়ায়, লেজটি যেন মাথাকে না নাড়ায়! ৪০তম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, মানবীয় তন্ত্রের ভেতরে কোথায় রয়েছে এই অশুভ শক্তির মূল। শত্রু *কোথায়?* শত্রুকে আক্রমণ করতে হলে তার অবস্থান কোথায় তা জানতে হবে। আসল কথাটি হলো এই যে, ঠিক যেমন সেনাপতি অঙ্গুলি সঙ্কেতে সেনার ওপর আদেশ দেন। 'যাও, ঐ দুর্গটি দখল কর, ওটি সুকৌশলে গঠিত ও অবস্থিত। এ কাজে সফল হলে তোমার যুদ্ধ জয় সুনিশ্চিত'। তেমনি শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ও তোমাকে-আমাকে বলছেন, এখানেই রয়েছে (শত্রুর) কেন্দ্র যেখান থেকে তারা কাজ করছে; ওখানেই তুমি শত্রুকে আক্রমণ করতে পার। ওই কেন্দ্রগুলি কী? ৪০ তম শ্লোকে সে বিষয়ে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০॥

—'ইন্দ্রিয়গুলি, মন এবং বুদ্ধি এর (কামের) আশ্রয়; এদের আশ্রয় করেই কাম দেহাভিমানী আত্মার বিবেকজ্ঞানকে আবৃত করে, তাকে ভ্রান্ত করে।'

ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি—মানব-ব্যক্তিত্বের এই তিনটি উপাদানকে কেন্দ্র করেই রোগের সংক্রমণ ঘটে। ঠিক যেমন চিকিৎসা বিজ্ঞানে আমরা রোগের উৎস-বিন্দুর খোঁজ করে থাকি, খোঁজ পেলেই আমরা সেখানে প্রতিষেধক ঔষধ প্রয়োগ করে রোগের বিষক্রিয়া দূর করে শরীরের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনি। তেমনি, দেহতন্ত্রের মধ্যে অপরাধ ও সমাজের ক্ষতিকারক অন্যান্য অশুভ বৃত্তির উৎস হলো জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি, মন ও বুদ্ধি। মানব-শরীর প্রাণবন্ত হয় ইন্দ্রিয়তন্ত্রের দ্বারা; কার্যত ইন্দ্রিয়তন্ত্রের পেছনে যে স্নায়ুতন্ত্র রয়েছে তার দ্বারা। এই হলো প্রথম সংক্রমণ-বিন্দু—যেখান থেকে সব রকম অশুভ বৃত্তি এসে থাকে। দ্বিতীয়টি হলো মন, *মনস্*। সাবধান হয়ে যত্ন না নিলে, কালে মনেও রোগের সংক্রমণ ঘটবে। শেষ সংক্রমণ বিন্দু হলো *বুদ্ধি*, বিবেক বুদ্ধি, যা ভাল-মন্দ বিচার করে। এই বুদ্ধি সংক্রামিত হলে বিচার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। এই বুদ্ধি পুরাপুরি

সংক্রামিত হলে, আমাদের জীবনকে ধ্বংস করে দেয়। আর সংক্রামিত না হলে, আমাদের রক্ষা করতেও পারে। অতএব মানব-ব্যক্তিত্বের মধ্যে থেকে এই তিনটি জায়গায় আমাদের শত্রুর অবস্থান খুঁজে বার করতে হবে। *এতৈঃ বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানম্ আবৃত্য দেহিনম্*, অশুভবৃত্তি, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি— মানবতন্ত্রের এই তিনটি কেন্দ্রবিন্দুকে মোহগ্রস্ত করে এবং দেহগত সত্তার *জ্ঞানকে* তথা আধ্যাত্মিক *জ্ঞানকে* আবৃত করে। *এতৈঃ বিমোহয়তি*, এগুলি মোহগ্রস্ত হয়; বিমোহিত না হলে, তোমার দ্বারা কোন অন্যায় কাজই অনুষ্ঠিত হতো না। যখন তোমার চিন্তা স্বচ্ছ থাকে, তখন তুমি কখনই কোন অন্যায় কাজ কর না। যখন তুমি কোন অন্যায় কাজ কর, জানবে যে তার পেছনে রয়েছে, মোহ। বাহ্যতম হলো *ইন্দ্রিয়*, অন্তরতম হলো *বুদ্ধি*, আর এই দুয়ের মধ্যে রয়েছে *মন*।

কঠ উপনিষদে যম নচিকেতাকে বলেছিলেন ঃ 'জীবন হলো পূর্ণ সাফল্যের দিকে যাত্রা, প্রত্যেকটি মানুষকেই এই যাত্রার জন্য উপযুক্ত সাজে সজ্জিত করা হয়েছে। ঐ যাত্রার জন্য কী কী প্রয়োজন? তোমার চাই একটি রথ, চাই ঘোড়াগুলি, তাদের তাড়না করতে লাগামও চাই; চাই একজন চালক। তবে তোমার যাত্রা শুভ হবে'। প্রকৃতি তোমাকে সব রকম সাজসজ্জা দিয়েছে। শরীর হলো রথ, ইন্দ্রিয়তন্ত্র হলো ঘোড়া, ঘোড়াতেই থাকে যাত্রায় এগিয়ে যাবার প্রেরণা—রথে নয়। তাই এখানে রয়েছে পূর্ণ শক্তিসম্পন্ন ইন্দ্রিয়তন্ত্র। তারপর, সেই ইন্দ্রিয়তন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে রয়েছে *মন*—ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে যেমন লাগাম ব্যবহার করা হয়। ঐ লাগাম ধরে থাকে রথ-চালক, সারথি; *বুদ্ধিই* হলো সেই সারথি। *বুদ্ধিম্ তু সারথিম্ বিদ্ধি*, '*বুদ্ধিকেই* রথের সারথি (চালক) বলে জানবে।'—এসব কথা যম সেখানে বলেছিলেন। যম সাবধান করে দিচ্ছেন যে, যদি এই যাত্রায় আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছুতে হয়, তবে আমাদের একটি বিশেষ জ্ঞান চাই ঃ ঐ যাত্রা যেন ইন্দ্রিয়তন্ত্র, তথা ঘোড়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়, লাগাম তথা মনের দ্বারাও নয়। ঐ যাত্রা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে *বুদ্ধি* অর্থাৎ চালকের তথা সারথির দ্বারা। এ সব শক্তিই নিয়ন্ত্রিত হয় ও নির্দেশিত হয় *বুদ্ধির* দ্বারা। কিন্তু এগুলির একটিও যদি রোগগ্রস্ত হয়, *বুদ্ধিও* রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে—তাহলে তুমি কখনই যাত্রা শেষ করতে পারবে না। পথে তোমার 'জাহাজ ডুবি' হবে, মহা বিপদ হবে। যম *কঠ উপনিষদে* এ কথাগুলি বলেছিলেন। এখানে এই ভাবটিকে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

এখানে রয়েছে মানব-তন্ত্রের এই সুন্দর সরঞ্জাম, স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্কসহ এই

ইন্দ্রিয়তন্ত্র। এটি মানব-দেহকে সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে সর্বাধিক কর্মচঞ্চল একটি কেন্দ্রে রূপায়িত করে। কী প্রচণ্ড শক্তিই না সেখানে কাজ করছে। কিন্তু এই শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। ঠিক পথে চালিত করে—উচ্চতর উদ্দেশ্যের দিকে নিয়ে যেতে হবে। এইখানেই তোমার স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত প্রয়াসের দরকার। তুমি যদি তা না কর, তবে এই শক্তিগুলি পরস্পরের পথে বাধা সৃষ্টি করে নষ্ট হয়ে যাবে। 'ক' নষ্ট করে 'খ'-এর কাজ, 'খ' নষ্ট করে 'ক'-এর কাজ, ফলে যে যেখানে আছে সেখানেই থেকে যায় অথবা নেমে যায়। অতএব তোমার অন্তরস্থ সমগ্র শক্তিতন্ত্রকে দক্ষতার সঙ্গে চালনা করা প্রয়োজন। যে শক্তি দক্ষতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত, সংযত ও চালিত হয় তার পরিমাণ ও গুণ দুইই উৎকর্ষ লাভ করে। ভৌতশক্তির ক্ষেত্রেও এরূপ দেখা যায়। সংযত শক্তি গুণে ও পরিমাণে উৎকৃষ্টতর। জলপ্রপাতে জলের প্রচণ্ড শক্তি দেখা যায় আর তা নষ্ট হয়ে যায়, বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু যখনই ঐ শক্তিকে সংযত করে, তা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়, এবং জলকে সেচ খাল দিয়ে প্রবাহিত করা হয়—তখনই তা থেকে যেমন বিদ্যুৎ পাওয়া যায়, তেমনি কৃষি উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, পঞ্চেন্দ্রিয় বিশিষ্ট মানবতন্ত্রটি এক বিশাল শক্তিকেন্দ্র, কিন্তু তা কোন *নির্দিষ্ট পথে চালিত নয়*। এখানেই আসছে *মনের* কাজ। সব শক্তিকে সংহত করার এবং পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে সমন্বিত করার প্রথম যন্ত্রটি হলো *মন*। এটি আবার যেন একটি ইন্দ্রিয়তন্ত্র বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়—তবে একটু বেশি সূক্ষ্ম। এর সামর্থ্য আছে, শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার, যেমন লাগামের সাহায্যে অশ্বশক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। অশ্ব খুব দুষ্ট হলে শক্ত লাগামের প্রয়োজন। যুবা বয়সে ইন্দ্রিয়গুলিকে গতিময় হতে দাও। কিন্তু তাকে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে দিও না; দিলে তা হবে অশ্বের পথ চলা, তোমার নয়। লাগাম দিয়ে অশ্বগুলিকে বাঁধ। কেবল তবেই তুমি ঐ শক্তিকে তোমার পছন্দ মতো অভিমুখে প্রয়োগ করতে পারবে। নচেৎ তা হবে অশ্বের পথ চলা, আর তুমি হবে এক অসহায় যাত্রী। *মনই* আমাদের সাহায্য করে ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে, আর *বুদ্ধি* এই সব শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত ও নির্দিষ্ট দিকে চালিত করে। তবে সুস্থ বুদ্ধি চাই, তাকে বিচারক্ষমও হতে হবে। তোমার যাত্রা পথে একজন মাতাল চালকের ওপর তুমি নির্ভর করতে পার না। তা হলে পথে তোমার অনিবার্য মৃত্যু। *বুদ্ধিকে* সম্পূর্ণ শান্ত ও স্থিতিশীল হতে হবে। তাই হলো শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ঃ *বুদ্ধিকে* সামঞ্জস্যপূর্ণ, বিচারক্ষম ও স্বচ্ছ চিন্তা করতে সমর্থ করে তোলার জন্যই শিক্ষা; তখনই জীবনে শ্রেষ্ঠ নির্দেশনা লাভ করা সম্ভব।

এই রকম বুদ্ধিই মানব জীবনের সব চেয়ে বেশি নিরাপদ নির্দেশক। শ্রীকৃষ্ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৯তম শ্লোকে আগেই বলেছেন ঃ *বুদ্ধৌ শরণম্ অন্বিচ্ছ*, 'সমত্ব *বুদ্ধির* আশ্রয় নিতে'। তা না হলে, আমাদের মধ্যে নিহিত শক্তিগুলি এদিকে ওদিকে ছুটে আমাদের নিজ জীবনকে তথা সমাজ জীবনকে ধ্বংস করবে। এর নমুনা দেখা যায় বর্তমান ভারতের তথা জগতের ক্রমবর্ধমান হিংসা ও অপরাধমূলক ঘটনার মধ্যে, কারণ এই ক্ষেত্রে এর প্রতিকারের জন্য আমরা বিশেষ কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করিনি। আবার হিংসা ও অপরাধমূলক কাজে যারা জড়িত তাদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত লোক। আমরা নিজ নিজ শক্তিকে সংযত করতেও চাই না। আমাদের অন্তর্নিহিত মনোভাব আমাদের আবেগ স্তরে, ইন্দ্রিয়ভোগের স্তরে থাকাকেই প্রশ্রয় দেয়, ঐ স্তরেই লাগামবিহীন, অসংযত, স্বাধীনতা চায়। এ হলো অধিকাংশ লোক বর্তমানে যে ভাব নিয়ে বেঁচে আছে, সেই জড়বাদী বস্তুতান্ত্রিক দর্শনের কুফল।

আমি ১৯৬৮-৬৯ খ্রিঃ যখন ১৮ মাসের সাংস্কৃতিক বক্তৃতা সফরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ছিলাম, তখন মানব-তন্ত্রের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সংযত রাখার প্রয়োজন সম্বন্ধে আমাকে বলতে হয়েছিল। আমি পোর্টল্যান্ড রেডিওর মাধ্যমে রাত্রি ১০টার সময় বলেছিলাম। কুড়ি মিনিটের অনুষ্ঠান সূচী আগে থেকে ঠিক করা থাকলেও তা দু-ঘণ্টা চলেছিল, কারণ বেতারঘোষক মিঃ ফেন্‌উইক প্রচলিত হিপি আন্দোলনের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হওয়ায় এই বিষয়টির ওপর বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। মানব সত্তার অন্তর্নিহিত শক্তি সংযত রাখার কথা আমি যখন উল্লেখ করেছিলাম, তখন ঐ ঘোষক বেতারের মাধ্যমেই চিৎকার করে ওঠেন, 'আমরা সংযম চাই না; আমরা চাই স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক জীবন'। আমি বলি, 'আপনারা পণ্ডিত রবিশঙ্করের গীতবাদ্যের প্রশংসা করছিলেন, কেমন স্বাভাবিক, কেমন স্বতঃস্ফূর্ত বলছিলেন। আপনি কি কখনো ভেবেছেন কত বছর নিয়মানুবর্তিতা অভ্যাসের পর রবিশঙ্কর এরকম একজন মহান সুরকার হতে পেরেছেন? আমরা কি সামান্য শৌচাদির ব্যাপারেও শিশুদের নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে আনার চেষ্টা করি না? আমরা গরু-ছাগলকে শৌচাদির ব্যাপারে নিয়মশৃঙ্খলা শিক্ষা দিই না।' আমার এই কথাগুলি শুনে খুব খুশি হয়ে তিনি বেতারেই চিৎকার করে ওঠেন ঃ 'ভারতের এই মহান পুরুষটির কথাগুলি সকলে শুনুন,' এবং আমাকে বললেন ঃ 'আপনি কি ক্লান্ত? ভাষণ কি আরো চালিয়ে যেতে পারেন? ইতোমধ্যে পূর্ব নির্ধারিত কুড়ি মিনিট পার হয়ে গেছে। আমি চালিয়ে যেতে সম্মত হলাম, ভাষণ মধ্যরাত পর্যন্ত

চলল। মিঃ ফেন্‌উইক ও তাঁর স্ত্রী ঠিক পরবর্তী রবিবার পোর্টল্যান্ড বেদান্ত সমিতিতে সর্বসাধারণের জন্য আয়োজিত আমার ভাষণ শুনতে এসেছিলেন।

বেদান্ত স্বীকার করে যে স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত জীবনই মানবের পক্ষে শ্রেষ্ঠ জীবন; কিন্তু কঠোর নিয়মানুবর্তিতা পালন ছাড়া ঐ জীবন লাভ করা যায় না। অন্যথায় তা কেবল স্বাভাবিক পশু জীবনই হয়, অন্য কিছু নয়। এই প্রসঙ্গে আমি তখন উদ্ধৃত করলাম শ্রীমদ্ভাগবতের এই (৩.৭. ১৭) শ্লোকটি ঃ

যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরং গতঃ।
তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ॥

—'দু-রকম লোকে জগতে সুখ (ও স্বতঃস্ফূর্ত জীবন) উপভোগ করে—যে একেবারে মূর্খ, আর যে বুদ্ধির পারে গেছে (ও আত্মোপলব্ধি করেছে); আর যারা সব এর মাঝামাঝি রয়েছে, তারা সংগ্রাম ও মানসিক ক্লেশের নানা স্তরে রয়েছে।

আমরা প্রথমে সংগ্রামের ভেতর দিয়ে চলে ইন্দ্রিয়তন্ত্রের শক্তিগুলিকে সংযত করি *মন* ও *বুদ্ধির* সাহায্যে। তারপর আমরা আসি দ্বিতীয় ধরনের স্বাভাবিকতাতে। তাই হলো প্রকৃত স্বাভাবিকতা, যেমন রমণ মহর্ষির স্বাভাবিকতা। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো সাধক ছিলেন স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। হিপি আন্দোলনের সময় মার্কিন যুবকও স্বাভাবিকতা লাভের জন্য আগ্রহী ছিল। মানসিক চাপ, নিয়মানুবর্তিতার কঠোরতা আর নয়। এ সব তারা চাইতো না। খুব ঠিক; কিন্তু যুবকরা যদি প্রকৃত স্বাভাবিকতা চায়, তবে তাদের আন্তর শক্তিকে সংযমনের মাধ্যমে জীবন পথে এগুতে হবে। এই নির্দেশনাটুকু না পেয়ে আমেরিকায় হিপি আন্দোলন ধীরে ধীরে অপরাধপ্রবণতা, মাদকাসক্তি ও নিছক কুঁড়েমিতে পর্যবসিত হয়েছিল এবং শেষে তা লোপ পেয়েছিল। ঐ আন্দোলন সম্বন্ধে আমেরিকার লোক আমাকে যা বলেছিল তা হলো ঃ 'আমরা এক "আবেগ-অভিব্যক্তি দর্শন" অনুসরণ করতে চাই'। তারা কোন আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায় না; তারা চায় আবেগ এলেই তাকে অভিব্যক্ত করতে। আমি বলেছিলাম, 'এই দর্শন অনুসরণ করলে কালে মানব সমাজ পশুর খোঁয়াড়ে পরিণত হবে।' সব আবেগই অভিব্যক্তির জন্য নয়; তোমাকে বিচার করতে হবে কোনটি অভিব্যক্তির যোগ্য আর কোনটি নয়। যখন তুমি সত্যিই 'আধ্যাত্মিকতায় দৃঢ়' হবে তখন তুমি সব আবেগকে অভিব্যক্ত করতে পার,

কারণ তখন সেগুলি নিম্নতর ইন্দ্রিয় স্তর বা বিষাক্ত স্তর থেকে নয়—মানবাত্মার গভীর প্রদেশ থেকে উৎসারিত হয় বলে—সদা শুদ্ধ হয়ে থাকে।

এই হলো সমাজে নাগরিকদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার ওপর শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর সুন্দর ভাবগুলির পটভূমিকা। সমাজে শান্তি না থাকলে, কীভাবে মানব জীবন উপভোগ করবে? আমি যদি না তোমাকে বিশ্বাস করি, তবে আমি কী উপায়ে মানবজীবন উপভোগ করবো? তুমিই বা কী উপায়ে জীবন উপভোগ করবে? উপায়টি হলো আমাদের অন্তর্নিহিত অসংস্কৃত শক্তিগুলির সংযমন ও নিয়ন্ত্রণ। সেগুলিকে সংস্কৃত করে, শোধিত করে, আরো কল্যাণকর শক্তিতে রূপায়িত কর। সমাজতন্ত্রে সমাজবদ্ধ করা বা সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলায় পরিচালিত করা অর্থাৎ সামাজিকীকরণ একটি বড় কথা, বড় কাজও বটে। মানব শিশুকে লোক ব্যবহার শেখাতে হবে, লোক সমাজে বাস করার উপযুক্ত হতে হবে—পরস্পরের মধ্যে প্রীতি শুভেচ্ছা জাগিয়ে তোলার সামর্থ্য নিয়ে। তা আসে এই অসংস্কৃত মানব-শক্তি-তন্ত্রে সংযমন থেকে। তা না করলে তোমার সমাজ ভরে উঠবে অপরাধী ও পরস্পর-বিরোধী বিকৃতমনস্ক লোকে। তেমন সমাজ কেউ চায় না। কিন্তু বর্তমানে সমাজ সেইদিকেই ভেসে চলেছে। এর গতিমুখে পরিবর্তন ঘটাতে হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক মানবজাতির কাছে এই শ্লোকগুলির মহত্তম তাৎপর্য রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ *এতৈঃ বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানম্ আবৃত্য দেহিনম্*, 'এই (অসংস্কৃত) শক্তিগুলি, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণে এনে *জ্ঞানকে* ঢেকে ফেলে আর আমরা মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ি।' এখানে আমাদের কাছে এই তিনটি ক্ষেত্রের কথাই বলা হয়েছে। পরবর্তী তিনটি শ্লোকে মানব মনের গভীর দেশের তত্ত্ব সম্বন্ধে সুমহান অন্তর্দৃষ্টির কথাই বলা হয়েছে। অন্য কোথাও মানব-তন্ত্র সম্বন্ধে এরূপ সুগভীর পর্যালোচনা এবং মানবের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে অগ্রগতি-সম্পন্ন জীবনের ওপর আলোকপাত—দেখা যায় না। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞান বিজ্ঞান নাশনম্ ॥ ৪১॥

—'অতএব, ভরতবংশজাত ঋষভতুল্য বীর, তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণে এনে, জ্ঞান ও বিজ্ঞান (উপলব্ধি)-নাশক এই পাপরূপ কামকে নাশ কর।'

'অতএব, হে অর্জুন, প্রথমে তোমার ইন্দ্রিয়-তন্ত্রকে সংযত কর।' এই দ্বার

দিয়েই সব রকম দোষের অনুপ্রবেশ ঘটে। চমৎকার ভাব! এই দোষ (রোগ-বীজ) কোথা থেকে এসে তোমার দেহে সংক্রামিত হয়েছে! তার সন্ধান তোমাকে করতেই হবে। চিকিৎসক এমন প্রশ্নই করবে। তাহলে, এই সংক্রমণের উৎসকে নিরুদ্ধ করতে চেষ্টা কর। অতএব, এখানে মানসিক দিক থেকে এই দোষ *বুদ্ধি* আসে না; আসে প্রথমে ইন্দ্রিয়তন্ত্র থেকে। অতএব ইন্দ্রিয়তন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ কর, তাদের শৃঙ্খলাপরায়ণ কর। *তস্মাৎ ত্বম্ ইন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য* 'তাই, প্রথমে তোমার ইন্দ্রিয় শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত ও সংযত কর'। *আদৌ,* মানে 'প্রথমে'। তারপর, *পাপ্মানম্ প্রজহি হ্যেনম্,* 'এই পাপ্মানম্, পাপীকে তোমার অন্তরস্থ অপরাধীকে পর্যুদস্ত কর'। আমি আমার ইন্দ্রিয়তন্ত্রের দ্বার দিয়ে কোন দোষের, রোগের বীজকে শরীরে প্রবেশ করতে দেব না; আমি তাদের নিয়ন্ত্রিত করব; আমি তাদের সংযত করব। যে অশুভ বস্তু বা রোগের বীজ ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে, তারা কী রকম বস্তু? *জ্ঞান-বিজ্ঞান নাশনম্* 'আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও বুদ্ধি নাশকারী'। তুমি যদি আগেই এ বিষয়ে যত্ন না নাও—তবে এ কর্কটরোগের মতো বৃদ্ধি পাবে। খুব কম সংখ্যক কর্কট কোষ শরীরে প্রবেশ করে বৃদ্ধি পেতে থাকে, শেষে আর আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা থাকে না। *প্রজহি,* 'জয় কর, (বশীভূত কর), এই হলো কথা। *এনম্,* 'এই' এইটিকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে, এটি এতই স্পষ্ট। এই ভৌত শরীর যেমন, এতে রোগ সংক্রমণ আছে ঃ ঐ রোগের বীজকে আমরা আলাদা করতে পারি, রক্তপরীক্ষা করতে পারি, মল-মূত্র পরীক্ষা করতে পারি এবং সংক্রমণের কেন্দ্রটিকে আবিষ্কার করে রোগের চিকিৎসা করতে পারি। মনস-তন্ত্রেও একই নিয়ম ঃ *এনম্,* 'এই' সুবিদিত অশুভ বস্তুটি সেখানে রয়েছে। তোমার সংজ্ঞা বা জ্ঞানেন্দ্রিয় তন্ত্র দূষিত বা রোগাক্রান্ত হয়েছে। যত্ন নাও। এখান থেকেই সব রকম অশুভ বৃত্তির সূচনা। এই সাবধানবাণী শ্রীকৃষ্ণ উচ্চারণ করছেন। এটি *জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশনম্, জ্ঞান* ও *বিজ্ঞান* (উপলব্ধি)কে বিনষ্ট করে দেয়।

এরপর আসছে মানব-ব্যক্তিত্বের গভীরতার মাত্রাগুলির একটি সুন্দর পর্যালোচনা। আমাদের অবশ্যই জানতে হবে এই মানবীয় ব্যষ্টিতন্ত্রের মাত্রাগুলি কী। এ বিষয়টি উপনিষদের এক বিস্ময়কর পর্যালোচনা, এখানে, গীতার এই অধ্যায়েরও। এখানে শ্লোক একটিই, কঠোপনিষদে তা দুটি হবে। কিন্তু একটিতেই মানব-ব্যক্তিত্বের মাত্রাগুলির সামগ্রিক বর্ণনার এক সুন্দর সার-সঙ্কলন নিহিত।

আমাদের দেহটাকেই ধর। গায়ের চামড়ারই কতগুলি স্তর রয়েছে। তার

নিচে প্রথমে দৃষ্টি পড়ে মাংসের ওপর। তারপর শিরা ও ধমনি। তারপরে রয়েছে স্নায়ু ও অস্থি-তন্ত্র। অস্থির মধ্যে রয়েছে মজ্জা। তাই দেখা যাচ্ছে এই ভৌত শরীরতন্ত্রেই কতগুলি স্তর রয়েছে ঃ একটির ভেতর আর একটি। তেমনি সমগ্র শরীর নিয়ে উপনিষদ্‌ এক পর্যালোচনা করেছিল। এ বিষয়ে এক বিশেষ পর্যালোচনা পাওয়া যায় *তৈত্তিরীয় উপনিষদে*—যার নাম দেওয়া হয়েছে কোষ-বিজ্ঞান, পঞ্চ-*কোষ* বিদ্যা। পাঁচটি *কোষ* আছে। *কোষ* মানে খাপ, তার ভেতর তলোয়ারটিকে রাখ। এইখানেই রয়েছে চিরশুদ্ধ, চিরমুক্ত, চিরপ্রবুদ্ধ—আত্মা। এই আত্মা পাঁচটি কোষে ঢাকা, কেবল একটি নয়। আরম্ভ হয়েছে শরীর, *অন্নময় কোষ* দিয়ে। তারপর *প্রাণময় কোষ, প্রাণ*, 'জীবনী শক্তি'; *মনোময় কোষ*, 'মনঃশক্তি'; তারপর, '*বুদ্ধি*', *বিজ্ঞানময় কোষ*। শেষে, 'আনন্দ', *আনন্দময় কোষ*। এই পাঁচটি কোষের ভেতরে ঢাকা রয়েছে তোমার আত্মা। এই সত্যটি জেনে রাখা ভাল।

তাই, এখানে আমরা এই পাঁচটি কোষের মধ্যে তিনটি উল্লেখ করছি। প্রথম, *ইন্দ্রিয়গুলি*, সংজ্ঞাতন্ত্র, জৈব-শক্তি-তন্ত্র। *ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ*, নিষ্প্রাণ জড় পদার্থ এই শরীরের তুলনায় খুবই উচ্চতর গুণে ভূষিত হলো ইন্দ্রিয়সমূহ; এই শরীরকে বাঁচিয়ে রাখে এই সংজ্ঞাবহ শক্তি। কাজেই তারা অবশ্যই শরীর যা বাহ্য জগতের উপাদান, জড় পদার্থের তুলনায় *পরা*, শ্রেয়স্কর। এখানে *পরা* কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ উচ্চতর, শ্রেয়স্কর। *ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরম্‌ মনঃ, মনস্‌* আবার ইন্দ্রিয়শক্তিতন্ত্র অপেক্ষা শ্রেয়স্কর। তারপর *মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ*, 'মনের থেকে শ্রেয়স্কর হলো *বুদ্ধি*। দেখছ কেমন ক্রম-বিন্যাস ঃ সাধারণ, উচ্চতর, উচ্চতম। তাই, এই তিনটি (কোষ) সম্বন্ধে এই কথাগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে বুদ্ধির পারে কী? *বুদ্ধির* পারে কেবল একটি সত্যই রয়েছে। সেটি কী? তা হলো আত্মা, অনন্ত পরমাত্মা। *যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ*, 'যিনি বুদ্ধির পারে, বুদ্ধির থেকে উচ্চতর তিনি হলেন লিঙ্গভেদরহিত (অলিঙ্গ) অনন্ত আত্মা তোমার প্রকৃত স্বরূপ, এই তিনটি খাপের ভেতর ঢাকা রয়েছেন।

এই বিষয়টি মানবের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, বিশেষত এই বৈজ্ঞানিক সভ্যতার বিস্ময়প্রদ যুগে। আমরা এই জগৎ সম্বন্ধে এত কিছু জানি, *সেখানকার* নানা জিনিস সম্বন্ধেও জানি, কিন্তু মানবের অন্তরে নিহিত বিষয়টি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না। এমনকি স্যার জুলিয়ান হাক্সলি পর্যন্ত বলেন, 'মনের পর্যালোচনা এই সবে আরম্ভ হয়েছে,' এদিকে বেদান্ত এই বিষয়টির গভীরে

প্রবেশ করেছে কয়েক হাজার বছর আগে। অতএব ভৌত বিজ্ঞানের মাধ্যমে আমরা পদার্থের বাহ্যদেশ থেকে গভীর প্রদেশ পর্যন্ত যে জ্ঞান অর্জন করেছি, তা চমৎকার; তাকে আমরা রক্ষা করব। কিন্তু সেই সঙ্গে তার পরিপূরক, পুষ্টিকারক ও শক্তিবর্ধক অন্য জ্ঞানও আমরা আহরণ করব : মানব-ব্যক্তিত্বের গভীরতার মাত্রাটি কী? সেই জ্ঞান আহরণে সফল হলে, আমরা এক চমৎকারী স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ সভ্যতা লাভ করব। এই জ্ঞান লাভ করলে সভ্যতার বর্তমান পরিমাণ-গত সূচকের স্থলে গুণগত সূচকই গৃহীত হবে। এবং সেই দিকেই চলেছে বর্তমান বিজ্ঞান, এমনকি সভ্যতার অগ্রগতির পথও। তাই বেদান্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে মানব জাতির কাছে এত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। বিষয়টির প্রভূত তাৎপর্য রয়েছে। পাশ্চাত্য দেশে আমি দেখেছি এই বিষয়টি সম্বন্ধে শুনতে ও বুঝতে অত্যন্ত আগ্রহী লোকগণ বক্তৃতা সভায় বসে রয়েছেন। 'আমরা এ বিষয়ে এত কম জানি। আমরা সে সম্বন্ধে আরো জানতে চাই।' জুলিয়ান হাক্সলি যা বলেছেন, তা সত্য। এতদিন আমরা বিষয়টির উপরিতলেই মাত্র একটু আঁচড় কেটেছি, সামান্যই অনুসন্ধান করেছি। কিন্তু আমার সামনে এমন একটি দর্শন রয়েছে, যা এর গভীর দেশে গেছে। ঐ দর্শনের অন্তর্দৃষ্টি ও প্রজ্ঞা বর্তমানে মানবজাতির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কারণ বিংশশতাব্দী ও পরবর্তী কালের সমস্যাগুলির সম্মুখীন হয়ে সেগুলিকে কাটিয়ে ওঠার পথ নির্দেশ এতে নিহিত আছে।

'স্নায়বিক শক্তিকে সংযত কর', *নিয়ম্য*। মূলগ্রন্থে 'দমন' বা 'ধ্বংসে'র কথা বলা হয়নি; বলা হয়েছে নিয়ন্ত্রণের কথা। *নিয়ম্য* মানে নিয়ন্ত্রণ করা। এটি না করলে তুমি তোমার চরিত্র, তোমার ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে পারবে না অথবা জীবনের সাফল্য অর্জনেও সক্ষম হবে না। পশুরা কখনো তাদের স্নায়ুতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ করে না। তাদের এক স্বাভাবিক সংযম পদ্ধতি আছে—যা তাদের জন্মগত কাঠামোতে নিহিত আছে। একমাত্র মানুষই পারে স্নায়বিক শক্তিগুলিকে সচেতনভাবে সংযত রাখতে। মন যখন রোগাক্রান্ত, তখন রোগের প্রতিকার দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, আরো দুঃসাধ্য হয় যখন *বিবেক*-বিচারের একমাত্র যন্ত্র, বুদ্ধিও আক্রান্ত হয়। তখন এই রোগের প্রতিকার করা আরো কঠিন হয়ে পড়ে। *বুদ্ধিস্তরে* কেবল বোধ-শক্তিই নয়, ইচ্ছাশক্তিও রয়েছে দেখা যায়। বোধশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির মিলিত ভাবই হলো *বুদ্ধি*। অতএব *বুদ্ধি-ই* শেষপর্যন্ত—যে রোগে সে আক্রান্ত হয়েছে তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়। তখন সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। এ কাজ প্রাথমিক স্তরে, সংজ্ঞা বা চেতনা স্তরে করা ভাল।

১৯৮৬ খ্রিঃ আমি যখন টোকিওতে ছিলাম, তারা আমাকে উপলক্ষ করে ভোজসভায় এক বক্তৃতার ব্যবস্থা করে। বিষয় ছিল, Children, Humanity's Greatest Asset—'শিশুরাই মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ'।[১] বক্তৃতাটি ভারতীয় বিদ্যাভবন (মুম্বাই) কর্তৃক প্রকাশিত হয়। আমাদের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হলো আমাদের সন্তান, বাড়ি নয়, ব্যাঙ্কে জমান টাকাও নয়—এগুলি সবই গৌণ। মৌলিক সম্পদ হলো আমাদের সন্তানগণ। তারা যদি সুস্থ থাকে, তাদের মতিগতি যদি সুসমঞ্জস হয়, তবে আমরা সুখী, তারা সুখী এবং জগৎ সুখী। তারা যদি বিপথগামী হয়, তবে সকলেই অসুখী। অতএব সন্তানদের স্বাস্থ্যরক্ষা আমাদের কর্তব্য—দৈহিক স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য দুই-ই। বর্তমানে বড়ই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের এবং ঐ স্বাস্থ্য রক্ষা করার। সমৃদ্ধ দেশে শিশুদের দৈহিক স্বাস্থ্য ভাল—তারা ভাল খায়, খাদ্যে তাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় সবটুকু ক্যালোরিই থাকে; কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে সব থেকে সমস্যা হলো তাদের ইন্দ্রিয় ও মনে রোগের সংক্রমণ; অল্প বয়সেই তাদের মানসিক বিকার আরম্ভ হয়।

আগে, আমি আমার পোর্টল্যান্ডে প্রদত্ত বেতার ভাষণের উল্লেখ করেছি। ঐ ভাষণে আলোচিত বিষয়ের পটভূমিকার কিঞ্চিৎ এখানে দিচ্ছি। আমেরিকার যুবসম্প্রদায় যে একটি বিশেষ জীবন-দর্শন অনুসরণ করে চলেছে তা লক্ষ্য করেছিলাম। তারা এটির নাম দিয়েছিল—*আবেগ-অভিব্যক্তি* দর্শন। মনে যে আবেগই উঠুক, শীঘ্রই তাকে অবাধে বেরিয়ে যেতে দাও। তাকে দমন করো না, নিয়ন্ত্রণও করো না। এই হলো আবেগ অভিব্যক্তি দর্শন; এরই বিপক্ষে আমি এই বেতার ভাষণে যুক্তি দেখিয়েছিলাম। আমেরিকার বেশ কিছু যুবক এই আবেগ অভিব্যক্তি দর্শন গ্রহণ করে। তাদের পিতামাতাও তা গ্রহণ করে। শিক্ষকগণ ও মনস্তাত্ত্বিকগণও তা গ্রহণ করে। তাঁরা তাঁদের সন্তানদের বলে থাকেন, যদি তুমি তোমার আবেগের স্বাধীন অভিব্যক্তি থেকে বঞ্চিত হও, তবে তোমার ব্যক্তিত্বের পক্ষে তা হবে বিপজ্জনক। তবে তুমি মানসিক বিপর্যয়ের শিকার হবে। মনঃপীড়া কথাটি ওখানে ব্যবহৃত হয়েছে। আবেগ দমন তোমার মনঃপীড়ার কারণ হবে। ক্রমাগত এরূপ মানসিক আঘাত শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর। আধুনিক সভ্যতার এ এক অদ্ভুত নতুন মতবাদ, এর বিপক্ষেই আমি যুক্তি দেখাতে চেষ্টা করছিলাম : হ্যাঁ কতকগুলি আবেগের ক্ষেত্রে বাধাহীনভাবে অবারিত করা সমীচীন হতে পারে, কিন্তু সব আবেগই সেরকম নয়; কতকগুলিকে দমন করাই উচিত। তোমার মানসিক পীড়া হয় কেন? অন্তরে

১ এই নামে বাংলায় উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়।

কিছু আধ্যাত্মিক দুর্বলতা থাকাই এর কারণ। আজকাল আমরা মানসিকভাবে বেশ দুর্বল। আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি নেই। সামান্য তিরস্কারেই মানুষ যায় আত্মহত্যা করতে। এই ধরনের দুর্বলতা আজকালকার মানুষদের মধ্যে এমনকি ভারতীয়দের মধ্যেও দেখা যায়। অতিমাত্রায় সংবেদনশীল; এটা হলো অন্তরের আধ্যাত্মিক দুর্বলতা। তাই কোন কোন আবেগকে দমন করা দরকার। তা না হলে তোমাকে মনুষ্য পদবাচ্য বলে গণ্য করা যাবে না। তুমি পশুসদৃশ হবে। ঐ আলোচনায় আমি এই ভাবটিই তুলে ধরেছিলাম। যিনি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন, তিনি খুব খুশি হলেন। তিনি এ সব কথা আগে শোনেন নি। তাই, আমি বললাম ঃ একটা আবেগ এল, আমাকে সেটা দমন করতে হবে, যাচাই করতে হবে। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয় তন্ত্রের সংযোগের ফলেই এর উৎপত্তি। আবেগ আসে। কিন্তু বিচার করে দেখ, বিচার করাটা একান্ত দরকার। তা না হলে মানব মনে আরো কদর্য বিকার উপস্থিত হতে পারে এবং পরবর্তী কালে তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। এই মনঃপীড়ার কিছুটা অবশ্যই তুমি সহ্য করতে পারবে। তুমি অবশ্যই সেই অন্তর্নিহিত শক্তির অধিকারী, মানবস্তরে যার প্রয়োজনীয়তার কথা তোমার জানা আছে। মানব জীবন এক সংগ্রাম, পশুজীবনে তো কোন সংগ্রাম নেই।

মানবসত্তায় প্রয়োজন ও স্বাধীনতা দুই-ই রয়েছে। আমরা কিছুটা প্রাকৃতিক নির্দেশনায় চালিত হই, আর কিছুটা স্বাধীনভাবে। সামান্য স্বাধীনতা পেলেই আমরা চঞ্চল হয়ে উঠি। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে মানবই হলো একমাত্র সত্তা যার মধ্যে এই চাঞ্চল্য দেখা যায় ঃ আমার অন্তর্নিহিত সামান্য স্বাধীনতাটুকু অভিব্যক্তি লাভের পথ খোঁজে। আর সব সময় কত কিছুই না আমাকে বাধা দিচ্ছে। তাই মানবের মধ্যে স্বাধীনতা ও প্রয়োজনীয়তার সহাবস্থান হেতু প্রকৃতির সমগ্র সৃষ্টিতে মানব এক অনন্যসাধারণ প্রাণিরূপে পরিগণিত। এই সামান্য স্বাধীনতাটুকুর সদ্ব্যবহার আমাদের দায়িত্বে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে; তা যেন ইন্দ্রিয়ের দাসত্বে পরিণত না হয়—সে অবস্থাকে একেবারেই স্বাধীনতা বলা যায় না। আমরা তো আগে পশুই ছিলাম। আমরা যখন মানব স্তরে উঠেছি, আমরা স্বাধীন হতে চাই, পশুর মতো কেবল ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় ইতিবাচক সাড়া দিয়ে নয়। আমাদের বলা হয়েছে ইন্দ্রিয়-শক্তিকে সংযত করতে, এ ছাড়া কোন উচ্চতর উন্নতি সম্ভব নয়। কেবল মানবসত্তার দ্বারাই ঐ উচ্চতর উন্নতি সম্ভব ঃ তাই এই ৪১তম শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ *তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ*, 'তাই, হে অর্জুন, তুমি তোমার ইন্দ্রিয়-তন্ত্রকে আগে সংযত কর', তা হলে

ভবিষ্যতে যে সব অশুভ ব্যাপার উদ্ভূত হবে, তুমি তাদের অতিক্রম করতে পারবে। তবেই তুমি ঐ সংক্রমণ থেকে মুক্ত হবে, অন্যথায় ওগুলি তোমার *জ্ঞান* ও *বিজ্ঞানকে* নষ্ট করে দেবে', *জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশনম্‌*।

অপরাধ ও অপরাধমূলক ব্যবহারের যেকোন পর্যালোচনায় উল্লিখিত সত্যগুলির ক্রিয়া স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। আমি যখন অপরাধ করি, তার পেছনে আমার ইন্দ্রিয়তন্ত্রে অনেকগুলি পরিবর্তন ঘটে থাকে। সেইগুলিই এই অধ্যায়ে আলোচিত হচ্ছে। এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ হলো ঃ প্রথমে ইন্দ্রিয়-তন্ত্রটির সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যবস্থা কর। মানুষ হিসাবে, তুমি যদি চরিত্র গঠন করতে চাও, তুমি যদি তোমার উচ্চতর সম্ভাবনাগুলিকে বাস্তবায়িত করতে চাও, তবে তোমাকে অবশ্যই ইন্দ্রিয়নামক প্রচণ্ড শক্তি-তন্ত্রকে সংযত করতে হবে। এ যেন নিরাপদ যাত্রার জন্য অশ্বগুলিকে লাগামের মধ্যে রাখা। তখন কী হয়? যখন ইন্দ্রিয়তন্ত্র সংক্রমণ মুক্ত থাকে, তখন মন সুস্থ থাকে, *বুদ্ধিও* সুস্থ থাকে। তোমার মানবিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চেষ্টা ফলবতী হয়। লক্ষ্য হলো মানবিক শ্রেষ্ঠত্ব। প্রগাঢ় সম্ভাবনা সকল আমাদের অন্তরে সমাচ্ছন্ন হয়ে আছে। ঐ আবরণ আমাদের উন্মোচন করতে হবে। এর জন্য আমাদের যা করণীয় তা হলো ইন্দ্রিয়তন্ত্রের প্রাথমিক নিয়মানুবর্তিতা বা সংযমন।

এবার আমরা ৪২তম শ্লোকটি ধরবো। এ এক চমৎকার শ্লোক। এতে মানবের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে একটা ধারণা তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের এক একজনকে এক একটি সহজ সরল ব্যক্তিরূপে আমরা দেখে থাকি; কিন্তু আমরা তা নই! তাতে অনেকগুলি স্তর রয়েছে। গাত্রত্বকের যেমন অনেক স্তর থাকে। আমরা একটি ত্বকই দেখতে পাই, কিন্তু একজন শারীরসংস্থানবিৎ (anatomist) ঐ ত্বকের নানা স্তর দেখে থাকেন ঃ

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২॥

—'স্থূল দেহ থেকে ইন্দ্রিয়গুলি শ্রেষ্ঠ; ইন্দ্রিয় থেকে মন শ্রেষ্ঠ; মনের থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; এবং বুদ্ধির থেকেও শ্রেষ্ঠ হলেন তিনি (যিনি নিত্য-মুক্ত আত্মা)।'

তৈত্তিরীয় উপনিষদের অন্তর্গত মানবিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিবিধ স্তর-বিষয়ে পূর্বোল্লিখিত বিশেষ পর্যালোচনার সামগ্রিক তত্ত্বটি গীতার এই একটি সরল শ্লোকের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

এই স্তরগুলি উল্লেখ করার সময় সর্বস্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য *পরা* কথাটি বার বার এসেছে। সব সময়েই *পরা* মানে উন্নততর, বৃহত্তর, উৎকৃষ্টতর, উচ্চতর। সুতরাং *ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ* 'বলা হয় ইন্দ্রিয়গুলি শ্রেষ্ঠ'। *ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ,* '*মনঃ* সংজ্ঞা বা চেতনাতন্ত্রের ওপরে, মনের প্রয়োজন ইন্দ্রিয়তন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মানুগ করার জন্য; তার মূল্য নিশ্চয়ই উচ্চতর ও উন্নততর। *মনসস্তু পরাবুদ্ধিঃ, বুদ্ধি* মন অপেক্ষা উন্নততর, কারণ মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যই বুদ্ধি। বুদ্ধির পারে কী? *যো বুদ্ধেঃ পরতঃ তু সঃ*। বুদ্ধির থেকে উন্নততর যিনি, তিনি হলেন সেই (আত্মা)। *সঃ* কথাটির আক্ষরিক অর্থ হলো 'সে' (লিঙ্গবোধে নয়)।

শঙ্করাচার্য বৃহদারণ্যক উপনিষদের (১.৪.৭) ভাষ্যে বলেছেন, অনন্ত অদ্বৈত, শুদ্ধ চৈতন্যের স্বরূপকে, চরম সত্যকে, নাম দিয়ে, এমনকি আত্মা বা ব্রহ্ম শব্দ দিয়ে, সীমিত করা যায় না।

বুদ্ধির ঠিক পেছনে রয়েছেন আত্মা। আত্মা বা ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই সত্য বেদান্তে নানাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। *ওঁ তৎ সৎ,* 'ওঁ সেই সত্য'। তেমনি আবার *তৎ ত্বম্ অসি,* 'তুমিই সেই'। এই সত্যের বিশেষ লক্ষণ হলো ঃ ইনি নিত্যশুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, নিত্যবুদ্ধ। এই হলো বেদান্তের চরম শিক্ষা। আত্মা অপাপবিদ্ধ—কোন পাপের দ্বারা ইনি প্রভাবিত হন না। কোন রোগ আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না। সেই জন্য একে বলা হয় নিত্যমুক্ত। কেবল বেদান্তে ও সুফি, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু প্রভৃতি জগতের সব ধর্মের মরমিয়া সাধনার উপদেশে এই শিক্ষা পাওয়া যায়। মরমি সাধকগণ এই সত্য উপলব্ধি করে থাকেন এবং সর্বদা বলেন, যে মানবের অন্তরাত্মা নিত্যশুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, নিত্যবুদ্ধ। ব্যাধি বা বাধা সমূহ আসে নিম্নস্তর থেকে। তারা ঐ উচ্চস্তরে পৌছয় না। এটিই হলো মানবের কাছে এক নিগূঢ় সত্য এবং পরম অনুপ্রেরণাদায়ী সত্য। যদি সবই মলিন হয়, তবে ময়লা সরান যাবে কিরূপে? মনে কর তোমার চারিদিকে প্রচুর ময়লা জমে রয়েছে, ময়লা ধোবার জন্য তুমি জল নিয়ে এলে; সে জলেও ময়লা। তা হলে ময়লা পরিষ্কার করা যাবে কী করে? ময়লা পরিষ্কার করতে পরিষ্কার জল চাই। তাই বৈদান্তিক চিন্তায়, অন্তর্মুখীন হয়ে সর্বান্তরাত্মার গভীরে অনুপ্রবেশ করে ঋষিরা দেহ-মন-বুদ্ধি সংঘাতের পারে অবস্থিত শুদ্ধ, অনন্ত আত্মাকে আবিষ্কার করেছিলেন।

শঙ্করাচার্য তাঁর ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে এঁকে *নিত্যশুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, নিত্যবুদ্ধ স্বভাব পরমাত্মন্* বলে উল্লেখ করেছেন। দেহ-মন-সংঘাতের সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ আত্মাই

হলেন অহঙ্কার বা আমিত্ব; এই আমিত্বই কেবল অপরাধ, পাপাদি অশুভ মনোবৃত্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়। আমাদের মধ্যে দু-রকম মাত্রাই রয়েছে। একটি প্রভাবিত হয় সুখ-দুঃখ অপরাধাদির দ্বারা—এরই নাম ছোট আমি, যা প্রজনন-তন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অন্যটি হলো, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, নিত্যবুদ্ধ আত্মা। কি সুন্দরভাবেই না এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যাপারটিকে উপনিষদে (মুণ্ডক, ৩.১.২) একই বৃক্ষে দুটি পাখির দৃষ্টান্ত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে;
তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বদ্বত্তি
অনশ্নন্ অন্যো অভিচাকশীতি॥

—'একই গাছে দুটি সুন্দর পাখি আছে, তারা নিবিড় সখ্য-বন্ধনে আবদ্ধ ও সুন্দর পালকযুক্ত। একটি পাখি গাছের ফল আস্বাদন করে বেড়ায় আর অন্যটি কোন ফল না খেয়ে কেবল স্ব-গরিমায় (অভিভূত হয়ে) বসে থাকে।'

এরা হলো একই দেহবৃক্ষে অবস্থিত জীব বা ব্যষ্টি আত্মা এবং পরমাত্মা। প্রথম পাখিটি অর্থাৎ *জীব*, সুখ-দুঃখ ভোগ করে, অপরাধ করে, সৎকর্ম ইত্যাদি করে। আমরা মনে করি যে আমরা ঐ জীবই বটে, কিন্তু আমাদের প্রকৃত স্বরূপ হলো অন্য পাখিটির মতো। অতএব নিম্নতর সত্তাকে শিক্ষা দেওয়া হলো—'তোমার স্বরূপ হলো অপর পাখিটির মতো।' তুমি এরূপ, কারণ তুমি দেহ-মন সংঘাতে আবদ্ধ হয়ে আছ। তাই বেদান্ত থেকে জানা যায় যে মানব-সম্ভাবনা-বিজ্ঞানের গভীর দেশে অনুসন্ধান চালিয়ে ঋষিরা তাঁদের *প্রবুদ্ধ* মনে উপলব্ধি করেছিলেন এই সত্যটি ঃ *মুক্তির সম্ভাবনা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে*; এই হলো বেদান্তের শিক্ষা। তাই আমরা কখনো কোন মানব সত্তাকে পাপী বলি না। বৈদান্তিক শিক্ষায়—মানব সত্তা পাপী—এভাবটি তুমি কোথাও পাবে না। নিঃসন্দেহে মানুষ পাপাচরণ করতে পারে। কিন্তু সে পাপী নয়। কারণ আপন প্রকৃত স্বরূপ না জেনে কেউ পাপাচরণ করতে পারে, কিন্তু আমাদের উদ্ধার প্রাপ্তিযোগও আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে নিহিত রয়েছে। সেই কথাই এবার শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে বলবেন।

স্বামী বিবেকানন্দ এই মহান সত্যের কথাই উল্লেখ করেছিলেন ১৮৯৩ খ্রিঃ চিকাগোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে[১] ঃ

১ বাণী ও রচনা, ১ম সং, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮-১৯

'প্রচণ্ড বায়ুমুখে ক্ষুদ্র নৌকা যেমন একবার ফেনিল তরঙ্গের মাথায় উঠছে পরক্ষণেই তরঙ্গ-গহ্বরে হাঁ-মুখে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। সেইরূপ আত্মাও কি সদসৎ কর্মের একান্ত বশবর্তী হয়ে ক্রমাগত একবার উঠছে ও একবার পড়ছে? আত্মা কি নিত্যপ্রবাহিত প্রচণ্ড গর্জনশীল অদম্য কার্যকারণ-স্রোতে দুর্বল অসহায় অবস্থায় ইতস্তত বিতাড়িত হচ্ছে? ... এ কথা ভাবলে মন দমে যায়, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মই এই। তবে কি কোন আশা নেই? পরিত্রাণের কি কোন পথ নেই? মানবের হতাশ হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে এরূপ ক্রন্দনধ্বনি উঠতে লাগল, করুণাময়ের সিংহাসনের কাছে ঐ ধ্বনি পৌছল, সেখান থেকে আশা ও সান্ত্বনার বাণী নেমে এসে এক বৈদিক ঋষির হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করল। বিশ্বের সামনে দাঁড়িয়ে ঋষি উচ্চৈঃস্বরে জগতে এই আনন্দ-সমাচার ঘোষণা করলেন ঃ

'শোন শোন অমৃতের পুত্রগণ! শোন দিব্যলোকের অধিবাসিগণ! আমি সেই পুরাতন মহান পুরুষকে জেনেছি। আদিত্যের মতো তার বর্ণ, তিনি সকল অজ্ঞান-অন্ধকারের পারে; তাঁকে জানলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, আর অন্য পথ নেই।

' ''অমৃতের পুত্র'' কি মধুর ও আশার নাম! হে ভ্রাতৃগণ, এই মধুর নামে আমি তোমাদের সম্বোধন করতে চাই—তোমরা অমৃতের অধিকারী—হিন্দুগণ তোমাদের পাপী বলতে চায় না। তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী—পবিত্র ও পূর্ণ। মর্তভূমির দেবতা তোমরা! তোমরা পাপী? মানুষকে পাপী বলাই এক মহাপাপ; মানবের যথার্থ স্বরূপের ওপর এটি মিথ্যা কলঙ্কারোপ। ওঠ, এস, সিংহস্বরূপ হয়ে তোমরা নিজেদের মেষতুল্য মনে করছ, এ ভ্রমজ্ঞান দূর করে দাও। তোমরা অমর আত্মা, মুক্ত আত্মা—চির-আনন্দময়। তোমরা জড় নও, তোমরা দেহ নও; জড় তোমাদের দাস, তোমরা জড়ের দাস নও।'

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ঋষি গ্রীসদেশীয় আর্কমেডিসের মতো বলতে পেরে ছিলেন, 'ইউরেকা! ইউরেকা!' অর্থাৎ পেয়েছি, পেয়েছি! 'আমি এক চমৎকার সত্য আবিষ্কার করেছি'। আর আমেরিকাবাসী শ্রোতাদের কাছে ঐ শ্লোকটির পূর্বোল্লিখিত অর্থ যখন স্বামী বিবেকানন্দের মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছিল, তখন তিনি ঐ বিরাট আবিষ্কারের শক্তি ঐ জনগোষ্ঠীর সামনে এনে ফেললেন। 'শোন, শোন', *শৃণ্বন্তু! বিশ্বে* মানে 'জগতের', সর্বত্র। ঋষি তাঁর দিক থেকে জগৎবাসীকে আহ্বান করে বললেন ঃ *অমৃতস্য পুত্রাঃ,* 'অমৃতের সন্তানগণ'! হে! অমৃতের সন্তানগণ! আমার কথা শোন, তোমাদের বলার জন্য সুসমাচার রয়েছে আমার

কাছে। শুধু তাই নয়, সর্বব্যাপক উপলব্ধিজনিত দুঃসাহস দেখ ঋষির; তিনি তাঁর সমাচার পাঠাচ্ছেন 'স্বর্গের দেবতাদের ও দেবদূতদের কাছেও, স্বর্গের অস্তিত্ব অনুমান করে', *আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ*। সে সমাচারটি কী? তা কি কোন গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত, অথবা উর্বর কল্পনাশক্তি প্রসূত? না! *বেদ অহম্ এতম্*, 'আমি *জেনেছি* এই সত্যকে?' আমি একে উপলব্ধি করেছি, এই সত্যের অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। এই *বেদাহমেতম্* ভাবটিই একটি চমৎকার সত্য যা থেকে পরবর্তী কালে ভারতে নানা ধর্মীয় বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু বর্তমান কালে এগুলি আমাদের বোধগম্য হয় না; আমরা ধর্মকে এক দিশাহীন পত্রের মতো করে ফেলেছি। এ ধর্ম 'আমি বিশ্বাস করি' এমতো নয়; পরন্তু 'আমি উপলব্ধি করেছি' এই মতো। এ বিষয়ে আমি অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। পরে তিনি বলবেন : 'তুমিও উপলব্ধি করতে পার।' সেটি কী বস্তু? *পুরুষম্ মহান্তম্*, 'সীমাবদ্ধ পুরুষের পারে, অসীম পুরুষ'। *অল্প* ও *মহা*, এদুটি সংস্কৃত শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র আর বৃহৎ। অহং বা আমি হলো *অল্প*, আর *আত্মা* হলো *মহা*। যখন আমরা *অল্প*, তখন আমাদের অপরাধ প্রবণতা থাকে; যখন আমরা *মহা*, তখন সেরকম কিছু হতে পারে না। সব রকম অপরাধ, কর্তব্যপালনে সব রকম ত্রুটি, আসে অল্পভাবাপন্ন অহং থেকে, নিজ মহান বা বিরাট স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞানতা থেকে। গান্ধীজীকে *মহাত্মা* বলা হতো; প্রত্যেকেই *মহাত্মা* হতে পারে। সেটা আমাদের জন্মগত অধিকার। তাই ঋষি বলেছেন : 'আমি সীমিত অহং-এর পারে অবস্থিত অসীম আত্মাকে উপলব্ধি করেছি', *বেদাহমেতম্ পুরুষম্ মহান্তম্*। *আদিত্যবর্ণং* 'সূর্যের মতো দ্যুতিমান বা সমুজ্জ্বল', *তমসঃপরস্তাৎ*, 'সব অন্ধকার ও ভ্রান্তির পারে'। এই সত্যকে আমি উপলব্ধি করেছি। কিন্তু সে সময়ে তিনি বলেন নি, 'উদ্ধার পাবার জন্য, কেবল আমাকে বিশ্বাস করলেই হলো।' তিনি বলেছিলেন : *তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি*, 'তুমিও অমৃতত্ব লাভ করার জন্য', এই সত্যকে উপলব্ধি কর, কারণ এ তোমার জন্মগত অধিকার। এ সত্য লাভের জন্য তোমাকে অন্য কারোর কাছে ভিক্ষা করতে বা ধার করতে হবে না।

উপনিষদে মানবের মহত্ত্ব ও গৌরব খ্যাপনকারী যে সব মৌলিক উক্তি রয়েছে, তেমনটি বিশ্ব-সাহিত্যে কোথাও পাওয়া যায় না। এগুলি এমনই দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা হয়েছে যে, তা শ্রোতার মনেও দৃঢ় প্রত্যয় জাগিয়ে তোলে। এই কথার পর ঋষি আরো বললেন : *নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়*, 'এছাড়া আর অন্য পথ নেই, মুক্তির জন্য আর অন্য কোন পথ নেই'। ভাষাটি লক্ষণীয় : *নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে*, 'অন্য কোন পথ নেই।' এই সত্যের সামান্য উপলব্ধি হলেও

এর চকিত দর্শন লাভেও তোমার জীবন পাল্টে যাবে। আজ আমি এক অপরাধপ্রবণ ব্যক্তি। কোন না কোন লোকের মাধ্যমে এই সত্যের সামান্য দর্শন পেলেও আমার জীবন মানব হিতে সেবা-প্রবণতায় প্রভাবিত এক সৎব্যক্তিতে পরিণত হয়ে যাবে।

প্রায় পাঁচ শত বছর আগে কর্ণাটক প্রদেশে এক কৃপণ মণি-মুক্তা ব্যবসায়ী ছিল। পরবর্তী কালে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন পুরন্দর দাস, 'পণ্ডারপুরের ভগবান বিষ্ণুর দাস' নামে। সে কাউকে তার প্রয়োজনে টাকা দিয়ে সাহায্য করতো না। দিব্য স্পর্শে সেই লোকটি একেবারে পাল্টে গেল। সে তার চারপাশের লোকেদের ডেকে, তার সমস্ত সঞ্চিত সম্পদ ও অলঙ্কারাদি বিতরণ করে দিল এবং ছোট একটি পুঁটলি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল *দাসের* মতো, ঈশ্বরের দাস, মানুষের দাসের মতো, আনন্দের সঙ্গে দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ দিব্য সঙ্গীত গাইতে গাইতে—মানবজাতিকে জাগাবার উদ্দেশ্যে। সেই পুরন্দর দাস এখনো মানুষের মনে প্রেরণা জাগায়। তার কী ঘটেছিল? সে নিজের অন্তরে এক বহুমূল্য মুক্তার সন্ধান পেয়েছিল; সংসারের এই সব জিনিস তার কাছে অর্থহীন হয়ে গিয়েছিল; এই বার্তাটুকুই সে অসাধারণ ও সাধারণ সব রকম মানুষের কাছে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল এমনই সুন্দর কন্নড় ভাষায় গাওয়া উচ্চগ্রামের সঙ্গীতের মাধ্যমে। পুরন্দর দাস ছিল, এমনই শত শত লোকের মধ্যে একজন। এতেই এ যুগের সভ্যতা সুস্থ ও সুস্থির হবে।

বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ, যিশুর জীবনে আমরা দেখেছি—কীভাবে ঐ মহাত্মাদের একটু স্পর্শে, একটি কথায়, এক ঝলক দৃষ্টিতে পাপী হয়ে গেছে সাধু; এর ফলে ঐ সব লোকের মধ্যে ঐ দৈবী মাত্রা জেগে ওঠে। 'যাও আর পাপ করো না' এই কথা যিশু বলাতেই পাপীটি এক সাধুতে পরিণত হয়েছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল, কারণ আমরা *মূলত নিষ্পাপ*। আমরা যদি বাস্তবে পাপী হই, তবে কেউই আমাদের পরিবর্তন সাধন করতে পারবে না। কোন বস্তুই তার মৌলিক চরিত্রকে পরিবর্তিত করতে পারে না। *স্বভাবম্ ন জহাতি সা*, 'কোন বিষয় তার মৌলিক চরিত্র বা গুণ ত্যাগ করতে পারে না।' তবে যদি তা বাহ্যরূপ হয়, যার পেছনে তার প্রকৃত গুণ ঢাকা রয়েছে, তা হলে তার পরিবর্তন হতে পারে। বিষয়টি তার স্বরূপে ফিরে আসতে পারে। আগুন কখনো তার তাপ ত্যাগ করতে পারে না। জল কখনো তার আর্দ্রতা ত্যাগ করতে পারে না। এই হলো তাদের স্বভাব, *প্রকৃতি*। তাই শঙ্করাচার্য *স্বভাবং ন জহাতি সা* বাক্যটির উল্লেখ করেছেন।

কোন বিষয়ই তার প্রকৃত স্বরূপ ত্যাগ করতে পারে না। সাময়িকভাবে মনে হয় সে যেন ত্যাগ করে থাকে। এক টুকরো লোহা স্পর্শ করলে ঠাণ্ডা বোধ হয়। এটিকে আগুনে দাও, গন্‌গনে লাল হয়ে ওঠে; বার করে রাখ—ওটি আবার আগের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

বেদান্ত সমগ্র মানব জাতির সম্বন্ধে এক মহান সত্যের কথা ঘোষণা করেছে। তাই বর্তমান জগৎ উৎসুক হয়ে আছে সেই সত্যটি জানার ও তদনুযায়ী জীবনযাপন করার জন্য। ঐ সত্য ঠিক ভৌত বিজ্ঞানের সত্যের মতোই; তাঁরা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য এক ঘোষণার প্রবর্তন করেছেন। আর সমগ্র জগৎ ভৌতবিজ্ঞানের পেছনে ছুটছে; এটি তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। সত্য সর্বদাই সর্বজনীন, সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে থাকে। কোন বিষয়ে অভিমত এবং সাম্প্রদায়িক মত কেবল সীমিত ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এখানে এক গূঢ় সত্য উল্লেখ করা হয়েছে : *শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ*, 'শোন আমার কথা, হে অমৃতের সন্তানগণ!' প্রত্যেকটি শিশুই অমৃতের সন্তান। বিবেকানন্দ বলেছেন : এই কল্যাণকর ভাবগুলি ছোট থাকতে থাকতেই শিশুদের কাছে পৌঁছে দাও। রানী মদালসার মতো, যার কথা আমাদের অধ্যাত্ম সাহিত্যে রয়েছে। যখনই তাঁর একটি শিশু জন্মাত, রানী তাকে দোলনায় শুইয়ে দোল দিতে দিতে গাইতেন : *নিত্যোঽসি, শুদ্ধোঽসি, নিরঞ্জনোঽসি, সংসার মায়ামল বর্জিতোঽসি,* 'শিশুটি আমার, কেন কাঁদছ? তুমি সেই শুদ্ধ, চিরমুক্ত, *সংসার*-কালিমা মুক্ত।' এইভাবেই মদালসা শিশুদের শিক্ষা দিতেন। স্বামীজীও এ পদ্ধতির উচ্চ প্রশংসা করতেন[১]—তুমি শিশুকে ব্যক্তি হিসাবে মান্য দাও; আরো কিছু গূঢ় মাত্রাও এর অন্তরে রয়েছে, আর গূঢ়তম মাত্রা হলো এই সত্য, *অমৃতস্য পুত্রাঃ*। এতে রয়েছে শিক্ষা ও ধর্ম দুইই, কারণ এখানে ধর্মকে শিক্ষার প্রসার হিসাবে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। যাকে বলা যেতে পারে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের স্তর থেকে অতীন্দ্রিয় স্তর পর্যন্ত—সর্ব স্তরের—অভিজ্ঞতা।

এই কথাকে ভিত্তি করেই বলা হয়েছে গীতার এই ৪২-সংখ্যক বিশেষ শ্লোকটি, যথা : *ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ, মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ।* *বুদ্ধির* ঠিক ওপরে ও পিছনে রয়েছেন আত্মা, তোমার নিজ অসীম আত্মা। তাই, শঙ্করাচার্য বলেন, *বুদ্ধি* হলো *নেদিষ্ঠং ব্রহ্ম* 'ব্রহ্মের বা আত্মার নিকটতম।' কেবল একবার পিছু ফিরে তাকাও, অমনি ব্রহ্ম নয়নগোচর হবেন। কিন্তু এই পিছন ফিরে তাকাতে যুগ যুগ তপস্যার দরকার

১ বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৪-১৩৫

হয়; এ কাজ সহজ নয়; তাই এসব শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু এই সব শিক্ষা থেকে যে একটি সত্য প্রতিভাত হয়, তা হলো ঃ শরীর-তন্ত্রের যে কোন অঙ্গই দোষদুষ্ট হোক না কেন, সেখানে এমন একটি মাত্রা আছে যা এই রকম সব দোষ থেকে চিরমুক্তই থাকে। তা হলো তোমার স্বীয় সত্য আত্মা। অন্যথায়, পাপীদের কোন আশাই থাকতো না। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন একটি ভাষণে বলেছিলেন ঃ 'প্রত্যেকটি পাপীরই একটি ভবিষ্যৎ আছে, প্রত্যেকটি সাধুর যেমন একটি অতীত থাকে।' মানবজাতির সম্বন্ধে সেই সত্যটি সব থেকে স্বচ্ছ ও সব থেকে যুক্তিযুক্ত ভাষায় বোঝানো হয়েছে কেবল একটি সাহিত্যে—উপনিষদে। পৃথিবীর অন্য কোথাও এমনটি পাওয়া যায় না। তাই উপনিষদে এর নাম হলো—*ঔপনিষদং পুরুষম্।* শিষ্য উপনিষদের আচার্যের কাছে গিয়ে বলে ঃ *ঔপনিষদম্ পুরুষং পৃচ্ছামি,* 'আমাকে সেই পুরুষ সম্বন্ধে বলুন যার বিষয় একমাত্র উপনিষদেই শেখান হয়ে থাকে'। উপনিষদের ভাষ্য লিখতে গিয়ে শঙ্কর তাই বলেছেন ঃ *উপনিষৎসু এব বিজ্ঞাতে, ন অন্যত্র*—'কেবল উপনিষদেই এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, অন্য কোথাও নয়'।

সে কালে ভারতবাসী যখন তীর্থ যাত্রায় বারাণসী যেত তখন তারা প্রায়ই যাত্রায় বেরুবার আগে কোন গ্রামবাসী বন্ধুর কাছে দশসহস্র মুদ্রা গচ্ছিত রেখে যেত। বছর দেড়েক পরে ঐ লোকটির ফিরে আসার কথা; তীর্থযাত্রায় আমার দেহান্ত হলে, ঐ অর্থ অমুক অমুককে দিও—সে কথাও সে বলে যেত গ্রাম থেকে বেরুবার সময়। অনেকদিন পরে ঐ ব্যক্তি তীর্থ থেকে ফিরে এলে তার বন্ধু তাকে ঐ দশসহস্র মুদ্রা ফেরত দিত; প্রতারণার কোন প্রশ্নই তখন ছিল না। বন্ধুটি জানতো অর্থ হলো বিষয়—সে অর্থের দাস নয়। এই মহান শিক্ষাটি এখন আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। আমরা এখন সামান্য অর্থেরও দাস হয়ে পড়ি। কিছু অর্থের বিনিময়েই মানুষ যে কোন অপকর্ম করতে পারে—শুধু গরিব মানুষ নয়, বিত্তবান পুরুষও। তাই যখন ভারতের দারিদ্র্য ও ভিক্ষাবৃত্তির সমস্যার কথা বলা হয়, তখন আমি বলি যে ভারতে দু-রকম ভিক্ষুক আছে। এক হলো রাস্তার ভিখারি, আর এক হলো অট্টালিকাবাসী ভিক্ষুকবৃত্তিধারী মানুষ। এসব ঘটেছে কারণ এই (আলোচ্য) সত্যটি পুরাপুরি উপেক্ষিত হয়েছে। বেদান্তই মানুষকে এই নিগূঢ় সত্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেবে, আর সে জন্যই ভারতে *বেদান্ত কেশরী,* বেদান্তের সিংহ, স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব। আগে আবির্ভূত হয়েছিলেন শঙ্করাচার্য, তার আগে বুদ্ধ, তারও আগে এসেছিলেন বেদান্তকেশরী শ্রীকৃষ্ণ। এখন আমাদের চাই সেইরূপ বেদান্ত সিংহের গর্জন। স্বামীজী বর্তমান

যুগেই সে গর্জন তুলেছিলেন : (C.W. vol.-4, p.351) 'বেদান্ত কেশরী গর্জন করে উঠুক; শেয়ালের দল পালাবে গর্তের ভেতরে।' তাই এই বেদান্ত কেশরী হলেন এমন এক চমৎকার যন্ত্র, যা সমাজ-পীড়নকারী অপরাধ, কর্তব্যে অবহেলা ও অন্যান্য অশুভশক্তির প্রভাব থেকে আমাদের মুক্ত করে এনে আপন মূল্য ও মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

এই শ্লোকে *পরা* কথাটি গভীর অর্থপূর্ণ, যেমন আগে উল্লেখ করেছি। মানব ব্যক্তিত্বের তিনটি মাত্রার, যথা *ইন্দ্রিয়াণি, মনঃ, বুদ্ধি* সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আমি এই শ্লোকে ব্যবহৃত *পরা* শব্দটির উল্লেখ করেছিলাম : *ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ,* 'ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে *ইন্দ্রিয়গুলি উচ্চতর*' ইত্যাদি। এখন আবার ওগুলি আলোচনা করব কঠোপনিষদের (১.৩.১০) অনুরূপ শ্লোকের ওপর শাঙ্কর-ভাষ্যের ভাবালোকে।

শঙ্করাচার্য বলেন, যা কিছু স্থূলের তুলনায় সূক্ষ্ম তাই *পরা*। স্থূল হলো সাধারণ; সূক্ষ্ম হলো উচ্চতর, উন্নততর স্থূলের থেকে। ইন্দ্রিয়ের বিষয় হলো স্থূল, তুমি সেগুলিকে স্পর্শ করতে পার, সেগুলিকে হাতে ধরে কাজে লাগাতে পার, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি স্থূল নয়, তারা অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতর আর আমরা সব সময় বুঝে থাকি যে স্থূল শক্তি সূক্ষ্ম শক্তি অপেক্ষা নিকৃষ্ট। অতএব, *পরা* শব্দকে *সূক্ষ্ম* অর্থে গ্রহণ করতে হবে।

তারপর দ্বিতীয় গুণ হলো, *মহান্তশ্চ,* বিস্তার ও শক্তিতে গুরুতর। শক্তির পরিমাণগত অস্তিত্ব রয়েছে; কিন্তু সূক্ষ্ম অবস্থায় শক্তির বিকাশ বেশি হয়। *মহান্তশ্চ* কথার অর্থ হলো, বৃহৎ, বিস্তৃত। এই হলো, *সূক্ষ্ম* ও *মহান্তশ্চ।*

তারপর আসছে তৃতীয় ও শেষ অংশ। *প্রত্যগাত্মভূতশ্চ,* 'আপন অন্তরাত্মার আরো নিকটে'। তোমার কাছে এই শরীর বহিঃস্থ, স্নায়ুতন্ত্র ও ইন্দ্রিয়-তন্ত্র আন্তর বা তোমার আত্মার নিকটতর; মন আত্মার আরো নিকটে। *বুদ্ধি* আত্মার নিকটতম। এ সবই বেদান্তে উদ্ভূত বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা : *সূক্ষ্মা মহান্তশ্চ প্রত্যগাত্মভূতশ্চ*। যখন তুমি *প্রত্যগাত্মা* কথাটি ব্যবহার কর, তখন এর অর্থ হলো আত্মন্ বা অন্তরাত্মা। বাহ্য জগৎ ও আত্মন্, কিন্তু এটা তার বহিঃপ্রকাশ—*পরাক স্বরূপ; পরাক* শব্দ ব্যবহারে বাস্তব সত্যের দিকেই অঙ্গুলি সঙ্কেত করা হচ্ছে। কিন্তু যখনই তুমি অঙ্গুলি সঙ্কেত কর নিজের দিকে, তখন লক্ষ্য হলো সত্যের *প্রত্যক্* মাত্রা, সাক্ষী হলো বিষয়ী বা আত্মা। ঐ বাহ্য বস্তু হলো *পরাক* আর এই ভেতরের বস্তু হলো *প্রত্যক*।

প্রকৃতির দুটি মাত্রা আছে ঃ *পরাক* মাত্রা এবং *প্রত্যক* মাত্রা। *পরাক* মাত্রার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে ভৌত বিজ্ঞানের মাধ্যমে, কারণ ঐ মাত্রাই হলো বস্তু, সংস্কৃত ভাষায় যাকে *বিষয়* বলা হয়, যা পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিকশিত হয়। ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা সংগৃহীত তথ্যই হলো ভৌত বিজ্ঞানের ভিত্তি। কিন্তু সে পরীক্ষা শেষ হলে অঙ্গুলি ফেরে অন্তরের দিকে, তোমার নিজের দিকে, মানবের চেতনার দিকে, সাক্ষী-মানবের দিকে, যাকে সংস্কৃত ভাষায় বলা হয় *বিষয়ী,* কর্তা, জ্ঞাতা বা আত্মারূপে; সেখানে এক গূঢ় রহস্য—উন্মেষের প্রতীক্ষায় গুপ্তভাবে রয়েছে। আধুনিক ভৌতবিজ্ঞান আজ পর্যন্ত ঐ সত্যকে বোঝেনি, একে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে নি। কিন্তু এখন এই বিংশ শতাব্দীতে, যে সব বৈপ্লবিক অগ্রগতি ঘটেছে—বিশেষত আণবিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, তাতে ঐ সাক্ষী বা কর্তা বা বিষয়ী ধীরে ধীরে আধুনিক বিজ্ঞানের দৃশ্যপটের দিগন্তে দেখা দিচ্ছেন। কোয়ান্টাম্ সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি বুঝতে চেতনার খানিকটা কাজ রয়েছে—বৈজ্ঞানিক এই ভাবেই ব্যাপারটাকে তুলে ধরে। অতএব ভৌতবিজ্ঞানের সামনে চেতনার এক নতুন মাত্রা, সত্যোপলব্ধির এক নতুন মাত্রা—খুলে যাচ্ছে। বেদান্ত চার হাজার বছর আগে এটি অনুমান করেছিল এবং বলেছিল *পরাক* তত্ত্বের পর্যালোচনার পর আমাদের *প্রত্যক* তত্ত্বের আলোচনা করতে হবে। *তত্ত্ব* মানে সত্য। *পরাক তত্ত্ব* হলো বাহ্য সত্য বা বাহ্য প্রকৃতি; *প্রত্যক তত্ত্ব* হলো সকলের অন্তরে যে সত্য নিহিত আছে বা আন্তর প্রকৃতি। এটিই পর্যালোচনার একটি বিরাট ক্ষেত্র। আর আজকাল, পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্বে চেতনা বিষয়ক পর্যালোচনা গুরুত্ব পাচ্ছে। এতকাল ওখানে তার স্থান ছিল না। এখন বিষয়টি দিন দিন গুরুত্ব পাচ্ছে নানা দিক থেকে। *তাত্ত্বিক দিক থেকে* পদার্থ বিদ্যা বা জীব বিদ্যা পর্যালোচনার সময় মানব সত্তায় নিহিত কিছু নিগূঢ় বস্তুর সত্যতা সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া যায়; *কার্যকারিতার দিক থেকে* মানবীয় পরিস্থিতিও নজরে পড়ে; মানবীয় মনস্তত্ত্বও অত্যন্ত বিকৃত রূপ নিয়েছে, প্রযুক্তি বিদ্যার প্রভূত উন্নতির কারণে। ভৌত বিজ্ঞান এই সমস্যাকে বেশিদিন উপেক্ষা করে চলতে পারবে না। যদি তুমি শান্তি চাও, যদি তুমি জীবনে পূর্ণ সাফল্য চাও, তবে তোমার নিজ মন ও চেতনা নিয়ে পর্যালোচনা করতে থাক। এই *প্রত্যক* তত্ত্বেই তুমি এর উত্তর পাবে, প্রতিকারও পাবে। কাজের সুবিধার জন্য আরো ছোটখাট সাজসরঞ্জাম, নিত্য প্রয়োজনের জন্য আরো কিছু ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বাড়িয়ে তা পাওয়া যাবে না। তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দু-দিকের বিবেচনায় এরকম জোরালো যুক্তি থাকায় এই বিষয়টির গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

অতএব *পরাক* ও *প্রত্যক* কথা দুটির গুরুত্ব লক্ষ্য কর। কেবল একটি মাত্রার পর্যালোচনা করে থেমে যেও না। আমাদের ভারতীয় ঋষিগণ প্রথমে *পরাকমাত্রা*, বাহ্যজগৎ, পর্যালোচনা করে ভৌত বিজ্ঞানের অনেকগুলি বিভাগ গড়ে তুলেছিলেন। তার পরেই তাঁরা *প্রত্যক*-মাত্রার পর্যালোচনায় মনোনিবেশ করেন। আর তারই ফলে তাঁদের কাছে ধরা পড়েছিল সত্যের—সামগ্রিক সত্যের—*একমেবাদ্বিতীয়ম্* সত্যটির অদ্বৈত দৃষ্টির এক সমন্বয়রূপ, যা বাহ্য প্রকৃতিরূপে যেমন প্রকাশ পায়, তেমনি পায় মানবের আন্তর চেতনারূপে। এই কারণেই বেদান্ত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে বা স্বীকৃতি দিতে পেরেছিল; যে স্বীকৃতি লাভের জন্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে ইউরোপীয় ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে ক্রমাগত সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল এবং সাফল্য হয়েছিল একটু একটু করে। ভারতে এই অদ্বৈত দৃষ্টি এসেছিল তার একমাত্র কারণ ভারত *পরাক ভাব ও প্রত্যক ভাব*—দুটির ওপরেই অনুসন্ধান চালিয়েছিল। তাই বেদান্তে আত্মাকে *প্রত্যগাত্মা, প্রত্যক স্বরূপ, প্রত্যক তত্ত্ব* এই আখ্যা দেওয়া হয়। এই সব কটি শব্দই বেদান্ত সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে ঃ কোন্ সত্যটি তোমার ভেতর স্পন্দিত হচ্ছে? সদ্যোজাত শিশুর চোখ দুটির দিকে তাকাও। ঐ চোখ দুটির মাধ্যমে কিছু গভীর মাত্রার বিকাশ ঘটে। সে মাত্রাটি কী? একটি পুতুল-শিশু নাও। তার চোখের দিকে তাকাও। তাতে কোন গভীরতা নেই; কেবল উপরের তলদেশই দেখা যায়। যে কোন সজীব শিশুতে, তার চোখ দুটি এক নিগূঢ় গভীর মাত্রার বিকাশ ঘটায়। এই অনুসন্ধানের ফলেই ঋষিদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছিল আত্মারূপে তোমার অন্তরে অবস্থিত সেই সত্য প্রত্যক তত্ত্বের এই তিনটি কোষ বা আবরণ, যথা ঃ *ইন্দ্রিয়, মন* ও *বুদ্ধি*।

১৯৮১ খ্রিঃ চিকাগোতে একটি বিশেষ জনসভা হয়, চিকাগো বেদান্ত সোসাইটির সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে; সেখানে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আমরা দু-জন ঃ ডঃ এস চন্দ্রশেখর নামে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত নভো-পদার্থবিদ (Astro-physicist) বললেন *Approach to Truth in Science (বিজ্ঞানে সত্যানুসন্ধান)* বিষয়ে, আর আমি বললাম, *Approach to Truth in Vedanta (বেদান্তে সত্যানুসন্ধান)* বিষয়ে। দুটি বিষয়েই সত্যানুসন্ধান। তাই, এখানে *প্রত্যক* ও *পরাক* শব্দ দুটি তাৎপর্যপূর্ণ। আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান কেবল প্রকৃতির *পরাক* বা বাহ্য দিকটি পর্যালোচনা করেছে। এখন *প্রত্যক* বা আন্তর দিকটি ধীরে ধীরে পদার্থ বিজ্ঞানের দিক্‌চক্রবালে উঁকি ঝুঁকি মারছে। তাই, *পরাণ্যাহুঃ* শব্দটি বোঝাচ্ছে—আরো *সূক্ষ্ম*, আরো

মহান্তঃ, আরো *প্রত্যগাত্মভূতঃ*। এই, সূক্ষ্ম, ব্যাপ্তি ও শক্তিতে বিরাট এবং নিজ সত্য আত্মার, অন্তরাত্মার, আরো নিকটে, শব্দ তিনটি ব্যবহৃত হয়েছে *পরা* শব্দটির অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে। *প্রত্যাগাত্মা* শব্দের অর্থ হলো অন্তরাত্মা।

আমরা এতক্ষণ তিনটি শ্রেণীর প্রথমটি যথা, সংজ্ঞাতন্ত্র বা ইন্দ্রিয়জ্ঞান তন্ত্রটিই আলোচনা করেছি। *মনের* স্তরে গেলে আমরা দেখব যে তা সংজ্ঞা-তন্ত্র অপেক্ষা আরো *সূক্ষ্ম*, 'ইন্দ্রিয়ের অগোচর'; *মহান্তশ্চ*, 'ব্যাপ্তিতে ও শক্তিতে আরো বিরাট' এবং *প্রত্যগাত্মভূতশ্চ*, 'আরো গভীর যেমন মানবের অন্তরাত্মা'।

*মন*কে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, হাতে করে নাড়াচাড়া করা যায় না। স্নায়ুতন্ত্রকে তুমি নাড়াচাড়া করতে পার। ইন্দ্রিয়-তন্ত্রকে তুমি নাড়াচাড়া করতে পার ঃ যেমন চোখ, কান ইত্যাদি। কিন্তু *মনকে* নাড়াচাড়া করা যায় না। তবু মনের অস্তিত্ব রয়েছে। এতে ইন্দ্রিয়-তন্ত্রের থেকে অনেক বেশি শক্তি রয়েছে। যদি *মন* দুর্বল হয়, ইন্দ্রিয়-তন্ত্রেরও জোর কমে যায়। এইভাবে তাঁরা মনকে 'সূক্ষ্মতর', 'ব্যাপ্তিতে ও শক্তিতে বিরাটতর' *মহান্তশ্চ* এবং *প্রত্যগাত্মভূতশ্চ* 'মানবের অন্তরাত্মার নিকটতর' রূপে বুঝেছিলেন।

তারপর *বুদ্ধি স্তর*, মানব-তন্ত্রের তৃতীয় স্তর। *বুদ্ধি* আরো বেশি সূক্ষ্ম, ব্যাপ্তি ও শক্তিতে আরো বেশি বিরাট এবং ইন্দ্রিয়তন্ত্র বা মনঃতন্ত্র থেকে স্বীয় আত্মারূপে আরো বেশি সত্য; সূক্ষ্ম মহান্তশ্চ প্রত্যগাত্মভূতশ্চ। এই তিনটিকে আমরা পর্যালোচনা করতে পারি; আর তা থেকে একটি সত্য জানা যায়, যেমন আগে বলেছি, তা হলো যতই অন্তরে প্রবেশ করা যায় ততই আরো বেশি শক্তি-সংস্থানের সন্ধান পাওয়া যায় স্বীয় অন্তরাত্মাতে।

মনে করা হয়, *বুদ্ধি* হলো 'আত্মার নিকটতম', *নেদিষ্ঠম্ ব্রহ্ম*। ব্রহ্ম, যাঁকে আত্মাও বলা হয়, তিনিই হলেন তোমার সত্তা, তোমার আত্মা। বুদ্ধি আন্তর দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার মতো শুদ্ধি অর্জন করলে সে ব্যক্তি অনন্ত আত্মাকে তথা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে, আর যে ব্যক্তির এই অভিজ্ঞতা লাভ হয় সে হয়ে যায় বুদ্ধ অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞানী। শঙ্করাচার্য বলেন, এই *সূক্ষ্মত্ব, মহান্তত্ব, প্রত্যগাত্মভূতত্ব* তাদের অনন্তত্ব লাভ করে এই চিরমুক্ত সত্তায়, আত্মায়। প্রত্যেক মানবীয় দেহ-মন-তন্ত্রে বিকশিত কর্মশক্তি সামান্য মাত্রায় ও অন্তর্নিহিত কর্মশক্তি অনন্ত মাত্রায় বর্তমান থাকে। যা বিকশিত কর্মশক্তি তা পাওয়া যায় শরীরে, মাংসপেশীতে, স্নায়ুতে, মনে, *বুদ্ধিতে*; অন্তর্নিহিত কর্মশক্তি রয়েছে আত্মার পশ্চাতে। তাই,

আমরা প্রত্যেকে মাত্র সামান্য কিছু শক্তিসম্ভার নিয়েই নাড়াচাড়া করে থাকি, যদিও এর পেছনে অনন্ত শক্তিসম্ভার বর্তমান—যা আমাদের জানা নেই।

বেদান্ত প্রত্যেক মানুষকে বলতে চায় যে, এই রকম আত্মিক শক্তির ভাণ্ডার তার মধ্যে নিহিত রয়েছে। আগে বলেছি, যে এই আত্মা সদামুক্ত। কোন পাপ বা কোন অপরাধ একে কলুষিত করতে পারে না। এই রকমই হলো আমাদের প্রকৃত স্বরূপ। এই পরম সত্যই বেদান্ত বহন করে নিয়ে যায় মানব জাতির কাছে। *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌* থেকে উদ্ধৃত চিকাগো ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দ কর্তৃক ঘোষিত, এই বাণীর কথা আমি আগেই বলেছি। 'আমি তো এ কথা জানি না' বলে যে কোন লোক প্রতিবাদ করতে পারে; কিন্তু কেউ না জানলেই সত্যের অবলুপ্তি হয় না। পৃথিবী যে গোল, এ সত্য শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষের জানা ছিল না। পরে বিজ্ঞানই এ সত্যকে *আবিষ্কার* করে—সৃষ্টি করে নি। তেমনি আত্মা সম্বন্ধে এই নিগূঢ় সত্য মহান ঋষিরা আবিষ্কার করেছিলেন সমগ্র মানব জাতির হয়ে। *গীতায়* পূর্ব শ্লোকে বলা হয়েছে পাপ ও অপরাধ—ইন্দ্রিয়-*তন্ত্রে*, মনঃ তন্ত্রে ও বুদ্ধিতে সংক্রামিত হতে পারে, কিন্তু আত্মাতে কখনই নয়। প্রত্যেকের মধ্যে এই আপতন বিন্দুটি সম্পূর্ণরূপে সদা শুদ্ধ ও সদা মুক্ত থাকে। তাই, তখন বলেছি, *যে আমাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা আমাদের অন্তরেই করা আছে।* কেবল আমাদের এই সত্যটিকে আবিষ্কার করতে হবে। এ সত্যকে কেউই ধ্বংস করতে পারে না। শঙ্করাচার্য তাঁর গীতাভাষ্যে বলেছেন ঈশ্বরও পারেন না সৎস্বরূপ মানবাত্মাকে ধ্বংস করতে। এই ভাষাই তিনি ব্যবহার করেছেন। সুতরাং, এই তিনটি ভাব, *সূক্ষ্ম, মহান্তশ্চ, প্রত্যগাত্মভূতশ্চ,* তাদের অনন্ত মাত্রায় পৌঁছে যায় এই আত্মাতে। কী সুন্দর এই ধারণা!

মানুষ যখন এই সত্যের বিষয় জানতে পারে—এই *বুদ্ধি*, এই *মন*, ঐ ইন্দ্রিয়-তন্ত্র তখন নতুন পবিত্রতায়, নতুন প্রেম ও *করুণাগুণে* বিভূষিত হয়। কী আনন্দদায়ক পরিবর্তনই না তখন আসে মানব জীবনে ও মানবের পারস্পরিক সম্পর্কে—যখন এই সত্যের সামান্যও উপলব্ধি হয়। শ্রীকৃষ্ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই কথাই বলেছেন, যথা—*স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।*

শুদ্ধ চৈতন্যরূপ আত্মা কখনও বিভাজ্য হতে পারেন না। *গীতা* ১৩শ অধ্যায়ে ১৬শ শ্লোকে বলবেন : *অবিভক্তম্ চ ভূতেষু বিভক্তম্ ইব চ স্থিতম্*, 'এই আত্মা সর্বভূতে অবিভক্তই আছেন, তবে মনে হয় যেন বিভক্ত'; আবার অবিভক্তম্ বিভক্তেষু (১৮শ অধ্যায়, ২০ শ্লোক), 'বিভক্তরূপে আপাত

প্রতীয়মান এই বস্তুগুলিতে তিনি অবিভক্তই আছেন'। এটি একটি অত্যন্ত গূঢ় আবিষ্কার যার ওপর ভিত্তি করে গীতা আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে এক নিগূঢ় দর্শন। *গীতা*—মানবের জীবনে ও নিয়তির কাজে তৎসহ মানব জীবনে অপরাধপ্রবণতা দমনে এবং সমাজে অপরাধ প্রশমনের উপায় নির্ধারণে—এই সত্যের কার্যকর প্রয়োগের কথাও তুলে ধরেছেন। অত্যন্ত অপরাধপ্রবণ সমাজে কেউই সুখী হয় না। সুস্থ সমাজে সকলেই সুখী হয়। তাই অপরাধ মুক্ত সমাজের জন্য, যে সমাজে সকলে সমান, সে সমাজে একাত্মবোধ সহকারে ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করতে পাওয়া মানুষের পক্ষে এক বিশেষ অধিকার লাভ করার সমান। এই জন্য মহান আধ্যাত্মিক আচার্যগণ বার বার আসেন ঃ মানবজাতিকে—দ্বন্দ্ব, হিংসা ও অপরাধ থেকে দূরে সহমর্মিতা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতার পথে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে।

মহাভারতে, যা সম্প্রতি* দিল্লী দূরদর্শনে প্রতি সপ্তাহে দেখান হচ্ছে, দেখা যায় পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ তাঁর সহপাঠী দ্রোণ কিছু সাহায্য চাইতে এলে তাঁর কাছে গর্বিত ভাব ও দম্ভ প্রদর্শন করেছিলেন। দ্রোণ খুবই দরিদ্র ছিলেন। পাঠ্যাবস্থায় দ্রুপদ দ্রোণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, 'তুমি যখনই যা কিছু সাহায্য চাইবে তাই দিতে প্রস্তুত থাকব'। কিন্তু রাজপদে অধিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুপদ মানুষটি পাল্টে গেল। তিনি ক্ষমতা লাভ করেছেন। তাঁর মন দম্ভে ও গর্বে ভরে গেল। আর তিনি দ্রোণকে অপমান করলেন। এইখান থেকেই আরম্ভ হয়েছিল, *মহাভারতে* সমগ্র পরবর্তী বিয়োগান্ত নাটকটি এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ।

মহাভারতের শান্তিপর্বে মনোমুগ্ধকর ভাষায় একটি অত্যন্ত অর্থপূর্ণ কাহিনী বলা হয়েছে। এক ঋষি বনে তপস্যা করছিলেন। একটা কুকুর কোনরকমে আশ্রমে ঢুকে পড়ে; ঋষিও তার যত্ন নিতে থাকেন। কুকুরটা যা একটু আধটু খাবার পেত, তাই খেত এবং তার স্বভাবও ছিল ভাল। কিছুদিন পরে কুকুরটির মনে হলো, 'আশ্রমের কাছে যে সাধারণ ছোট একটা বাঘটা আসে—তার থেকে তাঁর ভয় হচ্ছে। আমাকে বাঘের থেকে বেশি শক্তিশালী হতে হবে।' সেইমতো কুকুরটা ঋষির কাছে আর্জি করলো—'আমি তো তোমার অনুগত সেবক হয়ে এখানে রয়েছি; বাঘের থেকে আমি যে ভয় পাই, তুমি কি আমার ভয় নিবারণ করতে পার? ঋষি 'আচ্ছা' বলে, কুকুরটার ওপর কিছু গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলেন।

---

* মূল ভাষণ প্রদান-কাল অর্থাৎ ১৯৮৮-১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের কথা এখানে বলা হয়েছে।

কুকুরের শক্তি বৃদ্ধি হলো। তখন বাঘটা তাকে দেখে পালিয়ে যেত, আর আশ্রমে আসত না, কারণ কুকুর এখন শক্তিমান হয়েছে। আবার কিছুদিন পরে অন্য এক বড় পশু, সিংহ আশ্রমে আসতে থাকে, আর কুকুরটা ভয় পায়। সে আবার তার প্রভুকে বলে। প্রভু বলে, 'আচ্ছা আমি তোমার শক্তিবৃদ্ধি করে দেব'। কুকুরের শক্তি আরো বৃদ্ধি পেল। কোন সিংহই তার কাছে আসতে সাহস পায় না। এই ভাবে তিন-চার রকমের পশু, একটি আগেরটির থেকে বেশি শক্তিশালী, ঋষির আশীর্বাদপুষ্ট এই কুকুরটিকে দেখে ভয় পেল। এখন সেই শক্তি বৃদ্ধির পরিস্থিতিটা বেশ মজার! তখন কী হলো? কুকুরটা খুবই শক্তিশালী হয়েছে। আগে কতরকম পশু আসত। কিন্তু এখন কুকুরের ভয়ে কোন পশুই আর আশ্রমে আসে না। একদিন ঋষি ধ্যানে মগ্ন, কুকুরটা মনে করল,'আমি এখন সর্ব শক্তিমান। একটি মানুষই কেবল আমার থেকে বেশি শক্তিমান। তিনি হলেন এই ঋষি। একে শেষ করে দিই, তাহলে আমিই সকলের থেকে বেশি শক্তিমান হব'। এই কথা ভেবে ঋষিকে মেরে ফেলার জন্য তাঁর দিকে সে তেড়ে এল। ঋষি চোখ খুলে কুকুরটার গায়ে একটু জল ছিটিয়ে দিলেন; তখুনি সে আবার আগের কুকুরটিতে পরিণত হলো, তার সব শক্তি লুপ্ত হয়ে গেল। যখন কোন লোক নিজের হাতে ক্ষমতা পেয়ে তার অসদ্ব্যবহার করতে থাকে, তখন ঐ ক্ষমতাকে গঠনমূলক কাজে নিয়োগ করতে হলে যে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়— তা হলো সদসৎবিচার শক্তি; আর একমাত্র যখন সে শক্তি আত্মার সঙ্গে সমন্বয় ঘটাতে পারে তখনই তা বুদ্ধিপর্যায়ে উঠে আসে।

তাই শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র মানবজাতিকে বলছেন, *যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ*, 'বুদ্ধির পারে যা তাই আত্মা', *যেখানে এই সূক্ষ্মতা, বিশালতা, অন্তর্মুখিনতা—তাদের অনন্ত মাত্রায় পৌঁছে যায়*। এই হলো মানব জাতির স্বভাব। তৎ *ত্বমসি*, 'তুমিই সেই'—ছান্দোগ্য উপনিষদে যা বিঘোষিত হয়েছে। যত বেশি লোকে এ সত্য উপলব্ধি করবে, মানব-সমাজের পক্ষে ততই মঙ্গল। এতে কোন ধর্মমত নেই, ধর্ম বিশ্বাস বলে কিছু নেই। এ হলো মানবের অন্তরতম সত্তা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান, যা ঋষিরা আবিষ্কার করেছিলেন, পরে অন্যান্য ঋষিরা আবার তা পুনরাবিষ্কার করে সকলের কাছে তুলে ধরেছেন—যাতে আমরাও এ তত্ত্বকে পুনরাবিষ্কার করি। এ গলাধঃকরণ করার জন্য কোন ধর্মমত নয়, বা মেনে নেওয়ার মতো কোন তত্ত্বও নয়। এই ভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানবজাতিকে তার অন্তরতম সত্তা সম্বন্ধীয় দর্শনটির বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন—যার দ্বারা আমরা এক সার্থক জীবন উপভোগে সক্ষম হব এবং অন্যদেরও তেমন জীবনযাপনের সুযোগ

করে দেব। এই হলো মানবীয় ক্রমবিকাশের লক্ষ্য। আন্তর্জাতিক শান্তি আন্তর্জাতিক মানব কল্যাণ—এ সবই সম্ভব—কারণ সকল মানবের মধ্যেই এই গুণগুলি বিদ্যমান; কেবল তার অবশ্য কর্তব্য হবে মানবীয় ক্রমবিকাশকে ইন্দ্রিয় স্তরের পারে উচ্চতর নৈতিকতা, পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতার স্তরে নিয়ে যাওয়া।

তাই এই *পরা* শব্দটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত এটি উচ্চতর বলে অনূদিত হয়। কিন্তু 'উচ্চতর' বলতে কী বোঝায়? উচ্চতর স্থান বোঝাতে পারে, যেমন কোন জিনিসকে ওপর-তলায় রাখা। এখানে সে অর্থ নয়। তাই, একটি বাক্যে সমগ্র বিষয়টিকে উপস্থাপিত করা যায়, সেটি হলো—*মানবীয় শক্তি সংস্থানগুলি বিন্যস্ত আছে তাদের—সূক্ষ্মতা, বিশালতা ও অন্তর্মুখিনতা—গুণের ক্রমবর্ধমান মাত্রানুসারে।*

শ্রীশঙ্করাচার্যের মুখ নিঃসৃত এই সুন্দর বাক্যটি তাঁর কঠোপনিষদ্-ভাষ্যে রয়েছে। এই ক্রমবর্ধমান মাত্রার শেষ পর্যায়টি হলো—যখন আমরা, *যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ*, 'বুদ্ধির পারে ও তদূর্ধ্বে সেই অনন্ত সত্তা, আত্মায় পৌঁছে যাই। অপরাধ আমাদের আজকের সমাজের এক গুরুতর সমস্যা; সকল আন্তর্জাতিক সমাজেও। এই রকম অপরাধ ও হিংসা-লীলা যখন আমাদের চার পাশে ঘটে তখন আমরা কেমন করে শান্তিতে ও সুখে জীবন কাটাতে পারি? যখন তুমি জান যে ডাকাত যে কোন দিন তোমার সর্বস্ব লুণ্ঠন, এমনকি তোমাকে হত্যাও করতে পারে—তখন তুমি কিভাবে গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকতে পার? এই বিজ্ঞান লোকে যে বেশি করে জানে সেটা ভাল কথা। শান্তি ও সমন্বয়ের দেশ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনশ বছর আগেও বিদেশী দূতেরা বলেছে—যে দেশের লোক বাড়ির দরজায় তালা দেয় না—সেই ভারতই এখন অপরাধ ও হিংসার দেশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর কারণ আমরা এখন কেবল জগতের *পরাক* প্রকৃতিকে বুঝতেই ব্যস্ত। সাম্প্রতিক কয়েকশত বছর আমরা জগতের *প্রত্যক* প্রকৃতিকে উপেক্ষা করে চলেছি। এখন সময় এসেছে এই *প্রত্যক* মাত্রার দিকে একটু মনোযোগ দেবার আর সেখানে যে *তত্ত্বম্* রয়েছে তাকে আবিষ্কার করার। *পরাক* ও *প্রত্যক* দুটি *তত্ত্বম্ই* সত্য। একটি মাত্র অনন্ত সত্যই বিদ্যমান—তাই-ই কখনও বহিস্থ, কখনও আন্তর সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়। এই হলো বেদান্তের ভাষা।

তাই-ই গৌড়পাদের *মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ কারিকার* একটি মহান শ্লোকে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এটি একটি চমৎকার শ্লোক (২.৩৮) ঃ

তত্ত্বমধ্যাত্মিকং দৃষ্টা তত্ত্বং দৃষ্টা তু বাহ্যতঃ।
তত্ত্বীভূতস্তদারামস্তত্ত্বাদপ্রচ্যুতো ভবেৎ॥

—'তোমার অন্তরে যে *তত্ত্ব* নিহিত আছে, তাকে উপলব্ধি করে', *তত্ত্বম্ আধ্যাত্মিকম্ দৃষ্টা* এবং 'বাহ্য প্রকৃতিতে যে *তত্ত্ব* নিহিত আছে তাকে উপলব্ধি করে', *তত্ত্বম্ দৃষ্টা তু বাহ্যতঃ*; *তত্ত্বীভূতঃ*, 'তত্ত্বের সত্যের সঙ্গে একীভূত হয়ে', *তদারামঃ*, 'সত্যেই আনন্দ অনুভব করে'। *তত্ত্বাদ্ অপ্রচ্যুতো ভবেৎ* 'তুমি সত্য থেকে কখনো বিচ্যুত হবে না'।

তুমি চিরকালের মতো সবরকম অশুভের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকতে পার। ঐ শ্লোকে *তত্ত্বম্* কথাটির ওপর লক্ষ্য রাখ—*তস্য ভাবঃ তত্ত্বম্*, 'ঐ বিষয়ের সম্বন্ধে যা সত্য তাই *তত্ত্বম্*' এ কথা বলেছেন শঙ্করাচার্য। *তত্ত্বান্বেষণ* বলে কিছু আছে। সেটি বাহ্য জগতে থাকতে পারে; তা অন্তর্জগতেও থাকতে পারে। এ বিষয়ে শেষ কথা হলো—*তত্ত্ব* একটি। তত্ত্বের ব্যাপারে বাহ্য বা আন্তর শব্দের কোন অর্থ নেই। ঠিক যেমন বলা যায় যে—পৃথিবী কেবল একটি সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত। কিন্তু সুবিধার জন্য আমরা একে ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর, অতলান্তিক মহাসাগর বলে থাকি। কিন্তু মহাসাগর একটাই, একাধিক নয়। তাই, বাহ্য *তত্ত্বম্*, আন্তর *তত্ত্বম্*—এগুলির ব্যবহার শুধুমাত্র পর্যালোচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। স্ব-স্বরূপে *তত্ত্বম্* এক, অনন্ত, অদ্বিতীয়। আর বেদান্ত মতে একে উপলব্ধি করাই মানবীয় ক্রমবিকাশের লক্ষ্য। তুমি কি *তত্ত্বমের* দিকে অগ্রসর হচ্ছ? কি চমৎকার ভাব! বেদান্ত এটিকেই জীবনের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছে। যিশু বলেছেন, 'তোমাকে সত্য জানতে হবে, আর সত্য তোমাকে মুক্ত করবে'। ভারতীয় জাতি সত্যের কাছে উৎসর্গীকৃত হয়েছে, আমাদের জাতীয় সংবিধান রচয়িতাদের দ্বারা চল্লিশ (বর্তমানে পঞ্চান্ন) বছর আগে। সেই জন্যই তাঁরা *মুণ্ডক উপনিষদের সত্যমেব জয়তে* বাক্যটিকেই আদর্শ নীতি রূপে গ্রহণ করেছিলেন; যার অর্থ 'একমাত্র সত্যেরই জয় হয়'। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজ আমাদের জাতি থেকে এই নীতিটি লুপ্তপ্রায়; তার বদলে এসেছে 'অসত্যেরই জয়'। এই নরক থেকে ভারতকে রূপান্তরিত হতে হবে এমন দেশে যেখানে বেশি বেশি লোক চাইবে সত্যকে, সত্যময় জীবনকে—মিথ্যাময় জীবনকে নয়। কেবল তখনই আমরা 'মুক্ত হয়ে, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নৃত্য করতে পারব', শ্রীরামকৃষ্ণের কল্প কাহিনীতে যেমন আছে।

আর শ্রীকৃষ্ণ এই তৃতীয় অধ্যায়ের এবং এই অপরাধ ও তার নিবারণের বিষয়টির উপসংহার করছেন এই প্রেরণা দিয়ে ঃ

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩॥

—'বুদ্ধি অপেক্ষা যা শ্রেষ্ঠ সেই সত্যকে জেনে, আত্মার (শুদ্ধ বুদ্ধির) দ্বারা আত্মাকে (মনকে) সংযত করে, হে মহাবীর, *কাম* (বা অসংযত ইন্দ্রিয় ভোগ-লালসা) রূপ দুর্জয় শত্রুকে বিনাশ কর।'

এখানে ফৌজি ভাষা দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ এক যোদ্ধা, অর্জুনও এক যোদ্ধা ছিলেন। *এবম্* 'এইরূপে', *বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা,* 'বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে সত্য তাকে উপলব্ধি করে, *সংস্তভ্য আত্মানমাত্মনা,* 'অনন্ত আত্মার দ্বারা ক্ষুদ্র আত্মাকে নিয়মানুবর্তী বা সংযত করে', *জহি শত্রুম্,* 'শত্রুকে জয় কর।' সে শত্রু কে? *কামরূপম্ দুরাসদম্,* 'এই শত্রু দুর্জয় *কামরূপধারী'* আর এই কামই অপরাধ প্রবণতা ও অন্যান্য অশুভ বৃত্তির উৎপত্তিস্থল। একে জয় করা খুব কঠিন, সেজন্য সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করা চাই। এ কাজকে সহজ ভাবা উচিত নয়, এ কাজ যে অল্পায়াসে হবে, তা ভেব না। কেবল নৈতিক জগতে অলস ভাবে ঘুরে বেড়ালেই নৈতিক হওয়া যায় না। এর জন্য চাই কঠিন সংগ্রাম। সেই সংগ্রামই তোমাকে শক্তি দেবে, বল দেবে। এই শেষ ছত্রটিকে তাই, সকল মানুষের কাছে নির্দেশ-স্বরূপ, বিশেষত ভারতবাসীর কাছে। সেনাধ্যক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর দুর্গের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে সৈন্যদের নির্দেশ দেয় 'যাও ওটিকে জয় কর', তেমনি শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মাধ্যমে সকল লোককে বলছেন, সকল অপরাধ ও দোষের উৎসটিকে আক্রমণ কর, জয় কর। তখনই কেবল তুমি মুক্তি পেতে পার। তবে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যেমন ১৮ দিনে শেষ হয়েছিল, এ যুদ্ধ তেমনটি হবে না, সকল মানবজাতিকে নিরবচ্ছিন্নভাবে এ যুদ্ধ চালাতে হবে যতদিন না মানবিক ক্রমবিকাশের উচ্চতর লক্ষ্যে, আধ্যাত্মিক মুক্তি ও কৃতকৃত্যতা লাভ হয়। এই আন্তর যুদ্ধ পৃথিবীতে বাহ্যযুদ্ধের প্রবণতাকেও দূর করবে।

Success Through a Positive Mental Attitude (ইতিবাচক এক মনোবৃত্তির মাধ্যমে সাফল্য লাভ) নামে ১৮৯৪ খ্রিঃ প্রকাশিত একখানি বই আমি আমেরিকায় থাকতে পড়েছিলাম। নেতিবাচক মনোবৃত্তির, (Negative Mental Attitude) N.M.A-এর বিপরীত হলো ইতিবাচক মনোবৃত্তি, (Positive Mental Attitude) P.M.A. যখন মানুষ সেই আত্ম প্রত্যয়ের, সেই বিশ্বাসের অধিকারী হয়, তখন আরো শক্তি তার কাছে আসে—যাতে সে অন্তরে শান্তি ও প্রীতি এবং বাইরে সেবাভাব এই রকম এক চরিত্র গড়ে তুলতে পারে।

জগতের সমগ্র সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, একমাত্র *গীতা* ও উপনিষদ্সমূহ—এই দুই গ্রন্থের—মধ্যেই *আত্মশ্রদ্ধা* বা নিজের ওপর বিশ্বাস তথা শক্তি ও ভয়শূন্যতা বিষয়টির ওপর বরাবর গুরুত্ব দিয়ে আসা হয়েছে। ১৮৯৭ খ্রিঃ *Vedanta and Its Application to Indian Life* (বেদান্ত ও ভারতীয় জীবনে এর প্রয়োগ) বিষয়ে মাদ্রাজে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন[১] ঃ

'আর উপনিষদ্সমূহ শক্তির বৃহৎ আকর। উপনিষদ্ যে শক্তি সঞ্চার করতে সমর্থ, সেই শক্তি সমগ্র জগৎকে তেজস্বী করতে পারে, তার দ্বারা সমগ্র জগৎকে পুনরুজ্জীবিত; শক্তিমান ও বীর্যশালী করতে পারা যায়। তা সকল জাতির, সকল মতের, সকল সম্প্রদায়ের দুর্বল দুঃখী পদদলিতকে উচ্চরবে আহ্বান করে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে মুক্ত হতে বলে। মুক্তি বা স্বাধীনতা—দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক—এটাই উপনিষদের মূলমন্ত্র।'

এ হলো একের নির্ভীকতার দ্বারা অন্যের মধ্যে নির্ভীকতাকে জাগিয়ে তোলা; এ প্রসঙ্গ আসবে *গীতার* দ্বাদশ অধ্যায়ে।

ইতি কর্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

—এই হলো কর্মের যোগ নামক তৃতীয় অধ্যায়ের সমাপ্তি।

---

১ বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৩০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

চতুর্থ অধ্যায়

কর্ম-সন্ন্যাস-যোগ

কর্ম ত্যাগের যোগ

ভগবদ্ গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের পর্যালোচনা শেষ করা হয়েছে। তার শেষ সাতটি শ্লোকে সমাজে অপরাধ ও তার প্রতিরোধের উপায়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ যে মূল দার্শনিক তত্ত্বটি বোঝাতে চেয়েছেন, তা আগেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়ে গেছে। এখন তিনি কেবল সংযোজন করে চলেছেন নতুন ভাব, অধ্যাত্মজীবনের নতুন ধারাসমূহ—পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে, তত্ত্বটিকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলতে। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম কয়েকটি শ্লোক আলোচনা করলেই এ কথার তাৎপর্য বোঝা যাবে। অধ্যায় শুরু হচ্ছে ঃ

শ্রীভগবান্ উবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'আমি এই অক্ষয় *যোগ* বিবস্বানকে—সূর্যকে বলেছিলাম; বিবস্বান মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে এই যোগের কথা বলেছিলেন।'

ইমম্‌যোগম্, 'এই যোগ', অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত দার্শনিকতত্ত্ব; *বিবস্বতে প্রোক্তবান্ অহম্ অব্যয়ম্,* 'এই অক্ষয় *যোগ* আমি বিবস্বানকে উপদেশ দিয়েছিলাম'। *বিবস্বান্ মনবে প্রাহ,* 'বিবস্বান এ বিষয়ে মনুকে শিক্ষা দিয়েছিলেন'; *মনু ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ,* মনু এটি ইক্ষ্বাকুকে শিখিয়েছিলেন।' ইক্ষ্বাকুকে একজন ঐতিহাসিক পুরুষ হিসাবে ধরা যেতে পারে; তাঁরই বংশ পরম্পরায় পরবর্তী এক যুগে শ্রীরামের আবির্ভাব ঘটেছিল। *বিবস্বান* হলো 'সূর্য'। মনু ও বিবস্বান হলেন আমাদের প্রাচীন পুরাণ-পুরুষ। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, পূর্ব পূর্ব যুগে এ তত্ত্ব এই সব লোকেদের শিক্ষা দিয়েছিলাম। পরের

শ্লোকে দেখান হয়েছে, কীভাবে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় এই আধ্যাত্মিক তত্ত্বের শিক্ষাদান চলে আসছে।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২॥

—'এইভাবে নিয়মিত পরম্পরা অনুযায়ী রাজর্ষিগণ এই *যোগ* জেনেছিলেন; হে শত্রুতাপনকারী কালক্রমে ইহলোকে এই *যোগের* প্রভাব ম্লান হয়ে গেছে।

এই যোগদর্শন, যাকে সহজ কথায়, *যোগ* আখ্যা দেওয়া হয় এবং যা প্রায়োগিক বেদান্ত হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তা আগে এইভাবে গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমে শিক্ষা দেওয়া হতো। *এবম্* 'এইভাবে' *পরম্পরা*, মানে 'একের থেকে অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া', *প্রাপ্তম্*, লব্ধ হয়, *গুরু-শিষ্য পরম্পরা*, 'গুরু থেকে শিষ্যে এই ক্রমে'; *রাজর্ষয়ো বিদুঃ*, 'ঋষিরা এ তত্ত্ব জেনেছিলেন।' শঙ্করাচার্য বলেছেন—*রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চ ইতি রাজর্ষি*, 'যাঁরা একই দেহে রাজা ও ঋষি, তাঁদের রাজর্ষি বলা হয়, কথাটি যেমন খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কাছে, তেমনি অন্যের কাছেও। আমরা যখন *গীতা* আলোচনা করি এবং বর্তমানে আমাদের দেশে ও অন্যান্য দেশেও—মানবের ভবিষ্যৎ, তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণের সূত্র নির্ধারণের চেষ্টায় নিয়োজিত প্রশাসন, রাজনীতি ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নানা ক্ষেত্রে—এই যোগদর্শনের উপযোগিতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে যখন চিন্তা করি, তখন আমাদের পথ নির্দেশনার জন্য একটি দর্শনের প্রয়োজন আমাদের রয়েছে। তাই, শ্রীকৃষ্ণ এই ধরনের দর্শন তুলে ধরলেন ক্ষমতাবান ও দায়িত্বশীল সকল মানবের কাছে। তিনি তাঁদের রাজা বললেন, কারণ তাঁদের হাতে ক্ষমতা, আবার তাঁদেরই ঋষি বললেন কারণ তাঁরা এই যোগদর্শন অনুসরণ করে আধ্যাত্মিক ভাবে অনুপ্রাণিত। তাই, তাঁদের রাজর্ষি আখ্যা দিলেন।

আমাদের সকল শক্তির উৎস হলো সূর্য। ভারতে আমরা সূর্য ভাবনাকে আদর্শ করে নিয়েছি। বস্তুত, *The National Geographic Magazine of U.S.A (Sept. 1948)* পত্রিকায় 'The Smithsonian Institution' এর ওপর এক প্রবন্ধে টমাস. আর. হেনরি (Thomas R. Henry) বলেছেন ঃ

'সূর্য যেন মহীয়সী জননী। পৃথিবীস্থ সকল জীবনকে, ভূপৃষ্ঠে আপতিত সূর্যের অফুরন্ত রশ্মি-স্রোতের ক্ষণিকের এক মূর্তরূপ বলে ভাবা যেতে পারে। সূর্য

রশ্মি সবুজ উদ্ভিদকে সাহায্য করে মৃত্তিকাস্থ জল ও বায়ুমণ্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে সংশ্লেষিত করে শর্করা ও শ্বেতসারে রূপায়িত করতে এবং এইভাবে অন্য সব আবশ্যিক খাদ্য সৃষ্টি সম্ভাবনার ব্যাপারেও। আমরা আহার্য হিসেবে যখন শর্করা, রুটি ও মাংস গ্রহণ করি, তখন প্রকারান্তরে আমরা সূর্য রশ্মিই ভক্ষণ করি, যখন কয়লা ও তেল জ্বালাই তখন কোটি কোটি বছর আগে আবদ্ধ সূর্য রশ্মিকেই পোড়াই, যখন পশম বা তুলার পরিচ্ছদ পরিধান করি তখনও সূর্যরশ্মিকেই আমরা গায়ের আচ্ছাদন হিসাবে ব্যবহার করি; সূর্য রশ্মি থেকেই বাতাস বয়, বৃষ্টি পড়ে, যুগ যুগ ধরে প্রতি বছর গ্রীষ্ম ও শীতঋতু পর্যায়ক্রমে আসা-যাওয়া করে থাকে।

'জীবন ও আলোকের সূত্রদুটি পরস্পর বিশেষভাবে বিধৃত হয়ে আছে।' প্রাচীন ভারত মানবের জীবন ও নিয়তির ব্যাপারে সূর্যের অবদানের তাৎপর্য বুঝেছিলেন। *ঋগ্বেদে* সূর্য মানুষের স্তবনীয় বস্তুরূপে গৃহীত হয়েছিলেন। প্রসিদ্ধ *গায়ত্রীই* হলো এ বিষয়ে সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র—

'ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্,
ভর্গো দেবস্য ধীমহি,
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ'

—'ওঁ! আমরা সবিতৃদেবের মহিমা ধ্যান করি; তিনি যেন আমাদের (পবিত্র) বোধ শক্তিতে ভূষিত করেন।'

ভৌত সূর্য, যা আমরা চোখে দেখি, তা হলো ঐ সূর্যের পেছনে যে আধ্যাত্মিক সত্তা রয়েছে তার বহিরংশ। ওটিই হলো জীবন ও আলোকের মূল তত্ত্ব। এ হলো এই শিক্ষার পৌরাণিক দিক। কিন্তু যখন নেমে আসা যায়, তখন মানবীয় স্তরে আমরা এসে পড়ি। *বিবস্বান্ মনবে প্রাহ,* 'বিবস্বান মনুকে শিক্ষা দিয়েছিলেন', মনুকে আদি মানব মনে করা হয়, যার থেকে সমস্ত মানবজাতির সৃষ্টি। তাই মানবজাতির নাম *মানব, মানব* শব্দের উৎপত্তি মনু শব্দ থেকে।

মনু এই শিক্ষা দিয়েছিলেন ইক্ষ্বাকুকে। এই ইক্ষ্বাকুই 'সূর্য বংশে'র পত্তন করেছিলেন—অনেক পরে সেই বংশেই শ্রীরামের জন্ম। অতএব এখানে আমরা তিন জন প্রভূত দায়িত্বশীল লোককে পাই; তাঁরা তাঁদের নির্দেশনার জন্য একটি দার্শনিক তত্ত্ব প্রার্থনা করেছিলেন, আর আমি 'সেই শিক্ষাই তাঁদের দিয়েছিলাম', এই কথাই শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলেছেন।

তারপর, 'এই দার্শনিক তত্ত্বের শিক্ষণ পরম্পরাক্রমে চলে আসছে, *পরম্পরা প্রাপ্তম্ ইমম্ রাজর্ষয়ো বিদুঃ*; 'গুরু-শিষ্য পরম্পরায় রাজর্ষিগণ এই দার্শনিক তত্ত্ব জেনেছিলেন।' *কালেন মহতা,* 'কিন্তু বহুকাল কেটে যাওয়ার পর', *স যোগো নষ্টঃ পরন্তপ,* 'মানব সমাজের কাছে এ যোগ হারিয়ে গেছে, হে অর্জুন।' যখন আমরা শঙ্করাচার্যের গীতা-ভাষ্যের আভাস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, তখন শঙ্করাচার্যের একটি উক্তি উল্লেখ করেছিলাম, তাতে তিনি বলেছেন যে ধর্মের অবনতি ঘটে যখন নরনারীগণ অতিমাত্রায় লোভী, অতিমাত্রায় কামাতুর, ইন্দ্রিয়ভোগপরায়ণ হয়ে ওঠে; তখন সমাজ থেকে উচ্চতর বৃত্তিগুলি লোপ পায়; বর্তমানে ভারতে এই ব্যাপারই দেখা যাচ্ছে : উচ্চতর গুণগুলি লোপ পাচ্ছে! আমরা উল্লিখিত অবস্থায় এসে পড়েছি। তাই, শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, বহুযুগ পরে এই অবক্ষয় ঘটেছে। ধর্মের প্রভাব কমেছে, স্বভাবত অধর্মের প্রভাব বেড়েছে। এর ফলে মানবেতিহাসে এক সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে : *যোগো নষ্টঃ পরন্তপ,* 'যোগ নষ্ট হয়ে গেছে, হে অর্জুন'। শঙ্করাচার্য বর্তমান শ্লোকের ভাষ্যে তাঁর পূর্ব উক্তির পুনরালোচনা করেছেন, *যোগ* কীভাবে নষ্ট হয়েছিল, তা বোঝাবার জন্য। একটি সুন্দর অভিব্যক্তি : *দুর্বলান্ অজিতেন্দ্রিয়ান্ প্রাপ্য যোগো নষ্টঃ* পরন্তপ, 'যখন এই যোগ *দুর্বলান্*, দুর্বলদের হাতে, যাদের দেহে ও মনে বল নেই এমন লোকের হাতে, *অজিতেন্দ্রিয়ান্*, 'ইন্দ্রিয়শক্তির ওপর সংযমহীন লোকের হাতে পড়েছিল', তখন এই *যোগ* দিনে দিনে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

নিজ নিজ দেশের এবং অন্য দেশের ইতিহাস, যেমন ব্যাবিলোনিয়া ও রোমের ইতিহাস, পর্যালোচনা করলে, যে কোন লোকের পক্ষেই এই উক্তির তাৎপর্য বুঝতে পারা সম্ভব। কখনও কখনও লোকে জীবন ও ধর্মকে বীরত্বের অভিব্যক্তি হিসাবে বুঝেছে। তারা অনেক আশ্চর্য কাজ, সৃজনশীল কাজ করেছে, সমৃদ্ধিশালী কৃষ্টি ও সভ্যতা গড়ে তুলেছে। পরে, তাদের মনে অবসাদ এসেছে, শারীরিক দুর্বলতা এসেছে; ফলে লোকের ধর্মবোধেও অবক্ষয় ঘটতে শুরু করায় ধর্মাচরণকে সহজ থেকে সহজতর করে ফেলেছিল। ভারতের ক্ষেত্রে, এই অবক্ষয়ের স্রোতে আমরা বর্তমান যুগে উত্তরাধিকার হিসাবে ধর্মরূপে যা পেয়েছি, তা অত্যন্ত খেলো ধরনের। কয়েকটি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া, আর তাও পুরোহিতের মাধ্যমে দক্ষিণার বিনিময়ে, আর অন্য কিছু নয়; এতে উচ্চ চারিত্রিক শক্তি নেই, সৃজনশীল প্রেরণা নেই, মানবিকতা বোধও নেই—এ সব উচ্চতর বস্তু লুপ্ত হয়ে গেছে। ধর্মের কতই না অবক্ষয় ঘটেছে। তারপর আমাদের আছে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নানা করণীয় ও অকরণীয় কাজের তালিকা। আমাদের একটা বড় সমস্যা ছিল—

ডান হাতে জল খাব, না বাম হাতে এবং পণ্ডিতরা সভায় বসে আলোচনা করে সঠিক পদ্ধতি কী হবে তা নির্ণয় করতেন। এইভাবে ৮/১০ বছর বয়সের মেয়ের বিবাহ দেওয়া ছাড়া নানা সামান্য বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য বহু সভা গড়ে উঠত; এখনও ধর্মের নামে নানা রকম বালসুলভ আলোচনা হতে দেখা যায়। ধর্মের উদার দিকগুলি একেবারে ভুলে গেছে এবং দুর্বলতর শ্রেণির মানুষের বিষয়ে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সমস্ত ব্যাপারই যেন শুকিয়ে গেছে। তাই আমরা দেখব শঙ্করাচার্য বলছেন ঃ যখন মানুষ তার দৈহিক শক্তি, মানসিক শক্তি হারায় এবং ইন্দ্রিয়তন্ত্রের ওপর তার নিয়ন্ত্রণও হারিয়ে ফেলে—যে নিয়ন্ত্রণ কিছুটা না থাকলে উন্নত চরিত্র গঠন সম্ভব হয় না, যখন এমন পরিস্থিতি হয়েছিল, তখন এই যোগের অবক্ষয় হয়েছিল, ফলে তা নষ্টও হয়ে গিয়েছিল। এই কথাই তিনি এখানে দ্বিতীয় শ্লোকে আমাদের বলছেন ঃ *স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ঃ* 'হে অর্জুন, যোগ হারিয়ে গিয়েছিল!' তারপর শ্রীকৃষ্ণ আরও বললেন ঃ

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩॥

—'তুমি আমার ভক্ত ও সখা, এ কথা মনে রেখে আজ তোমাকে সেই অতি গূঢ় রহস্যপূর্ণ প্রাচীন যোগই বললাম।'

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ,* 'সেই প্রাচীন *যোগই* আমি এখন তোমাকে বলছি, হে অর্জুন।' কিন্তু কেন? ভক্তোঽসি, 'তুমি আমার ভক্ত'; শুধু তাই নয় *সখা চেতি* 'তুমি আমার সখাও বটে।' শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন সমবয়সী ছিলেন। তাঁরা পরস্পর বন্ধুভাবাপন্নও ছিলেন; *সখা,* 'বন্ধু', সেই কথাই শ্রীকৃষ্ণ নিজেও ব্যবহার করলেন। একাদশ অধ্যায়ে (৪১-৪২ শ্লোকে) অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণের *বিশ্বরূপ* 'বিশ্বব্যাপ্ত-মূর্তি' দেখলেন, তার মধ্যে অর্জুন নিজ মূর্তিকে দেখেছিলেন। তখন অর্জুন ভয় পেয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেছিলেন ঃ 'খেতে খেতে, পান করতে করতে, খেলতে খেলতে, হাসিঠাট্টা করতে করতে—আমি কতবারই না তোমার সঙ্গে বন্ধুরূপে ব্যবহার করেছি। তার জন্য আমাকে ক্ষমা কর। এখন আমি বুঝেছি তোমার ব্যক্তিত্বের মাত্রা কতই না বিরাট'। কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে, তাঁরা অন্তরঙ্গ বন্ধুই ছিলেন।

বস্তুত, মহাভারতের যুদ্ধের ঠিক আগে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে পাণ্ডব শিবিরে পাঠিয়েছিলেন সেখানে কি হচ্ছে দেখে আসার জন্য ঃ

কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, ভীম, যুধিষ্ঠির ও অন্যেরা পরস্পর কেমন ব্যবহার করছেন তা দেখে আসতে। এই খবরটুকু ধৃতরাষ্ট্রের জানার প্রয়োজন ছিল। সঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণের শিবিরে ঢুকে দেখেন যে, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কোলে পা তুলে দিয়েছেন, আর তাঁদের মধ্যে সহজভাবে খোলামেলা কথাবার্তা চলছে। সঞ্জয় খানিকবাদে ফিরে এসে ধৃতরাষ্ট্রকে বলেন, 'যখন আমি শ্রীকৃষ্ণের কোলে অর্জুনের পা তুলে দেওয়ার চিত্রটি দেখলাম, আর শ্রীকৃষ্ণ নামে এই বিরাট ব্যক্তিত্বটি যখন সব রকমে পাণ্ডবদের পেছনে রয়েছেন, তখনই নিঃসংশয়ে বুঝলাম এ যুদ্ধে আপনি পরাজিত হবেন, আপনি কখনই এ যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবেন না।' যাইহোক, সঞ্জয়ের এই প্রতিবেদন ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনকে প্রভাবিত করতে পারল না। 'জয় আমাদের, জয় আমাদের'—এই ভাবই তার মধ্যে প্রবল ছিল। কিন্তু কৃষ্ণ ও অর্জুনের মধ্যে নিবিড় সম্বন্ধটি লক্ষ্য কর। তাই, *ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যম্ হ্যেতদ্ উত্তমম্; রহস্যম্* বলতে 'গোপনীয় বস্তু' বোঝাতে পারে, আবার 'অতি গূঢ় কোন বস্তু'কেও বোঝাতে পারে। এখানে দ্বিতীয় অর্থই গ্রাহ্য। ধর্মে কোন কিছুই গোপনীয় নেই, কিন্তু কিছু গূঢ় তত্ত্ব আছে। *উত্তমম্ রহস্যম্*, 'এই শ্রেষ্ঠ রহস্য', এই নিগূঢ় সত্য যার সাহায্যে মানবজাতিকে পশুসুলভ বৃত্তি থেকে মুক্তিতে উন্নীত করা যেতে পারে। এর থেকে আরো বড় খবর আর কী হতে পারে! তাই 'এই বার্তা আমি পুরাকালে বিবস্বানকে জানিয়েছিলাম; এখন, হে অর্জুন! সেই বার্তা আমি তোমাকে জানাচ্ছি'।

আগে যেমন বলেছিলাম শঙ্করাচার্যের ভাষ্য থেকে তাঁর কথা : *দুর্বলান্ অজিতেন্দ্রিয়ান্ প্রাপ্য যোগো নষ্টঃ পরন্তপ,* 'সেই *যোগ* নষ্ট হয়ে গেছে, দুর্বলের ও দেহ-মনের শক্তিতন্ত্রের অসংযত ব্যবহারকারীর হাতে পড়ে'; ঐ শক্তিই হলো সর্ববিধ চারিত্রিক ভিত্তি। এই শক্তিতন্ত্রের নিয়মানুবর্তিতা কিছুটা পালন না করলে চারিত্রিক সম্পদ লাভ সম্ভব নয়। পশুর ঐ ইন্দ্রিয়তন্ত্রের ওপর কোন সংযম নেই। তারা তাই *জীবন ধারণ* করে থাকে ইন্দ্রিয় ভোগের স্তরে। একমাত্র মানুষেই উঠতে পারে *ঐ স্তর* থেকে ইন্দ্রিয়ের ওপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ এনে। অধিক নিয়ন্ত্রণে উচ্চতর চরিত্র গড়ে উঠতে পারে, কিন্তু এক মুক্ত সমাজের এক মার্জিত রুচিসম্পন্ন নাগরিক হতে হলে, আমাদের অন্তত কিছুটা নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করা চাই। তাই, শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'আমি এই বার্তা *রাজর্ষিদের* কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম'।

গীতায় এই *রাজর্ষি* ভাবের তাৎপর্য কী তা জেনে রাখা আমাদের পক্ষে

মঙ্গলকর। দেখা যায় *মহাভারতে* রাজর্ষি কথাটি কয়েকটি জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা ভারতবাসীরা প্রায় হাজার বছর ধরে—সেদিন পর্যন্ত, জাতি হিসাবে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত ছিলাম; সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক পদ্ধতির অধীনে যেটুকু সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতা আমাদের ছিল তার প্রয়োগ ছাড়া আমরা কখনো রাজনীতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিনি। মূল রাজনীতিক ক্ষমতা আমাদের হাতে ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের হাতে সেই ক্ষমতা এলো। যারা আগে 'নগণ্য' ব্যক্তি ছিল, তারাই এখন 'গণ্যমান্য' হয়ে হাতে প্রভূত ক্ষমতা পেয়ে গেল। এটি একটি বড় ধরনের পরিবর্তন, যা এসেছে গত চল্লিশ বছরে। কিন্তু এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একটি বিষয়ে আলোচনা করতে পারিনি ঃ ক্ষমতা হাতে পাওয়া সহজ, কিন্তু তাকে ঠিকমতো প্রয়োগ করা কঠিন কাজ। অতএব, কীভাবে ক্ষমতার প্রয়োগ করতে হবে? প্রত্যেক স্বাধীন সমাজে এটি একটি বৃহৎ বিষয়। পাশ্চাত্য দেশে এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে এবং এর ওপর অনেক গ্রন্থও রচিত হয়েছে। অজ্ঞেয়বাদী (চরমতত্ত্ব অজ্ঞেয়, এই মতে বিশ্বাসী) বার্ট্রাণ্ড রাসেলের এই '*ক্ষমতা*' বিষয়ে একটি বই আছে।

'*ক্ষমতা*' বিষয়ে তাঁর বই 'Ethics of Power'-এর (১৯৩৮ সংস্করণ) ১৭শ অধ্যায়ে, বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন ঃ

'ক্ষমতা-প্রীতিকে কল্যাণকর কাজে নিয়োগ করতে হলে, তাকে অবশ্যই জড়িত থাকতে হবে ক্ষমতার অতিরিক্ত কোন পরিণামের সঙ্গে।

'ক্ষমতার অতিরিক্ত কোন উদ্দেশ্য থাকাই যথেষ্ট নয়; উদ্দেশ্যকে এমনই হতে হবে, যে তা সফল হলে, অন্যের বাসনা চরিতার্থতায় সহায়ক হয়। ...এটি হলো দ্বিতীয় শর্ত, যা ক্ষমতা প্রীতিকে পূরণ করতে হবে, যদি তাকে জগৎ-কল্যাণমুখী হতে হয়; একে অবশ্যই এমন একটি উদ্দেশ্যের সঙ্গে জড়িত হতে হবে, মোটামুটিভাবে, যা, ঐ উদ্দেশ্যের সাফল্যে যে সব লোক উপকৃত হবে তাদের বাসনার সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত হয়।'

বার্ট্রাণ্ড রাসেল কর্তৃক উল্লিখিত ক্ষমতার এই অভিমুখিতাকেই, বেদান্তে বলা হয়েছে আধ্যাত্মিকতার উন্নতির ফল—*গীতার রাজর্ষি* ভাবনার *ঋষি*-অংশ।

রাজনীতিক, পরিচালক, শিল্পপতি, বুদ্ধিজীবী—যারই হাতে ক্ষমতা থাকুক, সেখানেই ক্ষমতা নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। কারও *বেশি* ক্ষমতা, কারও *কম*। আর সাধারণত, সাধারণ নাগরিকের হাতে নির্বাচনের সময় ভোট দেওয়া ছাড়া—অতি সামান্য ক্ষমতাই থাকে। কিন্তু, যে কোন সামান্য কেরানি বা পুলিশ

কনস্টেবল বা রাজনীতির বা পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত যেকোন লোকেরই একজন সাধারণ নাগরিকের থেকে বেশি ক্ষমতা থাকে।

কিন্তু, আমরা শিখিনি, নিজেকে এরূপ প্রশ্ন করতে যে ঃ 'আমরা এই ক্ষমতা নিয়ে কী করব? কীভাবে এর প্রয়োগ করব? আমরা এক গণতন্ত্র; আমাদের সংবিধান জনগণের কাছে অনেক বড় বড় বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি ঐ সংবিধান অনুযায়ী কর্মানুশীলনের একজন সহায়ক। যে ক্ষমতা আমার হাতে এসেছে তা নিয়ে আমি কিভাবে কাজ করব?'

যেহেতু এ বিষয়ে আলোচনা করিনি, এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য নিজেদের শিক্ষিত করিনি, তাই এই চল্লিশ বছর ধরে ক্ষমতার অপব্যবহার করে জনগণের কত অপকার করেছি তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে আসে। প্রতিদিন তুমি দৃষ্টান্ত পাবে—ক্ষমতার অপব্যবহারের, আত্মম্ভরিতার, ভ্রষ্টাচারের ও নানারকম দোষের—যেগুলি আসে জনগণের স্বার্থে, তাদের শক্তিবৃদ্ধির ব্যাপারে, ঐ ক্ষমতাকে কাজে না লাগানোর জন্য। একটি গণতান্ত্রিক, রাষ্ট্রের কাজ হবে জনগণকে শক্তিশালী করা, তাদের দুর্বল করে রাখা নয়। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র জনগণকে দুর্বল করে রাখে। সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রও জনগণকে দুর্বল করে রাখে। গণতন্ত্রের কাজ হলো জনগণকে শক্তিশালী করে তোলা। এই চল্লিশ বছর আমরা এই আদর্শকে আমাদের সবার সামনে পরিষ্কারভাবে ধরে রাখিনি। কিছু কিছু ব্যতিক্রম অবশ্য দেখা যায়, যেখানে কোন কোন লোক ব্যক্তিগত নৈতিকতা ও মানবিক অনুভবনশীলতার তাগিদে—একাজ করেছে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে আমরা উপেক্ষা করেছি এবং তার জন্য প্রচুর খেসারতও দিয়েছি, যেমন স্বাধীন হবার চল্লিশ বছর পরেও আমাদের জাতীয় উন্নয়ন নিম্নমাত্রায় পড়ে আছে।

তিন বছর আগে, হায়দ্রাবাদের এই প্রতিষ্ঠানে আমরা *মহাভারতের শান্তিপর্বের রাজ-ধর্ম* বা রাজ্য-রাজনীতি, সম্বন্ধে ভীষ্মের বাণীগুলি আলোচনা করেছিলাম। ওটি একটি প্রভূত তাৎপর্যপূণ বিষয়। সেই উপলক্ষ্যে 'লোককল্যাণের জন্য ক্ষমতার ব্যবহার' বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম। এটি একটি বিশ্ব-সমস্যা। প্রত্যেক দেশেই কিছু লোকের অতিরিক্ত ক্ষমতা থাকে, আর কিছু লোকের কম। ঐ 'অতিরিক্ত ক্ষমতাবান' লোক কীরূপ ব্যবহার করে? এ সমস্যা সব দেশে, সব সমাজেই আছে। এ বিষয়ে গীতায় এবং সাধারণভাবে মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের জবাবের এবং চৈনিক ঋষিদের কিছু কিছু শিক্ষার, এক বিরাট তাৎপর্য

রয়েছে বর্তমান মানবজাতির কাছে, বিশেষত ভারতবাসীর কাছে। ঐ পরিপ্রেক্ষিতে তোমাকে রাজর্ষি ভাবকে বুঝতে হবে, যে ভাবের কথা শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ের— সূচনাতেই বলেছিলেন; *রাজর্ষয়োঃ বিদুঃ*, '*রাজর্ষিগণ* এ বিষয়টি জানতেন'।

যখনই তুমি ক্ষমতা নিয়ে নাড়াচাড়া কর, তোমাকে *রাজা* বলা হয়। রাজার মাথায় মুকুট নাও থাকতে পারে। যে কেউ ক্ষমতা নিয়ে নাড়াচাড়া করে সেই একজন রাজা। খুবই সীমিত অর্থেই *রাজা* মুকুটধারী হন। কিন্তু যে ক্ষমতা ব্যবহার করে সে অবশ্যই রাজা। কেউ মুকুটধারী হতে পারে, কিন্তু মনে কর তার কোন ক্ষমতা নেই, তবে সে কী রকম *রাজা? স রাজতে, বিরাজতে*, হাতে যে ক্ষমতা, রাজনীতিক ক্ষমতা রয়েছে তাতেই সে বিভাসিত। এই ভাবেই *রাজা* শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। তাই রাজনীতিক, বৌদ্ধিক বা যে কোন রকম ক্ষমতাই হলো অন্যের *ওপর* কর্তৃত্বের ক্ষমতা। এই হলো ক্ষমতা কথাটির অর্থ। প্রত্যেক সমাজেই, আমাদের এমন একজনকে চাই যে ক্ষমতাকে কাজে লাগাবে। তাই সমাজে রাজনীতি চাই। প্রাচীন গ্রীসে রাষ্ট্র-ভাবনাকেই প্রশাসনিক ব্যবস্থা বলা হতো। 'পোলিস' মানে নগর, সেখানে এক 'পলিটি', অর্থাৎ এক লোকগোষ্ঠী একত্রে বসবাস করে। "তারা কীভাবে একত্রে বাস করে? তারা কীভাবে পরস্পরের সঙ্গে মত বিনিময় করে? তাদের শাসনব্যবস্থা কীরূপ? এবং কীভাবে তাদের 'পলিটি'কে —গোষ্ঠীকে—বিদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রক্ষা করা হয়?" এই সব প্রশ্ন নিয়ে গ্রিকরা পুরাকালে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনা করেছিল। আধুনিক পাশ্চাত্য জাতিগুলিও এই গ্রিক্ নগর-রাষ্ট্র-শাসন-ব্যবস্থার ভাবনা থেকে আধুনিক রাজ্য শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। বর্তমানে আমরা আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীতে পরিণত হতে চলেছি। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসঙ্ঘ ক্রমে বেশি বেশি ক্ষমতা পাচ্ছে, আন্তর্জাতিক মানবিক ব্যাপার সংক্রান্ত কাজ করার জন্য। তাই, এও ক্ষমতা-ভাবনারই এক বিকাশ। যেখানেই একাধিক লোক, সেখানেই ক্ষমতা-ভাব এসে পড়ে, পরিচালন ব্যবস্থা ও প্রশাসন ব্যবস্থার ভাবও এসে পড়ে। যেখানে লোকসংখ্যা একটি সেখানে কোন সমস্যাই নেই। যখন কেউ একটি দ্বীপে একাকী থাকে সেখানে সমস্যা নেই; কারণ সেখানে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি নেই। সে সেখানে নিজের খুশি মতো কাজ করতে পারে। কিন্তু সেখানে অন্য লোক থাকলে, তাদের মধ্যে পরস্পর কথাবার্তা হওয়া দরকার। ঐ রকম পারস্পরিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করা চাই। তার মানে ক্ষমতা বিন্যাস। আর তখনই সেখানে আইন, নিয়ন্ত্রণ, বিধি, সভা ও সংসদ, এ সবই দৃশ্যপটে এসে হাজির হয়।

এইভাবে, আমরা এই পরিস্থিতিতে এসে পৌঁছেছি, যেখানে রয়েছে আমাদের এই বিশাল গণতন্ত্র, গ্রাম-পঞ্চায়েৎ, জেলা-পরিষদ, বিধান সভা ও শেষে সংসদ এবং সর্বোপরি বিরাট ও ক্রমবর্ধমান শাসন-যন্ত্রের হাতে প্রচুর ক্ষমতা। তাই ক্ষমতার ব্যাপারটিকে আজকাল আমরা চিনেছি। তাই, সব থেকে বড় প্রশ্ন হলো, এই ক্ষমতার ব্যবহার কীরূপ হবে। এমনকি বাড়িতে ছেলেমেয়েদের ওপর পিতামাতার ক্ষমতাও রয়েছে। তারা এ ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে না। এ ক্ষমতারও অপব্যবহার হয়েছে এমন সব ঘটনার নজির আছে। তাই রাষ্ট্রসঙ্ঘ রাষ্ট্রীয় কর্ম তৎপরতায় শিশুনির্যাতন নিবারণ করার এক পরিকল্পনা গড়ে তুলেছেন। অতএব, পিতার ক্ষমতা আছে, মাতার ক্ষমতা আছে, শিক্ষকের ক্ষমতা আছে, এইরূপে প্রত্যেকেরই ক্ষমতা রয়েছে তার অধস্তন লোকের ওপর।

তবে, রাজনীতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার ক্ষেত্রেই নানা ধরনের লোকের ওপর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া রয়েছে। এইখানেই আমাদের প্রয়োজন একটি তাত্ত্বিক দর্শনের, যা ক্ষমতাধিকারীদের পথ দেখাবে। ঐ দর্শন যদি ক্ষমতাধিকারীকে প্রেরণা না দেয়, তবে ক্ষমতায় *মত্ত* হয়ে সে পাগলের মতো কাজ করবে। মানুষ নিজের হাতে একটু ক্ষমতা পেয়ে কীভাবে *মত্ত* হয়, তা তুমি সহজেই দেখতে পাবে। কোন মানুষ আজকে খুব সরল ও সুন্দর; কাল তার পদোন্নতি ঘটিয়ে এক ক্ষমতাধিকারযুক্ত-পদে তাকে বসান হলো। নরই হোক আর নারীই হোক, তার সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিই পাল্টে যাবে। 'তুমি কি জান না আমি এখন কে?' ঐ ফেটে পড়া কথাতেই তার ক্ষমতার প্রকাশ দেখা যায়। এতে বোঝা যায় যে ঐ ব্যক্তি ক্ষমতা হজম করতে পারে নি। ক্ষমতা হজম করতে না পারলেই, তা তোমাকে মত্ত করে তুলবে। ঠিক যেমন মদ্যপানের মাত্রা একটু ছাড়িয়ে গেলে মন মাতালের মতো হয়ে যায়। ক্ষমতা তেমনি মাত্রাতিরিক্ত হলে মানুষ মত্ত হয়ে পড়ে। সেই ক্ষমতা রাজনীতিক, বৌদ্ধিক, আর্থিক অথবা সামন্ততান্ত্রিক বংশপরিচয় হতে পারে।

এই বিষয়টি নিয়ে মহাভারতের উদ্যোগপর্বে (৫.৩৪.৪২) একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক আছে :

বিদ্যামদো ধনমদঃ তৃতীয়োঽভিজনো মদঃ,
এতে মদা অবলিপ্তানাম্ এত এব সতাম্ দমাঃ—

অল্পকথায় কি সুন্দর একটি বাণী এই শ্লোক থেকে বেরিয়ে এলো। প্রথম *মদ* বা মত্ততা হলো *বিদ্যা* বা জ্ঞান থেকে। 'আমার এত বিদ্যা, আমি বুদ্ধিমান,

তা তুমি জান না? এই হলো *বিদ্যা-মদঃ*। দ্বিতীয় হলো *ধন-মদঃ*। এতদিন আমি গরিব ছিলাম হঠাৎ অনেক টাকা পেয়েছি। এতেই আমি মদ বা মত্ত। তৃতীয় হলো *অভিজনো-মদ* বা বংশ পরিচয়জনিত মত্ততা। দ্বিতীয় ছত্রে বলা হয়েছে, *মদা এতে*, 'এই সব *মদগুলি*, মত্ততাগুলি *অবলিপ্তানাম্* 'কেবল অবলিপ্ত, 'অমার্জিতরুচি, সংস্কৃতিহীন লোকেদের জন্য'। কিন্তু *এতে এব সতাম্ দমাঃ*, 'উদারমনা লোকেদের কাছে এই মদগুলিই *দম*স্বরূপ হয়ে যায়। সংস্কৃত ভাষাতেই কেবল *মদ*-শব্দের *দম*-শব্দে রূপায়িত হওয়ার মতো সৌন্দর্য ও তাৎপর্য দেখা যায়। *মদ*-শব্দকে উল্টে দেওয়া হয়েছে। যদি *মদ*-শব্দের অর্থ হয় মত্ততা, *দম* শব্দের অর্থ হবে সম্পূর্ণ আত্ম-সংযম। সম্পূর্ণ আত্মানুবর্তিতার নাম হলো *দম*। যে নর বা নারী সমস্ত ক্ষমতাকে হজম করেছে, অতিরিক্ত কিছু নেই, যা তাকে মত্ত করতে পারে।

রামায়ণ মহাকাব্যে দেখা যায়, রাম কীভাবে ক্ষমতাকে হজম করেছিলেন। ভরতই বা কীভাবে ক্ষমতাকে হজম করেছিলেন। *এতে এব সতাম্ দমাঃ*, প্রকৃত মহৎ ব্যক্তিতে সব রকম *মদ* অর্থাৎ মত্ততা, *দম* অর্থাৎ সংযমে রূপায়িত হয়। কোন লোক যদি অতিরিক্ত মদ পান করে তবে সে মত্ত হয়ে যায়; তখন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান তার অনুভূতিতে আসে না। সে সব সময়ে টলতে থাকে, ইতোমধ্যে কিছু কিছু অশোভন আচরণও করে ফেলে। তাই অনেকে কবিতায় ও নাটকে ক্ষমতাকে মদ্যপানের সঙ্গে, যাতে মত্ত হওয়া যায় তার সঙ্গে তুলনা করেছে। এই শ্লোকে তারই বিশেষ উল্লেখ রয়েছে; কিন্তু প্রচুর মদ্যপান করেও— তা হজম করে—এমন লোকও আছে। তেমনি, এখানে, কোন কোন লোক ক্ষমতা হজম করতে পারে। এ হলো আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্যে হজম করা। এ শক্তি আসে *যোগ*-অভ্যাসের দ্বারা। *যোগ*-শক্তি মানুষকে এই সব ক্ষমতা হজম করতে সহায়তা করে এবং সেই লোকের কাছে সকল *মদ* অর্থাৎ মত্ততা *দমে* অর্থাৎ সংযমে রূপায়িত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কথা বলেছিলেন; সে প্রায়ই তাঁর কাছে এসে তাঁর সঙ্গে খোলাখুলিভাবে কথা বলত। একদিন সে এসে শ্রীরামকৃষ্ণকে ব্যঙ্গ করে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে ডাকতে লাগল ঃ 'কিহে, ও পুরুত মশায়! তুমি কেমন আছ?' একথা শুনে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গীকে বলেন, 'ও নিশ্চয়ই কিছু টাকা পেয়েছে। তাই আজ তার মধ্যে এই পরিবর্তন এসেছে'। এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগর্ভ গল্প আছে ঃ

একদিন, এক ভেক্ বাগানে লাফাতে লাফাতে একটি *চকচকে* টাকা পায়। ভেকটি টাকাটিকে নিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল, তার ভাল লাগল, তাই সেটিকে তার গর্তে নিয়ে গিয়ে সেখানে রেখে দিল। কিন্তু সেইদিন থেকে সে যেন অন্য ভেক্ হয়ে গেল। "*আমার কাছে পুরো একটা টাকা আছে!* আমি সেই পরিমাণ ধনী।" তাই, অন্য একদিন যখন একটা হাতি তার গর্তের পাশ দিয়ে গেল, এই ভেকটি রাগ দেখাতে দেখাতে গর্ত থেকে বেরিয়ে এল; "হাতিটির কী দরকার ছিল আমার গর্তের পাশ দিয়ে যাবার?" এই কথা বলে, সে হাতিকে কয়েকবার লাথি দেখিয়ে ফিরে গেল, আর গর্তের ভেতর সেই টাকাটির দিকে তাকিয়ে রইল। পৃথিবীতে ঐ ভেকের অস্তিত্বই হাতিটার জানা ছিল না; কিন্তু ভেকটা খুশি যে ঃ "আমি আমার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বোধ ঠিক মতো প্রকাশ করতে পেরেছি।"

এই হলো অজীর্ণ অর্থাৎ বদ-হজম-হওয়া ক্ষমতা। আর পৃথিবীর সাহিত্যে এরকম বদ-হজম-হওয়া ক্ষমতার বেশ কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। আমি 'হজম' কথাটি ব্যবহার করি, কারণ এটি সহজ-বোধ্য। আহার করার পর, তা যদি হজম হয়, তবেই তা থেকে শক্তি উৎপন্ন হয়। আহার হজম না হলে তা অধিবিষ বা জৈব বিষ হয়ে দাঁড়ায়। তা একরকম বিষে পরিণত হয়। তেমনি সব রকম অভিজ্ঞতাকে হজম করা দরকার। আর কেবল একটি শক্তিই আছে, যা তাদের হজম করাতে পারে; তা হলো তোমার অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তি। আধ্যাত্মিকতার অগ্নি সব রকম ক্ষমতাকে হজম করাতে পারে। এই অধ্যায়ের শেষে আমরা *জ্ঞানতপঃ*, 'জ্ঞানাগ্নি!' কথাটির উল্লেখ দেখতে পাব। এই হলো এখানে *যোগের* অর্থ।

এই বিষয়টির উল্লেখ পাওয়া যায় ইংরেজি সাহিত্যে সেক্সপিয়ারের *Measure for Measure* (Act-II, Sc ii) নাটকের এক প্রসিদ্ধ অংশ বিশেষে ঃ

'But man, proud man,
Drest in a little brief authority,
Most ignorant of what he's most assured,
His own glassy essence, like an angry ape,
Plays such fantastic tricks before high heaven
As make the angels weep; ...'

—কিন্তু মানব, গর্বিত মানব,

সামান্য ক্ষণিক কর্তৃত্বে সজ্জিত হয়ে,
থেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত সেই অতি নিশ্চিত পদের কথা
যে বিষয়ে তার সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়ার কথা
তারই সম্পর্কে সে থাকে সব থেকে অনবহিত,
যা তার অতি নির্মল আপন পরমসত্তা, ক্রুদ্ধ বানরের মতো,
উর্ধ্বলোকে স্বর্গের সামনে, দেখায় সে এমন সব উদ্ভট ভেঙ্কি
যাতে দেবদূতগণকেও করতে হয় অশ্রুমোচন।

এই মানুষটি কী? সে কত অদ্ভুত কাজ করতে পারত; কিন্তু সে বানরের মতো ব্যবহার করছে। মানুষটির অবস্থা দেখে দেবদূতগণ কাঁদছে। কেন? তাকে ক্ষণিকের জন্য সামান্য কর্তৃত্বে ভূষিত করা হয়েছে। বেশি দিনের জন্য নয়। বহুদিন আগে, আমার এক ডেপুটি কমিশনার বন্ধু, মহীশূরে থাকতে আমায় বলেছিল ঃ 'স্বামীজী, আমার বদলির হুকুম অফিসে পৌঁছুতেই, আমি ঘরে ঢুকলে এখন আর কেউ দাঁড়িয়ে ওঠে না। এর আগে পর্যন্ত তারা সবাই দাঁড়াতো। এখন তারা দাঁড়ান বন্ধ করেছে'। একেই বলে 'ক্ষণিক' কর্তৃত্ব। এ ক্ষমতা এতই সীমিত। সেক্সপিয়ার এ বিষয়টি বুঝতেন ঃ 'man dressed in a little brief authority, most ignorant of what he is most assured, his own glassy essence,'—'সামান্য ক্ষণিক কর্তৃত্বে সজ্জিত মানুষ, যে বিষয়ে তার সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়ার কথা তারই সম্পর্কে সে থাকে সব থেকে অনবহিত'—তার নিজ আত্মার কথা, অনন্ত আত্মার কথা। যদি সে তা জানতো, তবে সে ঐ ক্ষমতাকে হজম করতে পারতো। সে আত্মার কথা জানে না, তাই 'plays such fantastic tricks before high heaven, as make the angels weep'—'উর্ধ্বলোকে স্বর্গের সামনে দেখায় সে এমন সব উদ্ভট ভেঙ্কি উর্ধ্বলোকে স্বর্গের সামনে যাতে দেবদূতগণকেও করতে হয় অশ্রুমোচন'।

আজকাল ক্ষমতাধিকারীর ক্ষমতা-অপপ্রয়োগের ফলে আমাদের সমাজে কতই না অন্যায় হয়ে চলেছে। আমি একটি দৃষ্টান্ত দেব; একে লক্ষগুণ বাড়িয়ে নিতে পারি। দিল্লীতে এক নাগরিক টেলিফোন অফিসারকে তার খারাপ টেলিফোনটি বদলে দিতে বলে, অফিসারটি অনেক টাকা ঘুষ চায়, যা ঐ নাগরিকের সামর্থ্যের অতীত। ঐ নাগরিক, যাকে তাকে নয়, একেবারে প্রধানমন্ত্রীকে ধরে নতুন টেলিফোন পায়। কয়েকদিন পরে, ঐ অফিসারটিই নতুন টেলিফোনটি খুলে নিয়ে যায়! ঐ নাগরিকটি কত অসহায়! নিচু স্তরে এই সব ঘুষ চাওয়ার ব্যাপার সাধারণ নাগরিককে খুবই কষ্টের মধ্যে ফেলে।

অন্যায় অবিচারের শত শত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সমাজে অন্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ে। সমাজে দারিদ্র্য থাকতে পারে, অজ্ঞান থাকতে পারে, ওগুলি রাষ্ট্রকে দুর্বল করে না। কিন্তু যদি অবিচার থাকে আর তার মাত্রা যদি বৃদ্ধি পেতেই থাকে—তবে তা সমাজের গণতান্ত্রিক কাঠামোটিকে নড়বড়ে করে দেবে। সমাজের ক্ষমতাধিকারী লোক যদি ক্ষমতার অপব্যবহার করে তখনই অন্যায়-অবিচার সমুপস্থিত হয়। এই সব লোকের মধ্যে কোন আধ্যাত্মিক শক্তি নেই, যার সাহায্যে সে ক্ষমতাকে হজম করে তা দিয়ে জনহিতকর কাজ করতে পারে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শক্তিবৃদ্ধি ও লক্ষ লক্ষ লোকের সমস্যা সমাধানের জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে সাহায্য করতে প্রয়োজন, একটি তত্ত্বনির্ধারক দর্শনের। সেই দর্শনই শ্রীকৃষ্ণ আমাদের এখানে দিচ্ছেন। ক্ষমতা লাভ কর। আমাদের ক্ষমতার প্রয়োজন আছে, কিন্তু আমাদের জানতে হবে কিভাবে রাষ্ট্রের কল্যাণে, জনগণের কল্যাণে করা যায় এর প্রকৃষ্ট ব্যবহার; সেই হজম শক্তি ক্ষমতাধিকারীদের আসে তাদেরই অন্তর্নিহিত এক গভীরতর উৎস থেকে, যথা, মানবসত্তার আধ্যাত্মিক প্রকৃতি। সেই শক্তির বিকাশ যখন তুমি ঘটাতে পারবে, তখন সব কিছুই সহজ হয়ে যাবে। তখন কোন অবিচার নয়, কোন দলন নয়, কোন শোষণ নয়, কেবল মানবিকতার ভাব, সেবার ভাবই তোমাকে অনুপ্রাণিত করতে থাকবে তোমার সারা কর্মজীবন ধরে। তুমি যদি প্রশাসনে নিযুক্ত ব্যক্তিদের অন্তত ১০ বা ১৫ শতাংশকেও এই দর্শনের ভাবাদর্শে শিক্ষিত করে তুলতে পার তবে মানবিক পরিস্থিতিতে এক প্রচণ্ড পরিবর্তন সাধিত হবে। কিন্তু এখনও এমনটি ঘটছে না, যদিও এর প্রতিকার আমাদের জানা আছে; যেহেতু প্রতিকার আমাদের হাতেই আছে—ব্যাধির কথায় ভয় পাবার দরকার নেই। ব্যাধি খারাপ, কিন্তু প্রতিকারহীন ব্যাধি আরো খারাপ। কিন্তু এ যদি এমন 'ব্যাধি হয় যার প্রতিকার সহজলভ্য' তবে আমরা একদিন না একদিন ঐ ব্যাধির উপশম ঘটাতে পারব। আমি আশা করি যে আমার দেশবাসী গীতার এই মহান তত্ত্ব-দর্শন ও এর *রাজর্ষি* ভাবনাকে বুঝবে এবং দেশ প্রেম, মানব প্রেম ও জনসেবার ভাবে উদ্বুদ্ধ হবে।

এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায়, ১৯৪৯ খ্রিঃ হায়দ্রাবাদের সামরিক রাজ্যপাল জেনারেল জে. এন. চৌধুরীর—'রাজ্যপাল হিসাবে আমার জন্য গীতার কি কোন বাণী আছে?'—প্রশ্নের উত্তরে তাঁর সঙ্গে যে সব কথাবার্তা হয়েছিল তার আমি উল্লেখ করেছিলাম। আমি বলেছিলাম, 'হাঁ, একটি মহতী বাণী আছে আপনার জন্য।' তিনি ভাবতেন কেবল মনে একটু শান্তি পাবার জন্যই তাঁর

গীতা থেকে কয়েকটি করে শ্লোক পড়া।' উত্তরে আমি বলি 'না, এ ধারণা একেবারে ভুল। এই দর্শন আপনাকে শিক্ষা দেবে সর্ব লোক-কল্যাণের জন্য আপনার ক্ষমতাকে কীভাবে প্রয়োগ করতে হবে সে বিষয়ে।' *ক্ষত্রিয়ানাম্ বলাধানায়,* এ বিষয়ে শঙ্করাচার্যের ভাষ্য হলো ঃ 'ক্ষত্রিয়কে অর্থাৎ ক্ষমতাধিকারীকে বলীয়ান করার জন্য।' তখনও পর্যন্ত ক্ষত্রিয় কথায় *ক্ষত্রিয়* জাতি বোঝাত—যা কেবল ভারতেই রয়েছে। কিন্তু ক্ষত্রিয়ত্ব এক সর্বজনীন ব্যাপার। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রেগন একজন *ক্ষত্রিয়*। তেমনি সোভিয়েট ইউনিয়নের গর্বাচভও একজন *ক্ষত্রিয়*। আমাদের প্রধান মন্ত্রী একজন *ক্ষত্রিয়*। এইভাবে এঁরা সকলেই *ক্ষত্রিয়,* কারণ এঁরা ক্ষমতাধিকারী—মুকুটধারী নাও হতে পারেন। তাঁদের ক্ষমতা আছে; কিন্তু তাঁদের সকলেরই একটি নতুন ধরনের সামর্থ্য চাই, যার দ্বারা তাঁরা ঐ ক্ষমতা হজম করতে পারবেন ও তা সর্বলোকের কল্যাণে ব্যবহার করবেন। তাই শঙ্করাচার্য এর নাম দিয়েছেন ঃ *ক্ষত্রিয়ানাম্ বলাধানায়,* 'ক্ষমতাধিকারীকে বলীয়ান করার জন্য'। যাতে এই ক্ষমতা দিয়ে তাঁরা—তাঁদের চারিদিকে যে সব মানুষ রয়েছে—তাদের সেবা করার সামর্থ্য লাভ করেন। *জনান্ পরিপিপ্পালয়িতুম্,* 'জনগণকে এমনভাবে শাসন করতে হবে, যে তারা যেন নিজেদের মহৎ বলে মনে করে'—একেই বলে লোকতান্ত্রিক রাষ্ট্র। রাজনীতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার সংস্পর্শে এসে লোকে নিজেদের মহৎ বোধ করবে, ক্ষুদ্র হবে না। ক্ষুদ্র হয় সামন্ততান্ত্রিক প্রশাসনে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে, সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতা নর-নারীকে স্পর্শ করে তাদের খর্ব করার জন্য। গণতান্ত্রিক সমাজে রাজনীতিক ক্ষমতা জনগণকে স্পর্শ করে তাদের আত্মসম্মান বোধ ও স্বাধীন চেতনা জাগিয়ে তাদের আরো বড় আরো মহৎ করে তুলতে। যখন তারা এই *যোগ*-দর্শনের অধিকারী হয়, তখন তাদের সামর্থ্য জেগে ওঠে জনগণের সুখ ও কল্যাণের জন্য কাজ করতে। *সেই* শক্তিটি কী বস্তু, যা হজম করাতে পারে এই সব রাজনীতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতাকে, যেগুলি মানবিক পরিস্থিতিকে বিক্ষিপ্ত করছে, আর সৃষ্টি করছে অন্যায় ও অবিচার? সেটি হলো *যোগ* শক্তি, যা অন্তর্নিহিত আছে প্রতিটি মানব সত্তায়।

মহাকাব্য *মহাভারতে* প্রতিটি মানব সত্তার অন্তর্নিহিত শক্তির তিনটি উৎসের কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ের উল্লেখ আগেও আমি করেছি। প্রথম উৎস হলো, *বাহুবলম্,* পেশী শক্তি। তোমার শরীর যদি দুর্বল হয়, কোন সবল ব্যক্তি তোমাকে ঠেলে দেয়ালের কাছে নিয়ে যেতে পারে; এই হলো পেশী শক্তি। কিন্তু এ অতি সাধারণ শক্তি। দ্বিতীয় শক্তি হলো, *বুদ্ধিবলম্,* বুদ্ধিজাত শক্তি।

তোমার প্রবলতর বুদ্ধি শক্তির সাহায্যে তুমি জনগণের ক্ষতি করতে পার, তাদের শোষণ করতে পার। কিন্তু এই শক্তির সাহায্যে তুমি জনগণের কল্যাণও করতে পার। কিন্তু জনকল্যাণ করার স্পৃহা বুদ্ধিতে স্বতঃই জেগে ওঠে এমন নয়, এটি আসে অন্য একটি উৎস থেকে। এই তৃতীয় উৎস হলো *যোগবলম্* বা *আত্মবলম্*। অতএব, *বাহুবলম্, বুদ্ধিবলম্, যোগবলম্* বা *আত্মবলম্*। এই তিনটি শক্তি তোমার আমার মধ্যেই নিহিত আছে। আর গীতায় বলা হয়েছে, যাদের ওপর রাজনীতিক ও অন্য ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে, তাদের মধ্যে অবশ্যই কিছুটা *যোগবলের* জাগরণ হওয়াও দরকার। খুব বেশি নয়; এমন কি এর সামান্য অভ্যাসেই মানুষটি ভয়হীনতা ও শান্তির এক আকর হয়ে উঠবে। তাদের বড় বড় *ঋষি*প্রতিম পুরুষ হতে হবে না, কিন্তু তাদের অবশ্য *ঋষিত্বে* পৌঁছুবার পথটি ধরতে হবে, একটু আধ্যাত্মিক হতে হবে, যার সহায়তায় ক্ষমতার পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে জনগণের সেবা করতে পারবে ও তাদের আর একটু স্বস্তিতে ও সুখে থাকার সুযোগ করে দিতে পারবে। এই হলো *আত্মবল* বা *যোগ* বলের গুরুত্ব।

শ্রীকৃষ্ণ আগেই বলেছেন, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঃ *স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ* 'এই ধর্মের, এই তত্ত্বদর্শনের, সামান্য মাত্রও অভ্যাস করলে মানুষের বড় বড় ভয়ের কারণ দূরীভূত হয়'। অতএব, একজন সামান্য আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন জেলা-কালেক্টরের কথা কল্পনা কর ঃ তার দ্বারা কতই না কল্যাণ সাধিত হবে—চার পাশের জনগণের! তেমনি একজন প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক বা শিক্ষিকার ক্ষেত্রেও ঃ সামান্য আধ্যাত্মিক শক্তি তার মধ্যে এলে সে একজন শিশুসেবক বা শিশু সেবিকায় পরিণত হবে, শিশুদের দেখভাল করবে, লেখাপড়া শেখাবে, দেশের সুনাগরিক হিসেবে তাদের গড়ে তুলবে। এই সব উচ্চতর প্রেরণা আসে কেবল একটি মাত্র উৎস থেকে, তা হলো ঃ *আত্মবলম্* বা *যোগবলম্*, যা *বুদ্ধিবল*কে অনুপ্রাণিত করবে। বুদ্ধি সংশুদ্ধ হয় মানব ব্যক্তিত্বের গভীরতর স্তর থেকে উৎসারিত আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা। আর বেদান্তের মতে, এটি মানবজাতির পক্ষে একটি সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য। *যোগবল* প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই রয়েছে। কেবল মানুষকে চেষ্টা করতে হবে তাকে ভিতর থেকে বাইরে আনতে, তাকে প্রস্ফুটিত করতে, তার বিকাশ ঘটাতে। তাই, কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে ক্লাসে যাবার সময় তাঁর নিজ মনে প্রশ্ন তুলতে হবে ঃ 'আমি এখানে কেন এসেছি? এই সব শিশুরা অনেক দূর থেকে এসেছে; তারা বহুকাল কোন শিক্ষা পায়নি। আমাদের দেশ এখন স্বাধীন; ভারতীয় নাগরিক হিসাবে, আমি

জাতির একটি যন্ত্রবিশেষ, যার কাজ হলো শিক্ষা দেওয়া, জ্ঞান বিতরণ করা'। সেই মুহূর্তেই ঐ শিক্ষক বা শিক্ষিকা হয়ে উঠবেন এক মহৎ ব্যক্তি, তিনি আর সামান্য স্কুল শিক্ষক মাত্র থাকবেন না। সে এখন মানবিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারযোগ্য জাতির একটি যন্ত্রস্বরূপ। যখনই তিনি কথা বলবেন, তা হবে কেবল শিশুদের শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে, তাদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে। সরকারি দপ্তরের একজন কেরানির ক্ষেত্রেও ঐ কথা, রাস্তায় পুলিশ-কনস্টেবলের ক্ষেত্রেও তাই এবং যে কোন সরকারি পদাধিকারীর ক্ষেত্রেও তাই। এরা যদি একটু আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন হয়ে ওঠে তবে সমাজে এক বিরাট পরিবর্তন আসতে পারে।

তাই শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত শক্তিকে *রাজা* ও *ঋষি* দুই-এর মিলিত সত্তায় ন্যস্ত করার ওপর জোর দিয়েছেন। কেবল *রাজা* হয়ো না, কেবল *ঋষি* হয়ো না, দুই-এর মিলন ঘটাও একের মধ্যে। তোমার ক্ষমতা আছে; তাকে একটু আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে শোধন করে নাও। এই শোধিত ক্ষমতাই এখন দরকার। আজকাল ওদেশে একে বলে 'ক্ষমতাকে পোষ মানান'। আমাদেরও ক্ষমতাকে 'পোষ মানাতে' হবে। সাধারণত, প্রত্যেক সংবিধানে ক্ষমতাকে 'পোষ মানাতে' বাহ্য উপায়ের ওপর নির্ভর করা হয়। তা কী রকম? তা হলো, যাকে 'ক্ষমতা-সাম্য' বজায় রাখা বলা হয়। রাষ্ট্রপতির একরকম ক্ষমতা, প্রধানমন্ত্রীর আর একরকম ক্ষমতা, বিচারকবর্গেরও আপন ক্ষমতা রয়েছে; একজন অন্যজনকে সংযত করবে; এইভাবে সাংবিধানিক 'ক্ষমতা-সাম্য'-এর ব্যবস্থা আমাদের সংবিধানে বিহিত করা আছে। কিন্তু সবসময়েই এগুলিকে আমরা ওলট-পালট করে দিতে পারি, যেমন এখন হচ্ছে; কিন্তু যখন এই আধ্যাত্মিক শক্তির সংস্পর্শে ঐ ক্ষমতাধিকারীর ক্ষমতা শোধিত হয়, তখন শাসনব্যবস্থা বিনা বাধায় চলতে থাকে; ফলে কোনরকম ক্ষতিকর সংঘর্ষের সম্ভাবনা থাকে না।

অতএব, আমরা দেখতে চাই এক সুখী সমাজ গড়ে উঠেছে, যেখানে শান্তি ও পারস্পরিক সহযোগিতা বিরাজ করছে, আর প্রত্যেকেই অন্যের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। সেবা ভাব কেবল আত্মবলের উচ্চস্তর থেকেই এসে থাকে। যখনই তুমি শোধন ব্যবস্থা ছাড়া ক্ষমতা লাভ করবে, তখনই তোমার ইচ্ছা হবে জনগণকে শোষণ করার ও ভ্রষ্টাচারের মাধ্যমে নিজের আত্মম্ভরিতা প্রকাশের। ক্ষমতা-শোধনেরই এখন প্রয়োজন। তাই, *গীতায় রাজর্ষি* কথার ব্যবহার। *রাজা* হও, আবার *ঋষিও* হও। কীভাবে? তোমার মধ্যে

একটু আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারের মাধ্যমে, তোমার অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তিকে সামান্য বিকশিত করে। এইটিই আমাদের এখানে চাই, বলছেন *ভগবান* শ্রীকৃষ্ণ!

জনমুখী রাষ্ট্রের বিষয়টি, রাজর্ষি ভাবনার মাধ্যমে, আমি আরো বিস্তৃতভাবে পর্যালোচনা করেছি, *Democratic Administration in the Light of Practical Vedanta*, (ব্যবহারিক বেদান্তের আলোকে গণতান্ত্রিক প্রশাসন)-নামে, রামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, চেন্নাই-৪, থেকে প্রকাশিত আমার গ্রন্থটিতে। গ্রন্থটি বিভিন্ন শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে প্রদত্ত ছয়টি বক্তৃতার সংকলন, যথা ঃ

(১) মহীশূর (এখন কর্ণাটক) রাজ্য দপ্তরখানার কর্মচারিবৃন্দের কাছে, বিধান সৌধ কনফারেন্স হল, ব্যাঙ্গালোরে, Indian Institute of Public Administration, Mysore Regional Branch-এর পরিচালনায় প্রদত্ত বক্তৃতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ তারিখে, বিষয় ছিল ঃ *The Philosophy of Democratic Administration*, (গণতান্ত্রিক প্রশাসনের তত্ত্ব)।

(২) নিউ দিল্লীতে Indian Institute of Public Administration-এ ২ আগস্ট ১৯৭৯ তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতা; বিষয় ছিল ঃ *Social Responsibilities of Public Administrators*, (রাষ্ট্রীয় প্রশাসকগণের সামাজিক দায়িত্ব)।

(৩) মুম্বাইতে *Indian Institute of Public Administration*, মহারাষ্ট্র শাখা, মন্ত্রালয়-এ ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯ তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতা; বিষয় ছিল ঃ The Science of Human Energy Resources (মানবীয় শক্তির সম্পদ-বিজ্ঞান)।

(৪) কেরালায় Barton Hill, তিরুবানন্তপুরমে Institute of Management in Government-এ ১৫ ডিসেম্বর ১৯৮৩ তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতা; বিষয় ছিল ঃ *Human Values in Administration* (প্রশাসনে মানবিক মূল্যবোধ)।

(৫) দিল্লী Municipal Corporation-এর টাউন হলে, ৫ ডিসেম্বর ১৯৮৪ তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতা, বিষয় ছিল ঃ *The Role of Local Self Government Institutions in our Democracy*. (আমাদের গণতন্ত্রে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন সংস্থাগুলির ভূমিকা)।

(৬) হায়দ্রাবাদের সরকারি দপ্তরখানায় খোলা ময়দানে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রশাসনিক কর্মীদের জমায়েতে, ২৪ মার্চ ১৯৮৬ তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতা; বিষয় ছিল ঃ *Administrative Efficiency and Human Resource Development* (প্রশাসনিক দক্ষতা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন)।

ঐ *গ্রন্থের* পরবর্তী সংস্করণে, একই রকম ৭ম বক্তৃতাটি থাকবে, যা প্রদত্ত হয়েছিল লক্ষ্ণৌ সচিবালয়ের বিধান ভবনের তিলক হলে উত্তর প্রদেশ প্রশাসনিক কর্মচারীদের কাছে ২ এপ্রিল ১৯৬৮ তারিখে; বিষয় ছিল : *The Philosophy of Service* (সেবার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি[১])। এটি বর্তমানে ভারতীয় বিদ্যাভবন, মুম্বাই-৭, কর্তৃক প্রকাশিত Eternal Values for a Changing Society (পরিবর্তনশীল সমাজের চিরন্তন মূল্যবোধ) গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

গীতার সমগ্র শিক্ষা সারা বিশ্বে জনগণের কাছে *আত্মবিকাশের*, 'আধ্যাত্মিক উন্নতি'র বার্তা বহন করে; এ একরকমের মাহাত্ম্য, যার সামনে এলে অন্য সকলেও মহত্ত্ব অনুভব করে। কী চমৎকার ভাবটি! মায়ের মাহাত্ম্যে ছেলেও নিজেকে উন্নতবোধ করবে। এক গান্ধীজীর সামনে, অন্য সকলেই উন্নতবোধ করত। তাতে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। একজন মুসোলিনীর বা একজন হিটলারের কাছে, অন্য সকলে নিজেদের ক্ষুদ্রতর মনে করত। ঐরকম নেতারা অন্য লোকের মহত্ত্ব বিনাশ করে নিজেদের মহত্ত্ব অর্জন করত।

অত্যন্ত সাধারণ লোকের মধ্যে মহত্ত্ব আরোপ করতে হলে সেইরকম ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন যার মধ্যে *রাজা* ও *ঋষির* মিলন ঘটেছে। আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া না লাগলে ঐ ব্যক্তিত্ব কখনই স্ফুরিত হয় না। যেখানেই এই রকম ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটেছে, তাঁদের আধ্যাত্মিক গুণাবলী অন্য লোককে তাঁদের কাছে আকর্ষণ করেছে। এঁরা হয়তো কখনো কোন মন্দিরে বা গির্জায় বা কোন গুরুদ্বারে যান নি; তাঁরা হয়তো বা অজ্ঞেয়বাদী বা নাস্তিকও হতে পারেন। কিন্তু তাঁরা আধ্যাত্মিকতায় উন্নত হয়েছেন। আমেরিকার ইতিহাসে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম্ লিঙ্কন হলেন এর বিশেষ দৃষ্টান্ত, তাঁর সামনে এমন কি নিম্নতম ব্যক্তিও মর্যাদার আসনে উন্নীত হতো। এই হলো প্রকৃত মানবিক মহত্ত্ব। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে, এমন মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত কদাচিৎ আমাদের নজরে পড়েছে। সামন্ততান্ত্রিক প্রভুর কাছে আর সবাই ক্রীতদাসস্বরূপ হয়ে যেত। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মাতাপিতার কাছে সন্তান ছোট্ট শিশুটি হয়ে থাকত। এই রকমই ছিল পুরাতন সমাজ। কিন্তু নতুন সমাজ অন্য রকম হতে চলেছে। মাতাপিতার কাছে শিশুরা নিজেদের মর্যাদাসম্পন্ন বলে জ্ঞান করে। তারা আত্মবিশ্বাস লাভ করে। কি চমৎকার ভাব! এইরকম মানবিক উন্নতি ঘটে যখন *গীতার যোগ* ভাবনার সামান্যও মানুষের হৃদয় ও মনে প্রবেশ করে। এ এক

১ এই নামে বাংলায় উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়।

অতি প্রযুক্তি-সিদ্ধ দর্শন। এ কাজ তত্ত্ব বা আচার-অনুষ্ঠানাদির ওপর নির্ভরশীল নয়, কোনরূপ ভেল্কি বা রহস্যের ওপর তো নয়ই। *এ এক রূপান্তর, এক মানবীয় আধ্যাত্মিকতার ক্রমবিকাশ, মানুষের অনন্ত সম্ভাবনার দ্বারোদ্ঘাটন—একের পর এক।*

আমাদের ভারতীয় সমাজ কয়েক শতাব্দী ধরে—সেদিন পর্যন্ত মানবোন্নয়নের গতিকে রুদ্ধ করে রাখতো। কেউ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইলে, কোন ধাক্কা এসে যেন মাথায় পড়তো; কোথা থেকে যে আসতো তা কেউ জানতো না! এই রকমই ছিল আমাদের সমাজ। এখন আমাদের সমাজ প্রত্যেককে বলে ঃ 'উঠে পড়! আমি এখানে আছি, সাহায্য করব। আমি তোমাকে তোমার পায়ের ওপর দাঁড় করাব।' কী পরিবর্তন! এই পরিবর্তনই স্বামী বিবেকানন্দ বর্তমান ভারতে আনতে চেয়েছিলেন—তাঁর কর্মজীবনে বেদান্ত সম্বন্ধীয় বাণীগুলির মাধ্যমে—আর তাঁর মতে *গীতাতেই* সব থেকে ভালভাবে ঐ বিষয়ের মর্মোদ্ঘাটিত হয়েছে। প্রত্যেক শিশু, প্রত্যেক শ্রমিকের অবশ্য বোধ হওয়া চাই যে সমাজের মধ্যে তার একটা স্থান আছে, একটা মর্যাদা আছে—আর স্বাধীন ভারত তাকে সাহায্য করবে ঃ কী সুন্দর ভাব! এ সবই বেদান্ত, খুবই কার্যকর বেদান্ত। স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পূর্বে এ তত্ত্ব আমরা জানতাম না। আমাদের পুরোহিতকুল এবং সাধুরাও বেদান্ত আলোচনা করতেন তত্ত্বের দিক দিয়ে, আর তাঁদের জীবনযাপন ও কর্ম ছিল অ-বৈদান্তিক, সেই ভাবেই তাঁরা সমাজকে ভুল পথে চালিয়েছেন। বেদান্ত শেখায় প্রত্যেক মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের কথা, আর ভারতীয় সমাজ একই সমাজের গরিব ও নিম্নতর স্তরের লোকেদের পদদলিত করেছে। স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পর বেদান্তের মাধ্যমে মানবীয় পরিস্থিতির রূপান্তর সাধনের প্রভূত সম্ভাবনার কথা প্রকাশিত হওয়ায় জনগণের অবস্থা ভালর দিকে ফিরছে। এই দিকেই আমরা আজকাল আমাদের সমাজে প্রচেষ্টা চালিয়েছি। প্রত্যেকেই আপন মর্যাদাবোধ, মূল্যবোধ উপলব্ধি করছে। 'আমার সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াও'—আজ এই হলো আমাদের গণতন্ত্রের ডাক সর্বসাধারণের প্রতি—হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক অথবা খ্রিস্টানই হোক।

আমি দেখেছি, আমাদের সাধারণ লোককে এ কথা বোঝান কঠিন। জনগণকে বহু শতাব্দী ধরে বলা হয়েছে—'তোরা কেউ নয়, তোরা কিছু নয়'। আমি যদি বলি তুই সমাজের এক জন, তবে তাদের সেকথা মোটেই বোধগম্য

হয় না। তাদের কাছে এ এক নতুন দর্শন, নতুন ভাবনা। আমার মনে আছে ১৯৩৯-৪২ খ্রিঃ আমি যখন রেঙ্গুনের রামকৃষ্ণ মিশনে ছিলাম তখন সরকারি দপ্তরখানা অথবা অন্য অফিস থেকে চিঠি নিয়ে পিওনরা আমাকে দিতে আসত। গরমকালে তারা ঘর্মাক্ত কলেবর হতো। আমাকে চিঠিখানি সই করে নিতে হবে; ততক্ষণ পিওনটি দাঁড়িয়ে থাকবে। তাই আমি বলতুম, 'এখানে চেয়ার রয়েছে, বস।' সে বলত, 'না, আমি বসব না, আমার বসার অনুমতি নেই'। 'না, আমি বলছি, অনুগ্রহ করে বস।' তবু সে বসত না; এমনিভাবেই তাদের সম্মোহিত করে রাখা হয়েছিল। আমি যুক্তি দিয়ে বললাম, 'এ চেয়ার বসার জন্য, মাথায় করে নিয়ে যাবার জন্য নয়; অতএব, অনুগ্রহ করে বস।' শেষে, আমি বলতাম, 'তুমি *আমার* চাকর নও। তুমি অন্য কারও চাকর। তবে তো তুমি এখানে বসতে পার, অনুগ্রহ করে বস।' এইভাবে আমি কোন মতে তাকে মিনিটখানেকের জন্য বসাতে পেরেছিলাম। ১৯৪২-৪৮ খ্রিঃ আমি করাচিতে ছিলাম। একদিন ডাক-পিওন আমাকে একটি চিঠি দিল; সে প্রচুর ঘামছিল। কাগজপত্রে সই করতে আমার সময় লাগছিল, আর সে সেখানে দাঁড়িয়েছিল। আমি বলি 'অনুগ্রহ করে বস, ওখানে তো সোফা রয়েছে।' সে ধীরে ধীরে মেঝেতে বসল। সে সোফাতে বসবে না। 'অনুগ্রহ করে সোফাতে বস। সোফা তোমাদের সকলের জন্য।' 'না'। তখন আমি আস্তে আস্তে তাকে তুলে সোফাতে বসিয়ে দিলাম! এই সাধারণ লোকগুলিকে বার বার বলা হয়েছে, 'তুমি কেউ নও, তোমার কোন মর্যাদা নেই।' তারাও তাই বিশ্বাস করে নিয়েছে। এবার অন্যভাবে তাদের বলতে হবে, 'তুমিও একজন, তোমারও মর্যাদা আছে' মানুষের সঙ্গে এমন সব ধরনের ব্যবহার করা উচিত নয়—যার ফলে তার মানবিক মর্যাদা নষ্ট হয়ে যায়। দুই তিন পুরুষ আগেও এই সব ভাব আমাদের লোকেদের কাছে সম্পূর্ণ বিজাতীয় বলে বোধ হতো। তারা বলতো, এসব ভাব অদ্ভুত বৈপ্লবিক। কিন্তু বিবেকানন্দ বলেছিলেন—এইসব বৈপ্লবিক ভাবগুলিই আমাদের প্রয়োজন।

আমাদের সমাজ অত্যন্ত বদ্ধ, উদ্যমহীন, অমানুষিক হয়ে পড়েছে। কিন্তু কার্যকর বেদান্ত ও আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তা থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে বর্তমান যুগেই আমাদের সমাজে এক শান্তিপূর্ণ আমূল বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে আমাদের সমগ্র সমাজের উন্নয়ন যা এতদিন রুদ্ধ ছিল তা এবার গতিমান হবে ও ভারতের জনগণ—যা পৃথিবীর জনসংখ্যার এক ষষ্ঠাংশ—পূর্ণভাবে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে। অভূতপূর্ব

জাতীয় উন্নয়নের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ী ভাব ও আন্দোলনসমূহ এখনই ভারতীয় সমাজে ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খ্রিঃ এই সব ভাবগুলির অর্থ জোরালো ভাষায় ব্যক্ত করে গেছেন—যা স্বামী বিবেকানন্দের *কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্যন্ত* বক্তৃতাবলী (বা *ভারতে বিবেকানন্দ*) এবং *পত্রাবলী* গ্রন্থদ্বয়ে সঙ্কলিত রয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের পত্রের একটি কথা আমি তোমাদের বলতে চাই, সেটি আমেরিকা থেকে ভারতের একটি শিষ্যকে লেখা চিঠি। তাতে আলোচনার বিষয় ছিল, গত দুই শতাব্দী ধরে ভারতের মানবীয় পরিস্থিতির এক অতি নিম্নমানের অন্ধকারময়রূপ। আজকাল এর বহুল পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে চিঠিখানি মাদ্রাজের আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখিত ২০ আগস্ট ১৮৯৩ খ্রিঃ।[১]

"তাদের স্বপ্নেও মনে আসে না—সেই শত শত যুগব্যাপী মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক অত্যাচারের কথা, যার ফলে ভগবানের প্রতিমাস্বরূপ মানুষকে ভারবাহী গর্দভে এবং ভগবতীর প্রতিমারূপা নারীকে সন্তানধারণ করার দাসীস্বরূপা করে ফেলেছে এবং জীবন বিষময় করে তুলেছে।"

শতবর্ষ পূর্বে এইরকমই ছিল ভারতের সমাজ চেতনা। আমরা এর পরিবর্তন সাধন করছি। এইদিকেই আমাদের অগ্রগতি। এখানে আধুনিক পাশ্চাত্য ভাবনার ভালটুকু এবং বেদান্তের ভালটুকু একত্রিত হয়েছে নরনারীকে মর্যাদার ও গরিমার উচ্চতম চূড়ায় তোলার জন্য। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে গভীর আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক কর্মে চার বছর ধরে লিপ্ত থেকে ১৮৯৭ খ্রিঃ ভারতে ফিরে তিনি তাঁর ভারতীয় জনমুখী বক্তৃতাগুলি আরম্ভ করলেন রামেশ্বরমের কাছে, রামনাদে—এক বিরাট উৎসাহী জনসমাবেশে—তখন এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন[২]—

"সুদীর্ঘ রজনী প্রভাত প্রায় বোধ হচ্ছে। অবশেষে মহাদুঃখ অবসানপ্রায় প্রতীত হচ্ছে। মহানিদ্রায় নিদ্রিত শব যেন জাগ্রত হচ্ছে।... ভারত, আমাদের এই মাতৃভূমি ... গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করে জাগছেন। আর কেউই এখন এঁর গতিরোধে সমর্থ নয়; ইনি আর নিদ্রিত হবেন না, কোন বহিঃশক্তিই এখন আর এঁকে দমন করে রাখতে পারবে না, কুম্ভকর্ণের দীর্ঘ নিদ্রা ভাঙছে, সে তার পায়ের ওপর দাঁড়াচ্ছে।"

---

১ বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৬ খণ্ড, পৃঃ ৩৬৬

২ বাণী ও রচনা, ১ সং, ৫ খণ্ড, পৃঃ ৩৮

এই হলো বর্তমান ভারতের অধিবাসী আমাদের কাছে গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের *রাজর্ষি* ভাবনাটির উল্লেখের গুরুত্ব—*রাজর্ষয়ো বিদুঃ*, '*রাজর্ষিরা* এই বিষয়টি জানতেন।' তাঁরা মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করবেন মানুষের মতো এবং তাঁদের লব্ধ শক্তির দ্বারা এদের মানবিক মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। সেই রূপান্তর আজ আমাদের চাই আরো বেশি করে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পর্যন্ত, পঞ্চায়েত থেকে সংসদ পর্যন্ত, সকল প্রশাসনিক স্তরে, এই ভাবগুলি অবশ্যই অনুপ্রাণিত করবে, স্ব-স্ব কাজে ব্যাপৃত কর্মীকে। কেবল তখনই আসবে ভারতের মধ্যে এক আমূল পরিবর্তন। আমাদের শিল্পজগতে রূপান্তর সাধিত হচ্ছে, আমরা প্রচুর প্রয়োগ কৌশল শিখছি, আমাদের আমদানী রপ্তানিতে উন্নতি ঘটছে—কিন্তু ভারতীয় মানবের মন যদি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক নাগরিকত্বের জাতীয় কর্তব্যবোধের দ্বারা রূপান্তরিত না হয়, তবে সবই এক বিয়োগান্তক নাটক হয়ে দাঁড়াবে। এই রকমই এক বিয়োগান্তক নাটকের কথাই উল্লেখ করে ব্রিটিশ লেখক অলিভার গোল্ডস্মিথ দুশো বছর আগে লিখেছিলেন ঃ 'সে দেশের ভাগ্য মন্দ, সে দেশ শীঘ্রই অশুভের শিকার হয়, যেখানে সম্পদ বৃদ্ধি পায়, আর মানুষের অধোগতি হয়।' আমাদের সমাজেরও গতি তেমনিই হবে, যদি আমাদের মানবিক উন্নয়ন—অর্থনৈতিক ও কারিগরি উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে—সমান তালে না চলে। এই মানবিক উন্নয়নের পক্ষেই বেদান্ত বলে থাকে গীতার উপদেশের মাধ্যমে ঃ যেমন বিবেকানন্দ বার বার বলেছেন—পূর্ণ মানবিকতার উন্মেষ চাই, মানুষ-তৈরি ও জাতি-গঠনমূলক শিক্ষার মাধ্যমে।

আমি একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই, ভারতে ও ব্রিটেনে, নাগরিকদের সঙ্গে সরকারি কর্মচারীর ব্যবহারের তারতম্য দেখাতে। আমি যখন ১৯৬০ খ্রিঃ কলকাতাস্থ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সম্পাদক, তখন আমাদের আন্তর্জাতিক অতিথি আবাসের তদারকের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন এক মহিলা, তিনি জাতিতে ডাচ হলেও ব্রিটিশ নাগরিক। একদিন তিনি হাসিমুখে আমার কাছে এসে বলেন যে লন্ডনস্থ ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছেন, তাতে বলা ছিল যে তিনি বার্ধক্য-ভাতা পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছেন। এবং সেই সঙ্গে তার প্রথম কিস্তির পরিমাণের অনুরূপ একটি চেকও পাঠান হয়েছে। কি চমৎকারই না এই মানব কল্যাণ ভাবনা; মহিলা এ বিষয়ে চিন্তাও করেন নি; কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তার প্রাপ্য তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন! কবে এই রকম পরিস্থিতি, মানুষের জন্য এই রকম উদ্বেগ

ও ভাবনা আমাদের রাজ্য সরকার ও ভারত সরকারের কর্মচারীদের মনে অনুপ্রবিষ্ট হবে! এ সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হলো গীতার বাণীর বহুল প্রচার। আমাদের দেশ ও অন্য কয়েকটি দেশ যে পীড়ায় পীড়িত তার প্রতিকারের উপায় এর মধ্যেই রয়েছে।

আমরা এই অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোক পর্যালোচনা করেছি, এর শেষটিতে এমন কিছু ইঙ্গিত ছিল যা অর্জুনকে বিভ্রান্ত করেছিল। প্রথমটিতে এবং তৃতীয়টি পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'এই বিষয়টি আমি বিবস্বান প্রভৃতিকে শিখিয়েছিলাম,' এবং 'আমি তাই তোমাকে শেখাচ্ছি।' 'এ কী রকম শিক্ষা? শ্রীকৃষ্ণ, তুমি আমার সমসাময়িক, তুমি কী করে তাঁদের ঐ শিক্ষা দিলে? তাই, এই বিষয়ে অর্জুন প্রশ্ন তুলল। খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এখানে এসে পড়ল। যোগ বা কর্মে পরিণত বেদান্তের উপদেশ বহুদিন ধরে আচার্য ও শিষ্য পরম্পরায় চলেছে, কিন্তু কালের গতিকে, এই উপদেশ আপন গুরুত্ব কমিয়ে ফেলায় হারিয়ে গেছে। এই তিনটি শ্লোকের পরিপ্রেক্ষিতেই শ্রীকৃষ্ণ অবতারণা করেছিলেন, *রাজর্ষি* ভাবের—যাতে নর-নারী রাজনীতিক, সামাজিক, আর্থনীতিক বা অন্যান্য ক্ষমতার অধিকারী হয়েও সেগুলিকে সে কেবল জনকল্যাণেই ব্যবহার করে। এইরকম ব্যক্তিই একদিকে ক্ষমতা ও অন্যদিকে অন্তরের আধ্যাত্মিক উন্নতির মিলন ঘটাতে পেরেছেন। এই ভাবটি হলো *আধ্যাত্মিক উন্নতির,* ধর্মপালন নয়। মহোৎসব, আচার-অনুষ্ঠানাদি পালন, ধর্ম বিশ্বাস, ধর্ম মতের প্রতি নিষ্ঠা—এ সব নিয়ে ধর্ম বলতে যা সাধারণত বোঝায়, তার যতটা খুশি আমাদের থাকতে পারে। কিন্তু এতে আমাদের সে ক্ষমতা আসে না যার বলে আমরা লোক কল্যাণ করতে পারি। পরন্তু সামান্য আধ্যাত্মিক উন্নতিতে এই সব পরিবর্তন আসতে পারে, সংস্কৃত বা হিন্দি ভাষায় একে বলা হয় *আধ্যাত্মিক বিকাশ* বা 'আধ্যাত্মিক বিস্তার'। 'অহং' বোধের বিস্তার ঘটিয়ে তাতে 'তুমি' ও অন্যসকলের স্থান করে দেওয়া। তাকেই আধ্যাত্মিক উন্নতি বলে, যা থেকে সব রকম মূল্যবোধজনিত দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্ম—মানবিকতা, সেবাবোধ, উৎসর্গীকৃত জীবনবোধ ইত্যাদি এসে থাকে। বেদান্ত মতে সব মূল্যবোধই আধ্যাত্মিক এবং তার উৎস হলো প্রত্যেকটি জীবের অন্তর্নিহিত দেবত্ব।

এক বিরাট এবং দুঃখজনক পরিস্থিতি এসেছে আমাদের সর্বস্তরের সরকারি কর্মচারীদের। তার আশু পরিবর্তন চাই। তাদের অবশ্যই বিরত থাকতে হবে ঘুষ আদায়ের জন্য নাগরিকদের হয়রানি করা থেকে, যখন তারা কোন এক

যোজনা বা বাড়ি-তৈরির কাজ শুরু করার জন্য কোন আইনসম্মত সরকারি অনুমোদনের জন্য আসে। এইরকম অনুরোধের উত্তরে কর্মচারীর উত্তর হবে ঃ 'তোমার সাহায্যে আমি কী করতে পারি?' এইরকম কর্মচারীর সংখ্যা বাড়লেই রাষ্ট্র সুশাসিত হবে আর জনগণ হবে নির্ভীক ও সুখী। প্রায় চার হাজার বছর পরে আজও ভারতীয় মহাকাব্য *মহাভারত*, সামাজিক সুস্বাস্থ্য ও সুশাসিত রাজনীতিক রাষ্ট্রের একটি লক্ষণের কথা আমাদের জন্য বহন করে চলেছে। *শান্তিপর্বে রাজধর্ম* বা *রাষ্ট্রনীতি* পরিচ্ছেদে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলছেন (ভাণ্ডারকর সংস্করণ, ১২.৬৮.৩২) ঃ

স্ত্রিয়শ্চ আপুরুষা মার্গম্ সর্বালঙ্কার ভূষিতাঃ;
নির্ভয়াঃ প্রতিপদ্যন্তে যদা রক্ষতি ভূমিপঃ—

—'যদি কোন রাজ্যে স্ত্রীলোক সবরকম অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে, কোন পুরুষ সঙ্গী ছাড়া নগরের রাজপথে ও গলিতে কারও দ্বারা লাঞ্ছিত না হয়ে ইচ্ছামতো নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে, তবে সে রাজ্য সু-শাসিত।'

এখানে ঋষি কথাটির ব্যবহার ইঙ্গিত করে আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি, বেদান্তের মতে যা প্রত্যেক মানুষের জন্মগত অধিকার। সাধারণত ঋষি কথা শুনলেই আমরা বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ বা অন্য কোন পৌরাণিক ঋষির কথা ভাবি। কিন্তু কেন? যে কোন লোকই *ঋষি* হতে পারে, যদি ঐ আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির কম-বেশি কিছুটা তার মধ্যে থাকে।

ঐ সম্ভাবনা আসে, বেদান্তের শিক্ষাগত, প্রতিটি মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব ও তাকে জীবনে, কর্মে ও মানবিক ব্যবহারে বিকাশ করার জৈব ক্ষমতা থেকে। স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের এই সত্যকে প্রকাশ করেছেন একটি ছোট্ট উক্তি[১]'র মধ্য দিয়ে ঃ

'আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম। বাহ্য ও অন্তঃ প্রকৃতি বশীভূত করে আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য'।

ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত একটি পত্রে স্বামীজী লিখেছেন[২] ঃ

'জগতের ধর্মগুলি এখন প্রাণহীন মিথ্যা অভিনয়ে পর্যবসিত হয়ে পড়েছে। জগতের এখন একান্ত প্রয়োজন হলো—চরিত্র।'

---

১ বাণী ও রচনা, ১ম সং, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৫

২ বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৮

ঐ চরিত্র হলো আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির ফল, *আধ্যাত্মিক বিকাশ*। এই বিকাশ, কোন মতে বিশ্বাসী, মতানুযায়ী, ধর্ম নয়; এ হলো আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি যার পরিণামে মূল্যবোধমুখী জীবন সূচিত হয়। কেবল ঐরূপ জীবনযাপনেই ছোট বড় সব রকমের ঘুষ সমেত সমস্ত প্রলোভনকে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব। একেই আমি আগে *মহাভারত* থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে *আত্মবলম্* রূপে উল্লেখ করেছিলাম—যার স্থান *বাহুবলম্* ও *বুদ্ধিবলম্*-এর ওপরে। যাদের বুদ্ধিবলই আছে তারা ছোটখাট প্রলোভনকেও বাধা দিতে পারে না, কার্যত তারা অন্যের তুলনায় আরো সহজে প্রলোভনের বশীভূত হয়।

আমরা এমন এক যুগ প্রবর্তনের দিকে চলেছি, যখন আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির ও মূল্যবোধের জীবনযাপনের সূচনা হচ্ছে। প্রজননতন্ত্রের জালে ধরা পড়া আমাদের ক্ষুদ্র অহংটি এই তন্ত্র থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারে এবং ভালবাসাও সেই ব্যাপারে বিস্তার লাভ করতে পারে। এরই নাম আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি। আধুনিক জীববিদ্যায় একেই বলে *মনঃসামাজিক ক্রমবিকাশ*। তোমার মনও তার প্রজনন ক্ষেত্রের সীমা ও নিয়ন্ত্রণের আবেষ্টনী থেকে সরে এসে সহানুভূতি, ভালবাসা ও তৎসংক্রান্ত ব্যাপারে বিস্তার লাভ করতে পারে। আধুনিক জীববিদ্যা স্বীকার করে যে বংশগতি নিয়ন্ত্রক উপাদান বা জিন (ক্রোমোজোম)গুলি অহংকেন্দ্রিক এবং তা মূল্যবোধের উৎস হতে পারে না। ঐ বিস্তার হলো শিক্ষাক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের ব্যাপার, যে পর্যায়ে উন্নতি ঘটান প্রত্যেক মানব সত্তার পক্ষেই সম্ভব; আর তাই হলো মানবীয় স্তরে ক্রমবিকাশের লক্ষ্য। সমগ্র জগৎ অপেক্ষা করছে ঐ ক্রমবিকাশমুখী অগ্রগতির বাণী শোনার জন্য। আনুষ্ঠানিক ধর্ম আমাদের প্রচুর রয়েছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি আমাদের খুবই কম। আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি থেকেই চরিত্র গঠন হয়; অথবা যেখানে চরিত্র গঠিত হয়েছে, মূল্যবোধজনিত ক্রিয়াকলাপ চলেছে—সেখানেই থাকে আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির নিদর্শন—বেদান্ত এ কথা বলে। যখন তুমি পথ ধরতে পেরেছ, তখন কয়েক পদমাত্র অগ্রসর হলেও—তাকে বড় ধরনের লাভ বলে বিবেচনা করবে। তাই, ভারতে এই মহান শিক্ষাটি আমাদের লাভ করতে হবে, যে আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে, *সমগ্র* বা *শূন্য* নিয়ে কথা নয়; স্বল্প শিক্ষার মূল্যও অনেক। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের সমগ্র চিন্তাধারাটাই অন্য রকম। 'আমরা যদি বশিষ্ঠ ঋষি হতে না পারি, তবে আমি একজন স্বার্থপর সংসারী হব'। আমাদের শিখতে হবে যে, এ বিষয়ে অল্প শিক্ষাও অশিক্ষার থেকে ভাল। তবে এক ধাপ এগুবে না কেন? আরো একধাপ এগিয়ে চলো। ভালবাসতে ও

কল্যাণচিন্তা করতে থাক; সেবার ভাবে কাজ কর। তা করলেই তুমি আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির পথে এসে গেছ। এই রকম আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধ লোকের হাতেই ক্ষমতা থাকা উচিত—রাজনীতিক ক্ষমতা, প্রশাসনিক ক্ষমতা, আর্থিক ক্ষমতা। তারা যখন ক্ষমতার ব্যবহার করবে, সকলের উপকারই তারা করবে। সমাজ সুখী হবে, মানবিক উন্নয়ন হতে থাকবে, সমাজে শান্তি ও সমন্বয় বিরাজ করবে। অতএব, এই *রাজর্ষি* ভাবনাটি আমাদের ও অন্য জাতির পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ; এতে আমাদের লোকতন্ত্র সুস্থ ও সবল হয়ে উঠবে। শ্রীকৃষ্ণ ভাবতেন এই *যোগ-দর্শন* হলো প্রায়োগিক বেদান্ত, *রাজর্ষি* গড়ে তোলার শিক্ষা, তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায় চতুর্থ অধ্যায়ের *ইমম্ বিবস্বতে যোগম্ প্রোক্তবান্* এবং *রাজর্ষয়ো বিদুঃ*—এই কথার মধ্যে।

এই বিষয়ে, আমি প্রাচীন চৈনিক চিন্তাবিদদের কথা উল্লেখ করতে চাই, তারাও এইভাবে ভাবিত ছিলেন। চৈনিক চিন্তায় *রাজর্ষি* ভাব প্রকাশ পেয়েছিল—*অন্তরে ঋষিরূপ আর বাহিরে রাজরূপ*—এই ভাবে। বাহিরে তুমি রাজা, অন্তরে তুমি ঋষি। এ এক অদ্ভুত অভিব্যক্তি—*রাজর্ষি* কথাটির সঠিক অনুবাদ। অতএব, এই হলো সেই রূপান্তর যা চাই, সমগ্র জগতে, অনুন্নত ও উন্নত উভয়বিধ দেশগুলির মধ্যে। এই সমৃদ্ধি যে সম্ভব সে সম্বন্ধে পুরাপুরি আশ্বাস পাওয়া যায় প্রত্যেক মানব সত্তার অন্তর্নিহিত দেবত্ব সম্বন্ধে বৈদান্তিক সত্যের মধ্যে। ভ্রষ্টাচার, সামাজিক কুপ্রথা, অপরাধপ্রবণতার বৃদ্ধি—আসে আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির অভাব থেকে। 'ঐ আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির সামান্যও যথেষ্ট', *স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ*—এই আশ্বাস আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে পেয়েছি। অন্য কোন উপায়ে এর নিরাময় সম্ভব নয়; আইন প্রণয়নে বা সংসদীয় বিধিবিধানের অনুমোদনে, কোন মানুষের আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি সাধিত হতে পারে না। মানুষ যখন আপন চেষ্টায় তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে ব্যবহার করতে শেখে তখনই তার মধ্যে এই সমৃদ্ধির সূচনা দেখা যায়। প্রজননমাত্রার ওপারে, আধ্যাত্মিক মাত্রায় যখন এইরকম সমৃদ্ধি ঘটে, তখন মানুষ অন্তরে মহৎ হয়, যার ফলে সে প্রেমে ও সেবাবুদ্ধিতে অপরকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করতে পারে। সংস্কৃত ভাষায় *মহাত্মা* কথাটির অর্থ তাই; *মহা আত্মা*, বিরাট অন্তরাত্মা; গান্ধীজীকে কেন *মহাত্মা* বলা হতো? কারণ তাঁর অন্তরাত্মা তাঁর দেহতন্ত্রে বন্দি ছিল না। সেটি দেহ থেকে অনাসক্ত হয়ে—বিস্তৃতি লাভ করেছিল ভালবাসায় ও মানব ব্যবহারে। তাই আমরা তাঁকে মহাত্মা বলে সম্বোধন করতাম।

মহাত্মার বিপরীত হলো *অল্পাত্মা*, ক্ষুদ্রাত্মা; এতেও অনেকগুলি স্তর আছে, যেমন আছে *মহাত্মা* ভাবনায়। *অল্পাত্মার* নিম্নতম স্তর সম্বন্ধে জানার প্রয়োজন আছে। আমাদের জাতীয় ও রাজ্যস্তরের রাজনীতিতে ও প্রশাসনে বিভিন্ন স্তরে এই দুই ধরনের লোক দেখা যায়। আমরা তাকেই নিম্নতম *অল্পাত্মা* মনে করতে পারি—যে মোটা মাইনের সরকারি অফিসার বিয়ে করে বৌ এনে যৌতুক 'কম' হয়েছে বলে তাকে পুড়িয়ে মেরে অন্য একটি মেয়েকে বেশি টাকা যৌতুক নিয়ে বিয়ে করে। এই সব ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে অল্পাত্মা লোকটি পুরাপুরি প্রজননতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে থাকে। আধুনিক জীববিদ্যায় এই জিনগুলিকে স্বার্থপর বলা হয়। ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স *The Selfish Gene* (স্বার্থপর জিন) নামক তাঁর গ্রন্থে বলেছেন (pp. 2-3) ঃ

"এই গ্রন্থের যুক্তি হলো, আমরা এবং অন্য পশুরা জিন দ্বারা সৃষ্ট যন্ত্রমাত্র...। আমার যুক্তি হবে যে এক সার্থক জিনের লক্ষণীয় গুণ হবে নির্মম স্বার্থপরতা। সাধারণত ব্যষ্টির ব্যবহারে, যে স্বার্থপরতা দেখা যায় তার উদ্ভব ঘটে জিনের এই স্বার্থপরতা থেকে।

"আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি হলো, যে মানব সমাজ শুধু জিনের সর্বসাধারণ নির্মম স্বার্থপরতার নিয়মের ভিত্তিতে চলে—বাস করার পক্ষে সে সমাজ হবে এক অত্যন্ত জঘন্য সমাজ। ...সাবধান হোন, যদি আমার মতো আপনিও চান এমন একটি সমাজ গড়তে যেখানে ব্যষ্টিমানব উদারভাবে ও নিঃস্বার্থভাবে, পরস্পর মিলিত হয় মানব কল্যাণ সাধনে—সেখানে 'জৈব প্রকৃতি' থেকে অতি অল্প সাহায্যই পাওয়া যেতে পারে। অল্প সাহায্য মানে কোন সাহায্যই না পাওয়া!"

শিক্ষাব্যবস্থা এমন হোক যাতে প্রতিটি শিশুকে *মহাত্মা* হবার পথে স্থাপন করা যায়; যার ফলে শিশু একটু একটু অগ্রসর হয়ে অবসর নেবার বয়সের মধ্যে বেশ ভাল আধ্যাত্মিক উন্নতিসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে। এই হলো প্রকৃত বৈজ্ঞানিক শিক্ষা—যা মানবের মধ্যে আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি, উন্নতি, পরিপূর্ণতা ঘটিয়ে, সেই আন্তর সমৃদ্ধির ফলে নিজের সঙ্গে সমগ্র জগৎকেও নিয়ে চলে। সেই ভাবটিই শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন, প্রথম কয়েকটি শ্লোকে এবং গীতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে *যোগ* শিক্ষা দিয়েছেন সমগ্র মানব সমাজকে আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির পথে স্থাপিত করার জন্য; এই হলো ক্রমবিকাশীয় পরিপূর্ণতার পথে জয়যাত্রা; যদি এরূপ অগ্রগমনের জয়যাত্রা সূচিত না হয়, তবে স্যার জুলিয়ান

হাক্সলির মতো জীব বিজ্ঞানীর মতে মানবীয় ক্রমবিকাশ ইন্দ্রিয়স্তরেই থেমে থেকে, ক্রমে ক্ষীণ হতে হতে তা শেষ হয়ে যায়।

এরকম আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধিতে প্রতিটি মানবেরই জন্মগত অধিকার আছে, এই হলো বেদান্তের মত। এইটি আবার গীতার মূল মর্মবাণী। এটি সন্ন্যাস-দর্শন নয়; এটি সংসার-ত্যাগের দর্শন নয়; এতে কর্মময় জীবনের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এই কর্মময় জীবনকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে মানবের প্রতি ভালবাসা ও সেবার ভাবনায়। শ্রীকৃষ্ণের উক্তি থেকে অর্জুনের একটি প্রশ্ন জেগেছে তাই এখন আলোচিত হবে।

অর্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্ বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

অর্জুন বললেন—'আপনার জন্ম পরে, আর বিবস্বানের জন্ম আগে; তবে কেমন করে আমি বুঝব যে আপনি বিবস্বানকে একথা আগে বলেছিলেন?'

'আপনার জন্ম সম্প্রতি', *অপরম্ ভবতো জন্ম*। অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ সমবয়সী। অর্জুন জানতেন—*পরম্ জন্ম বিবস্বতঃ*, 'বিবস্বান্, (মনু ও ইক্ষ্বাকু) বহু বহু পূর্বে জন্মেছেন'। 'বেচারা অর্জুন কি করে বুঝবেন—এসব বিষয়ে শিক্ষা আপনি তাঁদের দিয়েছিলেন? এ খুবই যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন। আমরা যে কেউ এ প্রশ্ন করতাম। —*কথম্ এতদ্ বিজানীয়াম্ ত্বম্ আদৌ প্রোক্তবান্ ইতি*, 'আপনি যে অতি প্রাচীন কালে এসব শিক্ষা দিয়েছিলেন।' *আদৌ* অর্থাৎ 'সৃষ্টির প্রাক্‌কালে', আপনি যে এরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের এসব শিক্ষা দিয়েছিলেন, 'তা আমি কিভাবে বুঝব?'

অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তর দেন শ্রীকৃষ্ণ; আর সেই উত্তরেই পাওয়া যায় সনাতন ধর্মের ঈশ্বরের অবতারত্ব সম্বন্ধে বিস্ময়কর উপদেশ ঃ *সম্ভবামি যুগে যুগে*, 'আমি বার বার অবতীর্ণ হই'; এই কথাই শ্রীকৃষ্ণ অষ্টম শ্লোকে বলবেন। এই শিক্ষা কেবল সনাতন ধর্মেই পাওয়া যায়, খ্রিস্টীয় ধর্মেও পাওয়া যায়, তবে এইটুকু তফাৎ যে—খ্রিস্টীয় ধর্মে অবতার একবারই আসেন; দ্বিতীয় বার নয়—সৃষ্টি লয় করার সময় ছাড়া। কিন্তু এখানে, *সম্ভবামি যুগে যুগে*, 'আমি প্রতি যুগে অবতীর্ণ হই ঃ যখনই প্রয়োজন হয়'। *গীতা* ও *সকল পুরাণের* এ এক প্রসিদ্ধ শিক্ষা—অবতার সম্বন্ধে ঃ ঈশ্বরের অবতারত্ব সম্বন্ধে।

শ্রীভগবান্ উবাচ

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫॥

শ্রীভগবান বললেন—'হে অর্জুন, হে শত্রুতাপন, তুমি আর আমি বহু জন্ম পার হয়ে এসেছি, সেগুলির বিষয় আমি সব জানি, তুমি জান না।'

তুমিও আমি বহু জন্ম কাটিয়ে এসেছি, *বহূনি মে ব্যতীতানি* 'আমি বহু জন্ম কাটিয়ে এসেছি'; *তব চ,* 'তুমিও'; *তানি অহং বেদ সর্বাণি,* 'আমি সে সব জানি'; *ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ,* 'তুমি সে সব জান না, হে শত্রুদগ্ধকারী'; তুমি তো *জীব* বা জীবাত্মা মাত্র, তুমি কেবল এই জীবনের কথাই জান, কিন্তু আমি জানি যে, তুমি ও আমি পূর্বে আরো অনেকবার জন্ম গ্রহণ করে জীবনযাপন করেছি। আমি সে সব জানি। এই হলো প্রথম উক্তি। শ্রীকৃষ্ণ কীভাবে বার বার জন্মগ্রহণ করেন? কী উদ্দেশ্য ছিল? পরবর্তী দুটি শ্লোকে তার উত্তর দিচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ ঃ

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬॥

—'যদিও আমি জন্মরহিত, আমার স্বভাবের পরিবর্তন হয় না, আমি সর্বভূতের প্রভু, তবু আমি আমার স্বীয় *মায়ার* দ্বারা আমার প্রকৃতিকে বা ঈশ্বরীয় স্বভাবকে বশীভূত করে জন্মগ্রহণ করে থাকি'।

যদিও আমি *অজ,* 'জন্মরহিত বা জন্মহীন'। এই নেতিবাচক সংস্কৃত শব্দ *অজ* এবং ইতিবাচক শব্দ *জন্ম* থেকেই এসেছে জিন, প্রজনন বা বংশানুগতি বিদ্যা প্রভৃতি ইতিবাচক ইংরেজি শব্দগুলি। যদিও আমি *অজ* ও *অব্যয়,* 'জন্মহীন ও মৃত্যুহীন', এবং *ভূতানাম্ ঈশ্বরোঽপি সন্,* 'যদিও আমি সকল সৃষ্ট জীবের প্রভু', সম্ভবামি *আত্মমায়য়া,* 'আমি আমার নিজ *মায়াশক্তি* অবলম্বন করে শরীর ধারণ করি। আমি অনন্ত ঈশ্বরস্বভাব, কিন্তু *মায়া*-শক্তি অবলম্বন করে, একটি সান্ত মানবরূপ ধারণ করি; এই হলো একটি পুনর্জন্মের প্রকৃতি। বাহ্যত এটি খুবই সাধারণ, এর অন্তরে যে মাত্রাগুলি রয়েছে তা সাধারণ মানুষ সহজে দেখতে পায় না। শ্রীকৃষ্ণ সে কথা পরে বলবেন। *প্রকৃতিম্ স্বাম্ অধিষ্ঠায় সম্ভবামি,* 'আমি আমার প্রকৃতি বা মায়াকে অবলম্বন করে, জন্মগ্রহণ করি'। ঐ *প্রকৃতি* বা স্বভাবই হলো *মায়া*। সে শক্তি ঈশ্বরের হাতে রয়েছে। এক কীভাবে বহু হয়? এটি হয় *মায়ার* মাধ্যমে। যদিও ভারতে ধর্মের সর্বক্ষেত্রেই কর্মের একটা বড় অংশ *মায়ার* দ্বারা সাধিত

হয়, ভক্তি হোক, *জ্ঞান* হোক, গীতায় (৭.১৪) শ্রীকৃষ্ণের এক অদ্ভুত উক্তি পাওয়া যায়—যে *'মায়াকে* অতিক্রম করা দুরূহ; যারা আমার শরণ গ্রহণ করে কেবল তারাই এই *মায়াকে* অতিক্রম করতে পারে।'

যাদুকর ভেল্কি দেখায়, আর তোমরা এই ভেল্কি দেখে মেতে ওঠ। তোমরা মনে কর এ সবই সত্য। তা মোটেই নয়। যাদুকরের দিকে তাকাও। তা হলে ভেল্কির বিষয় বুঝতে পারবে। তুমি যদি ভেল্কিতে জড়িয়ে পড়, তবে তুমি পুরোপুরি মোহজালে জড়িয়ে পড়বে। অতএব তুমি *মায়া* ছেড়ে যিনি *মায়ার* প্রভু বা *মায়াবী* তাঁর কাছে যাও। বিষয়টি বোঝা যায় *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের* (৪.১০) একটি উক্তি থেকে ঃ *মায়াম্ তু প্রকৃতিম্ বিদ্যাৎ, মায়িনম্ তু মহেশ্বরম্,* *'মায়াকে* প্রকৃতি বা স্বভাব বলে জানবে, আর সেই পরম দেবতাই হলেন *মায়ার* প্রভু'। ঈশ্বর ও আমাদের সকলের মধ্যে পার্থক্য হলো ঃ আমরা *মায়ার* অধিকারে, কিন্তু সমগ্র *মায়া* হলো ঈশ্বরের অধিকারে। তিনি মুক্ত, আমরা মুক্ত নই। আমরা স্বরূপত ঈশ্বর, কিন্তু আমরা *মায়ার* অধিকারে, *মায়ার* বশে, তাই আমরা সান্ত, ব্যষ্টি মানব। কিন্তু আমাদের সত্য স্বভাব হলো সেই অনন্ত এক, বেদান্তে যে কথা বার বার বলা হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ এই তত্ত্বকে সরল বাংলায় এইভাবে বলেছেন ঃ *পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে,* 'ব্রহ্ম যখন পঞ্চভূতের জালে জড়িয়ে পড়েন, তখন তিনি কাঁদেন। দেহ-মন গঠনের উপাদান হলো পঞ্চভূত ঃ মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ। সেই জালে ব্রহ্ম জড়িয়ে পড়েন। ব্রহ্ম তখন ব্যবহার করেন পাখীর মতো, পোকার মতো, মানুষের মতো ইত্যাদি। তোমার আমার ভেতর ব্রহ্ম কাঁদেন। এই ভাষাতেই বলা হয়েছে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণও বলেছেন ঃ ঈশ্বর *মোহগ্রস্ত* হয়ে মানুষ হন, আর *মোহমুক্ত* মানুষই ঈশ্বর। এই *মায়া* যখনই সরে যায়, তুমি আমি জানতে পারি আমাদের প্রকৃত স্বরূপ। কিন্তু যতক্ষণ মায়া রয়েছে ততক্ষণ আমরা কাঁদি, আমাদের প্রকৃত স্বরূপের কথা ভুলে গিয়ে।

অতএব, আমাদের সকলের আর ঈশ্বরের মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে। তিনি নিজেই এই বিশ্বরূপ ধারণ করেছেন; তিনি প্রবেশ করে আছেন বিশ্বের সকল জিনিসের মধ্যে। এই হলো *তৈত্তিরীয় উপনিষদের* (২.৬.১) ভাষা ঃ *তদ্ অনুপ্রাবিশৎ,* 'তিনি এর ভেতর প্রবেশ করেছেন'; *তদ্ অনুপ্রবিশ্য,* 'আর প্রবেশ করে', তিনি কাজ করে চলেছেন। তিনি তাঁর নিজ স্বরূপ ভুলে গেছেন। এ এক অদ্ভুত শিক্ষা ঃ *মায়া* হলো—আমাদের সকলের জীবনের অভিজ্ঞতা।

বিবেকানন্দ ইংলন্ডে প্রদত্ত 'মায়া' সম্বন্ধে তাঁর প্রসিদ্ধ বক্তৃতামালায় বলেছেন[১]—

'মায়া কোন মতবাদ নয়। আমরা কি এবং সর্বত্র কি প্রত্যক্ষ করছি, এ সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনার এটি সহজ বর্ণনামাত্র।'

অতএব, এই *মায়া* ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন, ঈশ্বর *মায়াকে* অবলম্বন করে, একে ব্যবহার করে ক্ষুদ্র মানব শিশু হন। আর তোমরা মহাভারত টি.ভি. সিরিয়ালে দেখেছ, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নিলেন ছোট্ট শিশুরূপে, কংসের কারাগারে, কিন্তু তাঁর পিতামাতার কাছে তাঁর ঈশ্বরীয় রূপ প্রকাশ করলেন। অনন্ত ঈশ্বরের ক্ষেত্রে 'ছোট' বা 'বড়' কথাগুলির কোন অর্থ হয় না ঃ *অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্*, অণুর থেকে ছোট, বিশ্বের থেকে বড়'; এই হলো আত্মা, যেমন বলা হয়েছে *কঠ উপনিষদে*, প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় সর্গে।

আর তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *প্রকৃতিম্ স্বাম্ অধিষ্ঠায় সম্ভবামি*, 'আমি, স্বীয় প্রকৃতিকে অবলম্বন করে জন্মগ্রহণ করি।' সে কী রকম? *আত্ম মায়য়া*, 'স্বীয় *মায়ার* সহায়তায়', আমারই শক্তিতে ঃ'আমি যেন সাধারণ মানুষ হই, আমি যেন তাদের মতো কাজ করি। মানব জাতির জন্য কিছু মহৎ কল্যাণ সাধন করতে হবে। একমাত্র ঈশ্বরই এ কাজ করতে পারেন।'

তাই ঈশ্বর যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন জগতে এক নতুন শক্তি, জগৎ-রূপান্তরকারী শক্তির জাগরণ দেখা যায়। বস্তুত *অবতার* কথাটি সম্বন্ধে ভেবে দেখ, 'দেহধারণ অর্থে এই কথাটি সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত হয় ঃ কীভাবে আমরা এক মানব সত্তাকে '*অবতারে*'র বিশেষ মর্যাদা দিতে পারি? একজন সাধারণ মানব তার জীবন যাত্রায় নানা নিয়মে বদ্ধ, অবতারের ক্ষেত্রেও শারীরিক নিয়মের গণ্ডি প্রযোজ্য। তাঁরও অন্যের মতো ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে। কিন্তু অন্তরে তিনিই আবার অনন্ত। আর তা তিনি জানেন, ধীরে ধীরে এর অভিব্যক্তি ঘটে ও কাজ করতে থাকে মানবজাতির উন্নতির জন্য। তাঁর থেকে প্রচণ্ড শক্তি—জগৎ-রূপান্তরকারী শক্তি, যুগ-প্রবর্তনের শক্তি—প্রবাহিত হতে থাকে। যখন কোন মানুষের মধ্যে এরকম শক্তি দেখবে, স্মরণ করবে যে সেখানে ঈশ্বরত্বের বিকাশ ঘটছে। কেবল কিছু কাল গত হলেই আমাদের উপলব্ধি হতে থাকে যে ওখানে ঈশ্বরীয় বিকাশ ঘটেছিল। কাল একটি বড় কারণ। সাধারণ শ্রেষ্ঠতা কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে না। আজ, তুমি শ্রেষ্ঠ হিসাবে

---

১ বাণী ও রচনা, ১ম সং, ২ খণ্ড, পৃঃ ৪

কতগুলি লোকের নাম শুনছ, এমন কি কোন লোকের নামে রাস্তার নামকরণও হলো। দুটি পুরুষ যেতে না যেতে তার কথা লোকে ভুলে যায়। কেউ জানবে না। এ হলো সাধারণ শ্রেষ্ঠতা।

এর তুলনায়, আর একরকমের শ্রেষ্ঠত্ব আছে, যা ক্রমেই বাড়তে থাকে, ব্যাপক হতে থাকে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে—ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পরে, তার শরীর ভস্মীভূত হয়ে যাবার পরও। এই সব লোককে আমরা ঈশ্বরীয় অবতার বলে চিহ্নিত করি; এঁরা কালের প্রবাহকে পর্যন্ত পরাভূত করেন, অথবা তাকে বিপরীতগামী করে দেন। তাঁর জীবৎকালে, খুব অল্প লোকেই তাঁকে জানত। তাঁর মৃত্যুর পরেই, অনেকে তাঁর নাম শুনে, জানতে চেষ্টা করে। অনেকে তাঁকে সম্মান দেয়, পূজা করে। এমনকি দু-হাজার বছর পরেও, লোকে সম্মান প্রদর্শন করে ও পূজা করে। এ থেকে কী বোঝা যায়? এক প্রচণ্ড শক্তির বিকাশ তখন সংঘটিত হয়েছিল। তা সাধারণ মানবীয় শক্তি নয়। এইরকম শ্রেষ্ঠত্ব খুব কম লোকের মধ্যেই আমরা লক্ষ্য করেছি। এ এক স্বতন্ত্র বস্তু। অতএব, ভারতে এইরকম ব্যক্তিকে মনুষ্য শরীরধারী ঈশ্বর বা *অবতার* বলে।

তাই, আমাদের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে, শ্রীকৃষ্ণই সর্বপ্রথম এই বিষয়টির সম্যক ব্যাখ্যা দিচ্ছেন? *সম্ভবামি আত্মমায়য়া,* 'স্বীয় মায়া অবলম্বনে, আমি জন্মগ্রহণ করি,' ঈশ্বরের অবতাররূপে। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ছিল অসাধারণ, ঈশ্বরীয় সকল জন্মই অসাধারণ। যিশুর জন্মও ছিল অসাধারণ। শ্রীরামের জন্মও তাই। বিবেকানন্দের ভাষায় এঁদের প্রত্যেকেই হলেন এক একটি 'জগৎ আলোড়নকারী শক্তি'। সাধারণ সাধুসন্ত জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেন না। অল্প লোকেই উপকৃত হয়। কিন্তু যখন অবতার পুরুষ আসেন, তিনি জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তিনি তার নিজ আধ্যাত্মিক শক্তি থেকে বহু সাধুসন্ত তৈরি করতে পারেন। *ভগবান* বুদ্ধের নামে কত যে সন্ত জগতে এসেছিলেন! শ্রীকৃষ্ণের নামেও বহু সন্ত এসেছিলেন! যিশুর মাধ্যমেও কত সন্ত এসেছেন! এই হলো অবতার পুরুষদের বিশেষ গুণ।

এইরূপ সকলকেই আমরা ঈশ্বরীয় মর্যাদা দিয়ে থাকি। তাঁরা সাধারণ মানব নন। আমরা তাঁদের পূজা করি। একটি সমগ্র ধর্মই ঈশ্বরাবতারের উপাসনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। ঈশ্বরাবতারের উপাসনার মাধ্যমে খুব তীব্র আধ্যাত্মিকতা লাভ করা যায়। নিজেই এ বিষয়ে খোঁজ নাও। তোমাদের ইতিহাসেই পাবে, যেখানেই ঐ রকম ঈশ্বরাবতারের প্রতি ভক্তি রয়েছে, তা থেকেই উন্নত চরিত্র,

প্রচণ্ড শক্তি, এইসব গুণগুলি প্রবাহিত হতে থাকে। আমরা বলতে পারি যে প্রায় সমগ্র হিন্দু ধর্মের কেন্দ্রে রয়েছেন শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ। পাশ্চাত্য জগতে এই রকমই হয়েছে যিশুকে কেন্দ্র করে।

তাই তিনি বলেছিলেন, 'আমি আমার *মায়া* শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে শরীর ধারণ করে থাকি।' যদিও অনন্ত ও অবিনশ্বর, তবু সান্ত মানবসত্তা গ্রহণ করে থাকি। আর সেই কাহিনী অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে—*শ্রীমদ্ভাগবতের* শ্রীকৃষ্ণের জন্মপ্রসঙ্গে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ে, রাজা কংসের কারাগারে ছোট্ট শিশুটির জন্মবৃত্তান্ত পাওয়া যায়। সেখানে নবজাত শিশুটির পিতামাতা, বসুদেব ও দেবকী—তাকে প্রণাম করছেন। শিশুটি জ্যোতিঃমণ্ডিত। 'আমরা জানি যে তুমি সাধারণ মানব শিশু নও। আমরা জানি যে তুমি স্বর্গীয় পুরুষ; এই শিশুরূপে জগতে এসেছ।' এই ভাবে দেবকী ও বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করেছেন; এবং সেগুলি *শ্রীমদ্ভাগবতের* মধ্যে যে সব অতি সুন্দর ও উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ স্তুতি আছে, তাদের অন্যতম। আর তারপর অবতারের লীলা অবশ্যই চলতে থাকবে। যদি পিতা মাতা বোঝেন যে এই শিশু ঈশ্বরের অবতার, মানব সত্তা নয়, তা হলে তাঁরা তার কোন কাজে লাগবে না, আর তিনিও তাঁর জীবনধারণের যে উদ্দেশ্য তা সফল করতে পারবেন না। তাই *শ্রীমদ্ভাগবত* বলছেন, স্তুতির পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর *মায়া* প্রত্যাহার করে নিলেন, তাঁর ঈশ্বরীয় রূপও প্রত্যাহার করে নিলেন ও সাধারণ শিশুর মতো হয়ে কাঁদতে লাগলেন। *বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ, প্রাকৃত শিশু,* 'একটি *প্রাকৃত শিশু,* স্বাভাবিক শিশু হয়ে গেলেন।' পিতামাতা শিশুর ঈশ্বরীয় মাত্রা ভুলে গেলেন। কেবল তখনই তাঁরা শিশুর *যত্ন* নিতে পারলেন। তারপরেই, আমরা পাই মনোমুগ্ধকর কৃষ্ণলীলা, শিশু কৃষ্ণের খেলা, যা ভারতের জনগণকে যুগযুগ ধরে বিমুগ্ধ করে রেখেছে, আর এখন অন্য দেশেরও বহু লোককে বিমুগ্ধ করছে। তারপর, বয়স হলে তিনি এক মহান লীলা—যথা অর্জুনকে *গীতা* শিক্ষা দিলেন, আর তার মাধ্যমে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকেও শিক্ষা দিলেন। এই হলো শ্রীকৃষ্ণাবতারের মাধুর্য ও শক্তি।

এখন শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর যেসব লেখক লিখছেন তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরের অবতারত্ব সম্বন্ধে এইরকম বোধ দেখা যায়। ফরাসী চিন্তাবিদ্, মসিঁয়ে রোমাঁ রোলাঁর *Life of Ramakrishna* (রামকৃষ্ণ জীবনী) গ্রন্থের একটি কথা আমার ভাল লাগে, যেখানে তিনি রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে 'বিশ্ব আত্মার এক

অত্যুৎকৃষ্ট ঐকতান রূপে (Splendid Symphony)' উপস্থাপিত করেছেন। To my Western Readers (p. 13) 'আমার পাশ্চাত্য পাঠকদের প্রতি' অংশে রোমাঁ রোলাঁ বলছেন ঃ

'যে মানুষটির ছবি আমি এখন এখানে মানুষের মনে জাগিয়ে তুলছি, তিনি ছিলেন ত্রিশকোটি লোকের দু-হাজার বছরের অধ্যাত্ম জীবনের পরিপূর্ণ সিদ্ধরূপ। যদিও তিনি চল্লিশ বছর হলো দেহ ত্যাগ করেছেন, তাঁর আত্মা এ যুগের ভারতকে প্রাণচঞ্চল করে রেখেছে। তিনি গান্ধীর মতো কর্মবীর ছিলেন না, গ্যেটে বা টেগোরের* মতো কলা বা চিন্তা জগতের সহজাত প্রতিভাসম্পন্ন কোন পুরুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন বাংলার গ্রামের এক সামান্য ব্রাহ্মণ, যাঁর বাহ্যজীবন তৎকালীন রাজনীতিক ও সামাজিক কর্মতৎপরতার বাইরে, কোন বিশেষ ঘটনাবিহীন বাঁধা ছকে চলত না। কিন্তু অন্তর্জীবনে সমগ্র মানবীয় ও দৈব বৈচিত্র্যকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন।'

এর আগে *To My Eastern Readers* (আমার প্রাচ্য পাঠকদের প্রতি) অংশের ভূমিকায় (পৃঃ ২-৩) তিনি বলেছেন ঃ

'আর যেহেতু রামকৃষ্ণ অন্য কোন মানুষের থেকে আরো বেশি পরিপূর্ণভাবে এই ঈশ্বরীয় নদীর সার্মগ্রিক ঐক্যভাবকে, কেবল ধারণা করা নয়, নিজে উপলব্ধি পর্যন্ত করেছিলেন—যে নদী সকল নদী, সকল স্রোতস্বতীর কাছে উন্মুক্ত ছিল—তাই আমি এই পবিত্র জলের একটু গ্রহণ করেছি মহাজাগতিক তৃষ্ণা প্রশমিত করতে।'

এই অসাধারণমাত্রা প্রথমে প্রকটিত হয়েছিল মাত্র অতি অল্পলোকের কাছে। নরেন্দ্র, পরবর্তী কালে বিবেকানন্দ, বুঝেছিলেন; অন্য আরো কিছু লোক বুঝেছিলেন। ঠিক যেমন যিশুকে, দুই-এক জনই বুঝেছিল, অন্যে নয় ঃ তাদের মধ্যে একজনের মন্তব্য হলো ঃ 'তিনি কি সূত্রধরের পুত্র নয়?'

অতএব, অবতার পুরুষদের আন্তরমাত্রা এবং তার বিরাট বিস্তার বোঝা যেতে থাকে, শতাব্দীর পর শতাব্দী কাল যেমন গড়িয়ে যায়। আজ, শ্রীকৃষ্ণের মহত্ত্ব আমরা বিনা দ্বিধায় বুঝতে পারছি। কিন্তু যখন তিনি জীবিত ছিলেন, তখন কতজনই বা তাঁর মহত্ত্ব বুঝেছিল। কেউ তাঁকে স্যমন্তক মণিমালা অপহরণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করেছিল, এবং তাঁকে নিজে প্রমাণ করে দেখাতে হয়েছিল যে তিনি অপহরণ করেন নি। শিশুপালের মতো সমসাময়িক

* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শাসকবর্গও তাঁকে দোষারোপ করেছিল। তাই, অন্য মানবের মতোই অবতারকেও জীবনে উত্থান পতনের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। কিন্তু সে সব তাকে—তাঁর অন্তরস্থ প্রচণ্ড দিব্য-শক্তির উৎস থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে না। ঐ শক্তি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে বাহিত হতে থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতা শিক্ষা দিয়েছিলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে প্রায় তিন হাজার বছরেরও বেশি আগে। কেবল অর্জুনই সেখানে ছিল, আর সঞ্জয় তা দেখছিল রাজধানী থেকে ঋষি ব্যাসের বরে। কিন্তু আজ লক্ষ লক্ষ লোক শুনছে—শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছিলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে। তেমনি বুদ্ধ বারাণসীর কাছে সারনাথে বসে তাঁর পাঁচ শিষ্যকে উপদেশ দিয়েছিলেন খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে। তিনি তখন যা বলেছিলেন পাঁচশত বছরের মধ্যে তা সারা এশিয়া মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে মানুষের জীবনে পরিবর্তন এনেছিল। যিশু তাঁর এগারজন শিষ্যকে উপদেশ দিয়েছিলেন। আর সেই কণ্ঠস্বর পরবর্তী হাজার বছরে লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। তাই দেখা যাচ্ছে, যাঁকে ঈশ্বরাবতার বলা হচ্ছে—তিনি একটি সাধারণ লোকমাত্র ছিলেন না। তাঁর বিষয়ে কিছু অসাধারণ ব্যাপার থাকে, কিন্তু সাধারণ লোক তাঁকে বুঝতে পারে না। আমাদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ না ঘটলে, অবতারের মহত্ত্ব বোঝা আমাদের সাধ্যাতীত। শ্রীকৃষ্ণ পরে বলবেন, 'বহু লোকেই আমার প্রকৃত রূপ জানে না। যাদের অধ্যাত্মবোধ হয়েছে তারাই বুঝতে পারে।' তিনি অর্জুনকে বলেন : 'আমি পৃথিবীতে আসি অবতার রূপে, *সম্ভবামি*', 'কিন্তু কখন?' পরের শ্লোকেই তার উত্তর রয়েছে।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭॥

—'হে ভরত বংশজাত; যখনই ধর্মের মধ্যে ত্রুটি প্রবেশ করে, আর অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই আমি শরীর ধারণ করি।'

এই হলো ঈশ্বরের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য। অন্য কোন শক্তি এ কাজ পারে না। এটি একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক, আমাদের সাধকগণ হাজার হাজার বার যার উদ্ধৃতি দেন : *যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত*, 'যখনই ধর্মের গ্লানি হয়, আর *অভ্যুত্থানম্ অধর্মস্য*, অধর্ম বৃদ্ধি পায়, *তদাত্মানম্ সৃজাম্যহম্*, 'আমি সেই সময়ে দেহ ধারণ করি।' উদ্দেশ্য হলো :

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮॥

—সৎ ব্যক্তিদের রক্ষা করতে, আর দুষ্টের নাশ করতে, আর ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে, আমি প্রতি যুগে দেহ ধারণ করে এসে থাকি।'

যা *ধর্ম,* যা পুণ্য, যা ভাল ও পবিত্র, সেগুলিকে রক্ষা করতে, আর যা মন্দ, যা দুষ্টবুদ্ধিপ্রসূত সেগুলিকে ধ্বংস করতেই আমি আসি—একবার নয়—*যুগে যুগে,* 'কালে কালে'। যখনই প্রয়োজন হয়, ঐ কারণে আমি এসে থাকি। জগৎকে সুব্যবস্থায় রক্ষা করা ঈশ্বরের এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। শঙ্করাচার্যের *গীতা* ভূমিকা আমরা আগে আলোচনা করেছি, সেখানে তিনি এই পরিস্থিতির উল্লেখ করে বলেছেন—মানব সত্তাগুলির মধ্যে পরস্পর মিলনের সহায়ক 'সংযোজক উপাদানে'র অভাবে সামাজিক কাঠামো চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তাই সমাজে ভাঙ্গন দেখা যাচ্ছে; তাই সমাজে হিংসা ও অপরাধের প্রাদুর্ভাব; সর্বত্র সাফল্যের অভাব। এই পরিস্থিতি থেকে সমাজকে পুনরুদ্ধার করতে হবে; কোন পণ্ডিত বা রাজনীতিকের দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়, কোন পুরোহিত বা পাদ্রি এ কাজ করতে পারবে না; কোন লোকসভাও পারবে না। একমাত্র ঐশ্বরিক শক্তিতেই এই পুনরুদ্ধার সম্ভব। কোন্ বিশেষ মানবিক পরিস্থিতিতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব হয়? একমাত্র উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের মাধ্যমেই, অন্য কোন উপায়ে নয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *সম্ভবামি যুগে যুগে,* যখনই এই পরিস্থিতি হয়, 'আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই।' ভারতের ৫০০০ বছরের ইতিহাসে, এ পরিস্থিতি বার বার এসেছে। সীমিত কালের ইতিহাসে আমাদের পক্ষে বহু অবতার দেখা সম্ভব না হতে পারে। দীর্ঘকালের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখা যায়, যখন ঈশ্বরীয় বিকাশ ঘটেছে এবং তার ফলে মনুষ্য-জীবন আবার সতেজ হয়ে উঠেছে, নৈতিক মূল্যবোধ এসেছে, মানবিক মূল্যবোধ এসেছে—এরকম কিছুদিন চলে—আবার অবনতি ঘটে, আবার পুনরুজ্জীবনের ক্রিয়া চলতে থাকে। উচ্চ নৈতিক মূল্যবোধ নিয়ে যা আরম্ভ হয়েছিল, কালে মানবিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে চলতে চলতে তা নিম্নস্তরে নেমেছে—কাজেই প্রয়োজন হয়েছে, এক নতুন অনুপ্রেরণা। তাই, 'আমি বার বার আবির্ভূত হই'। *সম্ভবামি যুগে যুগে,* উদ্দেশ্য হলো *পরিত্রাণায় সাধূনাম্,* 'সৎ ও সাধু ব্যক্তিদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য।'

অনেক সরকারি বিভাগে, দেখা যায় ভাল সৎ কর্মচারী শক্তিশালী অসাধু

কর্মচারীদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে; অফিসে যদি দু-একটি সাধু অফিসার থাকে—তবে তারা কষ্টে দিন কাটায়। অন্য সকলে তাদের নিচে নামাতে চেষ্টা করে, তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলাও করে। আমাদের সমাজে কার্যত এরকম ঘটতে দেখা যায়। ফলে স্পষ্টবাদী সাধু লোকেরা কষ্টের মধ্যে পড়ে ও কিছুদিন পরে সেও বলতে পারে, 'আমিও তোমাদের দলে'।

১৯৪৭ খ্রিঃ রাজনীতিক স্বাধীনতা লাভের সময় কতই না উচ্চমনা ভাব আমাদের মধ্যে ছিল! তারপর প্রতি বছর গড়ানে পথে একটু একটু করে এই ভাব নেমে চলেছে, এখনও চলছে। বিবেকানন্দের রচনাদি পাঠে নতুন শক্তি আসতে দেখা যায় : 'চলো আমরা ওপরে উঠি, আর নিচে নামা নয়! আমরা যেন দেশকে, আমাদের দেশের দুর্বলতর মানুষকে ভালবাসতে শিখি ও পূর্ণ উদ্যমে তাদের সেবা করি।' সেই বার্তা যখন আরো লোকের কাছে পৌছুবে, তখন ঐরূপ পরিবর্তন আসবে। আজ, যে মহতী শক্তি বিকশিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মময়ী মাতা ঠাকুরাণী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর মাধ্যমে—তা সৃষ্টি করবে এক ব্যাপক পুনরুজ্জীবন—নৈতিক ও মানবিক সচেতনতা ও শক্তির। বিবেকানন্দ বলেছিলেন[১] :

" 'ত্যাগ ও সেবাই' ভারতের জাতীয় আদর্শ—ঐ দুটি বিষয়ে তাকে উন্নত করুন, তা হলে অবশিষ্ট যা কিছু আপনা হতেই উন্নত হবে। এদেশে ধর্মের পতাকা যতই উচ্চে তুলে ধরা হোক, কিছুতেই তা পর্যাপ্ত হয় না। কেবল এর ওপরেই ভারতের উদ্ধার নির্ভর করছে।"

সমাজে এই সব মহান ভাবগুলির প্রসার হতে সময় লাগে। ভারতীয় সমাজে বুদ্ধ-বাণী প্রচারিত ও প্রবর্তিত হয়েছিল ৩০০ বছর পরে, মৌর্য সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে। বিবেকানন্দ বলতেন, ভারতের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ কাল গেছে—যখন বুদ্ধবাণী ভারতীয় সমাজকে ও সেই সঙ্গে এশিয়া ভূখণ্ডের বহুজাতিকেও অনুপ্রাণিত করেছিল করুণা, পবিত্রতা ও সেবার ভাবে—তখন ভারতের বহু জায়গায় পশুসেবা, পশু-চিকিৎসাগারও চালু হয়েছিল। কিন্তু আরো পাঁচশ বছর পড়ে, ধীরে ধীরে অবক্ষয় শুরু হলো। খ্রিস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে ঐ বাণীর মূল শক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। চৈনিক তীর্থযাত্রী, হূয়েন সাং যিনি খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারত দর্শনে এসে, তাঁর সাত বছর ধরে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে গেছেন—তখনই তিনি ঐ অবক্ষয় লক্ষ্য করেছিলেন। সেই

১ বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৯ খণ্ড, পৃঃ ৪৭৮

সময়েই, *আধ্যাত্মিক* ও *তাত্ত্বিক* দিক থেকে শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব হয়, তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল প্রভূত শক্তি, পবিত্রতা ও করুণামণ্ডিত—আর তিনি আশ্চর্যজনক কাজ করেছিলেন জনগণের তাত্ত্বিক ও মানসিক স্তরে এবং সেই সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠাও তিনি করেছিলেন। আর স্বামী বিবেকানন্দই সাধারণ লোকের কাছে তুলে ধরলেন বুদ্ধ-বাণী ও শঙ্কর-বাণীর মধ্যে বৈদান্তিক সমন্বয়ের ভাবটি—সমগ্র জাতির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এই কাজই এখন শুরু হয়ে গেছে সমন্বয়ের দূত শ্রীরামকৃষ্ণের ঐশ্বরিক বিকাশের মাধ্যমে—আমাদের যুগেই। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের এই সমন্বয়ী ভাবটিকে প্রকাশ করে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তুতি সমন্বিত একটি সুন্দর স্তোত্রে—যখন তিনি হাওড়াতে একটি ভক্তের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি প্রতিকৃতি স্থাপিত করেছিলেন ঃ

স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে;
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ—

—'হে শ্রীরামকৃষ্ণ! তোমাকে প্রণাম, যে তুমি এসেছিলে *ধর্মকে* প্রতিষ্ঠিত করতে', *স্থাপকায় চ ধর্মস্য* ঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞার মতোই। *সর্বধর্ম স্বরূপিণে,* কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, অথবা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিশানা বা নিজনাম যুক্ত কোন মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, পরন্তু 'প্রত্যেক ধর্মের মূর্তবিগ্রহ স্বরূপ' এবং *অবতারবরিষ্ঠায়,* 'পরম ঈশ্বরীয় বিকাশস্বরূপ', *রামকৃষ্ণায় তে নমঃ,* হে রামকৃষ্ণ তোমাকে আমরা প্রণাম জানাই। সুতরাং তুমি দেখবে, যে এই ঈশ্বরীয় অবতরণ ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বার বার ঘটেছে। অন্যান্য দেশে তা একবারই ঘটেছে—খ্রিস্টীয় ধর্মে—কিন্তু তবু সেখানকার লোকে তখন তাঁকে গ্রহণ করেনি; তারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল। ঈশ্বরের পৃথিবীতে আগমনই যথেষ্ট নয়, কিন্তু মানুষকেও তৈরি থাকতে হবে, তাঁকে গ্রহণ করার জন্য। ভারতে এ বিষয়টির স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। ভারতের একটি তত্ত্ব রয়েছে, একটি সংস্কৃতি রয়েছে, যা ঈশ্বরীয় বিকাশকে স্বীকার করে, স্বাগত জানায়। আমরা আমাদের মহান আচার্যগণকে ক্রুশ বিদ্ধ করি না। অন্যান্য জাতি ধর্ম সংস্কারকগণকেও হত্যা করে; কিন্তু ভারতে তা কখনো হয়নি। আমরা সব সময়েই অবতারকে বা ধর্ম সংস্কারককে বোঝবার চেষ্টা করি; প্রথমে অল্প লোকে, ক্রমে বেশি বেশি লোকে; এই ভাবেই অবতার লোককল্যাণ সাধন কার্য আরম্ভ করেন, আর এই আধুনিক যুগে, কেবল ভারতের জন্য নয়, পরন্তু ভারতেতর সর্বদেশের জন্য। এই বিশাল কর্মযজ্ঞ এখনও চলেছে ধীর ও

শান্তভাবে। এ কাজ কয়েক হাজার বছর আগে হয়তো তিনচার হাজার বছর আগে শ্রীকৃষ্ণ শুরু করে গেছেন। সেই আশ্চর্য শিক্ষাই আমরা এখন চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করছি।

৭ম ও ৮ম শ্লোকদুটিতে ঈশ্বরের অবতারত্বের ভাবটি আলোচিত হয়েছে। আমি ঈশ্বরের অবতারত্বের ভাবটি উল্লেখ করেছি আমার *Eternal Values for a Changing Society* (পরিবর্তনশীল সমাজের জন্য নিত্য মূল্যবোধসমূহ) নামক গ্রন্থের, ৪র্থ খণ্ডের মধ্যে প্রথমটিতে, দুটি প্রবন্ধে; গ্রন্থটি ভারতীয় বিদ্যাভবন, মুম্বাই-৭, থেকে প্রকাশিত। ঐ প্রবন্ধদুটির নাম *Avatara as History-Maker* (ইতিহাস প্রবর্তকরূপে অবতার) ও *Avatara as Divinity* (ঈশ্বররূপে অবতার)। ইতিহাস-প্রবর্তন ও অবতারত্ব—এই দুটি মূল্যবোধ কোন কোন মহান পুরুষের মধ্যে মিলে মিশে এক হয়ে যায়। আর তারাই মানবজাতির কাছে গভীর শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে থাকেন। তাঁরাই ভালবাসা ও করুণা, সহনশীলতা ও বোধের এক প্রবাহধারা সৃষ্টি করে যান। তাঁরা শত শত বছর পরেও সেই শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে থাকেন। এই শ্রেণীর মহান মানবদের, পৃথিবীর ইতিহাসে যাঁদের সংখ্যা খুবই কম, এঁদের অবতার বা 'ঈশ্বরীয় আবির্ভাব'-এর থেকে শ্রেষ্ঠতর কোন আখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁদের প্রতিই মানবজাতি ঈশ্বরীয় সম্মান ও ঈশ্বরীয় পূজা নিবেদন করে। এ রকম মানব পৃথিবীর ইতিহাসে বেশি নেই। তাঁদের থেকে নিম্নতর ব্যক্তিত্ব নানা দিকে মানবজীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে—এমন লোক প্রচুর দেখা যায়। কখনো কখনো ভলটেয়ার, রুসো ও কার্ল মার্কসের মতো মহান গ্রন্থকার—বিরাট সামাজিক রাজনীতিক আন্দোলনে অনুপ্রেরণা দিতে পারেন। তেমনিই পারেন বিভিন্ন দেশের লেখক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবিগণ। কিন্তু ঈশ্বরীয় অবতারের শ্রেষ্ঠত্ব স্বতন্ত্র। সেই কথাই এখানে প্রকাশ করা হচ্ছে ঃ আমাদের সকলের মধ্যে ঈশ্বরীয় দীপ্তির স্ফুলিঙ্গ রয়েছে, তার কণামাত্র মিট্‌মিট্ করে কিরণ দিচ্ছে, কিন্তু তা ঐ ঈশ্বরীয় ব্যক্তিত্বে প্রজ্বলিতভাবে দীপ্তিমান। তাই, তাঁকে ঈশ্বরীয় শরীর-ধারণ বলে বর্ণনা করা হয়, আর তিনি আসেন আমাদের অন্তর্নিহিত ঈশ্বরীয় সত্তাকে উচ্চস্তরে তুলে দিতে। এই হলো ভারতীয় সংস্কৃতির আলোকে *অবতারের* তাৎপর্য।

শ্রীকৃষ্ণ অষ্টম শ্লোকে স্বীকার করেছেন যে, সমাজে *ধর্ম* বা নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি করতে, তিনি বার বার এ জগতে আসেন মানবরূপে এবং আপন কর্ম করে যান। আমরা দেখেছি পূর্বতন অবতারে, শ্রীকৃষ্ণ ও

শ্রীরামচন্দ্র, ক্ষত্রিয়রূপে জন্মগ্রহণ করে বাস্তবে দুষ্ট লোকেদের বিনাশ করেছেন—শ্রীকৃষ্ণ কংসকে ও শিশুপালকে এবং শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে। কিন্তু বুদ্ধ অবতারে দুষ্ট লোকেদের শারীরিকভাবে বিনাশ করতে দেখা যায় নি; কেবল অসীম প্রেম ও করুণাই দেখা যায়—যার ফলে লোকের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটেছিল। যিশুর ক্ষেত্রেও তাই দেখা যায়। এক আধ্যাত্মিক শক্তি তাঁদের থেকে প্রবাহিত হয়ে সকলকে, এমনকি পাপীদেরও স্পর্শ করেছিল। আজকাল শ্রীরামকৃষ্ণে আমরা সেই শক্তির খেলাই দেখছি, মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তারের কাজে—মৃদুভাবে নিঃশব্দে এমনকি তাদের অজান্তে। এই হলো ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ, মানব শরীরের মাধ্যমে নানাভাবে। শ্রীকৃষ্ণ একবার একথার উল্লেখ করেছিলেন, আবার তিনি অবতারের ঈশ্বরীয় জন্ম ও কর্মের কথা নবম শ্লোকে উল্লেখ করবেন। যদি কেউ এ বিষয়ে যা প্রকৃত সত্য তা জানে—যদি সে জানে যে অবতার এক সাধারণ শক্তিবিশিষ্ট মানুষ নন, তাঁর মাধ্যমে ঈশ্বরীয় শক্তিই খেলা করছে, তবে তার আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটবে। ভারতীয় *ভক্তি* আন্দোলনে, অবতারকে কেন্দ্র করে যে *ভক্তি* তা এক মহান শক্তির উৎস, যা মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির অগ্রগতিতে প্রেরণা জোগায়। এই *ভক্তি* গতিশীল, কারণ এতে প্রেরণা জোগাবার জন্য আদর্শরূপে রয়েছেন এক ঈশ্বরীয় ব্যক্তিত্ব। তাই আমাদের অধিকাংশ ভক্তি আন্দোলনই ঘটেছে কোন না কোন অবতার পুরুষকে কেন্দ্র করে; শিব, বিষ্ণু, দেবীর মতো পৌরাণিক ঈশ্বরীয় ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করেও *ভক্তি* হতে পারে, তাও মানুষের অধ্যাত্ম জীবনের উন্নতি ঘটাবার পক্ষে সহায়ক হতে পারে। কিন্তু এই সহায়তা প্রবল হয় যখন মানবরূপ অবতারে ঈশ্বর প্রকট হন ঃ তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥ ৯॥

—'হে অর্জুন, যে এইরূপে আমার ঐশ্বরিক জন্ম ও কর্ম, ঠিক ঠিক জানবে, সে দেহত্যাগের পর আর জন্মগ্রহণ করে না, সে আমাকে পায়।'

আমার জন্ম ও কর্ম, 'জন্ম ও কাজ', হলো *দিব্যম্*, 'ঐশ্বরিক'; তা সাধারণ লৌকিক ধরনের নয়। আমাদের নিজ *জন্ম* ও *কর্ম* আছে। আমরা *জীব*, 'সাধারণ মানবাত্মা'। আমরা এত সব জিনিস পাবার জন্য ক্ষুধিত হই, আকাঙ্ক্ষা করি, এটার পেছনে ছুটি, ওটার পেছনে ছুটি। এই হলো আমাদের *জন্ম* ও *কর্ম*। অবতারের ক্ষেত্রে তা অন্য রকমের। কোন কিছুর পেছনে তাদের ছুটতে হয়

না। তারা পূর্ণ, সবই তাদের রয়েছে। প্রথম থেকেই তাঁরা দান করেন, তাঁদের অন্তরস্থ প্রাচুর্য থেকে। এই হলো তাঁদের জন্ম ও কর্ম। শিশুকাল থেকেই তাঁরা জানেন যে এক মহান কাজের জন্যই তাঁদের আগমন। *জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্*, 'আমার ঐশ্বরিক জন্ম ও কর্ম।' *এবং যো বেত্তি*, 'যারা বোঝে'—*তত্ত্বতঃ*, 'স্বরূপতঃ প্রকৃত সত্যের দিক থেকে' : 'এতে কিছু ঐশ্বরিক ব্যাপার রয়েছে, আমি তা জানি।' তুমিও তখন জানবে, যখন তোমার কিছুটা আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে। অন্যথায়, তুমি ঐশ্বরিক ব্যক্তিত্বের যথাযথ ধারণা করতে পারবে না। তাই, *ত্যক্তা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি*, 'মৃত্যুতে—দেহত্যাগের পর এই লোকের আর জন্ম হয় না।' ঐ দিব্যভাবাপন্ন ব্যক্তিত্বের প্রতি প্রেমকে কেন্দ্র করে, সেই ব্যক্তিত্বকে ঈশ্বরের অবতারত্বকে জেনে—সে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তার আর জন্ম হয় না। *স মাম্, এতি অর্জুন*, 'হে অর্জুন, সে কেবল আমাতেই লীন হয়'। সে আমার সঙ্গে একত্ব প্রাপ্ত হয়। তাই হলো আধ্যাত্মিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা। একজন ভক্ত বাসনা করে সর্বক্ষণ ঈশ্বরের কাছে থাকতে; ঠিক যেমন মাছ চায় সর্বদা জলে থাকতে। জলই তার জীবন, জলের বাইরে সে বাঁচে না। তাই ভক্ত চায় সদা সর্বদা ঈশ্বরীয় ভাবে নিমজ্জিত থাকতে। এরকম লোকই হয় অতীব মহান অধ্যাত্ম *সাধক*, অনুসন্ধিৎসু। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের বলছেন যে ঈশ্বরীয় অবতারের মহত্ত্ব বোঝার ক্ষমতা যে কোন লোকের হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ভরদ্বাজাদি মুনিগণও রামাবতারের সময়ে শ্রীরামকে অবতার বলে বোঝেননি। তারা তাঁকে 'এক মহৎ ব্যক্তি'রূপেই দেখেছিলেন ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। অল্প কয়েকজনই শ্রীরামকে দেখামাত্রই তাঁর ব্যক্তিত্বে ঈশ্বরীয় গুণাবলী লক্ষ্য করেছিলেন। এ ব্যাপার যিশুর ক্ষেত্রেও দেখা যায়, অনেকেই তাঁর সঙ্গে ছুতোরের ছেলের মতো ব্যবহার করতেন। কিছু লোক শ্রীকৃষ্ণের দিব্য মহত্ত্ব মোটেই বোঝেনি। কিন্তু যারা বুঝেছিল তারা সেই বোধের মাধ্যমে প্রচুর আধ্যাত্মিক পুষ্টি লাভ করেছিল। পরবর্তী দশম শ্লোকটি খুবই প্রসিদ্ধ ও দৈব অর্থে পূর্ণ :

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥

—'আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ থেকে মুক্ত, মদ্‌গত চিত্ত, আমার শরণাগত, জ্ঞানাগ্নিতে শুদ্ধ বহু ব্যক্তি আমার ভাব, অর্থাৎ ব্রহ্ম ভাব, উপলব্ধি করে মোক্ষ লাভ করেছে।'

এখানে অতি সরল সংস্কৃতে গভীর অর্থপূর্ণ কয়েকটি কথা বলা হয়েছে। শেষ ছত্রটিতে বলা হয়েছে ঃ *বহবো মদ্‌ভাবম্ আগতাঃ*, 'অনেকে আমাতে একীভূত হয়েছে'। আগে তিনি বলেছিলেন, 'যারা আমাকে ঈশ্বরাবতার রূপে ঠিক ঠিক উপলব্ধি করেছে, তারা আমার কাছে আসে।' এখন তারই পুনরুক্তি করছেন ঃ অনেকেরই এরূপ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হয়েছে। এটা কিছু নতুন নয়। যুগে যুগে 'বহু লোক তপস্যা করে এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি প্রাপ্ত হয়েছে।' *বহবো মদ্ভাবম্ আগতাঃ*। এই হলো এই শ্লোকের মূল বক্তব্য। অনেকে আমার কাছে এসে আমাতে একীভূত হয়ে গেছে। একজন, দুজন নয়, অনেকে। আধ্যাত্মিকতার বৃদ্ধি, উন্নতি ও উপলব্ধির এ এক মহান ঐতিহ্য। তারা কীভাবে এ জিনিস লাভ করেছিল? শ্লোকের বাকি অংশে তাই বলা হয়েছে। আর ঐ কথার এক প্রগাঢ় অর্থ রয়েছে সারা বিশ্বজুড়ে লোকের দৈনন্দিন জীবনে।

তারা তিনটি জিনিসকে অতিক্রম করে। সেগুলি কী? *রাগ, ভয়, ক্রোধ*। *বীত* শব্দের অর্থ বর্জিত। *রাগ, ভয়, ক্রোধ* বর্জিত। *রাগ* মানে ইন্দ্রিয়াসক্তি; ভয় হলো ভীতি; *ক্রোধ* হলো রাগান্বিত হওয়া। তিনটি আবেগ অসংযত হলে—তা হয় মানবের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপন্থী। মনে রেখো, 'বেদান্ত ভয়কেও নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের বন্ধু বলে মনে করে না।' ভয় হলো মহৎ কাজের বাধাস্বরূপ। মানব জীবন যাপন করতে হলে সাধারণ ছোটখাট ভয় থাকা দরকার। কিন্তু তার বেশি ভয়ের ক্ষেত্রে সে ভয় হলো এক বিপরীত শক্তি, যদিও অনেক ধর্মে 'ঈশ্বর ভীতি'র ওপর জোর দেওয়া হয়, ঈশ্বরের ভয়ে কম্পমান হওয়া; বেদান্ত মতে এর কোন নৈতিক মূল্য নেই; বাইরের চাপের জন্যই ভয় মানুষকে নীতিবদ্ধ করে। ঠিক যেমন পুলিসের লাঠি তোমাকে রাজপথে সঠিক আচার-আচরণে বাধ্য করে। তাতেই তুমি নীতিজ্ঞানসম্পন্ন হও না। বাহ্য শক্তির সাহায্যে তোমাকে নীতিপরায়ণ করা হয়েছে। অতএব, ভয়ের সঙ্গে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের কোন সম্বন্ধ নেই। ঠিক তেমনই, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের ওপর ভয়ের কোন ক্রিয়া নেই। বেদান্তে এই বিষয়টির ওপর বার বার জোর দেওয়া হয়েছে। ভয়কে জয় কর। খাঁটি লোকের কাছে কোনরকম ভয়ের স্থান নেই। অতএব, ঐ আবেগকেও অতিক্রম করতে হবে। আসক্তি, ভয়, ক্রোধ ঃ এই তিন আবেগের প্রচুর শক্তি আছে। আমরা সে শক্তিকে নষ্ট করতে চাই না; আমাদের ঐ শক্তির রূপান্তর ঘটাতে হবে। তার উপায় কী?

এই হলো পরবর্তী প্রসিদ্ধ বাক্যাংশটির তাৎপর্য ঃ *জ্ঞানতপসাপূতা*, '*জ্ঞানার্জনের জন্য তপস্যার* মাধ্যমে তাকে শুদ্ধ করে নিতে হবে'। কী সুন্দর এই অভিব্যক্তিটি! *জ্ঞান*, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ওপর তপস্যার ভাব আরোপ করা হয়েছে, যার আক্ষরিক অর্থ হলো কৃচ্ছ্রতা; জ্ঞানের কৃচ্ছ্রতা কী সুন্দর ভাবটি! আমরা প্রায়ই শারীরিক কৃচ্ছ্রতা পালন করি, যেমন উপবাস প্রভৃতি। তা খুবই সাধারণ। সব থেকে বড় *তপস্যা হলো মানসিক তপস্যা* ঃ মন তপস্যা করছে, তার মাধ্যমে ব্যক্তিত্বকে শোধন করছে। তার নাম হলো *জ্ঞানতপস্যা*। মনে কর কোন শিশু স্কুলে যায়। সে *জ্ঞানতপস্যা* শুরু করল; তাকে বই পড়তে হবে, বোঝবার চেষ্টা করতে হবে, তাকে আবার এ বিষয়টিকে রচনায় পুনঃপ্রকাশ করতে সচেষ্ট হতে হবে। এ সবই *জ্ঞানতপস্যা*। এ কাজ কঠিন। তুমি এই ভাবে মনের শিক্ষণের ব্যবস্থা করছ; এ হলো *জ্ঞানতপস্যার* একটি দিক। ভারতে সমগ্র ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা এইভাবে *জ্ঞানতপস্যারূপে* পরিকল্পিত হয়েছিল। জ্ঞান সরাসরি তোমার কাছে আসে না। জ্ঞান এমন জিনিস নয়, যা গিলে ফেললেই হলো। এর জন্য তোমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। যখন শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে তপস্যাকে সরিয়ে দেওয়া হয়, শিক্ষা ব্যবস্থা তুচ্ছ হয়ে যায়, বেশ সস্তা। সারা পৃথিবীতেই মহান চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ অধিকাংশ শিক্ষা ব্যবস্থাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। আমাদের দেশে এ ব্যবস্থা আরো খারাপ। শিক্ষা এতই গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। শিক্ষাব্যবস্থায় চিন্তার কোন প্রয়োজন নেই। মনের কোন কাজ নেই। *জ্ঞানতপস্যাকে* শিক্ষাব্যবস্থা থেকে একেবারে নির্বাসিত করে দেওয়া হয়েছে।

ভারত ও আমেরিকা সহ অন্যান্য দেশে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইদানীংকালের শিক্ষাসংক্রান্ত কর্মসূচির ওপর অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ও সমালোচনাও করেছেন। গীতার যদি কিছু বলার থাকতো তো বলতো যে, এই সমালোচনার কারণ হলো—জ্ঞানান্বেষণকে *তপস্যার* ভাব থেকে সরিয়ে রাখা হচ্ছে। মানব-মনকে আগে জ্ঞানানুসন্ধিৎসার স্তরে ওঠাতে হবে। যা শিক্ষা দেওয়া হয় তার পরিপাক ও আত্মীকরণ হওয়া চাই। এই সবই তো *তপস্যা*। যেমন বলেছি, এটি অতি কঠিন কাজ। তুমি শিক্ষকের কাছে তাঁর বক্তব্যগুলি শুনে রচনার আকারে তার পুনঃপ্রকাশ করলে। শিক্ষক তখন তা পরীক্ষা করে দেখলেন যে তোমার কাজটি ভাল হয়েছে। এ কাজে তোমাকে কতটা মানসিক *তপস্যা* করতে হয়েছে! এরকম *তপস্যা* এখন প্রায় দেখা যায় না।

জ্ঞানতপস্যার আর একটি দিক আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ক্রোধ,

কামলোলুপতা, ঘৃণা, ভয়—এসবের আবেগকে জ্ঞানের আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এই হলো *প্রকৃত তপস্যা*; এই *তপস্যাই* চরম *তপস্যা*; এর ফলেই মহান চরিত্র গড়ে ওঠে। তাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ *বীত রাগ ভয় ক্রোধা*, 'যারা *রাগ, ভয়* এবং *ক্রোধ*, আসক্তি, ভয় ও ক্রোধকে অতিক্রম করেছে, *মন্ময়া*, 'আমার চিন্তায় নিজমনকে পূর্ণ করে রেখেছে', *মাম্ উপাশ্রিতাঃ*, 'আমার প্রতি অনুরক্ত হয়েছে।' তারা জেনেছে যে, এই দিব্য সত্তাটি তাদের আপন অন্তরাত্মাতেই উপস্থিত রয়েছে, তিনিই সকলের আত্মা। তাদের মন সেই পরম সত্যের দিকে আকৃষ্ট হয়। *বহবো*, 'এরকম অনেকে', *জ্ঞান তপস্যাপূতা*, 'এই জ্ঞানাগ্নিতে শুদ্ধীকৃত' হয়ে, আসক্তি, ক্রোধ ও ভয়ের আবেগ-সৃষ্টিকারী শক্তিকে ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের শক্তিবৃদ্ধিকল্পে গঠনমূলক, সৃষ্টিমূলক প্রচেষ্টায় রূপান্তর ঘটিয়ে থাকে ঃ এই হলো *তপস্যা*। তপস্যা ছাড়া এর কোনটাই হওয়া সম্ভব নয়।

আমি প্রায়ই বলে থাকি যে আমরা ভূগর্ভ থেকে অশোধিত তেল নিয়ে, তাকে শোধন করে, তা থেকে সুন্দর ও প্রয়োজনানুরূপ পেট্রোলিয়ামজাত জিনিস তৈরি করি। তেমনি, এই মানব শরীর ও মন পরিণত হয়ে উঠে এক শোধনাগারে; মনস্তাত্ত্বিক শোধনাগারে। এই সব আবেগগুলিকে শোধন করে নাও। এই শোধন কার্যের ফলে কী সব জিনিস উৎপন্ন হয়? সব রকম নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ—ভালবাসা, করুণা, নির্ভীকতা, সেবাপরায়ণতা। বেদান্ত ঘোষণা করে যে সমস্ত মূল্যবোধের উৎস হলো—সেই অনন্ত, *নিত্যশুদ্ধ* ও নিত্যমুক্ত আত্মা—যাঁর অবস্থান হলো দেহ-মন সংঘাতের গভীরে। *বেদান্ত আরো মনে করে যে মূল্যবোধ বিজ্ঞান হলো—ভৌত বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের মধ্যে—সেতুস্বরূপ। জ্ঞানতপস্যার* এই ভাবটি কী সুন্দর! আধুনিক সভ্যতায় এ বিষয়টি নিয়ে আমরা কখনো চিন্তা করিনি। আমরা সব সময়ে বাহ্য বস্তু নিয়েই চিন্তা করছি। এতে মানুষের কী হচ্ছে? তারা হয়ে পড়ছে অহংবোধসর্বস্ব, হীনচেতা, বিবাদপ্রিয় আবার হিংসাশ্রয়ী ও অপরাধপ্রবণ। এ সবই ঘটছে শিক্ষিত লোকেদের মধ্যেই। আমরা কখনো শিক্ষা ব্যবস্থাকে এই নতুন দিক থেকে গড়ে তোলার চেষ্টা করিনি; সেটি ভুল হয়েছে। তোমার মনকে গড়ে তোলো আর চিন্তাধারাকে ও আবেগসমূহকে শোধন কর। তোমার মন, তোমার আবেগসমূহ—এগুলিই তোমার নিকটতম বস্তু। তাদের গড়ে নাও, শোধন করে নাও। তা করতে পারলে কত উচ্চ মানের চারিত্রিক শক্তিই না তা থেকে বেরিয়ে আসবে! আর মানব জীবন কতই না সুখের হবে! মানুষে মানুষে সম্পর্ক কতই

না শান্তিপূর্ণ হবে! স্বামী-স্ত্রী-সম্পর্ক কতই না প্রেমময় ও শান্তিবিমণ্ডিত হবে। মানব জাতি কত পরিপূর্ণ জীবনই না লাভ করবে! আর অধুনাতম জীববিদ্যাও *পরিপূর্ণতাকেই* মানবিক ক্রমবিকাশের লক্ষ্য বলে মনে করে।

তাই, দশম শ্লোকের এই *জ্ঞানতপস্যা*-ভাবের ওপর জোর দেওয়া বর্তমানে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তুমি কি *জ্ঞানতপস্যা করেছ?* যে কোন বিষয়ের তথ্যাদির অবগতিই হলো *জ্ঞান*, কিন্তু এই প্রেক্ষাপটে এ হলো আধ্যাত্মিক জ্ঞান, এর ব্যাপারে তোমার আচরণ কি *তপস্যার* ভাবে করা হচ্ছে? শ্রেষ্ঠ *তপস্যা* হলো *জ্ঞানতপস্যা*। শারীরিক *তপস্যা* তো অতি সাধারণ ঃ কিছু কিছু বিষয়ে সহিষ্ণুতায় উৎকর্ষ সাধনের বিবরণ মাত্র। কিন্তু এই *জ্ঞানতপস্যা* এমন কিছু, যা উচ্চমানের চরিত্র গড়ে তোলে, আর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবিশেষ থেকে উদ্ভূত হয় প্রচণ্ড শক্তিসম্পদ। নিজের মধ্যে ঐরূপ শোধনাগার গড়ে তুলতে হবে। তা করতে হবে স্বীয় আত্মপ্রচেষ্টায় আমাদের নিজেদেরকেই। অন্য কেউ তা তোমার বা আমার জন্য করে দেবে না। আমি যদি একটি তৈলশোধনাগার চাই, আমি নিশ্চয় জানি যে ভারতে কোন না কোন দেশ এর জন্য প্রচুর অর্থ লগ্নি করতে পারে। কিন্তু মনঃশোধনের ক্ষেত্রে কোন লোকই তোমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। তোমাকে নিজেই এ কাজ করতে হবে, যদিও অন্যের কাছ থেকে এ বিষয়ে নির্দেশনা তুমি পেতে পার। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে এই উপদেশই দেওয়া হয়েছে ঃ

উদ্ধরেদ্‌ আত্মনাত্মানং নাত্মানম্‌ অবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুঃ আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ গীঃ, ৬.৫ ॥

—'তুমি নিজেই নিজেকে ওঠাও, নিজেকে দুর্বল করে ফেলো না; তুমি নিজেই তোমার বন্ধু, আবার শত্রুও বটে।'

বন্ধুরাত্মাত্মনঃ তস্য যেন আত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ গীঃ, ৬.৬ ॥

—'মানুষ নিজেই নিজের বন্ধু হয়—যখন সে নিজেকে জয় করতে পারে; যদি কেউ নিজে আপন মনকে বশে রাখতে না পারে, তবে সে নিজেই নিজের শত্রুর মতো কাজ করে।'

এটি সুন্দর ভাব, প্রত্যেক শিশুকে এইভাবে ভাবিত করতে হবে। পাঁচ ছয় বছর বয়সের মধ্যে শিশুর জানা চাই, কী করে তার শরীর-মনকে একটি

শোধনাগারে পরিণত করে ফেলা যায়; তখনই তাকে শুরু করতে হবে বাইরের প্রভাবকে আর সেই সঙ্গে, তার জন্য নিজের ভেতর থেকে যে স্বতস্ফূর্ত সাড়া জাগবে, তাকেও শুদ্ধ করার কাজ। বাইরের মন্দ প্রভাবকে তো অবশ্যই শোধন করা চাই, আর কেবল তার শুদ্ধ অংশটুকুই বাইরে পাঠাতে হবে। পেছনে ঈশ্বর আছেন এ বোধ যখন তার আসে তখন এই রকমই প্রকৃতি হয় মানবিক মনস্তাত্ত্বিক পরিকাঠামোর। *অতএব, সকলেই অল্পবিস্তর এ কাজ করতে পারে।* তাই বলা যায়, যে এ শ্লোকটির বিরাট প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে, মানবিক উন্নতি, সাফল্য, সুখদায়ক মানবিক সম্পর্ক—তথা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাপারে। অন্তরের শোধন ব্যবস্থা যদি সামান্যও না থাকে, তবে যে কোন রাজনীতিবিদ আন্তর-রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু যদি তারা বিশেষভাবে শুদ্ধ হয়, তবে তারাই হয়ে উঠবে জাতীয় শক্তি এবং সুগভীর আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া ও শান্তির উৎস। তেমনিই হবে, একই পরিবারে পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রেও। অতএব এই কার্যধারা আমাদের একটু একটু করে শুরু করতে হবে, পাঁচ ছয় বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের বালকবালিকাদের মধ্যে। তারপর বার চৌদ্দ বছরে এ কার্যধারা আরো জোরদার করে তুলতে হবে, যাতে পঁচিশ বছর বয়সে ঐ ব্যক্তি অনুভব করতে পারে যে, 'হাঁ, আমি আমার দেহ-মন সংঘাতকে আমার ভূয়োদর্শন পরিশোধনের একটি পরীক্ষাগারে পরিণত করেছি'। শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে কী দারুণ ধ্যানধারণা! এর সঙ্গে জ্ঞান আহরণ করতে থাক বই থেকে, শিক্ষকদের কাছ থেকে, স্কুল কলেজের মাধ্যমে। কিন্তু *জ্ঞানতপস্যা* ছাড়া, বাহ্যজ্ঞান ফলপ্রসূ হবে না। *পূতা জ্ঞান তপসা; পূতা* 'শোধিত', *জ্ঞান তপসা* 'জ্ঞানের তপস্যার দ্বারা'; *মদ্ভাবম্ আগতাঃ,* 'তারা আমাতে একীভূত হয়'। বহবো, 'অনেকে'। যদি অনেকে এ কাজে সিদ্ধ হয়ে থাকে, তবে আমি কেন পারব না? অতএব সারা জগতে অনেকে, নানা আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে, নানা নৈতিক ও সদাচারের মাধ্যমে, এই আশ্চর্য অবস্থায় পৌঁছেছে। নাস্তিক ও অজ্ঞেয়বাদীরাও এ অবস্থায় পৌঁছেছে, কারণ তারা 'ওখানে' অবস্থিত ঈশ্বরে অবিশ্বাস করতে পারে কিন্তু 'এখানে' অবস্থিত আপন অন্তরাত্মাকে অবিশ্বাস করতে পারে না। অতএব, নাস্তিকতা, অজ্ঞেয়বাদ এবং সবরকম ধর্ম বিশ্বাস—সবই এক হয়ে পড়ে, এই বিশেষ পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতিতে আমরা ভয়, ক্রোধ, তৎসহ অসংযত ইন্দ্রিয়াসক্তিকে বশীভূত করতে পারি। প্রত্যেক অভিজ্ঞতাকে শুদ্ধরূপে রূপান্তরিত কর এই *জ্ঞানতপস্যা* বা মানব-মনের শোধন সামর্থ্যের সাহায্যে। তপঃ এই মহান শব্দটির

ব্যাখ্যা—শঙ্করাচার্য যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে—এইভাবে করেছেন : *মনসশ্চ ইন্দ্রিয়াণাম্ চ ঐকাগ্র্যম্ তপঃ উচ্যতে,* 'মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের একাগ্রতাকে *তপস্যা বলে*'। ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকলেও আমি গভীরভাবে আধ্যাত্মিক, গভীরভাবে নৈতিক ও গভীরভাবে মানবিক হতে পারি। অজ্ঞেয়বাদীদের মধ্যে বহু উন্নত চরিত্রের লোক আছে। আমরা বৈদান্তিক চিন্তাধারার দিক থেকে অজ্ঞেয়বাদ বা নাস্তিকতার নিন্দা করি না। সাধারণ ধর্ম এই সব লোকেদের ভয় করতে পারে, কিন্তু বেদান্ত তা করে না। *বিবেকচূড়ামণির* একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শ্লোকে বোঝান আছে বেদান্তের এই উদার দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে এসেছিল (শ্লোক ৫৭৩) :

> অস্তীতি প্রত্যয়ো যশ্চ যশ্চ নাস্তীতি বস্তুনি;
> বুদ্ধেরেব বিকারেতৌ[১] ন তু নিত্যস্য বস্তুনঃ।

—'আস্তিক ব্যক্তির চরম সত্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস, আর নাস্তিকের চরম সত্যে অবিশ্বাস, এ দুইই মনের বিকার, এতে নিত্য সত্যের (আত্মবস্তুর) কোন রকম বিকার হয় না।'

বেদান্ত সকলকেই স্বাগত জানায়; তুমি একটি মানব সত্তা, তোমার মধ্যে একটি মহান কেন্দ্রবিন্দু আছে—যদিও তুমি তা নাও জানতে পার। কিন্তু কেন্দ্রবিন্দুটি ওখানে আছে। তারই বিকাশ হেতু তুমি নৈতিক, দয়ালু ও করুণাপ্রবণ হও, তোমার অন্তরে যে ঈশ্বর রয়েছেন, তুমি তাঁরই বিকাশ ঘটাচ্ছ। বিবেকানন্দ পূর্বে ধর্মের যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তা এই ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ : 'ধর্ম হচ্ছে, মানুষের ভেতর যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ'। যখন আমার অহঙ্কারের প্রকাশ ঘটে, তখন আমি মানুষকে দূরে সরিয়ে দিই; কিন্তু যখন আত্মার সামান্য বিকাশও ঘটে তখন আমি মানুষকে আকর্ষণ করি। এই হলো ব্রহ্মত্বের ধর্ম-বিজ্ঞানরূপে, মানব-সম্ভাবনা-বিজ্ঞান রূপে বিকাশের অর্থ। অন্তরের ব্রহ্মত্বের সামান্য বিকাশ ঘটিয়েছে এমন প্রতিটি মানুষই, এক একটি সুন্দর ব্যক্তি হয়ে ওঠেন, অন্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক সুখের হয়। তাই, এইটি হলো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা প্রত্যেক মানুষের মনে রাখা ও কাজে পরিণত করা দরকার।

এই শ্লোকটি কেবল গীতাতেই যে আছে তা নয়, পরন্তু শঙ্করাচার্যের গুরুর গুরু গৌড়পাদ রচিত *মাণ্ডূক্য উপনিষদ্ কারিকাতেও* আছে; আনুমানিক

---

১ 'গুণাবেতৌ' ইতি পাঠান্তরঃ।

সপ্তম (?) শতাব্দীতে নর্মদার তীরে ছিল তাঁর বসবাস। ওখানে বিষয়টি একটু অন্যরকম, ওখানকার আলোচনার বিষয় হলো সমাধির ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থার অভিজ্ঞতা, যা জাগতিক সম্পর্কের পারে, নাম-রূপ জগতের পারের অবস্থা, যেখানে মন উত্থিত হয়ে উপলব্ধি করে সেই অনন্ত নিরপেক্ষ সত্তাকে। কীভাবে তা ঘটে? তারই বর্ণনা দিয়ে ঐ শ্লোকে বলা হয়েছে (২.৩৫) ঃ

বীতরাগ-ভয়-ক্রোধৈঃ মুনিভিঃ বেদপারগৈঃ।
নির্বিকল্পো হ্যয়ং দৃষ্টঃ প্রপঞ্চোপশমোঽদ্বয়ঃ ॥

—'আসক্তি-ভয়-ক্রোধ শূন্য বেদ-পারগামী বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ মুনি বা ঋষিগণ এই অদ্বৈত *নির্বিকল্প* বা মনোহীন অবস্থাকে উপলব্ধি করেছিলেন—যেখানে এই নিত্য পরিবর্তনশীল আপেক্ষিক বিশ্বের অস্তিত্ব থাকে না।'

অদ্বৈত স্তরের অনুভূতি থেকে এই শ্লোকের বক্তব্য *গীতোক্ত শ্লোকের* রাগ-ভয়-ক্রোধের পারে যাওয়ার অনুরূপ। যাঁরা *মুনি*, চিন্তাশীল ব্যক্তি; *মননশীলো মুনিঃ*, শঙ্করাচার্য এই ভাবেই মুনির সংজ্ঞা দিয়েছেন। সাধারণত *মুনি* বলতে বুঝি যিনি মৌন থাকেন; *মৌনম্* মানে নিঃশব্দতা; কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ নির্বাক নয়, এর অর্থ মনের প্রচণ্ড সংযম, চিন্তাতেও সংযম অর্থাৎ মানুষটি মননশীল। এই রকম মানুষকে *মুনি* আখ্যা দেওয়া হয়; তিনি যে কথাই বলুন, তার পেছনে প্রচুর চিন্তা থাকে, কেবল বাক্য বাগীশ নয়। *মুনি* হঠাৎ বোকার মতো কিছু বলে ফেলেন না। তিনি যা বলেন তার গুরুত্ব থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের কথাবার্তার কোন গুরুত্ব থাকে না। অথচ মুনি যখন কথা বলেন, তাতে একটা গুরুত্ব থাকে, তাঁর সামান্য কথাই তোমার কাছে প্রচুর অর্থ বহন করে আনার পক্ষে যথেষ্ট। সেই রকম—যিনি '*কম কথা আর বেশি চিন্তা'র* লোক, তিনিই *মুনি*। এই রকম *মুনি রাগ ভয় ক্রোধকে বশীভূত করেন*। অধিকন্তু তাঁরা আর একটি ব্যাপারে সাফল্য লাভ করেছেন ঃ *বেদপারগৈঃ*, 'তাঁরা বেদের পারে গেছেন'। *ভারতের সনাতন ধর্ম ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মশাস্ত্রে এ রকম অভিব্যক্তি দেখা যায় না—যে একজন ভক্ত বেদ-শাস্ত্র বা অন্য কোন ধর্ম-শাস্ত্রের পারে চলে যাচ্ছেন*। বেদের পারে, কোরাণের পারে, বাইবেলের পারে চলে যাওয়ার অর্থ হলো; কেবল বিশ্বাস করেই সন্তুষ্ট থেকো না, নিজে সত্যকে উপলব্ধি কর। কথাতেই সত্য নিহিত থাকে না, সত্য লাভ হয় কেবল ভূয়োদর্শনের মাধ্যমে। তাই, এই রকম লোক, যাঁরা অধ্যাত্ম জীবনে পরীক্ষা শুরু করেন ও চরম অবস্থার অভিজ্ঞতা লাভ করতে চান, তাঁরা বেদের পারে

যান। তাঁরা এই সব পবিত্র গ্রন্থরাজির পারে যান। কী সুন্দর বৈপ্লবিক ভাব! সমগ্র ভারতের ইতিহাসে, আমরা *সব সময়েই,* এই বিষয়টির ওপর জোর দিয়েছি। মরমী সাধক তিনি, যিনি সত্য উপলব্ধি করে এই সব পবিত্র গ্রন্থরাজির পারে যান। আধ্যাত্মিক জীবনের কিছু কিছু অংশ আয়ত্ত করতে তোমার আমার পক্ষে ভূরি ভূরি গ্রন্থের প্রয়োজন, কিন্তু এই লোকগুলি ঐ *জীবন যাপন* করেছেন, ঐ জীবনের *অভিজ্ঞতা লাভ* করেছেন। বেদেরই একটি অনুচ্ছেদে—*বৃহদারণ্যক উপনিষদে* যথার্থই বলা হয়েছে যে যিনি ব্রহ্মকে, চরম সত্যকে জেনেছেন, তাঁর কাছে বেদ অর্থহীন : *বেদো অবেদো ভবতি,* 'বেদ অবেদ হয়ে যায়।' কি স্পষ্টভাষা লক্ষ্য করুন : *বেদো অবেদো ভবতি।* শঙ্করাচার্য আবার এর ভাষ্যের এক অংশে বলেছেন, 'যেমন সেবক তোমার সামনে আলো ধরে তোমাকে পথ দেখায়, আর তুমি পথ পেয়ে যাও, তেমনিই হয় বেদ ঐ লোকের কাছে।' বেদ কী বস্তু? সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের উক্তি। এখানে ইনি সত্যকে জেনেছেন, তিনি আর কেন বেদের ওপর নির্ভর করবেন? প্রত্যক্ষ অনুভূতি তাকে শাস্ত্র-গ্রন্থের পারে নিয়ে যায়। একটি স্তরে গ্রন্থগুলি বিরক্তির কারণ হয়। উপনিষদেই বলা হয়েছে : *বাচো বিগ্‌লাপনম্‌ হি তৎ* 'এই সব মনের পক্ষে, বাক্য বিক্ষেপকারী মাত্র।'

তাই দেখা যায়, ভারতের ধর্ম-শাস্ত্রে এমন বহু অংশ আছে, যেখানে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে মানুষ সাধনার গোড়ায় গ্রন্থের সাহায্য নিতে পারে, কিন্তু পরে, সেগুলিকে সরিয়ে দিয়ে সত্য উপলব্ধি করতে তাকে সচেষ্ট হতে হবে—সেই কথাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই বলি, প্রকৃত ধর্মে জোর দেওয়া হয়—উপলব্ধির ওপর, অধ্যয়নের ওপর নয়, পাণ্ডিত্যের ওপর নয়, 'হওয়া ও হয়ে ওঠা'র ওপরে—বিবেকানন্দ যেমন বলেছিলেন'—শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর একটি কল্পকাহিনীতে বলেছেন, 'বড় বড় পণ্ডিতের শুধু পাণ্ডিত্যে কী হবে, যদি বিবেক বৈরাগ্য না থাকে, যদি ঈশ্বরচিন্তা না থাকে? তবে সে তো শকুনির মতো; শকুনি উঁচু আকাশে ওড়ে, কিন্তু তার নজর থাকে নিচে, পৃথিবীর মাটিতে, ভাগাড়ের দিকে।' পাণ্ডিত্যে বড়, আর মনে ছোট। তার কী মূল্য? উন্নত মন গড়তে থাক। সেটাই বেশি দরকার। তাই, *মুনিভিঃ বেদপারগৈঃ,* 'মননশীল ব্যক্তিগণ যারা বেদের পারে গেছেন'। আগেই দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, 'বেদ তিন *গুণের* কথা বলে থাকে, তুমি তিন *গুণের* পারে যাও, হে অর্জুন,' *ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।* অতএব, এইভাবে গৌড়পাদ বলেছেন, অনেকে আসক্তি, ভয় ও ক্রোধকে বশীভূত করে, অত্যন্ত মননশীল হয়েছে এবং পরে বেদের পারে গেছে। *বহবো,* 'এরকম অনেকে', *জ্ঞান তপসা*

পূতা, 'জ্ঞানের তপস্যার দ্বারা শুদ্ধ হয়ে'; একথাগুলি আমরা গীতাতেও পেয়েছি। কিন্তু এখানে, *মাণ্ডুক্য কারিকায়* এটি এইভাবে আছে, *বীত-রাগ-ভয়-ক্রোধৈঃ মুনিভিঃ বেদপারগৈঃ নির্বিকল্পো হ্যয়ং দৃষ্টঃ,* 'এই নির্বিকল্প অবস্থা উপলব্ধি করা হয়েছে'। *বিকল্প* মানে মনের বিকার; *নির্বিকল্প* মানে মানসিক বিকারহীন, চরম স্তব্ধতা। তরঙ্গায়িত সমুদ্র একটি অবস্থা, সমস্ত তরঙ্গ স্তিমিত হয়ে গেছে ও সমুদ্র একেবারে স্থির। এ হলো আর এক অবস্থা। অতএব, *নির্বিকল্পো হি অয়ম্,* 'এই *নির্বিকল্প* অবস্থা' এতই নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে— 'এই নির্বিকল্প অবস্থা এইরূপ লোকে উপলব্ধি করেছে।' সে অবস্থার স্বরূপ কী? *প্রপঞ্চোপশমো,* 'যে অবস্থায় এই জাগতিক দ্বৈতভাব, এই পরিবর্তনশীল জগৎ, এই পারস্পরিক সম্বন্ধ বিশিষ্ট জগৎ, একেবারে লয় পায়'। একবার কল্পনা কর, কী সুন্দর বিবৃতি এটি! আমি কেন দ্বৈতভাব দেখি? পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এই দ্বৈতভাব আমরা পাই। আমি যদি সত্যকে আপন স্বরূপে দেখতে পেতাম, তবে একেবারে অন্যরকম হতো। তখন আমাদের চোখে সর্বভূত ব্রহ্মস্বরূপ, শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ বোধ হতো। তাই, *নির্বিকল্পো হ্যয়ম্ দৃষ্টঃ প্রপঞ্চোপশমো,* 'সমগ্র *প্রপঞ্চ* বা প্রকাশিত জগৎ সেই চরম সত্যে একেবারে লয় প্রাপ্ত হয়। সব কিছুই হয় ব্রহ্ম'।

এলবার্ট আইনস্টাইনকে যখন পদার্থ বিদ্যায় সত্যের চরম ধারণাটির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি বলেন, পদার্থ বিদ্যায় বর্তমানে দুটি সত্য রয়েছে ঃ একটি হলো ভূত বস্তু, অপরটি হলো ক্ষেত্র। তিনি বলেন, দু-টিই সত্য হতে পারে না, কেবল ক্ষেত্রই সত্য। তাকেই ক্ষেত্র বলি, যাতে ভূতবস্তু বুদ্বুদ স্বরূপ। সমগ্র বিশ্ব যেন কয়েকটি বুদ্বুদ, এই পর্যন্তই। সেই অনন্ত তেজক্ষেত্র, তাই হলো ভৌত সত্য। *সেই জ্ঞান, যার সবটাই বুদ্ধিজাত জ্ঞান, তাই আবার পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানে পর্যবসিত হয় এইরকম তপস্যার মাধ্যমে, যাকে বেদান্ত 'নির্বিকল্পো হি অয়ম্ দৃষ্টঃ প্রপঞ্চোপশমো'* বলে বর্ণনা করে। কেবল তাই নয়, সেটি আবার *অদ্বয়ঃ,* যাতে দ্বৈতভাব নেই। এই চরম সত্যে বহুত্ব নেই; সেখানে দ্বৈতভাব নেই। এক অনন্ত চৈতন্যই সেখানে বর্তমান, যাতে সমগ্র দৃশ্যমান বিশ্ব তার সমস্ত বৈচিত্র্য নিয়ে প্রতীয়মান হয়, আমরা এখন এই বৈচিত্র্য দেখছি আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে, আর যখন সত্য উপলব্ধি করব, বৈচিত্র্য দূর হয়ে যাবে। কেবল একটি আত্মাই বিদ্যমান থাকবে সবের ভিতর। তাই হলো শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি।

উপনিষদে এই ভাবটির পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়। এখানে *বৃহদারণ্যক*

উপনিষদের একটি বিস্ময়োদ্দীপক অনুচ্ছেদে সৃষ্টিকে ব্রহ্মের, চরম সত্যের, স্বীয় অভিক্ষেপ বা বিক্ষেপ বলে বর্ণনা করেছেন (২.১.২০) ঃ

> *স যথা উর্ণনাভিঃ তন্তুনা উচ্চরেৎ,*
> *যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি;*
> *এবম্ এব অস্মাদ্ আত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ*
> *সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি;*
> *তস্যোপনিষৎ সত্যস্য সত্যম্ ইতি;*
> *প্রাণা বৈ সত্যম্, তেষাম্ এষ সত্যম্—*

—'যেমন মাকড়শা (নিজ শরীর থেকে তৈরি করা) জালের ওপরই ঘুরে বেড়ায়, যেমন প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ ছিটকে বেরিয়ে যায়, ঠিক তেমনিভাবে এই আত্মা থেকে বেরিয়ে আসে সব রকম (ভৌত, জৈব ও মনঃশারীরিক) তেজ (প্রাণাঃ) জগৎসমূহ, দেবগণ ও জীব সকল।

'এর নিগূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ নাম (উপনিষদ্) হলো, *সত্যের সত্য*। বাস্তবিকই তেজ (প্রাণ)-ই হলো সত্য; এই আত্মাই হলো ঐ সব তেজের (প্রাণের) সত্যতা।'

মুণ্ডক উপনিষদে, যা *গীতা* পাঠ আরম্ভ করার পূর্বে ধারাবাহিক ভাবে আলোচিত হয়েছে, আমরা একটি শ্লোকে পড়েছি *ব্রহ্মৈবেদম্ অমৃতম্*, 'এই সমগ্র বিশ্ব মৃত্যুহীন ব্রহ্মই বটে।' *ইদম্* হলো '*এই প্রকটিত বিশ্বকে* বুঝায় এমন একটি পারিভাষিক শব্দ'। এটি হলো 'মৃত্যুহীন ব্রহ্ম', *ব্রহ্মৈবেদম্ অমৃতম্*। এর পর আরো বোঝানো হয়েছে একই *শ্লোকে* ঃ *পুরস্তাৎ ব্রহ্ম*, 'ব্রহ্ম পুরোভাগে (আগে) রয়েছেন'; *পশ্চাৎ ব্রহ্ম*, 'ব্রহ্ম পশ্চাৎভাগে (পেছনে) রয়েছেন'; *দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ*, 'দক্ষিণে, আবার উত্তরেও'; *ব্রহ্মৈবেদম্ বিশ্বমিদম্ বরিষ্ঠম্*, 'সমগ্র প্রকটিত বিশ্বই সেই পূজনীয় ব্রহ্ম'। এই হলো আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সর্বোচ্চ শিখর, যেখানে সব রকম দ্বৈতভাব অতিক্রান্ত হয়েছে, শুদ্ধ চৈতন্যের নিরপেক্ষ (কোনরূপ সম্পর্কবিহীন) অদ্বৈতভাব অনুভূত হচ্ছে।

অতএব, *মাণ্ডুক্যকারিকা* একই জিনিস বলছেন, যা গীতায় অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা হয়েছে, তা হলো বস্তুটি এমনই *যা অনেকে উপলব্ধি করেছে* এবং অনেকে উপলব্ধি করতে *পারে*, কারণ এর জন্য প্রয়োজনীয় জৈব সামর্থ্য আমাদের আছে। দরকার কেবল ঐ দিকে ফেরা। আমাদের শিখতে হবে কীভাবে ইন্দ্রিয়জ আরাম ও সুখে সন্তুষ্ট না থেকে এই মনঃ-শারীরিক তেজতন্ত্রকে সংযত করে

একে চরম সত্যের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়, অধিকাংশ লোক দেহ-মন সংঘাতকে কেবল আরাম ও সুখের জন্য ব্যবহার করে। বর্তমানে আমাদের সভ্যতায় তা চরমে উঠেছে। তাই আমরা একে ভোগবাদী সভ্যতা বলে থাকি। আমরা কেবল চাই ভোগ্যপণ্য—দেহতন্ত্রকে প্রয়োজনাতিরিক্ত আরামে রাখতে। আর অতি দক্ষ কারিগরী বিদ্যা আমাদের ইন্দ্রিয়জ ক্ষুধাকে আরও বেশি উদ্রিক্ত করে তুলছে। আমরা ইন্দ্রিয়স্তরেই আটকে গেছি। কিন্তু এই সঙ্গেই মানব সত্তা এই অবস্থাকে বিরক্তিকর বলে অনুভব করতে আরম্ভ করবে, কারণ এর সাহায্যে আমরা আমাদের অন্তরস্থ সর্বোত্তমকে প্রকাশ করতে পারি না; কিছু যেন হারিয়ে গেছে মনে হয়, তা বোঝার চেষ্টা করতে হবে। একটা সময় আসবে যখন প্রত্যেক মানব সত্তাই জানতে চাইবে ঃ এরপর কী? আমার অর্থ আছে, ক্ষমতা আছে, সুখ আছে—কিন্তু কিছু যেন হারিয়ে যাচ্ছে। সেই উচ্চতর কিছুর ক্ষুধা, যা ঠিক স্পষ্ট নয়—তবু তা এক প্রচণ্ড অনুভূতি। সেই ক্ষুধা থেকেই আসে এই বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা—সেই অসীম ও অবিনশ্বরের অনুসন্ধান। বর্তমানে উন্নত জাতির মধ্যে কিছু লোক এই ক্ষুধা অনুভব করছে, যে ক্ষুধার কথা শঙ্করাচার্য তাঁর প্রসিদ্ধ *ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্?* স্তোত্রের শেষ ছত্রে প্রকাশ করেছেন। তোমার স্বাস্থ্য আছে, তোমার অর্থ আছে, তোমার ক্ষমতা আছে, তোমার সুখ আছে, তবু তোমার মনে প্রশ্ন থাকবে, এরপর কী? এরপর কী? এরপর কী? এরপর কী? প্রথম প্রথম একে থামিয়ে দিতে পারি, কিন্তু কোন সময়ে এ খুব জেদ ধরতে পারে। তখন তুমি প্রশ্নটির ওপর গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে শুরু কর। মনে হবে, কিছু যে হারিয়ে গেছে, সেই কিছুকে খোঁজা যাক।

আর তাই, এই আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা একটি বাস্তব ঘটনা। অনেকে এ প্রচেষ্টা করে দেখেছে; সেই আধ্যাত্মিক পথে অনেকেই পদসঞ্চার করেছে ঃ তীর্থযাত্রার পথের মতো। তুমি এ পথ দিয়ে চলতে পার, এই জীবনেই, ভবিষ্যৎ জীবনে নয়—বলা হয়েছে বেদান্তে। যখন তোমার বয়স কম, শরীরে যথেষ্ট শক্তি রয়েছে, তোমার ভেতর এই শোধনাগার গড়ে তোল, তা হলে তোমার জীবন সত্যই আরো বেশি সমৃদ্ধ হবে। তাই এ সাধনার পথ কম বয়সী সকলের পক্ষে ধীরে সুস্থে গ্রহণযোগ্য। ১৬ বছর বয়স থেকেই অন্য সব কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে এই সাধনার দিকে আরো বেশি গুরুত্ব দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। দৈনন্দিন কাজ চলতে থাকবে, অর্থ রোজগার চলবে, পরস্পর মানবিক সম্পর্কও বজায় থাকবে, কিন্তু মন অনুভব করতে থাকবে এক নতুন অস্থিরতা—এই অস্থিরতাকে

অনুসরণ করলে, মনটি লোকব্যবহারের পক্ষে একটি আরো ভাল হাতিয়ার হয়ে উঠবে। বর্তমান সভ্যতা এই পদ্ধতিটিই ভুলে গেছে; আর বেদান্ত সর্বকালে মানবজাতির কাছে এই পথকেই চলার পথ বলে ঘোষণা করছে। দৈহিক সুখকেই মানুষের চরম লক্ষ্য মনে করা উচিত নয়। এ তো কেবল শুরু; শিশু দেহের সুখ পেতে পারে। কারণ, আরাম ও দৈহিক সুখ ছাড়া শিশু আর কী চাইতে পারে? মাতৃদেহের মধ্যে থেকে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা এবং মা যে স্তন্যটুকু তাকে দেন; এইগুলিই শিশু চায়, আর কিছু নয়। এটা হলো প্রথম স্তর। দুই থেকে আড়াই বছর বয়স হলে শিশু চায়—জানতে। মা যদি তাকে আবার ঐ দুধই দিতে চান, সে বলে, 'না, আমি এটা চাই না, আমি আরো ভাল কিছু চাই', মনের খাদ্য ঃ সে জ্ঞান চায়। এই হলো সৃজনশীল, বদ্ধ নয় এমন, মানবীয় ক্রমবিকাশের সূত্র। আমরা যখন মানবীয় ক্রমবিকাশের ঐ সূত্র ধরে চলি—উচ্চতর জ্ঞানের দিকে—তবেই শেষ পর্যায়ে দেখব যে আমরা আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের লোকে, ব্রহ্মলোকে, পৌঁছে গেছি। এখানেই জ্ঞান পরিপক্ক হয়ে প্রজ্ঞায় পর্যবসিত হয়। এই সাধনাই বর্তমানে করতে হবে, তবেই সমস্ত রকম জ্ঞান-আহরণ প্রচেষ্টা অর্থবহ হবে। বর্তমানে এর অর্থবহতা কেবল দেহ স্তরেই মানুষকে আরো স্ফীত করছে। তোমার সংগৃহীত জ্ঞান তোমাকে আরো বিত্ত আরো সুখ, আরো আরাম যোগাচ্ছে, এই পর্যন্ত। এতে কি তুমি ব্যক্তি হিসাবে আরো ভাল হতে পেরেছ? মোটেই না। অল্প কিছু ক্ষেত্র ছাড়া বেশি তথ্যজ্ঞান, বেশি টাকা হলে মানুষ আরো বদ, আরো হীন-মন্য হয়। তাই, আমাদের প্রাচীন আচার্যেরা বলেছেন ঃ 'এগিয়ে চল! আধ্যাত্মিক তেজ অর্জন কর। তাই হলো তোমার ক্রমবিকাশের পথ ও লক্ষ্য।' বর্তমান যুগে, স্বামী বিবেকানন্দ উদাত্ত কণ্ঠে এই উপনিষদীয় ভাষায় ডাক দিয়েছেন, 'ওঠো, জাগো, লক্ষ্যে না পৌঁছে থেম না।'

প্রকৃতি আমাদের এই মস্তিষ্কতন্ত্র দিয়েছেন। এর সামর্থ্যও প্রচুর, বিচার করতে, লক্ষ্য স্থির করতে ও সেই দিকে অগ্রসর হতে। কোন পশুর সে সামর্থ্য নেই, পশুর সামর্থ্য কেবল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনে, সন্তান উৎপাদনে, আর লড়াই করে বেঁচে থাকায়। মানুষেরই কেবল সামর্থ্য আছে জ্ঞান অর্জনের ঃ ভৌত জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান। আমাদের পক্ষে দুই-ই জ্ঞান, তাই মানবজাতি যেন সেই পথটি ধরে, এই পথটি নয়—যে পথ আমরা এতকাল পশুহিসেবে অতিক্রম করে এসেছি। ঐ ভাব বার বার এসেছে *মহাভারতে* ও আমাদের অন্যান্য গ্রন্থে। স্বামী বিবেকানন্দ ইংলন্ডে ও আমেরিকায় তাঁর বক্তৃতায় প্রশ্ন

তুলেছিলেন—'কোন মানুষ শুয়োরের থেকেও বেশি তৃপ্তি করে কি আহার গ্রহণ করে?' 'একটা শুয়োরের জীবন শরীর সর্বস্ব। তার খাওয়ায় তৃপ্তি তোমার আমার চেয়ে অনেক বেশি। ইন্দ্রিয় জগতে আমাদের অভিজ্ঞতা বাধাপ্রাপ্ত হয় আমাদের জানার, ভাবার ও বিচার করার সামর্থ্যের জন্য। তাই ইন্দ্রিয়জ সুখ পশু যতটা উপভোগ করে, মানুষ তা পারে না। পশুশরীর অধিকমাত্রায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগের জন্য তৈরি। মনুষ্যশরীরও ঐ স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করতে পারে, কিন্তু সেটাই তার জীবনের লক্ষ্য নয়; তাকে এই সুখভোগের ওপরে উঠতে হবে। এই শিক্ষাই দিয়েছেন, আমাদের অধ্যাত্ম মার্গের আচার্যগণ। মানব সত্তার ক্ষেত্রে উচ্চতর বস্তুর অন্বেষণের ওপর বার বার জোর দেওয়া হয়। এই হলো মানবিক ক্রমবিকাশের পথ; অন্যথায় শরীর স্তরেই অর্থাৎ চরম বদ্ধ দশায় পড়ে থাকতে হবে। এই মানব সত্তা মস্তিষ্কতন্ত্র নামক অসাধারণ যন্ত্রটির অধিকারী হয়েও বদ্ধ হয়ে আছে ইন্দ্রিয়স্তরে, সাংসারিক স্তরে; কী বিয়োগান্তই না ব্যাপারটা! বেদান্ত এই কথাই বলে থাকে। এই ধরনের লোককে *সংসারী* বা ইন্দ্রিয়স্তরে আবদ্ধ বলা হয়। সংসারে বাস করলেই *সংসারী* হয় না; পরন্তু, ইন্দ্রিয়স্তরে বদ্ধ থাকলেই সংসারী হয়; সমগ্র সভ্যতাই *সংসারীর* মতো বদ্ধ হয়ে থাকতে পারে।

তাই, এ বিষয়ে যখন আমরা চিন্তা-ভাবনা শুরু করি তখনই আমাদের নজর পড়ে দেহের ওপরে স্থাপিত প্রকৃতি প্রদত্ত মস্তিষ্ক তন্ত্রটির দিকে। প্রকৃতি এটিকে পাছার কাছে বা অন্য কোথাও বসাতে পারতেন। বস্তুত, বর্তমান স্নায়ুতত্ত্ব বলে কোন এক বৃহৎ শরীরধারী স্তন্যপায়ী জীবের সংযোগ রক্ষাকারী একটি মস্তিষ্ক পাছার কাছে স্থাপিত ছিল, ব্রিটিশ স্নায়ুতত্ত্ববিদ গ্রে ওয়ালটার কৌতুকচ্ছলে বলেছেন, 'ঐ স্তন্যপায়ী জীব তথ্যজ্ঞানের পূর্বে ও পরে বিচার করতে পারত।' পরবর্তী কালে প্রকৃতিই তার দ্বিতীয় মস্তিষ্কটির বিলোপ সাধন করেন, আর শিখর দেশের মস্তিষ্কটি ধীরে ধীরে উন্নত হয়ে উঠে। যারা ঐ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যন্ত্রটির সঠিক ব্যবহার রপ্ত করেছিল তাদের কাছে সেটি মানবিক ক্রমবিকাশের এক হাতিয়ারস্বরূপ হয়ে উঠল। শারীরবৃত্ত (Physiology) অনুযায়ী, আত্মসংরক্ষণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন শরীরের সবরকম সাধারণ কাজগুলি নিম্ন মস্তিষ্কের দ্বারাই হয়ে থাকে, পশুর সঙ্গে আমরাও এটির সমান অংশীদার। কেবল উর্ধ্ব-মস্তিষ্কের কাজ অন্য রকম ঃ কীভাবে চিন্তা করে, কীভাবে দূরদৃষ্টি ও সম্মুখ দৃষ্টির বিস্তার ঘটান যায়, কীভাবে এই জীবনকে উচ্চতর স্তরগুলিতে উন্নীত করে নিয়ে যাওয়া যায়? জীবের অর্জন করা প্রয়োজন কেবল তথ্যজ্ঞান

নয়, অন্তর্দৃষ্টি ও অন্তরে অনুপ্রবেশের সামর্থ্যও। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে ইংলণ্ডের জেরাল্ডিন কস্টার অন্তর্দৃষ্টি কথাটির সংজ্ঞা দিয়েছেন (*Yoga and Western Psychology*, p. 92) :

'এর সংজ্ঞা হলো, জীবের সেই সামর্থ্য, যা দিয়ে সে বহুতর বৈচিত্র্যকে জাগিয়ে তুলতে ও যে কোন একটি ভাব বা আবেগের সঙ্গে বহুতর বিষয়কে সম্পর্কিত করতে পারে এবং যা ঐ সামর্থ্যের ভাগ্যবান অধিকারীকে কোন পরিস্থিতির সঙ্গে, ''মৌলিকতা''র সঙ্গে বোঝাপড়া করতে সাহায্য করে।'

অবশ্য, যদি আমরা এই মস্তিষ্কতন্ত্রকে ইন্দ্রিয়তন্ত্রের গোলামে পরিণত করি, তবে কী বিয়োগান্ত নাটকেরই না অভিনয় হবে! মস্তিষ্কের ব্যবহার শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য নয় শুধুমাত্র একটু সুখলাভের জন্য নয়! দুর্ভাগ্যের বিষয়, লোকে যত বেশি শিক্ষিত হয়, ততই সে তার মস্তিষ্ককে ঐ কাজেই ব্যবহার করে, জীবনকে উচ্চতর স্তরে তোলার জন্য নয়। বেদান্তের দৃষ্টিতে, বর্তমান যুগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে এটি একটি দুঃখান্ত নাটকস্বরূপ। মানবের উন্নয়নের কাজে যন্ত্ররূপে এই উচ্চমস্তিষ্ক (ধীশক্তি) ব্যবহৃত হোক এই ছিল প্রকৃতির অভিপ্রায়। এই সম্পর্কে আমি এক স্নায়ু বিজ্ঞানীর কথার উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

তিনি হলেন গ্রে ওয়ালটার, যাঁর কথা আমি আগেই বলেছি এবং তাঁর বই, *The Living Brain*-এ তিনি বলেছিলেন, জীবের ক্রমবিকাশতত্ত্ব জীবের বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে জীবদেহে স্বয়ংক্রিয় তাপ-নিয়ন্ত্রণের মতো নানা ক্ষমতার বিকাশকে নিশ্চায়িত করে; যখন সেই ক্রমবিকাশ মানবশরীর স্তর পর্যন্ত উন্নত হয়, তখন তাতে আরো নতুন ক্ষমতা যুক্ত হয়। এখন এসবের অর্থ কী? মানব শরীর উত্তরাধিকার সূত্রে স্বয়ংক্রিয় তাপ-নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রটি পেয়েছে। স্তন্যপায়ী জীবের শেষের স্তরেই এ ধরনের ক্ষমতা অর্জিত হতে দেখা গেছে। প্রাথমিক প্রজন্মের স্তন্যপায়ী জীবের শরীরে এ ধরনের স্বয়ংক্রিয় তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু প্রকৃতি দেখল তারা টিকে থাকতে পারল না; ঐ প্রজাতির টিকে থাকার ব্যাপারে সাহায্য করতেই প্রকৃতি মানব শরীর সমেত পরবর্তী সমস্ত স্তরের স্তন্যপায়ী জীব-দেহের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় তাপ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটালে, মানব শরীরও স্তন্যপায়ী জীবের অন্তর্গত বলে বিবেচিত হয়।

এই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ক্রমবিকাশীয় তাৎপর্য সম্বন্ধে বিবেচনা করতে গিয়ে, ব্রিটিশ স্নায়ু বিজ্ঞানী গ্রে ওয়ালটার বলেছেন (The Living Brain. p. 16) :

'অন্তর্নিহিত স্বয়ংক্রিয় তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা Thermostasis-এর সংগ্রহ, স্নায়বিক ইতিহাসে তথা সমগ্র প্রাকৃতিক ইতিহাসের একটি চরম ঘটনা। এর ফলেই পৃথিবী ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও স্তন্যপায়ী জীবের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব হয়েছে। ক্রম-বিকাশের জন্য এই ছিল ঐটির সাধারণ গুরুত্ব। এর বিশেষ গুরুত্ব হলো, এর দ্বারা সম্পূর্ণ হয়েছে মস্তিষ্কের একটি অংশে জীবন্ত প্রাণীর প্রাণ ক্রিয়ার স্বয়ংক্রিয় স্থিতিকরণ ব্যবস্থা, ইংরাজিতে এক কথায়, যার নাম দেওয়া হয়েছে, homoeostasis অর্থাৎ দেহমধ্যে স্থিতিসাম্য সংরক্ষণ। *এই ব্যবস্থার ফলে, মস্তিষ্কের অন্য অংশগুলিকে ছেড়ে রাখা হয়েছে, প্রাণযন্ত্র বা ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত নয় এবং Homoeostasis-এর নিজস্ব বিস্ময়কে ছাড়িয়ে যায় এমন সব কাজের জন্য।'* (বাঁকা অক্ষরগুলি মূল গ্রন্থকার, গ্রে ওয়ালটারের নয়, উদ্ধৃতিকারের।)

এবং জৈব ক্রমবিকাশের এই ভৌত স্বয়ংক্রিয় স্থিতিকরণ তন্ত্রকে (homoeostasis) যোগের মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্থিতিকরণের (homoeo-stasis-এর) সঙ্গে সম্পর্কিত করে গ্রে ওয়ালটার উপসংহার করেছেন (p. 19) ঃ

'যেমন যেমন নতুন দিগন্তগুলি খুলছে, আমরা আবার একবার পুরাতন বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি। মস্তিষ্কে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক শান্তভাব এনে দেয় যে Homoeostasis, তার অভিজ্ঞতা দু-তিন হাজার বছর ধরে জানা ছিল নানা অভিধায়। এ হলো নানা ধরনের পূর্ণ নৈতিক বিশুদ্ধতা অর্জনের সম্ভাবনায় আস্থাবানদের বিশ্বাসের শারীরবৃত্তীয় (physiological) দিক; যে বিশ্বাসের মধ্যে পড়ে—যোগীর নির্বাণ বা মুক্তি, বোধাতীত শান্তি, অবজ্ঞাত "অন্তরস্থ সুখ"; *এ এক ধরনের কৃপায় অর্জিত অবস্থা—যেখানে বিশৃঙ্খলতা ও রোগ হলো যান্ত্রিক স্খলন ও ভ্রান্তিমাত্র।'*

তিনি আগেই বলেছেন যে স্তন্যপায়ীদের পক্ষে, homoeostasis-এর প্রয়োজন টিকে থাকার জন্যই মাত্র; কিন্তু মানবের পক্ষে এর প্রয়োজন বন্ধন মুক্তির জন্য।

তাই, *গীতার* এই শ্লোকগুলিতে দেখা যায়, মানবজাতিকে এই সত্য গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে বলা হচ্ছে। মস্তিষ্ককে কেবল নিজে টিকে থাকার লড়াই-এর একটা হাতিয়ার হিসেবে মনে করা ঠিক নয়। এর উদ্দেশ্য হলো আমাদের মুক্তির উচ্চতম স্তরে পৌঁছে দেওয়া, অন্যদেরও মুক্তির উচ্চস্তরে নিয়ে যাওয়া—নিজের ও অপরের আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষ, উন্নয়ন, সফলতা অর্জনের উদ্দেশ্যে।

এই মহাশিক্ষা আমরা শারীরবিজ্ঞান (Physiology)-এর মতো বিষয় থেকেও পেয়ে থাকি; তবু জড়বাদমুখী ভৌতবিজ্ঞান এ সত্য জানে না। উচ্চতর মস্তিষ্ক যদি নিম্নতর মস্তিষ্কের সেবক স্থানীয় হয়ে কাজ করে, তবে তা মানুষের পক্ষে নিকৃষ্টতম কাজ হবে। নিম্নতর মস্তিষ্কের কাজ কেবল টিকে থাকার উদ্দেশ্যে, কোন উচ্চতর উদ্দেশ্যের জন্য নয়। শ্রীকৃষ্ণ আগে *বুদ্ধি-যোগের* কথা উল্লেখ করেছেন ঃ বুদ্ধৌ শরণম্ অন্বিচ্ছ (২/৪৯), '*বুদ্ধির* (সমত্ব বুদ্ধির) আশ্রয় নাও।' *বুদ্ধি* হলো উচ্চতর মস্তিষ্ক, দ্যোতনশীল অঙ্গের সামর্থ্যের প্রতিভূ। নিম্নতর মস্তিষ্কের কোন দীপ্তি (বুদ্ধি) নেই। এর আছে কেবল শক্তি, আর আছে টিকে থাকার উদ্দেশ্যটির জ্ঞান, তার বেশি নয়। কিন্তু দীপ্তিমান, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, সেই অভীষ্টের দিকে তোমাকে নিয়ে যাবার সামর্থ্য-বিশিষ্ট—*বুদ্ধিই* কেবল তা করতে পারে। অতএব বুদ্ধিকে গড়ে তোল, একথাই *গীতায়* বলা হয়েছে। একমাত্র বুদ্ধিই মানুষকে উচ্চতম স্তরে পৌঁছে দিতে পারে; বুদ্ধিতে রয়েছে জ্ঞানগর্ভ যুক্তি ও ইচ্ছাশক্তির সমন্বয়।

আর তাই শ্রীকৃষ্ণ পরে বলবেন (গীঃ ১০.১০), 'যখন আমি কোন লোককে আশীর্বাদ করতে চাই, আমি কেবল তাকে সাহায্য করি, এই *বুদ্ধির* আশ্রয় নিতে; *দদামি বুদ্ধি-যোগম্ তম্*, 'আমি তাদের *বুদ্ধিযোগ* দান করি, *যেন মাম্ উপযান্তি তে*, 'যার দ্বারা তারা নিজেরাই আমার দিকে এগিয়ে আসার পথ খুঁজে নেবে।' ঐ *বুদ্ধি-যোগের* অর্থ হলো উচ্চতর মস্তিষ্ককে নিম্নতর মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করা, তাকে দিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করিয়ে নেওয়া ও অন্তর্নিহিত আত্মার সঙ্গে ইচ্ছামতো সমন্বিত হওয়া। এরই সাহায্যে তুমি উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে উঠতে পারবে। আমি টাকা নিয়ে কী করব? আমি বিলাসব্যসন নিয়ে কী করব? আমায় *বুদ্ধিযোগ* দাও। এই সব জিনিস আমি নিজেই সংগ্রহ করব। তার ফলে সর্বশক্তি আমার আয়ত্তে আসবে। মানবের এই প্রেরণার ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে, শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ লাভ হলো এই *বুদ্ধি-যোগ* লাভ, আর সব থেকে নিকৃষ্ট অভিসম্পাত হলো *বুদ্ধি* হারান এ সব কথা দ্বিতীয় অধ্যায়ে শোনা গেছে, *বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি*, 'যখন *বুদ্ধি* নষ্ট হয়ে যায়, মানুষের বিনাশ ঘটে'। যে মানুষ যখন এক ভীষণ অপরাধে অপরাধী হয় তখন বুঝতে হবে আগেই তার *বুদ্ধিনাশ* ঘটেছিল। তেমনি আমাদের অন্য সবরকম মন্দ কাজের পেছনেও রয়েছে *বুদ্ধিনাশ*। কিন্তু *বুদ্ধি* যদি সজাগ থাকে, 'এ সবের কিছুই ঘটে না। অতএব, *বুদ্ধির* আশ্রয় নাও। তাই সকলের কাছেই *গীতার* উপদেশ হলো, তোমার *বুদ্ধির* উন্মেষ ঘটাও। আর সেটি সম্ভব হয়, যেমন

আগে বলেছি, মনঃ-শরীর-তন্ত্রকে অভিজ্ঞতার শোধনাগাররূপে গড়ে তোলার মাধ্যমে। যখন তুমি অভিজ্ঞতাকে শোধন কর, তখন ঐ সব শক্তিকে একত্রিত করে উচ্চ সৃষ্টি-শক্তিতে রূপায়িত কর, তখন তাই হয়ে ওঠে *বুদ্ধি*-শক্তি। ঐ একই মনঃশক্তি ইন্দ্রিয়স্তরে হতে পারে, মনঃস্তরে হতে পারে, আবার *বুদ্ধিস্তরে* হতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন স্তর রয়েছে—একই শক্তির জন্য। তোমার চোখ, কান প্রভৃতির মাধ্যমে যে কাজই হচ্ছে, তাও মনঃশক্তি—তবে সে কাজ হয় ইন্দ্রিয় স্তরে। অতি নিম্নস্তরে। মনের স্তরে গেলে সেটা একটু উচ্চস্তরের কাজ হয়। তখন তা একটু বেশি সূক্ষ্ম, একটু বেশি ব্যাপক। কিন্তু *বুদ্ধিস্তরে* এলে, সে কাজ হয় শুদ্ধ, স্বচ্ছ, আর তা পরিধি ও সুযোগে হয় ব্যাপক।

আমি মহাত্মা গান্ধীর কথা উল্লেখ করেছি। তাঁর কী বিশেষত্ব ছিল? তিনি তাঁর শরীর মন সংঘাতকে এক উচ্চধরনের শোধনাগারে পরিণত করেছিলেন। তাই, যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর ওপর প্রচুর ঘৃণা বর্ষিত হয়—এমনকি পুলিশে মারছে, তিনি এসবকে তাঁর শোধনাগারে নিয়ে এসে ধীরে ধীরে প্রেম ও করুণায় রূপান্তরিত করেন। তিনি বলেন, ঐ পুলিশটির ওপর কিছু করো না, না জেনে সে এ কাজ করেছে। এখন, গান্ধীজীর এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণ কি? এতে কোন রকম অলৌকিকত্ব নেই। তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন এবং সফলও হয়েছেন; আমরা এ বিষয়ে চেষ্টা পর্যন্ত করি না। আমরা যখন চেষ্টা করব, আমরাও এ বিষয়ে সফল হব। এই শোধনাগারে ঘৃণাকে প্রেমে পরিণত করি না কেন? নিজেকে সে প্রশ্ন কর। এ বিষয়ে যখন চিন্তা করতে শুরু করবে—মনে কর ঐ লোকটি আমাকে ঘৃণা করে, আমি ঐ ঘৃণার বিষয় *চিন্তা* করতে আরম্ভ করি—এমনকি এতেও ঘৃণা কমে আসবে। যখন তুমি কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা করবে, সেটি অন্যরকম হয়ে যায়। চিন্তা না করলে, ঐটিই তোমার ওপর প্রভুত্ব করবে। তুমি ওর দাস হয়ে পড়বে। অতএব, মানবীয় শোধনাগার বলতে *জ্ঞান তপস্যাই* বোঝায়, মনকে *জ্ঞানের তপস্যায়* রূপায়িত করা। এগুলি সবই অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে করে দেখার মতো প্রস্তাব। অনেকে এ কাজ করেছে, আমি কেন পারব না? আমি বুঝি যে, অনেকে এসব জানে না। কিন্তু তারা আজই জেনে নিতে পারে, *গীতার* মতো বই তো রয়েছে। জানার পর, আমাদের তা অভ্যাসে পরিণত করতে হবে, এবং বলতে হবে, 'হাঁ, এর অর্থ চরিত্র গঠন করা। আমি যেটুকু জ্ঞান অর্জন করি, তা তো জীবনে, অভিজ্ঞতায় ও চরিত্রে প্রতিফলিত করার জন্যই।' দ্বিতীয় ধাপটি সকলের পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ। কিছুই অসম্ভব নয়। আজকাল তো অসম্ভব ঘটনা ঘটছে ঃ চাঁদে

মানুষের অবতরণ, ভয়েজার (Voyager) নামে মহাকাশযানটি চলেছে সৌরজগৎ ছাড়িয়ে মহাকাশে। যদি ভৌত-প্রযুক্তি বিদ্যা এইসব কাজে সফল হতে পারে, তবে মানস-প্রযুক্তি বিদ্যা জীবনের পরিমণ্ডলে একই রকম সাফল্য অর্জন করতে পারবে না কেন?

মনের এই নিয়মানুবর্তিতা, একে শোধনাগারে পরিণত করা—যেখানে সবরকম অভিজ্ঞতা শোধিত হয়ে তা থেকে শুদ্ধ সামগ্রী বেরিয়ে আসে—কী সুন্দর ভাব! আজকাল শিশুদের উৎসাহিত করতে এই সব ভাবের তুলনা হয় না। এসব কথা কেউ তাদের বলেনি। তুমি যদি তাদের বল, যে তোমার দেহ-মন একটা সুন্দর পরীক্ষাগার (Laboratory); তুমি পদার্থবিদ্যার, রসায়ন বিদ্যার পরীক্ষাগারে গিয়ে কতরকম কাজ কর, তা করতে থাক, কিন্তু কখনো ভুলো না যে তোমার নিজের দেহ-মনও একটি বড় পরীক্ষাগার। যত রকম অভিজ্ঞতা সেখানে আসছে, তোমার কাজ হলো সেগুলিকে শোধন করা। বাবা একদিন তোমাকে বকেছেন, তুমি মন-মরা হয়ে পড়েছ, শোধন পদ্ধতির ভেতর দিয়ে ঐ মন-মরা ভাবটিকে চালিয়ে তাকে আবার একবার উৎফুল্ল ভাবে পরিণত কর। শীঘ্রই এই ক্রিয়াটি সহজ সরল হয়ে যাবে। ফলে শিশুরা দিনে দিনে বলীয়ান হয়ে উঠবে। এই হলো অর্থ ও ব্যাপক তাৎপর্য এই চমৎকার ১০ম শ্লোকটির : *বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ। বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্‌ভাবমাগতাঃ*। মনে রেখো ঐ *বহবো* কথাটি, যার অর্থ হলো অনেক; অনেকে এই পথে গিয়ে সফল হয়েছে। এ কথাগুলি নতুন নয়। এই পথ প্রাচীন।

২৬০০ বছর আগে বুদ্ধের সময়, তিনি নিজে বলেছেন, আমি নতুন কিছু শেখাচ্ছি না। আমি কেবল পুরাতন পথটিকে পরিষ্কার করছি। পথে অনেক আগাছা জন্মেছে, আমি সেগুলিকে অপসারিত করে পথটিকে পরিষ্কার করছি, যাতে এই পথে হাঁটতে লোকের কষ্ট না হয়। এই ভাষাতেই তিনি বলেছিলেন। তিনি আরো বলেছিলেন, দুবার, *এষ ধর্ম সনাতনঃ, এষ ধর্ম সনাতনঃ*, 'এটি সনাতন *ধর্ম*; এটি সনাতন *ধর্ম*'। বুদ্ধ সদৃশ আচার্য আহ্বান করেছেন সমগ্র মানব জাতিকে, কারণ তিনি জানতেন যে মানবের জৈব সামর্থ্য রয়েছে, এই পথ পরিক্রমা করার ও সাফল্য অর্জন করার। লোকেদের এ সব কথা বলার দরকার কী? কিন্তু, না! আজকের স্নায়ুবিদ্যা পর্যন্ত বলে যে, মানুষের প্রচুর সামর্থ্য রয়েছে—তার বহুমুখী শক্তিসম্পন্ন মস্তিষ্কতন্ত্রটির মাধ্যমে—বাহ্যজগতের জ্ঞান ও অন্তরাত্মার জ্ঞান দুই-ই লাভ করার জন্য। বেদান্ত এই আহ্বানই জানাচ্ছে

সমগ্র মানবজাতির প্রতি, কোন অন্ধবিশ্বাস অথবা কোন সাম্প্রদায়িক মতবাদ প্রচার করতে নয়। এটি মানবিক সমস্যা, আর এর মানবিক সমাধানও রয়েছে। এই সব উক্তিগুলির ভাষা ও ভঙ্গিতে সেই একই রকম বিশ্বজনীনতা দেখা যায়। তাই বর্তমান জগৎ এই মহান ও প্রাচীন প্রজ্ঞার একটু স্পর্শের খোঁজে রয়েছে। এ জ্ঞান নয়, প্রজ্ঞা। জ্ঞানের পরিপক্ক ভাব। জ্ঞানকে অবশ্যই পরিপক্ক হয়ে প্রজ্ঞায় পরিণত হতে হবে। অন্যথায় ঐ জ্ঞান বিপজ্জনক হতে পারে। এ কোন ধর্মাচার্যের মত নয়, পরন্তু এক স্বীকৃত অজ্ঞেয়বাদী, বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মত; তিনি বলেছেন (*Impact of Science on Society*) ঃ

'আমরা যেন উপায় অবলম্বনে মানবীয় জ্ঞান আর ফলপ্রাপ্তির ব্যাপারে মানবীয় মূর্খতা—এই দুই-এর দৌড়ের মাঝখানে পড়েছি।'

উক্তির শেষে তিনি বলেছেন, 'জ্ঞানবৃদ্ধির সমান সমান প্রজ্ঞাবৃদ্ধি যদি না হয়, তবে জ্ঞানবৃদ্ধিতে দুঃখের জ্বালাই বাড়বে।'

কী সুন্দর ভাষাটি! যখন তোমার জ্ঞান ছিল না, তখন তোমার দুঃখও ছিল কম। বেশি জ্ঞানের সঙ্গে বেশি দুঃখ এসেছে! জ্ঞানকে প্রজ্ঞায় রূপায়িত কর, তুমি আবার মুক্ত হবে। এই হলো আধুনিক মানবের অগ্রগতির পথ। ভৌত ও আধ্যাত্মিক দুই জ্ঞানের বিষয়ই গীতায় বার বার এসেছে।

এইখানেই আসছে, *জ্ঞানতপঃ*, জ্ঞানের *তপস্যা* কথাটির তাৎপর্য। প্রতিদিন এতগুলি সমস্যা আমাদের সামনে আসে। তাদের সামনাসামনি হতে হবে, আবার সেগুলির সমাধানও করতে হবে। এর জন্য আমাদের শক্তি অর্জন করা দরকার। অন্তরের জ্ঞানকে জাগিয়ে তুলতে হবে। বাহ্য জগতের জ্ঞান ও আন্তর জগতের জ্ঞান—এ দুই মিলিয়েই জ্ঞান; এর মধ্যে দ্বিতীয়টিই বেশি তাৎপর্যপূর্ণ।

আমরা এখন ১১শ শ্লোক নিয়ে আলোচনা করব। এই শ্লোকটি সমন্বয়ের পথে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ চিহ্ন। ভারতের একটি স্বাতন্ত্র্য আছে, আর তা হলো এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের সমন্বয়, ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সমন্বয়, ধর্মের সঙ্গে নাস্তিকতা ও অজ্ঞাবাদের সমন্বয়। ভারতের গৌরবময় দিনগুলিতে এইসব বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব দেখা যায় নি। বার বার উপদেশ দিয়ে সমন্বয় ভাবের সংস্কার ভারতে জাগিয়ে রাখা হয়েছিল, প্রাচীন ঋগ্বেদের কাল থেকে বর্তমানের শ্রীরামকৃষ্ণ যুগ পর্যন্ত। *একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি*, 'সত্য একটিই, ঋষিরা এর বহু নাম দিয়েছেন'। এটি একটি মূল্যবান সম্পদ, যা পৃথিবীর অন্য কোন সমাজে নেই। এর ভিত্তি হলো বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব সম্বন্ধে ভারতের

উন্নত দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টি বা অদ্বৈত দৃষ্টি; বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গির পেছনে রয়েছে একত্ব। এ এক মহান শিক্ষা যা বৈদিক ঋষিরাই প্রথমে আমাদের দিয়েছেন। তারপর বিভিন্ন রাজনীতিক কারণে বিভক্ত বা প্রদেশ বিভাগের ফলে বিভক্ত রাজ্যগুলিও একই নীতি অনুসরণ করতো। বিশেষত মৌর্য সম্রাট অশোকের সময়ে, খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতাব্দীতে, এই সত্য ঘোষিত হতে দেখা গেছে, তাঁর শিলালিপিগুলিতে ও স্তম্ভে স্তম্ভে :

'যদি তুমি নিজ ধর্মকে ভালবাস আর অন্য ধর্মকে ঘৃণা কর, তবে তোমার নিজ ধর্মেরই ক্ষতি করা হলো, কারণ, তোমার ধর্ম বলে *সমবায় এব সাধুঃ*, 'মিলিতভাবে থাকাই সত্য।'

তারই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীকৃষ্ণের মহান বাণী পরিবেশিত হয়েছে ১১শ শ্লোকে :

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ১১ ॥

—'মানুষ যেভাবে আমার উপাসনা করে, সেইভাবেই আমি তাদের বাসনা পূরণ করি; হে বৎস পার্থ, (এই) সব লোক, সর্বভাবে আমার পথেই চলছে।'

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, 'ধর্মজগতে নরনারী যে পথই গ্রহণ করুক' : তুমি এক পথে উপাসনা করছ, অন্যে অন্য পথে। পথ বিভিন্ন হতে পারে; কিন্তু সকলে আমার কাছেই আসে। এর ওপর খুবই জোর দেওয়া হয়েছে। 'তুমি এই পথে এসেছ, তোমাকে গ্রহণ করলাম। যদি তুমি অন্য পথে আস, আমি বলব না যে "এই পথে না এলে তোমাকে গ্রহণ করব না" তুমি যে কোন পথে আসতে পার। তুমি যে পথেই আমার কাছে আস না কেন আমি তোমাকে গ্রহণ করব।' ধর্মগুলি সব যেন এক একটি পথ। পথ অনেক কিন্তু লক্ষ্য এক। অন্য সব ধর্মে একটি করে বাঁধাধরা পথ রয়েছে। সেই বাঁধাধরা পথে, কয়েকটি নির্দিষ্ট মত আছে। (তাদের মতে) এই পথে এস তবেই তোমাকে (তিনি) গ্রহণ করবেন। এই হলো তাদের শিক্ষা। ভারত যে মত পোষণ করে ও কাজে পরিণত করে থাকে, এ তার ঠিক বিপরীত। কী সুন্দর ভাবটি!

গ্রিক পুরাণে প্রোক্রাস্টেসের বিছানার একটি গল্প আছে। প্রোক্রাস্টেসের একটি বিছানা ছিল। কোন পথিক পাশ দিয়ে গেলেই, সে তাকে ডেকে বলত : এস, আমার বিছানায় একবার শুয়ে যাও। মানুষটি যদি একটু লম্বা হতো, পা দুটি যদি বিছানা ছাড়িয়ে যেত—তবে পা দুটিকে কেটে বিছানার সঙ্গে সমান

করে নিত। যদি খাট হতো, তবে সে পাদুটিকে টেনে বাড়িয়ে বিছানার সমান করে নিত। আমার বিছানাই ঠিক ঠিক মাপসই, নমুনাস্বরূপ। সকলকেই এই নমুনার মতো হতে হবে। ইংরেজি ভাষায় একে বলা হয় মত পথের প্রোক্রাসটীয় বিছানা। ভারতীয় ধর্মে প্রোক্রাসটীয় বিছানার মতো ভাব কখনো ছিল না। কখনই না। আমরা লোককে জামা দিয়ে থাকি, তার শরীরের মাপে। সকলের জন্য একই মাপের জামা নয়।

ভারতীয় কৃষ্টির এ এক বিরাট অবদান; কোন এক বিশেষ পরিস্থিতি বা কর্মপন্থা অনুযায়ী এ ব্যবস্থা হয়নি, হয়েছিল এক ব্যাপক আধ্যাত্মিক দৃষ্টি, দার্শনিক বোঝাপড়ার ফলে ঃ *যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্; মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ*। নর নারী এমনই পথ ধরে, যা কেবল আমার দিকেই নিয়ে আসে। কোন 'বাঁধা ধরা পথ নেই।' তুমি এই পথে যাবে, ঐ পথে নয়; এমন কোন মতানুসারী পথ নেই। এবং তা ঋগ্বেদের যুগ থেকেই এভাবের সূচনায় বলা হয়েছে ঃ *একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি*, 'সত্য এক, ঋষিরা একে নানা নামে ঘোষণা করেছেন', তারপর গীতার মাধ্যমে, শ্রীমদ্ভাগবতের মাধ্যমে এবং শেষে সমর্থিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর মাধ্যমে। তিনি বলেছেন ঃ যত মত তত পথ, যতরকম ধর্ম, ঈশ্বরের কাছে যাবার ততগুলি পথ রয়েছে।' সমন্বয় ভাব, সমতাভাব অভ্যাস কর। ধর্মের নামে বিবাদ কর না। এ দেশের সৌভাগ্য যে, এখানকার অধিবাসী ও রাষ্ট্রের দ্বারা একমাত্র এ দেশেই এই ভাব বিশেষভাবে সমাদৃত, ব্যাখ্যাত ও পরিপালিত হয়েছে। এখন যদি আমরা এভাব হারাতে বসি, তবে তা হবে আমাদের নিজ উত্তরাধিকার সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্য। কিন্তু ভারত সদাই এই মহান আদর্শকে ধরে রাখবে। আজ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব—বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পরস্পর বোঝাপড়া ও সমন্বয়ী ভাবের মহান আদর্শকে শক্তিশালী করার জন্য।

রোমীয় সাম্রাজ্যে বহুধর্ম ছিল—লোকে ইচ্ছামতো যে কোন একটি মতে উপাসনা করত। এই ছিল ভাব। রোমের রাজনীতিক সরকার ও বুদ্ধিজীবীরা ধর্ম সম্বন্ধে কোন কিছুকে স্বীকৃতি না দেওয়ার মনোভাব নিয়ে থাকতেন। এডওয়ার্ড গিবন তাঁর *'Decline and Fall of the Roman Empire'* (রোমীয় সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও পতন)—নামে বিখ্যাত গ্রন্থে একথা ব্যক্ত করে গেছেন এইভাবে ঃ

'রোমীয় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মগুলিকে জনতা সমভাবে সত্য

বলে বিশ্বাস করতেন, দার্শনিকগণ সেগুলিকে সমভাবে মিথ্যা বলে মনে করতেন এবং শাসকগণ সেগুলিকে সমভাবে প্রয়োজনীয় বলে ভাবতেন।'

রাজনীতিক সরকার এ ব্যবস্থা পছন্দ করতেন : (তাঁদের মনোভাব ছিল) তোমরা তোমাদের ধর্ম নিয়ে থাক—যে প্রচলিত রাজনীতিক শাসনব্যবস্থা, যা চালু আছে তাকে নাড়াতে যেও না। তাই, ধর্মগুলির কাজকে তারা অনুমোদন করত। এ এক অত্যন্ত নিন্দনীয় মনোভাব; ভারতের ঠিক বিপরীত মনোভাব। আমরা প্রচলিত সব ধর্মকে অনুমোদন করি; আমাদের রাজনীতিক বা আধ্যাত্মিক নেতৃগণ, আমাদের চিন্তাশীলব্যক্তিগণও সেগুলিকে অনুমোদন ও উৎসাহদান করে থাকেন, তাঁরা বলেন, 'যাও তোমার মতে চল; কিন্তু ঝগড়া-মারামারি কর না, কারণ লক্ষ্য তো এক—পথ অনেক হতে পারে'। এই শিক্ষার দ্বারাই আমরা বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে এক ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে পেরেছিলাম, যাকে স্বীকৃতিদান বলা হয়। আমরা তোমাকে স্বীকার করি। তুমি খ্রিস্টান, আমরা তোমাকে স্বীকার করছি। তুমি শিখ, আমরা তোমাকে স্বীকার করছি। তুমি মুসলমান, আমরা তোমাকে স্বীকার করছি। তুমি বৈষ্ণব, আমরা তোমাকে স্বীকার করছি।

ভারতের এই মহান সনাতন বাণী স্বামী বিবেকানন্দ বর্তমান জগতের কাছে ঘোষণা করেছিলেন ১১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ খ্রিঃ চিকাগোতে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম মহাসভায় অভ্যর্থনার উত্তরে' (*'Response to Welcome', Complete Works of Swami Vivekananda*, vol.-1, p.3)

'হে আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ,

'আজ আপনারা আমাদের যে আন্তরিক ও সাদর অভ্যর্থনা করেছেন , তার উত্তর দিতে উঠতে গিয়ে আমার হৃদয় অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।...

'যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল পরমতসহিষ্ণুতা ও সর্ববিধ মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়ে আসছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলে নিজে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা শুধু সব ধর্মকে সহ্য করি না, সব ধর্মকেই আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি। ... যে জাতি পৃথিবীর সকল ধর্মের ও সকল জাতির নিপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থী জনগণকে আশ্রয় দিয়ে আসছে, আমি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে নিজে গৌরব অনুভব করি। আমি আপনাদের এ কথা বলতে গর্ববোধ করছি

১ বাণী ও রচনা, ১ম সং, ১ খণ্ড, পৃঃ ৯-১০

যে, আমরাই ইহুদীদের খাঁটি বংশধরগণের মধ্যে যারা অবশিষ্ট ছিল তাদের সাদরে হৃদয়ে ধারণ করে রেখেছি; যে বছর রোমানদের ভয়ঙ্কর উৎপীড়নে তাদের পবিত্র মন্দির টুকরো টুকরো হয়ে ধ্বংস হয়, সেই বছরেই তারা দক্ষিণ ভারতে আমাদের মধ্যে আশ্রয়লাভ করে। মহান জরথুস্ত্রীয় জাতির অবশিষ্টাংশকে যে ধর্মাবলম্বিগণ আশ্রয় দিয়েছিল এবং আজও প্রতিপালন করছে, আমি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে নিজে গৌরব অনুভব করি।

'কোটি কোটি নরনারী যে স্তোত্রটি প্রতিদিন উচ্চারণ করে, আমিও যা শৈশব থেকে আবৃত্তি করে আসছি, তার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করে আপনাদের বলছি ঃ

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥[১]

—"বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্ন স্থানে, কিন্তু তারা সকলেই যেমন একই সমুদ্রে তাদের জলরাশিকে মিলিয়ে দেয়, তেমনি হে ভগবান, নিজ নিজ রুচির বৈচিত্র্যের জন্য সরল ও বক্র নানা পথে যারা চলেছে, তাদের সকলেরই লক্ষ্য একমাত্র তুমিই।" '

এ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ প্রাধান্য দিচ্ছেন আমাদের সংস্কৃতির মূল তত্ত্বের ওপর ঃ তা হলো—ধর্মজগতে সমন্বয়। ধর্ম যদি আমাদের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠার কাজে সহায়ক হতে না পারে, তবে অন্য কোথা থেকে সাহায্য আসতে পারে? শ্রেষ্ঠ শান্তি বিরাজ করছে ধর্মের অন্তরে। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গির অনুশীলনের অভাবে, ধর্মই হয়ে দাঁড়িয়েছে, মারামারি, অসহিষ্ণুতা, পীড়ন, হিংসা এবং যুদ্ধের কেন্দ্র হয়ে। ভারতীয় ইতিহাসে এর নিদর্শন সব থেকে কম, কারণ এই সমন্বয়ের শিক্ষা দিয়ে এসেছে শুধু ঋষিরা নন, রাজনীতিক শাসকগণও। তাই আমরা ইহুদি ও জরথুস্ত্রীয়ের মতো বৈদেশিক ধর্মকে ভারতে স্বাগত জানিয়ে বলতে পেরেছিলাম ঃ 'আপনারা স্বচ্ছন্দে আসতে পারেন ও আপন ধর্মানুষ্ঠানও চালিয়ে যেতে পারেন। আমরা আপনাদের সব রকম সাহায্য করব।' এই রকমই ঘটেছিল পারসিক জরথুস্ত্রীয়দের ক্ষেত্রে, যখন তারা পারস্য দেশে (বর্তমান ইরান) উত্তাল ঐশ্লামিক তরঙ্গে ভীষণভাবে উৎপীড়িত হয়ে, ৮ম বা ৯ম শতাব্দীতে ভারতে আসে; গুজরাট রাজ্যের রাজা তাদের স্বাগত জানিয়ে, তাদের নিজ সংস্কৃতি ও ধর্ম পালনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেন। এই মনোমুগ্ধকারী

১ শিবমহিম্নঃ স্তোত্র -৭

কাহিনীর—অন্য কোন দেশে যার তুলনা নেই এমন কাহিনীর—বিশদ বর্ণনা আমরা পাই পিলু নানাবর্থী নামে এক পার্সি রমণীর 'The Parsees' নামক গ্রন্থে। এখন এই মনোভাব ভারতের সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের শিক্ষা দিতে হয় না, অথচ অন্য সব দেশে এ বিষয়ে *শিক্ষা* দিতে হয়, কারণ তাদের জীবনধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি ঐরকম নয়। 'আমি যদি বেশি ধার্মিক হই, তবে আমি অত্যন্ত গোঁড়া হয়ে পড়ি। আমি যদি ধার্মিক না হই, তবে আমি উদার হলাম। আমি ধার্মিক থেকে উদার হতে পারি না।' এই হলো পাশ্চাত্যের ও পশ্চিম এশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি।

বৃটিশ ঐতিহাসিক স্বর্গত আরনল্ড টয়েনবি রোম সাম্রাজ্যে খ্রিস্টধর্মের আদিকালের ইতিহাসের এক ঘটনার উল্লেখ করেছেন। রোমের বিশপ অ্যাম্ব্রোজ রোমের সেনেটর সীম্মাখাসকে বলেছিলেন—ঈশ্বরের দিকে যাবার কেবল একটাই পথ আছে, আর তা হলো ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্ম। সীম্মাখাস পৌত্তলিক ধর্ম অনুসরণ করত, তাই অ্যাম্ব্রোজের দাবি অস্বীকার করে বলে ধর্মের নানা পথ আছে। কিন্তু শীঘ্রই ক্যাথলিক চার্চ কর্তৃক সীম্মাখাসের কণ্ঠস্বর ও সবরকম পৌত্তলিকতা রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এই কথা বলে টয়েনবি মন্তব্য করেন : সীম্মাখাসের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু সে যে সত্যকে তুলে ধরতে চেয়েছিল তাকে রুদ্ধ করতে পারেনি, কারণ কোটি কোটি হিন্দু সেই কণ্ঠস্বরকে সমর্থনজানিয়ে আসছে এবং আজও জানাচ্ছে।

এরপর পশ্চিম এশিয়াতে ইসলামের বিরুদ্ধে শতবর্ষব্যাপী খ্রিস্টীয় জেহাদ চলেছিল এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে খ্রিস্টীয় মিশনারিরা উৎপীড়ন চালিয়েছে ও বহু নারীকে খুটিতে বেঁধে পুড়িয়ে মেরেছে।

ক্যাথলিক খ্রিস্টান ধর্ম শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, যতদিন না ১৬শ শতাব্দীতে প্রোটেস্টান্ট (Protestant) নামে খ্রিস্টানদের বিরোধী উপদলটি—জার্মানীতে মূল দলের সঙ্গে ৩০ বছর ধরে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ করে—ক্যাথলিক চার্চকে দুভাগে বিভক্ত করে দিয়েছিল।

বর্তমান যুগেও ধর্মে ধর্মে শান্তিপূর্ণ হার্দিক সম্পর্ক বজায় রাখার সমস্যাটি থেকে গেছে; কিন্তু এবিষয়ে সাফল্য অর্জনের ভারতীয় পদ্ধতি ধীরে ধীরে গৃহীত হচ্ছে। ৪র্থ শতাব্দীতে বিশপ অ্যাম্ব্রোজ যা মন্তব্য করেছিলেন তার সঙ্গে মিল পাওয়া যাবে না পোপ ষষ্ঠ পলের ভারত-দর্শনের পর যে ধারণা হয়েছিল তার সঙ্গে। ১৯৬৪ খ্রিঃ পোপ পল ভারত-দর্শনের পর রোমে ফিরে গিয়ে এক বিবৃতি

দেন, তার প্রতিবেদন ১ জানুয়ারি ১৯৬৫ খ্রিঃ ওয়াশিংটন ডি. সি.-স্থ *Indian News* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল; ঐ প্রতিবেদনটি হলো ঃ

'পোপ ষষ্ঠ পল ডিসেম্বরের গোড়ায় ভারত-দর্শনে মুম্বাই গিয়েছিলেন, ২২ ডিসেম্বর তার বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন—"ঐটি আমাদের পক্ষে অতুলনীয় মানবিক মূল্যবোধে পূর্ণ ছিল।" প্রধান যাজক বিশ্ববাসীর কাছে তাঁর খ্রিস্টমাসের বাণীতে বলেন ঃ

"আমরা সেখানে (মুম্বাইতে) অন্তরীণ অপরিচিতের মতো, কেবল স্বধর্মাবলম্বীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকতে পারতাম... কিন্তু, তার পরিবর্তে আমরা সমগ্র জনসাধারণের সাক্ষাৎ পেয়েছি।" তিনি আরো বলেন, "আমাদের মনে হয়, ওরা বিস্তৃত ভারত ভূখণ্ডের ও সমগ্র এশিয়ার বিরাট জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছিল।" পোপ পল বলেন ঃ

"এ দেশ ক্যাথলিক নয়, তবু কী সৌজন্য, কী প্রাণখোলা ভাব, রোমের এই অপরিচিত পরিব্রাজকের দর্শন পাবার ও কথা শোনার জন্য কী গভীর আগ্রহ!" প্রধান যাজক আরো বললেন ঃ

"সে এক সময় গেছে গোষ্ঠী-মন বোঝার। আমরা জানি না, এই আনন্দে উৎফুল্ল জনতা আমাদের মধ্যে কী দেখেছিল কিন্তু ঐ জনতার মধ্যে আমরা দেখেছিলাম—হাজার হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে একাত্মভাবে ভাবিত, মহৎ আভিজাত্যবোধ বিশিষ্ট মানবজাতিকে। এই জনমণ্ডলীর সবাই খ্রিস্টান নয়, কিন্তু তাদের ছিল গভীর আধ্যাত্মিক ভাব আর তারা অনেক দিক থেকেই ছিল সৎভাবাপন্ন ও মনো-জয়ী।" '

ভারতে আমাদের ভাব ভিন্ন ধরনের ঃ আমাদের ধর্মের প্রভাবেই আমরা উদার, তোমার ধর্মকে আমরা স্বীকৃতি দিয়ে থাকি, আমাদের কাজে ফুটে ওঠে সমন্বয়ের ভাব। আমাদের ধর্ম আমাদের মধ্যে প্রেরণা জোগায় অন্য সব ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে। এই হলো শ্রীকৃষ্ণের এই বিবৃতির তাৎপর্য ঃ *যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্; মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ*। সব লোকে বক্র বা সরল নানা ধর্মীয় পথ অনুসরণ করে থাকে, কিন্তু পথগুলি শেষ পর্যন্ত সকলকে ঈশ্বরের কাছেই পৌছে দেয়। সত্য ধর্মের এই হলো ভাব। প্রত্যেক ধর্মেই দুটি মাত্রা বর্তমান। একটি তাকে অন্য ধর্ম থেকে পৃথক করে; সেগুলি হলো তাদের আচার অনুষ্ঠান, ধর্মমত, বিশ্বাস; এগুলি এক দিকে। ধর্মের অপর দিকটি আধ্যাত্মিক বিকাশ, আধ্যাত্মিক সমুন্নতি নিয়ে; এটি উচ্চতর দিক। মরমী

সাধকগণ ধর্মের এই দ্বিতীয় থাকের। সব ধর্মের মরমিরা সাধারণত একই ভাষায় কথা বলেন : ঐস্লামিক সুফি মরমি, হিন্দু মরমি, বৌদ্ধ মরমি এবং ইহুদি মরমি, এঁরা সকলেই একই ভাষায় কথা বলেন, কারণ তাঁরা বহুর পেছনে যে এক অদ্বৈত বস্তু রয়েছেন, তাঁকে উপলব্ধি করেছেন। সাধারণত তাঁরা অধিক সহনশীল হন, এঁদের সমঝোতার ভাবও বেশি হয়ে থাকে; অবশ্য এর ব্যতিক্রমও হয়ে থাকে—যখন তাঁরা নিয়ন্ত্রিত হন অনমনীয় ধর্ম প্রধানের দ্বারা, অথবা সমাজের অনমনীয় গোঁড়ামির দ্বারা। কিন্তু ভারতে আমাদের তেমন কোন কেন্দ্রীয় সংস্থা ছিল না সকলকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য। ধর্মজগতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার স্বাধীনতা ছিল। নতুন নতুন ধর্ম সম্প্রদায় গড়ে ওঠে, নতুন নতুন ধর্মাচার্য আসেন, তাঁদের অনুগামীরাও আসেন, আমরা তাঁদের শ্রদ্ধা করি। তাঁদের মধ্যে একজনকেও পীড়ন বা সংহার করা হয়নি। ধর্মে বৈচিত্র্য প্রয়োজন। যত ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় হবে, তত বেশি বেশি লোকের ধর্মরুচি তৃপ্ত হবে।

একই নির্দেশনায় নিয়ন্ত্রিত ধর্মে সকলের ধর্মরুচি তৃপ্ত হতে পারে না। ঠিক যেমন খাদ্যের বেলা : আমরা বিভিন্ন ধরনের খাদ্য চাই। আমার রুচি তোমার রুচি থেকে ভিন্ন; খাদ্য খাদ্যই। তুমি যেমন খাদ্যই খাও, পুষ্টি হলেই হলো। তাই, এইভাবে ভারতে যুগ যুগ ধরে এই মহান শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে; আর বর্তমান যুগেও এর মধ্যে কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নি।

প্রশ্ন উঠতে পারে—তোমাদের কি সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ববিরোধ ইত্যাদি নেই? তুমি দেখবে বর্তমানে ভারতে প্রায় সব ক্ষেত্রেই এ সব দ্বন্দ্ব ধর্মভিত্তিক নয়, রাজনীতিভিত্তিক। ধর্মের দিক থেকে মানুষে মানুষে কোন দ্বন্দ্ব নেই। অবশ্য কোন কোন ধর্মে সঙ্কীর্ণ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তারা বিশ্বাস করে না যে, অন্য ধর্মও সত্য হতে পারে। এ মনোভাবের পরিবর্তন দরকার। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে আগামী কয়েক দশকের মধ্যে তার পরিবর্তন সাধিত হবে। তাই বলা যেতে পারে যে, এখানে ধর্মের ইতিহাস কতক ভাল, কতক মন্দ। পরে কেবল ভালই হবে, যখন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব জগতের সব ধর্মকে প্রভাবিত করবে। বস্তুত তা ঘটছে। খ্রিস্টধর্ম দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। খ্রিস্টান লেখকগণ অ-খ্রিস্টান উৎস থেকে প্রেরণা লাভের জন্য নিজেদের উন্মুক্ত করছেন। শত শত বছরের পুরানো অনমনীয় মনোভাব আর নেই। তাই বলি, খ্রিস্টান ধর্মে এক বিরাট পরিবর্তন আসছে। ডঃ ঈশানন্দ ভেম্পানি তাঁর সাম্প্রতিক কালে লিখিত *Krishna and Christ* (কৃষ্ণ ও যিশু) নামে বইখানি

আমাকে পাঠিয়েছেন। এই ৩০০ পাতার বইটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। লেখকের অনুরোধে আমি বইখানির একটা ভূমিকাও লিখে দিয়েছি। তিনি আমেদাবাদের এক জেসুইট ফাদার এবং কিছুদিন আমার সঙ্গে এই মঠে ছিলেন। আমি বইখানি আগাগোড়া পড়েছি; এতে অ-খ্রিস্টান ধর্মগুলির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান ব্যক্ত হয়েছে। আগে এমন ছিল না; অন্যের ভাবগুলিকে বিকৃত করে খারাপ ভাবে দেখানই ছিল এদের কাজ। সেদিন পর্যন্ত নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠ ভাবটির সঙ্গে পর-ধর্মের নিকৃষ্টভাবের তুলনা করা হয়েছে। এখন অন্য ভাবে বই লেখা আরম্ভ হয়েছে ঃ প্রত্যেকটি ধর্মের প্রতি, তাদের ভাবগুলির প্রতি, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে দেখা যাচ্ছে। বলা হচ্ছে, 'ওটা' এক পথ, 'এটা' আর এক পথ।

তাই শ্রীকৃষ্ণের সমন্বয় শিক্ষা পৃথিবীর সব দেশের আরো বেশি বেশি লোকের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে চলেছে। এ যুগে, আমরা আরো বেশি করে কাছাকাছি হচ্ছি; অতএব একমাত্র এই দৃষ্টিভঙ্গিই কার্যকরী হতে পারে; নিজ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপন আর অন্যে ভুল পথে চলেছে, তাদের 'ঠিক' পথে আনার চেষ্টা তোমাকেই করতে হবে—এমন মনোভাব একসঙ্গে চলতে পারে না। প্রত্যেক ধর্মেই এমন ধর্মোন্মত্ত লোক পাওয়া যায়। কিন্তু তার কোন ভবিষ্যৎ নেই। ভবিষ্যৎ আছে কেবল সমন্বয়, ঐক্য, সহনশীলতা, সমঝোতার পথে। অতএব শ্রীকৃষ্ণের এই শিক্ষা পৃথিবীর সব দেশের বেশি বেশি লোককে অনুপ্রাণিত করবে, কোটি কোটি লোকের নিজ নিজ ভাষায় অনূদিত গীতার পঠন-পাঠনের সঙ্গে সঙ্গে। এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাই শ্রীকৃষ্ণ একাদশ শ্লোকের মাধ্যমে দিয়েছেন। তিনি নিজে এক বিশ্বমনের অধিকারী ছিলেন, যেখানে সব রকম উপাসনা ও সব রকম ধর্ম প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ থাকত। তাঁর শিক্ষা তাঁর জীবনেও প্রতিফলিত হয়ে ছিল। পরবর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা ॥ ১২॥

—'ইহলোকে কর্মফলের আশায় (লোকে) নানা দেবতার উপাসনা করে (মুক্তির জন্য আমার শরণ না নিয়ে); কারণ মনুষ্য জগতে কর্মের ফল অচিরেই লাভ করা যায়।'

একটিই পরম সত্তা আছে, যিনি সকলের আত্মা, আবার বিশ্বাত্মাও বটেন। এই হলো বেদান্তের মূল তত্ত্ব। কিন্তু নানা রকম দেব বা দেবী ও কিছু অলৌকিক

শক্তির ওপর ভিত্তি করে বহু ধর্মসম্প্রদায়ও আছে। *কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিম্ যজন্ত ইহ দেবতাঃ,* 'লোকে নানা *দেবতার* পূজা করে থাকে, আশানুরূপ কিছু ফল লাভের জন্য।' আমি কিছু কাজ করছি, আমি তোমার অনুগ্রহ চাই। তাই তারা নানা দেব-দেবীর পূজা করে। তা ভাল। ইহ জগতে, এ রকম কাজে ভাল ফল পাওয়া যায়। *ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা,* 'মনুষ্যলোকে কর্মের ফল শীঘ্র লাভ করা যায়।' তুমি এমনটি করতে পার, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম কেবল তখনই লাভ করবে যখন তুমি এই সত্যটি বুঝবে—যে এই সব নানা দেব-দেবী সেই এক ও অভিন্ন ঈশ্বরীয় সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র—যেমন *ঋগ্বেদে* ব্যক্ত হয়েছে : *একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি*। সেই জ্ঞানের উদ্ভাস অবশ্যই হওয়া চাই। কেবল তখনই শুদ্ধ ধর্মচেতনা জাগবে। এখানে আমরা স্বীয় স্বার্থসাধনের জন্য দেবতাদের কাজে লাগাবার চেষ্টা করছি। আমরা ঈশ্বরকে ভালবাসি না। কিছু লোক দেবতাদের নিংড়িয়ে দিয়ে নিজেদের জন্য কিছু সুবিধা আদায় করতে চায়। এটা সঠিক ধর্ম নয়। কিন্তু বেদান্ত এরও নিন্দা করে না; বেদান্ত এ কাজকেও শ্রদ্ধা করে।

১৮৯৩ খ্রিঃ চিকাগো ধর্ম মহাসভায় তাঁর বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দ জোর দিয়েছিলেন *সনাতন ধর্মের* বা হিন্দুধর্মের সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলার পদ্ধতির ওপর[১] :

"বিজ্ঞানের অতি আধুনিক আবিষ্ক্রিয়াসমূহ বেদান্তের যে মহোচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি মাত্র, সেই সর্বোৎকৃষ্ট বেদান্তজ্ঞান হতে নিম্নস্তরের মূর্তিপূজা ও আনুষঙ্গিক নানাবিধ পৌরাণিক গল্প পর্যন্ত, এমন কি বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়বাদ, জৈনদের নিরীশ্বরবাদ হিন্দুধর্মে এসবগুলির প্রত্যেকটিরই স্থান আছে।"

গীতায় ধর্ম সম্বন্ধে অতি সাধারণ ভাবও মর্যাদা পেয়েছে। কিছুই নিন্দিত হয়নি। 'ব্যক্তিবিশেষের' ধর্ম সম্বন্ধে ধারণা ঐ পর্যন্তই; সে ধর্মকে ঐ আলোকে দেখছে। যখন বোধশক্তির পরিবর্তন হবে, ঐ নর বা নারীর পরিবর্তন হবে। একটি শিশু ইংরাজি ভাষায় তার পাঠ লিখছে, ভুলে ভর্তি, উচ্চারণও ভুল; কিন্তু তবু তাকে আমরা নিন্দা করি না। কারণ, ঐ স্তরে, ঐ পর্যন্তই সে করতে পারে। তবে বড় হলে, সে একজন বড় পণ্ডিত হবে। ধর্মের ক্ষেত্রেও তেমনি। কিণ্ডারগার্টেন বা প্রাথমিক বা উচ্চ স্কুলে, অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারি। ধর্মের ক্ষেত্রেও তেমনি স্তরভেদে ধর্মবোধের পার্থক্য থাকে। তাই আমরা সর্বদা

---

১ বাণী ও রচনা, ১ম সং, ১ খণ্ড, পৃঃ ১৩

লোকধর্মকে মর্যাদা দিয়ে থাকি। যখনই কোন ব্যক্তি কোন দেবতার মাধ্যমে ঈশ্বরের পূজায় মন দেয়, সে প্রকৃতপক্ষে সেই এক ঈশ্বরেরই পূজা করে এবং শ্রীকৃষ্ণ পরে সপ্তম অধ্যায়ে বলবেন, 'বিভিন্ন দেবতার এই সব পূজা শেষ পর্যন্ত আমার পূজাতেই পর্যবসিত হয়; তারা আমাকেই খুঁজছে দেব-দেবীর এই সব অভিব্যক্তির মাধ্যমে।'

এবার আমরা ১৩শ মন্ত্রের একটি উক্তিতে আসি; এই শ্লোকটিকে বহু লোকে ভুল বুঝেছে এবং এটি বিতর্কের এক কেন্দ্রও বটে, কারণ এতে এক সামাজিক সমস্যার উল্লেখ আছে। গীতার দিক থেকে এর কথাগুলি খুবই পরিষ্কার। এই শ্লোকটিতে মূলত বলা হয়েছে, 'আমি কাজ করি, তবু অনাসক্ত থাকি।' তাই এতে অনাসক্তির এক দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, এই পর্যন্তই। উক্তিটি হলো ঃ

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩॥

—'*গুণ* ও *কর্মের* বিভাগ অনুসারে আমি এক চার থাকের বর্ণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছি। যদিও আমি এর স্রষ্টা, তবু তুমি জেনো যে আমি কর্তৃত্বহীন ও পরিবর্তনহীন।'

চার *বর্ণ,* অর্থাৎ চার জাতির লোক—*ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র*—এদের নিয়ে এই সমাজ ব্যবস্থা প্রত্যেক সমাজেই আছে, মানুষের প্রবণতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী, 'তাদের *গুণ* ও *কর্ম* অনুযায়ী'। এইগুলিই সূচিত করে কোন লোক ব্রাহ্মণ, না ক্ষত্রিয়, না বৈশ্য, না শূদ্র। একই পরিবারের সন্তানগুলি যে কোন বর্ণেরই হতে পারে। একজন সেনাবিভাগে যেতে পারে, একজন ব্যবসায়ে নামতে পারে, একজন কৃষিতে, একজন বা শ্রমসাধ্য কাজে। এইভাবে দেখা যায় লোকে নিজ নিজ মানসিক প্রবণতা বা গুণ অনুযায়ী বিভিন্ন *কর্ম* বা কাজ বা বৃত্তি গ্রহণ করে। এতেই দেখা যায় কতটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রয়েছে। তোমার যেমন কাজ পছন্দ, তা করার স্বাধীনতা তোমার রয়েছে। এই বিষয়ের ওপর শ্রীকৃষ্ণের উক্তির এই হলো মূল অর্থ। সমাজে গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন আছে—গোষ্ঠীগুলি মিলিত হয়ে সম্প্রদায় গড়তে পারে—আর ভারতে আমরা প্রথমে শ্রমজীবী হিসাবে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছিলাম; পরে ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ, শিল্প এল; আরো পরে আমরা পাই দেশশাসন, দেশে প্রতিরক্ষা, রাজনীতিক ব্যাপার ইত্যাদি। তারও পরে আমরা পাই উচ্চ বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক আচার্যদের

ছোট গোষ্ঠী। প্রত্যেক সমাজেই ঐ চারটি গোষ্ঠীই রয়েছে। কিন্তু ভারতে যা ভুল হয়েছে—তা হলো, পরবর্তী কালে *ঐ গোষ্ঠী বা বর্ণগুলি বংশানুক্রমিক হয়ে দাঁড়াল*। এটাই হলো প্রথম দোষ। বংশানুক্রমিক হওয়ায় আমরা এই ব্যবস্থাকে যেন সঙ্কীর্ণ করে ফেললাম। দ্বিতীয়ত আমরা কিছু লোককে বেশি আর কিছু লোককে কম সুবিধা দিলাম। এই দুটি দোষেই সমগ্র পদ্ধতিটি নষ্ট হয়েছে। অতএব এই দোষ দুটি দূর কর, তবেই দেখা যাবে যে সর্বত্র ঠিক বর্ণ বিভাগই ঘটছে এবং যা ভাল, তাই হচ্ছে।

আমেরিকায় এরূপ ভাব বেশ স্পষ্টই দেখা যায়। যে কোন পরিবারেই দেখা যাবে যে এক ছাত্র বলছে 'আমি ফৌজি দলে যোগ দেব;' তাকে বলা হয়, 'কোন বাধা নেই, তুমি তা করতে পার'। সে *ক্ষত্রিয়*, 'সে ক্ষত্রিয়ের কাজ করছে' অথবা সে বলছে, 'আমি ব্যবসা করব', সে *বৈশ্য*; অথবা বলছে, 'আমি কায়িক শ্রম করব', সে *শূদ্র*; অথবা বলছে, 'আমি পুরোহিত বা অধ্যাত্ম সাধক হব, তা হলে *ব্রাহ্মণ* হতে পারব।' এ সবই তোমার ওপর নির্ভর করছে। এ বিষয়ে তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। যখন *গুণ* ও *কর্ম* অনুযায়ী লোকে ইচ্ছানুরূপ নিজবৃত্তি গ্রহণের স্বাধীনতা পায়, তখন সুস্থ সমাজ গড়ে ওঠে। যখন বৃত্তি নির্বাচনের স্বাধীনতা বাধা পায়, মানুষকে তার বংশগত বৃত্তিতে আবদ্ধ হয়ে পড়তে হয়, তার বৃত্তি নির্বাচনের সুযোগ ক্রমে সঙ্কুচিত হয়ে আসে, *যখন এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীর থেকে বেশি সুযোগ দাবি করে, তখন তা দোষাবহ হয়ে পড়ে*। ভারতীয় *জাতি-ব্যবস্থায়* তাই ঘটেছে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বেশি মর্যাদা, বেশি সুযোগ, বেশি ক্ষমতা ভোগ করেছে; আর অন্যেরা অতি অল্প ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করতে পায়; কোন কোন গোষ্ঠী আবার মানুষের মর্যাদা থেকেও বঞ্চিত হয়। এই রকম বিকৃতি ঘটেছে পরবর্তী কালে, আজকাল আমরা সেই বিকৃত ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছি। কিন্তু গোষ্ঠী থাকবে। কেউ হবে উচ্চ আধ্যাত্মিকতাপ্রবণ, কেউ হবে রাজনীতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতাধিকারী, কেউ ব্যবসায় ও শিল্পে ব্যস্ত থাকবে, কেউ বা শ্রমজীবিরূপে এখানে ওখানে কাজ করবে— পরিস্থিতি অনুযায়ী, নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী। কিন্তু কারো ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অনুমোদন থাকবে না। তাই স্বামী বিবেকানন্দ ইংলন্ডে 'বেদান্ত ও বিশেষ সুবিধা'র ওপর এক উল্লেখযোগ্য বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, প্রত্যেক সমাজেই বিভিন্নতা থাকবে। ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন কাজের দায়িত্ব সম্পাদন করে। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু 'যখনই বিশেষ সুযোগসুবিধার কথা মাথা চাড়া দেবে, তাদের মাথায় কষাঘাত করবে'। নির্ভেজাল সমতাই হলো গণতন্ত্র। তাই,

গণতন্ত্রেও *চাতুর্বর্ণ্যম্* থাকতে পারে, তবে দোষ বর্জিত হয়ে। প্রত্যেক সমাজেই এ ব্যবস্থা আছে। তার পরিবর্তন হবে না। সেটা যে মূলগত ভাবনা।

আজকাল বহু গোষ্ঠী দেখা যায়। ক্ষুদ্র শিল্প একটি গোষ্ঠী হয়েছে। এই শিল্পে যারা নিযুক্ত তাদের নিজস্ব ব্যবসায়ী সমিতি বা শ্রম শিল্প সমিতি আছে। শিক্ষকদের নিজস্ব গোষ্ঠী আছে। আমরা সকলে মিলে গোষ্ঠী তৈরি করি। প্রত্যেক সমাজে আমাদের শত শত গোষ্ঠী আছে। কিন্তু ভারতে সেগুলিকে মোটামুটি চার জাতিতে ভাগ করা হয়েছিল, যার প্রথমটি ছিল ব্রাহ্মণ জাতি। *গীতা* সম্বন্ধে বর্তমান আলোচনাগুলির গোড়ায় শঙ্করাচার্যের *গীতা-ভূমিকা* পর্যালোচনার সময় এই বিষয়টি উল্লেখ করে বলেছিলাম, যে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে মনুষ্যজীবন ও ক্রমবিকাশের লক্ষ্য হলো *ব্রাহ্মণত্ব* অর্জন করা; এর অর্থ কী? সম্পূর্ণ নৈতিক চরিত্রবিশিষ্ট, আত্মসংযত, করুণায় পূর্ণ, সদাচারসম্পন্ন হওয়ার জন্য তাকে শাসন করার দরকার হয় না, কারণ এই জাতির নর বা নারী নিজ অন্তরে সু-সংযত হয়েই থাকে। এই দীপ্তিমান ব্যক্তি হলেন *ব্রাহ্মণের* ধরন, নমুনা বা আদর্শ। প্রত্যেক সমাজেই এই *ব্রাহ্মণ* জাতির লোক আছে। বিবেকানন্দ বলেছেন, কত সুন্দর সুন্দর *ব্রাহ্মণকে* আমি আমেরিকায় দেখেছি। এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'কী সুন্দর ধরনের (ব্রাহ্মণ) আমি এখানে দেখেছি!' সেই রকমই দেখা যায় জাপানে, অথবা চীনে, সর্বত্র। সোভিয়েট রাশিয়াতেও দেখা যায়। এরপর হলো *ক্ষত্রিয়* জাতি ঃ লোকসেবায় সদা প্রস্তুত, নিজ কষ্টের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও। সেইরকম সেবানুরাগের ভাবে সে সদাপ্রস্তুত। তারা *ক্ষত্রিয়* জাতি। তারপর আছে যারা ব্যবসা, শিল্প, কৃষি-কর্মে পটু ঃ তারা *বৈশ্য* জাতি। আর সুদক্ষ শ্রমজীবী, জগতে এই শ্রেণীর লোক সর্বদাই প্রচুর সংখ্যায় থাকবে। কিন্তু তাদের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা চলবে না ঃ খাওয়া, পরা, থাকা, প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় উপকরণ তাদের পাওয়া চাই। তাদের রোজগারও যেন ভাল হয়। অর্থ-রোজগারের কথায় একটি গূঢ় সত্য হলো, আদি ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় দেখা যায় যে যত উচ্চ স্তরে উঠবে পারিশ্রমিক তত কম হবে। *বৈশ্য* স্তর পর্যন্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা আছে। *বৈশ্যগণ* প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। একজন *ক্ষত্রিয়* অর্থলাভের চেয়ে সম্মানলাভের জন্য বেশি যত্নবান হয়। আর *ব্রাহ্মণ* সম্মান বা অর্থ কিছুই গ্রাহ্য করে না। তার জীবনযাত্রা অতি সরল। তাই ভারতীয় *ব্রাহ্মণগণ* জগতের মধ্যে দরিদ্রতম ও সরলতম পুরোহিত সম্প্রদায় বলে গণ্য হন। আমি *ব্রাহ্মণগণকে* মাসিক ১৫ টাকা দক্ষিণায় সুন্দর, অতি তৃপ্ত ও সুখী জীবনযাপন করতে দেখেছি। তবু কতই না তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন তাঁরা।

তাই, এইভাবে *ব্রাহ্মণ* একজাত, *ক্ষত্রিয়*ও এক জাতি, *বৈশ্য* ও *শূদ্র*ও এক একটি জাতি। এই সব সামাজিক বিভাজনের উদ্দেশ্য কী? ভারতে বলা হয় : ব্রাহ্মণ এক জাতি—আর শেষ পর্যন্ত সকলেই ক্রমবিকাশের পথে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হবে। সেই নর বা নারীকেই ব্রাহ্মণ বলা হয়—যে স্বার্থপর নয়, যার মনে সকলের সঙ্গে নিজের একত্ব বোধ জেগেছে, যে এই জীবনেই ঈশ্বরোপলব্ধি করেছে। গ্রন্থের ভূমিকায় এই বিষয়টি উল্লেখ করার সময় আমি ধম্মপদের 'ব্রাহ্মণ বগ্গো' অধ্যায়ের অন্তর্গত বুদ্ধের উপদেশগুলির উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম। বুদ্ধ ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধা করতেন। ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের মতো লোক অস্পৃশ্যের ঘরে জন্ম নিয়েও সংবিধান পরিষদে ভারতীয় সংবিধান বিলটি অতি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেছিলেন এবং সহজেই কেবল আইনমন্ত্রীই নয়, প্রধান মন্ত্রীও হতে পারতেন; তিনি ছিলেন *ক্ষত্রিয়*, যদিও তফশীলভুক্ত জাতিতে তাঁর জন্ম। কত গৌরবময় জীবনই না তিনি যাপন করে গেছেন, কতই না ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন তিনি! আমি মুম্বাইতে তাঁর বাড়িতে এক ঘণ্টা কাটিয়েছিলাম—ভারতীয় সংবিধান পরিষদের অধিবেশনের পূর্বে। যে অস্থিসার জাতিভেদ প্রথা আমাদের জাতীয় জীবনকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কুরে কুরে খাচ্ছে, তার দোষ-ত্রুটি দূর করে দিয়ে, নতুন ভারত কী ধরনের রূপ নিচ্ছে এ হলো তারই নিদর্শন।

শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে মূলত জোর দিচ্ছেন—আমি সমাজব্যবস্থার মায়িক স্রষ্টা হলেও আমি এর থেকে সম্পূর্ণ অনাসক্ত এবং কোনভাবেই এর কর্তা নই—এই সত্যটির ওপর। দ্বিতীয় পংক্তির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। 'যদিও আমি কাজ করি, তবু আমি অনাসক্ত'। অনাসক্তি এক মহান শব্দ। নতুন ধরনের চিন্তার ওপর সম্প্রতি প্রকাশিত একখানি বই পড়ছিলাম, যে চিন্তা বর্তমান যুগে আমাদের দরকার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সমতা রক্ষার জন্য; সেখানে 'অনাসক্তি' বিষয়টিকে নিয়ে আসা হয়েছে। মানব জীবনে উন্নতির উচ্চতর স্তরে অনাসক্তি একান্তই প্রয়োজন। গীতার মূল শিক্ষাই হলো—অনাসক্তির ধারণা। সেখানে আগ্রহ আছে, উৎসাহ আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আছে অনাসক্তি। এক চমৎকার ভাবাদর্শ। তুমি কঠোর পরিশ্রম কর, প্রচুর শক্তি দিয়ে কাজ কর, কিন্তু মনে অনাসক্ত থাক। এই হলো মূলীভূত শিক্ষা। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'আমি জগৎ-কল্যাণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করি, কিন্তু নিজেকে সম্পূর্ণ অনাসক্ত রাখি'। এ শিক্ষা আমাদের সকলের জন্য এবং পরিচালনের কর্মকর্তাদের জন্যও। যে বইখানি পড়লাম, তাতে এই ভাবটি রয়েছে : অনাসক্তি

জাগিয়ে তোল। মন অনাসক্ত থাকলে তুমি আরো ভাল কাজ, আরো সৃজনশীল কাজ করতে পারবে। সেখানে এইরকম ভাষাই ব্যবহার করা হয়েছে। আসক্ত মন থেকে সৃজনী শক্তি আসে না; কেবল অনাসক্ত মন থেকেই তা পাওয়া যায়। আজকাল এ রকম বই বেশি সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে। তাই এই বিশেষ অংশে এই বিষয়টির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই অনাসক্তি ভাবনার বিস্তৃত আলোচনার জন্য এবার আসছে ১৪শ শ্লোক ঃ

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪ ॥

—'কর্ম আমাকে দূষিত করতে পারে না, কর্মফলে আমার কোন আকাঙ্ক্ষাও নেই। যে আমাকে এইভাবে জেনেছে, সে কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হয় না।'

'কর্ম আমাকে কখন দূষিত করতে পারে না', *ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি*; তেমনি, *ন মে কর্মফলে স্পৃহা*, 'কর্মফলের প্রতি আমার কোন আসক্তিও নেই'। *ইতি মাং যোঽভিজানাতি*, 'যে আমাকে এই ভাবে জানে'। কর্মভির্ন স বধ্যতে, 'সেও কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়'। এরূপ নর বা নারী সব রকম কাজ করলেও কর্মফলে সে আবদ্ধ হবে না। আমার এরূপ অবস্থা যে বুঝেছে, আর নিজ জীবনে তার অনুশীলন করে, সেরূপ নর বা নারীও কর্মের দ্বারা অথবা কর্মফলে আবদ্ধ হবে না। অতএব কাজের ওপরে জোর দিতে হবে, তবে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে, তা হলো অনাসক্তি। প্রথম প্রথম এভাব অবলম্বন করে—ফলাকাঙ্ক্ষা না করে—কাজ করা খুবই কঠিন লাগবে, তাতে ক্ষতি নেই—আসক্তি থাকতেই পারে—একটু অসহায় বোধ করতে পারে, তবু চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, এই চেষ্টার ফলে ঐ ব্যক্তি এমন এক অনাসক্ত অবস্থায় পৌঁছবে যখন তার আধ্যাত্মিক শক্তি ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকবে। এমন আশা করা যায় না যে, প্রথম চেষ্টাতেই আমরা উচ্চমানের অনাসক্তি অর্জন করতে পারব। স্বামী বিবেকানন্দ, তাঁর প্রসিদ্ধ কর্ম-যোগ গ্রন্থে বলেছেন, দেখা যায় জীবনের শুরুতে মন পুরাপুরি আসক্ত; এতে কোন ক্ষতি নেই। অনুশীলন চালিয়ে যাও; উপদেশগুলি সামনে রাখ; কোন না কোন পরিস্থিতিতে অনাসক্তি অভ্যাস করতে থাক; ধীরে ধীরে তুমি শক্তি পেতে থাকবে। পরে এক সময়ে তুমি বলতে পারবে, 'হ্যাঁ বোধ হচ্ছে, আমি এখন অনাসক্ত।' আমি যখন আমার আত্মাকে দেহ থেকে পৃথক করি, তখন আমি যেন পাত্রস্থ বস্তুকে পাত্র থেকে পৃথক করে ফেলি। এখন তারা পরস্পর মিশে আছে। আমার সবে মাত্র বোধ হচ্ছে যে

অনন্ত আত্মাই আমার স্বরূপ, এই দেহ-মন সংঘাতটি একটি যন্ত্রমাত্র। এটি আসে যায়, আমি থাকি। এই অবস্থাতেই অনাসক্তির ভাবটি এসে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ এই দুই অবস্থাকে কাঁচা নারকেল, আর ঝুনো নারকেলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কাঁচা নারকেল ভেঙ্গে তার শাঁস চেঁচে তুলতে গেলে, তার সঙ্গে খোলেরও কিছু চাঁচা হয়ে শাঁসের সঙ্গে চলে আসে—কারণ শাঁস খোলের সঙ্গে লেপটে থাকে। ঝুনো নারকেল নাও, দেখবে শাঁস খোল থেকে আলাদা হয়ে আছে। নাড়লে *খড় খড়* শব্দ শোনা যাবে। তেমনি মানুষের মনও অসংস্পৃষ্ট হতে পারে। *গীতায়* সবরকম কাজের ক্ষেত্রে, ঐভাবে কর্ম থেকে কর্মফলকে আলাদা করার আহ্বান—বিঘোষিত হয়েছে। বিশেষত উচ্চ কারিগরী শিল্পের যুগে, যখন কাজের জন্য মানসিক চাপ, রক্তের চাপ এবং বদ মেজাজের সৃষ্টি হয়, তখন এ থেকে পরিত্রাণ পাবার একমাত্র উপায় হলো—আসক্তি ত্যাগের অনুশীলন। তাহলে, যত কাজই কর না কেন—তা তোমার কাছে কষ্টদায়ক হবে না। তাই *গীতায়*, অনাসক্তি, আসক্তিশূন্য হওয়ার কথাগুলি বার বার ব্যবহৃত হয়েছে।

মহাত্মা গান্ধী তাঁর গীতা ভাষ্যের নাম দিয়েছিলেন—*অনাসক্তি যোগ*, 'আসক্তি শূন্য হবার যোগ', এই হলো যোগ সম্বন্ধে *গীতার* বাণী।

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫॥

—'এইরূপ জেনে, প্রাচীন আধ্যাত্মিক-মুক্তি-লাভেচ্ছুগণও নিষ্কাম কর্ম করেছিলেন। প্রাচীনগণ পূর্বকালে যেমন নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করেছিলেন, তেমনি তুমিও ফলাসক্তি ত্যাগ করে কর্ম কর (কর্ম ত্যাগ করবে না)।'

কী সুন্দর ভাব! 'এই মনোভাব নিয়েই প্রাচীন আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভেচ্ছুগণ কর্ম করতেন' *এবম্ জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ*। এই মনোভাবেই তাঁরা *মোক্ষ*—আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভও করতে পারতেন, যদিও তাঁরা ঘোর কর্মোদ্যমে ব্যাপৃত থাকতেন। এমনই যখন হয়েছিল, *কুরু কর্মৈব তস্মাৎ ত্বং*, 'তুমিও কাজ করতে থাক', *পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্*, 'যেমন প্রাচীনগণ প্রাচীন পদ্ধতিতে করেছিলেন'; বর্তমান যুগে তুমিও তেমনি তোমার পদ্ধতিতে কাজ করে চল। কাজ চলতে থাকবে, কিন্তু কাজের প্রকৃতি বদলাতে পারে; অনাসক্তি আসবে আর সেই সঙ্গে আসবে আধ্যাত্মিক মুক্তি।

একটি শ্লোকে এই ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে। লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক তাঁর *গীতা রহস্যে* তা উদ্ধৃত করেছেন ঃ

বিবেকী সর্বথা মুক্তো কুর্বতো নাস্তি কর্তৃতা;
অলেপবাদম্ আশ্রিত্য শ্রীকৃষ্ণ জনকৌ যথা ॥

বিবেকী, 'বিচারশীল ব্যক্তি'; *সর্বথা মুক্তো*, 'চিরমুক্ত মনসহ'; *কুর্বতো নাস্তি কর্তৃতা*, 'নর বা নারী কাজে ব্যাপৃত থেকেও নিজেকে কর্মকর্তা বলে মনে করে না।' কীভাবে? *অলেপবাদম্ আশ্রিত্য*, 'অনাসক্তিবাদ অবলম্বন করে।' *অলেপ*, অর্থে 'কিছুই আমাতে লিপ্ত নয়।' *লেপ*, 'লিপ্ত থেকে'; তোমার শরীরে কিছু চন্দনের প্রলেপ দাও, তাকে বলা হয় *লেপন*। *অলেপবাদম্*, 'অনাসক্তি তত্ত্ব, লেপন না করে'; *আশ্রিত্য*, 'ঐ সত্যের ওপর নির্ভর করে।' তারপর, দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে ঃ *শ্রীকৃষ্ণ-জনকৌ যথা*, 'শ্রীকৃষ্ণ ও জনকের মতো; তাঁরা দুজন ছিলেন অনাসক্তভাবে কঠোর পরিশ্রমীদের দুই মহান দৃষ্টান্ত; তুমিও এরূপ কর।'

আমাদের পক্ষে কর্ম ত্যাগ করা অসম্ভব; কর্ম ছাড়া আমাদের জীবন অচল হয়ে যায়। অতএব কর্ম অপরিহার্য ঃ *কুরু কর্মৈব তস্মাৎ ত্বম্*, 'অতএব তুমি সর্বদা কর্ম করতে থাক'; কিন্তু এই নির্লিপ্ত মনোভাব নিয়ে। এই হলো শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ ঃ *পূর্বৈঃ পূর্বতরম্ কৃতম্*, 'যেমন প্রাচীন ব্যক্তিরা প্রাচীন কালে করেছিলেন'। কর্ম একটি দুর্বোধ্য বিষয়; পরবর্তী শ্লোকে তা উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১৬॥

—'কর্ম কী আর অকর্ম কী তা নির্ণয় করতে ঋষিরাও বিমূঢ় হন। তাই কর্ম কী—তা আমি তোমাকে বলব—যা জেনে তুমি অশুভের প্রভাব থেকে মুক্ত হবে।'

কিং কর্ম, 'কর্ম কাকে বলে?' *কিম্ অকর্ম ইতি*, 'অকর্ম কাকে বলে?' এ বিষয়ে *কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ*, ঋষিরাও এ বিষয়ের সমাধানে বিমূঢ় হয়ে পড়েন। বিষয়টি সহজবোধ্য নয়। *তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি*, 'তাই, আমি তোমাকে *কর্ম* সম্বন্ধে বলব;' *যৎ জ্ঞাত্বা*, 'যা জেনে'; *মোক্ষ্যসে অশুভাৎ*, 'তুমি কর্মজনিত অশুভ থেকে মুক্ত হবে।' আমি তোমাকে এমন এক তত্ত্ব বলব যা জেনে তুমি কর্ম করেও

কর্মফলে আবদ্ধ হবে না; পদ্মপত্র যেমন জলে ভেজে না, তুমি তেমনি মুক্ত থাকবে। অনাসক্তি ভাব অনুশীলনের ফলে মনের প্রকৃতি এমনই হয়ে যায়। এ বিষয়ে এটি প্রথম শ্লোক। দ্বিতীয়টিকে এ বিষয়ে চিন্তার গৌরী শৃঙ্গ বলা চলে। এটি এক অতি সংক্ষিপ্ত উক্তি, কিন্তু গভীর অর্থপূর্ণ। আর যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, তা প্রায় পরস্পর-বিরোধী ভাষা : *কর্মণি অকর্ম যঃ পশ্যেৎ, অকর্মণি চ কর্ম যঃ*, 'যে অকর্মে কর্ম, আর কর্মে অকর্ম দেখে'। ঐ বিষয়টি আলোচনা করার আগে শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তুতিসূচক মন্তব্য আমরা শুনব পরবর্তী শ্লোকে :

কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥

—সত্যই, *কর্মেরও* (যথার্থ প্রকৃতি) জানা চাই, আবার *বিকর্মের* বা নিষিদ্ধ কর্মের এবং *অকর্মের* বা নিষ্ক্রিয়তার (প্রকৃতি) জানা চাই : *কর্মের* প্রকৃতি খুবই সুগভীর ও দুষ্প্রবেশ্য।'

'*কর্ম* কী তা তোমাকে জানতে হবে', *কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যম্; বোদ্ধব্যং চ বিকর্মণঃ*, '*বিকর্ম* বা অন্যায় কর্ম কী তাও জানতে হবে'; *অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যম্*, 'অকর্ম বা নিষ্ক্রিয়তা কী তাও অবশ্যই জানতে হবে।' 'কর্মের গতি অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ', *গহনা কর্মণো গতিঃ*।

পরলোকগত বিশিষ্ট ব্রিটীশ শিক্ষাবিদ এল্‌, পি. জ্যাকস, তাঁর "*Education of the Whole Man*" (পূর্ণ মানবের শিক্ষা) শীর্ষক গ্রন্থে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এতে *গীতার যোগদর্শনের* প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় :

'কলাকৌশল প্রয়োগে শ্রম বিশ্রামে পরিণত হয়। আবার বিশ্রাম শ্রমে পরিণত হয় যখন বিজ্ঞান তার মূলদেশ পর্যন্ত গিয়ে অনুসন্ধান করে। কারণ কোন দুটি লোকের ক্ষেত্রে বিশ্রামের অর্থ ও মূল্য এক হয় না। তা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে বিশ্রামপ্রাপ্ত মানুষটির প্রকৃতি অনুযায়ী এবং বিশ্রাম-পূর্ব শ্রমের ধরন অনুযায়ী। অলস ধনীর সঙ্গে অলস নির্ধনের দ্বন্দ্বের মতো।

'আজকাল বিশ্রাম লাভ অন্যের দয়ার ওপর নির্ভর করে। মানুষ নিজে তার বিশ্রামের প্রভু নয়, "আপন স্বার্থেই", যেমন তারা বলে থাকে। আজকাল, একজন মানুষ যত বেশি বিশ্রাম ভোগ করে, সে ততই সক্রিয় হয় অন্যের বিশ্রাম নষ্ট করতে, অন্যে আবার তার বিশ্রাম নষ্ট করতে। পরস্পরের বিরক্তি উৎপাদনে আমরা যে সময় কাটাই তাই আমাদের বিশ্রাম।

'এইভাবে, আমাদের বিশ্রাম কালের ব্যবহার নির্ভর করে, অন্যেরা বিশ্রামের সময় কীভাবে ব্যবহার করে—তার ওপর।

'যখন শ্রম কেবল শরীরটাকে ক্লান্ত করে—মনের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে না তাকিয়ে, মানুষ বিশ্রামের বেশিটা কাটায় বাহ্য উত্তেজনার খোঁজে। কারিগরী শিল্প গড়ে ওঠে এই সব উত্তেজনা পরিবেশন করতে। এর অর্থ লোক সংখ্যার একটা বড় অংশের শ্রম। এইভাবে বিশ্রামের সঙ্গে শ্রম জড়িত ...। এই ভাবে একটি সমগ্র গোষ্ঠীতে বিশ্রামের সময় বাড়লে, সেই অনুযায়ী শ্রমের পরিমাণ কমে না। শ্রমের পরিমাণ কমত যদি বিশ্রামের সময়টি নিশ্চিতভাবে কাটান হতো নিদ্রা অথবা নিস্তব্ধ ধ্যানে। কিন্তু আধুনিক সভ্যতায় মানুষকে এভাবে বিশ্রাম যাপনের শিক্ষা দেওয়া হয় না। আমি মনে করি, দৈনন্দিন ঘুমের পরিমাণ যুগে যুগে বড় একটা পরিবর্তিত হয় না, এই ঘুম ছাড়া আধুনিক মানুষের বিশ্রামের বাকি সময়টুকুতে অন্যের শ্রমের ওপর তার চাহিদা খুবই কঠোর ও ভোগ্যপণ্যের উপভোগেও সে খুবই সক্রিয় (পৃঃ, ১২২)।

'সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রামের সময়ও বাড়বে আর সামাজিক সমস্যার ভর-কেন্দ্র তখন সরে যাবে শ্রমের দিক থেকে বিশ্রামের দিকে। একটা সভ্যতার অগ্নি পরীক্ষা নির্ভর করে তার বিশ্রামের সময় কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার নিরিখে। কোন সভ্যতা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে কেবলমাত্র যদি তা আধ্যাত্মিকতাকে জীবনের ভিত্তি ও লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করে।'

আমার মনে আছে, দিল্লীতে ১৯৫০-এর দশকে বন্ধুস্থানীয় অনেকে আমার রবিবারের সান্ধ্য আলোচনা সভায় রামকৃষ্ণ মিশনে উপস্থিত থাকতে আগ্রহী বলে আমাকে জানাতেন। একদিন বাড়ি থেকে তাদের বেরুবার সময় তাদের এক বন্ধুপরিবার অতিথিরূপে বাড়িতে এলেন। এরকম প্রায়ই ঘটছে দেখে তারা মধ্যাহ্ন আহারের পরেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে কোন পার্কে বসে থেকে, সময়মতো মিশনে এসে হাজির হতেন বক্তৃতা শুনতে। এই ঘটনাটি ডঃ এল. পি. জ্যাকসের ঃ 'পরস্পরের বিরক্তি উৎপাদনে আমরা যে সময় কাটাই তাই আমাদের বিশ্রাম'—মন্তব্যের একটি দৃষ্টান্ত।

এই প্রসঙ্গে সাগ্রহে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সহস্রাধিক শ্রোতার মধ্যে পা-মুড়ে ঘাসের ওপর বসে যাঁরা শুনতেন তাঁদের মধ্যে থাকতেন বহু নর-নারী, ছাত্র, কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের কর্মচারিগণ ও প্রতিরক্ষা-কর্মিবৃন্দ এবং বিভিন্ন দেশের কয়েকজন রাজদূতও থাকতেন, যথা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দিল্লীস্থ

রাজদূত মিঃ এলসওয়ার্থ বাঙ্কার ও তাঁর পত্নী। কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী আবার আমাকে বলেছিলেন যে কাজের জন্য বাইরে গেলেও তাঁরা এমনই ব্যবস্থা করতেন যাতে তাঁরা রবিবার দুপুরে বাড়ি ফিরে বিকালে পরিবেশিত গীতার মনের উন্নতি বিধায়ক ও তেজসঞ্চারক ভাবসম্পদ লাভে বঞ্চিত না হন।

'*কর্মের* গতি গূঢ় রহস্যপূর্ণ' গহনা কর্মণো গতিঃ, বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ ১৭শ শ্লোকে। পরবর্তী শ্লোকে তিনি দিচ্ছেন সেই বিখ্যাত বাণী :

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥ ১৮॥

—'যিনি কর্মে অকর্ম ও অকর্মে কর্ম দর্শন করেন, তিনি মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান (জ্ঞানী), তিনি যোগী ও সকল কর্মের কর্তা হন।'

সমগ্র গীতায় এটি একটি অতি উচ্চমার্গের চিন্তা। 'যিনি কর্মে অকর্ম ও অকর্মে কর্ম দর্শন করেন, সেই নর বা নারীই প্রকৃত *যোগী* ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এবং সর্ব কর্মের কর্তা হন।' *কর্মণি অকর্ম যঃ পশ্যেৎ*, 'কর্মে অকর্ম দেখা'। এমন দর্শন কীভাবে সম্ভব হতে পারে? এই বক্তব্য পরস্পর বিরোধী বলে মনে হলেও, সেরূপ নয়; মানবিক অভিজ্ঞতায় এরূপ কর্মে অকর্ম ও অকর্মে কর্ম সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব। *স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু*, 'মনুষ্যগণের মধ্যে সেই লোকই সব থেকে বুদ্ধিমান, *স যুক্তঃ* 'সে যোগী', অর্থাৎ সেই অবস্থা যে অবস্থা আমরা কালে লাভ করব, যখন আমাদের আপন স্বরূপের উপলব্ধি হবে।

এই ভাবটি অতি সুন্দরভাবে প্রতিধ্বনিত হয়েছে চৈনিক চিন্তাধারায়, তাও-মতে, ও আংশিকভাবে কন্‌ফুসিয়াসের চিন্তাধারায়। তারা একে বলে 'না করা কাজ'। এই 'না করা কাজ'ই হলো প্রকৃত কাজ। করা কাজ কাজই নয়। এ হলো কর্তৃত্ব ও আসক্তির প্রশ্ন। এ দুটি যখন সেখানে থাকে না, কাজ আর কাজ থাকে না, তা হয়ে যায় খেলা, হয়ে যায় স্বতঃস্ফূর্ত, হয়ে যায় স্বাভাবিক। এইভাবেই, যখন সেখানে চেষ্টা থাকে, সংগ্রাম করতে হয়, চাপ থাকে, তখনই সেখানে কাজের ভাব আসে। যখন তুমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হবে, তখনই সব রকম চাপ অপসৃত হবে। তুমি কাজ করছ, কিন্তু তোমার অনুভূতি হবে না যে তুমি কাজ করছ। কী সুন্দর একটি ভাব। এমনকি স্বাভাবিক জীবনযাত্রায়, তুমি দেখবে রাত্রে শিশু অসুস্থ, আর তার মা জেগে থেকে শিশুর শরীরের যত্ন

নিচ্ছে। এ কাজে মা একটুও কষ্টবোধ করেন না। এ রকম ভালবাসা যখন থাকে, কেউই কষ্টবোধ করে না। কিন্তু বেতনভোগী কর্মীর একই রকম অভিজ্ঞতা হয় না, কারণ সেখানে কোন স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসা নেই। আধ্যাত্মিকভাব একটু জাগলেই, কাজকে ভার বোঝা বলে বোধ হয় না, কাজ তখন আর *নীরস খাটুনি* থাকে না। আমি এমন একটি কথা ব্যবহার করেছি যা এই আধুনিক যুগে খুবই প্রচলিত। বর্তমানের শিল্পসভ্যতা মানুষকে ক্রমান্বয়ে বেশি বেশি শেখাচ্ছে যে কাজ হলো নীরস খাটুনিমাত্র। আনন্দ খুঁজতে হবে কাজের বাইরে। তাই এত ছুটির ব্যবস্থা। যেমনি শুক্রবার সন্ধ্যা এল, লক্ষ লক্ষ লোক বাইরে ছুটল ছুটি উপভোগ করতে। সপ্তাহের প্রথম পাঁচদিনের সবটাই নীরব খাটুনি; এর বাইরে আনন্দ ভোগ করা চাই। মনে হয় এই হলো আধুনিক তত্ত্ব। বস্তুত বহু পাশ্চাত্য লেখক এ বিষয়ে লিখেছেন। আমি এক ইংরেজের লেখায় এই রকম পড়েছি ঃ

লোকে শুক্রবার বিকালে লন্ডন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে গাড়ি করে, রাস্তায় অনেক গাড়ি কাটাতে কাটাতে যেতে হয়, তুমি ক্রুদ্ধ হও, ঝামেলার সৃষ্টি কর, শেষে সাগরতীরে এসে দেখ সেখানে এতলোক যে তুমি একটু খালি জায়গা পাচ্ছ না, সেখানেও আবার তুমি ক্রুদ্ধ হও; শেষ পর্যন্ত যখন সোমবার সকালে অথবা রবিবার রাত্রে তুমি ফিরলে, তখন শুক্রবার বিকেলে বেরুবার সময় যত পরিশ্রান্ত ছিলে তার থেকে অনেক বেশি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লে। বিশ্বের উন্নত অংশের সর্বত্রই এইরূপ ঘটছে। ভূমধ্যসাগরের তীরে এ অবস্থা প্রচুর লক্ষ্য করা যায়।

ভারতেও এরূপ হবে, কারণ আমরাও আনন্দকে কাজ থেকে নির্বাসিত করছি। কাজকে নীরস খাটুনিরূপে দেখার মতো দৃষ্টিভঙ্গি শ্রীকৃষ্ণ অনুমোদন করেন নি। কাজেও আনন্দ আছে। এক আনন্দ থেকে আর এক আনন্দের দিকে অভিযাত্রায় ব্যাপারটা ঠিক আছে। কিন্তু নীরস খাটুনি থেকে আনন্দে উত্তরণ কখনই হতে পারে না। কাজই আনন্দে পূর্ণ হতে পারে, যদি হৃদয়ে ভালবাসা থাকে, তখন সবই বেশ সুন্দর হয়। যদি হৃদয়ে ভালবাসা থাকে তবে তুমি আরো ভারী মাল বইতে পারবে। এই একটি শিক্ষা আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। দেশ রক্ষার জন্য যাদের হিমালয়স্থ সীমান্তে পাঠান হয়েছে, যদি তাদের জাতির প্রতি ভালবাসার ভাব থাকে, তবে তারা আনন্দের সঙ্গে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করবে। দূরবর্তী কোন জেলার দায়িত্বে নিযুক্ত হলে সরকারি উচ্চপদস্থ

কর্মচারিগণও তেমনি আন্তরিক ভালবাসা দিয়ে জনগণের সেবা করতে পারেন। আসক্ত হয়ে স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে কাজ করলে তোমার দ্বারা মহৎ কাজ সম্পন্ন হওয়ার বা তোমার নিজের স্বচ্ছবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা কম হয়।

কাজের সময় তুমি কেবল কাজই কর না, কাজের মধ্যে তোমার ব্যক্তিত্বেরও অভিব্যক্তি ঘটাও। কাজের মধ্য দিয়ে আপন ব্যক্তিত্বের উন্মাটন এক আশ্চর্য আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা। কাজই যে একটি আধ্যাত্মিক শিক্ষা, গীতায় এই ভাবটিকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। যদি তুমি ছুটির দিনের আনন্দ চাও, তুমি তা পেতে পার—কাজটা নীরস খাটুনি বলে নয়, এক দিন অতিরিক্ত অবসর পাব, একদিন নিভৃতে কাটাতে পারব বলে : এতে কোন ক্ষতি নেই। কাজকে কখনো নীরস খাটুনি বলে মনে করবে না। গীতা তা অনুমোদন করে না। কাজের মধ্যে আনন্দ পাবার চেষ্টা কর। কী সুন্দর ভাব! সরলতম কাজে আনন্দ পেতে পার; কারণ তুমি যে কাজের মধ্যে আধ্যাত্মিক মূল্য আরোপ করতে শিখেছ। কাজ এমনিতে একটি বাহ্য ক্রিয়া মাত্র। কিন্তু আমার মন কৃতকর্মের মূল্য জোগায়। ঐ মূল্য কাজের মধ্যে সঞ্চারিত হলে কাজ হয়ে ওঠে সুন্দর ও বেশ তৃপ্তিদায়ক। কোন স্নায়ুপীড়া নেই। তাই, 'কাজ কর, স্নায়ুচাপ ছাড়া', শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন (৩.৩০) *যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ*, 'জীবন যুদ্ধ চালিয়ে যাও অন্তরের চাপ বা তাপ ছাড়া'; *জ্বর* মানে 'চাপ বা দেহের উত্তাপ'; *বিগত* মানে ছাড়া'। শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় অধ্যায়ে বলেছেন, কাজ কর—কঠোর কাজ, সকলের কল্যাণে। তাই, তিনি বলেছেন (৪.১৮) :

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥

আমেরিকায় প্রকাশিত পরিচালন বিজ্ঞান (management) সম্বন্ধে কিছু গ্রন্থে, যার লেখকদের মধ্যে চৈনিক লেখকও আছেন, সেই চৈনিক লেখকের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানো হয়েছে যে তীব্র অনাসক্তি হলে অতিরিক্ত ভার বহন ও অতিশ্রম করা সম্ভব—কাজ করছি এ বোধ ছাড়াই। এখানে আমি আমার 'দৈব কৃপা' (Divine Grace) বিষয়ে বক্তৃতার অংশবিশেষ তুলে ধরছি; বক্তৃতাটি ভারতীয় বিদ্যাভবন, মুম্বাই-৭, থেকে প্রকাশিত 'পরিবর্তনশীল সমাজের জন্য শাশ্বত মূল্যবোধ (*The Eternal Values for a Changing Society*)' প্রথম খণ্ডে সন্নিবেশিত আছে। সেখানেও একই ভাবে চিন্তা করা হয়েছে।

আর জি. এইচ. সিউ (R.G.H. Siu) নামে M.I.T., U.S.A-এর চৈনিক বিজ্ঞানী তাঁর Tao of Science (বিজ্ঞানের তাও) গ্রন্থের ৭৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ

'বিকেন্দ্রীকরণের জ্ঞানে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশেষজ্ঞ হতে হলে, কার্যনির্বাহকদের তাও-পন্থীদের অকর্ম-বাদের মর্ম বুঝতে হবে।' কার্যসিদ্ধি লাভ করা যায় নৈষ্কর্ম্য কৌশলের মাধ্যমে। এ ভাবটি বোঝান বেশ কঠিন, কারণ দ্রুত বুঝতে গিয়ে অনেকেই ভ্রমবশত নৈষ্কর্ম্যকে অলস জীবনযাপনের সমতুল্য মনে করে। কিন্তু চুয়াঙ্‌-সের এই উদ্ধৃতি থেকে এর ভাবের কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে ঃ

"জ্ঞানার্থীর (লক্ষ্য হলো) প্রতিদিন জ্ঞান আহরণ করা;
তাও-শিষ্যের (লক্ষ্য হলো) প্রতিদিন তা হারিয়ে ফেলা।
দৈনন্দিন হারানোতে,
সে পৌঁছে যায় নৈষ্কর্ম্যতে;
কিছু না করে, সব করা হয়ে যায়।
যারা জগৎ জয় করে, প্রায়শ নৈষ্কর্ম্যই তাদের পথ।
যখন সে বাধ্য হয়ে কিছু কর্ম করে,
জগৎ তখন চলে গেছে, তার জয়ের পারে।"

'মূলত, দার্শনিক পরিচালক নির্দেশ পায় জ্ঞানের সঠিক গতির দ্বারা। অন্তরে, সে আধ্যাত্মিক তিতিক্ষা অনুশীলন করে; বাইরে, সে সমাজ কল্যাণে কর্ম করে। সে নিজের উন্নতি সাধনে অনুসরণ করে প্রাচীন চৈনিক বাক্যকে, "অন্তরে ঋষিবৎ আর বাইরে নৃপতি-বৎ"।' আরো বলেছেন (তদেব, পৃঃ ১৫৭-৫৮) ঃ

'ভারতের গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে কেন্দ্রীয় সরকার পর্যন্ত সকল স্তরের, অন্তত কিছু আইন প্রণেতা ও প্রশাসকও যদি নিজেদের এইভাবে গড়ে তোলে, তবে আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র অভূতপূর্ব ভাবে শক্তিশালী, স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ হয়ে উঠবে।'

এই অনাসক্তি হলো, অহঙ্কার বা ছোট 'আমি'-র প্রতি আসক্তি ত্যাগ, যে 'আমি' প্রজন্মতত্ত্বসূত্রে সদা-স্বার্থপর ভাব দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। আর এই অনাসক্তি অর্জন করা সম্ভব হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ বেদান্ত বা মানব সম্ভাবনা বিজ্ঞান কর্তৃক ঘোষিত সত্যটিকে বুঝতে পারে—যে সত্য বলে প্রত্যেক মানব সত্তাতেই বিরাজমান আছেন সেই চিরশুদ্ধ, চিরমুক্ত পরমাত্মা, যিনি প্রত্যেকটি সত্তারই প্রকৃত স্বরূপ।

অতি উচ্চ অদ্বৈত বেদান্ত-চিন্তা-সমন্বিত একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে। যা *অষ্টাবক্র* গীতা নামে প্রসিদ্ধ। সেখানে আছে (১৮.৬১) ঃ

নিবৃত্তিরপি মূঢ়স্য প্রবৃত্তিরুপজায়তে।
প্রবৃত্তিরপি ধীরস্য নিবৃত্তি ফলভাগিনী॥

এটি একটি চমৎকার শ্লোক। 'বোকা লোকের অকর্ম-ই কর্মে পরিণত হয়; বুদ্ধিমান লোকের কর্ম অকর্মের বা নৈষ্কর্ম্যের ফলভোগ করে।'

আমি যদি বুদ্ধিমান লোক হই, কর্ম করেও আমার বোধ হবে, আমি বিশ্রাম নিচ্ছি। আমি যদি চিন্তাহীন হই, তবে আমি ছুটি নিয়ে ছুটি কাটাতে বেড়াতে গেলেও, আমি চাপে বা উদ্বেগে ভুগতে থাকব; ছুটি আমার কোন উপকারে আসবে না, কারণ মনের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ হয়নি। তাই, ঐ শ্লোকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। *নিবৃত্তিরপি মূঢ়স্য প্রবৃত্তিরুপজায়তে*, 'বোকা লোকের *নিবৃত্তি* বা অকর্ম *প্রবৃত্তি* বা কর্ম হয়ে দাঁড়ায়।' নিবৃত্তির অর্থ হলো কাজ থেকে সরে থাকা; প্রবৃত্তির অর্থ কাজে লেগে পড়া।' *প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি* বিষয়টি শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্য ভূমিকায় দিয়েছেন এবং তা এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় আলোচিত হয়েছে। তাই, বোকা লোকের ক্ষেত্রে *নিবৃত্তি হয়ে* দাঁড়ায় *প্রবৃত্তি*। বুদ্ধিমান লোকের ক্ষেত্রে, *প্রবৃত্তিই* রূপান্তরিত হয় *নিবৃত্তিতে*; কাজে ব্যাপৃত থেকেও সে সম্পূর্ণ অনাসক্ত, যেন সে কোন কাজই করছে না। এই ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে বেদান্ত সাহিত্যের কয়েকটি গ্রন্থে, আবার চৈনিক চিন্তাতেও। সুতরাং এই ভাবটিকে সামনে রেখেই আমাদের কাজে নামতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি সামনে থাকলে, কোন গৃহকর্ত্রী সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে, পরিবারের সকলের ও অভ্যাগতদের দেখভাল করেও সন্ধ্যার সময় সতেজ বোধ করতে পারে। তা যদি সম্ভব হয় তবে তা সত্যই চমৎকার। *গীতা* বলেন—তা সম্ভব। অনেকে ঐ অবস্থা লাভ করেছে। এটি আসে অনাসক্তি বোধ, অন্যের প্রতি ভালবাসা ও কর্তব্য বোধ থেকে। *এই সবের একত্র সমাবেশই হলো জীবনের আধ্যাত্মিক মনোভাব*। অন্যথায় লোকের মন সদাই দোষদৃষ্টিপ্রবণ হয়ে উঠতে পারে। অনেক লোক আছে, যারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সর্বদা অসন্তোষে গজর গজর আর অভিযোগের বিষোদ্গার করতে করতে কাজ করে। এতে কী মজা আছে? ঠিক যেন একটি ষাঁড় গাড়ি টেনে চলেছে। শুধু ভারী বোঝা বয়ে নিয়ে চলেছে। এ জীবনের কি মূল্য আছে? কাজে অবশ্যই আনন্দ চাই, সন্তুষ্টি চাই। আমাকে নিজে তা পেতে হবে। অন্য কেউই তা দান করবে না আমাকে। কাজেতেই

কিছু মহত্ত্ব থাকে না; কর্মীর দৃষ্টিভঙ্গিই কাজকে ভাল বা মন্দরূপে মূল্যায়িত করে। গীতা এই শিক্ষা বার বার দিয়েছেন। দৃষ্টিভঙ্গি যদি ভাল হয়, তবে কাজও ভাল হবে। দৃষ্টিভঙ্গি যদি দোষস্থ হয় তবে কাজও দোষদুষ্ট হবে। অতএব সংযত কর তোমার দৃষ্টিভঙ্গিকে। অতএব তোমার দৃষ্টিভঙ্গিকে নিয়ন্ত্রণ কর, এ শক্তি তোমার রয়েছে।

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ অনাসক্তির কথা বলেছেন, যা গীতার কর্মবিষয়ক শিক্ষার মূল তত্ত্ব। তা হলো—জৈব তন্ত্রকে ঘিরে যে ক্ষুদ্র 'আমি' তা আমার প্রকৃত আত্মা নয়। আমার সত্তা অসীম, আধ্যাত্মিক ভাবে তা অন্য সকল সত্তার সঙ্গে একীভূত, (কারও পৃথক সত্তা নেই) এই জ্ঞানে অবশ্যই ধীরে ধীরে আসতে হবে। তখন তুমি এক প্রচণ্ড অনাসক্তিভাব উপলব্ধি করবে। তোমার ওপর সংসারের যে চাপ তাকে তুমি এই ভাবে সহজ, স্বাভাবিক করে আনতে পার। ঠিক যেমন হয়ে থাকে, দুটি রেল কোচের প্রান্ত দেশে স্প্রিং যুক্ত বাম্পার থাকায় কোচদুটির সংস্পর্শ-জনিত চাপের ক্ষেত্রে। এর ফলে তোমার ঝাঁকি লাগে না, তুমি ধাক্কা বোধ কর না। তেমনি মনের পেছনে প্রচুর শূন্য স্থান রয়েছে। সব সময় সরে যাবার স্থান থাকায় ধাক্কা তোমার কাছে পৌঁছুতে পারে না। আত্মা গভীরতম। তাই তাঁর দিকে কিছুটা অগ্রসর হলে, তোমার বোধ হবে যে তোমার কর্ম-শক্তি বেড়েছে। বেশি শ্রম, কম শ্রান্তি, কম চাপ। এটি সকলের পক্ষে এক মহান শিক্ষা, কারণ আমাদের সকলকেই কাজ করতে হবে—বাঁচার জন্য উপার্জন করতে এবং সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। অতএব এই দর্শন সকলের জন্য, বিশেষত আজকাল, যখন কাজ মানবের উন্নতি ও কল্যাণসাধনের পক্ষে এত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

১৮শ শ্লোকে পরস্পর-বিরোধী মন্তব্য রয়েছে; কিন্তু অনেক ন্যায়-সঙ্গত পরস্পরবিরোধী মন্তব্যের সমাধান পাওয়া যায় দৈনন্দিন জীবনের যুক্তিবিচারে; বাস্তব জীবনে এসব পরস্পর বিরোধ মিটে যায়। তাই, এই বিশেষ মন্তব্য সমর্থন করছে : 'যে লোক কর্মে অকর্ম দেখে ও অকর্মে কর্ম দেখে, সেরূপ নর বা নারী মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, প্রকৃত যোগী ও সর্ব কর্মের অনুষ্ঠাতা'।

বিবেকানন্দ সাহিত্য একবার অধ্যয়ন করার পর, আমরা *গীতা* আরো ভাল করে বুঝতে পারি। আমি এরূপই করেছিলাম এবং তাই আমি দেখেছি এ কথা কত ফলদায়ী।

এই সত্য কথনের পর, মন যখন ঠিক ঠিক সংযত হয়ে থাকে এবং মন

যদি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে থাকে, তবে কাজ করা আর না করা সমান হয়ে দাঁড়ায় এর অর্থ হলো বিশ্রাম। কাজ করতে করতেই তুমি বিশ্রাম পাবে। বর্তমান যুগে নর-নারীর কাছে এ এক প্রগাঢ় অর্থবহ বাণী। বিংশ শতাব্দীতে আমরা শিখেছি সব কাজকে নীরস একঘেয়ে খাটুনির সঙ্গে যুক্ত করে রাখতে, আর কাজের বাইরে তৃপ্তি খুঁজতে; এ এক অশুভ দৃষ্টিভঙ্গি। এ ভাবকে কাটিয়ে উঠতে হবে। কাজের মধ্যেও আনন্দ আছে। যখন তুমি তোমার অন্তর দিয়ে কাজ করবে আর অনুভব করবে এক অনাসক্তি ভাব—ক্ষুদ্র অহংভাবের এলাকা পর্যন্ত, তখন তুমি এর সত্যতাকে আবিষ্কার করবে। কিন্তু কাজ কেবল নীরস খাটুনি মাত্র—এই ভুল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আজকাল লোকে কাজ করতে করতে কর্মকে একঘেয়ে ভাবতে থাকে। কিন্তু একঘেঁয়েমি (Boredom) কথাটি অষ্টাদশ শতাব্দীর Dr. Johnson's English Dictionary-তে পাওয়া যেত না! এই নতুন কথাটিকে আমি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত থাকতে দেখেছি। এমনকি শিশুরাও পিতামাতাকে বলছে, 'মাম্মি একঘেয়ে লাগছে', যদিও চারিদিক উত্তেজনায় ভরা। এই অতি উত্তেজনাপূর্ণ যুগে কোন লোকের কীভাবে একঘেয়ে বোধ আসতে পারে? তার মনে কিছু ত্রুটি থাকতে পারে। একঘেয়েমি (Boring, Boredom) কথা ইংরেজি ভাষায় নতুন। Gerald Heard-এর একটি প্রবন্ধে এই কথাটি পড়ে, আমি এর সত্যতা নিরূপণে ব্যস্ত হই। তাই, চিকাগোতে, Chicago Public Library থেকে Johnson's English Dictionary আনাই। 'B' তালিকায় Boredom কথার নাম গন্ধ নেই। সে সময় লোকে একঘেয়ে ('bored') বোধ করত না! এখন এ কথা সর্বত্র। Boredom, boredom, I am bored, bored—এক ঘেয়েমি, আমি একঘেয়ে বোধ করছি। মানবের অধ্যাত্ম-বোধশূন্যতা এই একঘেয়েমি বোধের মাধ্যমে যত ভালভাবে প্রকটিত হয়, এমন অন্য কিছুর দ্বারা করা যায় না। তবে এ একঘেয়েমি বোধ বৃদ্ধদের জড়োসড়ো হয়ে জীবন কাটানোর ফলে যেমন বোধ হয় তা নয়; তাদের কথা বোঝা যায়; কিন্তু ৮ থেকে ১২ বছরের শিশুরা যদি একঘেয়ে বোধ করে, তবে বুঝতে হবে সমগ্র সভ্যতায় কোথাও ত্রুটি হয়েছে। তাই, *গীতার* এই শিক্ষায়, কাজের মধ্যেই বিশ্রাম লাভের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তুমি এ শিক্ষা নিজ জীবনে পরীক্ষা করে দেখতে পার, এর সত্যকে পরীক্ষা কর, কারণ এগুলি সব মতবাদ নয়—মানব জীবন সম্বন্ধে সত্য—যাঁদের প্রত্যক্ষানুভূতি হয়েছে তাঁদের উক্তি ঃ কর্ম, কঠোর কর্ম করছ, তবু তোমার বিশ্রাম বোধ রয়েছে। কীভাবে তা সম্ভব হতে পারে? নিয়ন্ত্রিত মনের কারণে।

মনকে যদি স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে সে নানা কৌশল করবে; কাজের সময় তুমি একঘেয়েমি বোধ করবে; তোমার বোধ হবে কাজের বাইরেই রয়েছে—সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, আর ছুটির দিনে সদাই এখানে ওখানে ছুটোছুটি করবে। এটা খুবই ভুল দৃষ্টিভঙ্গি। কর্মের মূল খুঁজে বার করলে দেখবে সেখানে অকর্ম রয়েছে। ছুটির দিনের ও অকর্মের মূল খুঁজলে শেষে কর্মই পাওয়া যাবে। এটা Dr. L.P. Jack-এর মন্তব্য, যা পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *গহনা কর্মণো গতিঃ*, '*কর্মের* পথ রহস্যময়'। মনে করা উচিত নয় যে, *কর্ম* কী, *অকর্ম* কী, আর *বিকর্ম* কী—এসব সহজবোধ্য। এ বিষয়টি একটি শ্লোকে, ১৮শ শ্লোকে, বোঝান হয়েছে; সেখানে বলা হয়েছে যে মনের একটি অবস্থা আছে যেখানে কঠোর শ্রমেও তুমি কঠোরতা ভাব বোধ করবে না। তোমার বিশ্রাম বোধ হবে, কারণ তুমি যে তোমার অন্তরস্থ কোন গভীরতর সত্যকে স্পর্শ করেছ। তুমি তো সেই অহং নও, যা সদাই চাপে রয়েছে। শঙ্করাচার্য যেমন বলেছেন বিবেকচূড়ামণিতে (১৪২) ঃ

ভানু-প্রভাসংজনিতাভ্রপঙ্‌ক্তিঃ
ভানুং তিরোধায় বিজৃম্ভতে যথা;
আত্মোদিতাহংকৃতিঃ আত্ম-তত্ত্বং
তথা তিরোধায় বিজৃম্ভতে স্বয়ম্॥

—'যেমন সূর্য কিরণ থেকে উৎপন্ন মেঘখণ্ড সূর্যকে ঢেকে ফেলে নিজেই প্রকাশ পায়, তেমনিই অনন্ত আত্মা থেকে উৎপন্ন অহংকার আত্মাকে ঢেকে ফেলে নিজেকেই আত্মারূপে ঘোষণা করে'।

অহংবোধের দিক থেকে কাজ সর্বৈব চাপে ভরা। কিন্তু অহংবোধের পেছনে রয়েছে এক অনন্ত আধ্যাত্মিক মাত্রা। সেটির সামান্যও উপলব্ধি করতে পারলে, অতিরিক্ত কাজ করলেও তার কঠোরতা অনুভূত হয় না। এমনকি সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকেই তা বোঝা যায় ঃ হৃদয়ে যদি প্রীতি থাকে, কর্মী কঠোরতা অনুভব করে না। যখন সেই প্রীতির অভাব হয়, এমনকি সামান্য কাজও খুব বেশি ভারী বলে মনে হবে। যখনই একটি বিশেষ কারণের প্রতি তোমার প্রীতি জাগবে—তখনই যেমনই হোক তা তুমি করতে পারবে; এক ব্যক্তি তার প্রিয়জনের জন্য একটি ভারী বোঝা বইছে। বোঝাটি তার কাছে ভারী বলে বোধ হচ্ছে না; কারণ বোঝাটি যথার্থই ভারী হলেও প্রিয়জনের প্রতি প্রীতিই সেই বোঝার ভারকে লাঘব করে দেয়। তার ভারের অনুভূতি থাকে না, কারণ

তার মন অবস্থার রূপান্তর ঘটিয়েছে। মানবজীবনে শত শত দৃষ্টান্ত আছে যেখানে এই সত্যের যথার্থতা অনেকের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। অন্যেরাও তা যাচিয়ে দেখতে পারে; তাই, এখানে শিক্ষা হলো ঃ কঠোর পরিশ্রম কর, কিন্তু উদারতর ভালবাসার ওপর প্রতিষ্ঠিত অনাসক্তিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে। তোমার পৃথক ছুটির দিনও আর দরকার হবে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ বর্তমান সভ্যতার মানবকুলকে এই নিগূঢ় বাণী দিচ্ছেন ঃ কাজ কর, বিশ্রামও নাও, কিন্তু কাজকে নীরস খাটুনি বলে মনে করবে না। আর কর্মজগতের বাইরে কোন বিশ্রামের খোঁজ করবে না। এই পদ্ধতিতে আমাদের গতি হবে—নীরস খাটুনি থেকে আনন্দে নয়, আনন্দ থেকে আনন্দে উত্তরণের পথে; মানব জীবন এইভাবেই চলা উচিত। তাই ১৮শ শ্লোকে ও পরবর্তী আরো কয়েকটি শ্লোকে, এই ভাবগুলি অভিব্যক্ত হয়েছে। এর মধ্যে কতকগুলি অতি উচ্চ স্তরে উন্নীত আধ্যাত্মিক মনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সাধারণ লোক এর যতটুকু বুঝবে, ততটুকুই নেবে। কিন্তু মূল শিক্ষা ওতেই আছে। তোমার মনে হতে পারে যে, কিছু শ্লোক তোমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; তা ঠিক। তোমার ক্ষেত্রে এগুলি আংশিকভাবে প্রযোজ্য, কিন্তু অন্যের ক্ষেত্রে, যারা বেশি আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করেছে তাদের ক্ষেত্রে এগুলি পুরাপুরি প্রযোজ্য।

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯॥

—'যার সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টা *কাম*, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভোগ বাসনা ও *সঙ্কল্প* অর্থাৎ কর্মফল *স্পৃহাশূন্য* এবং যার সমস্ত কর্ম জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তাকে ঋষিগণ পণ্ডিত বলে থাকেন।'

তম্ আহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ, 'বোধশক্তিসম্পন্ন লোকে এমন ব্যক্তিকে *পণ্ডিত* বলে থাকে; তারা যথার্থই আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন।' কীরকম লোক তারা; *যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ*, 'যাদের কর্মপ্রচেষ্টা সকল কোনরূপ ইন্দ্রিয়ভোগ বাসনা বর্জিত এবং কর্মফলে স্পৃহার প্ররোচনা শূন্য।' 'আমাকে এইটি পেতে হবে' এরূপ দৃষ্টিভঙ্গিই কাম সঙ্কল্প। তাদের কর্ম প্রচেষ্টার পেছনে ঐটি থাকে না। সে ক্ষেত্রে কী ঘটে থাকে? *জ্ঞানাগ্নি দগ্ধ কর্মাণম্*, 'তাদের সমস্ত কর্ম ও কর্মপ্রচেষ্টা সকল *জ্ঞানের* আগুনে পুড়ে যায়', জ্ঞানের আগুন বলতে 'আত্মজ্ঞানের, আমিই আত্মা, আমিই শুদ্ধ আত্মা' এই বোধের আগুন। সেই আগুনে ঐ ব্যক্তি এই সব কর্মকে পুড়িয়ে ফেলে। এরূপ ব্যক্তিকেই, জ্ঞানবান

লোকে *পণ্ডিত* বলে আখ্যা দেয়। সংস্কৃত ভাষায় *পণ্ডিত* একটি মহান শব্দ, যদিও আজকাল এর অর্থ খুবই সাধারণ। উত্তর ভারতে পাচককে পণ্ডিত বলা হয়। বর্তমানে *পণ্ডিতের* স্বভাব এমনই হয়েছে। এখানে শঙ্করাচার্য '*পণ্ডা*' শব্দের অর্থ করেছেন *আত্মবিষয়া বুদ্ধিঃ,* 'যে *বুদ্ধি* আত্মাভিমুখী, সেইরকম বুদ্ধিকেই *পণ্ডা* বলা হয়? যার ঐরূপ *পণ্ডা* বা *বুদ্ধি* আছে তাকেই *পণ্ডিত* বলা হয়। *গীতায়* পণ্ডিতের দু-তিনটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে; একটি এখানে। অন্যটি হলো ঃ 'যিনি একই আত্মাকে শুদ্ধ ব্যক্তিতে, সাধারণ মানব সত্তায়, গাভীতে, কুকুরে, প্রত্যেক জিনিসে দেখে থাকেন, তিনিই *পণ্ডিত*। ৫.১৮ শ্লোকে বলা হয়েছে *পণ্ডিতায় সমদর্শনঃ*। পণ্ডিতগণ সমদর্শী হয়ে থাকেন। তাঁর দৃষ্টিতে উচ্চ নীচ ভেদ নেই; ঐ লোক উঁচু আর এই লোক নীচু এ বোধ তাঁর নেই। এরকম দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর নয়, কেবল দেখেন—একই আত্মা সর্বভূতে রয়েছেন। এইটিই আবার পণ্ডিত শব্দের সংজ্ঞা। এর পর আসছে ২০শ শ্লোক।

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২০॥

—'কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করে, সদাতৃপ্ত থেকে, কোন কিছু অবলম্বন না করে, কর্মে নিযুক্ত থেকেও তিনি প্রকৃত পক্ষে কোন কাজ করে না।'

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গম্, 'কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করে'; *কর্ম ফল, আসঙ্গ* ঃ *আসঙ্গ* হলো আসক্তি, *ফল* হলো পরিণাম, *কর্ম* হলো কাজ। নিত্য তৃপ্ত, 'মন সর্বদা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট'। *নিরাশ্রয়ঃ* 'সম্পূর্ণ মুক্ত' কোন কিছুর ওপর নির্ভরশীল নয়; *আশ্রয়* বলতে বোঝায়—নির্ভরতা। *কর্মণি অভিপ্রবৃত্তোঽপি,* 'যদিও কাজে নিযুক্ত'। *নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ,* 'তিনি কিছুই করেন না'। সেই ব্যক্তিই জীবনকে ভোগ করে থাকে, ছুটি উপভোগ করার মতো। কঠোর পরিশ্রম, অথচ ছুটি উপভোগ করে। Holiday in Work কাজের মধ্যেই ছুটি। সেটা এক মহান ভাব। এ জীবনে অন্তত এর সামান্যও আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। এর উচ্চতম স্তরে আমরা কেবল তখনই পৌঁছতে পারব যখন সেই অনন্ত আত্মার উপলব্ধি আমাদের হবে। কিন্তু এর সামান্যও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের সকলের পক্ষে কল্যাণপ্রদ। অন্য ব্যক্তি, যার মন ঠিক মতো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়—সদা হৈচৈ, ব্যস্তবাগীশ, অযথা লাফালাফি, চিৎকার-চেঁচামেচি করে সারা জগৎকে সে একথাই বোঝাতে চায় যে সে যেন এক জগৎ-আলোড়নকারী কাজে ব্যস্ত, সে বস্তুত নিজের মনঃশক্তিরই অপচয় করে। এর

ফল অতি সামান্যই। এই মহৎ শিক্ষা আমাদের জনগণের নেওয়া উচিত। নীরব কাজ ফলপ্রসূ হয়। হৈচৈপূর্ণ কাজ আকাঙ্ক্ষিত ফল দেয় না। এতে হয় আবেগ শক্তির প্রভূত অপচয়, আর এটা ওটা নিয়ে হৈচৈ; কর্মের প্রতি বাংলায় যাকে বলে *সর্বনাশা* দৃষ্টিভঙ্গি; কাজ করতে করতে কিছু ভুল হলে—তাকেই একটা বৃহৎ ব্যাপার করে তোলা : *সর্বনাশ,* 'সব নষ্ট হয়ে গেল'—গ্রীক পুরাণে ক্যাসান্ড্রা (Cassandra) যেমন ট্রয়ের যুদ্ধে বলেছিল 'আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল'। আমাদের মধ্যেও ক্যাসান্ড্রার মতো লোক আছে; তারা তিলমাত্র ভুলকে তাল করে দেখায়। যাদের মন আধ্যাত্মিক ভাবে নিয়ন্ত্রিত, তারা হৈচৈ না করে অনেক বেশি কাজ করে। তাড়াহুড়ো করে কাজ করলে তাতে কাজ ফলপ্রসূ হয় না। এ সত্যটি আমাদের বুঝতে হবে। সমাজে কাজ করার সময় দেখা যায়, কিছুলোক সর্বদা হৈচৈ করছে, যেন সে কোন বড় কাজ করছে। আসলে তারা কেবল বিরক্তিকর পরিস্থিতিরই সৃষ্টি করে। এই পর্যন্তই। শান্ত, নীরব ও ধীরভাবে কাজই আমরা বর্তমানে চাই, কেবল কথা বা চিৎকারের কোন প্রয়োজন নেই।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের কিছু কথার এখানে উদ্ধৃতি দেব। দিল্লীতে অনেকগুলি ব্যস্তবাগীশ দল সমাজজীবনের সঙ্গে জড়িত ছিল। তারা চায় এখানে সেখানে কোন কিছু অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা করতে এবং দেখায় যেন সব সময়ে তারা ঐ নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, তাদের কাজের মাত্রা কিন্তু খুব অল্পই। তারা কিছু নাম চায়, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছবি তুলতে চায়। এই ব্যাপারেই, ডঃ রাধাকৃষ্ণন সে সময় বলেন, 'আধুনিক পুরুষেরা, বিশেষত আধুনিক মেয়েরা ধর্মে বা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। তারা বিশ্বাস করে লোককল্যাণে কিছু কাজ করে বেড়ানোয়। কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, *এতে লোক কল্যাণের থেকে ঘুরে বেড়ানটাই বেশি করা হচ্ছে'*। এরকম লোক সারা পৃথিবীতেই আছে। লোককল্যাণের থেকে ঘুরে বেড়ানোটাই তাদের বেশি। বেশি হৈচৈ করে নিজ উপস্থিতিটা জানান দেয়—এই ধরনের লোক সমাজ জীবনে, প্রতিষ্ঠানে, রাজনীতিক দলে; সর্বত্রই রয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, এই শিক্ষাগুলিকে খুবই মূল্যবান হতে দেখা যায়, এর দ্বারা সমগ্র জাতিকে মহান কর্মী-গোষ্ঠীতে, সাহসী কর্মী দলে রূপান্তরিত করা যায়।

কোন সময়ে এক স্মরণিকার বিজ্ঞাপনে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী থেকে

একটি ছত্র নজরে পড়ায় আমি স্বামী বিবেকানন্দের *Complete Works, vol. 7*, p 168 দেখলাম। সেই উদ্ধৃতিটি শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্য স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ সম্বন্ধে। সে ১৮৯৯-১৯০০ খ্রিস্টাব্দের কথা। তিনি তখন উদ্বোধন নামে বাংলা পত্রিকাখানি চালাচ্ছিলেন আবার শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সেবাও করতেন; তাঁকে পত্রিকার মুদ্রণ, বিতরণ, এমনকি মুদ্রণ সংক্রান্ত সব কাজ করতে হতো। পরে তিনি সানফ্রান্সিসকোস্থ বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষরূপে কয়েক বছর কাজ করেছিলেন এবং সেখানেই দেহরক্ষা করেন। একদিন, এক শিষ্য বিবেকানন্দের কাছে ত্রিগুণাতীতানন্দের প্রশংসায় বলেন[১] ঃ

"শিষ্য ঃ মহাশয়, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ (মহারাজ) এই পত্রিকার (উদ্বোধন) জন্য যেরূপ পরিশ্রম করছেন, তা অন্যের পক্ষে অসম্ভব।

স্বামীজী ঃ তুই বুঝি মনে করছিস, ঠাকুরের এসব সন্ন্যাসী সন্তানেরা কেবল গাছতলায় ধুনি জ্বেলে বসে থাকতে জন্মেছে? এদের যে যখন কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে, তখন তার উদ্যম দেখে লোকে অবাক হবে। এদের কাছে কাজ কি করে করতে হয়, তা শেখ।"

এদেশের ভবিষ্যৎ কথন প্রসঙ্গে ঐটি একটি মহাপ্রেরণাদায়ী উক্তি। বর্তমানে আমরা তেমন নই। কাজে আমাদের যোগ্যতার খুবই অভাব, আমরা কাজের থেকে কথায় বেশি শক্তি ব্যয় করে থাকি, কিন্তু তার পরিবর্তন হবে। এক নতুন দর্শন আসছে। তাই *কর্ম-যোগের* এই অর্থবিশ্লেষণ, আর অকর্মে কর্ম ও কর্মে অকর্ম দর্শন সম্বন্ধে এই নতুন শিক্ষা—এবার কাজে লাগান হবে। ভারতীয় সমাজ থেকে অনেক বেশি কর্মবীরের উদ্ভব হবে। অন্য দেশেও ভাল কর্মী আছে, যদিও তাদের প্রয়োজন আরও কিছুটা দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক গভীরতা। কিন্তু আমাদের দেশের দরকার—কীভাবে *ভাল* কাজ, যৌথভাবে কাজ করা যায় তা শিক্ষা করা, সামান্যতম নিমিত্ত থেকে কীভাবে প্রভূত ফল উৎপাদন করা যায়, তার প্রশিক্ষণ লাভ করা।

দিল্লী মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের কমিশনার যখন আমাকে একটি সাধারণ সভায় *The Role of Local Self-Government Institutions in Our Democracy*, 'আমাদের গণতন্ত্রে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা'—বিষয়ে বলার জন্য অনুরোধ করেন, তখন তিনি বলেছিলেন তাঁর ১,২৫,০০০ কর্মচারীর মধ্যে অতি অল্পই কাজ করে থাকে, তাই প্রসঙ্গত আমাকে

১ বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৯ খণ্ড, পৃঃ ১৭৪

উল্লেখ করতে হয় : কেন এইসব গ্রাম পঞ্চায়েৎ ও শহরের পৌরসংস্থাতে ঠিক মতো কাজ হয় না; কারণ কর্মচারীরা কেউই কাজ করে না, আর সভ্যগণ পৌরসমিতিগুলোতে কেবল কথাই বলেন; কেউই নাগরিকদের সমস্যার সমাধানের জন্য যত্ন নেন না। এ বিষয়ে তাদের কার্যকরী চিন্তা ও ব্যবস্থার অভাব। আমাদের পঞ্চায়েতগুলি অনেক উন্নতি করতে পারত, কিন্তু এটা সেটা কথা বলে, আর স্বার্থসিদ্ধির জন্য কিছু কাজ করিয়ে নেয়—তা হয় না; ফলে পঞ্চায়েত কাজের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এইরকম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একটি জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান কিভাবে দক্ষতার সঙ্গে চালান সম্ভব হতে পারে? সভ্যদের অবশ্যই মানব-কল্যাণমুখী হতে হবে, কার্যসূচীতে সন্নিবেশিত মানব কল্যাণমুখী সমস্যাগুলিকে এক একটি করে ধরে—আলোচনা করতে হবে, তার সমাধানের উপায় খুঁজতে। এখানে রাস্তা চাই, ওখানে জলের কল চাই, এখানে রাস্তার আলো চাই, সাধারণের জন্য শৌচাগার চাই। এগুলির ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হও, কথায় নয়—কাজগুলিকে করিয়ে নিয়ে; পরস্পরের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে। আলোচনা শেষ করে কাজ আরম্ভ কর। এর পরিবর্তে আমরা বক্তৃতাই দিতে থাকি। ভারতের একটি বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উপাচার্য আমাকে বলেছিলেন : 'আমাদের দশ-বারটি দফার কার্যসূচী থাকে; সিনেটের একটি সভায় চারঘণ্টা পরেও এর অর্ধেকও আলোচিত হয় না! সকলেই যে সব সময়ে বক্তৃতা দিতে চান'। তিনি কথাগুলি আমাকে আক্ষরিক অর্থেই বলেছিলেন। তাই বলা চলে যে এটি আমাদের জাতীয় চরিত্র—যা গড়ে উঠেছে আমাদের হাজার বছরের দাসত্বকালে। এখন আমরা মুক্ত। এখনো কেন আমরা এভাবে চলেছি? আমাদের পঞ্চায়েতগুলি জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম-চঞ্চল কেন্দ্র হয়ে উঠবে, যখন সভ্যগণ গড়ে তুলবেন আপন আপন চরিত্র, কর্ম-দক্ষতা ও দেশপ্রেম। পঞ্চায়েত এক ঘণ্টায় অনেকগুলি সমস্যার সমাধান করতে পারেন, তারপর তাঁরা এগিয়ে গিয়ে সেগুলিকে কাজে রূপায়িত করুন। এইভাবে আমাদের কাজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে। এতদিন আমাদের যা ছিল তা দাস-জাতির পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু স্বাধীন জাতির কর্মপদ্ধতি তো অন্য রকম; তাদের কর্ম-সামর্থ্য রয়েছে, জোট বেঁধে কাজও তারা করতে পারে। জোট বেঁধে কাজ না করলে কোন বড় কাজ করা যায় না। দশজনের হাত ও মাথাকে অবশ্যই একত্রিত করে আমাদের কাজে লাগাতে হবে, তবে আমরা কাজগুলি সম্পূর্ণ করতে পারব।

এই পঞ্চায়েত রাজ এখন ভারতীয় চিন্তাকাশকে প্রভাবিত করছে—তাই,

আমি আশা করছি, পঞ্চায়েতরাজের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গে যদি জনগণের চরিত্রেরও আবশ্যিক উন্নতি সাধিত হয়, তবে আমাদের জাতি স্বল্পকালের মধ্যেই মহান সফলতা অর্জন করতে পারবে। তাই *গীতার* এই শিক্ষা, যেন প্রয়োগমুখী হয়, দৈনন্দিন জীবনে ও কাজে বাস্তবিকভাবে পরীক্ষিত হয় এই উদ্দেশ্যেই এই শিক্ষার প্রবর্তন। তাই, *কর্মণি অভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ*, 'কাজে ভালভাবে নিযুক্ত থেকেও, সে বিশ্রাম উপভোগ করে।' জনগণের সেবায় কাজ করা কতই না আনন্দের বিষয়! তাতেই আমাদের সমস্যাগুলির একে একে সমাধান হবে। গ্রামগুলি ভাল রাস্তা, রাস্তায় আলো, সুস্থ পরিবেশ, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও শিক্ষাব্যবস্থা পেয়ে ঝলমল করে উঠবে, আর লোকে পরস্পর সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে বসবাস করবে, পরস্পরে মামলা করতে এখনকার মতো—যখন তখন আদালতে ছুটবে না। কী চমৎকার পরিবর্তনই না হবে! সারা দেশ স্বর্গে পরিণত হবে। ভারতে এই স্বর্গই আমাদের সৃষ্টি করতে হবে, মরণের পর স্বর্গে যাবার উদ্দেশ্যে পুরোহিতের কাছ থেকে একখানি টিকিট সংগ্রহ করার জন্য অপেক্ষা না করে। ভারতে এখনো পর্যন্ত ধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি তার বেশির ভাগটাই এরকম। শ্রীকৃষ্ণ ভারতের ও ভারতেতর দেশের সমগ্র মানবজাতিকে আহ্বান করছেন (গীতার) এই মহান কর্মযজ্ঞে, একাদশ অধ্যায়ের ৩৩তম শ্লোকে ঃ

তস্মাৎ ত্বম্ উত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব।
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্॥

—'অতএব, হে অর্জুন, ওঠ, যশোলাভ কর এবং শত্রু জয় করে জাতীয় সমৃদ্ধি ভোগ কর।'

সমগ্র জাতিকে আহ্বান করে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'সকলে উঠে দাঁড়াও'। *উত্তিষ্ঠ, যশো লভস্ব,* 'মানবের প্রাপ্য গৌরব অর্জন কর'। তোমার সমস্যার সমাধান করলেই, কেবল, তুমি তোমার গৌরবের অধিকারী হবে; অন্যথায়, তোমার কোন গৌরব নেই। কীভাবে? *জিত্বা শত্রূন্,* 'শত্রুদের পরাজিত করে' ঃ আলস্য, মানবজাতির প্রতি উদাসীনতা, দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, পিছিয়ে পড়া ভাব, নিরক্ষরতা, এই সবই হলো তোমার শত্রু। এগুলিকে অতিক্রম কর! অর্জুনের সামনে ছিল সশস্ত্র যুদ্ধ, আমাদের লোকেদের সামনে রয়েছে এইরকম যুদ্ধ! আর তারপর, *ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যম্ সমৃদ্ধম্* 'জীবন উপভোগ কর এই সমৃদ্ধিশালী সু-উন্নত দেশ থেকে'। তারপরই কেবল তুমি বুঝতে পারবে প্রকৃত

ভৌতবিজ্ঞানের ও প্রকৃত ধর্ম-বিজ্ঞানের অর্থ কী। এই বাণী আমরা পাব একাদশ অধ্যায়ে—অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের *বিশ্ব-রূপ* বা বিশ্বব্যাপ্ত রূপ দেখানোর পর।

এই ভাবগুলি মহান। এই ভাবগুলি যদি কেবল উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর লোকেদের অনুপ্রাণিত করে এবং গ্রামাঞ্চলের লোকেদের মধ্যে অনুস্যূত হয়, তবে কী বৈপ্লবিক পরিবর্তনই না আসবে! হাজার হোক, মানবজাতিকে শিক্ষা দেওয়া চলে। নতুন ভাবসম্পদের দ্বারা মানবজাতির চরিত্রের পরিবর্তন আনতে পারে, মন্দ থেকে ভালর দিকে। আমাদের জনগণের চাই নতুন নতুন ভাবসমূহ। তারা বংশানুক্রমে যে সব পুরাতন, সামন্ততান্ত্রিক ভাব পেয়েছে তাই নিয়ে তারা বেঁচে আছে। প্রথমেই তারা আত্মপ্রত্যয় হারিয়েছে। 'আমরা কী করতে পারি? আমরা তো সাধারণ লোক'। কে সাধারণ? প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী সাধারণ বা অসাধারণ হয়ে থাকে। এই হলো বেদান্তের শিক্ষা, আর আমাদের জনগণকে তা শিখতে হবে। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখ। তা হলে তুমি আশ্চর্য আশ্চর্য কাজ করতে পারবে। জাতির উন্নতি করতে হলে, আমাদের জনগণকে এ শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে—ধীরে ধীরে, দৃঢ়তার সঙ্গে *গীতার* প্রতিটি কথার লক্ষ্য হলো জনগণকে ভাল থেকে আরো ভাল করে তোলা। সভ্যতাকে সমৃদ্ধতর এবং পবিত্রতর করা; সে সভ্যতা প্রাচ্যই হোক আর পাশ্চাত্যই হোক। তাই শ্রীকৃষ্ণ একই সুরে (ভাব অবলম্বনে) বলে চলেছেন ঃ

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ২১ ॥

—'অতিরিক্ত বাসনা শূন্য, সংযত দেহ-মনা সবরকম ভোগ্যবস্তু ত্যাগী ব্যক্তি কেবল শরীর উপযোগী কর্মমাত্র করেন বলে, পাপ-পুণ্যরূপ কোন কর্মফলের ভাগী হন না।'

নিরাশীঃ, 'অতিরিক্ত প্রত্যাশাশূন্য', 'আমি এটা চাই, আমি ওটা চাই', সদাই মনে মনে সৌধনির্মাণ করছি; এরূপ মনোভাব থেকে মুক্ত মন অনেক বেশি স্থির হয়; *যতচিত্তাত্মা*, 'যার মন সু-সংযত', *ত্যক্ত সর্ব পরিগ্রহঃ*, 'এটা ওটা গ্রহণেচ্ছাশূন্যমনা'। আজকাল এই গ্রহণেচ্ছা অতি প্রবল, তাই ভ্রষ্টাচাররূপে এত চুরি ও এত ডাকাতি। আত্মমর্যাদা এতই অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেছে। তাই, *ত্যক্ত সর্ব পরিগ্রহঃ* 'আমাকে এটা পেতে হবে, ওটা পেতে হবে' এরূপ মনোভাব ত্যাগ করে।' কার্যত বস্তু ত্যাগ নয় কেবল 'বস্তুর অধিকারিত্ব—তজ্জনিত মানসিক গর্ব' ত্যাগ। *শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্*, 'যদি সে শরীর দ্বারা কাজ

করে'; *ন আপ্নোতি কিল্বিষম্*, 'তার কোনরূপ পাপ হয় না'। এরপর আসছে, আরো উচ্চতর আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভজনিত অবস্থার কথা।

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২॥

—'অনায়াসলব্ধ বস্তুতে ব্যক্তিগত ভাবে সন্তুষ্ট, শীতোষ্ণাদি বিপরীত অবস্থায় অপ্রভাবিত, ঈর্ষাহীন, লাভালাভে সমচিত্ত ব্যক্তি শরীর ধারণোপযোগী কর্ম করেও তাতে বদ্ধ হন না।'

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো, 'দৈবক্রমে যা আসে ব্যক্তিগতভাবে তাতেই সন্তুষ্ট,' কখনো কোন বস্তুর পেছনে ধাবমান হয় না। উচ্চ স্তরের আধ্যাত্মিক উন্নতিতেই এরূপ হয়ে থাকে। প্রথম প্রথম আমরা এরূপ করতে পারি না; কিন্তু বিষয়টিকে সর্বদা লক্ষ্যের মধ্যে রাখতে পারি। ঐ স্তর আছে। ১৮ বা ২০ বছর বয়সের বালক বা বালিকারা বুঝতে পারবে না, তাদের এই শিক্ষাটির বিষয়ে উদ্বিগ্ন হবারও প্রয়োজন নেই। প্রত্যেকেরই ঐ অবস্থায় পৌঁছবার সম্ভাবনা আছে। আমি এখন ঐ অবস্থাটি লাভ করতে নাও পারি। কিন্তু, আমি বিষয়টিকে লক্ষ্যপথে রাখব। এই স্তরে ঐ পর্যন্তই আমাদের করণীয়। *যদৃচ্ছা*, 'দৈবক্রমে; *লাভ*, 'ফললাভ'; *সন্তুষ্টো*, 'এতেই পরিতৃপ্ত'। আমি কখনো এর পেছনে ছুটি নি, এটি আমার কাছে এসেছে—এই রকম পরিস্থিতি। আমি এমন লোক দেখেছি যারা অফিসে পদোন্নতির জন্য চেষ্টা করে না। তাদের মনোভাব হলো, আমার যা প্রাপ্য তা আমার কাছে আসবে। এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম; আর তারা তাদের যা প্রাপ্য, তা পেয়েছেও, যদিও বর্তমানে আমাদের সমাজে কোন ব্যাপারই ততটা ভাল নয়। ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত সমাজে যার যা প্রাপ্য সে ঠিক তা পেয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের সমাজ ন্যায়ের পথে চলে না। সমাজে এখন অন্যায়ের প্রাদুর্ভাব খুবই বেশি; বহু চেষ্টা করেও ন্যায্য প্রাপ্য পাওয়া যায় না। আমি আমার কাজ ভালভাবেই করে যাব, আমার যা প্রাপ্য আমি তা পেয়ে যাব। এ অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক মনোভাব। যে সমাজে ন্যায় বিচারের অত্যন্ত অভাব, সেখানে শান্তি নেই। সেখানে সদাই একটা মানসিক চাপ। কিন্তু ন্যায়নীতিবর্জিত সমাজ *আমরাই* সৃষ্টি করেছি। এর পরিবর্তন *আমাদেরই* করতে হবে, এ আমাদের জাতীয় দায়িত্ব। অন্য কেউ এ সমাজের পরিবর্তন সাধন করতে যাবে না। কীভাবে একে আরো বেশি ন্যায়ভিত্তিক করা যাবে? ভারতে এটিই হলো মহান কর্ম। আমাদের বর্তমান সমাজে, আইন ও ন্যায় প্রায়ই

সমতালে চলে না। আইন চলে এক দিকে, ন্যায় অন্য দিকে। সেই সমাজকেই সুষ্ঠুতম বলা চলে, যেখানে আইন ও ন্যায় সমতালে চলে। কী সুন্দর ভাব! যদি আইন-প্রয়োগকারী সংস্থার মধ্যে অনাসক্তি ভাব থাকে তবে ঐ ভাব বাস্তবে পরিণত হয়। যদি অনাসক্তিভাব না থাকে, যদি সেখানে বিষয়বুদ্ধি, স্বার্থপরতা বিরাজ করতে থাকে, তবে সব কিছুই অন্যায় ভাবে চলে। সে সমাজে কেউই সুখী হয় না। আমরা চলেছি এক অতি কঠিন সৃষ্টি-তৎপরতার যুগের ভেতর দিয়ে, যেখানে এত মন্দের প্রাদুর্ভাব; তবে সেখানে কিছু ভালও আছে। ভালকে বাড়াতে ও মন্দকে কমাতে হবে। তোমাকে আমাকেই তা করতে হবে। সামাজিক কল্যাণ সাধনের এইরকম দায়ভাগ গ্রহণেচ্ছু মানুষ আমাদের কোটি কোটি লোকের ভেতর থেকে অবশ্যই বেরিয়ে আসবে।

ভর্তৃহরির নীতিশতকের এই শ্লোকটি স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় ছিল এবং তিনি তা প্রায়ই উল্লেখ করতেন ঃ

নিন্দন্তু নীতিনিপুণাঃ যদি বা স্তুবন্তু
লক্ষ্মী সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা
ন্যায়াৎ পথাৎ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ॥

তিনি প্রশ্ন করলেন, *ধীর* ব্যক্তির লক্ষণ কী? *ধীর* বলতে এক বুদ্ধিমান বীর্যবান মন বোঝায়। তাই সংস্কৃত ভাষায় *ধীর* একটি মহান শব্দ। ঐ *ধীর* ব্যক্তির স্বভাব কেমন? *নিন্দন্তু নীতি নিপুণাঃ যদি বা স্তুবন্তু* 'নীতিজ্ঞানসম্পন্ন লোকে নিন্দাই করুক বা প্রশংসাই করুক'; *লক্ষ্মী সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্* 'সৌভাগ্য এখনই আসুক বা তাঁর ইচ্ছামতো যেখানে সেখানে চলে যান'; *অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা,* 'মরণ এখনই আসুক বা বহু বছর পরেই আসুক'; *ন্যায়াৎ পথাৎ প্রবিচলন্তি পদম্ ন ধীরাঃ,* 'ধীর ব্যক্তি *ন্যায্য,* সত্য, ন্যায্যতার পথ থেকে এক পাও নড়েন না'। সমাজে এইরকম মন অবশ্যই বৃদ্ধি পাক। এই হলো *ধীর* কথার অর্থ। কী আশ্চর্যজনক পরিবর্তনই না তার দ্বারা সাধিত হতে পারে! এইরকম মনকে ন্যায়পরায়ণতার পথ থেকে, ন্যায়ের পথ থেকে কোন কিছুই নড়াতে পারে না।

আর তাই *দ্বন্দ্বাতীতো,* ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ দ্বৈতভাবই *দ্বন্দ্ব,* এরা সর্বদা এক সঙ্গে চলে। এর একটি পেলে অন্যটিও পাবে, *দ্বন্দ্বাতীত,* 'এই দ্বৈতভাব থেকে

মুক্ত'। *বিমৎসরঃ,* 'সব রকম ঈর্ষা, ঘৃণা থেকে মুক্ত', সব রকম হিংসোদ্দীপক চিন্তা থেকে মুক্ত; *সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ,* 'কাজে কৃতকার্যই হোন বা অকৃতকার্য হোন, তাঁর সমভাব, শান্তভাব একই রকম থাকে; *কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে,* 'তিনি কাজ করলেও, কর্মফলে মোটেই আবদ্ধ হন না।' মানবিক বিকাশের এটি অতি উচ্চ অবস্থা। তারপর আসছে, এই অধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শ্লোক—২৩তম শ্লোক ঃ

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩॥

—'অনাসক্ত, মুক্ত, আধ্যাত্মিক জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত চিত্ত, একমাত্র যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্যই কর্মে নিরত—এরূপ ব্যক্তির সমগ্র কর্ম অর্থাৎ কর্মফল, লয়প্রাপ্ত হয়—কর্মীকে আবদ্ধ করে না।'

গত সঙ্গস্য, 'যার *সঙ্গ* বা আসক্তি গত হয়েছে, দূরীভূত হয়েছে'। আসক্তি-ভাব লয় পেয়েছে। অতএব, *মুক্তস্য,* 'সে মুক্ত হয়েছে', এখানে এখনই কাজের মধ্যেই। *জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ,* 'যার মন বা চিত্ত বা বুদ্ধি আধ্যাত্মিক জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত'। অতি সুন্দর এই ভাবটি!—মন *জ্ঞানে* প্রতিষ্ঠিত। তারপর *যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম,* 'যা কিছু কর্ম করা হয়—তা করা হয় যজ্ঞভাবে, ঈশ্বরোদ্দেশে ত্যাগের ভাবে, উৎসর্গের ভাবে।' *সমগ্রম্ প্রবিলীয়তে,* 'একেবারে সবটাই লয়প্রাপ্ত হয়'। এমন নয় যে কর্মীকে সবটাই করতে হবে, নচেৎ কিছু করতে হবে না; না, কর্মীকে চেষ্টা করতে হবে এর একটুও অন্তত পাবার জন্য। *প্রবিলীয়তে,* 'লয় পেয়ে যায়'; *সমগ্রম্,* 'সম্পূর্ণ, সব'। কোন কর্মই নেই; আর তবু ঐ কর্মী সদা কর্মরত। এই হলো ২৩তম শ্লোক। পরবর্তী ২৪ তম শ্লোকটি, খুবই সু-প্রসিদ্ধ, বিশেষত সারা বিশ্বব্যাপী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরিমণ্ডলে। আহারের পূর্বে আমরা এটি আবৃত্তি করে থাকি।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥ ২৪॥

—'ব্রহ্মবিৎ দেখেন, অর্পণ-কার্য ব্রহ্ম, অর্পিত শোধিত ঘৃত ব্রহ্ম, অর্পণ কর্তা ব্রহ্ম, অর্পিত হচ্ছে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে; এর ফলে ব্রহ্মরূপ কর্মে সমাহিত চিত্ত ব্যক্তি একমাত্র ব্রহ্ম পদেই পৌছে থাকেন।'

আশ্চর্য শ্লোক। *ব্রহ্ম অর্পণম্,* অর্পণ-কার্য ব্রহ্ম; তারপর *ব্রহ্ম হবিঃ,* এই *হবিঃ,*

'ঘৃত ও অন্যান্য সামগ্রী যা অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়, তাকে *হবি* বলা হয়'; 'সেই হবিও ব্রহ্ম'; ব্রহ্মাগ্নৌ, 'যে অগ্নিতে হবি অর্পিত হয় তাও ব্রহ্ম', *ব্রহ্মণা হুতম্* 'যিনি অর্পণ করেন তিনিও ব্রহ্ম'। আর তারপর, *ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যম্*, 'একমাত্র ব্রহ্মই হলেন হবন-কর্তার লক্ষ্য'। এই যজ্ঞের ফলে, যজ্ঞকর্তা কী অর্জন করেন? *ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যম্*, 'যজ্ঞকর্তা একমাত্র ব্রহ্মই লাভ করেন, এই কর্মের ফলে'। কার দ্বারা? *ব্রহ্ম কর্ম সমাধিনা*, 'ব্রহ্মরূপ কর্মে যে সমাধি মগ্ন বা সমাহিত চিত্ত তার দ্বারা।' এরূপ লোক জানে যে নর-নারী সংসারে যা কর্ম করে থাকে সে সমস্তই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর ছাড়া অন্য কিছু নয়। এটি একটি গূঢ় বৈদান্তিক সত্য যে এই বিশ্বে কেবল ব্রহ্মই আছেন, যিনি অনন্ত, অদ্বৈত, শুদ্ধ চৈতন্য স্বভাব। তিনিই জগৎরূপে প্রকটিত হয়েছেন; বিষয়, কর্ম, বিষয়ী (কর্তা), সব কিছুই হলো কেবল এক অনন্ত ব্রহ্ম; এই শ্লোকের মাধ্যমে ওই সত্যই উদ্ভাসিত হয়েছে। এই আশ্চর্য সত্য শারীর বিজ্ঞানে ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাতেও পাওয়া যায় এবং ২য় শ্লোকের আলোচনার সময় যেমন বলেছিলাম, *National Geographical Magazine* পত্রিকায় *The Sun is the Great Mother* (মহৎ মাতৃ-রূপ সূর্য) প্রবন্ধে লেখক বলেছেন, আমাদের খাদ্যে ও হজম ক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা সূর্যকে আহার করি, আমাদের কাপড়ের মাধ্যমে সূর্যকে পরে থাকি, কয়লা, পেট্রোলিয়ামজাত তৈল প্রভৃতির মাধ্যমেও আমরা সূর্যকেই ব্যবহার করি এবং উপসংহার করেছেন, (সেই সূর্য) 'বিশেষভাবে টানা-পোড়েনের মতো জড়িয়ে রয়েছে জীবন-সূত্রে ও আলোক সূত্রে'—এই কথা বলে।

বৈচিত্র্যের পেছনে ঐ সার্বভৌমিক একত্বের কথা, ঋগ্বেদ থেকে আরম্ভ করে প্রাচীন ভারতীয়গণ বুঝতেন এবং প্রকাশও করতেন। এই সূর্যের নামও দেওয়া হয়েছিল পূষন্, 'যিনি পুষ্টি সাধন করেন।' সূর্য একটি ভৌত দৃশ্যমান বস্তু। কিন্তু আমাদের ঋষিরা সূর্যের পেছনে, নক্ষত্রমণ্ডলের পেছনে, সব কিছুর পেছনে, অবস্থিত ব্রহ্মের আধ্যাত্মিক চেতনাকে আবিষ্কার করেছিলেন। এই ব্রহ্মই চরম সত্য, অনন্ত শুদ্ধ চৈতন্য, এক ও অদ্বৈত। এই হলো বিশ্বের পেছনে নিহিত সত্য। আহারের সময়ে এর যথার্থতা প্রমাণিত হয়। সুন্দরভাবটি : পাকস্থলী ও অন্ত্রের মধ্যে যে জঠরাগ্নি বা পাচক রস, যার সাহায্যে মানুষ খাদ্য হজম করে, তাও ঈশ্বরেরই এক প্রকাশ। গীতা সে কথা বলবেন কয়েকটি অধ্যায় পরে (১৫.১৪) : 'সকল জীবের পাকস্থলীতে আমি বিরাজ করি পাচনকারী অগ্নি, জঠরাগ্নিরূপে। পাচক তন্ত্রে যে খাদ্য পড়ে আমি সে সবকে হজম করি।'

একমেবাদ্বিতীয়ম্, সমগ্র বিশ্বই হলো ঐ ব্রহ্মের অভিব্যক্তি। ঠিক যেমন সৌরজগতে, সকল বস্তুই হলো সৌররশ্মির ঘনীভূত রূপ—যেমন জল, বরফ, পাথর, উদ্ভিদ, এটা, সেটা। সবই সূর্যের রশ্মি। তাই, এটি এক মহান শ্লোক ঃ

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥

এটি একটি সত্য, কোন মত নয়।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, এটা বা ওটা সমান হবে কেমন করে? খাদ্য আর পাকস্থলীর অভ্যন্তরস্থ পরিপাক শক্তি একই বস্তু হবে কেমন ভাবে? হাঁ, তারা তাই, একেবারে মূলে যাও, দেখবে এ সবই আসছে একই উৎস থেকে। মানব শরীরের কথায় এস। একই জনন-বস্তু বংশানুগতি নিয়ন্ত্রক উপাদানই কঠিন অস্থি গঠন করে, আবার তাই সৃষ্টি করে সুন্দর দৃষ্টিশক্তি, চক্ষুর মাধ্যমে। এটি যেন অর্ধ-স্বচ্ছ। আরো সব হয়েছে, তাদের মধ্যে কোনটা নরম, কোনটা তরল, কোনটা চর্মরূপ, কোনটা নখরূপ, কোনটা কেশরূপ। এ সবেরই উৎপত্তি একই উপাদান থেকে। এই সত্যই আমরা বার বার পেয়ে থাকি ভৌতবিজ্ঞানেও। শরীরের সব কিছুরই নির্মাণ, মেরামতি, সংশোধন ও বৃদ্ধি শরীর মধ্যস্থ বংশানুগতি নিয়ন্ত্রক উপাদান থেকে। এ এক মহা-সত্য, সেই অদ্বৈত সত্য—যা ভারতে বহু যুগ পূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছিল—সমগ্র মহাবিশ্বসম্বন্ধে। আমরা একে বলি আত্মা বা ব্রহ্ম, অনন্ত চৈতন্য, যা অদ্বিতীয় ও এক, যেমন পূর্বে উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২.১.২০) বলা হয়েছে।

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥

—'যোগিগণের কেউ কেউ কেবল দেবগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞাহুতি দেন, আর অন্যে জীবাত্মারূপ ব্রহ্মকে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আহুতি দেন।'

এখন, কয়েক রকমের *যজ্ঞের* কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা ৩য় অধ্যায়ে ৯ম শ্লোকে যজ্ঞ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এখানে আবার সেটি অন্যভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কোন কোন *যোগী* দেবগণের, দীপ্তিমানদের, উদ্দেশ্যে যজ্ঞাহুতি দেন। অন্যেরা আবার পরমাত্মারূপ ব্রহ্মাগ্নিতে জীবাত্মাকে আহুতি দান করে নিজে যজ্ঞ করেন। এ অতি উচ্চ ধরনের আধ্যাত্মিক যজ্ঞ।

'ক্ষুদ্র আমি'কে ব্রহ্মজ্ঞানের অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়; ফলে তা দগ্ধ হয়ে যায়। ব্রহ্মই কেবল থেকে যান; এও অন্য আর এক রকম যজ্ঞ। একটি হলো বহির্মুখী, আর অন্যটি হলো আধ্যাত্মিক ও অন্তর্মুখী, উচ্চ শ্রেণীর—এর ফলে উন্নত চরিত্র, উচ্চ আধ্যাত্মিক চেতনা ও সেবার মনোভাব উপগত হওয়া যায়। তেমনি ভাবে,

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬॥

—'আবার কেউ কেউ কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকলকে সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দেন, অপর কোন কোন যোগী শব্দাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহকে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন।'

এ সব খুবই কার্যকরী চিন্তাভাবনা। প্রতিদিন শরীরাভ্যন্তরে বহু আহুতি দাও। তার একটি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ আবার এই অদ্ভুত শ্রবণ কর্ম ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়কর্মকে আত্মসংযমাগ্নিতে আহুতি রূপে প্রদান করে। তোমার ইন্দ্রিয়তন্ত্রকে সংযত কর। তার ফলে তুমি কী কর? তুমি একটি অগ্নি প্রজ্বলিত করলে। তার নাম হলো আত্ম-সংযম-যোগাগ্নি, 'আত্মসংযমের অগ্নি'। তুমি তোমার সব ইন্দ্রিয়গুলিকে ঐ অগ্নিতে আহুতি দিয়ে দগ্ধ কর। তারপর দেখা যাবে ইন্দ্রিয়গণের নিয়মনকারী শুদ্ধ মন ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। অতএব, এও এক রকমের যজ্ঞ। চারিত্রিক উন্নয়নের প্রত্যেকটি ধাপ এইরকম কোন কিছু যজ্ঞাহুতির ফল। এ কথা অবশ্য-স্মরণীয়। প্রতিদিন আমরা একাজ করছি, কেউ কম, কেউ বেশি; তা না হলে মানবসমাজ টিকে থাকতে পারে না। আমরা কেবল জানি না, যে আমরা যজ্ঞাহুতিরূপ এ কাজ করছি। একইভাবে, অন্যেরা অন্য সব ইন্দ্রিয়স্থানগুলিকে আহুতি দিচ্ছে। তারা কোথায় আহুতি দিচ্ছে? আত্ম-সংযমযোগাগ্নিতে। মনে কর তুমি কিছু শুনলে। শব্দকে শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণে, আহুতি দেওয়া হলো। প্রতিটি উচ্চতর জীবনে, এই আহুতি দিতে হয় আত্ম-সংযম যোগের কাছে—যা অগ্নি সদৃশ। বস্তুত এটা যজ্ঞই বটে। এইভাবে চরিত্র-উন্নয়ন-পদ্ধতিতেও, যখন ইন্দ্রিয়-তন্ত্র বিভিন্ন ইন্দ্রিয় বিষয় নিয়ে কাজ করে, তখন তুমি নানা ধরনের যজ্ঞই করছ। আমরা আহার্যকে জঠরাগ্নিতে আহুতি দিয়ে থাকি, আর তাই পরিণত হয়, আমাদের নড়াচড়ার, বল প্রয়োগের, শারীরিক পরিশ্রমের শক্তিতে। অতএব যজ্ঞাহুতি দেওয়া সব সময়েই চলেছে। কেবল আমাদের অবশ্য জানা দরকার, যে এই ভাবে তা ঘটছে। তাতে তোমরা

শরীরের শক্তিগুলিকে আরো অনেক দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারবে। তেমনি ঃ

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭॥

—'কেউ কেউ আবার, সমস্ত ইন্দ্রিয়-কর্ম, জীবনীশক্তি স্বরূপ *প্রাণবায়ুর* কার্যকে অধ্যাত্ম জ্ঞানের দ্বারা *প্রজ্বলিত* আত্ম-সংযমরূপ *যোগাগ্নিতে* আহুতি দেন।'

এই ২৭ তম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ' কোন কোন লোক আবার সমস্ত ইন্দ্রিয় কর্ম এবং জীবনীশক্তিস্বরূপ *প্রাণবায়ুর* কার্যকে আত্ম-সংযমরূপ যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দেন।' সমস্ত অন্তরেন্দ্রিয়কে পুরাপুরি নিয়মানুবর্তী করার জন্য আমাদের আহ্বান করা হচ্ছে। কীভাবে তা করা যাবে? আত্ম-সংযমরূপ অগ্নিকে প্রজ্বলিত করে, তাতে ঐগুলি আহুতি দিয়ে। এর নাম আন্তর-যজ্ঞ। এগুলি সবই প্রতীকী (প্রতীক অবলম্বনে) চিন্তাধারা। এবং *জ্ঞানদীপিতে,* এ ভাবনা আত্ম-জ্ঞানের দ্বারা প্রজ্বলিত হয়। এ কাজ তো আমরা জেনে শুনে, বিচার করেই করছি। কোন পশুর দ্বারা তা সম্ভব নয়। এ কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কখনই সম্ভব হয় না। তোমাকে এ কাজ বুঝে শুনেই করতে হবে। তাই তোমাকে বলা হয়েছে, প্রথমে জ্ঞানাগ্নিকে প্রজ্বলিত করতে—তারপর তাতে সব কিছু আহুতি দাও। উচ্চমানের চরিত্র এই কর্মের ফলেই গড়ে ওঠে। তোমাকে যজ্ঞাদি কেবল বাহ্যভাবেই করতে হবে না। এ দেশের লোক বাহ্য অনুষ্ঠান পছন্দ করে, কিন্তু গীতার উপদেশ হলো, সেগুলিকে আন্তরযজ্ঞে রূপান্তরিত করতে; এ কাজ যে ঈশ্বর অন্তরে সদা বর্তমান তাঁর অভিব্যক্তির সহায়ক হবে।

পূজায়, ভক্তিপথে আনুষ্ঠানিক পূজায় দু-টি স্তর আছে; একটি *মানস পূজা,* 'মনে মনে আরাধনা', অপরটি *বাহ্য পূজা,* 'নৈবেদ্য ও ক্রিয়াদি নিবেদন প্রভৃতি দৃশ্যমান কর্ম দ্বারা পূজা'। তাই যখন কেউ মূর্তির সামনে বসে পূজা আরম্ভ করে, সে প্রথমে চক্ষু নিমিলিত করে আন্তর পূজা করে। ঈশ্বরকে তোমার হৃদয়ে বসাও, পা ধোবার জল দাও, তাঁকে স্নান করাও; নৈবেদ্যাদি নিবেদন কর। সে কাজে কিছু বেশ চিত্তাকর্ষক মন্ত্র রয়েছে; আমরা হৃদয়ের মধ্যেই ঈশ্বরকে আপ্যায়ন করতে চাই। কীভাবে আপ্যায়ন করি? আমরা মনে করি আমাদের মনের ও ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্যই যেন ঈশ্বরের সামনে আমাদের নৃত্যরূপ আপ্যায়ন ক্রিয়া। অতএব কল্পনা কর, যদিও আমরা চাই না যে আমাদের মনের চঞ্চলতা চলতেই থাকুক, আমরা তাই গতিকে উচ্চ স্তরের অভিমুখী করছি। *নৃত্যম্ ইন্দ্রিয়*

কর্মাণি চাঞ্চল্যম্ মনসাঃ তথা, 'এই চঞ্চল মন যেন নৃত্য দ্বারা অন্তরের ঈশ্বরকে আপ্যায়ন করছে—এই হলো মন্ত্র। *ইন্দ্রিয়কর্মাণি,* 'ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সকল,' *চাঞ্চল্যম্,* 'অস্থিরতা'; *মনসাঃ তথা* 'তেমনি, মনেরও অস্থিরতা।' এই সবের আহুতি থেকে আরো বড় আহুতি আর কি হতে পারে? শরীরের মধ্যে যা কিছু ঘটছে তাকেই আধ্যাত্মিকতার দিকে মোড় ফিরিয়ে দেওয়া। তারপর আমরা চোখ খুলি, ঈশ্বরকে হৃদয় কন্দর থেকে বার করে এনে সামনে বসাই এক পুষ্পময়বেদিতে এবং বাহ্য পূজা করি। প্রথমত আন্তর *পূজা*; দ্বিতীয়ত বাহ্য *পূজা*।

তাই, এখানে এ শ্লোকে *সর্বাণীন্দ্রিয় কর্মাণি প্রাণ কর্মাণি চাপরে, আত্ম-সংযম যোগাগ্নৌ জুহ্বতি; যোগাগ্নি, যোগের* অগ্নি; কিরকম *যোগ? আত্ম সংযম,* সম্পূর্ণ আত্ম-নিয়ন্ত্রণ। সম্পূর্ণ আত্ম-সংযমকে অগ্নির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সেই অগ্নিতে তুমি এই সব দ্রব্য আহুতি দিচ্ছ। এ অতি সুন্দর পূজা, আমরা যে বাহ্যানুষ্ঠানাদি মাত্র করে থাকি তার থেকে উৎকৃষ্টতর আচার-অনুষ্ঠান। অধিকাংশ ধার্মিক ভারতবাসীর ক্ষেত্রেই এরূপ ঘটে না। তারা, প্রচুর বাহ্যানুষ্ঠান করে থাকে, আন্তর পূজার কোন অনুষ্ঠানই করে না। সেখানে কোন রকম যজ্ঞাহুতি নেই। আন্তর যোগের যজ্ঞাগ্নি স্থাপনও নেই। ফলে আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই পড়ে থাকি; আমরা যদি দুষ্ট, সঙ্কীর্ণমনা, বিবাদপ্রবণ, মামলাবাজ, এবং লোক দেখান ভগবদ্‌ভক্তিযুক্তও হই, তা হলে আমরা সেই রকমই থাকব। তা হওয়া উচিত নয়। তাই *গীতা* তোমাকে যজ্ঞের অনেকগুলি বিকল্প দিয়েছেন, যার দ্বারা সমস্ত জীবনটি এক যজ্ঞ হয়ে উঠবে। শ্রীকৃষ্ণ পরে ৪.৩৩ শ্লোকে, বলবেন জ্ঞান যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ।

Tao of Physics গ্রন্থে অধ্যাপক F. Capra (ক্যাপরা) বলেছেন, আধুনিক নভো-পদার্থ বিদ্যায় নভোমণ্ডলের *পটভূমির বস্তু* সম্বন্ধে যে ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে—তার ব্যাপ্তি উপনিষদের ব্রহ্মের তুলনায় অনেক কম। । ব্রহ্ম জগতের সর্বপ্রকার ভৌত ও অভৌত সকল বাস্তব বস্তুকে ব্যাপ্ত করে আছেন। সেই ব্রহ্মেরই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। সব কিছুই ব্রহ্মের বিকাশ। এ কথা বলে পরবর্তী শ্লোকগুলিতে আরো কতকগুলি *যজ্ঞের* কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এসবের আরো আগে বৈদিক উপদেশে অনেক রকম যজ্ঞের কথা বলা আছে। কিন্তু, আমি যেমন আগে বলেছি, *গীতা যজ্ঞ* শব্দটিতে এক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব এবং দিঙ্‌নির্দেশ আরোপ করেছেন। তৃতীয় অধ্যায়েও আমরা এরূপ

দেখেছি। এখানে শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন দৈনন্দিন জীবনে আমরা যত রকমের *যজ্ঞ* করে থাকি সেগুলিকে। জীবনের প্রত্যেকটি নড়াচড়াই *যজ্ঞের* এক একটি অংশ। এ ভাবেই এখানে *যজ্ঞের* রূপান্তর ঘটেছে। শেষে শ্রীকৃষ্ণ বলবেন, যে এই সব যজ্ঞের কোনটিই যাকে বলা যায় *জ্ঞানযজ্ঞ* অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের যজ্ঞ, তার সমতুল্য নয়। এটি শ্রেষ্ঠ *যজ্ঞ*। যারা ইন্দ্রিয়সংযম করে তারাও *যজ্ঞ* করছে। তারা সংযমের অগ্নি প্রজ্বলিত করে, আর তাতে ইন্দ্রিয়জ উদ্দীপনাসমূহকে আহুতি দিয়ে দগ্ধ করে রূপান্তরিত করে। এইভাবে সবরকম আন্তর-নিয়মন ও বাহ্য ব্যবহারও একরকম *যজ্ঞ*। আমার চুরি করার প্রবণতা রয়েছে; সেই প্রবণতাকে আমি নিয়ন্ত্রণ করি; কীভাবে? আমি আমার মধ্যে একটু জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়ে তার মধ্যে এই প্রবণতাকে আহুতি দিয়ে পুড়িয়ে ফেলি। এই ভাবে *যজ্ঞ*-ভাবনার অর্থে এক ব্যাপকতা দান করা হয়। ঐ অগ্নি নানা প্রকার হয়ে থাকে।

দু-রকম অগ্নিকে আমাদের চিনে রাখতে হবে। একটি হলো সর্বজনবিদিত *জঠরাগ্নি*, 'শরীর মধ্যস্থ পাচনাগ্নি'—আম্লিক ও নানা রস যা খাদ্যকে পরিপাক করে শরীরের অঙ্গীভূত করে, খাদ্যের সার বস্তু নিয়ে শরীর পুষ্ট হয়, আর বর্জবস্তুকে ত্যাগ করা হয়। প্রতিদিন শরীরের মধ্যে এই রকম এক *মহাযজ্ঞও* চলেছে। শরীরে উত্তম জঠরাগ্নি থাকা কল্যাণকর। কিন্তু মানবজাতির ক্ষেত্রে, সেটাই যথেষ্ট নয়। তাই আচার্যগণ বলেন, দেহতন্ত্রে আর একটি অগ্নির প্রয়োজন আমাদের অবশ্যই আছে। তাকে বলে *জ্ঞানাগ্নি*, 'জ্ঞানের অগ্নি'। কোন পশু জ্ঞানের অগ্নি প্রজ্বলিত করে তুলতে পারে না। জঠরাগ্নি তাদের আছে। জ্ঞানাগ্নি কেবল মানুষই জ্বালিয়ে তুলতে পারে। তাই, বাল্যকাল থেকে, আমাদের বলা হয়—এই জ্ঞানাগ্নিকে জাগিয়ে তুলতে, যাতে আমাদের নানা অভিজ্ঞতা হয়—তার মধ্যে কতকগুলি থাকে অপ্রীতিকর; তবে সেগুলিকেও আমাদের হজম অবশ্যই করতে হবে। এই হজম করা হয় *জ্ঞানাগ্নিতে*। যেমন আগে বলেছি, এ কাজ তৈল শোধনাগারের কাজের মতো—যেখানে অশোধিত তৈলকে শোধন করে সুন্দর সুন্দর ব্যবহারোপযোগী সামগ্রী প্রস্তুত করা হয়। এই ভাবেই চরিত্র রূপ নিতে থাকে। এই ভাবেই আমাদের মধ্যে দয়া, আত্মসমর্পণ ভাব, সেবা ভাব, হৃদয় ও মনের উদারতা গড়ে ওঠে। এ সবই যজ্ঞ। চরিত্র গড়ে তোলাই এক যজ্ঞ। পরবর্তী কালে এর ওপর আমাদের আরো বেশি জোর দিতে হবে।

আমি যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভাষণ দিতাম, যুবকদের

বলতাম, যুবা বয়সে প্রচুর হজমশক্তি থাকে, আমেরিকায় যাকে বলে Kentucky Fried Chicken (কেন্টাকির ভাজা মুরগি) ও Hamburger (মাংসের কিমা)—সেগুলি খেয়ে তারা সহজে হজম করতে পারে! এগুলি সেখানকার সাধারণ জিনিস। তবে পরিপাক ক্রিয়ায় যথেষ্ট বেশি হজমশক্তির প্রয়োজন। তা ভাল। কিন্তু, মনে রেখো, তোমাদের আর একটি অগ্নি, জ্ঞানাগ্নিকেও গড়ে তুলতে হবে, জীবনের কষ্টকর অভিজ্ঞতাগুলিকে হজম করার জন্য—যাতে মানসিক বিকারজনিত পীড়া তোমাকে পর্যুদস্ত করতে না পারে। তা হবে না—যদি তুমি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অগ্নি, *জ্ঞানাগ্নি*, জ্বালিয়ে রাখ। সেই জ্ঞানাগ্নিকে শৈশব থেকে গড়ে তুলতে চেষ্টা কর।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে, আমার ১৯৬৮-এর ১৮ জুলাই থেকে ১৯৬৯-এর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় বক্তৃতা সফরের সময়কার একটি দুটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। তার একটি আমি আগেই এই গ্রন্থে উল্লেখ করেছি, সেটি ঘটেছিল ১৯৬৯ খ্রিঃ আমার Portland Radio Talk (পোর্টল্যাণ্ড রেডিও কথিকা)-এর সময়; ২০ মিনিটের নির্ধারিত সময় ছাড়িয়ে ঐ আলাপ চলেছিল ২ ঘণ্টা, রাত্রি ১০টা থেকে মধ্যরাত্র ১২টা পর্যন্ত; এর মধ্যে শ্রোতারা টেলিফোনে যে সব প্রশ্ন করেছিল তার উত্তর দেওয়াও হয়েছিল।

এই গ্রন্থের নাম হলো *Universal Message of The Bhagavad Gita* (ভগবদ্গীতা ও বিশ্বজনীন বার্তা)। এতে বেদান্তকে কর্মজীবনে প্রয়োগোপযোগী করে প্রকাশ করা হয়েছে মানবের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিজ্ঞানরূপে; একে আধুনিক বিজ্ঞানের ভৌত প্রকৃতির সম্ভাবনা বিজ্ঞান, যা বর্তমানে পাশ্চাত্যে—বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খুবই উন্নতি লাভ করেছে, তারই ধারায় অনুসৃত ভাবা যেতে পারে। এই বক্তৃতা সফরে বেদান্ত-বাণীর সর্বজনীনতা সম্বন্ধে নতুন সমর্থন পেলাম। এই সফরে ছিল ৯৩৪টি বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তরের আসর, তার মধ্যে ৯০ টি ছিল দূরদর্শন, বেতার ও খবরের কাগজের সাক্ষাৎকার, ৩০টি অনুষ্ঠিত হয়েছিল চার্চে ও মন্দিরে, ১৪১টি বেদান্ত সোসাইটিতে ও রামকৃষ্ণ আশ্রমে, ১৫৬টি ভদ্রলোকের বৈঠকখানায়, ১৯৭টি সাধারণ জনসভায় এবং ৩২০টি ১১৫ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজে—যেমন আমার লেখা *A Pilgrim Looks at the World* (তীর্থযাত্রীর বিশ্বদর্শন) গ্রন্থের ২য় খণ্ডের প্রথম পাতায় প্রকাশক লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রতি এক ঘণ্টা বিনাপ্রস্তুতিতে বক্তৃতার পর চলত এক

ঘণ্টা প্রেরণাদায়ী প্রশ্নোত্তর পর্ব। অনেক ক্ষেত্রেই দর্শকদের মন্তব্য থাকতো, 'অনুগ্রহ করে আবার আসবেন।'

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ খ্রিঃ হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল আমার পূর্ব ঘোষিত এক বক্তৃতা। আমি বোস্টন বেদান্ত সোসাইটির স্বামী সর্বগতানন্দের সঙ্গে সেখানে পৌঁছাই সন্ধ্যা ৮.১০ মিনিটে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে দেখি সভাগৃহ অতিমাত্রায় জনাকীর্ণ; ব্যবস্থাপকগণ সভাটিকে ২০০ গজ দূরে অন্য একটি বড় সভাগৃহে স্থানান্তরিত করার কথা ঘোষণা করলে, শ্রোতৃগণ বৃষ্টি ও বরফের মধ্য দিয়ে সেখানে গেল। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই এক ঘণ্টা বলি; বিষয় ছিল ঃ *Self Knowledge and Human fulfilment* (আত্মজ্ঞান ও মানব জীবনের পরিপূর্ণতা), যা উদ্যোক্তারাই নির্বাচন করেছিলেন বোস্টন রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি প্রদত্ত একটি তালিকা থেকে। তারপর এল এক ঘণ্টা প্রশ্নোত্তর পর্ব ঃ তখন আমি টেবিলের ওপর পা মুড়ে বসলাম যাতে শ্রোতাদের মুখ দেখা যায়।

একটি বিশেষ প্রশ্নে আমাকে শ্রোতাদের মৃদু ভর্ৎসনা করতে হয়; কারণ আমি দেখি যে ঐ সভাগৃহে সমাগত শ্রোতৃবৃন্দের তুলনায় আসন সংখ্যা অপ্রতুল হওয়ায় এক বৃদ্ধ অধ্যাপককে পাশের ঘর থেকে চেয়ার আনতে হচ্ছে—কোন ছাত্রই ঐ কাজে এগিয়ে যাচ্ছে না; তাই ঐ প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় আমি বলি, "আমি কিছু দৃষ্টিকটু ব্যাপার দেখছি। ছাত্ররা কেউই উঠে গিয়ে অধ্যাপককে সাহায্য করছে না? সেবা কাজকে শিক্ষার এক অপরিহার্য অঙ্গ করে নেওয়া সঙ্গত নয় কি? কিন্তু এ তোমাদের দোষ নয়। শুধু, তোমাদের পিতামাতা ও শিক্ষকগণই তোমাদের এ কাজ করতে বলেন নি, পাছে তোমরা মনে কোন আঘাত পাও। এই ভাবেই যুবকরা তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে ব্যক্তিত্বে উন্নয়ন করতে সফল হয় না। জীব-বিজ্ঞানী স্যার জুলিয়ান হাক্সলি এইভাবে 'ব্যক্তি'র সংজ্ঞা দিয়েছেন—"যেসব বিশেষ মানুষ তাদের জৈবিক স্বাতন্ত্র্যকে অতিক্রম করে সচেতনভাবে সামাজিক কর্তব্যবোধে এগিয়ে আসে।" আমি আরো বলেছিলাম যে, মার্কিন যুক্তরাজ্যের অন্য আরো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়েও আমি এরকম ঘটনা লক্ষ্য করেছি। শ্রোতাদের মধ্যে ছাত্র, কিছু অধ্যাপক, কিছু নাগরিকও ছিলেন, তাঁরা আমার মন্তব্যগুলি বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছিলেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার দ্বিতীয় বক্তৃতা হয় ১৪ বছর পরে; তখন বিষয় ছিল *'Vivekananda and Human Excellence'*, 'বিবেকানন্দ ও মানবিক উৎকর্ষ'; সেটি পুস্তিকারূপে কলকাতার অদ্বৈত আশ্রম থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় আমি, কয়েকজন লেখক-প্রণীত *The Handbook of American Psychiatry*, vol-3 গ্রন্থে সিলভানো আরিয়েতির—মার্কিন যুব সম্প্রদায়ের সৃজনীশক্তির অবনতি ও তার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে মন্তব্যটির উল্লেখ করেছি।

১২ বছরের বালক হিসাবে আমার এক অভিজ্ঞতার কথা এই গ্রন্থে আগে বলা হলেও বর্তমান ক্ষেত্রে তার উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হবে। স্কুলে যাবার সময় আমি একটি যুবকের দিকে ঢিল ছুঁড়ি—মনে করিনি যে ঢিলটা অত দূর যাবে; কিন্তু তাতে যুবকটি আহত হয়েছিল। তার পিতামাতা আমার মায়ের কাছে এ বিষয়ে নালিশ করেন; আমার মা স্বভাবতই বিচলিত হয়ে পড়েন। বিকালে স্কুল থেকে ফিরলে দেখি আমার মা চাপা রাগে মুখ গোমড়া করে গম্ভীর হয়ে আছেন। তিনি বললেন, 'তুমি দশ ঘা বেত খাবে'। আমি বলি, 'হাঁ আমি সে শাস্তি পাব, কেন না আমি যুবকটিকে আঘাত করেছি' তারপর আমার বড় ভাই মায়ের সাক্ষাতে আমার হাতে দশ ঘা বেত মারেন। মার খেয়ে আমি মায়ের পাশে এসে শান্তভাবে বসলাম আর সব ভুলে গেলাম। কোন মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়নি।

আমি দেখেছি মার্কিন লোক, বিশেষত যুবক-যুবতীরা যদি গির্জার লোকেদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহলে তারা বেশ মন খোলা ও ব্যবহারে অত্যন্ত মানবিক হয়ে থাকে।

এই বিষয়টি নয়া দিল্লীস্থ আমেরিকান দূতাবাস থেকে প্রকাশিত *American Reporter*-এ ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ খ্রিঃ সংখ্যায়, *Vedantic Leader Impressed by U.S. Response'* (আমেরিকার জবাবে বৈদান্তিক আচার্য খুশি) —এই শিরোনামে নিম্নলিখিত প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয় নয়া দিল্লীস্থ আমেরিকান দূতাবাস থেকে প্রকাশিত American Reporter-এর ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ খ্রিঃ সংখ্যাতে (এটি *A Pilgrim looks at the World vol-II*, P. 737 Appendix-D তেও সন্নিবেশিত হয়েছে)—মার্কিন শ্রোতাদের ওপর তাঁর প্রভাব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় মিনেসোটার কার্লটন কলেজের ছাত্রী অ্যান কার্টিসের এই মন্তব্যে :

"একদিকে তাঁর অবিশ্বাস্য অগাধ জ্ঞান আমাকে কেবল মুগ্ধই করেনি, পরন্তু বৌদ্ধিক দিক থেকে আমাকে শিহরিত ও উদ্দীপিত করেছিল।—অন্যদিকে তাঁর কথাগুলি আমার অন্তরের গভীরে পৌঁছেছিল, যার ফলে আমার অন্তর

আক্ষরিকভাবেই রাঙিয়ে উঠেছিল এই উপলব্ধিতে যে, সেখানে আমরা প্রত্যেকে *সত্যই* প্রাণবন্ত এবং *সত্যই* কর্মচঞ্চল।"

'উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উইসকনসিন ইউনিয়ন সাহিত্য সভার সভাপতি ডেভিড মিলস্কি (David Milofsky) বলেছিলেন ঃ

"আপনার আগমন আমাদের মানসিক পরিধি বিস্তারে সহায়তা করেছে এবং আমাদের মধ্যে কায়িক ব্যবধান দূরত্বের দিক থেকে যথেষ্ট বেশি হলেও সর্বজন মধ্যে যে এক সর্বজনীন আধ্যাত্মিক আত্মীয়তা বর্তমান তা উপলব্ধি করতেও যথেষ্ট সাহায্য করেছে। আমি মনে করি ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দূরত্ব এবং বেদান্ত ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার মাঝে যে ব্যবধান বর্তমান তাও কমেছে আপনার বক্তৃতার ফলে।"

ভারতে ধর্মীয় প্রশিক্ষণের উপায় হিসাবে নানা রকম পদ্ধতি গড়ে উঠেছে; তার মধ্যে কতকগুলি ফলদানে খুবই অসমর্থ বলে নিজ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রয়ে গেছে; তা থেকে কোনরূপ জাগতিক মঙ্গল সাধিত হবার সম্ভাবনা খুবই কম। যেমন, অনেকে প্রচুর *প্রাণায়াম* অভ্যাস করে; পরে *গীতাতেও* কথাপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ এ বিষয়ে উল্লেখ করবেন। আমরা *প্রাণায়াম* করতে পারি। নাক দিয়ে বাতাস টেনে নিয়ে, কিছুক্ষণ শরীরের মধ্যে রেখে, পরে তা বার করে দিয়ে। এই তিনটি ধাপকে বলে *পূরক,* কুম্ভক ও *রেচক*। কিন্তু জ্ঞানের স্পর্শ বিনা এগুলি কেবল যান্ত্রিক প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়ায়। শুধু ওগুলির দ্বারাই উন্নত চরিত্র গড়ে ওঠে না। ১৯৩৯ খ্রিঃ কয়েকজন আমার কাছে এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসে, সে পুনের আবহাওয়া দপ্তরের একজন কর্মচারী। তারা বলে ঐ লোকটি প্রত্যহ *প্রাণায়াম* করে থাকে। আর, নিয়ম করে প্রতিদিন তার স্ত্রীকে প্রহার করে! তার বন্ধুরা তাকে *প্রাণায়াম* বন্ধ করতে বলে। সে বলে, না, আমি তা পারব না, *প্রাণায়াম* আমার কাছে অপরিহার্য। তাই, তারা সকলে তাকে আমার কাছে নিয়ে আসে। আমি বলি, তুমি যদি স্ত্রীকে ভালবাসতে না পার, তার সঙ্গে সম্মানসূচক ব্যবহার না করতে পার, তবে এই প্রাণায়ামের কী প্রয়োজন? এতো কেবল এক যান্ত্রিক ক্রিয়ামাত্র; *প্রাণায়াম* ছাড়, আর অন্তরে প্রীতি ভালবাসা জাগিয়ে তোল। কিন্তু সে বলল, 'আমি *প্রাণায়াম* ছাড়তে পারি না।' *প্রাণায়াম* তাকে পেয়ে বসেছে। এ এক ধরনের লোক। তাই, এই সব ব্যাপারে দেখতে পাবে, যে মানবিকতা গড়ে তোলার জন্য, চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য *জ্ঞানের* সহায়তা ছাড়া, কেবল শারীরিক ক্রিয়ার এবং কেবল আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার

কোন মূল্যই নেই। সেই কথাই শ্রীকৃষ্ণ আমাদের বলতে যাচ্ছেন—নানা ধরনের যে সব যজ্ঞানুষ্ঠান করা হয়ে থাকে সেগুলির সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার পর।

সর্বাণীন্দ্রিয় কর্মাণি প্রাণ কর্মাণি চাপরে, 'সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াগুলিকে, সকল প্রাণ ক্রিয়াকে, এসবকে তুমি আহুতি দিতে পার *আত্ম-সংযমরূপ* অগ্নিতে', আত্ম-নিয়ন্ত্রণরূপ, আত্ম-নিয়মন রূপ অগ্নিতে; এই সব শক্তিকে নিয়ে ঐ অগ্নিতে আহুতি দাও, তখন তারাই পরিণত হয়ে উঠবে উন্নত চরিত্রে। *আত্ম-সংযম,* আন্তর নিয়মনকে তুলনা করা হয়েছে অগ্নির সঙ্গে। কী সুন্দর ভাব! কিন্তু, *জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে,* 'সেই অগ্নিকে জ্ঞানাগ্নির দ্বারা প্রজ্বলিত করে; তখনই কেবল ঐ সব ক্রিয়ার সাহায্যে আমাদের কিছু উপকার হতে পারে। কেবল শুষ্ক সন্ন্যাসী সুলভ অভ্যাসের কোন মূল্য নেই। শুষ্ক সন্ন্যাসী হয়ে কী লাভ? মানুষ তাতে কী পেয়ে থাকে? কিন্তু, ঐ সন্ন্যাসের সঙ্গে জ্ঞান থাকলে, তবে তা চমৎকার হয়ে *ওঠে*; তখন আবার অত্যধিক সন্ন্যাসবৃত্তিরও আর প্রয়োজন থাকে না। তাই, জ্ঞানের ওপর এতটা জোর দেওয়া হয়েছে; এখানে এটি *জ্ঞান,* অন্যত্র এটি ভক্তি; আর শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়, শুদ্ধা ভক্তি ও শুদ্ধ *জ্ঞান* এক ও অভিন্ন। কতবারই না *জ্ঞান* শব্দ ব্যবহার করা হবে, কতবারই না *ভক্তি* শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'ঈশ্বর-প্রেম', 'ঈশ্বরীয় জ্ঞান'—দুই-এরই শক্তি রয়েছে মানব চরিত্রে রূপান্তর ঘটাবার। অতএব, প্রেম বা জ্ঞান বিনা শারীরিক অভ্যাস একেবারেই মূল্যহীন, নিষ্ফল। তা থেকে কোন মঙ্গল সাধিত হয় না। বরং সেগুলি প্রায়ই অহংকারের, গর্বের, দাম্ভিকতার উৎপত্তি ঘটায়। এরপর আসছে কয়েক ধরনের যজ্ঞের কথা—একটা শ্লোকের মধ্যে :

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাঽপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮॥

—'অন্য কেউ কেউ আবার দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞ, কৃচ্ছ্রসাধনরূপ যজ্ঞ, বা যোগরূপ (প্রাণায়ামাদিরূপ) যজ্ঞ করে থাকেন, অপর কোন কোন আত্ম-সংযমশীল দৃঢ়ব্রত যোগী আবার বেদাভ্যাস ও শাস্ত্রার্থজ্ঞানকে আহুতি দিয়ে যজ্ঞ করেন।'

যতি হলেন যিনি কঠিন কর্ম করতে অভ্যস্ত, তাঁরাই যতি যাঁরা লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য কঠিন কর্ম করেন। তাঁরা কীরকম *যজ্ঞ* করেন? *দ্রব্যযজ্ঞ,* যেমন ঘৃতাহুতি; এটি *দ্রব্যযজ্ঞ*। যে কোন স্থূল বস্তুই হলো *দ্রব্য*। কখনো কখনো লোকে কেবল *দ্রব্যযজ্ঞ* করেই কাজ শেষ করে; কিন্তু এ তো কেবল সূচনা। *তপোযজ্ঞ* হলো কোন কোন *'সন্ন্যাসিসুলভ অভ্যাস',* আত্ম-সংযম, আত্ম-নিয়মন, প্রভৃতি এই

অভ্যাসের অঙ্গ। *যোগযজ্ঞ* হলো 'যোগাভ্যাস', *প্রাণায়াম* অথবা এই রকম কর্ম-যোগ। *স্বাধ্যায়* হলো 'নিজে নিজে অধ্যয়ন করা রূপ যজ্ঞ'। এ এক চমৎকার *যজ্ঞ*। অধ্যয়নের সাহায্যে আমরা কতই না জ্ঞান অর্জন করি, আর সেই জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা শক্তি ও কিছুটা ভয়শূন্যতা অর্জন করি। জ্ঞানই শক্তি। এই অধ্যায়ে জ্ঞানের প্রশংসা করা হয়েছে কয়েকটি শ্লোকে। শ্রীকৃষ্ণ বলবেন, 'জ্ঞান হলো পরম সম্পদ; এই সম্পদ অর্জন করতে থাক।' বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করেই আমরা যেন পাঠাভ্যাস বন্ধ করে না দিই। অধ্যয়ন ও জ্ঞানান্বেষণ অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে। যতদিন বাঁচি ততদিনই আমাদের পাঠাভ্যাস চালিয়ে যাওয়া উচিত। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন 'যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি'। অধ্যয়ন কর, যা অধ্যয়ন কর তা বুঝতে চেষ্টা কর, তাকে প্রয়োগ করতে চেষ্টা কর, এই সবই হলো *স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞ*। *যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ,* 'যাঁরা সম্যক-সংযমী, যাঁদের মন সূক্ষ্ম, *সংশিত* মানে সূক্ষ্ম, তারা এই সব যজ্ঞ অভ্যাস করে থাকেন। কিন্তু প্রথমটি হলো *দ্রব্য যজ্ঞ,* অগ্নিতে স্থূল বস্তু আহুতি দেওয়া। যে কোন লোক একাজ করতে পারে। কখনো কখনো একাজ তুমি নিজে না করে, দশটাকা দক্ষিণা দিয়ে একজন পুরোহিত নিয়োগ করে থাক—সে তোমার হয়ে একাজ করবে বলে! এ হলো *দ্রব্যযজ্ঞ*। কিন্তু জ্ঞানের চর্চাই হলো প্রকৃত *যজ্ঞ*। যখন তুমি বোধশক্তির উন্মেষ ঘটাতে থাক, জ্ঞানের আলোক কিছুটা দেখতে পাও ও চরিত্রে তার প্রতিফলন হয়, তখনই তা থেকেই হয় শ্রেষ্ঠতর লোকের উদ্ভব। এর পরে কিছু কিছু লোকে যা করে থাকে, সেই প্রাণায়ামের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে পরের শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাঽপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৯ ॥

—'কেউ কেউ প্রাণবায়ুকে (বহির্মুখী বায়ু নিঃশ্বাসকে) অপানবায়ুতে (অন্তর্মুখী বায়ু প্রশ্বাসে) আহুতি দেয়, আবার কেউ কেউ অপানবায়ুকে প্রাণবায়ুতে আহুতি দেয়, অপানবায়ু ও প্রাণবায়ুর গতিকে স্তব্ধ করে, প্রাণকে, তথা জীবনী শক্তিকে সদা নিয়ন্ত্রণে রাখা অভ্যাস করে।'

যারা *প্রাণায়ামে* পারদর্শী, তারা *প্রাণকে অপানে* এবং *অপানকে প্রাণে* আহুতি দিয়ে থাকে। একটি নাসিকা বন্ধ করে প্রশ্বাস গ্রহণ করে ফুসফুস পূর্ণ করাকে *পূরক* বলে। শ্বাস কিছুক্ষণ ভেতরে ধরে রাখা হয়, তার নাম *কুম্ভক*। শেষে অন্য নাসিকা দিয়ে *ঐ রুদ্ধ* বায়ুকে বাইরে (*নিঃশ্বাসরূপে*) ছেড়ে দেওয়াকে বলে *রেচক*। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, কোন কোন লোক এরূপ করে থাকে। *প্রাণাপানগতি*

রুদ্ধা, '*প্রাণ* ও *অপানের* গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে'; *প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ*, 'তারা *প্রাণায়াম* সম্বন্ধে অভিজ্ঞ।'

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ ॥ ৩০ ॥

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১ ॥

—'অন্যে, অপরে আহার-সংযম করে *প্রাণবায়ু* সমূহে অন্যান্য *প্রাণবায়ুকে* আহুতি দেন (অর্থাৎ যে যে প্রাণবায়ু জয় করেন, সেই সেই প্রাণবায়ুতে অন্যান্য প্রাণবায়ু আহুতি দেন)। যজ্ঞাগ্নিতে নিজ নিজ পাপকে আহুতি দিয়ে দগ্ধ করার পর এঁরা সকলে *যজ্ঞ* তত্ত্ব জেনেছেন। যাঁরা যজ্ঞাবশেষ অন্নটুকু আহার করেন তাঁরা সনাতন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। যারা *যজ্ঞ*-হীন তাদের কাছে ইহলোকই নেই, ঊর্ধ্বতন লোক তাঁরা কীভাবে পেতে পারেন; হে কুরুশ্রেষ্ঠ?

অপরে, 'অন্যে'; *নিয়তাহারা*, 'আহার-সংযম করে', *প্রাণানপ্রাণেষু জুহ্বতি*, অন্য *প্রাণকে* (জয় করা) *প্রাণে* আহুতি দেয়।' এই সব লোকই *যজ্ঞতত্ত্ব* বেত্তা। অতএব, কত বিস্তৃতই না হয়েছে *যজ্ঞ* শব্দের তাৎপর্য? আদি বৈদিক যুগে *যজ্ঞ* বলতে বোঝাত অগ্নি প্রজ্বলিত করে তাতে কিছু ঘৃত বা অন্যরকমের শস্যসামগ্রী আহুতি দেওয়া। কিন্তু *গীতায়*, যজ্ঞের অর্থ এতটাই বিস্তৃত হয়েছে। জীবনের সব দিক, যেমন বলেছি, আমাদের আহার্য বস্তু পর্যন্ত—যাঁরা প্রকৃত আধ্যাত্মিক ভাবে ভাবিত তাঁদের কাছে—ব্রহ্মাগ্নিতে, জঠরাগ্নিতে, আহুতি-স্বরূপ। আহার করা, কেবলই ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি নয়, তুমি তার দ্বারা জীবনীশক্তি অর্জন কর, তাও এক রকম যজ্ঞ।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে 'ব্রহ্মের স্বরূপ জিজ্ঞাসা' আরম্ভ হচ্ছে—*অন্নম্ ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ*—এই উক্তি দিয়ে; এর অর্থ হলো—'(শিষ্য) বুঝলো, *অন্ন*, অর্থাৎ আহার্য যেন ব্রহ্ম'। জঠরে আহার্য পড়লে তা থেকে শক্তি উদ্ভূত হয়। তোমার সর্বশক্তির উৎস সেইটিই। যদি আহার্য না পাও, তবে কোন শক্তিই তুমি পাবে না। তারপর উপনিষদ্ বলে চলেছেন, যে এক এক করে *প্রাণ, মন, বিজ্ঞান* প্রভৃতিকে ব্রহ্মরূপে দেখতে হবে। শেষে, চরমে পৌঁছে অনন্ত, অদ্বৈত, শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ প্রকৃত ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়। অভিজ্ঞতার বিভিন্ন স্তরে অন্য যে সব ব্রহ্মের উপলব্ধি হয় সেগুলি সবই সেই একই ব্রহ্ম বস্তু। *তৈত্তিরীয়*

উপনিষদে বিষয়টিকে এই ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আবার *গীতায়* বলা হয়েছে, *সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো,* 'এ সব কটি দৃষ্টান্তই যজ্ঞবিদের, যাঁরা *যজ্ঞ* সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁদের বিষয়ে। *যজ্ঞক্ষপিত কল্মষাঃ* 'যাঁরা যজ্ঞের সাহায্যে মন ও হৃদয়-জাত মন্দভাব (পাপ) থেকে মুক্ত হন'। *যজ্ঞ শিষ্টামৃত ভুজো,* '*যজ্ঞ* শেষে যে অমৃত-স্বরূপ অন্ন অবশিষ্ট থাকে তাই আহার করে,' একেই পরবর্তী কালে *যজ্ঞাবশিষ্ট প্রসাদ* আখ্যা দেওয়া হয়েছে; তা অতি পবিত্র। ভাবটি হলো ঃ স্বার্থকেন্দ্রিকতার অর্থ কেবল বিষের ওপর বাস করা। তা করা উচিত নয়। তাই *যান্তি ব্রহ্মসনাতনম্* 'এরূপ লোক সনাতন (চিরস্থায়ী) ব্রহ্মে পৌছে যায়।' —ধীরে ধীরে যা অভিব্যক্ত হতে থাকে। আধ্যাত্মিক জীবনে, মানুষের ধীরে ধীরে সনাতন ব্রহ্ম প্রাপ্তি ঘটে, এই জীবনেই। *যজ্ঞ* হলো উপায়, আর সেই *যজ্ঞই* আবার *জ্ঞানদীপিতে,* 'আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলোকে প্রজ্বলিত।' এই দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা যা করব তাই আধ্যাত্মিক ভাবে মঙ্গলময় হয়ে উঠবে। তুমি কোন অতিথিকে সেবা কর, তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কর, তুমি তা তোমার আন্তর জ্ঞানের আলোকে করে থাক। তাই হবে 'অতিথি সেবা'। 'বিনা আমন্ত্রণে এসেছে তাই সে *অতিথি'।* ভারতে ইতিহাসের পাতায় পাতায় এর বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। অন্য কোন দেশে অতিথিরা এত যত্ন পায় না, যত পায় এ দেশে।

বস্তুত, ভারতের পক্ষে এমন প্রশংসাপত্র আমি পেয়েছিলাম এক মার্কিন অধ্যাপকের কাছ থেকে। আমি তখন আমেরিকায়, ঐ অধ্যাপক ও আমি একদিন নৈশভোজে বসেছি, তিনি বললেন, 'আমি ফুলব্রাইট (Fulbright) বৃত্তিপ্রাপ্ত হয়ে সস্ত্রীক মীরাট বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতাম।' 'আমরা তিন মাস সেখানে ছিলাম, তার মধ্যে একদিনও আমাদের নিজ গৃহে আহার করতে দেওয়া হয়নি। প্রতিদিনই কেউ না কেউ "অনুগ্রহ করে আমার বাড়ি আসবেন", "অনুগ্রহ করে আমার বাড়ি আসবেন" বলে নিজ বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাতেন। আমি পৃথিবীর অন্য কোথাও এমনটি কখনো দেখিনি।' আমি বললাম, 'আপনার কথা ঠিকই' আমাদের দেশের লোক অতিথি সেবার ভাবটিকে পুরাপুরি পালন করে চলেছে। ভারতে কোন ব্যক্তি পকেটে একটি পয়সাও না নিয়ে সারা দেশ ঘুরে বেড়াতে পারে। সব জায়গাতেই সে সেবা পায়। যারা সুদূর বারাণসীতে যায়, অথবা কেদার-বদরীতে ও অন্যান্য মহাতীর্থগুলিতে, প্রত্যেক জায়গাতেই তারা গৃহীর বাড়িতে যত্ন পেয়ে থাকে। এটা কিছুটা অসাধারণ। তাই, *তৈত্তিরীয় উপনিষদের* 'অতিথি দেবো ভব' উপদেশটি, একটি সুন্দর শিক্ষা, যা ভারতীয়রা সক্রিয় ভাবে অনুসরণ করে থাকে।

তাই এই *যজ্ঞভাবটির* এক ব্যাপক অর্থে ব্যাখা করা হচ্ছে ঃ আমরা যা করি, তা যেন *যজ্ঞভাবে* করি। এক শিক্ষক ছাত্রদের পড়াচ্ছেন; বস্তুত তিনি *যজ্ঞই* করছেন। তিনি জ্ঞানলাভে উৎসুক এমন একটি মনকে *জ্ঞান* দান করছেন। অতএব, *গীতার* সংস্পর্শে এই সব ব্যাপারেই যজ্ঞ-ভাবনার এক ব্যাপক তাৎপর্য মূর্ত হয়ে উঠেছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন, *সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো,* 'এই সব লোকেই যজ্ঞ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করেছেন।' সমস্ত জীবনটাই *যজ্ঞ,* 'দান করা'; কী চমৎকার ভাব! লোকে রাজনীতিতে যে কাজ করে তা বস্তুত *যজ্ঞই*। বর্তমানে, রাজনীতি তার সেই যাজ্ঞিক চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে, কারণ রাজনীতিক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ক্ষমতা দখলই একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেবা ভাব, দেশবাসীকে স্বাধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তোলার কাজ এখন নেই বললেই হয়। রাজনীতির মূল কাজ হলো কোটি কোটি দেশবাসীকে শিক্ষা দিয়ে সচেতন করে তোলা যে—সে এক মহান গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক। এই সম্পূর্ণ সরকার সেই নাগরিকদের জন্যই, সরকারকে তাদের ওপর নির্ভর করতে হয়; তাদের কাছ থেকেই সরকার শক্তি পেয়ে থাকে। গণতান্ত্রিক রাজনীতির উদ্দেশ্যই হলো জনগণের মর্যাদা বৃদ্ধি করা। ভারতে কদাচিৎ তা করা হয়। আমরা কেবল আমাদের নিজেদের ক্ষমতা দখলের সন্ধানেই ব্যস্ত—তা ব্যক্তিগতই হোক আর রাজনীতিক দলগতই হোক। অতএব, দেখা যাচ্ছে, জীবনের ক্ষেত্র থেকে *যজ্ঞ*ভাবনাকে সরিয়ে নিলে জীবন হয়ে পড়ে অত্যন্ত সাধারণ, অথবা তার থেকেও নিম্নমানের। এতে মানব জাতির জীবনযাত্রা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জীবনে যজ্ঞ-ভাবনার সামান্য কিছুও যদি পালিত হয় তবে সবই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। শাসন ব্যবস্থা এক যজ্ঞ, রাজনীতি এক যজ্ঞ, শিক্ষাব্যবস্থাও এক যজ্ঞ। শ্রীকৃষ্ণ এইভাবেই যজ্ঞ কথাটি ব্যবহার করেছেন, এক ব্যাপকতম দৃষ্টি নিয়ে। *যান্তিব্রহ্ম সনাতনম্,* সেই সব লোক 'শাশ্বত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে', ধীরে ধীরে তাদের আধ্যাত্মিক শক্তি, তাদের গুণাবলী প্রভৃতি গড়ে তুলে। 'যারা এই যজ্ঞ-দৃষ্টি গ্রহণ করতে পারে না, তারা এই (মূর্ত জগৎ) তথা ইহলোকের সুখই লাভ করতে পারে না, অধ্যাত্ম জগতের তথা পরলোকের সুখের আর কী কথা, হে *কুরুশ্রেষ্ঠ?*'

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২॥

—'এইভাবে বেদের ভাণ্ডারে, ঐরূপ বহু যজ্ঞের কথা ছড়িয়ে আছে। জানবে যে সেগুলি সবই কর্ম থেকে উদ্ভূত; আর তা জেনে, তুমি মুক্ত হয়ে যাবে।'

বেদে এরূপ বহু *যজ্ঞের* কথা ছড়িয়ে আছে। কিন্তু, *কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বান্*, 'জানবে যে সেগুলি সবই কর্মজাত।' সব যজ্ঞই এক একটি *কর্ম*; এবং *জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে*, 'এ সত্য যখন তুমি উপলব্ধি করতে পারবে তখনই তুমি মুক্ত হয়ে যাবে', এই সব কর্মের মাধ্যমেই তুমি তোমার অন্তরের জ্ঞানকে ফুটিয়ে তুলছ। এই ভাবটি সর্বদা নিজ অন্তরে জাগিয়ে রাখ। অন্যথায়, কেবল কায়িক সাধনা বা আনুষ্ঠানিক সাধনা মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয় না। কিন্তু, এই সাধনার ফলে, যদি তুমি জ্ঞানাগ্নিকে প্রজ্বলিত করতে পার, তবে তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হবে। আর তুমি এই জীবনেই মুক্ত হবে। এমনকি আমাদের দৈনন্দিন কাজও আমাদের নিশ্চিত সহায়ক হতে পারে, যদি তা *জ্ঞান*-বিষয়ক এই সত্যের সঙ্গে যুক্ত থাকে। তারপর, পরবর্তী শ্লোকে, শ্রীকৃষ্ণ বললেন তাঁর চরম উক্তি— *জ্ঞান-যজ্ঞের*, 'জ্ঞানাগ্নিতে আহুতি'র শ্রেষ্ঠত্বের কথা।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩॥

—হে শত্রুদহনকারিন্; (ভৌত) দ্রব্য দ্বারা (অনুষ্ঠিত) যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞান-যজ্ঞ প্রশস্ততর; হে পার্থ, সকল কর্মই সামগ্রিকভাবে চরম সার্থকতা লাভ করে জ্ঞানে (ব্রহ্মজ্ঞানে)।'

এই শ্লোক থেকে আমরা জ্ঞানের, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রশংসায় এক সুন্দর স্তবগানের মধ্য দিয়ে চলব। এখানে একটি চমৎকার অনুচ্ছেদ পাওয়া যাবে, যা 'In Praise of Wisdom' বা 'জ্ঞানের প্রশংসায়'-নামক ইংরেজি কবিতার মতো। *পরন্তপ*, 'হে শত্রুদমন, অর্জুন', *জ্ঞান-যজ্ঞঃ* 'জ্ঞানের যজ্ঞ, জ্ঞানাগ্নিতে আহুতি'; *শ্রেয়ান্*, 'প্রশস্ততর'; *দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাৎ*, 'ভৌত বস্তু আহুতি দিয়ে যজ্ঞ করা অপেক্ষা'। এই যজ্ঞ, জ্ঞান-যজ্ঞ প্রশস্ততর, ঐ যজ্ঞগুলি হীনতর। এই *যজ্ঞ*, *জ্ঞানযজ্ঞ* প্রশস্ততর এই কথাই প্রথম ছত্রে বলা হয়েছে; এর পর শ্রীকৃষ্ণের উপসংহার হলো ঃ *সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে*, 'হে পার্থ, তুমি এটা সত্য জেনে রাখ যে, কালে সমস্ত *কর্ম জ্ঞানে* লয় প্রাপ্ত হবে।' সবই হয়ে উঠবে *জ্ঞান*, 'আধ্যাত্মিক জ্ঞান'। কর্মানুষ্ঠানের কৌশল জানলে, এই মানব শরীরে যত কিছু কাজ করা হয় সে সবই শেষ পর্যন্ত *জ্ঞানে* পরিণত হবে। তোমার যাত্রা কর্ম দিয়ে শুরু হলেও, তার সমাপ্তি ঘটবে উচ্চে, *জ্ঞানে*। এই অধ্যায়ের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক। তাই যদি সত্য হয়, তবে জ্ঞানের অন্বেষণ কর। সেই বিষয়েই বলা হয়েছে পরবর্তী শ্লোকে,

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥

—'তাঁকে (পরব্রহ্মকে) জান, (গুরুকে) সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে, বার বার প্রশ্ন করে, সেবা করে; *জ্ঞানী* গুরুগণ, যাঁরা সত্য উপলব্ধি করেছেন, তাঁরা তোমাকে সেই ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ দেবেন।'

যদি *ব্রহ্মজ্ঞান* বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও তার অর্জনই জীবনের লক্ষ্য হয়, যদি সমস্ত কর্ম শেষ পর্যন্ত *জ্ঞানেই* লয়প্রাপ্ত হয়, আর আমরা আদিষ্ট হই সেই *জ্ঞান* অর্জন করতে, তবে কী উপায়ে আমরা তা অর্জন করব? *জ্ঞান* সম্বন্ধে এই সত্য বুঝতে চেষ্টা কর—আচার্যের কাছে গিয়ে *তদ্ বিদ্ধি*, 'তা জান'; প্রণিপাতেন, 'আচার্যকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে'; আর *পরিপ্রশ্নেন*, 'আচার্যের কাছে ও নিজ মনের কাছে বার বার প্রশ্ন করে।' জ্ঞানোন্মেষের জন্য প্রশ্ন করা প্রয়োজন। এটা কোন মতবাদ নয়, প্রশ্ন করলে যার অস্তিত্ব লোপ পায়। কেবল যা সত্য বস্তু—তাই সহ্য করতে পারে প্রশ্নবানের আঘাত এবং উৎসাহিত করে আরও প্রশ্ন করতে। এ হলো বাস্তব অভিজ্ঞতা। তাই এ ধরনের জ্ঞান, *পরিপ্রশ্নের*—পুনঃপুনঃ প্রশ্নের অপেক্ষা রাখে; *পরিপ্রশ্ন*—বার বার প্রশ্ন করা ঃ এর অর্থ কী? কেন এমন হবে? কীভাবে তা করতে হবে? এভাবে প্রশ্ন করায় বোঝা যায় যে, তুমি এ বিষয়টির ওপর যথার্থ গুরুত্ব দিচ্ছ। প্রশ্ন সাধারণও হতে পারে, আবার গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের কথাই বলেছেন। অনেকে আছে যারা অযথা নিরর্থক প্রশ্ন করে থাকে। কখনো কখনো আমি রাস্তায় চলেছি অমন সময় কোন প্রতিবেশী প্রশ্ন করে বসল, 'মহাশয়, ঈশ্বর কী বস্তু?' কিন্তু উত্তর দেবার আগেই দেখি সে এগিয়ে চলে গেছে। তার আগ্রহ নেই। কেবল অলস প্রশ্ন করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। এমন লোকও আছে। কিন্তু এখানে অন্য রকম। প্রশ্নকর্তা বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন, তিনি অবশ্যই প্রশ্নের সদুত্তর তথা মীমাংসা চান।

সেবয়া, 'আচার্যের সেবার মাধ্যমে'। সেবা আধ্যাত্মিক উন্নতি, চারিত্রিক উৎকর্ষ, সাধনের এক বিরাট প্রেরণা মহাভারতের কয়েক স্থানে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ দুষ্ট রাজপুত্র দুর্যোধনকে তিরস্কার করে বলছেন, 'মনে হয় তুমি কখনো বৃদ্ধ জনের, গুরুজনের সেবা করনি, তাই তোমার চরিত্র এত মন্দ'। সেবা করতে শেখ, এ হলো চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের উপায়। অন্যথায়, আপন গরিমায় ভুলে থাকবে—আর কিছু হবে না। তাই, এখানে গুরুজনের সেবা, গুণিজনের

সেবা, পবিত্র ব্যক্তির সেবাকে সব সময়ে আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ হিসাবে গণ্য করা হয়।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানম্, 'তাঁরা এই জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দেবেন'; তাঁরা কে? *জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ,* 'যাঁরা জ্ঞানী, যাঁরা সত্য উপলব্ধি করেছেন'। *তত্ত্ব* হলো সত্যের প্রতিশব্দ, যার অর্থ হলো—'বস্তুটি যেমন তাই'। তাঁরা তোমাকে *জ্ঞান* সম্বন্ধে উপদেশ দেবেন। *জ্ঞান* লাভ করতে হলে এই ধাপটির প্রয়োজন আছে। যার জ্ঞান আছে তার কাছ থেকেই তোমাকে তা পেতে হবে। একটি ছাত্র স্কুলে যায়; সে Physiology (শারীর বৃত্ত) বা অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে কিছুই জানে না; শিক্ষক তাকে শিক্ষা দেন আর ছাত্রটি শিক্ষা পায়; কেউ শিক্ষা দেবে আর অন্য একজন শিক্ষা নেবে। এই ভাবেই আমরা জ্ঞানান্বেষণের উচ্চতর স্তর পর্যন্ত এগিয়ে চলি; শিক্ষকের কাছ থেকে আরো বেশি সাহায্য আমাদের প্রয়োজন, কিন্তু তার অধিকাংশই হয় আভাসে ইঙ্গিতে ও পরোক্ষ পরামর্শ দানে, ব্যক্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে নয়। নিম্নস্তরে, তোমার দরকার খুঁটিনাটি জ্ঞানের বিষয়ে উপদেশ। উচ্চ স্তরে, তোমার মন বিভিন্ন বিষয় বুঝতে সমর্থ হয়েছে। তাই, আভাসে-ইঙ্গিতে যে পরামর্শ দেওয়া হয় তাতেই এখানে ওখানে কাজ চলার পক্ষে যথেষ্ট আর ছাত্র আরো ভালোভাবে বিষয়টি বুঝতে আরম্ভ করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণী আর স্নাতকোত্তর শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য হলো, শেষেরটিতে খুঁটিনাটি শিক্ষা দেওয়া হয় না। প্রয়োজনও নেই—সেখানে আভাসে ইঙ্গিতে পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে; বলা হয় 'লাইব্রেরিতে বই দেখে, নিজে এ বিষয়ে জেনে নাও'। এইভাবে ছাত্রকে স্বনির্ভর হতে শেখান হয়, কারণ ছাত্রের মন তখন পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। আগেকার স্তরে তেমনটি হয়নি। তখন শিক্ষককে অ, আ, ক, খ, থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি সামান্য বিষয়ও শেখাতে হয়েছে। সেইরূপ এ ক্ষেত্রে, এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের ক্ষেত্রে, অনন্ত, অমৃত, অদ্বৈত সত্যস্বরূপ, ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে—শিক্ষা দেওয়া হয় অতি অল্প কথায়; যত অল্প হয় ততই ভাল। এই বিশেষ ক্ষেত্রে কথার তুলনায় মৌনভাব অনেক বেশি কার্যকরী।

শ্রীকৃষ্ণ তিনটি উপায়ের কথা বলেছেন ঃ প্রথমটি হলো *তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন,* 'প্রণামের মাধ্যমে তা জেনে নাও'। ছাত্র যদি গর্বিতভাব নিয়ে যায়, তার মন কখনই জ্ঞান লাভের উপযুক্ত হতে পারে না। কোন ছাত্র যদি অতি গর্বিত মনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ আরম্ভ করে, তবে সে সেখানে কী লাভ করবে? কিছুই না। আমি কিছু চাই, আমার অন্তরের কিছু শূন্যতা রয়েছে, আমি

কিছু অভাব বোধ করছি, তাই তো আমি সেখানে গেছি। তাই তো আমি আমার শিক্ষাদাতা শিক্ষককে শ্রদ্ধা করি। তিনি আমার থেকে বেশি জানেন। তাই, ঐ নম্রভাব আমাদের দরকার, তবেই আমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারব, আর গৃহীত উপদেশ হজম করতে পারব। প্রকৃত জ্ঞান লাভের জন্য মনের ঐরূপ প্রবণতা অবশ্যই অপরিহার্য। জ্ঞান তখন প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে চরিত্র ও বোধ শক্তিরূপে। এখানে *জ্ঞান* বলতে সেই জ্ঞান যা যথেষ্ট পরিপক্ক হয়ে বোধশক্তিরূপে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে এবং সক্ষম হবে সাধককে আধ্যাত্মিক মুক্তি বিধান করতে। ঐরূপ জ্ঞানের কথাই এখানে উল্লিখিত হয়েছে। তাই, *উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানম্*, 'তাঁরা তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দেবেন'; তাঁরা কারা? *জ্ঞানিনঃ* 'ঐ *জ্ঞান* যাঁরা আগেই লাভ করেছেন', *তত্ত্বদর্শিনঃ*, 'যাঁরা ঐ তত্ত্বকে উপলব্ধি করেছেন'। *তত্ত্বম্ মতম্* থেকে ভিন্ন। কোন বস্তু সম্বন্ধে যা সত্য, তাই *তত্ত্বম্*। চরম *তত্ত্ব* হলো ব্রহ্ম। সমগ্র জগতের পেছনে রয়েছে সেই অনন্ত সত্য, যাকে উপনিষদে বলা হয়েছে *সত্যস্য সত্যম্*, সত্যের সত্য বা চরম *তত্ত্বম্* বা *পরম তত্ত্বম্*। এই সব কথাগুলি বেদান্ত সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাই, আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে পারদর্শী আচার্যের সহায়তার মাধ্যমেই আমরা এই জ্ঞান লাভ করতে পারি, ঠিক যেমন অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান আমরা লাভ করতে পারি, সেই সেই বিষয়ে পারদর্শী শিক্ষকের কাছ থেকে। সেগুলি সবই জ্ঞান, হতে পারে ভৌত জ্ঞান, হতে পারে মানসিক জ্ঞান, হতে পারে আধ্যাত্মিক জ্ঞান। কিন্তু, বেদান্তের দিক থেকে সব জ্ঞানই পবিত্র। আর আমরা সেই জ্ঞানেরই অন্বেষণ করছি। তাই উপদেশ দেওয়া হয়—শিশু-হৃদয়ে জ্ঞানের আগুন প্রজ্বলিত করতে। শিশু চায় বই পড়তে, স্কুলে যেতে, সে আর কেবল পুতুল নিয়ে খেলতে চায় না। এই ভাবেই শিশু নিজ মনে জ্ঞানের আগুন জ্বালায়। আর স্কুলে তার শিক্ষক তাকে সাহায্য করে এই অগ্নিশিখাকে বৃহৎ অগ্নিমণ্ডলে পরিণত করতে, যাতে সে যা শিক্ষা পায় তাকে হজম করে, তার দ্বারা স্বীয় পুষ্টিসাধন করে তাকে স্বীয় চরিত্রের অঙ্গীভূত করে—সে এক সৎ নাগরিকে—সৎ ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারে। এই শ্রেষ্ঠ সত্য সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে আমাদের কী লাভ হবে? তখন আমরা মোহজাল থেকে, সন্দেহজাল থেকে, দুর্বলতা থেকে মুক্ত হব। তা আলোচিত হবে পরবর্তী শ্লোকে।

যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥

—'হে পাণ্ডব, যে জ্ঞান লাভ করে তুমি, আর এইরকম মোহগ্রস্ত হবে না, যার ফলে সমগ্র সৃষ্টবস্তুকে তোমার আত্মায়, তথা আমাতে, অবস্থিত দেখতে পাবে।'

'এই সত্য', *তত্ত্বম্*, উপলব্ধি করার পর, *ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব*, 'এই রকম মোহ, যা তোমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তা আর আসবে না।' তুমি সব রকম মোহ-সম্ভাবনার পারে চলে যাবে। শুধুমাত্র বর্তমান মোহ নয়, ভবিষ্যতে মোহজালে পড়ার সম্ভাবনাও তোমার থাকবে না। সত্য-জ্ঞানে মোহ সম্ভাবনাও নষ্ট হয়ে যায়। এই হলো সত্যের স্বভাব। *যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মনি*, 'এই সত্যের জ্ঞান হলে, তুমি দেখবে সমগ্র জগৎ অবস্থান করছে তোমার, তথা অনন্ত আত্মার মধ্যে'; অথো ময়ি, যেমন আমার মধ্যেও, তথা শ্রীকৃষ্ণের—ঈশ্বরাবতারের মধ্যেও। এই ভাবে, আধ্যাত্মিক উন্নয়নে, আমরা সকল সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে পরস্পর ভেদবুদ্ধি দূর করে দিয়ে থাকি। সাধারণত আমাদের পরস্পরের মধ্যে ভেদদৃষ্টি থাকে। যতই আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, এই ভেদবুদ্ধি দূরীভূত হয়। আমরা মূলত এক। এইটি হলো শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। সমস্ত বিশ্ব জুড়ে কী মহান পরিবর্তনই না আসছে। একশত বছর আগেও জাতিভেদ, বর্ণভেদ এবং মানুষে মানুষে নানারকম ভেদ অতিমাত্রায় দেখা যেত। সে সব ভেদবুদ্ধি আমরা ধীরে ধীরে নিয়মিতভাবে পরিহার করছি। আমরা এক, মানব জাতি এক; কী সুন্দর ভাব!

প্রায় ৯০ বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ এই ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে মানবিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছিলেন মাদ্রাজে তাঁর *Vedanta in its Application to Indian Life* (ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা) শীর্ষক বক্তৃতায়।[১]

"আমাদের উপনিষদ্ থেকে আর একটি মহান উপদেশ লাভ করার জন্য পৃথিবী অপেক্ষা করছে—সমগ্র বিশ্বের অখণ্ডত্ব। অতি প্রাচীনকালে এক বস্তু ও আর এক বস্তুতে যে পার্থক্য বিবেচিত হতো, এখন অতি দ্রুত তা চলে যাচ্ছে।... আমাদের উপনিষদ্ ঠিকই বলেছেন—অজ্ঞানই সব রকম দুঃখের কারণ। সামাজিক বা আধ্যাত্মিক জীবনের যে কোন অবস্থায় প্রয়োগ করি না কেন, দেখা

১ বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৩২-৩৩

যায়, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। অজ্ঞানতাবশতই আমরা পরস্পরকে ঘৃণা করি, পরস্পরকে জানি না বলেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা নেই। যখনই আমরা পরস্পরকে ঠিক ঠিক জানতে পারি, তখনই আমাদের মধ্যে প্রেমের উদয় হয়, তা হবেই তো কারণ আমরা সকলেই কি এক নই? সুতরাং দেখা যাচ্ছে, চেষ্টা না করলেও আমাদের সকলের একত্ব ভাব স্বভাবতই এসে থাকে।

"রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রেও যে সকল সমস্যা বিশ বছর পূর্বে শুধু জাতীয় সমস্যা ছিল, এখন আর জাতীয় স্তরে সেগুলির সমাধান করা যায় না। ঐ সমস্যাগুলি ক্রমশ বিপুলায়তন হয়ে উঠছে, বিরাট আকার ধারণ করছে। প্রশস্ততর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকেই শুধু তাদের মীমাংসা করা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক সংহতি, আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ, আন্তর্জাতিক বিধান—আজকের দিনের জিগির হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটাই বিশ্বজনীন সংহতির লক্ষণ।"

পশু-পক্ষীর মতো মানবেতর জাতির ক্ষেত্রেও আমরা একত্ব-জ্ঞানকে প্রসারিত করছি। তাদের প্রতিও আমরা করুণা বিস্তারের পথ খুঁজছি। এ জাতীয় শিক্ষাও মানব জাতির কাছে এসে পৌঁছচ্ছে। তাই, এ হলো মানবীয় ক্রমবিকাশ : ভেদনীতি ক্রমে ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং আমাদের মৌলিক একত্ব সম্বন্ধে আমাদের উপলব্ধি ক্রমেই বাড়ছে।

১৯৪৫ খ্রিঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর, মানব জাতির এ এক বিরাট প্রাপ্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে এই সব ভেদনীতির ওপরই যত গুরুত্ব দেওয়া হতো। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানব মনকে এক প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছে, মানব হৃদয়ে এক নতুন প্রজ্ঞা সঞ্চারিত হতে আরম্ভ করেছে। তারপর থেকে এক 'বিশ্বমানবীয় সচেতনতা'র ক্রমবিকাশ ধীর ও স্থির গতিতে চলেছে, দেখা যায়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংস্থাগুলি সবই 'বিশ্বমানবীয় সচেতনতা'র ভাবকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ভারতে আমরা এখন আর বলি না যে অন্য দেশের লোকেরা ম্লেচ্ছ। ৭০ বছর আগেও আমরা তা বলেছি। এখন আমরা ও কথা একেবারেই বলি না। তেমনি পাশ্চাত্য জাতিও আগে বলতো—অশ্বেতকায় জাতির স্থান মানবীয় মর্যাদার নিম্নে। এমনকি, অস্ট্রেলিয়াতে, আমি যখন ১৯৫৮ খ্রিঃ সেখানে প্রথম যাই, তখন দেখেছি, বর্ণ সচেতনতা, ভেদভাবরূপ যন্ত্রণাদায়ক নিদানটি বর্তমান রয়েছে; কিন্তু গত কয়েক বছরে, আমি লক্ষ্য করেছি—বর্ণ সচেতনতা প্রায় সম্পূর্ণ মুছে গেছে; কেবল একটি ছোট্ট শ্বেতকায় গোষ্ঠী এখনও ওটিকে ধরে রেখেছে। মানবিক একত্বের ভাবটি ধীরে ধীরে মানব সমাজে অনুভূত হচ্ছে। কঠোপনিষদে (২.১.১১) এই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে :

মনসৈবেদম্ আপ্তব্যম্ নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥

'এই সত্যের ধারণা হবে মনে, সে জন্য মনের শিক্ষা চাই', *মনসৈবেদম্ আপ্তব্যম্*। সত্যটি কী? *নেহ নানাস্তি কিঞ্চন,* 'এ জগতে নানা বা বহু বা পৃথকত্ব বলে কিছু নেই।' পৃথক্‌ভাব কেবল ওপরে ওপরে। গভীর তলদেশে একত্ব বিরাজ করছে। আর তারপর, *মৃত্যোঃ স মৃত্যুম্ গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি,* 'যে লোক পৃথক্‌ভাব দেখে, আর সেই বোধ অনুযায়ী জীবনযাপন করে, মৃত্যুর পর মৃত্যু পথেই তার গতি হয়'। ভারতের ঋষিদের এই শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও ভারত পৃথকত্বের ওপরেই জোর দিচ্ছে। সমগ্র ভারত পরিণত হয়েছিল অনেকগুলি অংশে, ছোট ছোট রাজ্যগোষ্ঠীতে—প্রত্যেকে পরস্পর পৃথক, পরস্পর যুদ্ধে ব্যাপৃত; ফলে তারা বহিরাক্রমণের শিকার হয়েছিল। এই ভাবে, আমরা *মৃত্যোঃ স মৃত্যুম্ গচ্ছতি য ইহ নানা ইব পশ্যতি*—এই সত্যের অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। বেদান্তের এই শিক্ষা সত্ত্বেও আমরা সর্বত্র ভেদ খুঁজে বেড়িয়েছি। আমরা মানুষে মানুষে কতকগুলি ভেদ সৃষ্টি করেছি। কিছু মানুষকে স্পর্শ করা চলবে না, কিছু মানুষের কাছে যাওয়া চলবে না, কিছু মানুষকে চোখে দেখাও নিষেধ—এত সব পাপ। আর যখন ভিন্ন দেশের লোক এসেছে, আমরা তাদের স্পর্শ করিনি, তাদের সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান বা শিক্ষণীয় বিষয়—পরস্পর বিনিময়ও করিনি।

আল্ বেরুনি ১১শ শতাব্দীতে ভারতে এসেছিলেন। তিনি তাঁর ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখে গেছেন ঃ 'এ দেশের লোকেদের কী হয়েছে? তারা এত সঙ্কীর্ণ, যে অন্যের সঙ্গে মিশতে চায় না, অন্যের সঙ্গে তাদের অভিজ্ঞতার বিনিময়ও করতে চায় না। তাদের পূর্বপুরুষগণ এরূপ ছিলেন না। তারা অন্যের কাছে যেমন শিখেছে তেমনি অন্যকেও শিখিয়েছে। কিন্তু এখনকার এই সব লোক এতই সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে।' তিনি হাজার বছর আগে যা বলে গেছেন বহু শতাব্দী ধরে তার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। আর ৯০ বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দও আমাদের এই জাতীয় ভ্রান্তির কথা উল্লেখ করেছেন[১] ঃ

"যখনই ভারতবাসীরা 'ম্লেচ্ছ' শব্দ আবিষ্কার করল ও অপর জাতির সঙ্গে সব রকম সংস্রব পরিত্যাগ করল, তখনই ভারতের অদৃষ্টে ঘোর সর্বনাশের সূত্রপাত হলো।"

---

১ বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২৯

বর্তমানে আমরা ঐ সঙ্কীর্ণ মনোভাব থেকে উদারতর মনোভাবের দিকে চলেছি। আমরা এখন অন্য দেশের লোকের সঙ্গে মিশতে চাই। আমরা দেখতে চাই যে একই মানবজাতি সর্বত্র রয়েছে, একই সমবেদনা তাদের মধ্যে রয়েছে, একেই অপরকে সাহায্য করার সামর্থ্য তাদের মধ্যে রয়েছে। কী চমৎকার ভাব! যারা আমেরিকায় যায়, তারা পরস্পর পরিচিতি ছাড়াও ওখানকার কোন না কোন লোকের কাছ থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়ে থাকে তখন তাদের বোধ হয় যে মানবজাতি একটিই।

পাঞ্জাবের স্বামী রামতীর্থ একটি গল্প বলেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে তিনি ভারতের মহান মনীষী ও আধ্যাত্মিক আচার্যগণের অন্যতম বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ভাবে খুবই প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি ১৮৯৭ খ্রিঃ লাহোরে স্বামীজীর বক্তৃতাবলীর ব্যবস্থা করেছিলেন। এবং তার কিছু পরেই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি গণিতশাস্ত্রের এক তীক্ষ্ণধী অধ্যাপক ছিলেন। এরপর তিনি জাপানে যান, সেখান থেকে আমেরিকায়। তাঁর সঙ্গে অর্থ ছিল না; ঐভাবেই তিনি আমেরিকায় পদার্পণ করেন। এইরকম গল্প আছে ঃ এক আমেরিকাবাসী তাঁকে দেখে বলেন, 'আপনি কোথা থেকে এসেছেন? ভারত থেকে?' 'হাঁ, আমি ভারত থেকেই এসেছি।' 'তা, কোথায় থাকবেন? কার কাছে থাকবেন?' রামতীর্থ তখনই বলেন, 'আমি আপনার কাছেই থাকব!' ঐ আমেরিকাবাসীটি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তিনি কথাগুলি এমনই স্বাভাবিকভাবে বলেছিলেন যে ঐ আমেরিকানটি তাঁকে অতিথি হিসাবে গ্রহণ করে তাঁর দেখাশোনা করেছিলেন।

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, যখন আমাদের মন ভেদবুদ্ধি থেকে মুক্ত হয়, আমরা তখন অন্যের হৃদয়ে *প্রবেশ* লাভ করতে পারি। তা না হলে, তোমার পক্ষে অন্যের হৃদয়ে স্থান করে নেওয়া সম্ভব হয় না। এই শিক্ষার ওপর বেদান্তে খুবই জোর দেওয়া হয় ঃ *মৃত্যোঃ স মৃত্যুম্ গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি*, 'তোমার ভেদবুদ্ধি যদি একটুও থাকে, তবে সেই ভেদবুদ্ধিই তোমাকে ধ্বংস করবে।' ভেদভাব একটি তথ্য বটে, কিন্তু সত্য নয়, সত্য হলো আমরা এক। স্থূলভাবে আমরা বস্তুতে বস্তুতে ভেদ দেখে থাকি। প্রত্যেকটি বস্তু অন্য বস্তু থেকে পৃথক্। কিন্তু এর পেছনে রয়েছে সত্য, রয়েছে একত্ব, *একম্ এব অদ্বিতীয়ম্*, 'এক ব্রহ্ম যার দ্বিতীয় নেই', সেই এক রয়েছে বহুর, তথা বিশ্বের পেছনে। সুতরাং এই হলো *জ্ঞান*। এই *জ্ঞানের* সাহায্যে আমরা মহাশক্তি অর্জন

করতে পারব, আর দুর্বলতা নয়, আর ভেদভাবের মোহে পড়ে, মৃত্যু ভয়ে, বার বার মৃত্যু বরণ নয়; এ অবস্থা কখনই আসবে না যদি এ সত্য এই জীবনেই উপলব্ধি করা যায়। সেই মাত্রায় বর্তমান ভারতের উন্নতিও দেখা যাচ্ছে। যদিও মানুষে মানুষে ভেদভাব, বিভিন্ন জাতের মধ্যে ভেদভাবের ওপর জোর দেওয়ার মতো পুরাতন টানটুকু এখনো রয়েছে—তবু সার্বিক প্রবণতা হলো ঐগুলোকে অতিক্রম করা এবং মানুষের অন্তরস্থ মৌলিক মানবিকতা উপলব্ধি করা—শুধু ভারতবর্ষের অভ্যন্তরেই নয়, ভারতের বাইরেও।

সারা বিশ্ব জুড়ে মানবিক উন্নতিকল্পে এক বৃহত্তর প্রচেষ্টার পক্ষে কী সুন্দরই না এই পরিস্থিতি; যে কেউ বিদেশে ঘুরে এসেছে, সেই এ সত্য স্বীকার করতে পারবে যে, সর্বত্র একই মানবজাতি বিরাজ করছে। তাদের মধ্যে বিরাজ করছে একই হৃদয়, একই সমবেদনা, অন্যের বিপদে সাহায্য করার মতো—একই বলিষ্ঠ হস্ত। আমার নিজেরই এরকম ঘটনার প্রচুর অভিজ্ঞতা হয়েছে, যখন আমি প্রায় ৫০টি দেশে সাংস্কৃতিক বক্তৃতা সফরে ঘুরেছি। এক সময়ে, আমি রেলগাড়ি থেকে নেমেছি লন্ডন স্টেশনে, প্যাডিংটন অথবা লিভারপুল স্টেশনে, পরে ট্যাক্সিতে উঠে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে ইংরেজ ড্রাইভারকে যখন ভাড়া দিতে গেলাম, সে বলল, 'না, আমি আপনার কাছ থেকে টাকা নেব না। আপনি নিজে লোককল্যাণ করছেন, আমি ভাড়া নেব না!' আমি তো অবাক! আমি তাকে বলি, 'তা নয়, আমাদের কাছে যে আর এক জন রয়েছেন তিনি তোমাকে দিচ্ছেন, আমি নয় আর ইনি ভালই রোজগার করেন, তুমি অনুগ্রহ করে ভাড়া নাও'। আমরা একরকম জোর করে তাকে ভাড়া নেওয়ালাম। তা না হলে, সে নিত না। আমি তাকে কখনো চিনি না, সেও আমাকে চেনে না। কিন্তু, মনের দিক থেকে, আমাদের পারস্পরিক কোন বিষয় আমাদের ভেদভাবকে দূর করে দিয়েছিল। আমি ইটালীর St. Francis of Assissi তীর্থক্ষেত্রে গেছলাম। সেখানে দেখি রোমের কোন ভদ্রলোক আমার জন্য হোটেলে একটি ঘর রিজার্ভ করে রেখেছেন; হোটেলের লোক বলল ঃ 'স্বামীজী এই ঘরটি আপনার জন্য, আর এর জন্য টাকা তিনি দিয়ে গেছেন'। এই পর্যন্ত। আমি জানতাম না কে ঐ ব্যক্তি। এ রকম বহু জায়গায় লোকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে, কারণ তারা মনে করে—আমরা সকলে এক। ঐ ভাবকে দৃঢ়তর করতে হবে। তাই উপনিষদে (কঠঃ ২.১.১১) বলা হয়েছে, *মনসৈবেদমাপ্তব্যম্,* 'সত্যকে মন দিয়েই উপলব্ধি করতে হবে'; তোমার সন্তানদের শিশুকাল হতেই শেখাও এই সত্য, *নেহ নানাস্তি কিঞ্চন,* 'এ জগতে পৃথক্ত্বের মনোভাব একেবারেই নেই,'

আমরা মূলত এক। এই পৃথকত্বের মনোভাব শিশুমন থেকেই একেবারে দূর করে দিতে হবে। তবেই উন্নততর জগৎ আসবে। *মৃত্যোঃ স মৃত্যুম্ আপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি*, 'যে ইহলোকে পৃথক্‌ভাব দেখতে থাকে, সে মৃত্যু থেকে পুনর্মৃত্যুর দিকে যায়'—জীবন থেকে জীবনের দিকে নয়। জীবন থেকে জীবন কেবল তখনই আসে, যখন পরস্পরের মধ্যে একত্বভাব উপলব্ধি করা যায়।

আগামী শতাব্দীতে ভারতের উন্নতি ঐ ভাবনার মধ্য দিয়েই আসবে। মহাসমন্বয় ঘটবে, মানুষে মানুষে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে; বর্তমান দুঃখকষ্টগুলি পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির এক একটি পর্বমাত্র। কালে দেশবাসী সেগুলিকে কাটিয়ে উঠবে যখন তাদের মধ্যে বেদান্তের বাণী ছড়িয়ে পড়বে। জাতীয় উন্নতি ও আন্তর্জাতিক সুসম্পর্ক যে দর্শন থেকে প্রতিশ্রুতি লাভ করে থাকে, সেটাই হলো বেদান্ত দর্শন। আর অনেকেই স্বামী বিবেকানন্দ পরিবেশিত বেদান্ত অধ্যয়ন করছে, অনুধাবন করছে একত্ব সম্বন্ধে, অভেদভাবনা সম্বন্ধে, *ত্যাগ* ও *সেবাভাব* সম্বন্ধে, তাঁর শিক্ষাগুলি। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাক।' সেই অদ্বৈতজ্ঞান থাকবে তোমার অন্তরে। তা হলে তুমি পারস্পরিক ব্যবহারে সুফল পাবে। তাই বলা হয়েছে, *যেন ভূতানি অশেষেণ দ্রক্ষ্যসি আত্মনি অথো ময়ি*, 'এই জ্ঞান লাভ করলে, তুমি (ব্রহ্মা থেকে স্থাবর) সকল সৃষ্ট বস্তুকে স্বীয় আত্মাতে এবং আমাতেও দেখতে পাবে,' তোমার নিজ অনন্ত আত্মায় এবং আমাতে—আমার দিব্য ব্যক্তিত্বে—*পুরুষোত্তমে* অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাঁর সর্বজনীন মাত্রার জন্য। কোন কিছুর সর্বজনীন মাত্রা থাকলে, তা প্রত্যেকেরই আকর্ষণীয় হয়। তিনি যেন ভারতীয়ের অন্তরের কাছে 'Pied Piper'-এর বাঁশি বাজিয়ে, সর্ব-জীব-আকর্ষণকারী বংশীবাদকের মতো। যেমনই তাঁর বাঁশিতে সুর-সংযোগ ঘটে সারা বিশ্ব তাঁর কাছে চলে আসে। এমনই সে আকর্ষণের প্রকৃতি। এইজন্যই সমগ্র ভারত শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত। তিনি আমাদের *অন্তর্যামী*, অন্তরাত্মা। এই কথা বলে পরবর্তী ৩৬তম শ্লোক আরম্ভ হচ্ছে :

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬॥

—'তুমি যদি সকল পাপীর মধ্যে পাপিষ্ঠও হও, তবু একমাত্র এই জ্ঞানের ভেলায় চড়ে, দুস্তর পাপ সমুদ্র পার হয়ে যাবে।'

পাপীদের মধ্যে পাপিষ্ঠ হলেও, জ্ঞানপ্লবা 'জ্ঞান জাহাজের' সাহায্য নিয়ে সে পাপ সমুদ্র পার হতে পারে। *অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ*, 'সব পাপীদের মধ্যে পাপিষ্ঠ হলেও', *জ্ঞানপ্লবেনৈব* 'কেবল আধ্যাত্মিক জ্ঞান রূপ নৌকার সাহায্যে' তুমি *বৃজিনম্* 'পাপে'র সমুদ্র, সন্তরিষ্যসি, 'পার হয়ে যাবে'; সব জ্ঞান, বিশেষত অধ্যাত্ম জ্ঞান শক্তিপ্রদ; ইংরেজি প্রবাদে বলে 'Knowledge destroys fear'—অর্থাৎ 'জ্ঞানে ভয় বিনষ্ট হয়ে যায়'। অতএব, কখনো নিরাশ হয়ো না। প্রত্যেকেরই আশা আছে। এই *জ্ঞান* প্রত্যেকের কাছে মহান আশীর্বাদস্বরূপ। *সর্বম্ বৃজিনম্* সমস্ত পাপ, সন্তরিষ্যসি 'তুমি পার হয়ে যাবে।' শ্রীকৃষ্ণ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ৩৭তম শ্লোকে ঃ

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭॥

—'হে অর্জুন, প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন অনেক কাঠকে ভস্মীভূত করে, তেমনি অধ্যাত্ম জ্ঞানরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হলে সমস্ত কর্মই ভস্মীভূত হয়ে যায়—সে সকল কর্ম আর ফল প্রসব করে না।'

ঠিক যেমন অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মে পরিণত করে, *এধাংসি*, হলো কাষ্ঠ, *যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নিঃ*, 'প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন, কাষ্ঠরাশিকে', *ভস্মসাৎ কুরুতে অর্জুন*, 'ভস্মে পরিণত করে, হে অর্জুন' *জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা*, 'তেমনি জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্মকে দগ্ধ করে ভস্মে পরিণত করে', আর *জ্ঞানই* কেবল অবশিষ্ট থাকে। *জ্ঞান-স্বরূপ* 'জ্ঞানই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ', তাই এ কার্যের পরে কেবল জ্ঞানই অবশিষ্ট থাকে। এই ভাবেই জ্ঞানের প্রশস্তি চলেছে পরপর কয়েকটি শ্লোকে। যেমন আগে বলা হয়েছে, *জ্ঞানাগ্নিঃ*, 'আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অগ্নি', একটি সুন্দরভাব! ঠিক *জঠরাগ্নি*, 'পরিপাকাগ্নি', যার কথা আমি আগে বলেছি। ঐ জ্ঞানাগ্নি সেইরকম অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতাকে ভস্মসাৎ করে দেবে, কোন রকম মর্মপীড়ার অবকাশ রাখবে না। চারিত্রিক পরমোৎকর্ষ লাভের জন্য সব লোকেরই মনে এই ভাব গড়ে তোলা দরকার। চারিত্রিক উৎকর্ষের অর্থ হলো অন্তরে প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জ্বলন্ত অগ্নির অবস্থান। গান্ধীজীর অন্তরে এই প্রচণ্ড জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত ছিল। সকল মহান আধ্যাত্মিক আচার্যদের ক্ষেত্রেও তাই। সাধারণ মানুষের মধ্যে যাদের চরিত্র বিশেষরূপে ভাল, তারাও এই জ্ঞানাগ্নি প্রকাশ করতে পারেন। তাই, এই ভাবটি কেবল তত্ত্ব নয়, মতবাদ নয়, পরন্তু সত্য, যা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করতে পারে। তুমি

যখন জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করবে, তখন তুমি তোমার সমস্ত মানসিক যন্ত্রণা ও চাপ সম্বন্ধে সমুচিত ব্যবস্থা নিতে পারবে। আজকাল আধুনিক মানবের মধ্যে এই জ্ঞানাগ্নির অতি সামান্যই বর্তমান। তাই এতরকম মানসিক যন্ত্রণা, স্নায়বিক বৈকল্য এবং হিংসা ও আত্মহত্যার প্রবণতা। কিন্তু যখন এই জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হবে তখন আমরা মানসিক স্থিরতা অর্জন করতে পারব। কোন মন্দ ভাবনা থাকবে না, কারণ ঐ অগ্নি সবই নষ্ট করে দেবে। এমনকি আবর্জনাও সেই অগ্নিতে ভস্মসাৎ হয়ে যাবে। তাই, এই ভাবে জ্ঞানাগ্নি ভাবটি গীতার এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত ও প্রশংসিত হয়েছে। পরবর্তী শ্লোকে জ্ঞান-স্তুতিতে আর এক মাত্রা যুক্ত হয়েছে।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥

—'সত্যই, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের তুল্য শুদ্ধিকর বস্তু জগতে আর কিছুই নেই। সময় হলেই, যোগে সিদ্ধ হলেই—কর্মযোগে চিত্ত শুদ্ধ হলে—মুমুক্ষু ব্যক্তি স্বীয় আত্মাতেই ঐ ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধি করে থাকেন।'

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রম্ ইহ বিদ্যতে, 'জ্ঞানের মতো চিত্তশুদ্ধিকর বস্তু ইহ জগতে আর নেই'। *পবিত্রম্* অর্থাৎ শুদ্ধিকর। তুমি তোমার কাপড়-চোপড় সাবান-জলে কেচে থাক এবং শরীরটাকে ধুয়ে নাও ঐ সাবান আর জল দিয়েই। এসব দেহের পক্ষে ভাল। মানব-তন্ত্রের বাকি বিষয়গুলিকে শুদ্ধ করতে পারার উপকরণ হলো একমাত্র *জ্ঞান*। এ জগতে *জ্ঞানের* মতো এত শুদ্ধিকর আর কিছু নেই, *ইহ*, অর্থাৎ এ জগতে, এই মনুষ্য জীবনে। *তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি*, 'কালক্রমে যোগে সিদ্ধ হয়ে, তুমি নিজে সেই বস্তুকে উপলব্ধি কর', পরোক্ষভাবে বা লোকমুখে নয়। প্রথমে সে অগ্নি স্ফুলিঙ্গের আকারে প্রতিভাত হবে, কিন্তু পরে তা বিরাট অগ্নিকাণ্ডের রূপ নেবে। ওটি তোমার কাছে আসবে, কারণ বেদান্ত বলে ওটিই তোমার প্রকৃত স্বরূপ; এর জন্য তোমাকে ভিক্ষা করতে বা ধার করতে হবে না। *কালেনাত্মনি বিন্দতি*, 'তুমি উপযুক্ত সময়ে তা অর্জন করবে', তাড়াতাড়ি করলে হবে না; স্বীয় রূপে গড়ে উঠতে অগ্নির সময় লাগে তার পরেই সেই জ্ঞানাগ্নির আশীর্বাদ লাভ করা সম্ভব। *আত্মনি বিন্দতি*, 'তুমি স্বীয় অন্তরে তা উপভোগ করবে'। তুমি উপলব্ধি করবে : 'হাঁ, আমার মধ্যেই ঐ অগ্নি রয়েছে। ছোটখাট দুঃখকষ্টে আর এখন আমায় ক্লিষ্ট হতে হবে না। ঐ কথা বলতে পারার অর্থ কী? এর অর্থ

হলো, তুমি তোমার অন্তরে জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়ে ফেলেছ। যখন তুমি বড়সড় যন্ত্রণাও অতিক্রম করতে পারছ, তখন তুমি বলতে পার, হাঁ, ঐ অগ্নি এখন আরো জোরালো, আরো তেজী হয়ে উঠেছে।'

এইভাবে, অনেকে প্রচুর চাপ ও যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে, কারণ তাদের অন্তরে রয়েছে প্রজ্বলিত জ্ঞানাগ্নি। যাদের মধ্যে এই অগ্নির নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর মাত্রায় বিদ্যমান, তারা একটুতেই বিহ্বল হয়ে পড়ে। ঠিক যেমন স্নায়ুবিদ্যায় আমরা বলে থাকি ঃ যন্ত্রণা সহন ক্ষমতা এক এক জনের এক এক রকম। কোন লোক অল্প যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে; কোন কোন লোক সামান্যমাত্র যন্ত্রণাও সহ্য করতে পারে না। ১৯৩৩ খ্রিঃ আমাদের মহীশূর আশ্রমে আমার ছাত্রাবাসে তরুণ ছাত্ররা থাকত; তাদের ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক টিকা দেবার জন্য এক ডাক্তারকে আনা হলো। অধিকাংশ ছেলে ইনজেকসনের কষ্ট সহ্য করল। কিন্তু দুটি একটি ছেলে ইনজেকসনের সূচ দেখেই অজ্ঞান হয়ে গেল। সূচটাকে দেখেই তারা জ্ঞান হারিয়ে ফেলল! এতেই তুমি বুঝে নিতে পারবে, এই সব ছেলেদের মধ্যে জ্ঞানাগ্নির কতটুকুই বা আছে। কিন্তু, তবু তার পরিবর্তন হতে পারে। পরে সে শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। তাই এই ভাবে দেখা যায়, জীবনকে সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করার সামর্থ্য নির্ভর করে, তুমি তোমার হৃদয়ে কীরূপ জ্ঞানাগ্নি, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলো জ্বালাতে পেরেছ, তার ওপর। সে অগ্নি যদি শুদ্ধ ও সমুজ্জ্বল হয়, তবে তুমি যে কোন আজেবাজে ঝুটঝামেলা কাটিয়ে উঠতে পারবে, তোমার মন একেবারেই তাতে বিচলিত হবে না। এই হলো মানসিক স্থৈর্য। এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ আগেই বলেছেন দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে *স্থিতপ্রজ্ঞ*, 'স্থির বুদ্ধি লোকে'র প্রসঙ্গে। এই অধ্যায়ে তিনি বিষয়টি বিস্তৃত ব্যাখ্যা করছেন।

'জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করা' এক সুন্দর ধ্যানধারণা। এই জন্যই তো সব রকম জ্ঞানের প্রয়োজন। শিক্ষালাভের মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন করা, তা কেবল পুঁথিগত বিদ্যা নয়, পরন্তু সেই জ্ঞান, যা এক পূর্ণাঙ্গ চরিত্রের বিকাশ ঘটায়। এতেই তোমার উপলব্ধি হবে যে, তোমার অন্তরে জ্ঞানাগ্নি জ্বলেছে। *ন হি জ্ঞানেন সদৃশং* 'জ্ঞানের সমান আর কিছু নেই'। ৭০ বৎসরাধিক কাল আগে যখন মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হয়, তাঁরা এই শ্লোকটিকে তাঁদের নীতিবাক্য হিসাবে গ্রহণ করেন ঃ *ন হি জ্ঞানেন সদৃশং*, 'জ্ঞানের সমান আর কিছু নেই'। কী সুন্দর ভাব! আমাদের নীতি বাক্যগুলি বিস্ময় উৎপাদন করে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কদাচিৎ ঐ নীতি

অনুযায়ী গড়ে ওঠে। ঠিক যেমন একদিকে আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জাতীয় নীতিবাক্য : *সত্যমেব জয়তে*, 'একমাত্র সত্যই জয়যুক্ত হয়', আর অন্যদিকে আমাদের জাতি এখন অনুসরণ করছে ঠিক তার বিপরীত নীতিকে : *অসত্যমেব জয়তে*। তাই বলি, নীতিবাক্য তেমন কিছু একটা অসাধ্য সাধন করতে পারে না, যদি না তাকে জীবনের অভিজ্ঞতায় পরিণত করার জন্য সত্যিকারের ইচ্ছা কার্যকরী হয়। কে জ্ঞান লাভ করে? পরের দু-তিনটি শ্লোকে সেই প্রসঙ্গ আলোচিত হবে। তোমার *শ্রদ্ধা*, 'অস্তিত্বে বিশ্বাস' থাকা চাই। *শ্রদ্ধা* ছাড়া কোন জ্ঞান হয় না। সেইটি হলো পরবর্তী শ্লোকের বিষয়।

গত রবিবার প্রায় তিন শত ছাত্র এখানে অনুষ্ঠিত যুবসম্মেলনে যোগ দিয়েছিল। তার মধ্যে অন্তত চার জন এই সভাগৃহে তাদের আসনে নিজ নিজ নাম আঁচড় কেটে লিখে রেখে গেছে। তাদের একবারও এ প্রশ্ন জাগল না : 'এই আসনটি কি আমি নষ্ট করব?' এতেই প্রমাণিত হচ্ছে যে বিচারের অগ্নি, সেই *জ্ঞানাগ্নি*, তাদের মধ্যে তখনো জ্বলে ওঠেনি। 'এ কাজের কোন মূল্য আছে কি? এ কাজ করাটা কি ঠিক?' —এইভাবেই একজন বিবেক-বিজ্ঞান রূপ অগ্নিকে প্রজ্বলিত করবে। ছোটখাট দৃষ্টান্ত থেকে তুমি জীবনে জ্ঞানাগ্নির অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পার। তাতেই জীবনের গতি পাল্টে যেতে পারে। এই সব দৃষ্টান্তগুলি পাওয়া যাবে যেখানে আমাদের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলনের যথেষ্ট প্রয়াস নেই। সেখানে রয়েছে পুস্তক পাঠ, বক্তৃতা শোনা, কিছু মুখস্থ করা এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। কিন্তু, তুমি কি তোমার মধ্যে জ্ঞানাগ্নি জ্বেলেছ?

তাই এখানে বলা হয়েছে :

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নিঃ ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥

—'হে অর্জুন, কাঠের সাহায্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করলে সেই কাঠ ভস্মে পরিণত হয়, তেমনি জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্মফলকে দগ্ধ করে।'

'জ্ঞানাগ্নিতে সমস্ত কর্মফল ভস্মে পরিণত হবে'। ওটি মানবজাতির চরম অনন্যতা। মানুষ কাজ করবে কিন্তু তার সঙ্কেত আসবে এক গভীরতর উৎস থেকে, যথা, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অগ্নি থেকে—এর ফলে সমগ্র জীবন হয়ে ওঠে সু-সংগঠিত, সু-সংযত এবং ফলপ্রসূ—সব দিক থেকে।

এ যুগের নভো পদার্থ বিদ্যার ভাষায় আমরা বলতে পারি, 'আদিতে পটভূমির নিশ্চল আধিভৌতিক উপাদানটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না।' *আনীৎ অবাতম্*, প্রাচীন ঋগ্বেদে যেমন আছে, 'এর অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু এর কোন চঞ্চলতা ছিল না', ছিল না কোন ক্রিয়া, ছিল না কোন *কর্ম* অথবা 'কর্ম পদ্ধতি'—আধুনিক দার্শনিক ভাষায় যেমন বলা হয়ে থাকে; কর্ম পদ্ধতি তখনো শুরু হয় নি। মহাবিশ্ব হলো ঐ পদ্ধতি অনুযায়ী সৃষ্ট বস্তু। পদ্ধতির পেছনে রয়েছে শুদ্ধ সত্তা; তারপর এল এই পদ্ধতি। সত্য অথবা সৎবস্তু এবং পদ্ধতি। এবং পরে, সৃষ্টিচক্রের আবর্তন-শেষে, সমস্ত পদ্ধতিটি পুনরায় রূপান্তরিত হয় সৎ বস্তুতে। আমরা এখন যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি তা হলো এই পদ্ধতিরই ত্বরান্বিত রূপ। সৃষ্টি-পদ্ধতির সূচনা করে যখন Big Bang (বিগ ব্যাং) বা মহানাদে সংঘটিত হলো, তার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতি মুহূর্ত কালাংশে এই বিশ্বজগৎ শুরু করল তার এগিয়ে চলা এই পদ্ধতি অনুযায়ী। ক্রমে স্থূল জগৎই অধিক মাত্রায় সৃষ্ট হতে থাকল। আদিতে স্থূল জগৎ ছিল না। তখনকার সেই অনন্য সাধারণ এককত্বের অবস্থায় (State of Singularity) মহাজাগতিক বিবর্তনের প্রথম কয়েক মুহূর্তে ইলেকট্রন, প্রোটন, মহাকর্ষ প্রভৃতি ছিল না। ধীরে ধীরে তাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পৃথকীকরণ ও বিকাশ ঘটল। তারপরে আমাদের জীবন ধারণের ও কর্মপ্রচেষ্টার উপযোগী এই অস্তিত্বমান মহাবিশ্ব সৃষ্ট হলো। মনুষ্য স্তর পর্যন্ত, এ সবই কেবল পদ্ধতি। পদ্ধতির নিজস্ব কোন কর্মক্ষমতা নেই; এর কোন স্বাধীনতা নেই। কিন্তু ক্রমবিকাশ যখন মনুষ্যস্তর পর্যন্ত পৌঁছে গেল, সেই মানব সত্তার এমন শক্তি থেকে গেল যা পদ্ধতিকে সত্তায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলো। ঐ সক্ষমতা আসে *জ্ঞান* থেকে। এই *কর্মই জ্ঞানে* রূপান্তরিত হয়। তাই মানব সত্তা বুঝতে পারে, আমরা এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উৎস কোথায়। *আমরা* সেই উৎসের সঙ্গে একীভূত হতে পারি। কোন জড় বিষয় বা মনুষ্যেতর প্রাণীর পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়। কারণ, বৈদান্তিক ধারণায়, পটভূমির পদার্থটি কেবল একটি জড় বস্তুমাত্র নয়। এটি শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, অনন্ত, অদ্বৈত : *সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম*, 'ব্রহ্ম হলেন সত্যস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ,' (*তৈত্তিরীয় উপনিষদ্* ২.১.৩)।

শ্রীশঙ্করাচার্য *বৃহদারণ্যক উপনিষদের* ভাষ্যে (২.৪.১২) বলেছেন :

'*পৌরাণিকগণ* মনে করেন (মহাবিশ্বের) এই বিলয় বা *প্রলয়* হলো স্বাভাবিক ক্রিয়া। আর ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিরা ব্রহ্মজ্ঞানের মাধ্যমে সচেতনভাবে যা করে থাকেন,

তা হলো ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে চরম বিলয় (মহাপ্রলয়), আর তা ঘটে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হলে।'

পৌরাণিকগণ হলেন, কয়েকখানি *পুরাণের* রচয়িতা; তাঁদের ব্যাখ্যাতে মহাবিশ্বের বিকাশ হয় অদ্বৈত ব্রহ্ম থেকে, আবার শেষ লয়ও হয় ব্রহ্মে, কোটি কোটি বছর পরে; আধুনিক পাশ্চাত্য সৃষ্টিতত্ত্বও এই কথা বলে—তফাৎ এই যে ওদের সৃষ্টির উৎস সচেতন ব্রহ্ম নয়, তা এক অতি ঘন জড় পদার্থের পটভূমি; তাই তা কোন মানবের *অভিজ্ঞতার* বিষয় হতে পারে না। কেবল এই সত্যই বেদান্ত ও পাশ্চাত্য সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে এক বিরাট ভেদ সৃষ্টি করে রেখেছে।

এ হলো সেই জ্ঞান লাভের সামর্থ্য যা মানবের মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে। এই *জ্ঞানের* মাধ্যমেই তুমি ফিরে যেতে পার তোমার উৎসে, যা মহাবিশ্বেরও উৎস বটে। 'এ মহাবিশ্ব কি রূপ? এ কোথা থেকে এল? এর প্রকৃত স্বরূপ কী? আমারই বা প্রকৃত স্বরূপ কী?' —এই রকম বোধ শক্তি, এ বিষয়ের সামগ্রিক পদ্ধতি, নাম দেওয়া হয় *জ্ঞান*। অতএব, *জ্ঞানই* পারে, আমাদের ফিরিয়ে আনতে আদিম বা প্রারম্ভিক অবস্থায়—আমাদের উপলব্ধি করাতে সেই চরম সত্যকে বা ব্রহ্মকে। সমস্ত সৃষ্ট পদার্থকেই পদ্ধতি অনুযায়ী চলতে হয়। মনুষ্য জাতিভুক্ত আমরাও কিছুটা প্রাকৃতিক পদ্ধতি অনুযায়ী চালিত হই। আমরা নিজেরাও নিজেদের পদ্ধতিগত নিয়মে চালিয়ে নিতে পারি। আমরা প্রাকৃতিক পদ্ধতিকে থামিয়ে দিতে পারি। আমাদের সে স্বাধীনতা আছে। এই স্বাধীনতাই আমাদের নিয়ে যায় *জ্ঞানের* উচ্চতর স্তরে। এ জগতে কোন মানবেতর প্রজাতিরই একেবারে অতি প্রারম্ভিক স্তরের জ্ঞানের বেশি উচ্চতর *জ্ঞান* থাকে না : তারা ক্ষুদ্র জড় জগতের সামান্য কিছু বুঝতে পারে। *জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয় গোচরে*। অতি মহান শাস্ত্র গ্রন্থ, *দেবী মাহাত্ম্যে*, 'মাতৃ দেবীর স্তুতি'তে এই শ্লোকটি (১.৪৭) রয়েছে। এর অর্থ, 'এই সব প্রাণীদের জ্ঞান রয়েছে কেবল তাদের ইন্দ্রিয়-যন্ত্রে।' এই পর্যন্ত। ইন্দ্রিয়জ বিষয়ের ওপরে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তাদের কিছু ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি হয়, তার প্রতিক্রিয়াও তাদের মধ্যে দেখা যায়। ঐ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া পদ্ধতির জ্ঞানটুকু তাদের আছে, সবই ইন্দ্রিয় স্তরেই সীমিত। কেবল মনুষ্যজাতির ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের ওপরে বুদ্ধিজাত জ্ঞানের স্তরে ওঠার সামর্থ্য লক্ষ্য করা যায়। শেষোক্ত জ্ঞানের আরো উন্নতি সাধন করে চরম সত্যের জ্ঞানে, ব্রহ্মজ্ঞানে পৌছান যায়; ঐ সত্যের নামই জ্ঞান; যা হলো *জ্ঞান স্বরূপ* বা *চিৎস্বরূপ*।

এই পদ্ধতিটি, যাকে ভুল করে সৃষ্টি বলা হয়, তা শুরু হয়েছে এই ভাবে ঃ 'আমি এক, বহু হব।' মহাজাগতিক বিবর্তন পদ্ধতিতে ঐ চেতনা অন্তর্নিহিত থাকে, তার বহিঃ-প্রকাশ ঘটে, যখন বিশ্বের ক্রমবিকাশ জৈব-ক্রমবিকাশের স্তরে ওঠে। জৈব-ক্রমবিকাশের অগ্রগতি যখন ক্রমান্বয়ে চলতে থাকে, তখন ঐ চৈতন্য-সত্য অধিক থেকে অধিকতর বিকশিত হতে হতে মানবসত্তার আত্ম-সচেতনতায় উন্নীত হয়, মানব-পূর্ব-প্রজাতির ক্ষেত্রে যা মাত্র বস্তু জগতের চেতনা তার থেকে। মানব সত্তার আরো বিকাশ ঘটায় তার উপলব্ধি হতে থাকে শাশ্বত পবিত্রতার, স্বাধীনতার এবং অনন্ত চৈতন্যের বা ব্রহ্মের বা আত্মার সার্বজনীনতার বিষয়ে। ঐ চরম সত্য (পরব্রহ্ম), নাম-রূপের পারে, কিন্তু তাঁকে বুদ্ধিগম্য করার জন্য, তাঁকে কিছু আপাত নামে ভূষিত করা হয়, যথা আত্মা বা ব্রহ্ম। *বৃহদারণ্যক উপনিষদের* (১.৪.৭) ভাষ্যে শঙ্করাচার্য এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন *আত্মেতি* কথাটির মধ্যে *ইতি* শব্দ ব্যবহারের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে; *ইতি* শব্দের অর্থ এইরূপ ঃ *যঃ তু আত্ম-শব্দস্য ইতি পরঃ প্রয়োগঃ, আত্মশব্দ প্রত্যয়য়োঃ আত্ম-তত্ত্বস্য পরমার্থতো অবিষয়ত্বম্ জ্ঞাপনার্থম্*—" 'আত্মা' শব্দের সঙ্গে *ইতি* শব্দের ব্যবহার ...কেবল এইটুকু বোঝাবার জন্য যে আত্ম-সত্য প্রকৃত পক্ষে 'আত্মা' শব্দের সংজ্ঞা ও ধারণার পরিধির পারে।"

গীতায় যাকে *জ্ঞান* এবং *জ্ঞানাগ্নি* বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তার এই পর্যায়ে উন্নয়ন এই ক্রমবিকাশেরই ফলশ্রুতি। এ বস্তু কখনই নির্বোধ, প্রাণহীন, প্রচলিত আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্যার আধিভৌতিক পটভূমি থেকে উদ্ভূত হতে পারে না। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের অথবা যিশুর বা বুদ্ধের অপার করুণার উৎস খুঁজতে এই পটভূমির আধিভৌতিক উপাদানের দিকে অগ্রসর হওয়া কতই না শিশুসুলভ আচরণ হবে! এ বিষয়ে আরো তত্ত্ব এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যতটুকু বোঝে, তার থেকে আরো ব্যাপকতর এক সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে *গীতার* ৭ম অধ্যায়ের ৪ থেকে ৭ সংখ্যক শ্লোকে।

অতএব, এখানে মানব মনের সামনে এক বিরাট আহ্বান রাখা হয়েছে। আমরা যেন সৃষ্টি পদ্ধতির অঙ্গ হই, কিন্তু তার সঙ্গে এই সমগ্র সৃষ্টি ব্যাপারটির যেন দর্শকও হই। 'দর্শক', এটি একটি বিস্ময়কর শব্দ, সংস্কৃত ভাষায় এর প্রতিশব্দ *সাক্ষী*। তুমি সৃষ্টি ব্যাপারের বাইরে। তুমি একে পর্যবেক্ষণ করছ, তুমি একে দেখছ। তুমি একে বোঝার চেষ্টা করছ। তুমি একে নিয়ন্ত্রণ করতে পার।

এরপর তুমি নিজের দিকে দৃষ্টি ফেরাও। তুমি বুঝতে চেষ্টা কর তোমার দেহকে, এর নানা জ্ঞানেন্দ্রিয় তন্ত্রকে, মানসতন্ত্রকে এবং যা এর বাইরে আছে তাকে। আমার প্রকৃত স্বরূপ কী? সেই অনন্ত আত্মা, যা আমাদের আদি উৎস, সেই শুদ্ধ চৈতন্য যা আমার অন্তরে স্পন্দিত হচ্ছে। এ সত্য আমি উপলব্ধি করতে পারি। এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার। এই হলো মানবসত্তার চরম স্বাতন্ত্র্য। সেই প্রসিদ্ধ মরমী গণিতজ্ঞ, সম্ভবত ব্লেইজ প্যাসক্যাল, এক সুন্দর কথা বলেছিলেন ঃ 'মহাকাশে, বিশ্ব আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে সূচ্যগ্র বিন্দুমাত্রে পর্যবসিত করে'। এই হলো মন্তব্যের প্রথম বাক্য। ভৌতিকদিক থেকে বলতে, মহাশূন্যের দিক থেকে বলতে—আমরা কী? বিশাল মহাবিশ্ব মাঝে একটি ক্ষুদ্র ধূলি-কণামাত্র! এটাকেই বলা হয় সৃষ্টিপদ্ধতির অংশ। এটাই কি সব? এই কথা বলে, প্যাসক্যাল পরবর্তী বাক্যে বলেন ঃ '*কিন্তু চিন্তার মাধ্যমে আমরা সেই বিশ্বকে বুঝি।*' সেই অনন্ত মহাবিশ্ব যা আমাদের ঘিরে রয়েছে, আর তা আমাদের বোধগম্য হয় এই চিন্তাশক্তি দ্বারা, যখন আমাদের মধ্যে হয় জ্ঞানের বিকাশ! মানবসত্তার এইটিই হলো মহত্তম রহস্য। এই রহস্য যদি তুমি স্বীকার করতে না চাও, তবে তুমি মানবসম্ভাবনা বিজ্ঞানের একটুও বুঝতে পারনি। এই চিন্তাভাবনাগুলি আজকাল পাশ্চাত্য ভৌত বিজ্ঞানে ধীরে ধীরে গৃহীত হচ্ছে, বিশেষত পারমাণবিক বিজ্ঞানে, যেখানে অনুসন্ধানের জন্য, দর্শক বা সাক্ষীও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত (যে সব তথ্যের ওপর সিদ্ধান্ত নির্ভর করে) হয়ে উঠছে। পর্যবেক্ষণ *ক্রিয়ার* দ্বারা, আমরা পারমাণবিক ব্যাপারেই পরিবর্তন নিয়ে আসি। অতএব, এটি একটি অনুসন্ধানযোগ্য এক বিরাট উপাত্ত। আমরা যেন দর্শকের বিষয়ে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করি। ভৌতবিজ্ঞানের এই হলো পরিস্থিতি।

তাই, ৩৭তম শ্লোকে যে *জ্ঞানের* কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো সেই অনন্ত শুদ্ধ চৈতন্য, যা তোমার, আমার এবং সকলের মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে। আমরা একে উপেক্ষা করি। এ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার দরকার মনে করি না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যখন আমরা স্কুলে গিয়ে জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করি, তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের অন্তরে সদা নিহিত জ্ঞান-স্পন্দনের অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকি। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন ঃ 'শিক্ষা হলো মানবের অন্তরে যে পূর্ণতা আগে থেকেই রয়েছে তারই, বিকাশ'। কিন্তু, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা তা উপেক্ষা করি। আমরা মস্তিষ্ককে কেবল কতকগুলো তথ্য ও সূত্র পুরে ভারাক্রান্ত করে থাকি, আর জীবনযাপন করি উদাসীন ভাবে, প্রকৃতির ক্রিয়া

পদ্ধতির একটি অঙ্গ হিসেবে। তোমার স্বাতন্ত্র্যের কি হলো? এইটিই তোমাকে আবিষ্কার করতে হবে। যখন তুমি তা করবে, তখন এই শ্লোকটি তোমার কাছে অর্থবহ হবে—*সর্বম্ কর্মাখিলম্ পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে*, 'হে পার্থ, সকল কর্মই, সামগ্রিকভাবে, সার্থকতা লাভ করে *জ্ঞানে* লয় হয়ে'। এসব পদ্ধতিই আসে—বিশ্বের পশ্চাতে বিরাজমান অনন্ত চৈতন্য থেকে, অনন্ত সদ্‌বস্তু তথা ব্রহ্ম থেকে। আমাদের *সনাতন ধর্মে* ব্রহ্মবিদ্যার ভাষায় আমরা বলে থাকি যে, ব্রহ্ম—অনন্ত সদ্‌বস্তু—বিষ্ণুরূপে স্বীয় নাভিকমল থেকে উদ্গত সর্ব-জ্ঞান-ভাণ্ডার ব্রহ্মাকে বিশ্বের বিকাশ ঘটাবার জন্য আদেশ দিলেন। সমগ্র সৃষ্টি প্রকরণ আরম্ভ হয় পুরুষরূপী ব্রহ্মা থেকে। অন্যটি হলো ব্রহ্ম, যা স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষ লিঙ্গ যুক্ত। তাই, ধর্মতত্ত্বের, তথা শিল্পীর ভাষায় আমরা এই ভাবেই বর্ণনা দিয়ে থাকি সদ্‌বস্তু ও সৃষ্টি পদ্ধতির। ব্রহ্মা জানতেন যে তাঁরই মধ্যে বিরাজিত আছেন অনন্তব্রহ্ম। তিনি নিজেই প্রকটিত হলেন মহাবিশ্বরূপে। মহাবিশ্বসৃষ্টির সূচনা হলো এক *স্ফোট*, অর্থাৎ বিস্ফোরণ দিয়ে, ব্রহ্মার মানস ক্রিয়ার মাধ্যমে। ব্রহ্মা এক শব্দ শুনলেন। তিনি চারিদিকে তাকালেন, কাউকে দেখলেন না—সেখানে কেউ ছিল না। এ শব্দ কোথা থেকে হলো? শব্দটি কী? এটি *তপঃ তপঃ*, *তপস্যা* কর, *তপস্যা* কর। কীরকম *তপস্যা*? *জ্ঞান-তপস্যা, যস্য জ্ঞানময়ম্ তপঃ*, 'যার *তপস্যা* ছিল *জ্ঞানময়*।' গীতার মাধ্যমে আমরাও *জ্ঞানময় তপস্যা* নিয়ে আলোচনা করছি। এই *জ্ঞানময় তপস্যার* মাধ্যমে ব্রহ্মা এই মহাবিশ্বকে প্রকট করলেন। *তপস্যা* রূপান্তরিত হয়েছিল সৃষ্টি পদ্ধতিতে (সৃষ্টি প্রকরণে) এবং তা এখনও চলেছে। শ্রীকৃষ্ণ এই বিষয়ে আরো কিছু বলবেন অষ্টম অধ্যায়ের ১৬শ থেকে ২০শ শ্লোকে।

বিশ্ব-সৃষ্টি যে চৈতন্য থেকে, কোন ঘন জড় পদার্থের পটভূমি থেকে নয়, এই ভারতীয় সত্যই ব্যাখ্যাত হয়েছে একদা জড়বাদী জ্যোতির্বিদ্ ফ্রেড হয়েল কর্তৃক তাঁর *The Intelligent Universe*, 'চৈতন্যময় মহাবিশ্ব' নামক গ্রন্থে। এ কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি।

যখন আমরা মহাবিশ্বকে আধ্যাত্মিক ভাবে ব্রহ্মে লয় করি, তখন আমরা এক আশ্চর্য কিছু অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করি। ঐ পদ্ধতির কাজ চলতে থাকবে, কিন্তু আমরা জানব সমগ্র পদ্ধতিটি ব্রহ্মকে জানা ছাড়া আর কিছু নয়। বেদান্তে ঈশ্বর বলতে সেই অনন্ত চৈতন্যকে বোঝায়, *সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম*। তা কোথায়? *যো বেদ নিহিতম্ গুহায়াম্*। যাঁর উপলব্ধি হয়েছে তাঁর অন্তর্হৃদয়ে

তিনি লুকিয়ে আছেন। সেই অনন্ত এক সত্তা বিশ্বের ক্ষুদ্রতম ধূলিকণাতে বিদ্যমান আছেন। এই ভাবেই আমাদের এই সত্যকে উপলব্ধি করতে হবে। এই মহান চিন্তা রয়েছে *তৈত্তিরীয় উপনিষদে*। *গীতা* উপনিষদের সারটুকু গ্রহণ করে তাকে এমন এক রূপ দিয়েছে যা খুবই প্রয়োগ কুশল হবে। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেন : সব কর্মকে *জ্ঞানে* রূপান্তরিত কর। সেইটিই তার আপন উৎস। *সর্বম্ কর্মাখিলম্ পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে,* বলতে যা বোঝায় তা এই-ই।

তারপর, যাঁরা তোমাকে শিক্ষা দিতে পারেন তাঁদের কাছে এই *জ্ঞানের* বিষয় জানার চেষ্টা কর; তখনই আসে *জ্ঞানের* স্তুতি। *ন হি জ্ঞানেন সদৃশম্ পবিত্রম্ ইহ বিদ্যতে,* 'এ জগতে জ্ঞানের যতটা পবিত্রীকরণ সামর্থ্য রয়েছে এমন আর কিছুতে নেই'। আমাদের সব শিশুই স্কুলে গিয়ে উপকৃত হবে, কেবল যদি তারা জানে যে জ্ঞানের সন্ধানই তাদের উদ্দেশ্য। এতে কী মহৎ পরিবর্তনই না আসবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ও সেই ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্জিত ফলাফলে। কিন্তু এই বিষয়টি সম্বন্ধে কোন ধ্যান ধারণাই নেই, না শিক্ষকদের দিক থেকে, না ছাত্রদের দিক থেকে। *তৎস্বয়ম্ যোগ সংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি,* 'যখন তুমি এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে, তখন ধীরে ধীরে স্বীয় প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে সর্বোচ্চ উপলব্ধি তোমার হতে থাকবে।' জ্ঞানান্বেষণের পথে একবার প্রতিষ্ঠিত হলে, তোমার *নিজ সত্তাতেই* সেই পরম জ্ঞানের অভিজ্ঞতা হতে থাকবে, এমনকি একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র অবস্থাতেও। জ্ঞানান্বেষণ চালিয়ে যাও, কালে তুমি অখণ্ড, সর্ববন্ধনমুক্ত, শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করবে। বেদান্তে ঈশ্বর-ধারণা হলো ঐরূপ।

বেদান্তে ব্রহ্ম *জ্ঞান স্বরূপ,* 'জ্ঞানের স্বরূপ যেমন', *অনুভব স্বরূপ,* অনুভবের স্বরূপ যেমন, *সৎ-স্বরূপ,* 'সত্যের স্বরূপ যেমন', এই ভাবে বর্ণিত হয়েছেন। শঙ্করাচার্য, ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের ভূমিকায় লিখেছেন : *আত্মৈকত্ব বিদ্যা প্রতিপত্তয়ে সর্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে,* 'সমস্ত উপনিষদেই চেষ্টা চালাচ্ছে আত্মার একত্ব-বিজ্ঞানের উপলব্ধি প্রতিপাদনের জন্য'; তারপর আরও বলছেন : *অনুভব অবসানম্, ব্রহ্ম বিজ্ঞানম্,* 'ব্রহ্মোপলব্ধিতেই ব্রহ্মজ্ঞানের পরিপূর্ণতা'। একটা চেয়ার সম্বন্ধে *জ্ঞান* হলে আমরা চেয়ারে রূপান্তরিত হই না। কিন্তু, যখন আমাদের ব্রহ্ম সম্বন্ধে *জ্ঞান* হয়, তখন আমাদের উপলব্ধি হয় যে আমরা নিজেরাই ব্রহ্ম। আন্তর জীবনে, সমস্ত বস্তুজ্ঞানের গতি হলো ঐ বস্তুময় হয়ে যাওয়ার দিকে।

অতএব, এইরূপ সব জ্ঞানই হলো তৎবস্তুতে সম্পূর্ণ আত্তীকৃত হওয়া। স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন 'তা হলো ভাবরাজির আত্তীকরণ', বা তৎ তৎ ভাবে পরিণত বা ভাবিত হওয়া। আমি যে জ্ঞানই লাভ করি, আমি তাতেই পরিণত হই। এই ভাবে চরিত্রের উৎকর্ষ হতে থাকে। এই ভাবেই জ্ঞান অবাধে উন্নীত হতে থাকে বৈষয়িক থেকে আধ্যাত্মিকে।

একটি গ্রাম্যবালক বা বালিকাকে স্কুলে ভর্তি করে দাও। এতেই তার মধ্যে শুদ্ধিকরণের উপকরণ প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হলো। সে নিজেকে বুঝতে শিখল, সঙ্গে সঙ্গে জগৎকেও। সেগুলি না হলে সে তো একটি প্রাণীমাত্র হয়ে থাকত। সামান্য শিক্ষা পেলেই সে তার প্রাণিভাব থেকে মুক্তি লাভের দিকে এগিয়ে চলে। সে দেখে, 'আমি বহুবিধ বিষয়ের মধ্যে একটি নয়, আমি স্বতন্ত্র এক ব্যক্তি।' এই হলো *আত্মজ্ঞানের* শুরু। এই পথে এগিয়ে চল, স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে, সব রকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা শেষ করে, আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভের দিকে এগিয়ে চল। শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই এখানে বলছেন; তিনি বলছেন যে তোমার সমস্ত কর্মজীবনকে জ্ঞানে, জ্ঞান-স্পন্দনে ধ্বনিত কর।

কেউ এই *যোগ সমাধিতে* প্রতিষ্ঠিত হলে, '*জ্ঞান-যোগে* প্রতিষ্ঠিত হয়ে', সেই যোগী, *কালেন,* 'সময় হলেই' আত্মজ্ঞান লাভ করে। আমরা তো সৃষ্টি প্রকরণের, ক্রমবিকাশ পদ্ধতির মধ্য দিয়েই চলেছি; এখন জেনে রাখ যে আর একটি পদ্ধতি আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে চলেছে আমাদের উৎপত্তিস্থলের দিকে। ধ্যানে বসাও এরকম একটি পদ্ধতি, এই নতুন পদ্ধতিটি গড়ে উঠছে তোমারই ভেতরে; তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে—অনন্ত, অমরত্ব ও দেবত্বের দিকে। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলে, আমরা এসেছি ব্রহ্ম থেকে, জীবন কালে আমাদের স্থিতি ব্রহ্মে, আবার ব্রহ্মেই আমাদের ফিরে যাওয়া। অতএব মানব সত্তার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদ্ধতিটি তাৎপর্যপূর্ণ। একমাত্র সে-ই নিজে তার উৎপত্তি স্থলের অনুসন্ধান করতে পারে। পৃথিবীর অন্য কোন প্রাণীরই নিজ উৎপত্তি সম্বন্ধে জ্ঞান নেই। এ জ্ঞান আসে *নিবৃত্তি* নামে জ্ঞাত দ্বিতীয় পদ্ধতির মাধ্যমে এবং তা ভাল করে ব্যাখ্যাত হয়েছে উপক্রমণিকায়। অন্য পদ্ধতিটির নাম হলো *প্রবৃত্তি,* এক্ষেত্রে মন বহির্মুখী হয়ে বিচরণ করে। *নিবৃত্তির* ক্ষেত্রে মনের বিচরণ ঘটে অন্তরে, আর সমস্ত ক্রিয়ার রূপান্তর ঘটে জড়ত্ব থেকে আধ্যাত্মিকতার দিকে। সব কাজটাই হয়ে দাঁড়ায় আধ্যাত্মিক।

মানবজীবনে অনাধ্যাত্মিক বলে কিছুই নেই। বেদান্তের দৃষ্টিতে, সবই

আধ্যাত্মিকতা। সেই অনন্ত ব্রহ্ম সদা স্পন্দিত হচ্ছেন তোমার মধ্যে, আমার মধ্যে, সকলের মধ্যে; এ স্পন্দন সাধারণত আমরা উপেক্ষা করি। শ্রীকৃষ্ণ একে উপেক্ষা করতে নিষেধ করছেন। তোমার অস্তিত্ব, তোমার কর্ম অর্থবহ হয়ে ওঠে এর জন্যই। অন্যথায় তুমি প্রকৃতির ভৌত শক্তির, ভৌত পদ্ধতির অধীনস্থ একটি প্রাণী হয়েই থাকবে। বেদান্ত বলে, তেমনটি হয়ো না। এই সত্যকে বুঝতে চেষ্টা কর।

ঋষিদের দৃষ্টিতে সর্বভূতে একই আত্মার অবস্থান প্রত্যক্ষ হয়। যে ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয়, তিনিই আবার আমাদের সকলের মধ্যে বিরাজিত। এই প্রাণবন্ত দর্শনই ঋষিরা প্রকাশ করে গেছেন, ব্যাখ্যা করে গেছেন। *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* এক ঋষি অন্তর্মুখী পদ্ধতি, নিবৃত্তি মার্গ, অনুসরণ করে, এই সত্যের সন্ধান পেয়ে অনন্ত আত্মাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তারপর বাহ্য জগতের দিকে দৃষ্টি প্রসার করে দেখেছিলেন, একই আত্মা সর্বভূতে বিরাজ করছেন। তখনই তিনি সুন্দর সঙ্গীতে মুখর হয়ে উঠে ফেটে পড়েছিলেন ঃ

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমান্ অসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥

—'তুমি নারী, তুমি নর, তুমি *কুমার* বা বালক, তুমি *কুমারী* বা বালিকা, তুমি জরাগ্রস্ত হয়ে লাঠি ধরে কাঁপতে কাঁপতে চল এবং তুমিই জন্ম নিয়ে নানারূপ পরিগ্রহ করে থাক।'

তাই যখন মানুষ নিজের মধ্যে আত্মোপলব্ধি করে, বাইরে তাকায়, তখন সে একই আত্মাকে সর্বত্র দেখতে থাকে। সেখানে তুমি 'বহির্মুখী' সৃষ্টি পদ্ধতিকে 'অন্তর্মুখী' করার চেষ্টা করে সফলকাম হয়েছ ঃ *প্রবৃত্তি* থেকে *নিবৃত্তির* দিকে। *নিবৃত্তি* হলো—নৈতিক, ধার্মিক ও আধ্যাত্মিক—সকল মূল্যবোধের উৎস। *প্রবৃত্তি* ও *নিবৃত্তির* সংমিশ্রণেই স্থিতিশীল সভ্য সমাজ গড়ে ওঠে। এই কথাই শঙ্করাচার্য তাঁর *গীতা*-ভাষ্যের ভূমিকায় বলেছেন—যা আমি এই গ্রন্থের প্রারম্ভে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করেছি। *গীতাই* হলো সেই পরমগ্রন্থ যাতে *প্রবৃত্তি* ও *নিবৃত্তিকে* মানব জীবনের মানবীয় ক্রিয়াকলাপের পরিপূর্ণতা রূপে একত্রিত করা হয়েছে। তাই, দুটিই ক্রিয়াপদ্ধতি ঃ একটি বহির্মুখী, অপরটি অন্তর্মুখী। যখন তুমি ভাবতে থাক ঃ আমি যা করছি তা কি ঠিক? তখন তুমি *নিবৃত্তিমার্গেই* চলেছ; তুমি যদি একেবারেই চিন্তাহীন, কেবল ক্রিয়াপরায়ণ হও, তবে তা হলো *প্রবৃত্তিমার্গ*।

আজকালকার রাজনীতিতে ও জীবনের অন্যান্য পরিমণ্ডলে, চিন্তার এত অভাব দেখা যায়, এত সামান্য *নিবৃত্তি* ভাব আর সুপ্রচুর *প্রবৃত্তি*ভাব—প্রচুর হৈ চৈ, প্রচুর আবেগ ও প্রবল উত্তেজনা। তাই এত হিংসাবৃত্তি ও অপরাধ দেখা যায়। *নিবৃত্তিভাব* একটুও নেই। *নিবৃত্তিভাবই* সমাজে নিয়ে আসে নৈতিক সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং অন্যান্য উচ্চ মূল্যবোধ। মানব সমাজে এ দুই-এরই একত্র সমাবেশ থাকতে হবে। তবেই তা হবে 'এক পূর্ণাঙ্গ জীবন-দর্শন', যাতে জীবনের সব দিক আলোচিত হবে। তাই হলো বেদান্ত, *গীতায়* যা ব্যাখ্যাত হচ্ছে, উপনিষদের ওপর ভিত্তি করে, শঙ্করাচার্যের ভূমিকায় প্রদত্ত তাঁর মন্তব্য অনুযায়ী। ইতর প্রাণীসুলভ আজ্ঞাবহতা আর মুক্তি—এই দুই-এর একটিকে বেছে নিতে হবে, মানুষকে। আমার ব্যবহার যদি প্রথমটির মতো হয় তবে আমি ইতর প্রাণীর মতোই থাকব, যদি দ্বিতীয়টির মতো হয়, তবে আমি মুক্ত হব।

জ্ঞানের মাহাত্ম্য বর্ণনের পর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, কে *জ্ঞানলাভের* যোগ্য।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯॥

—'গুরুবাক্যে বিশ্বাসী, যে ঈশ্বরে বিশ্বাসী ও তাঁতে ভক্তিসম্পন্ন এবং জিতেন্দ্রিয়, সে এই জ্ঞান লাভ করে। এই জ্ঞান লাভের পরেই সে পরম শান্তির অধিকারী হয়।'

'তোমার *শ্রদ্ধা* থাকলে, তুমি *জ্ঞান* লাভ করবে', *শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্*। *শ্রদ্ধা* মানে নিজের ওপর বিশ্বাস, বিশ্বের অর্থপূর্ণতার ওপর বিশ্বাস। *শ্রদ্ধা* হলো এক মহান নৈতিক উৎকর্ষ, যা কেবল তথাকথিত নিছক বুদ্ধিগত শিক্ষার ফলেই সহজে নষ্ট হতে পারে। আর আধুনিক সভ্যতায় এমন বহুলোক আছে যারা এই *শ্রদ্ধাকে* হারিয়েছে। মানুষের মন নাস্তিক ভাবে পূর্ণ। আস্তিক্য বুদ্ধিসম্পন্ন মন যেন একেবারে লোপ পেয়ে গেছে। শঙ্করাচার্য *শ্রদ্ধার* সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এক সুন্দর বাক্য প্রয়োগ করেছেন; শ্রদ্ধা হলো আস্তিক্যবুদ্ধি, 'মনের অস্তিভাব—আছে এই ভাবই হলো *শ্রদ্ধা*।' অন্যটি হলো নাস্তিভাব। কী সুন্দর ভাবনা! আস্তিক্য বোধসম্পন্ন মন নিয়ে তুমি সংসারে লড়াই করছ, অসুবিধায় পড়ে মন হেরে গেলে মনে এক নাস্তিক ভাবের ছায়া পড়ে। নাস্তিক ভাবের চরম সীমায় এলে ভূমিকায় আমি যা পূর্বেই ব্যাখ্যা করে বলেছি, যেন তারা

সকল বিষয় দোষদর্শী-ভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা সত্যের ওপর, মানুষের ওপরে, মূল্যবোধের ওপরে সব রকম বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। এরই নাম Cynicism, বিশ্বনিন্দাবাদ। *শ্রদ্ধা* হলো বিশ্বনিন্দাবাদের বিপরীত। পরবর্তী শ্লোকে বিশ্বনিন্দুক মন নিয়ে আলোচনা হবে। এই মন কোন মূল্য অর্জনে সক্ষম হয় না, কারণ সে সব কিছুরই নিন্দা করে। যখন তুমি স্কুল বা কলেজে যাবে, *শ্রদ্ধা* নিয়ে যাবে। 'ওখানে *জ্ঞান* অর্জন করতে হবে, ওই জ্ঞান আমাকে এখানেই অর্জন করতে হবে' : এই আস্তিক্য বুদ্ধি নিয়ে। অন্যথায় স্কুল-কলেজে গিয়ে কী লাভ? *তৎপর* : 'সেই বিষয়ে অনুরক্ত হয়ে', সত্যের প্রতি অনুরক্ত হয়ে, সত্য লাভের জন্য আত্মোৎসর্গ করে। উচ্চতম সত্যের সংস্কৃত ভাষায় পরম প্রতিশব্দ হলো 'তৎ'। *গীতায়* পরবর্তী কোন অধ্যায়ে বলা হবে, '*ওঁ তৎ সৎ*', ওঁ সেই সত্য রূপে চরম সদ্‌বস্তু বর্ণিত হয়ে থাকেন; *সংযত ইন্দ্রিয়ঃ*, 'ইন্দ্রিয়শক্তিকে কঠোরভাবে সংযত রেখে'। ইন্দ্রিয় সংযম ছাড়া তুমি জ্ঞান লাভের যোগ্য হবে না। পশুগণের ইন্দ্রিয় সংযম নেই। কিন্তু মানবকে ইন্দ্রিয় সংযম করতে হবে। কিন্তু আজকাল আধুনিক সভ্যতায় বহু লোক সংযম, এমনকি আত্ম-সংযম কথাটাই পছন্দ করে না। এটা দূরদৃষ্টির অভাব এবং দুর্ভাগ্যজনক।

এক বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির কোন একটি বিষয় সম্বন্ধে পরীক্ষায় নিযুক্ত আছেন। এ কাজ তিনি করেন কেন? এ বিষয়ে তাঁর *শ্রদ্ধা* আছে বলে। তিনি জানেন যে কোন সত্য প্রকৃতির মধ্যে ঢাকা আছে, লুক্কায়িত আছে, আমাকে সেই সত্য আবিষ্কার করতে হবে। মনে কর যদি তাঁর জানা থাকত যে ওতে কোন সত্যই নেই, তবে সে কি কখনো ঐ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হতো? অতএব *শ্রদ্ধা* বলতে বোঝায় জগতের অর্থপূর্ণতা। আমি সে কথা মেনে নিয়ে, সেই দিকে চলেছি, সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য। আর যেহেতু আমার আত্ম-প্রত্যয় আছে, সেই সত্য যে পর্দা দিয়ে ঢাকা আছে তাকে ছিঁড়ে ফেলার জৈব সামর্থ্যও আমার আছে। এই হলো *শ্রদ্ধার* প্রকৃতি। শ্রদ্ধা ছাড়া কোন ভৌত বিজ্ঞানই থাকতে পারে না। শ্রদ্ধা ছাড়া কোন আধ্যাত্মিক উন্নয়নও সম্ভব নয়। এই বিষয়টি নিয়ে আমি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি, Science and Religion এবং Faith and Reason শীর্ষক দুটি ভাষণে—যা ভারতীয় বিদ্যাভবন কর্তৃক প্রকাশিত '*Eternal Values for a Changing Society*' গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, *তৎপরঃ*, তুমি 'সত্যানুসন্ধানরত'। বৈজ্ঞানিক কী খুঁজে বেড়াচ্ছে? সেও সত্যকে খুঁজছে। বহু কিছু বস্তু আপাত-প্রতীয়মান হয়। কিন্তু যখন অন্তরে অনুপ্রবেশ করা যায় তখন দেখা যায় এগুলি সত্য নয়। এই সত্যেই

তোমার লক্ষ্য স্থির রাখ। *তৎপরঃ,* 'ঐ সত্যে অনুরক্ত থাক'। আমি সত্যের অনুসন্ধান করছি। আর এই মানব মনেরই কেবল 'সামর্থ্য আছে সত্যানুসন্ধান করার'—আপাত সত্যকে বা ভৌত, জড়, সত্যকে নিয়েই সে বেঁচে থাকতে চায় না। *তৎপরঃ / সংযতেন্দ্রিয়ঃ,* 'সে ইন্দ্রিয় শক্তিকে সংযত, নিয়ন্ত্রিত রেখেছে'। তাই তো কেউ তোমাকে কটূক্তি করলে তুমি তখনি সেই কটূক্তি ফিরিয়ে দিতে পার, কিন্তু তুমি নিজেকে সংযত রেখে ভাববে, 'না, একটু অপেক্ষা করি, দেখি। সে কেন আমাকে এভাবে কটূক্তি করল?' তুমি যদি মনস্তাত্ত্বিক হও, মানসিক রোগের চিকিৎসা করা যদি তোমার কাজ হয়, তবে নিশ্চয় দেখেছ যে এই সব রোগী চিকিৎসককে কটূক্তি করে, কিন্তু চিকিৎসক কটূক্তি করে তার উত্তর দেয় না। তাকে বুঝতে হয় রোগী কেন এমন করছে, রোগীকে সাহায্য করাই যে তার কাজ। তবেই তো সে চিকিৎসক। তাই, *সংযতেন্দ্রিয়ঃ,* 'ইন্দ্রিয়তন্ত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মনশক্তিসম্পন্ন'। তখনই তুমি এক নতুন শক্তির সাহায্যে জীবনের ওপর এক নতুন কর্তৃত্ব গড়ে তুলতে পারবে। তখনই জীবন তোমার কাছে সুখের হয়ে উঠবে। তুমি কেবল ইতরপ্রাণীর মতো অবস্থার দাস হয়ে থাকবে না। *জ্ঞানং লব্ধা পরাম্ শান্তিম্ অচিরেণাধিগচ্ছতি,* 'যখন তুমি এই জ্ঞান লাভ করবে, তারপর অল্প সময়ের মধ্যেই তুমি পরম শান্তির অধিকারী হবে', যে শান্তি উৎসারিত হয় সর্ব শান্তির কেন্দ্র আত্মা থেকে ঃ তাই উপনিষদে বলা হয়েছে—*শান্তোঽয়ম্ আত্মা,* 'আত্মা সম্পূর্ণ শান্তিস্বরূপ।' এই আত্মা কী বস্তু? *শান্তি*—শান্তি, যেখানে সব রকম মানসিক চাপ সমাহিত হয়, তাই হলো আত্মা এবং তাই হলো আমাদের প্রকৃত স্বরূপ বা স্বভাব।

১৯৮৬ খ্রিঃ অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন শহরের কাছে ডিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে বলার জন্য আমি আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। তারা আমাকে একটি ক্যাসেটও দিয়েছিল। বক্তৃতার বিষয় ছিল—'ধর্ম ও আন্তর্জাতিক শান্তি'। সেখানে বর্তমান বিষয়টি এসে পড়ে। একমাত্র তাই হলো শান্তি, যা আসে মানব-ব্যক্তিত্বের গভীরতম প্রদেশ থেকে। মানসিক স্তরেই রয়েছে চাপ। আত্মার স্পর্শে দুটি স্তরেই শান্তি নেমে আসে। যদি তোমার আত্মা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয়ে থাকে, তবে তুমি হয়ে উঠবে অপার শান্তির এক কেন্দ্রস্বরূপ। এই হলো দৈহিক স্তর থেকে আধ্যাত্মিক মাত্রা পর্যন্ত সমগ্র মানবসত্তার সত্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এই ভাষণ শান্তভাবে শুনতে এসেছিল। কিছু কিছু লিপিবদ্ধও করেছিল, তাদের খুশিভাব প্রকাশ পাচ্ছিল, তারা এরকম ভাব পরিবেশন আগে কখনো শোনেনি। বেদান্ত, শান্তির বিষয়টি সম্বন্ধে, এক নতুন অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেয়। তাই, *জ্ঞানং*

লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি। *চিরেণ*, কথার অর্থ বহুদিন পরে, *অচিরেণ*, বহুদিন পরে নয়, অতি শীঘ্র। এর ঠিক বিপরীতে,

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০॥

—'জ্ঞানহীন ব্যক্তি, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি, আত্মপ্রত্যয় হীন ব্যক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আত্মপ্রত্যয়হীন ব্যক্তি ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও সুখী হয় না।'

অজ্ঞ, 'জ্ঞানহীন ব্যক্তি', *অশ্রদ্দধানশ্চ*, 'শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি', দোষদর্শী ব্যক্তি, *সংশয়াত্মা*, 'সদাসন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি', *বিনশ্যতি*, 'ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়'। সে ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হয় না, যেমন আছে তেমনি অধম প্রাণীই হয়ে থাকে। *সংশয়াত্মা বিনশ্যতি*, 'যার মন সর্ব বিষয়ে সন্দিগ্ধ চিত্ত সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়'। এই গ্রন্থের ভূমিকাতে আমি উল্লেখ করেছি এ বিষয়ে Sylvano Ariety (সিলভানো আরিয়েতি)-কৃত *Handbook of American Psychiatry, Vol.-III*-তে সন্নিবেশিত আলোচনাটি—যেখানে তিনি বলেছেন আমেরিকায় শিশুদের শীঘ্রই উদ্ধার করতে হবে অতি সন্দিগ্ধ চিত্ত হওয়ার কুফল থেকে এবং ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে তারা সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে। বুদ্ধির বিকাশ একপেশে হলে মানুষ দোষদর্শী হয়ে পড়ে। যে সামর্থ্য পরস্পরকে ভালবাসতে, বুঝতে, একাত্মভাবে ভাবতে সহায়তা করে তাই সৃষ্টিমুখী। মানুষ তখন নিজ সত্তার কোন গভীরতম কেন্দ্রকে স্পর্শ করে। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *অজ্ঞশ্চ অশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি*, তারা সকলে এক সঙ্গে চলে, 'জ্ঞানহীন ব্যক্তি, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি আর আত্মপ্রত্যয়হীন ব্যক্তি এক সঙ্গে চলে।' এখানে অজ্ঞ কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, স্কুল শিক্ষাবিহীন গ্রামবাসী নয়; সে প্রকৃত *অজ্ঞ* নয়; তার উচ্চ পর্যায়ের মূল্যবোধ তোমার আমার থেকে অনেক বেশি। পরন্তু *অজ্ঞ* বলতে সেই সব লেখাপড়া জানা লোকদের বোঝাচ্ছে যারা জীবনের উচ্চতর স্তর সম্বন্ধে, উচ্চতর মূল্যবোধ সম্বন্ধে *অজ্ঞ*, কিছু জানে না। তাদের মূল্যবোধ সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। এরাই *অজ্ঞ*। *সংশয়াত্মা*, 'আত্মপ্রত্যয়হীন ব্যক্তি', *বিনশ্যতি*, 'ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।'

প্রত্যেক সমাজেই এরকম প্রকৃতির কয়েক দল লোক থাকে, যারা, আধ্যাত্মিক দিক থেকে মৃত, যাদের দ্বারা কোন সৎকাজ করা সম্ভব নয়। তাদের মধ্যে কিছু একটা গোলমাল ঘটেছে। তারা স্রোতহীন হয়ে পড়েছে। এইটাই অত্যন্ত

বিপজ্জনক অবস্থা, এইটাই আধ্যাত্মিক মৃত্যু। স্থূল শরীরের মৃত্যু, আধ্যাত্মিক মৃত্যুর মতো অত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়, কারণ মানব সত্তা ক্রমবিকাশের বেশ উচ্চস্তরেই রয়েছে। আধ্যাত্মিক মৃত্যু যেন তোমার না হয়। প্রাণবন্ত হয়ে থাকার চেষ্টা কর, সদা আনন্দে পূর্ণ হয়ে থাক, জীবনকে সোৎসাহ করে রাখ, লোককল্যাণ হয় এমন কাজে যেন তোমার আগ্রহ থাকে। এর নাম *শ্রদ্ধাবান*, এরূপ না হলে তুমি হবে *অশ্রদ্দধান*। এরূপ লোক *বিনশ্যতি*, 'ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়'। এরূপ বিনাশে সব রকম সৃজনশীলতা ইন্দ্রিয় স্তরেই আটকে পড়ে ও সেখানেই থেকে যায়। *নায়ম্ লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ। সংশয়াত্মা*, 'সন্দিগ্ধ চিত্ত লোক' এ জগতে জয়ী হতে পারে না, পরলোকেও না, কোন সুখও লাভ করে না। তাদের সৎবন্ধু জোটে না, তারা অন্য লোকের সঙ্গে সুখী হয়ে ব্যবহার করতে পারে না, তাদের পক্ষে কিছুই সম্ভব নয়, কেন না তাদের আধ্যাত্মিক জীবন শেষ হয়ে গেছে। তাই, তারা এ জগৎকে হারায়, আবার এ জগতের পারে যা আছে তাও হারায়, যা পরম সত্য, তাও হারায়। এবারে চতুর্থ অধ্যায় শেষ করা হচ্ছে ৪১তম ও ৪২তম দুটি খুবই চমৎকার ও শক্তিদায়ী শ্লোক দিয়ে।

যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

—'পরমার্থ সংযোগ হেতু কর্ম ত্যাগ হওয়ায় অর্থাৎ কর্মফলাকাঙ্ক্ষারহিত হওয়ায় এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভে সমস্ত সংশয় দূর হওয়ায়, হে ধনঞ্জয়, সেই আত্মবান, অপ্রমত্ত, ব্যক্তিকে দৃষ্ট বা অদৃষ্ট কোন কর্মই বন্ধন করতে পারে না।'

হে অর্জুন, যার স্বভাব এইরূপ, কোন কর্মই তাকে বাঁধতে পারে না। এইরূপ ব্যক্তিই মুক্ত, এমনকি এই শরীরেই, এমনকি এই জীবনেই এ সংসারে কর্মনিরত অবস্থাতেই। সে অবস্থাগুলি কীরূপ? *যোগসংন্যস্ত কর্মাণম্*, 'যে সমস্ত কর্ম, অর্থাৎ কর্মফলাকাঙ্ক্ষা যোগে-পরমার্থে সমর্পণ করেছে।' আধ্যাত্মিকভাবে সে সমস্ত কর্মকে জ্ঞানে রূপান্তরিত করেছে, জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ করেছে। *যোগ সংন্যস্ত কর্মাণম্*—মানে কেবল কর্ম ত্যাগ করে, শহর বা গ্রাম ত্যাগ করে, বনে জঙ্গলে গিয়ে, 'আমি সব কর্ম ত্যাগ করেছি' বলা নয়। এরকম লোক নয়, পরন্তু এমন লোক যে কাজ করছে, কাজে ব্যস্ত, তবু সে সব ত্যাগ করেছে *যোগের* মাধ্যমে। এমন লোক, *জ্ঞান-সংছিন্নসংশয়ম্* 'যে *জ্ঞানের* মাধ্যমে সমস্ত সংশয় দূর করেছে'। জ্ঞান লাভ হয়েছে, সমস্ত সংশয় একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে। এই

রকম লোক *আত্মবন্তম্*, 'আত্মাতে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত।' 'হে অর্জুন, কোন কর্ম, অর্থাৎ কর্মফল, তাকে বাঁধতে পারে না, *ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।* এ এক বিস্ময়কর শ্লোক। *সংছিন্ন* মানে, 'ধ্বংসকারী', এমন জ্ঞান যা সমস্ত সংশয় ধ্বংস করছে, দূর করছে; *আত্মবন্তম্*, 'আত্ম-প্রতিষ্ঠ', আপন অনন্ত আত্মায় প্রতিষ্ঠিত; *ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি*, 'কোন কর্ম তাকে বাঁধতে পারে না'। শেষ শ্লোকটিও অনুরূপ। অতএব, তাই যদি সত্য হয়, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে, তাঁর মাধ্যমে এই আধুনিক যুগে আমাদের সকলকে, উদ্বুদ্ধ করছেন ঃ

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২॥

—'অতএব, হে ভারত, আত্মা সম্বন্ধে তোমার অন্তরস্থ অজ্ঞানপ্রসূত এই সংশয়কে জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা ছিন্ন করে, যোগের, অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মযোগের পথ ধরে, কাজ করতে—যুদ্ধ করতে—উঠে পড়ে লাগ।'

তাই, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, এই সংশয়কে, *হৃৎস্থম্*, যা তোমার হৃদয়ে চুপিচুপি এসে বাসা বেঁধেছে, আর জীবনকে ও কর্মকে খর্ব করে দিচ্ছে তাকে, ধ্বংস কর। *অজ্ঞান সম্ভূতম্*, 'অজ্ঞান বা আধ্যাত্মিক অন্ধত্বপ্রসূত তোমার সংশয়কে—আছে কি নেই মনের এবংবিধ সন্দেহকে' ধ্বংস কর। কীভাবে? *জ্ঞানাসিনা জ্ঞানকে খড়্গ* রূপে কল্পনা করে তা দিয়ে তোমার মনে যে সংশয়ের ও বিভ্রান্তির জঙ্গল সৃষ্ট হয়েছে, তা কেটে ফেল। এখানে *জ্ঞান, অসির* সঙ্গে তুলিত হয়েছে, আর *অসি* মানে খড়্গ। *ছিত্ত্বা* 'ধ্বংস করে' এই সংশয় ও বিভ্রান্তিকে ; *এনম্* 'এই', আমাদের এখনকার বিশেষ কষ্ট, আমাদের সংশয়, বাধা-বিপত্তি, আন্তরিক বিভ্রান্তিগুলি—যা সৃষ্ট হয়েছে অন্তরের জ্ঞানাগ্নির অভাবে। জ্ঞানকে খড়্গ-রূপে গ্রহণ করে সংশয় ও অনিশ্চয়তার জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে ফেল। তারপর, *যোগম্ আতিষ্ঠ*, '*যোগের* স্তরে *উঠে পড়*' এবং *উত্তিষ্ঠ ভারত*, 'হে অর্জুন, উঠে পড়!' অর্জুন সে সময় হতোদ্যম হয়ে পড়েছিলেন। উপনিষদে এ কথা বার বার বলা হয়েছে, উত্তিষ্ঠ, উত্তিষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণও গীতায় একথা বলেছেন দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৭তম শ্লোকে এবং ১১শ অধ্যায়ের ৩৩তম শ্লোকে। *যোগম্ আতিষ্ঠ, উত্তিষ্ঠ ভারত*, '*যোগে* প্রতিষ্ঠিত হও এবং *উঠে পড়*! উঠে পড়ে এ ধরনের সংশয় ও এই আন্তরিক দুর্বলতাকে ভেঙ্গে ফেল, এদের কেটে ফেল। তুমি এ কাজ করতে পার। প্রকৃতি তোমাকে সে সামর্থ্য দিয়েছেন। এ সব সামর্থ্যের সদ্ব্যবহার কর এবং মুক্তি অর্জন কর, সংশয় থেকে মুক্তি, ভয় থেকে মুক্তি

তোমার চাই, তা অর্জন কর। কী সুন্দর ও তেজদীপ্ত বাণী, মহান আচার্য শ্রীকৃষ্ণ মানবজাতির কাছে পাঠাচ্ছেন! *কঠ উপনিষদও* এই আদেশ পাঠিয়েছেন মানবজাতির কাছে ১ম অধ্যায়ের ৩য় বল্লীতে ঃ *উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত,* 'ওঠ, জাগো, মহান আচার্যের আশ্রয়ে নিজের জ্ঞানোন্মেষ ঘটাও।' স্বামী বিবেকানন্দ সোজা ভাষায় যার রূপ দিয়েছিলেন—'ওঠো, জাগো, লক্ষ্যে না পৌঁছান পর্যন্ত থেমো না।'

এটি গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ শ্লোক। তৃতীয় অধ্যায়ের শেষেও আমরা পাই এই রকমই একটি উদাত্ত আহ্বান ঃ 'এইভাবে ইচ্ছাসহ বুদ্ধি বা যুক্তি থেকে শ্রেষ্ঠ এবং তারও অতীত যে আত্মা, তাঁকে জেনে এবং আত্মার সহায়ে ইন্দ্রিয় সংযম করে, হে মহাবাহু অসংযত কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে জয় কর।'

ইতি জ্ঞান কর্ম সন্ন্যাস যোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায় ঃ

এই হলো *কর্মকে জ্ঞানে সমর্পণ রূপ যোগের পথ* নামক
চতুর্থ অধ্যায়ের সমাপ্তি।

বর্ণানুক্রমিক শ্লোক-সূচী

(আদিচরণ-ক্রমে)

নির্ঘণ্ট